প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

একাদশ পুষ্প

# গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

## প্রথম পর্ব্ব—প্রথমাংশ



ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

গৌড়ীয় মত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

এম্-এ, ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য (বৈষ্ণব-পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয়), বিদ্যাবাচস্পতি,
ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর

কর্ত্তৃক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির

কলিকাতা

প্রকাশক ঃ

প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে

যুগ্মসম্পাদক

**ডকুটর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী**, এম. এ., পি. এইচ্. ডি

৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯

**প্রাপ্তিস্থান ঃ—**

১। মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৩। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

দ্রষ্টব্য ঃ—পুস্তক বিক্রেতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন ঃ—

**৪৬, রসা রোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ,**

**কলিকাতা—৩৩**

এই ঠিকানা হইতে ডাকযোগে, বা বিমানযোগে, কিম্বা লোকের দ্বারা গ্রন্থ পাঠাইবার সুবিধা নাই। ডাকে বা বিমানযোগে গ্রন্থ পাঠানোর জন্য কোনও পত্র পাওয়া গেলে তাহা উল্লিখিত মহেশ লাইব্রেরীতে প্রেরিত হইবে এবং মহেশ লাইব্রেরী হইতেই গ্রন্থ প্রেরিত হইবে।

---

**প্রথম খণ্ডের মূল্য ষোল টাকা**

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ-বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

# গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

# প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্য এবং বিশেষভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুধী ও সাধক পরম-পূজনীয় জ্ঞানপ্রবীণ ডক্‌টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের রচিত এই অপূর্ব্ব **গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন** গ্রন্থটী প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রকাশ করার সুযোগ লাভ ক'রে আমরা পরম আনন্দিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গদেশের প্রাণস্বরূপ। এই সার্ব্বজনীন পরম-ধর্ম্মের পুণ্যপ্রবাহে বাঙ্গলাদেশের সংস্কৃতির সকল দিক্‌ই যে ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, তার তুলনা জগতের ইতিহাসে স্বল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই মহাধর্ম্মের মূলীভূত দর্শন ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিষয়ে সাধারণের বিশেষ কিছুই জানা নাই। সে জন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জনসমাজে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মন্দ ধারণার অভাব নেই। এই কারণে, বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সুধীসমাজ এবং জনসাধারণ সকলের পক্ষেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন এরূপ পূর্ণাঙ্গ, বিজ্ঞানসম্মত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণমূলক আর দ্বিতীয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সমস্ত মূলতত্ত্বই পরমশ্রদ্ধেয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত ক'রে আমাদের ধন্য ক'রেছেন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার যে ভক্তি-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত ক'রে দিলেন, তা' সুচিরকাল অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হবে এবং চিত্তভূমি উর্ব্বরতর ক'রে তুলবে।

অলমিতি বিস্তরেণ ॥ ইতি—

প্রাচ্যবাণী মন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
৭-৩-'৫৭
( ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৬৩ )

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারি-প্রীতয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

# লেখকের নিবেদন

আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, বিশেষতঃ ভজন-সাধনবিহীন লোকের পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার প্রয়াস যে ধৃষ্টতামাত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি কেন আমি এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলাম, সুধীবৃন্দের চরণে তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ অনেক ভক্ত বৈষ্ণব অনেক দিন হইতেই এ-জাতীয় একখানা গ্রন্থ লিখিবার জন্য আদেশ করিতেছিলেন; কিন্তু স্বীয় অযোগ্যতার কথা বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহসী হই নাই। সময় সময় বিশেষ কারণে এমন একখানা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিয়াছি— যাহাতে শ্রীমন্মহপ্রভু-কথিত এবং তাঁহার চরণাশ্রিত বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত-গুলি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ভাবে সন্নিবেশিত থাকে। কিন্তু তদ্রূপ কোনও গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি আমার মনে জাগে নাই। অবশেষে প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্বে এক দিন কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ মহাশয় আসিয়া জানাইলেন—শ্রীবৃন্দাবন দাবানলকুণ্ডাশ্রয়ী গৌরগত-প্রাণ পরমভাগবত শ্রীশ্রীহরিবাবা মহারাজ তাঁহার একটী আদেশ আমাকে জানাইবার জন্য তাঁহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন; মহারাজজী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন লেখার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন এবং লেখার জন্য একটী কলমও পাঠাইয়াছেন। একথা বলিয়া ঘোষ মহাশয় আমার হাতে একটী ফাউণ্টেনপেন্ দিলেন। তখন আমার মনে হইল—শ্রীমন্মহাপ্রভুরই যেন ইচ্ছা—এই অযোগ্য অধমের দ্বারা কিছু কাজ করাইবেন। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তি; অচেতন পুতুলের দ্বারাও তিনি তাঁহার অভীষ্ট কাজ করাইয়া লইতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য হইয়াও আমি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তিনি কৃপা করিয়া যাহা স্ফুরিত করাইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি আমার মায়ামলিন চিত্তের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া স্থলবিশেষে তাহা যে মলিনতাদ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। অদোষদর্শী সুধী পাঠকবৃন্দের চরণে সানুনয় প্রার্থনা—তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন এই অযোগ্যের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন এবং মলিনতার আবরণের অন্তরালে যদি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে, তাহাই গ্রহণ করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সিদ্ধান্তগুলিকেই বর্ত্তমান যুগের এবং সাধারণ পাঠকদের উপযোগী ভাবে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে তদনুরূপ কিছু যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বিশ-পঁচিশ ফর্ম্মাতেই গ্রন্থ শেষ হইবে; কিন্তু শেষকালে দেখা গেল, গ্রন্থখানি প্রায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। তখন চিন্তা আসিল, গ্রন্থ কিরূপে প্রকাশিত হইবে। প্রকাশের

জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন ; তাহা যোগাইবার সামর্থ্য আমার নাই। ভাবিলাম—যিনি কৃপা করিয়া লিখাইয়াছেন, গ্রন্থের প্রকাশও যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন। বাস্তবিক তিনিই সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে একজন মহাপ্রাণ পরমভাগবত আপনা হইতেই আসিয়া গ্রন্থ প্রেসে দেওয়ার কথা বলিলেন। আমার আর্থিক অসামর্থ্যের কথা জানাইলে তিনি বলিলেন—"গ্রন্থ প্রেসে দিন ; শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদ্বারা কিছু আনুকূল্য করাইতে পারেন।" ইহার পরে এক দিন আসিয়া তিনি পাঁচহাজার টাকা দিয়া গেলেন এবং পরেও দুই হাজার টাকা দিয়াছেন। এই পরমভাগবতের যোগে প্রকাশিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া গত বৈশাখ মাসে পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিলাম এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকা দিয়া গ্রন্থের জন্য কাগজ কিনিলাম। গত আষাঢ় মাসে মুদ্রণ আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত মহাপ্রাণ ভক্ত তাঁহার নাম প্রকাশে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহার চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—প্রভুর কৃপাধারা যেন তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের উপর অজস্র বর্ষিত হয়।

আমার প্রয়োজনীয় কোনও কোনও গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া যাঁহারা আমার আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণেও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি এবং প্রভুর চরণে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর অজস্র কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীধামনবদ্বীপবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত করুণাময় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা চেতলা নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ঘোষ এবং কলিকাতা ডোভার লেন নিবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব গিরীশঘোষ-অধ্যাপক গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয়, শ্রীল সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস মহোদয় অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন ; আমার শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে তাঁহার হস্তে এই গ্রন্থখানি অর্পণের সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত।

সমগ্র গ্রন্থকে সাতটী পর্ব্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পর্ব্বে—ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। ইহার দুইটী অংশ ; প্রথমাংশ—ব্রহ্মতত্ত্ব, গৌড়ীয়মত ; দ্বিতীয়াংশ—প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে অন্য আচার্য্যদের অভিমত ও তাহার সমালোচনা। দ্বিতীয় পর্ব্বে—জীবতত্ত্ব। তৃতীয় পর্ব্বে—সৃষ্টিতত্ত্ব। চতুর্থ পর্ব্বে—ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। পঞ্চমপর্ব্বে—সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব। সর্ব্বত্রই প্রস্থানত্রয়ের মত, অন্য আচার্য্যদের মত এবং তাহার আলোচনা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ষষ্ঠপর্ব্বে—প্রেমতত্ত্ব। সপ্তম পর্ব্বে—রসতত্ত্ব।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব—এই কয়টী বিষয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

প্রতি পর্ব্বে প্রায় প্রত্যেকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ই পৃথক্ ভাবে এবং যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই রকমের উক্তি স্থান পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে মনে করিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে।

## লেখকের নিবেদন

গ্রন্থের আকার বড় হইয়াছে বলিয়া খণ্ডে খণ্ডে বাঁধাইয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভূমিকা এবং প্রথম পর্ব্বের প্রথমাংশ দেওয়া হইল। সম্পূর্ণ গ্রন্থে তিন খণ্ড হইবে বলিয়া মনে হয়; কিছু বেশীও হইতে পারে।

জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট্ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাস, এম, এ, মহোদয় এই গ্রন্থের মুদ্রণভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। বাস্তবিক তাঁহার এতাদৃশ আগ্রহ না থাকিলে প্রথম খণ্ড এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, প্রভুর চরণে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতাস্থিত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, অধুনা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয়-সংস্কৃতশিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ এবং প্রাচ্যবাণীর যুগ্ম সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমশ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ্-ডি-মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের প্রকাশনভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাধারা তাঁহার উপর বর্ষিত হউক, ইহাই প্রভুর চরণে প্রার্থনা।

ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের একটা উপদেশ আছে—সত্য কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" কিন্তু পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন—অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেয়ঃ। "শ্রেয়স্তত্রহিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৩।১২।৪৪॥" এজন্য প্রাচীন আচার্য্যগণও বহুস্থলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই আনুগত্যে এই গ্রন্থেও কোনও কোনও বিরুদ্ধমতের সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও মনে দুঃখ জন্মে, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি যেন দয়া করিয়া এই অযোগ্য অধমকে ক্ষমা করেন।

সর্ব্বশেষে বিনীত নিবেদন এই। আমি ভ্রম-প্রমাদাদি সমস্ত দোষের আকরতুল্য। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। সহৃদয় সুধীবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া আমাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিবেন—ইহাই তাঁহাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা।

সকলের চরণেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

২রা চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ,
৪৭১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা।
১৬ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।
৪৬, রসা রোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

কৃপাপার্থী
**শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**

# সূচীপত্র

( অনুচ্ছেদ। বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক )

## ভূমিকা

( ভূমিকার সূচীপত্রে পৃষ্ঠাঙ্কগুলির পূর্ব্বে "ভূ-" সংযোজনীয় )

সূচীপত্র

# সূচীপত্র



## অবতরণিকা

## প্রথম-পর্ব্ব—প্রথমাংশ ( ব্রহ্মতত্ত্ব-গৌড়ীয় মত )

( পৃষ্ঠাঙ্কগুলির পূর্ব্বে সর্ব্বত্র "১।১।" সংযোজনীয় )

### প্রথম অধ্যায়। ব্রহ্ম-শব্দের তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম সশক্তিক



### দ্বিতীয় অধ্যায়। ব্রহ্মের শক্তি



### তৃতীয় অধ্যায়। পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব

## চতুর্থ অধ্যায়। পরব্রহ্মের আকার-সম্বন্ধে আলোচনা



## পঞ্চম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব



## ষষ্ঠ অধ্যায়। ব্রহ্মের নাম-পরিচ্ছদাদি



## সপ্তম অধ্যায়। আবির্ভাব-তিরোভাব

## অষ্টম অধ্যায়। পরব্রহ্ম একেই বহু



## নবম অধ্যায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম



## দশম অধ্যায়। পরব্রহ্মের পরিকর

## একাদশ অধ্যায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা



## দ্বাদশ অধ্যায়। পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব

## ত্রয়োদশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা ও ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি



## চতুর্দ্দশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব



## পঞ্চদশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের তত্ত্ব

## ষোড়শ অধ্যায়। গোপীভাব

সূচীপত্র

## সপ্তদশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-বিচার



## অষ্টাদশ অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব



## ঊনবিংশ অধ্যায়। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্

## বিংশ অধ্যায়। সম্বন্ধতত্ত্ব



প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

সঙ্কেত ঃ

১।১।২৩-অনু = প্রথম পর্ব্ব। প্রথমাংশ। ২৩শ অনুচ্ছেদ

১।২।৫০-অনু = প্রথম পর্ব্ব। দ্বিতীয়াংশ। ৫০শ অনুচ্ছেদ

২।১৫-অনু = দ্বিতীয় পর্ব্ব। ১৫শ অনুচ্ছেদ

৪।২৫-অনু = চতুর্থ পর্ব্ব। ২৫শ অনুচ্ছেদ

উ. নী. = উজ্জ্বলনীলমণি

প. পু. = পদ্মপুরাণ

প. পু. পা. = পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড

বি. পু. = বিষ্ণুপুরাণ

ভ. র. সি. = ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীচৈ. চ. = শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীভা. = শ্রীমদ্ভাগবত

হ. ভ. বি. = শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস

অন্যান্য গ্রন্থের সম্পূর্ণ নামই প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়াছে।



চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ, ৪৭১ শ্রীচৈতন্যাব্দ,

এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

# শুদ্ধিপত্র

**পৃষ্ঠা। পংক্তি। অশুদ্ধ-শুদ্ধ**

ভূ-১১।১০। বিজ্ঞানারিক্ত—বিজ্ঞানাতিরিক্ত
ভূ-৩২।৫। মিনিত্ত—নিমিত্ত
ভূ-১১৫।১৩। সানভক্তিকে—সাধনভক্তিকে
ভূ-১১৬।১৫। পরমামৃত্তমাং—পরমামুত্তমাং
ভূ-১৪৯।৪। আয়ত্বে—আয়ত্তে
ভূ-১৮৫।১১। অচিন্ত্যশক্তিময়াত্বাদিতি—অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি
২১।৯। আকামঃ—অকামঃ
২৩।৬। **১৪—১৩**
২৫।৯। **পূর্ব্ববর্ত্তী—১৪ পূর্ব্ববর্ত্তী**
৫৭।২৭। করিয়া—হইয়া
৬০।১১। পৃথিবীং—পৃথিবী
১০১। শেষ। ব্রহ্মাণ—ব্রহ্মণি
১০২।২২। সর্ব্বর্গতং—সর্ব্বগতং
১০৬।১৬। যেই—সেই
১৪৭।১০। ষৎ—যৎ
১৫৯।২২। ব্রহ্মেব—ব্রহ্মের
১৬০।১। বাসুদেব—বাসুদেবং
১৬২।১৫। তমীশ্বরাণং—তমীশ্বরাণাং
১৭২।২৪। তো—তে
১৮৪।৭। করি্লন—করিলেন
২০৫।১। পবিত্রাণায়—পরিত্রাণায়
২০৬।২৬। স্বচিচ্ছক্তেবীর্য্যং—স্বচিচ্ছক্তের্বীর্য্যং
২১১।৪। মৎষ্য—মৎস্য
২১৩।১৬। বিচিত্রী—বৈচিত্রী
২২৮।৭। ব্রহ্মা—ব্রহ্ম
২৫৮।১৪। ভূতান—ভূতানি
২৫৯।৩। পার্যদগণকেও—পার্ষদগণকেও
২৬৫।৫। ঊদ্ধর—উদ্ধর
২৮৩।৯। তাহকে—তাহাকে
৩২৭।১৯। প্রেম্নঃ, প্রেম্নি—প্রেম্ণঃ, প্রেম্ণি
৩৩৭।৬। সমোইহং—সমোঽহং
৩৬৩।৫। কিঞ্চিদূরবর্ত্তী—কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী
৩৬৩।২৫। মৎপ্রেভূং—মৎপ্রভুং
৩৬৭।২৯ অক্ষুন্ন—অক্ষুণ্ণ
৩৭৩।১৮। অবিষ্ট—আবিষ্ট
৩৭৩।২৩। তাভ্যামপীথং—তাভ্যামপীত্থং
৩৭৭।৩। **দ্বারকা-মথুরায়ও—(২) দ্বারকা-মথুরায়ও**
৩৯৯।২। শ্রীকৃষ্ণরও—শ্রীকৃষ্ণেরও
৪০৫।১৪। পাবে—পারে
৪৩০।৭। লোকাভিরাম—লোকাভিরাম
৪৩২।১০ সুতরং—সুতরাং
৪৫০।২১। অভিলাষিত—অভিলষিত
৪৭৪।৩। বন্তু—বস্তু
৪৮৫।৮ স্নেহ—স্নেহ
৪৯১।২০ শ্রীনারাগণের—শ্রীনারায়ণের
৫০০।৩। **খ—ঘ**
৫১১।২৬। চিদ্‌বন্তু—চিদ্‌বস্তু
৫২০।২৫। বক্ষমাণ—বক্ষ্যমাণ
৫২১।১৬।।১।১।১৬৯-ক (৫)—১।১।১৬৯-ক (৬)
৫২৬।২৮। সমৃদ্ধিমাম্—সমৃদ্ধিমান্
৫২৮।২৪। ঋভস্য—ঋষভস্য
৫৩২।৯। বণিত—বর্ণিত
৫৮৮।১। সম্বন্ধে—সম্বন্ধ
৫৯৩।২৪ উৰ্দ্ধ—ঊর্দ্ধ
৬১৪।৫। গুরুপত্বীর—গুরুপত্নীর
৬৪০।১১। অঙ্গরদ্বয়—অক্ষরদ্বয়
৬৪৮।৮। **দেহিক—দৈহিক**

# ভূমিকা

# ভূমিকা

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

## ১। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তির হেতু

জগতে সকলেই সুখ চাহেন। সুখের জন্যই সকলের প্রয়াস। প্রয়াসের ফলে চিত্তবিনোদক একটা বস্তু অনেক সময়ে পাওয়া যায়; তাহাকেই সুখ মনে করিয়া সংসারী জীব আস্বাদন করেন।

সুখ চাহেন বলিয়া সুখ-বিরোধী দুঃখ কেহ চাহেন না; দুঃখ-লাভের জন্য কেহ কোনওরূপ চেষ্টাও করেন না; বরং দুঃখ যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্যই চেষ্টা করা হয়। তথাপি দুঃখ আসিয়া পড়ে এবং আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহা ভোগ করিতেও হয়; কিন্তু তাহা ভোগ করা হয় অনিচ্ছার সহিত, দুঃখ যেন বলপূর্ব্বকই নিজেকে ভোগ করাইয়া লয়।

দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি এবং নির্ম্মল সুখ—ইহাই হইতেছে সকলের কাম্য। কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে, মনীষীগণ তাহার নির্দ্ধারণের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী চিন্তার ফলেই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব।

ভিন্ন ভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। এজন্য দার্শনিক মতবাদও বিভিন্ন।

কেহ কেহ এই সংসারের সুখ লাভের জন্যই কেবল লালায়িত। তাঁহারা তাহারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। দুঃখের কারণ দূরীভূত করার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার প্রাধান্য নাই; সুখের বন্যায় দুঃখকে ভাসাইয়া দেওয়ার জন্যই যেন তাঁহাদের প্রয়াস।

আবার কেহ কেহ দুঃখ-নিবৃত্তির এবং সঙ্গে সঙ্গে সুখের জন্যও লালায়িত এবং তদনুকূল উপায়ের সন্ধানেই তাঁহারা চেষ্টিত।

আবার কেহ কেহ মনে করেন—সুখ থাকিলেই তাহার সহচরী বা অনুচররূপে দুঃখও থাকিবে; কেননা, এই সংসারে এইরূপ অবস্থাই প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। এজন্য তাঁহারা সুখলাভের উপায় উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টিত না হইয়া আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের সন্ধানেই ব্যস্ত।

আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা মনে করেন—সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়, তদ্রূপ বাস্তব সুখের উদয়ে দুঃখ আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা কেবল বাস্তব-সুখ-প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্যই চেষ্টিত।

এই গেল সুখ-দুঃখের কথা। এই সঙ্গে আরও একটী বিবেচনার বিষয় আছে। সুখ বা দুঃখ ভোগ করে কে ? সুখ-লাভের জন্য বা দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য লালায়িতই বা কে ? যদি বলা যায়—কেন, "আমরা" ? "আমরাই" সুখ-দুঃখ ভোগ করি এবং সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য লালায়িত হই। কিন্তু, এই "আমরা" কে ? সুখ-দুঃখ তো দেহই ভোগ করে। "আমি" কি কেবল এই দেহ ? না কি দেহাতিরিক্ত কিছু ? এই বিষয়েও সকলে একরূপ মত পোষণ করেন না। কেহ বলেন—এই দেহই "আমি" ; দেহাতিরিক্ত কিছু নাই। আবার কেহ বলেন—না, এই দেহই "আমি" নহি ; "আমি" হইতেছি দেহাতিরিক্ত একটা বস্তু, দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেও "আমি" থাকি।

এইরূপ বিভিন্ন চিন্তাধারার ফলে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

সুখ-লাভের বা দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের অনুসন্ধানই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব-হেতু হইলেও প্রসঙ্গ-ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই দার্শনিক মনীষীদিগকে অন্যান্য অনেক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে ; যেমন, সুখ কি বস্তু, দুঃখ কি বস্তু, জীব কি বস্তু, জগৎই বা কি, জগতের কোনও সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ত্তা আছেন কিনা, থাকিলে তিনি কে, জীবের মৃত্যু বস্তুটী কি, মৃত্যুর পরে জীব থাকে কিনা, ইত্যাদি।

এ-স্থলে অতিসংক্ষেপে কয়েকটী দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করা হইতেছে।

## ২। চার্ব্বাক-দর্শন

চার্ব্বাক-মতে দেহই "আমি," "আমি" বা জীবাত্মা" বলিয়া দেহাতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই। পরলোক বলিয়াও কিছু নাই, পুনর্জ্জন্ম বলিয়াও কিছু নাই। দেহ ভস্মীভূত হইলেই "আমার" সব শেষ। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" এই দেহই যখন "আমি", তখন দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে "আমিও" ভস্মীভূত হইয়া গেলাম। ইহার পরে "আমি" আর কোথা হইতে কিরূপে আসিব ? সুতরাং যত দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, যথেচ্ছভাবে ততদিন সুখভোগ করার চেষ্টা করাই সঙ্গত, তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। "খাও, পিও, মজা কর"—ইহাই চার্ব্বাক-নীতি। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" "যত দিন বাঁচিয়া থাক, সুখে থাক। সুখ-ভোগের জন্য দেহের শক্তির প্রয়োজন ; দেহের শক্তি রক্ষার এবং বৃদ্ধির জন্য ঘৃত পান কর। অর্থ না থাকে, ঋণ করিয়াও ঘৃত সংগ্রহ কর। ঋণ শোধ করিতে না পার, ভয় কিসের ? পরকাল বলিয়া তো কিছু নাই ; মৃত্যুর পরে তোমারও অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন কে কখন কোথায় তোমার নিকটে ঋণের টাকা চাহিবে ?"—ইহাই চার্ব্বাক-নীতি।

চার্ব্বাক-মতে—অঙ্গনা-সঙ্গাদি জনিত সুখই পুরুষার্থ ; এই দেহে যে দুঃখাদির অনুভব হয়, তাহাই নরক। রাজাই পরমেশ্বর, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। এই ভোগায়তন স্থূল দেহের নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই। পরলোক, পুনর্জ্জন্ম—প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া তাহাদের অস্তিত্বও স্বীকার্য্য নহে। ক্ষিতি ( পৃথিবী ), অপ্ ( জল ), তেজঃ ও বায়ু—এই চারিটীই তত্ত্ব ; কেননা, এই চারিটী প্রত্যক্ষের বিষয়। আকাশ ( ব্যোম ) প্রত্যক্ষের বিষয় নহে বলিয়া তত্ত্ব নহে।

উল্লিখিত চারিটী তত্ত্বের পরিণতিই দেহ। ইহাদের মিশ্রণে দেহে এক প্রকার মাদকতা জন্মে—ইহাই দেহের স্বভাব। ইহাকেই চেতনা-শক্তি বলে। তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের যেরূপ সম্মিলনে এই চেতনা-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই সম্মিলন নষ্ট হইলেই চেতনা-শক্তিও অন্তর্হিত হয় ; ইহাই মৃত্যু।

দেহ-সর্ব্বস্ব লোকের নিকটে চার্ব্বাক-দর্শনের উল্লিখিতরূপ বাক্যগুলি চারু—আপাততঃ মনোরম—বলিয়া মনে হয়। এজন্য এই মতবাদকে চার্ব্বাক-মত বলা হয়। লোকের ( জনসাধারণের ) মধ্যে ইহা সহজেই আয়ত ( বিস্তৃত ) হয় বলিয়া এই মতবাদকে "লোকায়ত-মত"ও বলা হয়।

চার্ব্বাক-মতে জীবাত্মার ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং বেদের প্রামাণ্যও স্বীকৃত হয় না। বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না বলিয়া বেদানুগতগণ চার্ব্বাক-দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলেন।

কথিত আছে, দেবগুরু বৃহস্পতি নাকি চার্ব্বাক-দর্শনের প্রবর্ত্তক। বৃহস্পতি বোধ হয় স্বর্গবাসী দেবতাদের জন্যই এই দর্শন প্রচার করিয়া থাকিবেন ; তাঁহারাই অনেকটা নিরাপদে এই দর্শনের অনুসরণ করিতে পারেন। কেননা, স্বর্গবাসীরা নাকি নীরোগ, নির্জরা এবং বহুভোগেও নিরবসাদ। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে চার্ব্বাক-মতের অনুসরণ নিতান্ত নিরাপদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, মর্ত্ত্যজীব নীরোগও নহে, নির্জরাও নহে ; আর বহুভোগে মর্ত্ত্যজীব অবসাদগ্রস্তও হয়, রোগাদির কবলেও পতিত হয়। সুতরাং যথেচ্ছ এবং অবাধ সুখ-ভোগের প্রয়াস মর্ত্ত্যজীবের পক্ষে সুখের বিপরীত বস্তুই আনয়ন করিবে।

## ৩। বৌদ্ধ-দর্শন

### ক। সাধারণ পরিচয়

শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ হইতেছেন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। বৌদ্ধমতে শূন্যই হইতেছে একমাত্র সত্য তত্ত্ব। এই শূন্য কি রকম পদার্থ, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। শূন্যকে অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছুও বলা যায় না, অস্তিত্বহীন কিছুও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না, উভয়ের অভাবও বলা যায় না। কেবল তত্ত্বটীর কথা প্রকাশ করার জন্যই ইহাকে "শূন্য" বলা হয়। "শূন্যমিতি ন বক্তব্যম্ অশূন্যমিতি বা ভবেৎ। উভয়ং নোভয়ং চেতি প্রজ্ঞাপ্ত্যর্থং তু কথ্যতে॥" সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার বলেন—"অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যতত্ত্বম্।—আছে, নাই, উভয়, অনুভয়—শূন্যতত্ত্ব হইতেছে এই বস্তুচতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত।"

এই শূন্য হইতেই উৎপত্তি, শূন্যেই লয়। শূন্যই সত্য, আর সব মিথ্যা। বৌদ্ধমতে জীব, জগৎ—কিছুই সত্য নহে। "ঈশ্বর আছেন"—একথাও বুদ্ধদেব বলেন নাই, "ঈশ্বর নাই"—একথাও তিনি বলেন নাই। সুতরাং বৌদ্ধমতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন।

বৌদ্ধমতে জীব বা আত্মা বলিয়া কোনও নিত্য পদার্থ স্বীকৃত হয় না ; এমন কি, আত্মা বলিয়া বহুকাল-ব্যাপী স্থির কোনও পদার্থও স্বীকৃত হয় না। বৌদ্ধমতে সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—ক্ষণকালস্থায়ী ; আত্মাও তদ্রূপ ক্ষণিক।

ক্ষিতি ( পৃথিবী ), অপ্ ( জল ), তেজঃ, মরুৎ ( বায়ু ) ও ব্যোম ( আকাশ )—এই পাঁচটী পদার্থের মধ্যে বৌদ্ধগণ প্রথম চারিটীর বস্তুত্ব স্বীকার করেন ; তাঁহারা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আকাশ হইতেছে অভাব-বস্তু।

বৌদ্ধমতে চারি প্রকারের পরমাণু আছে—পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয়। এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু—এই চারি রকমের স্থূল-ভূতাকারে সংহত ( মিলিত ) হয়। এই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ( ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ব্বস্তু ) পদার্থের—অর্থাৎ দৃশ্যমান্ বাহ্য বস্তুর—উৎপত্তি হয়।

এই মতে আবার পাঁচটী আন্তর বা আভ্যন্তরিক পদার্থও স্বীকৃত হয় ; ইহাদিগকে স্কন্ধ বলে। যথা—রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কার-স্কন্ধ। ইহাদের মধ্যে সবিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতেছে রূপস্কন্ধ। বিষয় সকল বাহ্যবস্তু হইলেও দেহস্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া রূপস্কন্ধকেও অধ্যাত্ম বা আন্তর বা আভ্যন্তরিক বলা হয়। বিজ্ঞান-প্রবাহ হইতেছে বিজ্ঞান-স্কন্ধ। "অহং অহং—আমি, আমি" এইরূপ বিজ্ঞানধারার বা অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহের নামান্তর হইতেছে "আলয়-বিজ্ঞান।" বেদনা-স্কন্ধ—সুখাদির অনুভব। সংজ্ঞাস্কন্ধ—গো, অশ্ব, মানুষ—এইরূপ নামরঞ্জিত জ্ঞান-বিশেষ। সংস্কার-স্কন্ধ—রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম। এই স্কন্ধপঞ্চকের মধ্যে যে বিজ্ঞান-স্কন্ধ, তাহাই হইতেছে বৌদ্ধমতে চিত্ত ও আত্মা। অন্য চারিটী স্কন্ধকে চৈত্ত বলা হয়। এই পঞ্চস্কন্ধের মিলনে সমস্ত আন্তর-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

সমস্ত পদার্থ ই—পঞ্চস্কন্ধও—প্রতিক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে, আবার ধ্বংসপ্রাপ্তও হইতেছে। লোকের সমগ্র জীবন ধরিয়াই স্কন্ধসমূহের এইরূপ অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশ ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। বৌদ্ধগণ কর্ম্ম মানেন, কর্ম্মফলও মানেন। এক ক্ষণের স্কন্ধসমষ্টি যে কর্ম্ম করে, পরবর্ত্তী ক্ষণের স্কন্ধসমষ্টি তাহার ফল ভোগ করে। যে পর্য্যন্ত জীবের বাসনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই এইভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল থাকিবে। বাসনার নিবৃত্তিতে কর্ম্মেরও নিবৃত্তি।

বৌদ্ধদর্শনের মতে দেহনাশে বা মৃত্যুতে জীবত্ব নষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরে কর্ম্ম অনুসারে পাঁচ রকমের দেহপ্রাপ্তি হইতে পারে—দেবশরীর, মনুষ্য-শরীর, নারকীয় শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব-শরীর। এইরূপ শরীর-প্রাপ্তি কিন্তু পুনর্জন্ম নহে। কেননা, জীব বা আত্মা বলিয়া বাস্তব নিত্য বস্তু কিছু থাকিলেই তো তাহার জন্ম বা পুনর্জন্ম থাকিতে পারে। বৌদ্ধমতে তাহা যখন নাই, তখন আত্মার পুনর্জন্মও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শরীর-ধারণ হইতেছে নব-নব-স্কন্ধ-সমষ্টির প্রকাশ।

বৌদ্ধমতে রূপকায় ( বা স্থূলদেহ ), নামকায় ( বা সূক্ষ্মদেহ ) এবং বিজ্ঞান—ইহারা মিলিয়াই পুরুষ। বিজ্ঞান হইতেছে অদৃশ্য, অনন্ত বা অসীম এবং সর্ব্বতোপহ। "বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সর্ব্বতোপহম্॥—দীঘনিকায় ॥১১॥" পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি হইতেছে ভূতাত্মা।

বৌদ্ধমতে সংসার অনাদি, কিন্তু অনন্ত নহে। সাধনের ফলে সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। সংসারের ধ্বংসই নির্ব্বাণ ( বা মোক্ষ )। দুঃখের আত্যন্তিক অবসানই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণে দেহাদি কিছুই

থাকে না, শূন্যতা প্রাপ্তি হয়। তৈল ও সলিতার যোগে যেমন প্রদীপ জ্বলে, আলোক বিস্তার করে ; তদ্রূপ পঞ্চস্কন্ধের যোগে এবং পার্থিবাদি পরমাণুর যোগে দেহের উৎপত্তি, সুখ-দুঃখাদির অনুভব। তৈল ও সলিতার অভাব হইলে প্রদীপ আর জ্বলে না, আলোকও বিস্তার করেনা ; তদ্রূপ স্কন্ধাদির আত্যন্তিক বিনাশে দেহও থাকে না, দেহের সুখ-দুঃখও থাকেনা ; সমস্তই শূন্য হইয়া যায়।

নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্য যে সাধন, তাহা হইতেছে এই দশটী বস্তুর অনুশীলন ঃ—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান ( বা পরিমিতা )।

শীল—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটীকে বলা হয় "পঞ্চশীল।" জৈনমতেও এই পাঁচটী উপদিষ্ট ; জৈনমতে ইহাদিগকে বলা হয় "পঞ্চমহাব্রত।" উল্লিখিত পঞ্চশীল ব্যতীতও বৌদ্ধমতে আরও পাঁচটী "শীল" উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—সুরাপান-ত্যাগ, অপরাহ্ন-ভোজন-ত্যাগ, নৃত্যগীত-ত্যাগ, উচ্চাসন-ত্যাগ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-ধারণ-ত্যাগ। বৌদ্ধমতে এই দশটী "শীল।"

দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য। নির্ব্বাণেই দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমতে পরমাণু, স্কন্ধ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ই অচেতন এবং অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী।

বৌদ্ধমতে প্রমাণ দুইটী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই প্রমাণদ্বয়মূলক যুক্তির উপরেই বৌদ্ধদর্শন প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধদর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, বেদানুগতগণ তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলেন। এইরূপে বৌদ্ধদর্শনও নাস্তিক-দর্শনের মধ্যে পরিগণিত।

## খ। চারিটী প্রধান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়

বুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পরে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধদর্শনের যে অভিমত, সূত্রকার ব্যাসদেব "সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ॥ ২।২।১৮॥"—সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ॥ ২।২।৩২॥"—সূত্র পর্য্যন্ত পনরটী সূত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিভিন্ন ভাষ্যকারগণও বৌদ্ধমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাষ্যপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তিনটী বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ এবং সর্ব্বশূন্যবাদ। সর্ব্বাস্তিত্ববাদীদের মতে ঘট-পটাদি বাহ্য পদার্থও আছে ( সত্য ) এবং জ্ঞানাদি আন্তর পদার্থও আছে ( সত্য )—বাহিরে ভূত ( পৃথিব্যাদি ভূত ) এবং রূপাদি ও রূপাদির গ্রাহক চক্ষুরাদি ভৌতিক পদার্থও সত্য ; অন্তরে চিত্ত ও চৈত্তও ( চিত্তসম্বন্ধীয় ব্যাপার ) সত্য। বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদীরা বলেন—বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে ; অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আর সর্ব্বশূন্যবাদীরা বলেন—বাহিরেও কিছু নাই, অন্তরের বিজ্ঞানও বস্তুসৎ নহে।

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে চারিটী বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তন্মধ্যে ( ১ ) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব

স্বীকার করেন। (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু বৈভাষিকদের ন্যায় তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন। (৩) যোগাচার-সম্প্রদায় কিন্তু বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশে ঘট-পটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার ধারণপূর্ব্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থই নাই। আর (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধি বিজ্ঞান—কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন; এজন্যই এই সম্প্রদায়কে সর্ব্বশূন্যবাদী বলা হয়।

উল্লিখিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী সম্প্রদায়ই বলেন—বাহ্য ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম-ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশীল এবং তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল; কোনও পদার্থই উৎপত্তির পরে এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অবয়বের অতিরিক্ত "অবয়বী" বলিয়াও পৃথক্ কোনও পদার্থ নাই। পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণু-সমূহই যথাসম্ভবভাবে সম্মিলিত হইলে বিভিন্ন প্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পরমাণুপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকাশ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; উহা হইতেছে অসৎ—আবরণাভাব মাত্র।

বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা বলেন—পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয়—এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চলন স্বভাবান্বিত। রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ—এই চারিটী গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম্ম। রূপ, রস ও স্পর্শ—এই তিনটী গুণ জলীয় পরমাণুর ধর্ম্ম; রূপ ও স্পর্শ—এই দুইটী তৈজস পরমাণুর ধর্ম্ম এবং স্পর্শ বায়বীয় পরমাণুর ধর্ম্ম। এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়। এই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত (সমষ্টি) উৎপন্ন হয়। এইরূপে পৃথিব্যাদি পরমাণু পরস্পর সংঘাত প্রাপ্ত (মিলিত) হইয়া পৃথিব্যাদি দৃশ্যমান পদার্থের উৎপাদন করে। এইরূপে বাহ্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

আবার (১) রূপ, (২) বিজ্ঞান, (৩) বেদনা, (৪) সংজ্ঞা ও (৫) সংস্কার—ইহারা হইতেছে পঞ্চস্কন্ধ—পাঁচটী আন্তর বা আভ্যন্তরিক বিভাগ।

এই পাঁচটী স্কন্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই পঞ্চস্কন্ধের মিলনে সমস্ত আন্তর-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

সম্প্রদায়-বিভাগ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীপাদ রামানুজ যাঁহাদিগকে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বলিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহাদিগকেই একসঙ্গে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলিয়াছেন। আর শ্রীপাদ রামানুজের যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ই যথাক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করের বিজ্ঞানবাদী এবং সর্ব্বশূন্যবাদী সম্প্রদায়।

উল্লিখিত বৌদ্ধ-মতবাদের অযৌক্তিকতা বেদান্তদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে

## গ। সর্ব্বাস্তিত্ববাদ-( অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-) সম্বন্ধে আলোচনা

ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমতে কোনও পদার্থ ই যখন একক্ষণের বেশী স্থায়ী হয় না, তখন একাধিক পদার্থের একত্রাবস্থিতি—সুতরাং মিলনও—অসম্ভব। এই অবস্থায় পরমাণু-আদি বহু পদার্থের সংঘাত ( মিলন ) এবং চিত্ত ও চৈত্তের সংঘাত ( মিলন ) অসম্ভব এবং ইহাদের সংঘাতে বাহ্য ও আন্তর ব্যবহারও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার, বৌদ্ধমতে পরমাণুও অচেতন এবং স্কন্ধও অচেতন। বৌদ্ধমতে কোনও স্থির চেতন বস্তু নাই। কাহার প্রভাবে অচেতন পরমাণু বা স্কন্ধ সংহত হইবে ?

বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন—নিয়ামক ও সংঘাতকর্ত্তা কোনও স্থির চেতন পদার্থ না থাকিলেও লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের বাধা হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্যা ( যাহা ক্ষণিক, তাহাকে স্থির বলিয়া জানা হইতেছে অবিদ্যা ), সংস্কার, বিজ্ঞান ( অহং-এইরূপ জ্ঞান ), নাম, রূপ, ষড়ায়তন ( বিজ্ঞান, পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় এবং রূপ—এই ছয়টী পদার্থের মিলনে উৎপন্ন পদার্থকে ষড়ায়তন বলে। ইন্দ্রিয়সমন্বিত দেহই ষড়ায়তন ), স্পর্শ ( নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম স্পর্শ ), বেদনা ( সুখাদির অনুভব ), তৃষ্ণা ( বিষয়-স্পৃহা বা ভোগেচ্ছা ), উপাদান ( তৃষ্ণা হইতে যে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম উপাদান ), ভব ( পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ), জাতি ( উৎপত্তিমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি বা দেহবিশেষ-প্রাপ্তি ), জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা ( শোকজনিত দুঃখ ), দুঃখ, দুর্ম্মনস্তা ( মনোব্যথা ), মান, অপমান ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; সুতরাং ইহারা হইতেছে পরস্পর পরস্পরের কারণ। এই অবিদ্যাদি পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ( কারণ-কার্য্য)-ভাবে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকে বলিয়া সংঘাত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তির পক্ষে নিমিত্ত বা কারণ হইতে পারিলেও সংঘাতের (মিলনের) জনক হইতে পারে না।

বস্তুতঃ অবিদ্যাদির কারণতাও সিদ্ধ হয় না। কেননা, কার্য্য ও কারণ হইবে অব্যবহিত-সম্বন্ধবিশিষ্ট। ক্ষণিকবাদে তাহা অসম্ভব ; এই মতে, পূর্ব্বক্ষণীয় বস্তু ধ্বংস প্রাপ্তির পরেই পরক্ষণীয় বস্তুর উদ্ভব। সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে অব্যবহিত সম্বন্ধ নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে "অভাব"। এজন্য তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি বলা যায়—পূর্ব্বক্ষণীয় বস্তুর ভাবাবস্থা থাকিতে থাকিতেই তাহা পরক্ষণীয় বস্তুর উৎপাদক হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকবাদই আর থাকে না।

অভাব হইতেও ভাব-বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা অবশ্য বলেন "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ—উপমর্দ্দন ( বিনাশ ) ব্যতীত কোন কিছু প্রাদুর্ভূত হয় না" ; কিন্তু ইহাও অসঙ্গত। কেননা, যদি অভাব হইতেই ভাব-বস্তু জন্মিত, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ কারণ থাকার প্রয়োজন হইত না। কেননা, বস্তুনিরপেক্ষ অভাবের কোনও বিশেষ নাই। বিনষ্ট বীজে যে অভাব, নিঃস্বভাব শশশৃঙ্গে সেই অভাব নহে। বিশেষ বিশেষ স্থলে অভাবের বিশেষত্ব স্বীকার করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুরের, দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে। যাহার কোনও বিশেষ নাই, ভেদ নাই, নির্দ্দিষ্টতা নাই, তাদৃশ অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে শশশৃঙ্গ হইতে বা আকাশকুসুম হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কিন্তু তাহা হয় না।

তারপর আকাশ-সম্বন্ধে। বৌদ্ধেরা বলেন—আকাশ অবস্তু। বেদান্ত-দর্শন এই মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ—পরমাত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।" ইহাদ্বারাই আকাশের বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা শ্রুতি মানেন না, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশ অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। পৃথিব্যাদি যেমন গন্ধাদি গুণের আশ্রয়, আকাশও তেমনি শব্দগুণের আশ্রয়। শব্দ হইতেই আকাশের অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব অনুমিত হইতে পারে। "এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে"-ইত্যাদি স্থলে শ্যেনাদির বিচরণস্থানরূপেই আকাশের অস্তিত্বের প্রতীতি হইতেছে।

একথাও বলা যায় না যে—পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের অভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত "আকাশ" বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। কেননা, পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের অভাবই যদি "আকাশ" হয়, তাহা হইলে কোন্ রকমের অভাব ? প্রাগভাব ? না কি ধ্বংস ? না কি অত্যন্তাভাব ? না কি অন্যোন্যাভাব ? প্রাগভাব হইতে পারে না ; কেননা, কোনও বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী যে অভাব, তাহাকে বলে প্রাগভাব। "আকাশ" যদি পৃথিব্যাদির উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অভাব হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভাববস্তু বিদ্যমান্ থাকাকালে আকাশের প্রতীতিই জন্মিতে পারে না। ঘট প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার প্রাগভাব ; ঘট প্রস্তুত হইলে ঘটের প্রতীতি জন্মে ; তখন আর তাহার প্রাগভাবের প্রতীতি জন্মিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—"আকাশ" পৃথিব্যাদির প্রাগভাব হইতে পারে না। ইহা ধ্বংসও নহে। ঘট ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহার যে অভাব হয়, তাহার নাম ধ্বংস বা ধ্বংসরূপ অভাব ; ঘট বিদ্যমান থাকিতে এই অভাবের প্রতীতি হইতে পারে না। তদ্রূপ আকাশ যদি পৃথিব্যাদির ধ্বংসাভাব হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি বিদ্যমান থাকিতে তাহার প্রতীতি জন্মিতে পারে না। সুতরাং "আকাশ" পৃথিব্যাদির ধ্বংসাভাবও নহে। অত্যন্তাভাবও নহে। কেননা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ে অস্তিত্বের অভাবকেই আত্যন্তিক অভাব বলে। আকাশের আত্যন্তিক অভাব স্বীকার করিতে গেলে, জগৎ আকাশশূন্য হইয়া পড়িবে। আর, এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে অভাব বা ভেদ, তাহাকে বলে অন্যোন্যাভাব বা ইতরেতরাভাব। যেমন—ইহা ঘট, পট নহে।" অন্যোন্যাভাব হইতেছে প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ ; সুতরাং অন্তরালসময়ে ( যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন ) বস্তুর প্রতীতি জন্মে না। "আকাশ" যদি পৃথিব্যাদির অন্যোন্যাভাব হয়, তাহা হইলে অন্তরাল-সময়ে আকাশের প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

বৌদ্ধগণ আবরণাভাবকে "আকাশ" বলেন। ইহা কিন্তু তাঁহাদের স্বমতবিরোধী। তাঁহাদের শাস্ত্রে এই প্রকার প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—"পৃথিবী ভগবন্ কিংসন্নিঃশ্রয়ঃ—হে ভগবন্, পৃথিবী কি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ?" ইহার উত্তরও আছে। এই জাতীয় প্রশ্নোত্তর-প্রবাহের শেষভাগে আছে—"বায়ুঃ কিংসন্নিঃশ্রয়ঃ—বায়ু কি আশ্রয় করিয়া থাকে ?" ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—"বায়ুরাকশসন্নিঃশ্রয়ঃ—বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে।" এই উত্তরেই আকাশের বস্তুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ; আকাশ কোনও সৎ-বস্তু না হইলে বায়ু কিরূপে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে—আকাশ বস্তুই, অবস্তু নহে।

আবার বৌদ্ধেরা বলেন—আকাশ নিরুপাখ্য ( তুচ্ছ—যেমন খ-পুষ্প ), অবস্তু, অথচ নিত্য। একথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, যাহা বস্তু নহে, যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার নিত্যানিত্য ব্যবস্থা কি ? ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বস্তুতেই থাকিতে পারে, অবস্তুতে থাকিতে পারে না। আকাশের নিত্যত্ব-স্বীকারেই তাহার বস্তুত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

উল্লিখিত প্রকারে সর্ব্বাস্তিত্ববাদীদের ( সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের ) মতের খণ্ডন করা হইয়াছে।

## ঘ। বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার সম্প্রদায়ের মত সম্বন্ধে আলোচনা

বিজ্ঞানবাদীরা ( যোগাচার-সম্প্রদায় ) বলেন—প্রমাণ, প্রমেয়, ( প্রমাণের বিষয় ), ফল, সমস্তই অন্তরে ; বাহিরে কিছুই নাই। প্রমাণাদিই বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন ও উপপন্ন করে। বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত কোনও বাহ্য পদার্থে যখন প্রমেয়ত্বাদির ব্যবহার হয় না, তখন বুঝিতে হইবে—প্রমেয়-সকল বুদ্ধিরই আকার বা পরিবর্ত্তন-বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ নহে ; বিজ্ঞানারিক্তি বাহ্য বস্তু কিছু নাই। স্তম্ভজ্ঞান, কুড্য জ্ঞান ( কুড্য—ঘরের দেওয়াল ), ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষ ভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, জ্ঞানই তত্তদ্বিষয়াকার হয়। জ্ঞানের বিষয়াকার স্বীকৃত হইলে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আরও কথা এই যে—জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলব্ধির নিয়ম আছে। বিষয় ব্যতীত কেবল জ্ঞান, বা জ্ঞান ব্যতীত কেবল বিষয়, কেহ কখনও অনুভব করে না। ইহা দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান এই দু'য়ের অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এই অভেদভাবের প্রতিবন্ধক কোনও প্রমাণ যখন নাই, তখন বিষয় ও বিজ্ঞানের বাস্তব ভেদ না থাকাই সঙ্গত। অন্য যুক্তিতেও বাহ্যবস্তুর অভাব সিদ্ধ হয়। বাহ্যবস্তু নাই, অথচ তদাকার জ্ঞান হয়। কিরূপে তাহা সম্ভব ? জ্ঞানই পূর্ব্বক্ষণে বাহ্যবস্তুর আকার হইয়া পরক্ষণে তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে কিছু নাই, অথচ অন্তঃস্থ জ্ঞানও যে জ্ঞানজ্ঞেয় উভয়াকার ধারণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নাদি। স্বপ্নদর্শন, ইন্দ্রজালদর্শন, মরুমরীচিকায় জলদর্শন—ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টবস্তুর কোনও অস্তিত্ব বাহিরে নাই ; তথাপি সে-সকল অন্তরে গ্রাহ্য ও গ্রাহকাকারে ( বস্তু ও বস্তুজ্ঞান—এই উভয় আকারে ) প্রকাশ পায়। তদ্রূপ, জাগ্রত অবস্থাতেও স্তম্ভাদির জ্ঞান হয়।

যদি বলা যায়—বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তরে কিরূপে বিচিত্র জ্ঞানের উদয় হইতে পারে ? ইহার উত্তর হইতেছে এই—বিচিত্র বাসনা-( জ্ঞান সংস্কার- ) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি, এতদন্তঃপাতী বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য ; তাহার ফলে জ্ঞানবৈচিত্র্য অনিবার্য্য।

এই সমস্ত যুক্তিবলে জানা যায়—বাহিরে কিছু নাই ; সমস্তই অন্তরে।

"নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২।২।২৮ ॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে বিজ্ঞানবাদীদের উল্লিখিত মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই।

ঘট, পট, স্তম্ভাদি বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয় ; তাহাতেই বুঝা যায়—ঘট-পটাদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপলব্ধিও হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—"বাহ্যবস্তুর অনুভব করি বটে; কিন্তু তাহা কেবল অনুভূতি (জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু নহে—বাহ্যবস্তু নহে। যাহা যাহা অনুভব করি, সমস্তই জ্ঞান মাত্র।" ইহার উত্তরে বলা যায়—"বিজ্ঞানবাদীর উল্লিখিত উক্তিতেই অনুভূতির বিষয় বাহ্যবস্তু স্বীকৃত হইতেছে। কেবল উপলব্ধিকে কেহ কখনও ঘট, পট, স্তম্ভ ইত্যাদি রূপে অনুভব করেনা; ঐ সকলকে উপলব্ধির বিষয়রূপেই অনুভব করে। বহির্ব্বস্তুর অস্বীকার করিতে যাইয়া বহির্ব্বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—বিজ্ঞেয় বস্তু-সকল অন্তরেই আছে; কিন্তু সে সকল বহিঃস্থিতের ন্যায় (বহির্ব্বৎ) অবভাসিত হয় মাত্র। সে সকল যদি আদৌ বাহিরে না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে 'বহির্ব্বৎ—বহিঃস্থিতের ন্যায়' বলা যাইতে পারে? বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে—এইরূপ কথা কেহ বলে না। অতএব অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থিতের ন্যায় প্রকাশ পায় না।"

যাহা জ্ঞানের আকার, বিষয়েরও তাহা আকার—ইহাতে বিষয়ের অভাব নিশ্চিত হয় না। কেননা, বিষয় না থাকিলে বিষয়ের সারূপ্যও থাকেনা; সুতরাং বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয় এবং সেই অস্তিত্ব যে বাহিরে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানকে কেহ কখনও পৃথক্ দেখে না, জ্ঞেয়কেও পৃথক্ দেখেনা। সকলেই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় দেখিয়া থাকে। জ্ঞান-জ্ঞেয়ের এই যে সহোপলব্ধির নিয়ম, ইহা উপায়-উপেয়মূলক নিয়ম, অভেদমূলক নহে। বিষয় উপলক্ষ্যেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক বা অভিন্ন বলিয়া তাহাদের একত্রে উপলব্ধি হয় না, সাধ্য-সাধক বলিয়াই তাহা হইয়া থাকে।

ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান-ইত্যাদি স্থলে বিশেষণীভূত ঘট-পটেরই ভিন্নতা, বিশেষ্যভূত জ্ঞানের ভিন্নতা নহে। শুক্ল বৃষ, কৃষ্ণ বৃষ ইত্যাদি স্থলে শুক্ল কৃষ্ণই ভিন্ন (শুক্ল এক বস্তু, কৃষ্ণ অন্য বস্তু), কিন্তু বৃষ ভিন্ন নহে। এ-স্থলেও তদ্রূপ।

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—জ্ঞানই পূর্ব্বক্ষণে বাহ্যবস্তুর আকার হইয়া পরক্ষণে তাহার গ্রাহকের আকার ধারণ করে। ইহা অসম্ভব। কেননা, পূর্ব্ববিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হয়; আবার পরবিজ্ঞানও আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হয়। ক্ষণধ্বংসী বলিয়া কাহারও সহিত কাহারও দেখা শুনা হয় না। বিজ্ঞান যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধশাস্ত্রীয়—বিজ্ঞানের ভিন্নতা, বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব, স্বলক্ষণসামান্য, বাস্য-বাসকত্ব, অবিদ্যোপপ্লব, সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ—সমস্ত প্রতিজ্ঞাই মিথ্যা হইয়া পড়িবে।

বৌদ্ধেরা যে বলেন—স্বপ্নাদি-বিজ্ঞানের ন্যায় জাগ্রদ্‌বিজ্ঞানও বাহ্যালম্বনশূন্য, তাহাও অসঙ্গত। কেননা, জাগ্রদ্‌জ্ঞান ও স্বপ্নজ্ঞান সমান নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বাধিত; কিন্তু জাগ্রদ্‌দৃষ্ট বস্তু অবাধিত। স্বপ্নদ্রষ্টা জাগ্রত হইলেই বুঝিতে পারে—স্বপ্নে সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, তৎসমস্ত মিথ্যা, তাহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় লোক ঘট-পটাদি যাহা যাহা দেখে, তৎসমস্ত অস্তিত্বহীন বলিয়া কখনও তাহার জ্ঞান হয় না।

বস্তুতঃ, স্বপ্নদর্শন হইতেছে একপ্রকার স্মৃতি—স্মরণাত্মক জ্ঞান। কিন্তু জাগ্রদ্‌জ্ঞান হইতেছে উপলব্ধি। উপলব্ধি ও স্মৃতি এক নহে। উপলব্ধি হইতেছে বিদ্যমানবস্তু-বিষয়ক; স্মৃতি হইতেছে অবিদ্যমান-বস্তুবিষয়ক।

বৌদ্ধেরা যে বলেন—বাহ্যবস্তু না থাকিলেও জ্ঞানের বিচিত্রতা অসম্ভব হয় না ; বিচিত্র বাসনা ( জ্ঞান-সংস্কার ) থাকাতেই জ্ঞানের বিচিত্রতা সম্ভবপর হইতে পারে। ইহাও অযৌক্তিক। কেননা, বৌদ্ধমতে বাহ্যবস্তু নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধিও থাকিতে পারে না ; উপলব্ধি না থাকিলে বাসনা বা জ্ঞান-সংস্কারও থাকিতে পারে না। বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা হইতেই পর পর জ্ঞানভেদ জন্মে—ইহা বলিতে গেলেও অমূলক অনবস্থা-দোষ ও ব্যবহার-বিলোপের আপত্তি হইবে ; কিন্তু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না।

বাসনা হইতেছে এক প্রকার সংস্কার। সংস্কার কখনও নিরাশ্রয় হয় না, থাকেও না। কিন্তু বৌদ্ধমতে বাসনার আশ্রয় খুজিয়া পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধেরা বলেন—বাসনার আশ্রয় বা আধার হইতেছে আলয়-বিজ্ঞান ( অহং-জ্ঞান ; এই অহং-জ্ঞানই বৌদ্ধমতে আত্মা )। কিন্তু এই আলয়-বিজ্ঞানও ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, কিঞ্চিৎকালও স্থায়ী হয় না, তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। পূর্ব্ব, মধ্য, পর—অথবা, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—যাহা এই তিন কালে বিদ্যমান থাকে, অথবা ধ্বংসাদি পরিশূন্য কোনও এক সাক্ষী পদার্থ যদি থাকে, তাহা হইলেই তাহা বাসনার আশ্রয় হইতে পারে। নচেৎ, দেশ-কালাদি-ঘটিত বাসনা, স্মৃতি, প্রতিসন্ধানাদি—সমস্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আলয়-বিজ্ঞান ( অহংজ্ঞান—বা বৌদ্ধমতে আত্মা ) ক্ষণিক বলিয়া বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। আলয়-বিজ্ঞানকে বাসনার আশ্রয় বলিলে ক্ষণিকবাদই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

## ঙ। সর্ব্বশূন্যবাদ বা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত সম্বন্ধে আলোচনা

উল্লিখিত প্রকারে বিজ্ঞানবাদীদের (যোগাচার-সম্প্রদায়ের) মতের খণ্ডন করিয়া বেদান্তসূত্র সর্ব্বশূন্যবাদীদের ( মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের ) মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন—বাহ্যবস্তুও নাই, আন্তর বস্তুও নাই ; সব শূন্য। "সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩১ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্র বলেন—সর্ব্বশূন্যবাদ সর্ব্বথা অনুপপন্ন—অসিদ্ধ। কেন অসিদ্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সর্ব্বশূন্যবাদীরা কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিয়া, কিম্বা অসৎ বলিয়া, অথবা অন্য কোনও প্রকারে—সর্ব্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন ? কিন্তু কোনও প্রকারেই তাঁহাদের শূন্যত্ব সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিষয়ক প্রতীতিতেও বিদ্যমান-বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব "সমস্তই শূন্য" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় শূন্যবাদীর পক্ষেও—"সমস্তই সৎ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ন্যায়ই—বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে। "সমস্তই শূন্য"—এ-স্থলে যে "সমস্ত" বলা হয়, তাহাতেই বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান পদার্থনিচয় সূচিত হইতেছে। সুতরাং কিছুতেই অভিপ্রেত শূন্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আবার, কোনও প্রমাণের সহায়তায় শূন্যতা উপলব্ধি করিয়া শূন্যতা সাধন করিতে গেলেও অন্ততঃ সেই প্রমাণের সত্যতা ( অশূন্যতা ) স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে—অর্থাৎ শূন্যত্ব-প্রতিপাদক কোনও সত্য প্রমাণ না থাকিলে—সমস্তই সত্য হইতে পারে এইরূপে দেখা গেল—কোনও প্রকারেই সর্ব্বশূন্যত্ব উপপন্ন হইতেছে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—লোক-ব্যবহার সিদ্ধি, বাহ্য ও আন্তর বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধ সম্প্রদায়-চতুষ্টয় যে অভিমত পোষণ করেন, তাহা অযৌক্তিক।*

**চ। বৌদ্ধমতে জীব।** বৌদ্ধ-দর্শনে নিত্যজীব স্বীকৃত নহে; এমন কি, বহুক্ষণ-স্থায়ী কোনও জীবও স্বীকৃত নহে। বৌদ্ধমতে জীব বা আত্মাও ক্ষণিক—ক্ষণস্থায়ী। উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরেই আত্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাহার পরে আর এক আত্মা উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমেই আত্মার উৎপত্তি ও ধ্বংস চলিতে থাকে। এইরূপ ক্ষণিক আত্মার পক্ষে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহই বা কিরূপে হইতে পারে?

বৌদ্ধমতে আত্মা হইতেছে বুদ্ধি-বিজ্ঞান; শরীরের অভ্যন্তরস্থ গ্রাহকাভিমানী (অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানী) বিজ্ঞান-সন্তানই (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবাহই) আত্মা। "শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী গ্রাহকাভিমানারূঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবাত্মত্বেনাবতিষ্ঠতে॥ 'সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ' ॥ ২।২।১৮ ॥—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ।" ক্ষণিক আত্মার পক্ষে কোনও বিষয়ের গ্রহণই যে অসম্ভব, শ্রীপাদ রামানুজ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"পরমাণূনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহতৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্যন্তে, কদা চ বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে; কো বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা বেদয়তে; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে; স্প্রষ্টা হি নষ্টঃ, স্পৃষ্টশ্চ নষ্টঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নষ্টঃ। কথং চান্যেন স্পৃষ্টমন্যো বেদয়তে, কথং চান্যেন বিদিতমর্থমন্য উপাদত্তে? ২।২।১৮-ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য॥—পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন ক্ষণিক—ক্ষণ-মাত্রস্থায়ী—বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাত-সমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত হইবে? কখনই বা বুদ্ধিবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত (বিজ্ঞাত) হইবে? আর কখনই বা হেয় বা উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য্য হইবে? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাই বা কোন্ বিষয়কে কখন অনুভব করিবে? আর কেই বা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টীকে কখন গ্রহণ করিবে? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টীকে স্পর্শ করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত (বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায়; আর, অপরের বিষয়কেই বা অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ করিবে?—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত ভাষ্যানুবাদ।"

"অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২।২।২৫"—ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলেন, অনুভবকর্ত্তা আত্মাকেও ক্ষণিক বলেন; কিন্তু অনুস্মৃতি থাকায় তাহা অসম্ভবগ্রস্ত। অনুভবের অন্য নাম উপলব্ধি। তদুত্তরে উৎপাদ্যমান যে স্মরণ—তাহার অন্য নাম অনুস্মৃতি। এই অনুস্মৃতি পূর্ব্ববর্ত্তিনী

---

* এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য অবলম্বনেই বৌদ্ধ-মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

উপলব্ধির কর্ত্তাতেই সম্ভব হয় ; কর্ত্তা ভিন্ন হইলে তাহা অসম্ভব হইবে। বস্তু এক পুরুষে উপলব্ধ হইল, অন্য পুরুষ তাহা স্মরণ করিল, এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। যে পূর্ব্বে ছিল, সে যদি এখন না থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে বলেন—'আমি পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছিলাম, এখনও ইহা দেখিতেছি ?' * * * ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিক জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞানকে এক-কর্ত্তৃক ও আপনাকে 'সেই আমি'—এতদ্রূপে জানিয়াও যে ক্ষণভঙ্গবাদ প্রচার করেন, ইহাতে কি লজ্জাবোধ করিবেন না ? যদি বলেন—জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অসংখ্য কর্ত্তা ( বিজ্ঞানরূপ আত্মা ) হইতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পর বিভিন্ন ; কিন্তু সাদৃশ্য থাকাতে ও অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হওয়াতে, সে সকল এক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। এরূপ বলিলেও তাহার এইরূপ প্রতিবাদ হইবে যে—'এটী সেইটীর সদৃশ'—এতদ্রূপ সাদৃশ্য দু'এর অধীন ; কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদে তুল্য বস্তুদ্বয়ের গ্রহীতা ( বোদ্ধা ) না থাকায় সাদৃশ্যঘটিত অনুসন্ধান অসম্ভব ও তদ্বাক্য প্রলাপোক্তি বলিয়া গণ্য।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ।"

আত্মার ক্ষণিকত্ব-খণ্ডন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিতরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাহা হইতে জানা গেল—আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে লোক-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধ্যয়নের কথা ধরিয়াই বিবেচনা করা যাউক। কোনও গ্রন্থের অধ্যয়নের আরম্ভে যে আত্মা অধ্যয়ন আরম্ভ করিল, গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপ্তিকালের অধ্যয়ন করে আর এক আত্মা ; মধ্যবর্ত্তী কালেও অসংখ্য আত্মার প্রত্যেকেই ক্ষণকাল অধ্যয়ন করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সঙ্গে তাহার অধীত বিষয়ের জ্ঞানও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় সমগ্র গ্রন্থের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কেবল অধ্যয়ন কেন, যে কোনও কার্য্য-সম্বন্ধেই এইরূপ অবস্থা হইবে ; সমস্ত কার্য্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

বৌদ্ধ দার্শনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচার করিবেন কিরূপে ? যে আত্মা যে-ক্ষণে প্রতিপক্ষের কথা শুনিলেন, শুনিয়া প্রতিপক্ষের উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন, পরক্ষণেই সেই আত্মা এবং তাঁহার উপলব্ধিও বিনষ্ট হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ক্ষণের আত্মা প্রতিপক্ষের কথাও শুনেন নাই, প্রতিপক্ষের উক্তির মর্ম্মও উপলব্ধি করেন নাই। তিনি কিরূপে প্রতিপক্ষের উক্তির উত্তর দিবেন ? অথচ বৌদ্ধ দার্শনিক যে তাঁহার প্রতিপক্ষের সহিত বহুক্ষণব্যাপী বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—নিজেদের মত প্রচার করার জন্য বৌদ্ধগণ ক্ষণিকত্বের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁহারা আত্মার ক্ষণিকত্ব মানেন না ; কার্য্যতঃ তাঁহারাও আত্মার একত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন।

তাঁহারা হয়তো বলিবেন—আত্মার একত্ব, কর্ম্মের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তা এক আত্মাই, বিভিন্ন ক্ষণিক আত্মা নহে, ইহা—আমরা স্বীকার করি না। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া এবং বিভিন্ন আত্মা অবিচ্ছেদে উৎপন্ন হইয়া কাজ করিয়া যায় বলিয়া তাঁহারা এক বলিয়া প্রতীত হয়েন মাত্র। শ্রীপাদ শঙ্কর একথার উত্তর দিয়াছেন ; তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষ্যানুবাদেই বলা হইয়াছে। বিভিন্ন আত্মা যে পরস্পরের সদৃশ বা তুল্য, তাহা জানিতে পারিবেন কে ? কোনও আত্মাই তাহা জানিতে পারিবেন না ; কেননা, প্রত্যেক আত্মাই ক্ষণকাল পরে বিনষ্ট হইয়া যায়েন ; কোনও আত্মাই তাঁহার পরক্ষণবর্ত্তী বা পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী আত্মাকে দেখেন না ;

সুতরাং আত্মাসমূহের সাদৃশ্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য কোনও আত্মারই থাকিতে পারে না। বহুক্ষণস্থায়ী কোনও চেতনবস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই বস্তুর পক্ষে ক্ষণিক বহু আত্মার দর্শন এবং তাঁহাদের সাদৃশ্যের অনুভব সম্ভবপর হইত। কিন্তু বৌদ্ধমতে বহুক্ষণব্যাপী কোনও চেতন বস্তুর স্বীকৃতি নাই।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। বিভিন্ন ক্ষণিক আত্মা পরস্পরের সদৃশ হইলেও এক আত্মার উপলব্ধি অন্য আত্মাতে সঞ্চারিত হইতে পারে না। কেননা, বৌদ্ধমতে আত্মার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উপলব্ধিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; যাহার অস্তিত্বই থাকে না, তাহা অপর আত্মায় কিরূপে সঞ্চারিত হইবে? উপলব্ধি নষ্ট না হইলেও সঞ্চারিত হইতে পারে না। একজন লোক যাহা দেখেন, তিনি না বলিলে অপরে কিরূপে তাহা জানিতে পারিবেন? এইরূপে দেখা গেল—আত্মাসমূহের সাদৃশ্য এবং অবিচ্ছেদোৎপত্তিবশতঃ তাঁহাদের একত্বের প্রতীতি বিচারসহ নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ক্ষণিক আত্মার পক্ষে কোনও কার্য্য-নির্ব্বাহই সম্ভবপর হইতে পারে না।

আত্মা-সম্বন্ধে আরও একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধমতে আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানস্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি-বিশেষ; কর্ত্তৃত্বাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান। বিজ্ঞান হইতেছে অচেতন জড় বস্তু। বৌদ্ধমতে সমস্ত তত্ত্বই অচেতন। অচেতন জড় বস্তু বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে কর্ত্তৃত্বের অভিমান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? অচেতন বস্তুর কার্য্যপ্রবৃত্তিই বা কিরূপে সম্ভব? অভিমান, কার্য্যপ্রবৃত্তি প্রভৃতি হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম।

সুতরাং আত্মার নিত্যত্বের ন্যায় চেতনত্বও স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ লোক-ব্যবহারই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

**ছ। বৌদ্ধমতে সাধন।** বৌদ্ধশাস্ত্রে অহিংসাদি সাধনাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধনের অনুষ্ঠান করিবে আত্মা বা জীব। আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান যে অসম্ভব, জীবসম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। **সাধন অসম্ভব**; কেননা, সাধন একটী ক্ষণিক ব্যাপার নহে; বহুকাল ধরিয়া একই ব্যক্তির ইহা অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধনও লোকচেষ্টাই।

সাধনের উপদেশ দিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র কার্য্যতঃ আত্মার ক্ষণিকত্বই অস্বীকার করিয়াছেন।

**জ। বৌদ্ধসাধনের ব্যবহারিক মূল্য ও সামান্য-ধর্ম্মতা।** পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দান-শীলাদি দশটী বস্তুর অনুশীলনই বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী শীল এবং সুরাপান-ত্যাগাদি পাঁচটী শীল—এই দশটী শীল অনুশীলনীয়। এই সমস্ত হইতেছে চিত্ত-সংযমের উপায়। যথেচ্ছ ভোগসুখের প্রবাহে পতিত হইয়া যাহাতে লোক উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে অগ্রসর হইতে না পারে, তজ্জন্যই মুখ্যতঃ এই সমস্ত আচরণের বিধান। এই সমস্ত আচরণ কেবলমাত্র বৌদ্ধদেরই নিজস্ব নহে। জৈনদের পঞ্চমহাব্রতাদিও এই জাতীয়ই। পাতঞ্জল-দর্শনেও অহিংসাদি-নীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "অহিংসা সত্যমস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ। —অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।"

বৈদিক ধর্ম্মেও এই সমস্তের উপদেশ ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

"অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি—কোনও প্রাণীকেই হিংসা না করিয়া", ইহা শ্রুতিরই কথা (ছান্দোগ্য ॥৮।১৫ ॥)।

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও বলেন—অভয়, চিত্তের সংশুদ্ধি, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, দম ( বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম ), যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাহীনতা, প্রাণিসমূহের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অতিমানাভাব—এই সমস্ত হইতেছে লোকের দেবোচিত সাত্ত্বিক সম্পদ।

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ গীতা ॥ ১৬।১-৩ ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥ ১১।১৭।২১ ॥

—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কাম-ক্রোধ-লোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর প্রয়াস—এই সমস্ত হইতেছে সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম।"

এই সমস্ত হইতেছে মানুষের সামান্য সদাচার বা সামান্য-ধর্ম্ম—সমান ভাবে যাহা সকলেরই পালনীয়।

সামান্য-সদাচার মোক্ষ-প্রাপক সাধনের সহায়মাত্র, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপক সাধন বলিয়া বেদানুগত শাস্ত্রে স্বীকৃত নহে। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই হইতেছে জীবের সংসারিত্বের হেতু; ভগবদুন্মুখতাতেই সংসার-ক্ষয়ের সম্ভাবনা। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি সকুলং ন চ ভূরিমানঃ ॥ ৭।৯।১০ ॥"

এই-শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—মহাভারত হইতে জানা যায়—ধর্ম্ম, সত্য, দম ( ইন্দ্রিয়-সংযম ), তপঃ, মাৎসর্য্যাভাব, হ্রী ( লজ্জা ), তিতিক্ষা ( দুঃখসহনশীলতা ), অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ( জিহ্বার ও উপস্থের বেগ সম্বরণ ) ও শ্রুত ( বেদাধ্যয়ন )-এই দ্বাদশটী হইতেছে ব্রাহ্মণের গুণ বা ব্রত। "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি ॥" শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—"দ্বাদশগুণযুক্ত অথচ ভগবদ্‌বিমুখ বিপ্র অপেক্ষা—যিনি ভগবচ্চরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ—শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি; যেহেতু, এতাদৃশ শ্বপচ নিজেকে এবং স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু দ্বাদশ-গুণান্বিত বলিয়া লোক-সমাজে যে ব্রাহ্মণ যথেষ্টরূপে সম্মানিত, ভগবদ্‌বিমুখ বলিয়া তিনি নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না, তাঁহার কুলকে পবিত্র করা তো দূরে।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—বৈদিক শাস্ত্রানুসারে, কেবল সদাচার থাকিলেই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে না—সুতরাং মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধনাঙ্গগুলির উল্লেখ বৈদিক শাস্ত্রেও আছে—তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু বৈদিক মতে সে-সমস্তের অনুষ্ঠানে মোক্ষ-লাভ না হইলেও বৌদ্ধমতে হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বৌদ্ধশাস্ত্রকথিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে, বৌদ্ধশাস্ত্র-স্বীকৃত প্রমাণদ্বয়ে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ে—তাহা উপপন্ন হয় কি? নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় নয়; বৌদ্ধশাস্ত্রকর্ত্তারা নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের কথিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে যে নির্ব্বাণ লাভ হয়, প্রত্যক্ষ-প্রমাণে তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না। কেবলমাত্র অনুমান-প্রমাণেও কোনও বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; অনুমানেরও ব্যভিচার হয়। সুতরাং বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধনের ফলে যে নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে, বৌদ্ধস্বীকৃত প্রমাণদ্বয়ে তাহা নিশ্চিত-রূপে উপপন্ন হইতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—বৈদিক মতে ধ্যান হইতেছে মোক্ষ-লাভের উপায়। বৌদ্ধ-সাধনেও তো ধ্যান আছে। সুতরাং বৌদ্ধ-সাধনে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বৈদিকমতে ধ্যানের ব্যবস্থা যেমন আছে, ধ্যেয় বস্তুর উল্লেখও আছে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেছেন বৈদিক মতে ধ্যেয় বস্তু। সাধক তাঁহার ধ্যান করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে ধ্যেয় বস্তু কি? এই মতে শূন্য ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, মিথ্যা। ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা বস্তুর ধ্যানের উপাদেয়তা কিছু নাই। শূন্যতত্ত্বের ধ্যান কি সম্ভব? "অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যতত্ত্বম্"-ইত্যাদি বাক্যে শূন্যতত্ত্বের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার ধ্যান সম্ভবপর হতে পারে না।

তবে বৌদ্ধশাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন যে একেবারে নিরর্থক, তাহাও বলা সঙ্গত হইবে না। নির্ব্বাণ-বিষয়ে না হইলেও অন্যবিষয়ে এই সাধনের উপাদেয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্যবহারিক জগতে লোক আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন এবং ব্যবহারিক জগতের অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইতে পারে। এই সাধনার মূল্য ব্যবহারিক জগতে পরম উপাদেয়।

বেদমতে কিন্তু লোকের চেষ্টায় বা অভ্যাসে অহিংসাদি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না। কেননা, হিংসা-চৌর্য্যাদির মূলীভূত কারণ হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। এই মায়া ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া জীবের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া; যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েন, কেবলমাত্র তাঁহারাই এই মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥৭।১৪॥" মায়া অপসারিত হইলেই হিংসা-চৌর্য্যাদির মূল উৎপাটিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর মানেন না; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নও তাঁহাদের সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। এজন্য বেদবিশ্বাসিগণ মনে করেন, বৌদ্ধশাস্ত্রবিহিত আচরণের অনুশীলনে হিংসা-চৌর্য্যাদির

প্রবৃত্তি সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারে না। তবে অহিংসাদিকে নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া অভ্যাস করিলে চিত্তবৃত্তির স্বৈরাচরকে কিছু নিয়ন্ত্রিত ও প্রশমিত করা যাইতে পারে; এজন্যই বৈদিক শাস্ত্রে অহিংসাদিকে সদাচার বা সামান্য-ধর্ম্মরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ-ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিলে যে কোনও কিছুকে নীতিরূপে গ্রহণ, বা অভ্যাসও সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহার হেতু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা আত্মার নিত্য-অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষেই অভ্যাস ও নিয়মগ্রহণাদি সম্ভব হইতে পারে।

ঝ। **বৌদ্ধ-সাধনের পারমার্থিক মূল্য।** বৌদ্ধ-সাধনের পারমার্থিক মূল্য যে অনিশ্চিত, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। বৌদ্ধদিগের কাম্য পারমার্থিক ফল হইতেছে শূন্যতা-প্রাপ্তি। উপদেষ্টা বুদ্ধগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়সিদ্ধ উপদেশ ব্যতীত শূন্যতার অপর কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। এজন্যই বলা যাইতে পারে—বৌদ্ধসাধনের পারমার্থিক ফল অনিশ্চিত। পরমার্থতত্ত্ব কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

ঞ। **বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য।** বৌদ্ধদর্শনের লক্ষ্য হইতেছে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি। সুখপ্রাপ্তি ইহার লক্ষ্য হইতে পারে না। নির্ব্বাণ ভাবও নহে, অভাবও নহে; ইহা অনির্দ্দেশ্য। নির্ব্বাণ অবস্থায় কোনও জ্ঞান থাকে না, কোনও প্রতীতিও থাকে না। সুতরাং সুখভোগের প্রতীতিও থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে একটী বাক্য আছে এইরূপঃ

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরমদুঃখম্।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নির্ব্বাণং পরমং সুখম্॥"

তাৎপর্য্য এইরূপ। ক্ষুধাই পরম রোগ, অর্থাৎ ক্ষুধা হইতেছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগের ন্যায় ক্লেশদায়ক। তদ্রূপ সংসারও—জীবনও— পরম-দুঃখ। নির্ব্বাণই পরম সুখ।

এ-স্থলে নির্ব্বাণকে পরম সুখ বলার তাৎপর্য্য দুঃখ-নিবৃত্তিতেই পর্য্যবসিত। দুঃখাভাবকেই এ-স্থলে পরম-সুখ বলা হইয়াছে, সুখ-নামক কোনও ভাববস্তুকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কেননা, সুখ যদি কোনও ভাববস্তু হইত, তাহা হইলে তাহার অনুভব জন্মিত, প্রতীতি জন্মিত। কিন্তু নির্ব্বাণে কোনও জ্ঞান থাকে না, কোনও প্রতীতি থাকে না।

## ৪। জৈন দর্শন *

### ক। সাধারণ পরিচয়

জিন-শব্দ হইতে জৈন-শব্দের উৎপত্তি। 'জিন'—অর্থ "জয়ী"। যিনি রাগ-দ্বেষাদিকে এবং কর্ম্মশত্রুকেও জয় করিয়াছেন, তিনিই 'জিন'। "রাগদ্বেষাদি দোষান্ বা কর্ম্মশত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ।" জিন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম জৈন ধর্ম্ম।

* শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা-মহোদয়ের "জৈনধর্ম্মের পরিচয়" এবং "জৈন দর্শনের রূপলেখা" অবলম্বনে লিখিত।

জিনকে অর্হৎ, অর্হন্ত, অরিহন্ত, তীর্থঙ্কর প্রভৃতিও বলা হয়।- তীর্থঙ্কর-শব্দের একটী বিশেষ অর্থ আছে। সংঘকে তীর্থ বলা হয়। যিনি সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে নিয়মাবদ্ধ করেন, তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলে।

সংঘ চারি রকমের—সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা।

জৈনধর্ম্মাবলম্বী যে সকল পুরুষ গৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু-জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে সাধু এবং তাদৃশী রমণীগণকে সাধ্বী বলে। জৈনধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ পুরুষদিগকে শ্রাবক এবং তাদৃশী রমণীদিগকে শ্রাবিকা বলা হয়।

জৈন সাধু ও সাধ্বীদিগকে পঞ্চমহাব্রতের পালন করিতে হয়—যথা, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।

এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে দশটী যতিধর্ম্মও পালন করিতে হয়। যথা—ক্ষমা, মার্দব ( নম্রতা ), আর্জব ( সরলতা ), নির্লোভতা, অকিঞ্চনতা, সত্য, সংযম, তপস্যা, শৌচ ও ব্রহ্মচর্য্য। সাধু বা সাধ্বীগণ শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, রাত্রিতে আহার করেন না, যানারোহণ করেন না, ভিক্ষাজীবী, অর্থাদি গ্রহণ করেন না, কোনও বস্তু সংগ্রহ বা সঞ্চয় করেন না, ইত্যাদি।

শ্রাবক ও শ্রাবিকাদিগকে দ্বাদশটী ব্রত পালন করিতে হয় ; যথা—অপরাধহীন জঙ্গম জীবকে হত্যা না করা, অন্য প্রাণীর অনিষ্টজনক মিথ্যা কথা না বলা, চৌর্য্য পরিত্যাগ করা, বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকের সহিত স্বামি-স্ত্রীরূপে ব্যবহার না করা, ভোগোপযোগী সম্পত্তির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদতিরিক্ত সম্পত্তি সংগ্রহ না করা, বাণিজ্যাদির জন্য বা অন্য কোনও কারণে নির্দ্ধারিত সীমার অতিরিক্ত স্থানে কোনও দিকে গমন না করা ( ইহাকে দিক্‌পরিমাণ ব্রত বলে ), ভোগ ও উপভোগের উপযুক্ত বস্তুর পরিমাণের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই সীমা অতিক্রম না করা, অপ্রয়োজনীয় কুকার্য্য হইতে বিরত হওয়া, সকল প্রাণীর প্রতি সমভাব পোষণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে অসৎ-প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া এক স্থানে স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক প্রত্যহ দুই দণ্ড কাল ধ্যান, স্তব বা জপাদি করা, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রতিদিনের জন্য পূর্ব্বগৃহীত 'দিক্‌পরিমাণ ব্রতের' সীমাকে সঙ্কুচিত করা, চারিপ্রহর বা অষ্ট প্রহরের জন্য সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া সাধুদিগের ন্যায় ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকা, এবং অতিথি-সৎকার।

উল্লিখিত ব্রতসমূহের পালনই হইতেছে জৈনধর্ম্মের সাধন।

**খ। লোক ও অলোক।** বিশ্বের যে অংশে জীব ও জড় পদার্থ বিদ্যমান, তাহাকে বলে "লোক"।

"লোকের" চতুর্দ্দিকে যে অনন্ত বিস্তৃত শূন্য বিদ্যমান, তাহাকে "অলোক" বলে। অলোকে আকাশ ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য নাই, জীব নাই, জড় নাই। সেখানে কোনও জীব বা জড় পদার্থ গমনাগমনও করিতে পারে না।

জৈনদের মতে—প্রতি কল্পেই জৈনধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে ; বর্ত্তমান কল্পের আদি তীর্থঙ্কর হইতেছেন ঋষভদেব, অর্থাৎ ঋষভদেবই বর্ত্তমান-কল্পের জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন—জৈনধর্ম্মও বৈদিক ধর্ম্ম। ইহা বিচারসহ কিনা, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

যে ঋষভদেবকে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলা হয়, তিনি কোন্ ঋষভদেব ? পুরাণাদিতে এক ঋষভদেবের নাম পাওয়া যায় ; তিনি বেদবিহিত ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ দৃষ্ট হয়। এই ঋষভদেব ছিলেন ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার ; আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি ও তৎপত্নী মেরুদেবীর যোগে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার কর-চরণাদিতে ভগবল্লক্ষণ বিদ্যমান্ ছিল। তাঁহার একশত পুত্র ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন মহারাজ ভরত, যাঁহার নামে এই দেশের নাম হইয়াছে "ভারতবর্ষ।" তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত। কবি-হবি-প্রমুখ নবযোগীন্দ্রও ভরতের সহোদর। তাঁহারা নিমি-মহারাজের সভায় ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ঋষভদেবও সর্ব্বদা ভগবদ্ভজনের কথা প্রচার করিতেন। সুতরাং এই ঋষভদেব যে বেদবিরোধী এবং ঈশ্বর-বিরোধী জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়—ঋষভদেব রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অবধূত-বেশে ভাগবত-পরমহংসলীলা প্রকটিত করিতে করিতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কুটক এবং দক্ষিণ কর্ণাটদেশে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন—"কলিতে কোঙ্ক-বেঙ্কট-কুটক দেশের অর্হৎ-নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অবধূত-বেশ ঋষভদেবের বহিরাচরণের কথা শুনিয়া, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তিনি অকুতোভয়ে স্বীয় ধর্ম্মপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় মনীষায় বেদাদির সহিত সামঞ্জস্যহীন পাষণ্ড ( বেদবিরোধী ) কুপথের প্রবর্ত্তন করিবেন। ( স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়-মপহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দং সংপ্রবর্ত্তয়িষ্যতে ॥ শ্রীভা. ৫।৬।৯ ॥)"

এই অর্হৎ-নামক রাজাই যদি জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ভগবদবতার ঋষভদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম--সুতরাং বেদবিহিত ধর্ম্ম—বলা সঙ্গত হইবে না।

## গ। নবতত্ত্ব

জৈনদর্শনে নয়টী তত্ত্ব স্বীকৃত হয় ; যথা—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—

**জীব।** যাহার চেতনা আছে, তাহাকে জীব বলে। জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি জীবের লক্ষণ। প্রত্যেক জীবের পৃথক্ সত্ত্বা আছে। জীব সংখ্যায় অনন্ত। জীব দুই রকমের—মুক্ত ও সংসারী। সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয়ের পরে যাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত ; ইঁহাদের জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও আনন্দ—সমস্ত অনন্ত ; ইঁহাদিগকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। আর, যাঁহারা সংসারে জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তাঁহারা সংসারী। সংসারী জীব চারি রকমের—দেব, মনুষ্য, নারক ও তির্য্যক্।

**অজীব।** চেতনাশূন্য, জড়। অজীব বা জড় পাঁচ রকমের—ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তি-কায়, পুদ্গলাস্তিকায় এবং কাল।

**"অস্তিকায়"** হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ ; ইহার তাৎপর্য্য এই। "অস্তি"-শব্দে "প্রদেশ" বুঝায়। কোনও দ্রব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে বলে "প্রদেশ"। এইরূপে অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের

সমবায়কে বলে "কায়"। সুতরাং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের সমবায়ে নির্ম্মিত দ্রব্যকে বলে "অস্তিকায়।" জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও পুদ্গল—এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবিভাজ্য প্রদেশসমূহের সমবায়ে নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্যেকেই হইল "অস্তিকায়।"

**ধর্ম্মাস্তিকায়।** যে দ্রব্য না থাকিলে জীব বা জড় পদার্থের পক্ষে কোনওরূপ গতিই সম্ভবপর হয় না, তাহাকে ধর্ম্মাস্তিকায় বলে। ইহা অরূপী, অচেতন এবং সম্পূর্ণ "লোক"-ব্যাপী।

**অধর্ম্মাস্তিকায়।** জীব ও জড় পদার্থ নিজেদের গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলে যে দ্রব্য গতিরোধের সহায়তা করিয়া তাহাদিগকে স্থির করে, তাহাকে বলে অধর্ম্মাস্তিকায়। ইহাও ধর্ম্মাস্তিকায়ের ন্যায় অরূপী, অচেতন এবং সমস্ত-"লোক"-ব্যাপী।

**আকাশাস্তিকায়।** যাহা জীব, পুদ্গল প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে অবকাশ বা অবস্থিতির স্থান দান করে, তাহাকে বলে আকাশাস্তিকায়। ইহাও অরূপী, অচেতন এবং ইহা "লোক" ও "অলোক" উভয়দেশব্যাপী।

পরমাণু ও পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে **পুদ্গলাস্তিকায়** বলে। পুদ্গল বস্তুসমূহ সংখ্যায় অনন্ত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি পুদ্গলের লক্ষণ। পরমাণু হইতেছে জড়দ্রব্যের সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশ। পরমাণুতেও রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আছে।

**কাল।** কাল হইতেছে একটী কল্পিত পদার্থ; ইহার বাস্তব সত্বা নাই। চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদির গতির দ্বারা ইহার কল্পনা করা হয়।

**আস্রব।** যাহা দ্বারা আত্মার সহিত বন্ধনের জন্য শুভাশুভকর্ম্মের আগমন হয়, তাহাকে বলে আস্রব। বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তিই আস্রব। মিথ্যা, অসংযম, কষায় ( ক্রোধ, মান, মায়া, মোহ ), প্রমাদ ( অনবধানতা ) ও যোগ ( কায়মনোবাক্যের ব্যাপার )—সাধারণতঃ এই কয়টী হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের আগমন হয়; সুতরাং ইহারাও আস্রব। হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, মৈথুন, পরিগ্রহ বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতিও কর্ম্মবন্ধনের হেতু বলিয়া ইহারাও আস্রব।

**বন্ধ।** আত্মার সহিত কর্ম্ম-বর্গণার অনন্তানন্ত পরমাণুর দ্বারা গঠিত স্কন্ধের বন্ধনকে বন্ধ বলে।

**"স্কন্ধ"** হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। দুই বা ততোঽধিক পরমাণুর সংযোগে নির্ম্মিত জড় পদার্থকে "স্কন্ধ" বলা হয়। **"বর্গণা"**-শব্দের অর্থ "প্রকার।" এক বিশেষ প্রকারের পরমাণু আছে, যাহা জীবের মিথ্যাত্ব, কায়-মনোবাক্যের যোগ ও রাগ-দ্বেষাদি অধ্যবসায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মার সহিত বদ্ধ হয়। এইরূপ পরমাণুকে **কর্ম্মবর্গণার পরমাণু** বলে। আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, নির্ম্মল, চৈতন্যময়, অরূপী; ইহার সহিত রূপী অচেতন পরমাণুর বন্ধন হইতে পারে না; কিন্তু অনাদিকাল হইতে মূর্ত্ত কর্ম্ম-পুদ্গলের সহিত বদ্ধ থাকাতে আত্মা আবরণময় হইয়া আছে। এই কর্ম্মের আবরণকে জৈন-পরিভাষায় **কার্ম্মণ শরীর** বলে। অনাদিকাল হইতে জীব এই কার্ম্মণ-শরীরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। এজন্য তাহাতে নানপ্রকার প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-চেষ্টায় উদয় হয়। এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নূতন নূতন কর্ম্ম-পুদ্গল সেই কার্ম্মণ-

শরীরের সহিত বন্ধ হইতেছে এবং তাহার ফলে নানা প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।

**পুণ্য**। কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের ফলকে পুণ্য বলে। ইহাও জীবের বন্ধন। পুণ্যকর্ম্মের ফলে শারীরিক ও মানসিক সুখ, রোগহীনতা, দেহের সৌন্দর্য্য, ধন-সম্পত্তি, সুখ্যাতি আদি পাওয়া যায়।

**পাপ**। পুণ্যের বিপরীত তত্ত্বকে পাপ বলে। কায়, মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠিত অশুভ কর্ম্মের ফলই পাপ। ইহাও বন্ধন।

**সংবর**। যে সমস্ত কার্য্যদ্বারা কর্ম্মের আস্রবকে—কর্ম্মের আগমনকে—নিরোধ করা যায়, তৎসমস্তকে সংবর বলে। ইহা আস্রবের বিপরীত তত্ত্ব।

**নির্জরা**। পূর্ব্ববদ্ধ কর্ম্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ করাকে নির্জরা বলে। ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বেই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মকে ধ্বংস করিতে না পারিলে মুক্তি অসম্ভব। কেননা, ফলোন্মুখ কর্ম্ম ফল-দান-কালে আবার নূতন কর্ম্মের বন্ধন আসিয়া পড়ে। এজন্য মোক্ষকামী ব্যক্তিকে ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বেই পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে কর্ম্মক্ষয় করাকে নির্জরা বলে। তপস্যাদ্বারা নির্জরা সাধিত হয়।

**মোক্ষ**। সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেলে জীবাত্মা যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলে। মোক্ষই নির্ব্বাণ। মুক্ত আত্মা "লোকের" শীর্ষভাগে স্থিত হয়। মুক্ত আত্মাসমূহ "লোক"শীর্ষ দেশে পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থান করে; তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

**ঘ। মোক্ষলাভের উপায়।** সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটী হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়। এই তিনটীকে **ত্রিরত্ন** বলে। পূর্ব্বে সাধুদিগের সম্বন্ধে যে পঞ্চমহাব্রতের এবং দশ যতিধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে এবং শ্রাবকদিগের সম্বন্ধে যে দ্বাদশ ব্রতের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্তের পরিপালনেই ত্রিরত্ন লাভ হইতে পারে এবং পরিণামে মোক্ষ-লাভ হইতে পারে।

জৈনশাস্ত্রে জীবন্মুক্তি স্বীকৃত হয়। তীর্থঙ্করগণ জীবন্মুক্ত—কেবল জ্ঞান-সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী।

**ঙ। বিশ্বের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব।** জৈনমতে এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই। বিশ্ব সৃষ্ট-বস্তু নহে। অনাদিকাল হইতেই এই বিশ্বের অস্তিত্ব আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত অস্তিত্ব থাকিবে। এই মতে বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থই সব সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে; কিন্তু কখনও তাহার সর্ব্বথা বিনাশ নাই। জীব ও অজীব অর্থাৎ চেতন ও জড়—এই দুই প্রকার পদার্থের নানাবিধ পরিণামের ফলেই বিশ্বস্থিত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে; কিন্তু মূল দ্রব্য সর্ব্বদাই থাকিয়া যাইতেছে।

**চ। বেদ ও ঈশ্বর।** জৈনধর্ম্মে বেদের প্রামাণ্য এবং ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না; ঈশ্বর স্বীকৃত হয় না বলিয়া অবতারও স্বীকৃত হয় না। তীর্থঙ্করগণ দেবতার ন্যায় পূজ্য; কিন্তু তাঁহারাও জীব—জীবন্মুক্ত জীব।

**ছ। কর্ম্ম।** জৈনমতে কর্ম্ম স্বীকৃত। কর্ম্মের ফলদাতাও কর্ম্ম। সাধনের ফলে কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ। কর্ম্ম অনাদি; কর্ম্মবন্ধনও অনাদি; কর্ম্মবন্ধনের কোনও হেতু নাই।

**জ। সম্প্রদায়।** জৈনদের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় আছে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরেরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন; দিগম্বরেরা উলঙ্গ থাকেন।

**ঝ। প্রমাণ।** জৈনমতে দুইটী প্রমাণ স্বীকৃত হয় – প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ প্রমাণ হইতেছে শ্রুত-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ। জৈনদের মধ্যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে, সেই শাস্ত্রের প্রমাণকেই তাঁহারা শ্রুত-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণ মনে করেন। শাস্ত্রও তীর্থঙ্করদের প্রণীত। সুতরাং জৈনদের অপরোক্ষ বা শব্দপ্রমাণও বস্তুতঃ তীর্থঙ্করদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ই।

**ঞ। সপ্তভঙ্গী।** জৈনমতে বিচার-ধারার সাতটী প্রকার আছে। এই সাতটী প্রকারকে সপ্তভঙ্গী বলে। কোনও পদার্থের সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞানলাভ কেবল সপ্তভঙ্গী দ্বারাই সম্ভব। কোনও এক বস্তুতে অস্তিত্বাদি ধর্ম্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে বিরোধশূন্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বাধাশূন্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ বা সম্মিলিত ভাবে বিধি ও নিষেধের পর্য্যালোচনা করিয়া আপেক্ষিকতার সহিত যে সাত প্রকার বচন-বিন্যাস করা হয়, তাহাকেই সপ্তভঙ্গী বলে।

উল্লিখিত সাত প্রকার বচন-বিন্যাস এইরূপ ঃ—

( ১ ) স্যাৎ অস্তি, ( ২ ) স্যাৎ নাস্তি, ( ৩ ) স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ, ( ৪ ) স্যাৎ অবক্তব্য, ( ৫ ) স্যাৎ অস্তি অবক্তব্যশ্চ, ( ৬ ) স্যাৎ নাস্তি অবক্তব্যশ্চ এবং ( ৭ ) স্যাৎ অস্তি নাস্তি অবক্তব্যশ্চ।

জীব-শব্দের সম্বন্ধে সপ্তভঙ্গী প্রয়োগ করিলে নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিন্যাস হইবে। যথা—

( ১ ) স্যাৎ অস্তি=এক প্রকারে আছে। যদি বলা হয়—জীব নিত্য, তাহা হইলে বুঝা যাইতে পারে যে, কোনও অপেক্ষায় জীব নিত্য; কিন্তু অন্য কোনও অপেক্ষায় জীব অনিত্যও হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে বিধিকল্পনার দ্বারা প্রথম ভঙ্গ।

( ২ ) স্যাৎ নাস্তি=দেখিতে গেলে অন্য প্রকারে নাই। যদি বলা যায়—জীবের নিত্যত্ব নাই, অর্থাৎ জীব অনিত্য, তাহা হইলে বুঝা যাইতে পারে যে, কোনও অপেক্ষায় জীব অনিত্য। এই বাক্যে, অনিত্যতাব্যতীত জীবের নিত্যতাও থাকিতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ইহা হইতেছে নিষেধ-কল্পনা দ্বারা দ্বিতীয় ভঙ্গ।

( ৩ ) স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ=একরূপে আছে, অন্য প্রকারে নাই। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য, আবার কোনও অপেক্ষায় অনিত্য—উভয়ই। ইহা হইতেছে বিধি ও নিষেধ কল্পনার দ্বারা তৃতীয় ভঙ্গ।

( ৪ ) স্যাৎ অবক্তব্য=কোনও অপেক্ষায় অবক্তব্য। জীবের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব যুগপৎ প্রতিপাদিত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা কোনও শব্দদ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া বলা হয়—অবক্তব্য। ইহা হইতেছে যুগপৎ বিধি ও নিষেধের কল্পনা দ্বারা চতুর্থ ভঙ্গ।

(৫) স্যাৎ অস্তি অবক্তব্যশ্চ। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য ও অবক্তব্য উভয়ই। এই ভঙ্গে জীবের নিত্যত্ব ও যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হয়। ইহা হইতেছে বিধিকল্পনা ও যুগপৎ বিধি-নিষেধ কল্পনার দ্বারা পঞ্চম ভঙ্গ।

(৬) স্যাৎ নাস্তি অবক্তব্যশ্চ। জীব কোনও অপেক্ষায় অনিত্য এবং অবক্তব্য-উভয়ই। এই ভঙ্গে জীবের অনিত্যত্ব এবং যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। ইহা হইতেছে নিষেধ-কল্পনা ও যুগপৎ বিধি-নিষেধ-কল্পনার দ্বারা ষষ্ঠ ভঙ্গ।

(৭) স্যাৎ অস্তি নাস্তি অবক্তব্যশ্চ। জীব কোনও অপেক্ষায় নিত্য, অনিত্য এবং অবক্তব্যও বটে—এইরূপ ভঙ্গে জীবের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের সঙ্গে যুগপৎ নিত্যানিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হয়। ইহা হইতেছে অনুক্রমে বিধি ও নিষেধ কল্পনা এবং যুগপৎ বিধি-নিষেধ কল্পনার দ্বারা সপ্তম ভঙ্গ।

উল্লিখিত সাতটী ভঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভঙ্গ হইতে পারে না। যে কোনও বস্তুসম্বন্ধেই উল্লিখিত সাতটী ভঙ্গ প্রয়োজিত হইতে পারে। সপ্তভঙ্গবাদকে স্যাদ্বাদও বলে। এই স্যাদ্বাদে একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা বিচার করা হয় এবং তাহাতেই সেই বস্তুর বিভিন্ন গুণ প্রকটিত হইতে পারে, বস্তুটীকেও সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারা যায়।

সপ্তভঙ্গীনয়—হইতেছে উল্লিখিত সপ্তভঙ্গী-মূলক যুক্তি। নয়=ন্যায় বা যুক্তি।

**ট। বক্তব্য।** উল্লিখিত বিবরণ হইতে জৈনদর্শন সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তৎসম্বন্ধে স্বভাবতঃই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলি এই :—

প্রথমতঃ, "অলোক" সম্বন্ধে। জৈনমতে প্রমাণ মাত্র দুইটী—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ-প্রমাণ যে তীর্থঙ্করদের প্রত্যক্ষীভূত বিষয়মাত্র, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অবশ্য সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য নহে; ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইতে পারে; কেহ কেহ শ্বেত শঙ্খকেও পীত বর্ণ দেখেন, একটী চন্দ্রের স্থলেও দুইটী দেখেন, পূর্ব্বদিক্‌কেও দক্ষিণ দিক্ বলিয়া মনে করেন। যুক্তির অনুরোধে প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করিলেও তদ্দারা "লোকের" অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু "অলোকের" অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কেননা, তীর্থঙ্করগণও "লোকের" মধ্যে থাকেন বলিয়া এবং "অলোক" "লোকের" অতীত বলিয়া "অলোক" তাঁহাদেরও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে না, সুতরাং অপরের পক্ষেও তাহা "অপরোক্ষ"-প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সুতরাং "অলোক" কি কেবল ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র নয়?

"অলোক" যদি কেবল ভিত্তিহীন কল্পনামাত্রই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটী অনিশ্চিত বস্তু; সুতরাং মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের "অলোকে" স্থিতিও হইবে অনিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মবন্ধন-সম্বন্ধে। জৈনমতে কর্ম্মবন্ধন অনাদি এবং অহেতুক। জৈনদর্শনের মতে যাহা অনাদি, তাহার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। কেননা, হেতু স্বীকার করিতে গেলে হেতুর উদ্ভবের পর হইতেই হইবে তাহার উৎপত্তি; সুতরাং তাহা অনাদি হইতে পারে না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, হেতুরও অনাদিত্ব-স্বীকার করিলে উল্লিখিত আপত্তির কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। বৈদিক মতেও কর্ম্মের অনাদিত্ব এবং কর্ম্মবন্ধনের অনাদি হেতুও স্বীকৃত হয়—অনাদি ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা বা ভগবান্ সম্বন্ধে অনাদি অস্মৃতি। হেতু স্বীকৃত না হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতির উপায়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বন্ধনের যাহা হেতু, তাহার অপসারণেই অব্যাহতি। রোগের হেতু দুরীভূত হইলেই রোগের চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে।

যদি বলা যায়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তো রোগের নিদানের অনুসন্ধান করা হয় না, কেবল লক্ষণ দেখিয়াই ঔষধ নির্ব্বাচন করা হয়। এ-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, হোমিওপ্যাথিতেও নিদানের প্রতি অনুসন্ধান আছে ; এজন্যই "বিশেষ লক্ষণের" অনুসন্ধান করা হয় ; "বিশেষ লক্ষণটী"ই রোগের নিদান-সূচক।

কর্ম্মবন্ধনের হেতু অস্বীকৃত হইলে তাহার স্বাভাবিকত্বই স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্ম জড় বস্তু বলিয়া আপনা-আপনি উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মবন্ধনের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, চৈতন্যস্বরূপ জীবই কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিও জীবের পক্ষে স্বাভাবিকী। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, কর্ম্মপ্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিকী বলিয়া কর্ম্ম-নিবৃত্তির চেষ্টা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তির অনুরোধে তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও কর্ম্ম-নিবৃত্তির প্রয়াস হইয়া পড়িবে নিরর্থক ; কেননা, স্বাভাবিকী কর্ম্মপ্রবৃত্তির ধ্বংস অসম্ভব। কোনও উপায়েই অগ্নির স্বাভাবিক দাহকত্বের বিনাশ সম্ভবপর হয় না।

## ঠ। জৈনসাধনের ব্যবহারিক মূল্য ও সামান্য-ধর্ম্মতা

জৈন-শাস্ত্রে অহিংসাসত্যাস্তেয়াদি যে সকল সাধনের উপদেশ আছে, পূর্ব্বোক্ত কারণে মোক্ষ-বিষয়ে তাহাদের সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তবে তাহারা যে একেবারেই নিরর্থক, তাহাও বলা যায় না। মোক্ষ-বিষয়ে না হইলেও অন্য বিরয়ে অহিংসাদির উপাদেয়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে ব্যবহারিক জগতে লোক আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং ব্যবহারিক জগতের অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইতে পারে। অহিংসাদি-ব্রতানুষ্ঠানের মূল্য ব্যবহারিক জগতে পরম উপাদেয়।

বলা বাহুল্য, জৈনশাস্ত্রোক্ত অহিংসাদি ব্রতের আচরণ কেবল জৈনধর্ম্মাবলম্বীদেরই নিজস্ব নহে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে, পাতঞ্জলদর্শনে এবং বৈদিক শাস্ত্রেও যে এই সমস্তের উপদেশ আছে এবং এই সমস্ত যে মানুষের সামান্য সদাচার বা সামান্য ধর্ম্ম, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত সাধনের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ( পূর্ব্ববর্ত্তী ভূ-৩ জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

## ড। জৈনসাধনের পারমার্থিক মূল্য।

বৌদ্ধসাধন-সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—কেবলমাত্র অহিংসাদির সাধনে বৈদিক মতে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—কেবলমাত্র অহিংসাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে বৈদিক মতে মোক্ষ লাভ না হইতে পারে ; কিন্তু জৈনমতে হইতে পারে।

উত্তরে বক্তব্য এই যে—কেবলমাত্র অহিংসাদি-ব্রতাচরণে যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে, জৈনশাস্ত্রসম্মত প্রমাণদ্বয়েও তাহা উপপন্ন হয় না। কেন না, মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা এবং মোক্ষ-স্থান "অলোক"—ইহাদের কোনওটীই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে ; যেহেতু, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কোনও জিন-তীর্থঙ্করেরও এ-সমস্ত প্রত্যক্ষীভূত নহে বলিয়া পরবর্ত্তী কোনও তীর্থঙ্করের বা অপর কাহারও পরোক্ষ-প্রমাণের

বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জৈনমতে প্রমাণ তো মাত্র এই দুইটী। মোক্ষাদি এই দুইটী প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া কেবলমাত্র অহিংসাদির অনুষ্ঠানেই যে জীবের মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

যদি বলা যায়—তীর্থঙ্করগণ সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদির প্রভাবে তাঁহারা মোক্ষাদি সম্বন্ধে সমস্তই জানিতে পারেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। তীর্থঙ্করগণ যে আদর্শ মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "লোক"-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন ; কেননা "লোক" এবং "লোক"-সম্বন্ধীয় বস্তু তাঁহাদের প্রত্যক্ষের এবং পরোক্ষেরও বিষয়ীভূত। কিন্তু "অলোক" যখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের স্থান "অলোক"-সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জৈনমতে মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধনের মোক্ষ-প্রাপকত্ব, জৈনশাস্ত্রসম্মত প্রমাণদ্বয়ের দ্বারাও নিশ্চিতরূপে উপপন্ন হয় না।

### ঢ। জৈনদর্শনের লক্ষ্য

জৈনদর্শনের মতে আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিই হইতেছে লক্ষ্য ; আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিতেই মোক্ষ। জৈনমতে সংসারী জীবেরই দুঃখের সহিত সুখ। মুক্তজীবের সুখানুভবের সম্ভাবনা নাই ; কেননা, এই মতে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর স্বীকৃত নহে ; আনন্দের আস্বাদন-দায়িনী কোনও শক্তিও স্বীকৃত নহে। সুতরাং মুক্তজীবের আনন্দাস্বাদনের সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

### ণ। বেদান্তদর্শনে জৈনমতের বিচার

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৩৩ ॥"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়-নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥"-পর্য্যন্ত কয়েকটী সূত্রে জৈনমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও এই সকল সূত্রের ভাষ্যে জৈনমতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যের মর্ম্ম এ-স্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

### (১) সপ্তভঙ্গীনয়ের অযৌক্তিকতা

"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৩৩ ॥"-সূত্রে সপ্তভঙ্গী-নয়ের অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও বস্তু একই সময়ে যেমন শীতল এবং উষ্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ কোনও পদার্থে একই সময়ে সৎ ও অসৎ ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। জৈনমতে বস্তুর স্বরূপ অনিশ্চিত, বস্তুবিষয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত ; সুতরাং জৈনমতের জ্ঞান সংশয়জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ। অর্থাৎ "স্যাৎ অস্তি," "স্যাৎ নাস্তি"—বস্তু এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, ইহা সত্য হইলে তাহাতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিতে পারে না ; পরন্তু অনিশ্চিত বা সংশয়াত্মক জ্ঞানই জন্মিবে। যদি বলা যায়—"বস্তুমাত্রেই বহুরূপ"—এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান

জন্মিবে, তাহা সংশয়ের ন্যায় অপ্রমাণ হইবে কেন ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যাঁহারা সর্ব্ববস্তুর নিরঙ্কুশ বহুরূপতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "নিশ্চয়"ও "অনিশ্চয়ের" মধ্যে পরিগণিত। কেননা, নিশ্চয়েও "স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি" যোজিত হইবে—অর্থাৎ তাহাতেও "এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই"—এই অনির্দ্ধারিতরূপই হইবে। তাহাতে যিনি নিশ্চয় করেন, তাঁহার এবং নিশ্চয় ফলের অনিশ্চয়তাই সিদ্ধ হয়। যে স্থলে নিশ্চয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়-ফল অনিশ্চিত, সে স্থলে কিরূপে অনিশ্চিত শাস্ত্রবক্তা অনিশ্চিতরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ করিবেন ? কি প্রকারেই বা তন্মতানুসারিগণ অনিশ্চিত তদুপদিষ্ট পদার্থে প্রবৃত্ত হইবেন ? ফলের নিশ্চয়তা ও একরূপতা থাকিলেই লোক অব্যাকুলচিত্তে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে ; তাহা না থাকিলে প্রবৃত্তি অসম্ভব।

আবার, জৈনশাস্ত্রকথিত জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়—এই পাঁচ রকমের অস্তিকায়ও সপ্তভঙ্গীনয়-প্রয়োগে অসম্ভব হইয়া পড়ে। অস্তিকায়পঞ্চকে পঞ্চসংখ্যা আছে ও নাই—এই দুই বিকল্প স্থাপন করিলে পক্ষান্তরে না-থাকাও পাওয়া যায় ; সুতরাং সে-পক্ষে হয় ন্যূন সংখ্যা, না হয় অধিক সংখ্যা পাওয়া যায়।

আবার, ঐ সকল পদার্থের "অবক্তব্যতা"-পক্ষও অসম্ভব। কেননা, "অবক্তব্য" হইলে তাহা বলিবার যোগ্য নহে। বক্তব্য, অথচ অবক্তব্য—ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। উচ্চারিত হইলে তখনই অবধারিত ( নিশ্চিত ) ও অনবধারিত ( অনিশ্চিত )—এই দ্বিবিধ পক্ষ স্থাপিত হইবে। অবধারণের ফল সম্যক্জ্ঞান ; তাহাও পক্ষদ্বয়গ্রস্ত ( আছে ও নাই )। অবধারণের বিপরীত অনবধারণ ; তাহাও অস্তি-নাস্তিগ্রস্ত। স্বর্গ ও অপবর্গ ( মোক্ষ )—এই দুই পদার্থও পক্ষান্তরে "নাই" ও "অনিত্য" হইয়া উঠে। নিত্য ও অনিত্য, আছে ও নাই—এইরূপ পক্ষদ্বয় থাকায় সমুদায় পদার্থই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। সুতরাং জৈনমতাবলম্বীদিগের সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিই উপপন্ন হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয় অযৌক্তিক।

## ( ২ ) আত্মার দেহ-পরিমিতত্ব অযৌক্তিক

জৈনশাস্ত্রানুসারে, আত্মা যখন যে-দেহে থাকে, তখন সেই দেহের আকারই প্রাপ্ত হয়, সেই দেহকে ব্যাপিয়াই অবস্থান করে।

"এবঞ্চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্ ॥ ২।২।৩৪ ॥", "ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫ ॥" এবং "অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ২।২।৩৬ ॥"—এই তিনটী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব এবং এই সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ আত্মা-সম্বন্ধে জৈনমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে আত্মা হইবে অপূর্ণ, সুতরাং ঘট-পটাদির ন্যায় অনিত্য। শরীর-পরিমাণের স্থিরতা নাই ; মনুষ্য-শরীর, হস্তি-শরীর, কীটাণুর শরীর—একরূপ আয়তন-বিশিষ্ট নহে। যে আত্মা এখন মনুষ্য-শরীরে আছে, কর্ম্মফলানুসারে সেই আত্মার যদি হস্তি-শরীরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই আত্মা হস্তি-শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না ; আবার যদি তাহাকে কখনও কীটাণু

হইতে হয়, তাহা হইলে কীটাণুদেহে তাহার স্থান হইবে না। জন্মান্তরের কথা দূরে, একই জন্মে বাল্য-যৌবনাদি-যুক্ত শরীরেও ঐরূপ দোষ দেখা দিবে।

যদি বলা যায়—সঙ্কোচ ও বিকাশ—এই দুইটী আত্মার ধর্ম্ম; আত্মা যখন মনুষ্যদেহ হইতে হস্তিদেহে প্রবেশ করিবে, তখন বিকশিত হইয়া বৃহৎ হইবে; আবার যখন কীটাণুদেহে প্রবেশ করিবে, তখন সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ স্বীকার করিলে আত্মার বিকার এবং বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়; তাহাতে আত্মাও ঘট-পটাদির তুল্য হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ অসম্ভব। কেননা, অন্ত্যাবস্থার ( মোক্ষাবস্থার ) জীব-পরিমাণ নিত্য; ইহা জৈনগণও স্বীকার করেন। অন্ত্যজীব-পরিমাণ নিত্য হইলে সেই দৃষ্টান্তে আদ্য-মধ্য-জীবপরিমাণও—অর্থাৎ সংসারী জীব যখন যে দেহেই থাকুক না কেন, সেই দেহে অবস্থান-কালেও জীবাত্মার পরিমাণ—নিত্যই হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থায় জীবাত্মার পরিমাণ একরূপ থাকিবে—ইহাই সিদ্ধ হইল। একরূপতা স্বীকার না করিলে নিত্যত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার দেহপরিমিতত্ব অযৌক্তিক।

## ৫। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন

### ক। সাধারণ পরিচয়

পরমর্ষি কপিল হইতেছেন নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক। একাধিক কপিল আছেন। কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতির পুত্রও এক কপিল। তিনি ভগবদবতার। তিনিও এক রকমের সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক নহেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে অগ্নিবংশজ এক কপিলের উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক।

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ সঃ কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ॥

—যতিগণ যাঁহাকে সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন, তিনি অগ্নিবংশ্য একজন পরম-ঋষি।"

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মতে তত্ত্ব পঁচিশটী—পুরুষ ( বা জীবাত্মা ), প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত। মূল তত্ত্ব বাস্তবিক দুইটীই—প্রকৃতি ও পুরুষ। মহত্তত্ত্বাদি তেইশটী তত্ত্ব প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত। প্রকৃতি অচেতনা, জড়রূপা, স্বতন্ত্রা এবং ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইলেই, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলেই, মহত্তত্ত্বাদির উদ্ভব হয় এবং জগতের সৃষ্টি হয়। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে ক্রিয়াহীনা; পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয়া হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে প্রকৃতির দুইটী অবস্থা। সৃষ্টিতে প্রকৃতি বহু রূপ প্রাপ্ত হয়; প্রলয়ে এই বহু রূপ থাকে না, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্না একা প্রকৃতিই থাকে।

পুরুষ চেতন, নিত্য, নির্গুণ ও বিভু। পুরুষ স্বরূপতঃ এক। কিন্তু স্বরূপতঃ এক হইলেও, ঘটাদির

সংযোগে আকাশ যেমন নানাত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থানবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাধিভেদে পুরুষও বহুত্ব প্রাপ্ত হয়। "উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগে আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ॥ সাংখ্যদর্শন॥ ১।১৫৩॥ জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্॥ সাংখ্যদর্শন॥ ১।১৪৯॥" ঘটাদি উপাধির ভেদেই আকাশের বহুত্ব প্রতীতি হয়, বাস্তবিক তত্তৎস্থলে আকাশের কোনও ভেদ নাই, ভেদ উপাধিরই। তদ্রূপ, নিত্য নির্গুণ বিভু পুরুষেরও স্বরূপতঃ ভেদ নাই, দেহাদি উপাধিরই ভেদ এবং উপাধির নানাত্ববশতঃই পুরুষের বা আত্মারও ভেদ জন্মে বলিয়া প্রতীতি হয়।

শুভ্র স্ফটিকের নিকটে রক্তবর্ণ ফুল থাকিলে ফুলের রক্তবর্ণ স্ফটিকে প্রতিফলিত হইয়া যেমন স্ফটিককে রক্তবর্ণ করে বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ধর্ম্ম—গুণত্রয়—পুরুষে প্রতিফলিত হয়, পুরুষকেও যেন প্রকৃতির ধর্ম্মযুক্ত করে; তাহার ফলে পুরুষের মধ্যে অভিমান জন্মে, প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য পুরুষের ইচ্ছা জন্মে। ইহাই পুরুষের দুঃখের কারণ।

আবার, ঠিক ঐ ভাবে চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ স্বরূপতঃ অচেতনা জড়রূপা প্রকৃতিও পুরুষের চৈতন্যগুণ প্রাপ্ত হয়। অগ্নির সান্নিধ্যবশতঃ লৌহও যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। চৈতন্যগুণ-প্রাপ্তা প্রকৃতিও পুরুষকে যেন জানাইতে চাহে যে, তাহার মধ্যে বাস্তবিক পুরুষের ভোগের উপযোগী কিছু আছে। প্রকৃতির এইরূপ ইচ্ছা এবং পুরুষের ভোগের ইচ্ছা—দুই পক্ষের এই দুই ইচ্ছার ফলেই তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হয় এবং পুরুষের ভোগবাসনা যতদিন চলিতে থাকে, ততদিনই তাহার সাংসারিক সুখ-দুঃখও চলিতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই পুরুষের ভোগের—সুখ-দুঃখের—অবসান এবং সুখ-দুঃখের অবসানেই পুরুষের মোক্ষ। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকই হইতেছে এই মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞান।

অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগতের সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। যে অন্ধ, তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, সুতরাং পথ দেখিয়া চলিতে পারে না। আর, যে পঙ্গু, তাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু পঙ্গু বলিয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু যদি দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট অন্ধের স্কন্ধে অরোহণ করিয়া পথ দেখিয়া দেখিয়া অন্ধকে চালিত করে, তাহা হইলে উভয়েই অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়। জড়রূপা প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ; আর, চেতন-পুরুষ যেন দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট, অথচ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া ক্রিয়াশক্তিহীন। উভয়ের সংযোগ হইলে দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট একটী বস্তুর উদ্ভব হয়; এই বস্তুই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

নিরীশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। এই মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবাৎ।" সুতরাং এই মতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কোনও ঈশ্বর নাই। প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল। প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীলা।

নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই সাংখ্যদর্শনের লক্ষ্য। কেবল সুখ, অথবা দুঃখ-নিবৃত্তির সঙ্গে সুখ—এই দর্শনের লক্ষ্য নহে।

## খ। বেদান্তদর্শনে নিরীশ্বর সাংখ্যমতের আলোচনা

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে ২।২।১ ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২।২।১০ ব্রহ্মসূত্র পর্য্যন্ত দশটী সূত্রে নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ যে ভাবে সাংখ্যমতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে একা প্রকৃতিই জগতের কারণ। কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে। কেননা, যাহা কোনও চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নহে, চেতনকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নহে, এতাদৃশ কোনও অচেতন পদার্থকে কোনও বস্তু রচনা করিতে দেখা যায় না। গৃহ, অট্টালিকা, আসন, শয্যা, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যত রকম বস্তু আছে, তৎসমস্তই কোনও বুদ্ধিমান্ শিল্পিদ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায় ; কেবল অচেতন পাষাণাদিদ্বারা তৎসমস্ত রচিত হইতে দেখা যায় না। লোষ্ট্র-পাষাণাদি অচেতন পদার্থ যখন চেতনের প্রেরণাব্যতীত সামান্যমাত্রও কিছু রচনা করিতে পারে না, তখন অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লোক এবং পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত কর্ম্মফল-ভোগযোগ্য বহুবিধ স্থান, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক শরীরাদি, মনুষ্যাদি জাতি এবং অসাধারণরূপে বিন্যস্ত ও রচনা-পরিপাটীযুক্ত এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে পারে ? বিচারবুদ্ধিহীনা অচেতনা জড়রূপা প্রকৃতির পক্ষে এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা বলেন—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক যে কিছু বিকার—সমস্তই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সমস্ত বিকারেই সুখ-দুঃখাদির অন্বয় আছে। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হয় না। কেননা, সুখ, দুঃখ ও মোহ—এ-সমস্ত অন্তরস্থ বলিয়াই প্রতীত হয় এবং শব্দাদি পদার্থ বাহ্য বলিয়াই অনুভূত হয়। বাহ্য বস্তুতে সুখ-দুঃখ নাই। একই শব্দে, একই স্পর্শে, একই রূপে—কেবল ভাবনার পার্থক্য অনুসারে কাহারও দুঃখ, কাহারও বা কিছু সুখ হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়, শব্দ-স্পর্শাদি বাহ্য বিষয় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক নহে।

যাঁহারা পরিমিত—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণযুক্ত—অঙ্কুরাদি বিকারের সংসর্গপূর্ব্বক ( বীজভূমি-জলাদি-সংসর্গজনিত ) উৎপত্তি দেখিয়া পরিমিতত্ব হেতুর দ্বারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকারের ( জন্য পদার্থের ) সংসর্গ-পূর্ব্বকত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণেরও সংসর্গপূর্ব্বকত্ব প্রসঙ্গ হয়। কেননা, এই গুণত্রয়েরও পরিমিতত্ব ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক বিরচিত যান, আসন, শয্যা প্রভৃতিতে কার্য্য-কারণ-ভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং কার্য্যকারণভাব গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদের ( ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ) অচেতনপূর্ব্বকত্ব ( অচেতন-কারণ-নির্ম্মিতত্ব ) অনুমান করা সঙ্গত হয় না।

অচেতনা প্রকৃতির পক্ষে সৃষ্টি-আদি কার্য্য তো দূরে, সৃষ্টি-আদির প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। কোনও কার্য্যনির্ব্বাহ করার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া তদ্বিষয়ে যে প্রয়াস, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। অচেতনের পক্ষে ইচ্ছা বা প্রয়াস অসম্ভব। সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতেছে তাহার সাম্যাবস্থার বিনাশ। কোনও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত, বাহিরের কোনও শক্তিব্যতীত সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। যদি বলা যায়, অচেতন

রথাদিরও তো প্রবৃত্তি—গতি—দেখা যায় ? রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায় সত্য ; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে কোনও চেতন বস্তু। চেতন বস্তু রথাদিকে চালায় বলিয়াই অচেতন রথ চলিতে পারে।

যদি বলা যায়—অচেতন দুগ্ধ আপনা-আপনিই বৎসের মুখে ক্ষরিত হয় ; অচেতন জল স্বীয় স্বভাববশে নিম্নভূমির দিকে চলিয়া থাকে। এ-সকল স্থলে অচেতনেরও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তদ্রূপ অচেতন প্রধানও ( প্রকৃতিও ) পুরুষার্থ-সাধনের মিনিত্ত প্রবৃত্ত হয়—মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। ধেনু চেতন ; তাহার ইচ্ছা ও বৎসের প্রতি স্নেহ থাকাতে দুগ্ধের ক্ষরণ হয়। বৎসের চোষণেও ধেনুর দুগ্ধ আকৃষ্ট হইয়া গতি প্রাপ্ত হয়। জলের গতিও নিম্নভূমির অপেক্ষা রাখে। দুগ্ধ বা জল—কোনটাই অন্যনিরপেক্ষ ভাবে আপনা-আপনি গতি প্রাপ্ত হয় না। অচেতন প্রধান অন্যনিরপেক্ষ ভাবে আপনা-আপনি কিরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রধান বলা হয়। প্রধানকে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেয়—এমন কিছুও নাই। পুরুষ আছে সত্য ; কিন্তু পুরুষ উদাসীন, নিষ্ক্রিয়—সুতরাং কাহারও প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হইতে পারে না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রধান কখনও মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, আবার কখনও হয় না ( অর্থাৎ কখনও সৃষ্টি এবং কখনও প্রলয় )—ইহা সম্ভবপর হয় না। পরিণাম-প্রাপ্তি যদি প্রধানের স্বভাবই হয়, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিণামের দিকেই ( অর্থাৎ সৃষ্টির দিকেই ) তাহার প্রবৃত্তি থাকিবে, কখনও পরিণাম-নিবৃত্তির ( অর্থাৎ প্রলয়ের ) দিকে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। তাহাতে প্রলয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; অথচ সাংখ্য প্রলয়ও স্বীকার করেন। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি এবং মায়াসহায় ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিলে সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই উপপন্ন হইতে পারে। অন্যনিরপেক্ষ অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

যদি বলা যায়—তৃণাদি যেমন আপন-স্বভাবে দুগ্ধাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপন-স্বভাবেই মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়।

উত্তরে বলা যায়—ধেনুকর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলে তৃণ কখনও দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। যে তৃণ ধেনুকর্ত্তৃক ভুক্ত হয় না, তাহা কখনও দুগ্ধে পরিণত হয় না। বৃষাদিকর্ত্তৃক ভুক্ত তৃণও দুগ্ধে পরিণত হয় না। স্তূপীকৃত তৃণরাশিও আপনা-আপনি দুগ্ধে পরিণত হয় না। ইহা হইতে জানা যায়—অচেতন তৃণ, দুগ্ধে পরিণত হইতে কোনও বিশেষ কারণের অপেক্ষা রাখে। বিশেষ-কারণ-নিরপেক্ষ ভাবে তৃণ কখনও দুগ্ধে পরিণত হয় না। তৃণের দৃষ্টান্তে অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রধানের পরিণতি উপপন্ন হইতে পারে না।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অন্যনিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই প্রধান মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলেও প্রয়োজনাভাব-রূপ দোষ দেখা দেয়।

প্রধান যদি আপনা-আপনিই প্রবৃত্ত হয়, অন্য কাহারও অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রধান যেমন কোনও সহকারীর প্রতীক্ষা করে না, তেমনি কোনও প্রয়োজনেরও প্রতীক্ষা

করে না, তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনা। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনা প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে গেলে সাংখ্যেরই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় ; কেননা, সাংখ্য প্রধানের প্রবৃত্তিকে নিষ্প্রয়োজনা বলেন না। সাংখ্যমতে পুরুষের অর্থ বা অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রবৃত্ত হয়, মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়।

বলা যাইতে পারে—প্রধান অপর সহকারীর অপেক্ষা রাখেনা বটে. কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রধান প্রবৃত্ত হয় ? পুরুষের ভোগ সাধনের জন্য ? না কি পুরুষের মোক্ষ সাধনের জন্য ? না কি ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ?

যদি পুরুষকে ভোগ করানই প্রধানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মোক্ষের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ, পুরুষের ভোগই অসিদ্ধ ; কেননা, পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ; তাঁহাতে কোনওরূপ অতিশয় বা বিকার-বিশেষ সম্ভবপর নহে ; সুতরাং পুরুষের ভোগই সিদ্ধ হয় না।

যদি পুরুষের অপবর্গ বা মোক্ষই প্রয়োজন হয়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, প্রধানের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই পুরুষ মোক্ষাবস্থাতেই থাকেন। বন্ধনই যখন নাই, তখন মোক্ষ কিরূপে প্রয়োজন হইতে পারে ? অধিকন্তু, অপবর্গ-প্রয়োজনা প্রবৃত্তি হইলে বন্ধনজনক শব্দাদির অনুভব হইবে কেন ?

ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রয়োজন স্বীকার করিতে গেলে মোক্ষই অসম্ভব। কেননা, ভোক্তব্য প্রাকৃতিক পদার্থ অনন্ত ; কস্মিন্ কালেও মুক্তি হইতে পারে না।

মাত্র ঔৎসুক্য-নিবৃত্তিই প্রয়োজন—ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। কেননা, প্রধান হইতেছে জড়, অচেতন ; তাহার কোনও ইচ্ছাও থাকিতে পারে না, ঔৎসুক্যও থাকিতে পারে না। আর, পুরুষ হইতেছেন নির্ম্মল ; তাঁহারও কোনও ঔৎসুক্য থাকিতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—চেতন বলিয়া পুরুষ দৃক্-শক্তিসম্পন্ন এবং ত্রিগুণাত্মক বলিয়া প্রধান সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্না। দৃশ্যবস্তুর সৃষ্টিব্যতীত এই উভয় শক্তির সার্থকতা থাকে না। দৃশ্য না থাকিলে দৃক্শক্তি থাকা-না-থাকা সমান। দর্শক না থাকিলে দর্শন-শক্তিও থাকা-না-থাকা সমান। এই শক্তিদ্বয়ের সার্থকতা সাধনের জন্যই প্রধান স্বীয় সৃষ্টি-শক্তি প্রকাশ করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শক্তি নিত্য বলিয়া সৃষ্টিও নিত্য হইয়া পড়ে এবং সৃষ্টি নিত্য হইলে মোক্ষেরও অভাব হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কারণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে সাংখ্যকথিত অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়ের আলোচনা করা হইতেছে। সাংখ্যবাদীরা বলেন—দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু যেমন দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট অন্ধকে প্রবর্ত্তিত করে, অথবা চুম্বক যেমন স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান থাকিয়াও লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ পুরুষও প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। সাংখ্যকথিত দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য নাই। পঙ্গুর বাক্শক্তি-আদি আছে ; তদ্দ্বারা সে অন্ধকে চালিত করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ; তাঁহার

এমন কোনও প্রবর্ত্তক-ব্যাপার নাই, যদ্দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। চুম্বকের দৃষ্টান্তও অসঙ্গত। চুম্বকের লৌহ-সান্নিধ্য নিত্য নহে, সাময়িক। কিন্তু পুরুষের প্রকৃতি-সান্নিধ্য নিত্য, সকল সময়ে সমান। তদনুসারে, পুরুষের সান্নিধ্যই যদি প্রধানের প্রবৃত্তির হেতু হয়, তাহা হইলে এই সান্নিধ্য যখন নিত্য, প্রধানের প্রবৃত্তিও হইবে নিত্য—সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়াও নিত্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকিবে, প্রলয় কখনও সম্ভবপর হইবে না। এই সমস্ত কারণে পঙ্গুর বা চুম্বকের সহিত পুরুষের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না।

আবার, প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন। তাহাদের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব। সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, এমন কোনও তৃতীয় পদার্থও সাংখ্যমতে নাই। যদি বলা যায়—পুরুষ ও প্রধানের যোগ্যতাই সম্বন্ধ ঘটায়। তাহা স্বীকার করিলেও দোষ দেখা দেয়। পুরুষের চেতনত্বরূপ যোগ্যতা এবং প্রধানের জড়ত্বরূপ যোগ্যতা হইতেছে নিত্য। এই নিত্য যোগ্যতাই যদি প্রবৃত্তির হেতু হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিও হইবে নিত্য—সুতরাং সংসারও হইবে নিত্য। তাহাতে সংসারত্যাগরূপ মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

প্রধান যে আপনা-আপনি সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অন্য হেতুও আছে। সেই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই হইতেছে প্রধান বা মূল প্রকৃতি। সাম্যাবস্থায় সকল গুণই সমান এবং স্বরূপমাত্রে অবস্থিত থাকে ; সুতরাং তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব উপপন্ন হয় না। অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেছে তারতম্য-ভাব বা উপকার্য্য-উপকারকভাব। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় ইহা অসম্ভব। অনপেক্ষ-স্বরূপ সত্ত্বাদিগুণের অঙ্গ-প্রধান-ভাব অনুপপন্ন। অঙ্গপ্রধান-ভাব বা অঙ্গাঙ্গিভাব থাকিলে স্বরূপ—সাম্যাবস্থা—থাকিতে পারে না। আবার চিরকাল প্রধানাবস্থা বা সাম্যাবস্থা থাকাও সাংখ্যের অভিপ্রেত নহে ; কেননা, সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হইলে সৃষ্টিই হইতে পারে না। অথচ সাংখ্যমতে এমন কোনও তৃতীয় বস্তুও নাই, যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে পারে, ভোগ জন্মাইতে পারে। আবার তাহা না থাকিলে গুণবৈষম্যমূলক মহত্তত্ত্বাদিরও উৎপত্তি হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—সত্ত্বাদি গুণত্রয় অনপেক্ষ-স্বভাব নহে, কূটস্থও নহে। তাহাদের স্বভাব হইতেছে কার্য্যানুযায়ী। যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎপত্তি সঙ্গত হয়, গুণসকলের সেইরূপ স্বভাব আছে। গুণসমূহ চলস্বভাব, কূটস্থ নহে। সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্য-প্রাপ্তির যোগ্যতা তাহাদের থাকে।

ইহার উত্তর এই। গুণসমূহের স্বভাব কার্য্যানুযায়ী, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অনপেক্ষ-স্বভাব নহে—ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বকথিত দোষের পরিহার হয় বটে ; কিন্তু অচেতন প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় তাহাদ্বারা অনন্ত বৈচিত্র্যময় সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না।

সাম্যাবস্থাতেও গুণসমূহের মধ্যে বৈষম্য-যোগ্যতা থাকে—ইহা স্বীকার করিলেও বিনা কারণে সেই বৈষম্য-যোগ্যতা কার্য্যকরী হইতে পারে না—সুতরাং সাম্যাবস্থাও নষ্ট হইতে পারে না, সৃষ্টিক্রিয়াও হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বিনা কারণেই গুণসমূহের বৈষম্যযোগ্যতা প্রকাশ পাইতে পারে এবং সাম্যাবস্থাও নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বদা বৈষম্যই—সুতরাং অনবরত সৃষ্টিই—স্বীকার করিতে হয়, প্রলয়ের সম্ভাবনা আর থাকে না, সাম্যাবস্থাও আর কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

পদার্থসম্বন্ধেও সাংখ্যবাদীদের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ। কোনও আচার্য্য বলেন—ইন্দ্রিয় সাতটী ; আবার কেহ বলেন—ইন্দ্রিয় একাদশটী। কোনওস্থলে দেখা যায়—মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রের উৎপত্তি ; আবার কোনও-স্থলে দেখা যায়—অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি। কেহ বলেন—অন্তঃকরণ তিনটী, আবার কেহ বলেন—অন্তঃকরণ একটী। এইরূপ পরস্পর মতবিরোধ। এই বিরোধের কোনও সমাধানও দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতির সহিত এবং শ্রুতির অনুগতা স্মৃতির সহিতও সাংখ্যমতের বিরোধ অতি সুস্পষ্ট। শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ এবং স্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যের দর্শন সমঞ্জস নহে।

## গ। সাধারণ আলোচনা

যদি বলা যায়—সাংখ্যদর্শনে আগম-প্রমাণও স্বীকৃত। আগম বলিতে শ্রুতিকে বুঝায়। সুতরাং সাংখ্য-দর্শন কিরূপে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে ?

শ্রীপাদ শঙ্করই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ২।২।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপ্যুদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তো ব্যাচক্ষতে। তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং ন সম্যগ্ব্যাখ্যানমিত্যেতাবৎ পূর্ব্বত্র কৃতম্।—সাংখ্যাদি-শাস্ত্র স্বপক্ষ-স্থাপনের নিমিত্ত বেদান্ত-বাক্যসমূহের উল্লেখ করিয়া নিজেদের মতের অনুকূল ভাবেই সে-সমস্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি-বাক্যের তাহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যানের আভাসমাত্র, সম্যক্ ব্যাখ্যা নহে, তাহা পূর্ব্বে ( বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ) প্রদর্শিত হইয়াছে।"

সাংখ্য-শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, অন্যান্য আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ও তদ্রূপই। ইহা হইতে বুঝা গেল, সাংখ্যকারগণ শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; বরং তাঁহারা শ্রুতিবাক্যসমূহকেই তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা বাস্তবিক ব্যাখ্যা নহে ; পরন্তু ব্যাখ্যার আভাস। সাংখ্য-দর্শন সৃষ্টি-বিষয়ে প্রধান-কারণবাদী, কিন্তু বেদান্তদর্শন প্রধান-কারণবাদের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম-কারণবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; কিন্তু বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জীব, জীবের সংসারিত্ব, জীবের মোক্ষাদি সম্বন্ধেও বেদান্ত-মতের সহিত সাংখ্যমতের কোনওরূপ সঙ্গতি নাই।

সাংখ্যের পুরুষ ( বা জীবাত্মা ) এবং শ্রুতিস্মৃতি-কথিত জীবাত্মা—উভয়ে চেতন হইলেও কিন্তু এক নহে। শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত জীবাত্মা পরব্রহ্মের শক্তি। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা ॥৭।৫॥" কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ ব্রহ্মের শক্তি নহে। সাংখ্য-দর্শন ব্রহ্মই মানেন না, ব্রহ্মের শক্তি আবার মানিবেন কিরূপে ? শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতা প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতি—উভয়ে অচেতনা জড়রূপা হইলেও এবং মহত্তত্ত্বাদি উভয়েরই পরিণাম হইলেও—এক নহে। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিতা প্রকৃতি হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি, পরব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিতা, পরব্রহ্মের অধীনা—সুতরাং অস্বতন্ত্রা।

কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি পরব্রহ্মের শক্তি নহে ; সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতেছে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব, কাহারও অধীন নহে, কাহাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিতও নহে, কাহারও অপেক্ষাও রাখে না। শ্রুতি-স্মৃতির প্রকৃতি পরব্রহ্মের অধ্যক্ষতাতেই জগতের সৃষ্টি করে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥ গীতা ॥ ৯।১০ ॥" কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি অন্যনিরপেক্ষভাবে আপনা-আপনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করে। শ্রুতি-স্মৃতিমতে অনাদি ভগবদ্‌বিস্মৃতি বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতির সান্নিধ্যই পুরুষের পক্ষে সংসার-বন্ধনের হেতু। শ্রুতি-স্মৃতিমতে ব্রহ্মজ্ঞানে বা ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই জীবের মোক্ষ। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকে বা প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান-লাভেই জীবের মোক্ষ।

শ্রুতি-স্মৃতিমতে শব্দপ্রমাণ বা বেদপ্রমাণই হইতেছে মুখ্য প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ বেদ-প্রমাণের আনুকূল্যবিধায়ক হইলেই প্রমাণরূপে স্বীকৃত। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই প্রমাণত্রয় স্বীকৃত হইলেও কার্য্যতঃ সাংখ্য যে আগম-প্রমাণ বা বেদপ্রমাণকে স্বীকার করেন না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং সাংখ্যমতে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই প্রমাণদ্বয়ই কার্য্যতঃ স্বীকৃত।

এই সমস্ত কারণেই সাংখ্যমতকে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।

সাংখ্যমত কেবল যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্য্যগণও যুক্তিদ্বারাই দেখাইয়াছেন যে, সাংখ্যমত যুক্তিসিদ্ধও নহে। আবার বেদান্তমত যে যুক্তিসিদ্ধ, ২।২।১০-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাও দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—সাংখ্যমত স্বীকার করিলে জীবের সংসার-বন্ধন এবং মোক্ষও উপপন্ন হয় না।

## ৬। পাতঞ্জল-দর্শন বা যোগদর্শন

### ক। সাধারণ পরিচয়

মহর্ষি পতঞ্জলি হইতেছেন যোগদর্শনের প্রবর্ত্তক ; এজন্য ইহাকে পাতঞ্জল-দর্শন বলা হয়। পাতঞ্জল-দর্শনকে নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শনের এক বিশেষ সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, নিরীশ্বর কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে যে পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলিও সেই পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; তদুপরি আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন—ঈশ্বর। এইরূপে, পাতঞ্জল-দর্শনের মতে তত্ত্ব হইতেছে ছাবিবশটী। কপিল ঈশ্বর স্বীকার করেন না ; পাতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করেন। ইহাই হইতেছে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জল-দর্শনের বিশেষত্ব।

পতঞ্জলি তাঁহার স্বীকৃত ঈশ্বরের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন :—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয়—এই সমস্তদ্বারা অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট) পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর।"

ক্লেশ পাঁচ রকমের—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা হইতেছে মিথ্যাজ্ঞান। অস্মিতা—পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি—আমিত্ব। রাগ—ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি। দ্বেষ—দুঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি। অভিনিবেশ—মৃত্যুভয়। কর্ম্ম হইতেছে—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ; পাপ ও পুণ্য। বিপাক—কর্ম্মফল ; জন্ম, আয়ু ও ভোগ। আশয়—বাসনা ; বিপাকের অনুরূপ সংস্কার।

পতঞ্জলি যোগকেই মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন। এজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনকে যোগদর্শনও বলা হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের যোগ হইতেছে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, স্থিতি বা আলস্য—এই তিনটী হইতেছে চিত্তের স্বভাব এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী হইতেছে চিত্তের গুণ।

যোগ-সিদ্ধির বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের জন্য এই আটটী উপায়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা—(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য, (২) ঈশ্বরোপাসনা, (৩) প্রাণায়াম, (৪) নাসাগ্র, জিহ্বামূলাদিতে ধারণা, (৫) হৃৎপদ্মে ধারণা, (৬) কোনও নিষ্কাম মহাপুরুষের ধ্যান, (৭) স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষের বা সাত্ত্বিকবৃত্তির আশ্রয় এবং (৮) নিজের রুচি-অনুসারে যে কোনও বস্তুর ধ্যান। এই আটটী উপায়ের যে কোনও একটী অবলম্বন করিলেই যোগ সিদ্ধ হইতে পারে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটী হইতেছে যোগাঙ্গ। ধ্যানের পরিপক্ব অবস্থায় চিত্ত যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে ভাসমান হয়, তখন তাহাকে বলে সমাধি। এই সমাধি আবার দুই রকমের—সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ এবং অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সূক্ষ্ম বৃত্তি থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

পতঞ্জলি-প্রবর্ত্তিত যোগকে রাজযোগও বলা হয়। ইহা কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপ্রোক্ত "রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ" নহে। রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগে ভগবদ্ভজনের কথা এবং ভজনদ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। পতঞ্জলির রাজযোগের লক্ষ্য ভগবৎ-প্রাপ্তি নহে ; ইহার লক্ষ্য হইতেছে কৈবল্য, অর্থাৎ চৈতন্যমাত্ররূপে পুরুষের (বা জীবের) নিত্য অবস্থান। এই কৈবল্যে জীবের আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে সুখ-প্রাপ্তি নাই ; কেননা, সুখ-স্বরূপ ভগবানের সহিত পতঞ্জলি-কথিত কৈবল্যের বা মোক্ষের কোনও সম্বন্ধ নাই।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মোক্ষ এবং পাতঞ্জল-দর্শনের মোক্ষ একরূপই।

### খ। বেদান্তদর্শনে যোগদর্শনের আলোচনা।

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডন করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনে বলিয়াছেন—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥২।১।৩॥ ব্রহ্মসূত্র ॥—সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানে যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাতা হইল।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিতেই যোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা যোগদর্শনের (পাতঞ্জল

দর্শনের ) একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, যোগদর্শনে যোগ, আসন, ধ্যানাদির উপদেশ আছে। বেদেও এই সমস্তের উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, সাধক আত্মদর্শনার্থ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবেন। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—ইত্যাদি। নিদিধ্যাসন হইতেছে ধ্যান। এই শ্রুতিবাক্যে ধ্যানের উপদেশ আছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও আছে—"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্-ইত্যাদি—শরীরকে ত্র্যুন্নত ( অর্থাৎ বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক :এই তিন স্থান উচ্চ ও সমান ) করিয়া—ইত্যাদি।" এ-স্থলে যোগাসনের এবং অন্যান্য যোগাঙ্গের উপদেশ করা হইয়াছে।

বেদমধ্যে আরও দৃষ্ট হয়—"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্" ইতি, "বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্"–ইত্যাদি। তাৎপর্য্য—"মুনিগণ নিশ্চলা ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলেন",—"এই বিদ্যা ও সমুদয় যোগবিধান"। এইরূপ অনেক যোগবোধক উপদেশ বেদে দৃষ্ট হয়। যোগ যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়, তাহা যোগদর্শনেও বলা হইয়াছে।

এইরূপে, যোগদর্শনের কোনও কোনও অংশ বেদেও দৃষ্ট হয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন— অষ্টকাদি-স্মৃতির* ন্যায় যোগস্মৃতিও অনিন্দনীয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদান্তসূত্রে উল্লিখিতরূপ আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। কেননা, যোগস্মৃতির একাংশ বেদের অনুরূপ হইলেও অপরাংশ বেদবিরুদ্ধ।

উল্লিখিত সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—বেদনিরপেক্ষ (অর্থাৎ অবৈদিক) সাংখ্যজ্ঞানে এবং অবৈদিক যোগে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়— তাঁহাকে ( ব্রহ্মকে ) জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে ; ইহার আর অন্য পন্থা নাই।" কিন্তু সাংখ্য-দর্শন এবং পাতঞ্জল-দর্শন হইতেছে প্রধানাদিপর, ব্রহ্মপর নয় ; এই দুই দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হয় নাই, মুক্তির উপায়রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এই দুই দর্শনের অনুসরণে মোক্ষলাভের সম্ভাবনাও নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বেদান্তবাক্য দ্বারাই হইতে পারে, অন্য কিছুতে নহে। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্—যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি সেই বৃহৎ বস্তুকে ( ব্রহ্মকে ) জানিতে পারেন না।" "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—কেবল সেই উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছুক।"

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সাংখ্যদর্শনের এবং যোগদর্শনের যে-যে অংশ বেদের অবিরুদ্ধ, সেই-সেই অংশ গ্রহণীয় ; কিন্তু যে-যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥২।১।৩॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"অব্রহ্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরাভ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়োরাত্মে-শ্বরায়োর্ব্রহ্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি-সর্ব্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাৎ *** ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং

---

* অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। অষ্টকাস্মৃতি—তদ্বোধিকা স্মৃতি। অষ্টকাবাক্য বেদে দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু বেদে ইহার বিরুদ্ধ কথাও নাই। বিরুদ্ধ কথা নাই বলিয়া অনুমিত হয় যে, অষ্টকাস্মৃতির মূল হইতেছে শ্রুতি ; সুতরাং তাহা প্রামানিক বলিয়াও গণ্য হয়।

ন্যায্যমিতি—( যোগস্মৃতিতে ) অব্রহ্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদান-কারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায় এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় *** তাহা ( যোগস্মৃতি ) দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ন্যায্য হয় না।”

যে-যে হেতুতে যোগদর্শন বেদবিরুদ্ধ—সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য—শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত ভাষ্যাংশে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই ভাষ্যাংশ হইতে জানা গেল—পতঞ্জলি-স্বীকৃত ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ, কিন্তু উপাদান-কারণ নহেন। সূত্রকার ব্যাসদেব ২।১।৪ ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী সূত্রে প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম-কারণবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।

### গ। সাধারণ আলোচনা

পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত ঈশ্বর বৈদিক বা শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত ঈশ্বর কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। পতঞ্জলি বলেন—ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়দ্বারা অস্পৃষ্ট পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। বৈদিক ঈশ্বরে ( বা ব্রহ্মেও ) এই এই কয়টী লক্ষণ আছে। কিন্তু কেবল ইহা দ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপ অবধারিত হইতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ কি, তাহাও জানা আবশ্যক। বেদমতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতেছেন—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা বলা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার চেতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু আনন্দস্বরূপত্বের বা রস-স্বরূপত্বের উল্লেখ নাই। আবার বেদমতে ঈশ্বর বা পরব্রহ্মই হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ; কিন্তু পাতঞ্জল-মতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ, পরন্তু উপাদান-কারণ নহেন। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়—পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত ঈশ্বরে বৈদিক ঈশ্বরের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান নাই; সুতরাং তাঁহাকে বৈদিক ঈশ্বর বলিয়াও মনে করা যায় না।

পতঞ্জলি-স্বীকৃত ঈশ্বর হইতেছেন—ক্লেশকর্ম্মাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ। পতঞ্জলির “পুরুষ” হইতেছে “জীব”। এই জীবরূপ পুরুষ হইতেছে “চিৎস্বরূপ”। সুতরাং ঈশ্বরও চিৎস্বরূপ। চিৎস্বরূপত্বে পতঞ্জলির ঈশ্বর ও জীব সমান। এজন্যই বোধ হয় তিনি ঈশ্বরকেও “পুরুষবিশেষ” বা “জীববিশেষ” বলিয়াছেন। তবে ঈশ্বর পুরুষমাত্র নহেন; তিনি “পুরুষবিশেষ”। সাধারণ পুরুষ হইতে তাঁহার বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে—“ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ”-বিশেষণ দ্বারা। ঈশ্বরকে ক্লেশকর্ম্মাদিস্পর্শ করিতে পারে না; তিনি নিত্যই ক্লেশকর্ম্মাদিদ্বারা অস্পৃষ্ট; কিন্তু জীবরূপ পুরুষ সংসারাবস্থায় ক্লেশকর্ম্মাদিযুক্ত, কেবল মুক্তাবস্থায় ক্লেশকর্ম্মাদিবিমুক্ত। এইরূপে দেখা যায়—ঈশ্বর হইতেছেন “নিত্যমুক্ত” জীবসদৃশ। কিন্তু “নিত্যমুক্ত” জীব বলিয়া যে কিছু আছে, পাতঞ্জল-দর্শন হইতে তাহা জানা যায় না। যাহা হউক, পাতঞ্জল-দর্শনের ঈশ্বরকে নিত্যমুক্ত জীবও বলা যায় না; কেননা, পাতঞ্জলের মুক্তজীব বা স্বরূপাবস্থ পুরুষ হইতেছে, সাংখ্যের পুরুষের ন্যায়, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ঈশ্বর নির্গুণ নহেন; যেহেতু, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। নির্গুণ নিষ্ক্রিয়

ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়—পতঞ্জলির ঈশ্বর হইতেছেন—সৃষ্টিকর্তৃত্ববিশিষ্ট নিত্যমুক্ত জীবের তুল্য।

সাধন-সম্বন্ধেও পাতঞ্জল-মতের ও বৈদিক মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। বৈদিক মতে ব্রহ্মজ্ঞানই হইতেছে মোক্ষের একমাত্র উপায়; ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং বৈদিক সাধনে ঈশ্বরের বা পরব্রহ্মের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। কিন্তু পাতঞ্জলমতে সাধনে ঈশ্বরের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য নহে। পাতঞ্জল-সাধনে ঈশ্বরোপাসনা বা ঈশ্বর-প্রণিধানের কথা আছে বটে; কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য বা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; উহা বিকল্পবিধিমাত্র। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা—অথবা ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও (চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হইতে পারে)।" "বা"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়—ঈশ্বরোপাসনার বা ঈশ্বর-প্রণিধানের অত্যাবশ্যকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বিহিত অন্য কোনও উপায়ে যেমন যোগ সিদ্ধ হইতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রণিধানেও হইতে পারে। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি ঈশ্বর-প্রণিধানের চেষ্টা করিতে পারেন; তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই; কেননা, অন্য উপায় অবলম্বন করিলেও পাতঞ্জল-মতে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে। এই মতে নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোনও বস্তুর ধ্যানেও যোগ সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং সাধন-ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষত্ব কিছু নাই।

বৈদিক সাধনেও ধ্যানের কথা আছে, পাতঞ্জল-সাধনেও ধ্যানের কথা আছে। কিন্তু বৈদিক সাধনে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের ধ্যানই উপদিষ্ট হইয়াছে। পাতঞ্জল-মতে যে ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই ধ্যানের ধ্যেয় বস্তু কি? ঈশ্বরের ধ্যান তো বিকল্পমাত্র, অত্যাবশ্যক নয়। যাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যান করিবেন না, তাঁহাদের ধ্যেয় বস্তু কি হইতে পারে? রুচি অনুযায়ী যে কোনও বস্তুর ধ্যানে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা ধ্যেয় বস্তুতে কেন্দ্রীভূততা হয়তো জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ জন্মিবে কিরূপে? তাহাতে চিত্তবৃত্তি একই বস্তুতে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কিন্তু নষ্ট হইবে না। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন সূর্য্যরশ্মিসমূহ মণিবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় বটে; কিন্তু বিনষ্ট হয় না। যাহাতে চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা যদি নিত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে হয়তো কেন্দ্রীভূততারও নিত্যত্ব থাকিতে পারে; বিষয়-ভোগে চিত্তবৃত্তি আর ধাবিত না হইতে পারে; কিন্তু পাতঞ্জল-দর্শনের ধ্যেয় বস্তু অত্যাবশ্যকরূপে নিত্য নহে। কিরূপে যোগ সিদ্ধ হইতে পারে?

আসন-প্রাণায়ামাদির কথা বেদেও আছে, পাতঞ্জল-মতেও আছে। কিন্তু বেদমতে আসন-প্রাণায়ামাদি দৈহিক ব্যাপার—মুখ্য সাধনাঙ্গ নহে; এ-সমস্ত হইতেছে সাধনের সহায়মাত্র। আসন-সিদ্ধিতে দেহের রোগ-হীনতা, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্যাদি লাভ হইতে পারে; প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তের স্থিরতাদি রক্ষিত হইতে পারে। এইরূপে দেখা যায়—আসন-প্রাণায়ামাদি দেহ-মনকে সাধনের অনুকূল অবস্থায় আনয়নের সহায়তামাত্র করিতে পারে; কিন্তু এ-সমস্ত মুখ্য সাধন নহে। বৈদিক মতে মুখ্য সাধন হইতেছে ব্রহ্মের ধ্যান।

পাতঞ্জল-দর্শনের "যোগ" এবং বৈদিক "যোগ"—এই উভয়কে সর্ব্বতোভাবে এক বলা যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—কর্ম্মকুশলতাই যোগ।" সুতরাং গীতার "যোগ" হইতেছে একটী ব্যাপক বস্তু। এজন্য গীতার প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষেই "যোগ"-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, তারকব্রহ্মযোগ, রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ,

ইত্যাদি। বৈদিক শাস্ত্র চিত্তবৃত্তির বিষয়মুখতার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ভগবদুন্মুখতা-সাধনের উপায়রূপে অধিকারিভেদে বিভিন্ন সাধনপন্থার উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনবিষয়ে কৌশলকে যোগ বলিয়াছেন। বৈদিক মতে "যোগ" হইতেছে উপায় ; কিন্তু পাতঞ্জল-মতে "যোগ" হইতেছে উপেয়—চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এই নিরোধ চিত্তবৃত্তির ঈশ্বরোন্মুখতা নহে ; চিত্তবৃত্তির নিরোধহীনতার হেতুও পাতঞ্জলে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সাংখ্যমত এবং পাতঞ্জল-মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তত্তন্মতের অনুসরণে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। ইহার প্রতিবাদে কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বৈদিক মতের সহিত সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতের সকল বিষয়ে সঙ্গতি না থাকিলেই যে সাংখ্য-পাতঞ্জল-কথিত সাধন মোক্ষ-প্রাপক হইবে না, তাহা স্বীকার করার কি হেতু থাকিতে পারে ? বেদও কতকগুলি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মোক্ষের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে ; সাংখ্য-পাতঞ্জলও কতকগুলি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মোক্ষ লাভের উপায় নির্ণয় করিয়াছে। বেদ-স্বীকৃত তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বেদ-প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত সাধনেই মোক্ষলাভ হইবে, আর সাংখ্য-পাতঞ্জল স্বীকৃত তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত সাধনে মোক্ষ লাভ হইবে না—ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বেদবিহিত সাধন সম্বন্ধে প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে—বেদ-প্রদর্শিত যুক্তি বেদ-স্বীকৃত তত্ত্ব-সমূহের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা সত্য। কিন্তু সেই যুক্তির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য আছে কিনা ? যদি সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে বেদ-প্রদর্শিত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না। আর যদি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—২।২।১০-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন যে, বেদান্তমত যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিলেও বেদ-মত অস্বীকার করা যায় না ; কেন না, কোনও যুক্তিদ্বারা ইহার খণ্ডন করা যায় না।

আর, সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত যে যুক্তিসিদ্ধ নহে, সূত্রকার ব্যাসদেব এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্য্যগণ যুক্তিদ্বারাই পরিস্কারভাবে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং যুক্তির উপর নির্ভর করিলেও সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত স্বীকার করা যায় না ; কেননা, যুক্তিদ্বারা ইহার খণ্ডন করা যায়।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতের অনুসরণে মোক্ষ হয় না, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

বেদ অপৌরুষেয় শাস্ত্র ; সুতরাং বেদবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা নাই। বেদপ্রদর্শিত যুক্তির সামঞ্জস্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র হইতেছে পৌরুষেয় ; তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা আছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল-প্রদর্শিত যুক্তির অসামঞ্জস্যই তাহার প্রমাণ। ইহা হইতেও বুঝা যায়—সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রের অনুসরণে মোক্ষ লাভ হইবেই—একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

## ৭। ন্যায়-দর্শন

### ক। সাধারণ পরিচয়

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রবর্ত্তক। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে জানা যায়—লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বর বেদবিদ্যা যেমন প্রকটিত করিয়াছেন, তদ্রূপ ন্যায়-বিদ্যাও তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র রচনা করিয়া সেই ন্যায়-বিদ্যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

ন্যায়দর্শনে ষোলটী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে :—(১) প্রমাণ ( যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় ), (২) প্রমেয় ( যথার্থ জ্ঞানের বিষয় ), (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব ( অনুমানের অঙ্গীভূত বাক্য ; members of a syllogism ), (৮) তর্ক ( সমর্থক যুক্তি ), (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ ( সত্যনির্ণয়ের জন্য বিচার ), (১১) জল্প ( প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করার জন্য আপাতঃরম্য যুক্তি ), (১২) বিতণ্ডা ( বৃথা তর্ক বা ধ্বংসাত্মিকা যুক্তি ), (১৩) হেত্বাভাস ( যাহা হেতু নয়, অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে হেতুর মত মনে হয় ; fallacy ), (১৪) ছল ( প্রতিপক্ষ-কথিত বাক্যের কদর্থ করা, নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা ; quibbles ), (১৫) জাতি ( মিথ্যা সাদৃশ্যমূলক যুক্তি ) এবং (১৬) নিগ্রহস্থান ( যে যে বিষয়ে প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়েন, তাহার নির্দ্দেশ )।

ন্যায়মতে দুঃখ একুশ রকম :—শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় রকমের বুদ্ধি—এই উনিশ রকমের দুঃখস্থান উনিশ রকম 'দুঃখ' নামে অভিহিত। বিংশতিতম দুঃখ হইতেছে 'সুখ' ; সুখও দুঃখেরই পরিণাম বলিয়া দুঃখরূপে পরিগণিত। আর একবিংশতিতম দুঃখ হইতেছে—দুঃখ নিজে।

নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত প্রমাণ চারিটী—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই শব্দ-প্রমাণ হইতেছে—বাক্যে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমবেতভাবে যে তাৎপর্য্য, তাহা।

ন্যায়দর্শনে নিত্য পরমাণু স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরমাণুই জগতের উপাদান। কেবল উপাদান থাকিলেই কোনও বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না, প্রস্তুতির একজন কর্ত্তা আবশ্যক। ন্যায়দর্শনের মতে ঈশ্বর হইতেছেন জগতের কর্ত্তা। পরমাণুসমূহকে চালিত করিয়া ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাণুর ন্যায় ঈশ্বরও নিত্য, অনাদি। সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি।

এক বিশেষ অর্থে এ-স্থলে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। কুম্ভকার যেমন সাক্ষাদ্‌ভাবে ঘটাদি প্রস্তুত করে, ঈশ্বর কিন্তু সেইরূপ সাক্ষাদ্‌ভাবে জগতের সৃষ্টি করেন না। তিনি সৃষ্টির আদি প্রবর্ত্তক ; তাঁহার ইচ্ছাতে পরমাণুসকল চালিত হইয়া অণু এবং স্থূলতর বস্তুর সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ন্যায়দর্শনের মতে জীব বা জীবাত্মা নিত্য, অনাদি। জীব সংখ্যায় বহু ; কিন্তু ন্যায়দর্শন জীবাত্মাকে চৈতন্যস্বভাব বলিয়া মনে করেন না। কারণের এবং অবস্থার যথাযোগ্য সংস্থানে জীবাত্মার সহিত বুদ্ধি-আদির সংযোগ হয়। *

---

* Though the Nyaya admits a plurality of souls, it does not think that these are of the nature of consciousness. They are only substantive entities which may be associated with

ন্যায়-মতে জীব ও ঈশ্বর হইতেছে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ দুইটী তত্ত্ব। কর্ম্মবশতঃই জীবের সংসার এবং সংসার-দুঃখ। কর্ম্মফল অনুসারেই সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জগতে জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, সাধনও করিতে পারে। ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা। কেবল কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না বলিয়াই ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্যায়-মতে পূর্ব্বোল্লিখিত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই জীব সংসারমুক্ত হইতে পারে। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মুক্তি। মুক্তিতে বাস্তব সুখের স্থান নাই। মুক্তাবস্থায় জীব অচেতনবৎ থাকে।

ন্যায় শাস্ত্রের অপর একটী নাম—আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। অন্বীক্ষা অর্থ—বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা বা বিচার, Logic. ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ পর্য্যালোচনাদ্বারা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয় বলিয়া ইহাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলা হয়। বস্তুতঃ বিচারের রীতি-আদি ন্যায়শাস্ত্রেই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

### খ। আলোচনা

পরবর্ত্তী ৮খ এবং ৮গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ৮। বৈশেষিক দর্শন

### ক। সাধারণ পরিচয়

কণাদ-ঋষি হইতেছেন বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তক। তিনি হইতেছেন উলূকের পুত্র ঔলূক্য।

কণাদ ছয়টী পদার্থ স্বীকার করেন—(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায়। সামান্য-শব্দে জাতি বা সার্ব্বত্রিকত্ব বুঝায়। বিশেষ—যাহা জাতি নহে, সার্ব্বত্রিক নহে। সকল গাভীতে, সকল ষণ্ডে গোত্ব আছে; এই গোত্ব হইতেছে সামান্য। কিন্তু ষণ্ড এবং গাভী এক নহে; পরস্পর হইতে পার্থক্যসূচক ইহাদের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। এই পার্থক্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলিই হইতেছে "বিশেষ"। আর "সমবায়" হইতেছে এইরূপঃ—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। যাহাদের পৃথক্ ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত সেই সমস্ত পদার্থের যে "ইহ প্রত্যয়ের" (আশ্রিতত্ব-জ্ঞানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। দ্রব্য দেখিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, এই "সমবায়"ই তাহার কারণ। এই সমবায় সম্বন্ধটী নিত্য।

উল্লিখিত পদার্থগুলি পরস্পর হইতে ভিন্ন এবং ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। মনুষ্য, অশ্ব, শশ প্রভৃতি যেমন পরস্পর হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ।

বৈশেষিক মতে জীব সংখ্যায় বহু। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল বা শক্তিকে "অদৃষ্ট" বলা হয়।

---

intellectual, volitional, or emotional qualities as a result of proper collocation of causes and conditions.—*The Cultural Heritage of India*, vol. III, 2nd edition, 1953—*Introduction* by Dr. S. N. Dasgupta, P. 21.

এই অদৃষ্টবশেই জীব সৃষ্টিপ্রবাহে আসিয়া পড়ে এবং জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্মাদির কবলে পতিত হইয়া সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

উপরে উল্লিখিত ছয়টী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানেই জীবের অদৃষ্ট বিনষ্ট হইতে পারে এবং অদৃষ্ট বিনষ্ট হইলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বৈশেষিক মতে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিই হইতেছে মুক্তি।

কণাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বৈশেষিক দর্শনের "তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্—তাঁহার বাক্য বলিয়া আম্নায়ের প্রামাণ্য"—এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কোনও কোনও টীকাকার বলেন—এই সূত্রে "তৎ"-শব্দে ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বৈশেষিক-মতে বিশ্বের সমস্ত বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণু অবিভাজ্য। পরমাণু চারি রকমের—পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু। এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুর রূপ-রসাদি গুণ আছে। পরমাণুসমূহ নিত্য। পরমাণুসমূহের প্রত্যেকেই এক একটী "বিশেষ"—অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এমন কিছু ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা এক জাতীয় পরমাণু হইতে অপর জাতীয় পরমাণুর পার্থক্য জানা যায়। কণাদের দর্শনে এই "বিশেষ" পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে "বৈশেষিক দর্শন" বলা হয়।

যখন সৃষ্টিকাল সমাগত হয়, তখন প্রাক্তন অদৃষ্টবশতঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে। যে যে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া সেই সেই বায়বীয় পরমাণুকে সংযুক্ত করে, সংযুক্ত করিয়া প্রথমে দ্ব্যণুক এবং পরে ক্রমশঃ ত্র্যণুক, চতুরণুক ইত্যাদি ক্রমে বায়ুনামক মহাভূতের উৎপাদন করে। ঐ ভাবেই ক্রমশঃ অগ্নি, জল, পৃথিবী, সেন্দ্রিয় দেহ এবং সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বই অণু হইতে উৎপন্ন হয়। যে অণুতে যে যে রূপ ও রসাদি বিদ্যমান থাকে, সেই সেই রূপ ও রসাদি হইতেই দ্ব্যণুক রূপের ও দ্ব্যণুক রসাদির উদ্ভব হয়; যেমন শ্বেত সূত্র হইতে শ্বেত বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ। কারণদ্রব্যের রূপাদি হইতেই কার্য্যদ্রব্যের রূপাদি জন্মে। ইহাই কণাদের এবং তদনুগতদের অভিমত। (২।২।১২-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর)।

আবার যখন সৃষ্টি-বিনাশের কাল উপস্থিত হয়, তখন এই বিশ্ব বিপরীত ক্রমে পরিণতি লাভ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহাভূত, চতুরণুক, ত্র্যণুক, দ্ব্যণুকাদি ক্রমে অবিভাজ্য পরমাণুতে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাই প্রলয়।

বৈশেষিক-মতে প্রমাণ দুইটী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

কালক্রমে ন্যায়দর্শন বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গে, অথবা বৈশেষিক ন্যায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

### খ। বেদান্তদর্শনে ন্যায়-বৈশেষিকের আলোচনা

ন্যায় ও বৈশেষিক এই উভয়ই পরমাণু-কারণবাদী। এই উভয়ের কেহই ব্রহ্ম-কারণবাদ স্বীকার করেন না। বেদান্তদর্শনে "উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ২।২।১২॥"—ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া

"অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ২।২।১৭ ॥"—ব্রহ্মসূত্র পর্য্যন্ত ছয়টী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ পরমাণু-কারণবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-স্থলে ভাষ্যকারদের যুক্তির মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

বৈশেষিকেরা বলেন—জীবের অদৃষ্টবশতঃই পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয়; তাহার পরে পরমাণুসমূহের সংযোগ ঘটে; তাহার ফলে এই বিশ্বের উৎপত্তি।

ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিব্যাপারই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, জীবের অদৃষ্ট জীবেই থাকুক বা পরমাণুতেই থাকুক, যে-স্থানেই থাকুক না কেন, তাহা তো নিত্যই বর্ত্তমান। নিত্যই যখন বর্ত্তমান, তখন কেবল সৃষ্টিকালেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার হেতু কি? তাহার পূর্ব্বেও তো হইতে পারিত? তাহা হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টিকার্য্য চলিতে থাকিবে, কখনও প্রলয় হইতে পারে না।

বৈশেষিকেরা যে সমবায়-সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাও অসামঞ্জস্যময়; কেননা, তাহাতে অনবস্থা-দোষ দেখা দেয়। যাহাদের পৃথগ্‌ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি-গুণাদি সেই সমস্ত পদার্থের সেই অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের জন্যই যদি "সমবায়"-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে "সমবায়"ও যখন সেইরকমই একটী পদার্থ (অর্থাৎ দ্রব্যব্যতিরেকে সমবায়েরও যখন স্থিতি ও উপলব্ধি হইতে পারে না), তখন তাহারও অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্ব্বাহের জন্য অপর একটী হেতুর আশ্রয়-গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে; আবার সেই কল্পিত হেতুটীর জন্যও সেইরূপ অন্য একটী হেতুর কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে কল্পনার আর শেষ হইতে পারে না বলিয়া অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। আর, যদি বলা যায়—অপৃথক্ সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও জাতি-গুণাদির সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাবের কল্পনা করা উচিত; কিন্তু অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহা অনুভবের বিষয়ীভূত নহে, এইরূপ) একটা "সমবায়" কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা সঙ্গত হয় না।

আবার, বৈশেষিকমতে "সমবায়" সম্বন্ধটী হইতেছে নিত্য। সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে সমবায়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগতেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, বৈশেষিকেরাও জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না; যেহেতু, তাঁহারাও প্রলয় স্বীকার করেন।

বৈশেষিকেরা পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়—এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন এবং এই সমস্ত পরমাণু যে যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট, তাহাও স্বীকার করেন। ইহাও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা। কেননা, রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য। রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য এবং স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ, লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও বৈশেষিকদের অভিপ্রেত বিশেষার্থ ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। এই কারণেও বৈশেষিক-মতের সামঞ্জস্য দেখা যায় না।

পরমাণুসমূহের রূপাদির স্বীকারেই যে দোষ হয়, তাহাই নহে। কারণের গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ, তখন পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকার না করিলেও (পরমাণুসমূহ রূপাদিশূন্য, ইহা স্বীকার করিলেও)

পরমাণুর কার্য্য পৃথিব্যাদিও রূপাদিশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাও অযৌক্তিক ; কেননা, পৃথিব্যাদি দৃশ্যমান্ পদার্থ রূপাদিশূন্য নহে। আবার, এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত যদি পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে। এইরূপে দেখা যায়—বৈশেষিক-মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের ( সাংখ্যের ) পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহার সৎকার্য্যবাদাদি কোনও কোনও অংশ বেদানুগত পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বৈশেষিক-মত কোনও অংশেই শিষ্ট-পরিগৃহীত নহে বলিয়া এবং যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মোক্ষার্থীদের পক্ষে উপেক্ষণীয় *। সূত্রকার ব্যাসদেবও পরমাণুকারণবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ২।২।১৭॥ ব্রহ্মসূত্র॥—কোনও ঋষি পরমাণুকারণবাদের কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব শিষ্টবহির্ভূত বলিয়া পরমাণুবাদ বেদবাদীর অগ্রাহ্য—বিশেষরূপে অনাদরণীয়।"

## গ। সাধারণ আলোচনা

ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত পদার্থসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। সৃষ্টিপ্রসঙ্গেই ঈশ্বরের উল্লেখ। কেবল কর্ম্ম সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না বলিয়া কর্ম্মফলদানার্থ এবং সৃষ্টিকার্য্য-নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্বস্বীকৃত পদার্থ সমূহ ব্যতীত আরও একটা হেতু কল্পনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঈশ্বর হইতেছেন কল্পিত বস্তুমাত্র, বৈদিক ঈশ্বর নহেন।

কণাদের বৈশেষিক-সূত্রে ঈশ্বরের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পরবর্ত্তী কোনও কোনও বৈশেষিকাচার্য্য কণাদের কোনও কোনও উক্তিতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেও বৈশষিক-মতের সৃষ্টি-আদি ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ কোনও স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা যায়—ঈশ্বর-প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের সঙ্গে বেদান্ত-মতের বিশেষ পার্থক্য। বেদান্তমতে ঈশ্বর বা ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক-মতে অচেতন জড় পরমাণুই জগৎ-কারণ।

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব এবং তাঁহার সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু-কারণবাদ শিষ্টগণের উপেক্ষণীয়, অনাদরণীয়। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—ইহা মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে উপেক্ষণীয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ন্যায়-বৈশেষিকের অনুসরণ করিয়া কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। ইহা যে অতি যুক্তিসঙ্গত কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংসার-বন্ধনের মূল হেতু নির্ণীত হইলেই সেই হেতুর নিরাকরণের উপায়—সুতরাং মোক্ষের উপায়—নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকে বন্ধনের মূল হেতুরও উল্লেখ নাই, হেতু-নির্ণয়ের প্রয়াসও দৃষ্ট হয় না। ন্যায়-বৈশেষিকে যে কয়টী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষলাভ হইতে পারে

---

* শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যাবলম্বনে এই আলোচনা লিখিত হইল। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্মও এইরূপই।

বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মত-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই প্রযোজ্য। পদার্থ-সমূহের তত্ত্বজ্ঞানে যে জীবের মোক্ষলাভ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে, অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে, কিছু বলা যায়না। যাহা নিশ্চিত নহে, মোক্ষার্থিগণ কখনও তাহার আদর করিতে পারেন না।

## ৯। পূর্ব্ব-মীমাংসা বা জৈমিনি-দর্শন

মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে মীমাংসা বলে। কোনও শব্দের বা বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং কিরূপ যুক্তি-বিচারে তাহা নির্ণীত হইতে পারে, মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার গ্রন্থে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থকে পূর্ব্বমীমাংসা বলা হয়। "পূর্ব্ব" বলার হেতু এই।

বেদের দুইটী অংশ—পূর্ব্বকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। পূর্ব্বকাণ্ড বা প্রথম ভাগে বৈদিক কর্ম্মাদির কথা বলা হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডে বা শেষভাগে উপনিষৎ বা বেদান্ত। জৈমিনি ক্রিয়াকর্ম্মবহুল পূর্ব্বভাগ সম্বন্ধেই তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মীমাংসা-গ্রন্থকে পূর্ব্বমীমাংসা বলা হয়—বেদের পূর্ব্ব বা প্রথম ভাগ সম্বন্ধে মীমাংসা।

সূত্রকার ব্যাসদেব বেদের উত্তরকাণ্ড বা উপনিষদ্-ভাগ লইয়া আলোচনা করিয়া ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন প্রকটিত করিয়াছেন। এজন্য বেদান্ত-দর্শনকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়—বেদের উত্তর বা শেষ ভাগ সম্বন্ধে মীমাংসা।

জৈমিনি কেবল কর্ম্মকাণ্ড নিয়া আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তকে কর্ম্ম-মীমাংসাও বলা হয়।

যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ার কি ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কোন্ অঙ্গের পরে কোন্ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলই বা কি, মহর্ষি জৈমিনি তাঁহার মীমাংসা-সূত্রে সম্যক্ বিচার-পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

জৈমিনি বেদকে অপৌরুষেয়—অনাদি ও নিত্য—বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; এজন্য জৈমিনি-দর্শনও বৈদিক দর্শন।

কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র বৈদিক কর্ম্মেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক কর্ম্মের অতিরিক্ত জীবের করণীয় আর কিছু নাই। বৈদিক কর্ম্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠানেই পরম-পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। তাঁহার মতে পরম-পুরুষার্থ হইতেছে স্বর্গ-প্রাপ্তি।

জৈমিনির মতে পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎ হইতেছে অনাদি। ইহার ধ্বংস বা প্রলয় নাই। সুতরাং তাঁহার মতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে কোনও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন—একথা স্বীকার করারও কোনও প্রয়োজন নাই।

জৈমিনি পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম স্বীকার করেন। এই কর্ম্মও তাঁহার মতে নিজেই নিজের ফলদাতা ; সুতরাং কর্ম্মফলদাতা কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও অনাবশ্যক।

জৈমিনির মতে আত্মা বা জীবাত্মা অস্পষ্ট, নিত্য, সংখ্যায় বহু। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মীমাংসাসূত্রে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। জীব কি বিভু, না কি মধ্যমাকার, না কি অণু—তৎসম্বন্ধে জৈমিনিও কিছু বলেন নাই, মীমাংসা-সূত্রের টীকাকার শবরও কিছু বলেন নাই। অবশ্য পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ নৈয়ায়িকদের অনুসরণে জীবাত্মাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বলিয়া গিয়াছেন। মীমাংসা-মতে দেহেন্দ্রিয়াদিই জীব নহে; জীব হইতেছে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ একটী বস্তু।

জীব যে কর্ম্ম করে, তাহার অনুরূপ দেহই লাভ করিয়া থাকে। সাধু বা পুণ্য কর্ম্মের ফলে মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি লাভ করিতে পারে।

যদি বলা যায়—কার্য্য ও কারণ অব্যবহিত থাকিলেই তাহাদের কার্য্য-কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। জীব জীবিত অবস্থায় যে পুণ্যকর্ম্ম করে, তাহার ফলে মৃত্যুর পরে কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে? পুণ্যকর্ম্ম করার পরে—হয়তো বহুকাল পরে—লোকের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পরে হয় স্বর্গপ্রাপ্তি। সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের বা ফলের সহিত তাহার কারণরূপে কথিত পুণ্যকর্ম্মের অনেক ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় পুণ্যকর্ম্ম কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে? কোনও কোনও কর্ম্মের ফল হয়তো সঙ্গে-সঙ্গেই পাওয়া যায়; এরূপ-স্থলে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও কর্ম্মের ফল, হয়তো জীবিত থাকা কালেই, কর্ম্মানুষ্ঠানের অনেক পরে পাওয়া যায়; এরূপ স্থলেই বা কর্ম্ম ও তাহার ফলের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে জৈমিনি বলেন—কর্ম্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠানের ফলে একটা শক্তি বা প্রভাব জন্মে। জৈমিনির পরিভাষায় এই শক্তি বা প্রভাবকে বলা হয় "অপূর্ব্ব"। এই "অপূর্ব্ব," কর্ম্মানুষ্ঠাতা জীবের মধ্যেই থাকে—ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। যে কর্ম্মের ফল মৃত্যুর পরে পাওয়া যায়, সেই কর্ম্মজাত "অপূর্ব্ব" মৃত্যুর পরেও জীবের মধ্যে থাকে এবং যথাসময়ে ফলদান করিয়া থাকে। এই "অপূর্ব্বই" হইতেছে কর্ম্মফলের অব্যবহিত কারণ।

কর্ম্ম দুই রকমের—বিহিত কর্ম্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম। দর্শপৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম হইতেছে বিহিত কর্ম্ম। আর, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্যাদি হইতেছে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি-আদি শুভ ফল পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ কর্ম্মের করণে প্রত্যবায় জন্মে, নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, মৃত্যুর পরে নীচ যোনিতে জন্ম লাভ হয়।

বেদবিহিত কর্ম্ম আবার তিন রকমের—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। সকলের পক্ষেই যথাবিহিত নিত্যকর্ম্ম অবশ্য করণীয়। নৈমিত্তিক কর্ম্ম কোনও বিশেষ উপলক্ষ্যে অবশ্য করণীয়। আর, কাম্যকর্ম্ম হইতেছে ঐচ্ছিক, অবশ্য-করণীয় নহে। কাহারও ইচ্ছা হইলে বৈষয়িক কোনও ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যথাবিহিত কাম্য কর্ম্ম করিতে পারে।

মীমাংসা-দর্শনের মতে বৈদিক দেবতাদের স্থান অতি গৌণ। যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, জৈমিনি-দর্শনে সে সকল দেবতার প্রাধান্য নাই; প্রাধান্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের। "স্বর্গকামো যজেত—যিনি

স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করিবেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন”—ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে বুঝা যায়—যজ্ঞই ফলদান করিতে পারে ; যজ্ঞের দ্রব্য এবং যজ্ঞের দেবতা হইতেছে যজ্ঞের গুণভূত। জৈমিনির মতে দেবতা হইতেছেন মন্ত্রাত্মক, অর্থাৎ যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রই হইতেছে সেই দেবতা ; মন্ত্রাতিরিক্ত কোনও দেবতা নাই। ঐ মন্ত্র হইতেছে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গবিশেষ ; সুতরাং মন্ত্রাত্মক দেবতাও হইতেছেন কর্ম্মের অঙ্গ। আর কর্ম্ম হইতেছে অঙ্গী ; অঙ্গ অপেক্ষা অঙ্গীরই প্রাধান্য। যে-যজ্ঞের জন্য যে-দ্রব্যের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই দ্রব্য ব্যতীত যেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অনুষ্ঠিত হইলেও যেমন সেই যজ্ঞ ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণাদি ব্যতীতও যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় না।

## খ। আলোচনা

কয়েকটী বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের সহিত পূর্ব্বমীমাংসার গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বমীমাংসার মতে এই দৃশ্যমান্ জগৎ স্বষ্টবস্তু নহে ; ইহা অনাদি কাল হইতেই এই রূপে অবস্থিত এবং অনন্তকাল পর্য্যন্তই এই রূপে থাকিবে। ইহার ধ্বংস বা প্রলয় নাই।

কিন্তু বেদান্ত-মতে এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব হইতেছে সৃষ্ট বস্তু ; ইহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ বা প্রলয় আছে। সৃষ্টিপ্রবাহ নিত্য এবং অনাদি হইলেও বিশ্ব কিন্তু অনিত্য এবং সাদি। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি—এইরূপ ক্রম অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বমীমাংসা-মতে বিশ্ব সৃষ্টবস্তু নহে বলিয়া এবং অনাদি বলিয়া বিশ্বের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিতে পারে না ; সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কল্পনা করারও কোনও প্রয়োজন নাই। আবার, কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করারও কোনও প্রয়োজন নাই ; কেননা, কর্ম্ম নিজেই নিজের ফল দান করিতে সমর্থ।

কিন্তু বেদান্ত বলেন—বিশ্ব যখন অনাদি নহে, বিশ্ব যখন সৃষ্ট বস্তু, বিশ্বের ধ্বংস বা প্রলয়ও যখন আছে এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে ইহার স্থিতিও যখন দৃষ্ট হয়, আবার জড়রূপ অচেতন বিশ্ব যখন নিজে নিজের সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারে না, স্থিতি-বিধানও করিতে পারে না, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা একজন আছেন এবং তিনি হইতেছেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ ; কেননা, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ না থাকিলে এই অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি তাঁহাদ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। তিনি হইতেছেন—ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র নহে। অপৌরুষেয় এবং অনাদি বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে—অনাদি কাল হইতে বিরাজমান স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ এবং সর্ব্বজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, তাহাও বেদান্ত হইতে জানা যায়। এজন্য বেদান্ত-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২-ব্রহ্মসূত্র।” আবার, কর্ম্ম অচেতন জড়বস্তু বলিয়া নিজে নিজের ফল দান করিতে পারে না। কর্ম্মফলদাতাও ব্রহ্মই—ইহাও বেদান্ত-শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন এবং তদনুসারে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন—“ফলমতঃ উপপত্তেঃ ॥ ৩।২।৩৭-ব্রহ্মসূত্র।”

পূর্ব্বমীমাংসা-মতে বেদবিহিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হইতে পারে এবং এই স্বর্গাদি-প্রাপ্তিই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ ; ইহার উপরে আর কোনও পুরুষার্থ নাই।

কিন্তু বেদান্ত-মতে, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হইতে পারে সত্য ; কিন্তু স্বর্গাদি-প্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ নহে। স্বর্গে সুখভোগ আছে সত্য ; কিন্তু সেই সুখভোগ অনিত্য। পুণ্য কর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে স্বর্গলোক হইতে আবার চলিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" স্বর্গ কেন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জন-তপ-আদি যত লোক আছে, পুণ্যক্ষয়ে সে সমস্ত লোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ॥ গীতা ॥ ৮।১৬ ॥" যাহা অনিত্য, তাহা কখনও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই পরম-পুরুষার্থতা ; কেননা, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, পুনর্জ্জন্ম হয় না। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥ ৮।১৬ ॥", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ৪।৪।২২-ব্রহ্মসূত্র।" আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে কেবল যে সংসারে পুনরাবর্ত্তন আত্যন্তিক ভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তাহাই নহে, তাহাতে পরমানন্দ লাভও হইয়া থাকে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৭ ॥" আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তি এবং নিত্য-পরমানন্দ-লাভ—ইহাই পরম-পুরুষার্থ। স্বর্গাদিতে আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিও নাই, নিত্য-পরমানন্দ-লাভও নাই ; সুতরাং স্বর্গাদি-প্রাপ্তি কখনও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না।

## গ। পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ

এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্ব-মীমাংসার অনেক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-বিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জৈমিনি বেদের পূর্ব্বকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়—পূর্ব্বমীমাংসার সহিত বেদান্তের বা বেদের উত্তরকাণ্ডের বিরোধ রহিয়াছে। তাহা হইলে কি পূর্ব্বকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড পরস্পর-বিরোধী ?

বেদের পূর্ব্বকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড যদি পৌরুষেয় হইত এবং দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি লিখিত হইত, তাহা হইলে লেখকদ্বয় বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলে গ্রন্থদ্বয়ও পরস্পর-বিরোধী হইতে পারিত। অথবা, উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক লিখিত হইলেও পূর্ব্ব-গ্রন্থ লেখার পরে পর-গ্রন্থ লেখার সময়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইলেও উভয় গ্রন্থের মধ্যে মত-বিরোধ হইতে পারে, কিম্বা ভ্রম-প্রমদাদি-বশতঃও ঐরূপ হইতে পারে ; কেননা, সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তিই ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষের উর্দ্ধে নহে। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায়—বেদাদি-শাস্ত্র অপৌরুষেয়, পরব্রহ্মের নিশ্বাসরূপে অনায়াসে প্রকটিত। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্য এব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২।৪।১০ ॥" অপৌরুষেয় বেদাদি শাস্ত্র পরব্রহ্মেরই বাক্য। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্মে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না। "ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১০২ ॥" বেদের

পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড দুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে ; একই বেদের দুইটী অংশমাত্র এবং পরব্রহ্মেরই বাক্য এবং ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত। তথাপি তাহাদের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয় কেন ?

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিতে বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। বেদান্ত-দর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১।১।১ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত "অথ"-শব্দের তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"যতস্তত্রাথ-শব্দ আনন্তর্য্যে, অতঃ শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে বর্ত্ততে। তস্মাদথেতি স্বাধ্যায়ক্রমতঃ প্রাক্ প্রাপ্তকর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসয়া সম্যক্ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরমিত্যর্থঃ। অত ইতি তৎক্রমতঃ সমনন্তরং প্রাপ্তব্রহ্মকাণ্ডে তু উত্তরমীমাংসয়া নির্ণেয়-সম্যগর্থেঽধীতচরাদ্ যৎ কিঞ্চিদনুসংহিতার্থাৎ কুতশ্চিদ্বাক্যাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বমীমাংসায়াঃ পূর্ব্বপক্ষত্বেনোত্তরমীমাংসানির্ণয়োত্তরপক্ষেঽস্মিন্নবশ্যাপেক্ষ্যত্বাদবিরুদ্ধাংশে সহায়ত্বাৎ কর্ম্মণঃ শান্ত্যাদিলক্ষণসত্ত্বশুদ্ধিহেতুত্বাচ্চ তদনন্তরমিত্যেব লভ্যম্। বাক্যানি চৈতানি—'তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতঃ লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি ( ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৬ ॥'-ইতি ; 'ন স পুনরাবর্ত্ততে'-ইতি, 'স চানন্ত্যায় কল্পতে ( শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫।৯॥ )'-ইতি, 'নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি ( মুণ্ডক ॥ ৩।১।৩॥ )', 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ গীতা ॥ ১৪।২॥"-পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর সংস্করণ। ৩৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা ॥

মর্ম্মানুবাদ। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-এই ব্রহ্মসূত্রের "অথ"-শব্দ আনন্তর্য্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ( অর্থ—অতঃপর )। "অতঃ"-শব্দ পূর্ব্বকথনের হেতুভাবে বিদ্যমান। অতএব, "অথ"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—বেদপাঠ-ক্রমে প্রথম-প্রাপ্ত কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্ব-মীমাংসাদ্বারা সম্যক্ কর্ম্মজ্ঞানের পরে ( অর্থাৎ বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমে আছে পূর্ব্বকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড হইতেই বেদপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। পূর্ব্ব-মীমাংসার সহায়তায় কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্ম-বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান লাভের পরে ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে হয় )। আর, সূত্রস্থিত "অতঃ"-শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ—"অতঃ"-শব্দের অর্থ—"এই হেতুবশতঃ।" কি সেই হেতু ? হেতুটী এই—বেদপাঠ-ক্রমে পর-প্রাপ্ত ( কর্ম্মকাণ্ড-অধ্যয়নের পরে প্রাপ্ত ) ব্রহ্মকাণ্ডে ( উত্তরকাণ্ডে )—উত্তর-মীমাংসাদ্বারা যাহার অর্থ সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হইতে পারে, সেই ব্রহ্মকাণ্ডে, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকাণ্ড অধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্ব-মীমাংসার সহায়তায় পূর্ব্বে যে পূর্ব্বকাণ্ডের বা কর্ম্মকাণ্ডের অধ্যয়ন করা হইয়াছিল, সেই অধ্যয়ন-কালে কোনও স্থলে কোনও বাক্যের যে অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই অনুসংহিতার্থ বাক্যই ( যে বাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই বাক্যই, হইতেছে হেতু। ( বিষয়টী পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমে দেখা যাউক—"অনুসংহিতার্থ বাক্য" বলিতে কি বুঝায় ? অনুসংহিত=অনু+সম্+ধা+ক্ত প্রত্যয়। অনু-পূর্ব্বক সম্-পূর্ব্বক ধা-ধাতুর অর্থ হইতেছে অনুসন্ধান। তাহা হইলে "অনুসংহিত"-শব্দের অর্থ হইল—যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। "অনুসংহিতার্থ"-শব্দটী হইতেছে বহুব্রীহি-সমাসনিষ্পন্ন এবং "বাক্য"-শব্দের

বিশেষণ। যাহার অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেই বাক্য হইতেছে—অনুসংহিতার্থ বাক্য; যে-বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাই "অনুসংহিতার্থ বাক্য।" এক্ষণে দেখিতে হইবে—কোথায় এবং কেন সেই বাক্যের অর্থ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাসার সহায়তায়—বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা পূর্ব্বকাণ্ড অধ্যয়নের সময় স্বভাবতঃই কয়েকটী বিষয়ে চিত্তে সন্দেহ জাগিতে পারে। যেমন—জৈমিনি বলিয়াছেন—বিশ্ব অনাদি, ইহা সৃষ্ট বস্তু নহে, ইহার প্রলয় নাই অর্থাৎ ধ্বংস নাই। এ-স্থলে সন্দেহ জাগে এই যে—বিশ্বের যদি ধ্বংস না থাকে, তাহা হইলে তাহার কোনও অংশেরও ধ্বংস থাকিতে পারে না; কিন্তু বিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংস না দেখিলেও আংশিক ধ্বংস আমরা দেখিতেছি। জীবদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভূমিখণ্ড-বিশেষের ধ্বংসও দৃষ্ট হয়। যাহার অংশের ধ্বংস দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপে সামগ্রিক-ধ্বংসহীন হইতে পারে? বিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংস বা প্রলয় কি তবে আছে? বেদের যে বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যদি প্রলয় থাকে, তাহা হইলে তো প্রলয়ের পরে আবার বিশ্বের সৃষ্টি হওয়ার কথা। কে সৃষ্টিকর্ত্তা? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকিবে, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও থাকিবে; নচেৎ এই অনন্ত বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি অসম্ভব? কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর কি তবে আছেন? জৈমিনি আরও বলিয়াছেন—কর্ম্ম নিজেই নিজের ফলদানে সমর্থ। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মেরই তো ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা দেখি, আমাদের সকল কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না; আকাশের চাঁদ ধরিবার প্রয়াস তো ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে কি কর্ম্মের ফলদাতা কেহ আছেন? যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন এবং বিচারবুদ্ধিতে সুনিপুণই হইবেন; নচেৎ কর্ম্মানুরূপ ফল দিবেন কিরূপে? বেদের যে বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি কর্ম্মকেই ফলদাতা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? জৈমিনি আরও বলিয়াছেন—স্বর্গপ্রাপ্তিই পরম-পুরুষার্থ। কিন্তু যাহা পরম-পুরুষার্থ, তাহা অবশ্যই নিত্য এবং ধ্বংসহীন হইবে। কিন্তু স্বর্গ নিত্য কিনা? স্বর্গ তো বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত; বিশ্বের যখন অন্ততঃ আংশিক ধ্বংস দৃষ্ট হয়, তখন স্বর্গেরও অন্ততঃ আংশিক ধ্বংস অনুমিত হইতে পারে, সামগ্রিক ধ্বংসও অনুমিত হইতে পারে। স্বর্গই যদি ধ্বংসশীল হয়, তাহা হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি তো নিত্যবস্তু হইতে পারে না, সুতরাং তাহা পরম-পুরুর্ষার্থও হইতে পারে না। যে বেদবাক্যকে অবলম্বন করিয়া জৈমিনি স্বর্গপ্রাপ্তিকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ কি? এইরূপে পূর্ব্বমীমাংসার আনুগত্যে বেদের পূর্ব্বকাণ্ডের অধ্যয়ন-কালে কোনও কোনও বেদবাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে। উত্তরকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ডের অধ্যয়ন-কালে আশা জন্মিতে পারে—উত্তরমীমাংসার সহায়তায় ব্রহ্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিলে সন্দেহের নিরসন হইতে পারে, পূর্ব্বকাণ্ডের যে সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রকৃত অর্থ জানা যাইতে পারে। তাই উত্তর-মীমাংসার বা বেদান্ত-দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রই হইতেছে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"—পূর্ব্বকাণ্ড অধ্যয়নের পরে, পূর্ব্বকাণ্ডের যে সকল বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত বাক্যকে হেতু করিয়াই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম কি কেহ আছেন? উত্তরমীমাংসা বলিতেছেন—"আছেন। ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। জন্মাদ্যস্য যতঃ।" এই একটী উত্তরেই

অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। এই উত্তর হইতে জানা গেল— বিশ্ব অনাদি নহে, অসৃষ্ট নহে, ধ্বংসহীনও নহে ; বিশ্বের সৃষ্টি আছে, প্রলয় আছে এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তাও আছেন। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা হইতেছেন—ব্রহ্ম—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রহ্ম। পরে বলা হইয়াছে—কর্ম্ম কর্ম্মের ফলদাতা নহে, কর্ম্মফলদাতাও ব্রহ্ম। "ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র।" আবার, বিশ্ব যখন অনাদি নহে এবং ধ্বংসশূন্য নহে, তখন বিশ্বান্তর্গত স্বর্গও অনাদি এবং ধ্বংসহীন নহে ; সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তিও নিত্যবস্তু নহে। স্বর্গপ্রাপ্তি যখন নিত্যবস্তু নহে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে—স্বর্গ হইতেও পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে, পুনর্জন্ম হইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল—যে পূর্ব্বমীমাংসার সহায়তায় বেদের পূর্ব্বকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড অধীত হয়, তাহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষমাত্র এবং যে উত্তর-মীমাংসার সহায়তায় বেদের উত্তর-কাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড অধীত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। ইহার পরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—, পূর্ব্বমীমাংসা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তর-মীমাংসা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। সুতরাং উত্তর-পক্ষ অবশ্যই পূর্ব্বপক্ষের অপেক্ষা রাখিবেন ( কেননা, পূর্ব্বপক্ষের উক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াই উত্তর-পক্ষ মীমাংসা করিয়া থাকেন।) যে বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, সেই বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ অবশ্য উত্তর-পক্ষের সহায়কও হয়েন ; ( যেমন, যজ্ঞাদি-পুণ্যকর্ম্মের ফলে যে স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে উভয়-পক্ষই একমত )। আবার, যথাবিহিত ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের শান্তি জন্মিতে পারে, চিত্তশুদ্ধিও জন্মিতে পারে। এইরূপে চিত্তশুদ্ধির হেতুরূপ পূর্ব্বকাণ্ডের অধ্যয়নের পরেই উত্তর-কাণ্ডের অধ্যয়নারম্ভ। ইহাই "অথ"-শব্দের তাৎপর্য্য।

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থক শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ বলেন—"ইহলোকে সেবাদি বা কৃষি-আদি কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত শস্যাদি-লোক যেমন ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, যাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্য-কামাদি-গুণসমূহকে অবগত না হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের সমস্ত লোকে ( ভোগভূমিতে ) অ-কামাচার ( স্বাতন্ত্র্যাভাব ) হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাঁহারা আত্মাকে এবং সত্যকামাদি-গুণসমূহকে অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সমস্ত লোকে তাঁহাদের কামাচার ( স্বাতন্ত্র্য ) হইয়া থাকে।"—ইতি; "তিনি পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না ;" "( যিনি আত্মাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন ) তিনি অনন্ত গুণের যোগ্য হয়েন ( শ্বেতাশ্বতর ) ;" "তিনি নিরুপাধি হইয়া পরম-সাম্য লাভ করেন (মুণ্ডক)" ; "যাঁহারা এই জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা আমার ( পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ) সাধর্ম্ম্য লাভ করেন ; সৃষ্টিকালেও তাঁহাদের আর জন্ম হয় না, প্রলয়-কালেও তাঁহারা ব্যথিত হয়েন না ( গীতা )।"—ইত্যাদি। ( এই সকল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে বলা হইল—স্বর্গ হইতেও পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় ; কিন্তু আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানিলে—পাইলে—আর পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্মকে জানা বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ, স্বর্গ-প্রাপ্তি পরম-পুরুষার্থ নহে। এ-স্থলেও পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যায়। এই সকল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতেছে বেদের উত্তর-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তর-মীমাংসার আনুগত্যেই—এই সকল বাক্যের অর্থ-নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা যে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তর-মীমাংসা যে উত্তর-পক্ষ, তাহাই নির্দ্ধারিত হইল )।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১।১।১-ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে একস্থলে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—

"মীমাংসা-পূর্ব্বভাগজ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থিরফলত্বাৎ উপরিতনভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য অনন্তাক্ষয়-ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাৎ অনন্তরং ততএব হেতোর্ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ বৃত্তিকারঃ—'বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা'-ইতি।—মীমাংসার পূর্ব্বভাগে ( পূর্ব্ব-মীমাংসায় ) কর্ম্মফলের অল্পত্ব ও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায় এবং উত্তরভাগে ( ব্রহ্ম-মীমাংসায় ) ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের অনন্তত্ব ও অক্ষয়ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। আদি-বৃত্তিকার আচার্য্য বোধায়নও বলিয়াছেন—'পূর্ব্বসম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়।'-ইতি।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"তদেবং সম্যক্ কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানানন্তরং ব্রহ্ম-কাণ্ডগতেষু কেষু চিৎ বাক্যেষু স্বর্গাদ্যানন্দস্য বস্তুবিচারেণ দুঃখরূপত্ব-ব্যভিচারিসত্তাকত্ব-জ্ঞানপূর্ব্বকং ব্রহ্মণস্ত্ব-ব্যভিচারিপরতমানন্দত্বেন সত্যত্ব-জ্ঞানমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং হেতুরিতি॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর॥ ৩৬৯ পৃষ্ঠা॥—এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সম্যক্ জ্ঞানলাভের পরে, ব্রহ্মকাণ্ডগত কোনও কোনও বাক্যে বস্তুবিচার-দ্বারা কর্ম্মপ্রাপ্য স্বর্গাদি সুখের দুঃখরূপত্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান জন্মিবার পরে, ব্রহ্মবস্তুই যে অব্যভিচারী পরমতম আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ—এই জ্ঞানই হইতেছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা গেল—জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষ এবং ব্যাসদেবের উত্তর-মীমাংসা হইতেছে উত্তর-পক্ষ। পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তর-পক্ষ একই শাস্ত্রের অন্তর্গত থাকে। শ্রীপাদ রামানুজও আদিবৃত্তিকার বোধায়নের উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক একথাই বলিয়াছেন—

বক্ষ্যতি চ কর্ম্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়োরৈকশাস্ত্র্যং—"সংহিতমেতৎ শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেতি শাস্ত্রৈকত্বসিদ্ধিঃ"-ইতি। অতঃ প্রতিপিপাদয়িতার্থভেদেন ষট্কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসয়োর্ভেদঃ। মীমাংসাশাস্ত্রং – "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"-ইত্যারভ্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"-ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমম্॥ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য।—কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা যে একই শাস্ত্র, তাহা ( বৃত্তিকার বোধায়নও ) বলিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়াছেন—"এই শারীরকসূত্র ( ব্রহ্মমীমাংসা বা উত্তর-মীমাংসা ) জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসার সহিত ( বা সম্মিলিত ) হইয়া 'ষোড়শাধ্যায়'-(১) পূর্ণ। অতএব উভয়ই ( কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা ) এক শাস্ত্র—ইহা সিদ্ধ হয়।" যেরূপ প্রতিপাদ্যবিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্ক-(২) ও

---

(১) জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; আর, বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত; সুতরাং উভয় মীমাংসার মিলিত অধ্যায়-সংখ্যা হইতেছে ষোড়শ।

(২) পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম ছয় অধ্যায়কে প্রথম "ষট্ক" এবং দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়কে দ্বিতীয় "ষট্ক" বলা হয়; সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায়ে দুইটী "ষট্ক।" উত্তর-মীমাংসায় এইরূপ "ষট্ক"-ভেদ নাই; কেবল "অধ্যায়"-ভেদ আছে—মোট চারিটী অধ্যায়।

অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ভেদও সেইরূপ। পূর্ব্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-মীমাংসার সর্ব্বশেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সূত্রসমষ্টি একই মীমাংসা-শাস্ত্র ; সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যাদিরূপ বিশেষ-ক্রমযুক্তমাত্র।— মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা হইতেছে একই মীমাংসা-গ্রন্থের দুইটী অংশমাত্র। লেখক ভিন্ন হইলেও গ্রন্থের একত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রশ্নকর্ত্তা এবং উত্তরদাতা সাধারণতঃ দুই জনই হয়েন ; কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের উপলক্ষ্যে যে তত্ত্বটী অভিব্যক্ত হয়, তাহা ভিন্ন নহে ; তাহা একই। প্রতিপাদ্য বিষয়ের একত্বে গ্রন্থের একত্ব।

তদ্রূপ, বেদের পূর্ব্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড, বা কর্ম্মকাণ্ড এবং ব্রহ্মকাণ্ড—এই দুইটী কাণ্ডও একই বেদের দুইটী অংশ। পূর্ব্বকাণ্ডের পর্য্যবসান উত্তরকাণ্ডে ; উত্তরকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইতেছেন পরব্রহ্ম ; সুতরাং সমগ্র বেদই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বকাণ্ড-সম্বন্ধে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" বলিয়াও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।"

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, বেদের উত্তরকাণ্ড হইতেছে পূর্ব্বকাণ্ডের বিরোধী। কেননা, পূর্ব্বকাণ্ডে যজ্ঞাদি-কর্ম্মের বিধান দেওয়া হইয়াছে এবং যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে ; কিন্তু উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ —যজ্ঞাদি কর্ম্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে অশক্ত নৌকার তুল্য।" ইহাদ্বারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিরোধিতাই প্রকাশ পাইতেছে।

এ-স্থলে বক্তব্য এই। পূর্ব্বকাণ্ডে যজ্ঞাদির যে ফলের কথা বলা হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডে যদি তাহা নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলেই উত্তর-কাণ্ডকে পূর্ব্বকাণ্ডের বিরোধী বলা সঙ্গত হইত। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যে স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি হয়, তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে যেমন বলা হইয়াছে, উত্তর-কাণ্ডেও তেমনি বলা হইয়াছে। "তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ১।২।১॥ —ঋগ্বেদাদি-নামক মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহা সত্য এবং পুরুষার্থ-সাধক। সেই বেদবিহিত ঋষিদৃষ্ট কর্ম্ম-সমূহ ত্রেতাযুগে বহুলরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব তোমরা যথাযথ কর্ম্মফলকামী হইয়া সেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদের পন্থা অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির সাধক।" ইহার পরে বলা হইয়াছে—"এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধি-বাসঃ॥ মুণ্ডক॥ ১।২।৫॥ —যে অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অগ্নির জাজ্বল্যমান জিহ্বাতে যথাকালে আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যানুষ্ঠান করেন, সেই যজমানকে এই আহুতিসকল সূর্য্যরশ্মিরূপে পরিণত হইয়া বহন করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যায়, যে স্থানে দেবাধিপতি ইন্দ্র বাস করিতেছেন, অগ্নিহোত্রীর আহুতিসমূহ যজমানকে লইয়া সেই স্থানে গমন করে।"; "ত্রহেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥ মুণ্ডক॥ ১।২।৬॥ —এই দীপ্তিশালী আহুতি-

সকল 'এস, এস' বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক 'এই পবিত্র ব্রহ্মলোকই তোমাদের যজ্ঞফলস্বরূপ'—এই প্রকার প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে সৎকার করিয়া অগ্নিহোত্রযজ্ঞকারীকে সূর্য্যরশ্মিসহকারে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।"—শঙ্কর-ভাষ্যানুগত্যে শ্রীল প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত অনুবাদ।

ইহার পরেই অবশ্য বলা হইয়াছে—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দতি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।৭ ॥ —ষোড়শ ঋত্বিজ (পুরোহিত), পত্নী এবং স্বয়ং যজমান—এই অষ্টাদশাশ্রয় কর্ম্মাঙ্গভূত-যজ্ঞসমূহ বিনাশী এবং অদৃঢ় নৌকাতুল্য। যে সমস্ত মূঢ় অবিবেকিগণ এতাদৃশ যজ্ঞসকলকে শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অভিনন্দিত করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।" "অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।৮ ॥ —যাহারা অবিদ্যাগ্রস্ত এবং অবিবেকী, তাহারাই 'সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়াছি' বলিয়া অভিমান পোষণ করে এবং জরা-রোগাদি অনেক অনর্থদ্বারা আবৃত হইয়া বিভ্রান্ত হয়। যেমন চক্ষুর্হীন ব্যক্তিদ্বারা নীয়মান অপর চক্ষুর্বিহীন ব্যক্তি গর্ত্ত বা কণ্টকাদির মধ্যে পতিত হয়, তেমনি অজ্ঞানী ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদি-লোকে নীত হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে পতিত হয়।" "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।৯ ॥ —অবিদ্যাপরিভূত অজ্ঞানী ব্যক্তিরা 'আমরাই কৃতার্থ'—এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে। কারণ, কর্ম্মফলে অনুরাগবশতঃ ইহারা প্রকৃত বস্তু জানিতে পারে না। তাই কর্ম্মফলে অনুরাগবশতঃ দুঃখার্ত্ত হইয়া কর্ম্মফল প্রক্ষীণ হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।" "ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।১০ ॥ —যাহারা পুত্র, পশু ও বন্ধু প্রভৃতিতে প্রমুগ্ধ, তাহারা যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম ও দীর্ঘিকা, কূপ ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাই পুরুষার্থসাধন প্রধান কর্ম্ম মনে করিয়া আত্মজ্ঞানাখ্য শ্রেয়ঃসাধন বস্তুকে জানিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা ভোগায়তন স্বর্গোপরি বাস করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি, অথবা ইহা হইতেও অধোবর্ত্তী তির্য্যক্ ও নরকাদিরূপ নানা অবস্থাতে প্রবেশ করে।" —শ্রীল প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত অনুবাদ।

এইরূপে দেখা গেল—বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যাহা বলা হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডেও তাহাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠানজাত ফল অনিত্য; যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের বা পরকালের অনিত্য ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় বটে; কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই যে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহাও উত্তরকাণ্ডে বলা হইয়াছে।

### ঘ। কর্ম্মকাণ্ডের সার্থকতা

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে যদি সংসার-বন্ধনই ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডের বিধানই বা কেন দেওয়া হইল ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। বেদে নানারকমের উপদেশ আছে। অধিকারভেদে, লোকের চিত্তের অবস্থা-ভেদে উপদেশের ভেদ। বৈষয়িক অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য, কিম্বা পরকালে স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগের জন্য যাঁহারা ব্যাকুল, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই, এমন কি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহাও যাঁহারা জানেন না, বা জানিতে ইচ্ছুকও নহেন, তাঁহাদের জন্যই বেদের পূর্ব্বকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ড। বেদবিহিত কর্ম্মের যথাবিহিত অনুষ্ঠানে ইহকাল-ভোগ্য অভীষ্ট বস্তু লাভ হইতে পারে—ইহা জানিয়া দেহসুখ-সর্ব্বস্ব কোনও লোক যদি যথাবিধানে অভীষ্ট-দায়ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়েন, * তাহা হইলে বেদে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিতে পারে। সেই বিশ্বাসের বশে তিনি স্বর্গ-প্রাপক যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করিতে পারেন ; স্বর্গসুখও পরকালের দেহের সুখই। যথাবিহিত ভাবে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধির অনুকূল গুণাদিরও আবির্ভাব হইতে পারে। চিত্তের চঞ্চলতা প্রশমিত হইলেই নিজের অবস্থা-সম্বন্ধে, বৈষয়িক ও স্বর্গাদি-লোকের সুখের স্বরূপ-সম্বন্ধে লোকের অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে এবং তাহার ফলেই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাও জাগিতে পারে। এই অনুসন্ধিৎসাতেই কর্ম্মকাণ্ডের পর্য্যবসান। বেদে যদি অভীষ্ট-দায়ক যজ্ঞাদি-কর্ম্মের উপদেশ না থাকিত, তাহা হইলে ভোগবাসনা-সর্ব্বস্ব একান্ত বহির্ম্মুখ লোকগণের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ-জ্ঞাপক বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকিত না, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে এবং ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকিত না। ভোগবাসনা-পূর্ত্তির জন্য যথেচ্ছ প্রয়াসে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহেই ভাসিয়া যাইতেন। কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এইরূপ উদ্দেশ্যে কর্ম্মকাণ্ড বিহিত হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধী বলা যায় না। বস্তুতঃ, দেহসুখ-সর্ব্বস্ব লোকগণের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—মিষ্ট লড্ডুকাদির লোভ দেখাইয়া পিতামাতা অজ্ঞ শিশুকে ঔষধ সেবন করান। ঔষধ-সেবন করিয়া শিশু লড্ডুকও পায়, রোগ হইতেও মুক্ত হয়। এ-স্থলে লড্ডুকই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রোগমুক্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তাহার যখন জ্ঞান জন্মে, তখন সে নিজেই রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবন করে, লড্ডুক-প্রাপ্তির আশা করে না। তদ্রূপ, ভোগাসক্ত অজ্ঞ লোকগণ স্বর্গাদি-লোকের সুখপ্রাপ্তির লোভেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে ; কর্ম্মের ফল পায় ; কিন্তু এই ফলই কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, ইহা প্রলোভনমাত্র। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শাস্ত্রাদির কিছু জ্ঞান লাভ করিলে তাহারা ফলপ্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করে ; তখন তাহারা নৈষ্কর্ম্ম্য মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

---

* আজকাল কেহ কেহ যে কর্ম্মকাণ্ডের ফল পায়েন না, তাহার হেতু কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা নহে ; কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে ত্রুটিই তাহার হেতু। মন্ত্রাদির উচ্চারণে, ক্রমরক্ষণাদিতে, বেদবিহিত দ্রব্যাদির সংগ্রহাদিতে অনেক ত্রুটি থাকে ; সর্ব্বত্র উপযুক্ত পুরোহিতও পাওয়া যায় না, কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী যজমানও পাওয়া যায় না। এ-সমস্ত কারণে অনেক ত্রুটি জন্মে ; তাহাতেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না ; কোনও কোনও স্থলে বা বিপরীত ফলও জন্মিতে পারে।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্ম্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নিষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥
—শ্রীভা. ১১।৩।৪৪-৪৬॥

বস্তুতঃ, কর্ম্মকাণ্ড কি জ্ঞানকাণ্ড—বেদের উভয় কাণ্ডের, বা সমগ্র বেদের তাৎপর্য্যই হইতেছে পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত।

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেত্বহম্ ॥ শ্রীভা. ১১।২১।৪২-৪৩ ॥

—বেদাদি সম্বন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—(বৃহতীনামক বেদের ছন্দবিশেষ, কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্যদ্বারা কাহার বিধান করেন ? (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন ? (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (তর্কবিতর্ক) করেন ?—এ-সমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন, এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্ক-দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন।"

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ শ্রীভা. ১।২।২৭-২৮॥

—সকল বেদের তাৎপর্য্যই বাসুদেব। বেদে যে যজ্ঞের কথা আছে ? যজ্ঞও বাসুদেবারাধনার জন্যই ; এজন্য যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। যোগে যে প্রাণায়ামাদির কথা আছে ? প্রাণায়ামাদিও বাসুদেব-প্রাপ্তির উপায়-বিশেষই ; সুতরাং উহার তাৎপর্য্যও বাসুদেবই। বৈদিকী ক্রিয়াদির তাৎপর্য্যও বাসুদেব ; জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম—সমস্তই বাসুদেবপর ; এই সমস্তেরই (অথবা জীবের) গতিই বাসুদেবের দিকে।"

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥১৫।১৫॥—সমস্ত বেদের বেদ্যই আমি।"

শ্রুতিও পরিষ্কারভাবে উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ কাঠকোপনিষৎ ॥২।১৫॥

—নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার।"

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যের তাৎপর্য্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটীমাত্র পয়ারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"গৌণ-মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১২৮ ॥"

এইরূপে দেখা গেল—পূর্ব্বকাণ্ড ( বা কর্ম্মকাণ্ড ) এবং উত্তরকাণ্ড ( বা জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড )—উভয় কাণ্ডই একই বেদের দুইটী অংশমাত্র। একের পর্য্যবসান অপরে বলিয়া, উভয় কাণ্ডই একই ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া একই গ্রন্থ। তাহারা পরস্পর-বিরোধী নহে।

যাহা হউক, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা-সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে জানা যায়—মীমাংসা-দর্শনের অনুসরণে অনিত্য-স্বর্গাদি-লোক-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইলেও মোক্ষপ্রাপ্তি—সুতরাং পরম-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি—অসম্ভব।

## ১০। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন

বেদের উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহের এবং তদনুগত স্মৃতিগ্রন্থসমূহের সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক ব্যাসদেব যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহা গ্রথিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রেরই অপর নাম বেদান্ত-দর্শন বা উত্তর-মীমাংসা।

### ক। বেদান্ত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য

বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটী বৈশিস্ট্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

### (১) বেদান্ত-দর্শনে স্বীকৃত বিষয়ের সত্যত্ব

প্রথমতঃ, অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বেদান্ত-দর্শনেও কয়েকটী পদার্থ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যান্য দর্শনের স্বীকৃত পদার্থগুলি হইতেছে তত্তদ্দর্শন-কারদের কল্পিত। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্বীকৃত বিষয়গুলি ব্যাসদেবের কল্পিত নহে; এ-সমস্ত হইতেছে অপৌরুষেয় বেদের উক্তি—সুতরাং সত্য। অন্যান্য দর্শন হইতেছে পৌরুষেয় শাস্ত্র, বিজ্ঞ পণ্ডিতগণদ্বারা গ্রথিত; সুতরাং এই সমস্ত দর্শনে ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষের অবকাশ রহিয়াছে; তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন অপৌরুষেয় বেদ-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র ঈশ্বর-কথিত। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি-দোষ থাকিতে পারে না।

## (২) বেদান্ত-দর্শনে সিদ্ধান্তের যুক্তিসিদ্ধত্ব

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও একটী কথা বিবেচনা করা সঙ্গত। তাহা হইতেছে যুক্তির কথা। যুক্তির অনুরোধে বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলেও দেখা যায়—অন্যান্য দর্শনের স্বীকৃত পদার্থসমূহদ্বারা তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ উপপন্ন হয় না ; তত্ত্বদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের স্বীকৃত বিষয়সমূহদ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত-সমূহ সম্যক্‌রূপে উপপন্ন হয়। বেদান্ত-দর্শনের সকল সিদ্ধান্তই যে যুক্তিসঙ্গত, ২।২।১০-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

## (৩) বেদান্ত-দর্শনে স্বীকৃত ব্রহ্মের অকল্পিতত্ব বা সত্যত্ব

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য দর্শনের মধ্যে কোনও কোনও দর্শনে ঈশ্বরের কোনও উল্লেখই নাই। আবার কোনও কোনও দর্শনে স্বীকৃত পদার্থসমূহের সহায়তায় কোনও কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় না বলিয়া কেবলমাত্র সমস্যা-সমাধানের জন্য একটী বস্তুর কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পিত বস্তুটীকেই সে-সকল দর্শনে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বর কিন্তু সে-সকল দর্শনে স্বীকৃত প্রধান প্রদার্থ-সমূহের অন্তর্ভুক্তও নহে। পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত-পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ঈশ্বরের স্থান যে নিতান্ত গৌণ, পাতঞ্জল-কথিত মোক্ষেও যে ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই, সাধনেও যে ঈশ্বরের অপরিহার্য্যতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পাতঞ্জল-দর্শনেও ঈশ্বরের মুখ্যত্ব কিছু নাই।

কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যাসদেবের বা অপর কাহারও কল্পিত নহে, পরন্তু, অপৌরুষেয়-বেদবিহিত—সুতরাং নিত্য সত্য। ব্রহ্মের সত্যত্বে প্রমাণ এই যে, তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণ শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মের দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালেও শ্রুতির আনুগত্যে যাঁহারা সাধন-ভজন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মের দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন।

## (৪) বেদান্ত-দর্শনের আনুগত্যে মোক্ষের নিশ্চিতত্ব

চতুর্থতঃ, অন্যান্য দর্শনের আনুগত্যে মোক্ষ অসম্ভব, অন্ততঃ অনিশ্চিত ; দর্শন-সমূহের আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের আনুগত্যে মোক্ষ অসম্ভবও নহে, অনিশ্চিতও নহে।

বেদান্ত-দর্শনের যুক্তিসিদ্ধত্ব তাহার একটী প্রমাণ।

## (৫) বেদান্ত-দর্শনেই পরম-পুরুষার্থ নির্দ্ধারিত

পঞ্চমতঃ, পরম-পুরুষার্থ-বিষয়েও বেদান্ত-দর্শনের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরম-পুরুষার্থ বস্তুটী কি, তাহা বিবেচনা করা দরকার।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়—জীবমাত্রই চায় সুখ—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল সুখ। সুখ চায় বলিয়াই সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখ চায় না। জীবের সমস্ত প্রচেষ্টাই সুখ-বাসনাদ্বারা প্রবর্ত্তিত। দুগ্ধপোষ্য শিশুও সুখ চায় ;

যে তাহার আদর-যত্ন করে, তাহার কোলেই সে যাইতে চায়। মুমূর্ষু বৃদ্ধও আরাম চায়, সুখ চায়, সংসার-সুখ-ভোগের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে চায়। যে বৃক্ষটী অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত, সেও রৌদ্রের দিকে একটী শাখা প্রসারিত করে; কেননা, রৌদ্র তাহার সুখের পোষক। পশু-পক্ষীর মধ্যেও এইরূপ সুখ-বাসনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, সুখের জন্য জীবমাত্রেরই একটা চিরন্তনী বাসনা আছে।

সুখের জন্য লোকের প্রয়াস সর্ব্বদাই যে অসার্থক হয়, তাহা নয়; কোনও কোনও প্রয়াস সফলও হয়; তখন অভীষ্ট যাহা পাওয়া যায়, সুখ বলিয়া তাহাকে লোক আস্বাদনও করে; কিন্তু তাহাতেও তাহার চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা পরিতৃপ্তি লাভ করে না। নবলব্ধ সুখের আস্বাদনের উন্মাদনা তিরোহিত হইয়া গেলে আবার সুখ-বাসনা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; যে সুখ পাওয়া গিয়াছে, সেই জাতীয় আরও প্রচুর সুখ, বা অন্য রকমের সুখের জন্যও বাসনা জাগিয়া উঠে। সে-সমস্ত পাওয়া গেলেও আবার নূতন নূতন সুখের জন্য বাসনা জাগে। ইহাতে বুঝা যায়, বাস্তবিক যে সুখের জন্য লোকের বাসনা, সেই সুখ লোক পাইতেছে না; হয়তো বা সেই সুখের স্বরূপও জানে না; তাই সেই সুখের জন্য চেষ্টাও করিতে পারে না। তবে ইহা বুঝা যায় যে, লোক চায় নিত্য নিরবচ্ছিন্ন এবং দুঃখ-লেশশূন্য প্রচুর সুখ।

শ্রুতি বলেন, এতাদৃশ সুখ জগতে দুর্ল্লভ, সীমাবদ্ধ বস্তুতে—যাহা দেশে সীমাবদ্ধ, কালেও সীমাবদ্ধ, তাহাতে—এই সুখ সুদুর্ল্লভ। "নাল্পে সুখমস্তি"; কেননা, সুখ হইতেছে ভূমা বস্তু, সর্ব্বব্যাপক বস্তু। "ভূমৈব সুখম্।" ভূমাবস্তু হইতেছে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু, আনন্দস্বরূপ-রসস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু। এই আনন্দ-স্বরূপ-রসস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন একমাত্র সুখ এবং এই রসস্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুকে পাওয়া গেলেই সুখের জন্য জীবের ছুটাছুটির চিরতরে অবসান হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এই আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুটীর সহিত জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহার প্রতি জীবের অনাদিসিদ্ধ চিরন্তন আকর্ষণ; এই সুখস্বরূপের জন্যই বাস্তবিক জীবের চিরন্তনী বাসনা। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া তাহা জানিতে পারে না, সুখবাসনার তাড়নায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। ইহকালের সুখ, পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া এবং সেই সেই সুখ লাভ করিয়াও চিরন্তনী সুখবাসনার তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যই যদি জীবের একমাত্র ঐকান্তিকী বাসনা হইত, সুখের জন্য যদি তাহার স্বরূপগত কোনও বাসনা না থাকিত, তাহা হইলে জীব কখনও দুঃখমিশ্রিত সুখ চাহিত না। কিন্তু সংসারে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত সুখকে দুঃখমিশ্রিত জানিয়াও জীব তাহা চায় এবং তাহা আস্বাদনও করে। ইহাতেই বুঝা যায়—সুখই জীবের একমাত্র কাম্য, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি তাহার কাম্য নহে। অবশ্য দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে জীব চেষ্টা করে না, তাহা নহে। দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যও চেষ্টা করে। তাহার দুইটী হেতু। প্রথমতঃ, সুখই অভীষ্ট বলিয়া সুখের বিপরীত দুঃখ জীব চায় না; তাই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুঃখ যখন আসিয়া পড়ে এবং সেই দুঃখ যখন অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল"—এই নীতি অনুসারে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ দূর করার চেষ্টার সময়েও

সুখবাসনা থাকে এবং দুঃখ দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরেও আবার সুখলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতেও বুঝা যায়—কেবলমাত্র দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের কাম্য নহে, সুখই তাহার পরম কাম্য। আবার, দুঃখমিশ্রিত এবং অনিত্য সুখও তাহার কাম্য নহে ; দুঃখলেশ-সংস্পর্শশূন্য এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখই জীবের কাম্য। সংসারে অবশ্য দুঃখ-স্পর্শশূন্য এবং নিত্য সুখ নাই ; এমন কি স্বর্গাদি লোকেও নাই। স্বর্গাদি-লোক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনিত্য ; সুতরাং স্বর্গাদি-লোকের সুখও অনিত্য। আবার, স্বর্গসুখও দুঃখ-স্পর্শশূন্য নহে ; কেননা, মহাপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়ে বহুবার স্বর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; স্বর্গে এই ধ্বংসের ভয় আছে ; আবার অসুরাদিকর্ত্তৃক আক্রমণের ভয়ও আছে। স্বর্গের উর্দ্ধভাগে জন-তপঃ-আদি লোকও মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হইয়া যায় এবং স্বর্গাদির দৈনন্দিন প্রলয়-কালে স্বর্গপর্য্যন্ত সমস্ত লোক যখন দগ্ধীভূত হইয়া যায়, তখন তাহার প্রচণ্ড উত্তাপ পরবর্ত্তী লোকেও অনুভূত হয়। এইরূপে দেখা যায়, স্বর্গাদিলোকের সুখেও দুঃখের মিশ্রণ আছে।

একমাত্র আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই দুঃখলেশহীন সুখ সম্ভবপর এবং দুঃখের হেতুও ঐকান্তিকভাবে তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে। শ্রুতিই একথা বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চনেতি—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কিছু হইতেই আর ভয়ের কারণ থাকে না" ; "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।" এই আনন্দ আবার নিত্য ; কেননা, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য বস্তু।

বেদান্ত-কথিত ব্রহ্ম যে কেবল আনন্দ-স্বরূপমাত্র, তাহাও নহে ; তিনি আনন্দদাতাও। শ্রুতি বলেন—একমাত্র তিনিই আনন্দদাতা, আর কোনও আনন্দদাতা নাই। "এষ হি এব আনন্দয়াতি॥ তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মবল্লী ॥ ৭ ॥" তিনি যে আনন্দ দান করেন, পরিমাণেও তাহা অল্প নহে ; তাহা প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, অসীম ; কেননা, এই আনন্দদাতা হইতেছেন ব্রহ্ম—সর্ব্ববৃহত্তম, অসীম ; তিনি যাহা দান করেন, তাহাও সর্ব্ববৃহত্তম, অসীম, অপর্য্যাপ্ত। বৃহৎ বা বড় করাই তাঁহার স্বভাব। বৃংহয়তি ইতি ব্রহ্ম। আবার, এই আনন্দ মায়িক আনন্দও নহে ; কেননা, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥ ১।৫ ॥" মায়িক নহে বলিয়া এই আনন্দ হইতেছে নিত্য।

এইরূপে দেখা গেল—বেদান্ত-দর্শনে এক নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন এবং মায়াস্পর্শ-বর্জ্জিত, দুঃখগন্ধলেশশূন্য, অপর্য্যাপ্ত আনন্দের কথা জানা যায় এবং এই আনন্দ যে জীব পাইতে পারে, তাহাও জানা যায়। ইহাই জীবের নিত্য-আকাঙ্ক্ষিত পরম-পুরুষার্থ।

এতাদৃশ পরম-পুরুষার্থের সংবাদ অন্য কোনও দর্শনে পাওয়া যায় না। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় স্বর্গাদি-লোকের সুখের কথা পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু তাহা অনিত্য এবং দুঃখমিশ্রিত বলিয়া পুরুষার্থ হইলেও পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না। মায়িক-দেহসুখ-সর্ব্বস্ব অজ্ঞ লোকই তাহাকে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক তাহা স্বরূপতঃ সুখও নহে ; কেননা, বাস্তব সুখ হইতেছে ভূমা বস্তু—"ভূমৈব সুখম্" এবং এই ভূমা-সুখ দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত স্বর্গাদিতে থাকিতে পারে না। শ্রুতিই বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি।"

ইহা হইতেছে মায়িক সত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ। মায়িক সত্ত্বের চিত্তপ্রসাদরূপ তথাকথিত সুখ জন্মাইবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই তাহার শক্তিকে "হ্লাদকরী" বলা হয়। "হ্লাদতাপকরী-মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ —( ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে ) তুমি মায়িক-গুণবর্জ্জিত বলিয়া হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসিকী এবং মিশ্রা রাজসিকী-শক্তি, অর্থাৎ মায়িক সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ হইতে উদ্ভূত শক্তি, তোমাতে নাই।"

পূর্ব্বমীমাংসা ব্যতীত অন্যান্য দর্শনে স্বর্গাদি-লোকের সুখের কথাও নাই, কেবলমাত্র আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির কথাই আছে। এই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিতে সুখস্পর্শের লেশমাত্রও নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুখলেশস্পর্শশূন্য কেবলমাত্র আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি জীবের কাম্য নহে; সুতরাং ইহা জীবের পরম-পুরুষার্থও হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—পরম-পুরুষার্থবিষয়েও বেদান্ত-দর্শনের একটা অসাধারণ এবং অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

## (৬) ব্রহ্মের আনন্দের জন্য বাসনা বন্ধনের হেতু নহে

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—সুখবাসনা তো বন্ধনের হেতু। সুখবাসনার পরিপূর্ত্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াই জীব সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয়। যতদিন সুখবাসনা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই জীবের সংসার-বন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং মোক্ষে আবার কিরূপে পূর্ব্বকথিত পরম-পুরুষার্থরূপ সুখ থাকিতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। সংসারের অনিত্য মায়িক সুখের বাসনাই হইতেছে বন্ধনের হেতু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাংসারিক সুখ হইতেছে মায়িক সত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ। মায়িক সত্ত্বগুণই মায়িক সুখের জন্য আসক্তি জন্মাইয়া বন্ধন ঘটায়। "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ গীতা॥ ১৪।৬॥ —প্রকৃতির সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক এবং অনাময় ( অরোগ )। এই সত্ত্বগুণ সুখের সঙ্গে এবং জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ ঘটাইয়া জীবকে বদ্ধ করে।"; "সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি॥ গীতা॥ ১৪।৯॥—সত্ত্বগুণ সুখে আসক্তি জন্মায়।" প্রকৃতিসম্ভব রজঃ ও তমঃ গুণের ন্যায় সত্ত্বগুণও জীবের বন্ধন জন্মাইয়া থাকে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা॥ ১৪।৫॥"

এইরূপে দেখা গেল—সত্ত্বগুণজাত প্রাকৃত সুখই এবং সেই সুখের বাসনাই জীবের বন্ধনের হেতু। অপ্রাকৃত সুখ এবং অপ্রাকৃত সুখের বাসনা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। কেননা, বন্ধনের মূল হেতুই হইতেছে মায়িক গুণত্রয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় সুখস্বরূপ ব্রহ্মও মায়াতীত এবং ব্রহ্মের আনন্দও মায়াতীত। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ১।৪॥—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও আর ভয় থাকে না।" এই ভয় হইতেছে বন্ধনের ভয়, জন্ম-জরাদির ভয়। এই শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা গেল—শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী॥ ১।৭॥—রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়", এই আনন্দী হওয়াতে বন্ধনের ভয় নাই; এই আনন্দের জন্য যে

বাসনা, তাহাও বন্ধনের হেতু নহে। কেননা, জীবের সহিত আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ ব্রহ্মের অনাদিসিদ্ধ নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের দিকেই তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ; এই আকর্ষণই হইতেছে জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা। এই বাসনার চরিতার্থতা হইতেছে সুখস্বরূপ রসস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তিতে। এই সুখবাসনা আগন্তুকী নহে, পরন্তু স্বাভাবিকী ; তাই ইহা বন্ধনের হেতু নহে।* এই চিরন্তনী সুখবাসনার লক্ষ্য যে সুখ, তাহার স্বরূপ না জানিয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়ার প্রভাবে প্রাকৃত রূপ-রসাদির আস্বাদনজনিত সুখের দিকে ধাবিত হয় এবং বঞ্চিত হয়। মায়ার প্রভাব এবং তজ্জনিত প্রাকৃত সুখের দিকে আকর্ষণ—উভয়ই আগন্তুক বলিয়া এবং জীবের স্বরূপবহির্ভূত—সুতরাং অস্বাভাবিক—বলিয়া প্রাকৃত সুখের বাসনা হয় বন্ধনের হেতু। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা স্বাভাবিক এবং জীবের স্বরূপগত বলিয়া তাহা বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি"—শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

### খ। বেদান্ত-দর্শনের সাধারণ পরিচয়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদান্তদর্শন হইতেছে অপৌরুষেয় শ্রুতির উপরে এবং শ্রুতির অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-দর্শনের বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণও এজন্য শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শনে শ্রুতিকথিত ব্রহ্মকেই মুখ্যতত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মুখ্যতত্ত্ব কেন, ব্রহ্মকে একমাত্র তত্ত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা, জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্বাদি সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বা ব্রহ্মতত্ত্বের আনুষঙ্গিক। একথা বলার হেতু এই। বেদান্তদর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রই হইতেছে "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" এই জিজ্ঞাসার উত্তরই হইতেছে সমগ্র বেদান্ত-দর্শন। ব্রহ্মের পরিচয় উপলক্ষ্যেই জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্বাদি আসিয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকার তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা অনুসারে বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টি-তত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব এবং ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতের আলোচনা না করিলে বেদান্ত-দর্শনের বাস্তব তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোনওরূপ ধারণা সম্ভবপর হইতে পারে না। এজন্য পরবর্ত্তী কয়েকটী অনুচ্ছেদে ব্রহ্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যকারের অভিমত অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন মতের কিছু আলোচনাও করা হইতেছে।

## ১১। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব

### ক। প্রমাণসম্বন্ধে একটী কথা

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে প্রমাণসম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। বেদ যে অপৌরুষেয়, সকল ভাষ্যকারই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বলিয়া বেদ হইতেছে ভ্রম-প্রমাদাদি-

---

* জীবের সুখবাসনা যে তাহার স্বরূপভূতা বা স্বাভাবিকী, মূলগ্রন্থের পঞ্চম পর্ব্বে ৫।৬-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

দোষের অতীত ; সুতরাং বেদ হইতেছে স্বতঃপ্রমাণ, নিজেই নিজের প্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বেদবাক্যের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে যে যুক্তি-তর্কের অবকাশ নাই, তাহাও নহে। বেদের বিভিন্ন বাক্যের সমন্বয় স্থাপনের জন্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেই যুক্তিতর্ক হইবে বেদবাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। লৌকিকী যুক্তিও গৃহীত হইতে পারে, যদি তাহা বেদবাক্যের অনুকূল হয়। বেদবাক্যের প্রতিকূল কোনও তর্ক বেদার্থ-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; সুতরাং তাহা বেদের স্বতঃপ্রমাণতারও অনুকূল হইতে পারে না। অনুমানাদি প্রমাণ-সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি

মুখ্যাবৃত্তিতে বা অভিধাবৃত্তিতে অর্থ করিলেই বেদবাক্যের স্বতঃপ্রমাণতা রক্ষিত হইতে পারে। লক্ষণা-বৃত্তিতে বা গৌণীবৃত্তিতে অর্থ করিলে কিছু যুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয় ; তাহাতে বেদের স্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, শ্রুতিবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্যও অবগত হওয়া যায় না। অবশ্য, যে স্থলে কোনও শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ ( মুখ্যাবৃত্তির অর্থ ) অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, সে-স্থলে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় বিধানার্থ লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয় যে নেওয়া হয় না, তাহাও নহে। ইহাদ্বারা বেদের স্বতঃপ্রমাণতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ( এই গ্রন্থের "অবতরণিকায়" এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে )।

এক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যকারের অভিমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

## খ। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষ্যকারের অভিমত

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যের অভিমত অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমে আচার্য্যের নাম, তাহার পরে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে।

**শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য** ঃ—ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব ; অবধিরহিত ও তারতম্যরহিত ; স্বরূপতঃ অসীম এবং গুণতঃও অসীম ; সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ; সর্ব্ববিধ-হেয়গুণ-বিবর্জ্জিত, কিন্তু অনন্ত-কল্যাণগুণাকর ; জগৎকর্ত্তা ; সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎও সাকার। বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই পরব্রহ্ম।

**শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য** ঃ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ামক ; অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় , পরমস্বতন্ত্র ; সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ ; অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট ; সাকার ; সর্ব্বব্যাপক। বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই পরব্রহ্ম।

**শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য** ঃ—সচ্চিদানন্দ ; ব্রহ্মের অনন্তগুণ, অনন্তশক্তি ; গুণ ও শক্তি স্বাভাবিক ; অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; ব্রহ্ম স্বরূপে ও শক্ত্যাদিতে সর্ব্ববৃহত্তম ; স্বভাবতঃ নিরস্ত-সমস্ত-দোষ ; অশেষ-কল্যাণ-গুণৈকরাশি ; জগৎ-কারণ ; রসস্বরূপ ; সর্ব্বব্যাপক, সাকার ; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

**শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী** ঃ-- ( বিষ্ণুস্বামীর কোনও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার তাঁহাদের গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে ) ঃ—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট ; হ্লাদিনী-সংবিদাত্মিকা স্বরূপশক্তিদ্বারা নিত্য আলিঙ্গিত ; প্রাকৃত-গুণহীন ; জগৎ-কর্ত্তা ; সাকার ; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রসস্বরূপ।

**শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য ঃ**—সৎ, চিৎ ও আনন্দ—তিনই ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ ; সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ; অনন্ত-শক্তি ; জগৎ-কারণ ; নির্গুণ ও সগুণ—প্রাকৃত-গুণরহিত বলিয়া নির্গুণ, অনন্ত-অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া সগুণ ; সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় ; সৎ ও সত্ত্বাবান্ ; জ্ঞান ও জ্ঞানবান্ ; আনন্দ ও আনন্দময় ; রসস্বরূপ, রসাত্মক ; বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম, স্মৃতিতে যিনি পরমাত্মা, শ্রীভাগবতে তিনিই ভগবান্ ; সাকার ; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রসস্বরূপ।

**শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ঃ**—সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব ; বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ; সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ; অনন্ত অচিন্ত্যগুণ ও অচিন্ত্যশক্তির আধার ; সর্ব্বেশ্বর ; জগৎকর্ত্তা ; প্রাকৃত-গুণহীন, কিন্তু অনন্ত-অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট ; সৎ ও সত্ত্বাবান্ ; জ্ঞান ও জ্ঞাতা ; আনন্দ ও আনন্দময় ; সাকার ; শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। রসস্বরূপ।

**শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ঃ**—ব্রহ্মের দুইটী রূপ—কারণরূপ ও কার্য্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় ; কিন্তু কার্য্যরূপে তিনি বহু। তাঁহার কারণরূপ হইতেছে সত্য এবং স্বাভাবিক, আর কার্য্যরূপটী ঔপাধিক ; তথাপি সত্য। কারণরূপ ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ ( লোকাতীত ), অনন্ত, অসীম। তিনি সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ। তাঁহার সত্ত্বা, বোধ বা জ্ঞান এবং অনন্তত্ব হইতেছে তাঁহার গুণ, তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। কেননা, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে স্বরূপভেদ হয় না ; গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিত গুণও নাই। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি নিরংশ হইলেও স্বেচ্ছায় জীবজগৎ-রূপে পরিণত হয়েন ; কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। বাস্তবিক, তাঁহার ভোগ্যশক্তি জগদ্রূপে এবং ভোক্তৃশক্তি জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

**শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ঃ**—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক, সর্ব্ববিধগুণবিবর্জ্জিত, নিরাকার। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা নহেন ; আনন্দস্বরূপ, আনন্দময় নহেন ; আনন্দসত্ত্বামাত্র, চিৎসত্ত্বামাত্র ; ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি জগৎকর্ত্তা নহেন ; যিনি জগৎকর্ত্তা, তিনি হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ; নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার যোগে সগুণ ব্রহ্ম হয়েন।

ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধে এ-স্থলে যাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করা হইল, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্ব, শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীপাদ বল্লভ এবং শ্রীপাদ বলদেব—ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের এই বিশেষত্ব যে স্বাভাবিক, পরন্তু ঔপাধিক বা আগন্তুক নহে, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত তাঁহাদের অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী ; তিনি ব্রহ্মের বিশেষত্ব স্বীকার করেন না।

শ্রীপাদ ভাস্করের কারণরূপ ব্রহ্ম নিরকার হইলেও সবিশেষ ; কেননা, তাঁহার গুণ আছে, ইচ্ছা আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রীপাদ শঙ্করের মতই শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত, না কি শ্রীপাদ রামানুজাদির মতই শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত ? অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-অনুসারে ব্রহ্ম কি সবিশেষ, না কি নির্ব্বিশেষ ? ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়ই বা কি ?

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গেই এক্ষণে এই সকল প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইতেছে।

## ১২। শ্রীপাদ শঙ্কর ও ব্রহ্মতত্ত্ব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন সত্ত্বামাত্র। এ-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রায় কি, তাহা দেখা যাউক। এই গ্রন্থে ( প্রথম পর্ব্বের দ্বিতীয়াংশে ) এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে ; এ-স্থলে সেই আলোচনার মর্ম্মই অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইতেছে।

### ক। বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বস্তুতঃ শক্তিই হইতেছে শক্তিমদ্‌বস্তুর বিশেষত্ব ; শক্তির কার্য্যও তাহার বিশেষত্ব। গুণকার্য্যাদি সমস্তই শক্তির কার্য্য। বস্তুর শক্তি যদি স্বাভাবিকী হয়, তাহা হইলে বস্তুর গুণ-কার্য্যাদিও হইবে স্বাভাবিক, স্বরূপভূত। এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মের কোনও স্বাভাবিকী শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় কিনা ?

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তি আছে এবং এই শক্তি হইতেছে স্বাভাবিকী ; তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও আছে।

**"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ** ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৮ ॥" ইহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া চ বলক্রিয়া চ। জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাত্রেণ সর্ব্বং বশীকৃত্য নিয়মনম্।" জ্ঞানক্রিয়া—সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানের প্রবৃত্তি। বলক্রিয়া—স্বীয় সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীভূত করিয়া নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা এবং জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বের এবং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের কথাও জানা গেল। এই বাক্যটী ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

**"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্** ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।১০ ॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী মায়াশক্তির কথাও জানা যায়। মায়া তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মকে "মায়ী" বলা হইয়াছে। এই বাক্যে ব্রহ্মকে পরিষ্কার ভাবে "মহেশ্বর"ও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের মহা ঐশ্বর্য্য আছে। এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বসূচক বহুবাক্য দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের দুইটী শক্তির কথা জানা গেল—পরাশক্তি এবং মায়াশক্তি। মায়াশক্তি যে জড়রূপা, চিদ্বিরোধী, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। পরাশক্তি হইতেছে শ্রেষ্ঠা শক্তি, মায়াশক্তি হইতে পরা বা শ্রেষ্ঠা ; মায়ার সমজাতীয়া শক্তি নহে, অর্থাৎ পরাশক্তি জড়রূপা নহে। জড়রূপা না হইলেই তাহা হইবে জড়বিরোধী চিৎ। পরাশক্তি হইতেছে চিচ্ছক্তি ; এই চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়।

শক্তিই হইতেছে শক্তিমদ্‌বস্তুর বিশেষত্ব ; শক্তির কার্য্যও তাহার বিশেষত্ব। ব্রহ্মের যখন জড়রূপা এবং চিদ্রূপা—এই দ্বিবিধ-শক্তির কথা জানা গেল, তখন বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মেরও দ্বিবিধ বিশেষত্ব থাকিতে পারে—চিদ্রূপা পরাশক্তি এবং পরাশক্তি হইতে জাত গুণাদিরূপ বিশেষত্ব, আর মায়াশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে জাত গুণাদিরূপ বিশেষত্ব। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায়, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, মায়া কেবল বহির্জগৎকেই বেষ্টন করিয়া রাখে। "মায়য়া বা এতৎসর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি, তাস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি ॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥ ১৫ ॥" মায়া যখন ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন মায়াসম্ভূত গুণও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। হইাতে বুঝা গেল—ব্রহ্মে কোনওরূপ মায়িক বিশেষত্ব নাই। মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া তাঁহার বিশেষত্ব বটে ; কিন্তু এই বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-বহির্ভূত। আর, পরাশক্তি চিন্ময়ী বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মও চিন্ময় বলিয়া, এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত কোনও বিরোধ নাই ; সুতরাং পরাশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে এবং পরাশক্তিসম্ভূত গুণাদি-বিশেষত্বও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে, ব্রহ্মস্বরূপেও থাকিতে পারে। চিৎস্বরূপা পরাশক্তি হইতে সম্ভূত গুণাদি-বিশেষত্ব হইতেছে চিন্ময় বিশেষত্ব ; অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা জড়রূপা মায়া হইতে সমুদ্ভূত বিশেষত্ব হইতেছে প্রাকৃত বিশেষত্ব বা মায়িক বিশেষত্ব।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, পরব্রহ্মের বিশেষত্ব দুই রকমের—অপ্রাকৃত বা চিন্ময় এবং প্রাকৃত বা মায়িক। অপ্রাকৃত বা চিন্ময় বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে ; কিন্তু প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব, মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ও ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে না ; প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব থাকে ব্রহ্মের বাহিরে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত স্পর্শহীন ভাবে। ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া ব্রহ্মের "বাহির" বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না ; তথাপি যে "বাহির" বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—স্পর্শহীনতা। পূর্ব্বোদ্ধৃত নৃসিংহতাপনী-শ্রুতিবাক্যেও এই অর্থেই "বহিঃ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—"মায়য়া বহির্ব্বেষ্টিতং ভবতি।"

কিন্তু উল্লিখিত আলোচনায় কেবল শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিদ্বারাই জানা গেল যে, অপ্রাকৃত চিন্ময় বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে ; প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব তাঁহার স্বরূপে থাকিতে পারে না ; তাহা থাকিবে তাঁহার স্বরূপের বহির্ভাগে, অর্থাৎ স্বরূপের সহিত স্পর্শহীনভাবে। ইহার সমর্থক কোনও স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য আছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি থাকে, তাহা হইলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে। এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য যদি থাকেও, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে—একজাতীয় গুণহীনত্বদ্বারা অপর-জাতীয়-গুণও নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা। কেননা, একজাতীয়-গুণহীনত্বদ্বারা অপর-জাতীয়গুণ নিষিদ্ধ হইলে সর্ব্ববিধ-গুণহীনত্বই উপপন্ন হইবে। একজাতীয়-গুণের নিষেধের দ্বারা যদি অপর-জাতীয় গুণ নিষিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই স্বীকার করিতে হইবে ; কেননা, কোনও বস্তুর যদি কেবলমাত্র একটী বিশেষত্ব বা একটীমাত্র গুণও থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ বলা যায় না, তাহার সবিশেষত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের অভিমত কি।

## ১৩। শ্রুতিপ্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

### ক। দ্বিবিধ-বিশেষত্ব শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ

পরব্রহ্মের যে দ্বিবিধ বিশেষত্ব আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়।

"এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ঋগ্বেদ ॥ ১০।৯ ॥"
"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।১২।৬ ॥"

১।১।৪৭-অনুচ্ছেদে এই দুইটী শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বাক্যদ্বয় হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের এক পাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত এবং তিন পাদ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেছে মায়াতীত দিব্য অপ্রাকৃত লোকে।

স্মৃতিও একথা বলেন—

"ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎপদম্‌।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥
—লঘুভাগবতামৃত-ধৃত-প্রমাণ ॥ ৫।২৮৬ ॥"

শ্রুতিপ্রোক্ত "বিশ্বভূতানি বা বিশ্বাভূতানি"-শব্দে সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝায়; সুতরাং স্বর্গও এই "বিশ্বভূতানি"র অন্তর্গত। এই প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ব্রহ্মের এক পাদ বিভূতি। ত্রিপাদ বিভূতিকে "অমৃতম্‌—অনশ্বর, অপরিণামী" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডস্থিত এক পাদ বিভূতি "অমৃত" নহে, তাহা "নশ্বর, পরিণামী।" এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের দুইরকম মহিমার বা ঐশ্বর্য্যের কথা জানা গেল।

ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত—প্রাকৃত বা মায়িক। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই—উৎপত্তি-বিনাশশীল, পরিণামী, নশ্বর। যাহা প্রাকৃত নহে, তাহাই হইবে অপরিণামী, অনশ্বর—অমৃত। সুতরাং অপ্রাকৃত বস্তুই হইতেছে "অমৃত।" যে স্থানে এই অপ্রাকৃত বা অমৃত ঐশ্বর্য্য বিরাজিত, তাহাও হইবে অপ্রাকৃত, চিন্ময়। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই অমৃত বা অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য "দিবি" বিরাজিত। সুতরাং "দিবি"-শব্দে যে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামকে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামের ঐশ্বর্য্যই হইতেছে "অমৃত—অপ্রাকৃত, চিন্ময়।"

ব্রহ্মের এক পাদ বিভূতি যে মায়িকী, মায়াতীত ভগবদ্ধামের ত্রিপাদ্‌বিভূতি যে তদ্বিপরীত—মায়াতীত, অপ্রাকৃত, চিন্ময়—উপরে উদ্ধৃত স্মৃতি-প্রমাণ হইতেও তাহা জানা যায়।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মের দুইরকম বিশেষত্ব আছে—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত।

ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত বলিয়া এবং মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়া, তাহা যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না—সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না—তাহাও

সহজেই বুঝা যায়। আর, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এবং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপেই অবস্থান করে বলিয়া, তাহা যে ব্রহ্মের স্বরূপেই অবস্থান করে, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ব্রহ্মের স্বরূপে আছে। সুতরাং অপ্রাকৃত বিশেষত্বে ব্রহ্ম সবিশেষ; কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্বে তিনি নির্ব্বিশেষ।

## খ। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই

১।২।২৬-অনুচ্ছেদ হইতে ১।২।৪০-অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত কয়েকটী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ক দুইশত ছিয়াশী ( কিঞ্চিন্ন্যূন তিনশত ) বাক্য উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যও অবশ্য আছে বটে; কিন্তু এই নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যেও কতকগুলিতে সবিশেষত্বের উল্লেখও আছে; আবার, কতকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বাক্যে, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী বাক্যেও সবিশেষত্বের কথা আছে।

১।২।৪৬-অনুচ্ছেদে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলি পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই এই সকল শ্রুতিবাক্যে কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১।২।৪৭-অনুচ্ছেদে নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শব্দগুলিকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আনুগত্যেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১।২।৪৮-অনুচ্ছেদে নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্যগুলির পুনরায় আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং অপ্রাকৃত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে।

'নির্ব্বিশেষ' কহে তাঁরে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৩৩ ॥

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে, সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ।

শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য তাঁহার শ্রুতিভাষ্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা দেখাইয়াই বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন "সর্ব্ববিশেষণ-রহিত।" "সর্ব্ববিশেষণ-রহিতত্বাৎ অক্ষরম্ সত্যং পুরুষাখ্যম্ ॥ প্রশ্ন ॥ ৪।১০ ॥-ভাষ্য।" অন্যত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও যখন শ্রুতি-সিদ্ধ এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে যখন অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাতেই ব্রহ্মের "সর্ব্ববিশেষণরাহিত্য" উপপন্ন হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শ্রুতিভাষ্যে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের নির্ব্বিশেষপর অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ১।২।৬০-৬১-অনুচ্ছেদে তাহাদের মধ্যে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার অর্থ বিচারসহ নহে।

## ১৪। স্মৃতি-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

স্মৃতি-প্রস্থানের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই সমস্ত ভাষ্যকার সমানভাবে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই।

মূলগ্রন্থের ১।২।৪৩-অনুচ্ছেদে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শতাধিক ব্রহ্মবিষয়ক শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহাদের পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। এই আলোচনায় দেখা গিয়াছে, গীতার সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম"ই যে পরতত্ত্ব-বস্তু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কোনও স্থলেই তাহা বলা হয় নাই।

মূলগ্রন্থের ১।২।৪৪-অনুচ্ছেদে পুরাণাদি হইতে ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী শ্লোক আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতেও জানা যায় যে, পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—স্মৃতিপ্রস্থানও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

## ১৫। ন্যায়-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মসূত্রই হইতেছে ন্যায়-প্রস্থান। মূলগ্রন্থের ১।২।১-২৪ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মবিষয়ক বহুসূত্র আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য মতের খণ্ডন করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব যে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ( ১।২।২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অতঃপর ( অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণের পর ) ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসারগতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন অবস্থাভেদ, ব্রহ্মসতত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ, উপাসনা-বিশেষে উপাস্যগত গুণবিশেষের উপসংহার ( গ্রহণ ) ও অনুপসংহারের ( অগ্রহণের ) নিয়ম, সম্যক্‌দর্শনে পুরুষার্থসিদ্ধি, সম্যক্‌দর্শনের উপায়-বিশেষে বিধিপ্রভেদ ও মুক্তিফলের অনিয়ম—এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।" তৃতীয় অধ্যায় হইতেছে মুখ্যতঃ সাধনবিষয়ক, ইহা মুখ্যতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক নহে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও তিনি লিখিয়াছেন—"পরা ও অপরা—এই দ্বিবিধ-বিদ্যার যে কিছু সাধন ও তদ্‌বিষয়ক যে কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার আলোচিত হইবে এবং প্রসঙ্গগত অন্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।"

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেই জানা গেল—প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই দুইটী অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব—অর্থাৎ সবিশেষত্বই—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্রটী হইতেছে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় সূত্রেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ—এই বিশ্বের জন্মাদি—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম।" এই উত্তরে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের কথা বলিয়া—অর্থাৎ ব্রহ্মের সবিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই—তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য মতের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্যসমূহের সমন্বয়মূলক মীমাংসাই ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রেও যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা ও অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা মনে করাই স্বাভাবিক। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিলে প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ-সত্ত্বেও ব্রহ্মকে সবিশেষই বলিতে হইবে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১।২"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রগুলির যে অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক। অবশ্য মধ্যে মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি তাঁহার নিজের কথাও বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার সহিত প্রকরণেরও সঙ্গতি নাই, মূলসূত্রের তাৎপর্য্যেরও সঙ্গতি নাই। মূলসূত্রের অর্থে তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়ের একটী সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। সূত্রটী এই ঃ

**ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥**

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মবিষয়ক যে কয়টী সূত্র আছে, তাহাদের মধ্যে এই সূত্রটীই হইতেছে মুখ্যসূত্র। এই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয়টী সূত্রে বিচারপূর্ব্বক এবং বিরুদ্ধপক্ষের নিরসনপূর্ব্বক তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সূত্রটীর অর্থ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজাদির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের ১।২।২৪-অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য সম্বন্ধে সে-স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে তাহার সার মর্ম্মমাত্র ব্যক্ত করা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রগুলির সহিত ৩।২।১১-সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রভাষ্যোপক্রমে বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক; তাহাতে দুই ব্রহ্মের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে। ব্রহ্ম কখনও একাধিক হইতে পারেন না।

যাহা হউক, আলোচ্য সূত্রের তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ নহেন—"ন পরস্য উভয়লিঙ্গম্।" উভয় লিঙ্গের তাৎপর্য্যে তিনি লিখিয়াছেন—সবিশেষত্ব এবং নির্ব্বিশেষত্ব। ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ উভয়ই হইতে পারেন না; কেননা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব হইতেছে পরস্পর-বিরোধী; সুতরাং তাহাদের একত্রাবস্থান অসম্ভব। কাজেই ব্রহ্ম হইবেন—এক-লিঙ্গ—হয় সবিশেষ, আর না হয় নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্ম সবিশেষ হইতে পারেন না; সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। কেননা, "সর্ব্বত্র হি"—

সর্ব্বত্র, সমস্ত শ্রুতিবাক্যেই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। যথা "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের সমস্ত বিশেষরাহিত্যের কথা বলিয়াছেন। ইহাই হইল শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের সারমর্ম্ম।

**বক্তব্য।** "উভয়লিঙ্গ"-শব্দে সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব বুঝায়—শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। পূর্ব্বে যদি সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইত, তাহা হইলেই এ-স্থলে সিদ্ধান্তপক্ষে বলা যাইতে পারিত—ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ—উভয়ই হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সূত্রেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে; ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষত্বের কথা কোনও স্থলেই বলা হয় নাই। এই অবস্থায়, নির্ব্বিশেষত্ব-লিঙ্গের অনুমান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

তিনি বলিয়াছেন—সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব পরস্পর-বিরোধী বলিয়া তাহাদের একত্রাবস্থিতি সম্ভবপর নহে। এই উক্তিও বিচারসহ নহে। একই বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী বটে; কিন্তু এক রকম বিশেষত্বের অস্তিত্ব-সত্ত্বেও অন্যরকম বিশেষত্বের অনস্তিত্ব অসম্ভব নহে। বধির ব্যক্তিরও দর্শন-শক্তি থাকিতে পারে। ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব না থাকিলেও অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিতে পারে।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্বের একত্রাবস্থিতি অসম্ভব, সুতরাং ব্রহ্ম হয় সবিশেষ হইবেন, আর না হয় নির্ব্বিশেষ হইবেন, তাহা হইলে—ব্রহ্ম কি সবিশেষই হইবেন, না কি নির্ব্বিশেষই হইবেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

ব্রহ্ম-বিষয়ক পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত সূত্রেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; কোনও সূত্রেই নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব যে পূর্ব্বপক্ষের উক্তি, তাহাও কোনও সূত্রে বলা হয় নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রভাষ্যেও তাহা তিনি বলেন নাই; এমন কি, আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যোপক্রমেও তিনি তাহা বলেন নাই। এই অবস্থায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে আলোচ্য সূত্রের অভিপ্রেত, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ; ব্রহ্ম যখন উভয়লিঙ্গ হইতে পারেন না, একলিঙ্গই যখন হইবেন, তখন তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব-লিঙ্গই স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র হি—শ্রুতির সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ নহেন—সুতরাং একলিঙ্গ, একথাই সূত্রে বলা হইয়াছে; সেই এক লিঙ্গ কি সবিশেষত্ব, না কি নির্ব্বিশেষত্ব—তাহাও আলোচ্যসূত্রে বলা হয় নাই। সেই একটী লিঙ্গ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে—"সর্ব্বত্র হি"-বাক্য দ্বারা। কিন্তু "সর্ব্বত্র হি"-বাক্যে কি সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, না কি নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সূত্র হইতে জানা যায় না। শ্রুতির "সর্ব্বত্র" কি

ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, না কি নির্ব্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়াই "সর্ব্বত্র হি"-বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--শ্রুতির "সর্ব্বত্র" ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে। কেননা, শ্রুতির "সর্ব্বত্র" ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, বরং সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব কোনও বাক্যেই নিষিদ্ধ হয় নাই ; বরং প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যদি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রভাষ্যে সে সকল শ্রুতিবাক্যের সহায়তায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির কি অবস্থা হইবে ? আর "তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ১।১।৪ ॥"—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই যে লিখিয়াছেন—সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্যই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব ( সুতরাং সবিশেষত্ব ) প্রতিপাদিত করে—"তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্ত-শাস্ত্রাদবগম্যতে। কথম্ ? সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেনৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি"—এই বাক্যেরই বা কি গতি হইবে ? আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে "সর্ব্বত্র হি"-বাক্যের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের পূর্ব্বোক্তিরই বিরোধী।

যাহা হউক, তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যটী তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে। গ্রন্থমধ্যে ১।২।৪৮-খ ( ২ )-অনুচ্ছেদে এই কঠশ্রুতিবাক্যটী আলোচিত হইয়াছে। সে-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াই দেখান হইয়াছে যে, তাঁহার ভাষ্যানুসারেই "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। এই কঠশ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে অন্যশ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন, "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মই "সর্ব্বকারণ" এবং "সর্ব্বসাক্ষী"। শ্রুতিবাক্যস্থিত "অনাদি"-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমৎ, তৎ কার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদ্ অকার্য্যম্।" আবার "মহতঃ পরম্"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"মহতো মহত্তত্ত্বাদ্ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপাৎ ; সর্ব্বশক্তি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি 'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু'-ইত্যাদি"। সর্ব্বকারণত্ব এবং সর্ব্বসাক্ষিত্বও বিশেষণ। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যখন সর্ব্বকারণত্ব ও সর্ব্বসাক্ষিত্ব—এই বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন এই বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়—তাঁহার উদ্ধৃত "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদি ১।৩।১৫-কঠশ্রুতি-বাক্যটী ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-নিষেধক নহে—সুতরাং তাঁহার উক্তির সমর্থকও নহে।

এইরূপে দেখা গেল—যে শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের

নির্বিবশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবাক্যই তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে ; সুতরাং তাঁহার চেষ্টাও যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক বহু সূত্র আছে ; তন্মধ্যে এই একটী মাত্র সূত্রের শব্দসমূহের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার অভীষ্ট নির্বিবশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হয় নাই ; এই আলোচ্য-সূত্রেও তিনি ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। এই সূত্রের শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-বাচক পূর্ব্বসূত্রসমূহের সহিত সঙ্গতিযুক্ত যে অর্থ, তাহারই সমর্থনে ব্যাসদেব ইহার পরেও কয়েকটী সূত্র সংযোজিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর সে-সমস্ত সূত্রেও তাঁহার অভীষ্ট নির্বিবশেষত্বপর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ীভূত করার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু মুখ্য সূত্রেই তাঁহার প্রয়াস যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন সমর্থক সূত্রগুলিতে তাহা আর কিরূপে সার্থকতা লাভ করিবে ? ( বিশেষ আলোচনা ১।২।২৪ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )।

উপক্রম-উপসংহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের একটা সর্ব্বজন-সম্মত প্রথা প্রচলিত আছে। সেই প্রথা অবলম্বন করিলেও জানা যায় যে, ব্রহ্মের সবিশেষত্বই হইতেছে বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরও সম্মত। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদেও "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥"-ইত্যাদি সূত্রসমূহেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ; শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রার্থ হইতেও তাহা জানা যায়। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"-ইত্যাদি সূত্রগুলির পরে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক আর কোনও সূত্র নাই ; সুতরাং এইগুলিকে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপসংহার-সূত্রও বলা যায়। তাহারও পূর্ব্বে, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে "ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩।২।৩৮ ॥"-সূত্রে এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রেও ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—উপক্রমে ( প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ), উপসংহারে এবং মধ্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বেদান্তদর্শনে খ্যাপিত হইয়াছে। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তিও একটী লক্ষণ, যদ্দ্বারা গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণীত হইতে পারে। বেদান্তদর্শনের বহু সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের নির্বিবশেষত্ব-পর সিদ্ধান্ত তাঁহারই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ইহা বেদান্ত-সম্মত নয়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার অভীষ্ট নির্বিবশেষত্বের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যে-সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে-সমস্ত যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-নিষেধক মাত্র, পরন্তু সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-নিষেধক নহে, ১।২।৫৬-৫৯ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

## ১৬। শ্রীপাদ শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম ও সবিশেষত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর এক "সগুণ" ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, নির্বিবশেষ —সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন আনন্দসত্তা বা জ্ঞানসত্তামাত্র। মায়ার উপাধির যোগে এই নির্বিবশেষ নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ সবিশেষ হয়েন। শ্রুতিতে যে বিশেষত্বের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে এই সগুণ ব্রহ্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব যে শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা মূলগ্রন্থের ১।২।৬৬-অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি ॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥ ১।৫।১ ॥" সুতরাং মায়িক উপাধির সহিত ব্রহ্মের সংযোগ হইতেই পারে না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সংযোগ সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলেও তদ্দারা ব্রহ্মের সগুণত্ব বা সবিশেষত্ব প্রাপ্তি যে অসম্ভব, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মায়ার যোগে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ১।২।৬৭ অনুচ্ছেদে সে-সমস্তও আলোচিত হইয়াছে, এবং সেই আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ বিচারসহ নহে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধির যোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই সবিশেষত্বও হইবে মায়িক বিশেষত্বজাত—প্রাকৃত বিশেষত্ব; কেননা, মায়িক-উপাধিজাত বিশেষত্বও মায়িক বা প্রাকৃতই হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩খ অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে,—ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যসমূহে কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ-স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে একটী শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১১ ॥

এ-স্থলে যাঁহাকে নির্গুণ ( নির্গুণশ্চ ) বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আবার "কর্ম্মাধ্যক্ষ", "সাক্ষী", "চেতা" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। "কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতা" প্রভৃতি শব্দ সবিশেষত্ব-বাচক; কিন্তু "নির্গুণ" শব্দ নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে "নির্গুণঃ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"নির্গুণঃ সত্ত্বাদি-গুণরহিতঃ—সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত।" আবার "কেবলঃ"-শব্দের অর্থেও তিনি লিখিয়াছেন—"কেবলঃ নিরুপাধিকঃ—কেবল-শব্দের অর্থ নিরুপাধিক।" শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্ত্বাদিগুণরহিত ( অর্থাৎ প্রাকৃতগুণহীন ) এবং উপাধিবর্জ্জিত। আবার এই প্রাকৃতগুণহীন নিরুপাধিক ব্রহ্মকেই শ্রুতিবাক্যটীতে "কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝায় ? ইহাই বুঝাইতেছে যে, কর্ম্মাধ্যক্ষতাদি ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ বা প্রাকৃত বিশেষত্ব নহে এবং এ-সমস্ত ব্রহ্মের আগন্তুক উপাধিও নহে। বিশেষত্ব কেবল দুই রকমের হইতে পারে ( পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যে-বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইবে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব এবং ব্রহ্মকে যখন "নিরুপাধিক" বলা হইয়াছে, তখন এই অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব তাঁহার উপাধিও নহে। উপাধি হইতেছে আগন্তুক বস্তু; যাঁহাতে কোনওরূপ আগন্তুক উপাধি নাই, তিনিই নিরুপাধিক। কর্ম্মাধ্যক্ষত্বাদি বিশেষত্ব যখন তাঁহার

"উপাধি" নহে, তখন বুঝিতে হইবে—এই বিশেষত্ব হইতেছে ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক, স্বরূপভূত—ইহা মায়িক উপাধিগত নহে। মায়িক গুণ যাহাতে নাই, তাঁহাতে মায়িক বা প্রাকৃত বিশেষত্বও থাকিতে পারে না, মায়িক উপাধিও থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়াও যে-সকল বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেছে অপ্রাকৃত এবং স্বরূপগত বিশেষত্ব।

একথা বলা চলিবেনা যে—শ্রুতিবাক্যস্থিত "কেবলঃ" এবং "নির্গুণঃ"-শব্দে "নির্ব্বিশেষ" ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে এবং "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ", "সাক্ষী"-ইত্যাদি শব্দে "মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মের" কথা বলা হইয়াছে। কেননা, শ্রুতিবাক্য হইতে এইরূপ উক্তির কোনও আভাসও পাওয়া যায় না। বরং "কেবলঃ নির্গুণশ্চ"-বাক্যের অন্তর্গত "চ"-শব্দে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে, যিনি "কর্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতা"-ইত্যাদি, তিনিই "কেবলঃ ( নিরুপাধিক ) এবং নির্গুণঃ ( মায়িকগুণহীন )।"

মুণ্ডকোপনিষদের "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদি ১।১।৬-বাক্যেও "অদ্রেশ্যম্" ইত্যাদি শব্দে যাঁহার প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, "ভূতযোনিম্" শব্দে আবার তাঁহারই এক বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে; এই বিশেষত্বও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। যাঁহাকে প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই যে আবার ( ভূতযোনিত্বরূপ ) অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যস্থিত "যৎ, "তৎ"-শব্দদ্বয় হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—মায়িক উপাধির যোগে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েন—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি বিচারসহ নহে, শ্রুতিসম্মতও নহে। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিক বিশেষত্ব, স্বরূপভূত-বিশেষত্ব; ইহা আগন্তুক বা ঔপাধিক নহে।

শক্তিই হইতেছে বিশেষত্ব, আবার শক্তি হইতেও অপর বিশেষত্বের উদ্ভব হয়। শক্তি যদি স্বাভাবিকী হয়, তাহা হইলে বিশেষত্বও হইবে স্বাভাবিক। ব্রহ্মের শক্তি যে স্বাভাবিকী, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও যে স্বাভাবিকী, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ শ্বেতাশ্বতর॥"

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যে যে শক্তি ও জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে শ্রীপাদ শঙ্করের "মায়োপহিত সগুণ"-ব্রহ্মের শক্তি এবং ক্রিয়া, তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, যাহা মায়ার উপাধি হইতে জাত, তাহা হইবে আগন্তুক, তাহা কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না। যখন মায়ার উপাধির সহিত সংযোগ জন্মে, তখনই তাহার উদ্ভব, তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের শক্তিকে এবং জ্ঞানবলক্রিয়াকে **স্বাভাবিকী** বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের "সগুণ" ব্রহ্ম শ্রুতিসিদ্ধ নহে; এই "সগুণ" ব্রহ্ম হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করেরই স্বকপোল-কল্পিত।

প্রাকৃত-গুণহীন বলিয়াই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "নির্গুণ" বলা হয়, "একোদেবঃ" ইত্যাদি ৬।১১-শ্বেতাশ্বতর-

শ্রুতিবাক্য হইতেই এবং শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণহীন বলিয়া "নির্গুণ", কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ বা বিশেষত্ব আছে বলিয়া তিনি "সগুণ" বা সবিশেষ। প্রাকৃত গুণ এবং অপ্রাকৃত-গুণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া প্রাকৃত গুণের অনস্তিত্ব সত্ত্বেও অপ্রাকৃত-গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"— এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ-স্থলে "মায়া"-শব্দের "শক্তি"-অর্থ ই যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত, "শক্তি"-অর্থ গ্রহণ না করিলে যে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়—সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ যে বিচারসহ নহে— মূলগ্রন্থের ১।২।৬৭গ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

## ১৭। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের অভ্যুপগম

শ্রীপাদ শঙ্কর প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। তিনি বলেন—সমস্ত-বিশেষত্ব-রহিত নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য নহেন। "সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্॥ ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর। শ্রীযুত মহেশচন্দ্র পাল-প্রকাশিত সংস্করণ।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে সে-স্থলেই তিনি বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'-ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে। —ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক যে-সমস্ত বেদান্তবাক্য আছে, সেই সমস্ত বাক্যে সর্ব্বত্রই 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়'-ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সর্ব্ববিশেষত্ব হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহই হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক; "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"-ইত্যাদি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে। কিন্তু শ্রুতি বা ব্রহ্মসূত্র কোনও স্থলেই এইরূপ কোনও কথা বলেন নাই। বরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে সবিশেষত্ব দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে—ইহা বেদান্ত-দর্শনের কথা নহে, পরন্তু শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা এবং তাঁহার এই উক্তির পশ্চাতে বেদান্ত-দর্শনের সমর্থনও নাই।

ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে, তাঁহার ভাষ্য অনুসারেই যে কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা দেখাইয়াই সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথা প্রচার করা সঙ্গত হয় না। ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের অভ্যুপগমেরই ফল। তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন। ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকৃতির অতীত বস্তু; সুতরাং তাঁহার স্বীকৃতি অনুসারে প্রকৃতির অতীতে কোনও বিশেষত্বই থাকিতে পারে না; যাহা কিছু বিশেষত্ব, কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই। এজন্য তিনি প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা প্রদর্শন করিয়াই বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন।

ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যুপগম শ্রুতিসম্মত কিনা, তিনি তাহা বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি শ্রুতির অনুসরণ করেন নাই; বরং শ্রুতিবাক্যকেই নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাই, "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি প্রাকৃত-বিশেষত্ব-নিষেধক শ্রুতিবাক্যদ্বারা তিনি বলাইতে চাহিয়াছেন—ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন। আবার, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাও নাই বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে। পরিষ্কার ভাবে সবিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য তিনি স্বীকার করেন নাই; যেহেতু, এই সমস্ত তাঁহার অভ্যুপগমের অনুকূল নহে। "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য আছে বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করেন, সে-সমস্তও বাস্তবিক তাঁহার অভ্যুপগমের অনুকূল নহে; তথাপি সে-সমস্ত বাক্যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা আছে বলিয়া এবং তাঁহার অভ্যুপগম অনুসারে প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্যতীত অন্য কোনওরূপ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই তিনি সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি শ্রুতিবাক্য পারমার্থিক, কতকগুলি পারমার্থিক নয়—এইরূপ কোনও উক্তি কোনও শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের পারমার্থিক মূল্য তিনি স্বীকার করেন না—(অর্থাৎ করিতে পারেন না, কেননা তাহাদের পারমার্থিক মূল্য স্বীকার করিলে তাঁহার অভ্যুগমই ভূমিসাৎ হইয়া যায়), সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা দেখাইবার জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর এক মায়োপহিত "সগুণ" ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পিত "সগুণ"-ব্রহ্মের অস্তিত্ব যে শাস্ত্রসম্মত নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার এই "সগুণ"-ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রয়াসও হইতেছে শ্রুতিকে তাঁহার আনুগত্যস্বীকার করাইবার প্রয়াসেরই একটা ভঙ্গী।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে একস্থলে বলিয়াছেন—বেদবাক্য সমূহের মধ্যে কোনওটী অর্থবান্, কোনওটী তাহা নহে, ইহা বলা সঙ্গত নহে; কেননা, প্রমাণত্ব-বিষয়ে তাহাদের বিশেষত্ব নাই—(অর্থাৎ কোনও বাক্য প্রামাণ্য নহে, কিম্বা কোনও বাক্য অধিকতর প্রামাণ্য—এইরূপ নহে)। "নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ॥ ৩।২।১৫-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর।" কিন্তু কার্য্যকালে ইহা স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার অভ্যুপগমই দাঁড়াইতে পারেনা। তাই তাঁহাকে সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির পারমার্থিকতা—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণায়করূপে প্রামাণ্যত্ব—অস্বীকার করিতে হইয়াছে। আবার কখনও বা "জক্ষন্ ক্রীড়ন্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলিকে প্রকারান্তরে উন্মত্তের প্রলাপরূপে অভিহিত করিতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। "ননু বচনেনাপি অগ্নেঃ শৈত্যম্, উদকস্য চৌষ্ণ্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাৎ বচনানাম্। ন চ দেশান্তরে অগ্নিঃ শীতঃ ইতি শক্যতে এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্য বা দেশান্তর উষ্ণমুদকমিতি। বৃহদারণ্যক॥ ৩।৯।২৮-বাক্যের শঙ্কর-ভাষ্যে॥—ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয়? বচন ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বচন (শব্দপ্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র। কিন্তু অন্যদেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ—

উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না, (জ্ঞাপন করিলেও সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না)।—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থকৃত অনুবাদ।"

উন্মত্তব্যতীত অপর কেহ অগ্নির শীতলত্বের কথা বলিতে পারে না।

যাহা সর্ববিধ-বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, তাহা কখনও শব্দবাচ্যও হইতে পারে না। কেননা, বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের "নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম"ও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। তিনি তাহা স্বীকার করেন এবং তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি "ততো বাচো নিবর্বন্ততে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—এই শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের সর্ববিষয়ে অপরিসীমত্বই সূচনা করে, শব্দাবাচ্যত্ব সূচনা করে না। ব্রহ্ম যদি শব্দের অবাচ্যই হয়েন, তাহা হইলে বেদ-বেদান্ত তাঁহার বিষয়ে কিছুই বলিতে পারেন না—সুতরাং তাঁহাকে বেদান্ত-বেদ্যও বলা যায় না। অথচ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে—"বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেদ্যঃ।" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥"—সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়া গিয়াছেন—একমাত্র বেদ হইতেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা তিনি ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তথাপি কিন্তু স্বীয় অভ্যুপগত নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করার সময়ে তিনি বলেন—ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য।

যদি বলা যায়—"সগুণ" ব্রহ্মই বেদান্ত-বেদ্য; জগৎকর্ত্তা "সগুণ" ব্রহ্মের কথাই বেদান্তে বলা হইয়াছে। "নির্গুণ"-ব্রহ্মের কথা বেদান্ত বলিতে পারেন না; কেননা "নির্গুণ" ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নহেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে—তাঁহার "নির্গুণ বা নির্বিবিশেষ" ব্রহ্ম শ্রীপাদ পাইলেন কোথায়? তাঁহার অভ্যুপগত নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম যে বেদান্তবেদ্য নহে, প্রকারান্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর কি তাহাই স্বীকার করিলেন না?

যদি বলা যায়—শ্রুতিবাক্যের কেবল অক্ষরের দ্বারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয়, তাৎপর্য্যদ্বারাই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—তাৎপর্য্যেরও তো একটা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। সেই ভিত্তি যদি কেবল অনুমান বা কল্পনা হয়, তাহা হইলে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের কোনও মূল্য থাকিতে পারে না এবং তাহাকে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তও বলা যায় না।

আবার যদি বলা যায়—নির্বিবিশেষব্রহ্মপর সিদ্ধান্ত কেবল কল্পনাপ্রসূত নহে। "অশব্দমস্পর্শম্"-ইত্যাদি, "নেতি নেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যের উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহা তো সেই পুরাতন কাহিনীই। "অশব্দমস্পর্শম"-ইত্যাদি, "নেতি নেতি"-ইত্যাদি, শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সর্ববিধ-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া এই সকল শ্রুতিবাক্য সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য যে নির্বিবিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, তাহা বলা যায় না; তাহা বলিতে গেলে কেবল কষ্ট-কল্পনারই প্রশ্রয় দিতে হয়।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ববত্র হি॥ ৩।২।১১॥"—সূত্রটী ব্যতীত অন্য কোনও সূত্রেই তিনি স্বীয় মত অভিব্যক্ত করার সুযোগ পায়েন নাই। ৩।২।১১-সূত্রটীতে তিনি যে ভাবে

নিজের অভ্যুপগমকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রকে নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্যই ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

## ১৮। বেদান্ত-দর্শনে জীবতত্ত্ব

জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বলদেবাদি আচার্য্যবর্গ বলেন—জীব স্বরূপতঃ অণু, পরিমাণগত-ভাবেই অণু; মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। জীব সংখ্যায় অনন্ত।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীব স্বরূপতঃ বিভু, অণু নহে। কেননা, মায়িকী অবিদ্যায় উপোহিত ব্রহ্মই সংসারী জীব নামে অভিহিত হয়েন; জীব একটি পৃথক্ তত্ত্ব নহে। দুর্জ্ঞেয়ত্ববশতঃই জীবকে অণু বলা হয়, জীব পরিমাণে অণু নহে। ব্রহ্মই যখন অবিদ্যোপহিত অবস্থায় জীবরূপে পরিচিত হয়েন, তখন জীব সংখ্যাতেও বহু নহে; ব্রহ্ম যখন এক, জীবও তেমনি একই।

শ্রীপাদ ভাস্করও বলেন—স্বরূপে জীব হইতেছে ব্রহ্ম—সুতরাং বিভু; তবে সংসার-দশায় জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ, তাহার ভোক্তৃশক্তিও অণু। অণু হইতেছে জীবের ঔপাধিক পরিমাণ। জীবের ভোক্তৃত্ব এবং বহুত্বও ঔপাধিক।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শঙ্কর ও ভাস্করের মতে পার্থক্য নাই; উভয়ের মতেই জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—সুতরাং বিভু।

এক্ষণে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শাঙ্কর মতের আলোচনা করা হইতেছে।

## ১৯। শ্রীপাদ শঙ্কর ও জীবতত্ত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন জীব—বিভু। কিন্তু ইহা প্রস্থানত্রয়ের সম্মত নহে। প্রস্থানত্রয় জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। মূলগ্রন্থের ১।২।১২ হইতে ১।২।২৩ অনুচ্ছেদ-সমূহে এ-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

**শ্রুতিও** জীবের অণুত্বের কথা বলেন। যথা,

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৫।৯॥"

এ-স্থলে বলা হইয়াছে—কেশের অগ্রভাগের শতাংশের যে একাংশ, তাহারও শতাংশ হইতেছে জীব। কেশের শত-শতাংশে পরিমাণই বুঝায়।

"আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোহপি দৃষ্টঃ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৫।৮॥"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—আরার (চর্ম্মভেদকারী লৌহ-শলাকার বা সূচির) অগ্রভাগের যে মাত্রা বা পরিমাণ, তাহাই জীবের মাত্রা বা পরিমাণ।

"অণুপ্রমাণাৎ ॥ কঠ ॥ ১।২।৮॥"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—জীবের প্রমাণ বা পরিমাণ হইতেছে অণু।

**স্মৃতিও** শ্রুতির অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। যথা,

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ গীতা ॥ ১৫।৭"

এ-স্থলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—জীব হইতেছে তাঁহার সনাতন অংশ। জীব যে বিভু নহে, ইহাদ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

"মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ শ্রীভা. ১১।১৬।১১"

এ-স্থলে "মহান্" বলিতে মহত্তত্ত্বকে বুঝায়; মহত্তত্ত্ব পরিমাণেই বৃহৎ। এই শ্লোকে "মহতাম্"-শব্দের প্রতিযোগী হইতেছে "সূক্ষ্ম" এবং "মহান্"-শব্দের প্রতিযোগী হইতেছে "জীব"। পরিমাণের প্রতিযোগীও পরিমাণই হইবে। সুতরাং এ-স্থলেও জীবের পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ১।২।১৯-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

**ব্রহ্মসূত্রেও** জীবের অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের ২।৩।১৯ হইতে ২।৩।৩২ পর্য্যন্ত কয়টী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব জীবের অণুত্বের কথা বলিয়াছেন এবং বিরুদ্ধপক্ষকর্তৃক উত্থাপিত বিভুত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। ১।২।১৮ অনুচ্ছেদে এই সূত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। এই অণুত্ব যে পরিমাণগত, "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২২॥"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাও পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন ( ১।২।১৮ঘ-অনুচ্ছেদ )। ১।২।১৯-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা করা হইয়াছে।

"ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ ॥ ২।৩।২১॥"-সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—শ্রুতিতে যে-স্থলে "আত্মা"কে বিভু বলা হইয়াছে, সে-স্থলে জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই, পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। পরমাত্মাই বিভু; জীবাত্মা বিভু নহে, জীবাত্মা অণু ( ১।২।১৮ গ অনুচ্ছেদ )।

"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।১৯॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥"–সূত্র পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীবের অণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার, "উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।১৯॥"-সূত্রের ভাষ্যে তিনিই জীবের বিভুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং "এবঞ্চ আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্ ॥ ২।২।৩৪॥," "ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫॥" এবং "অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাদ-বিশেষঃ ॥ ২।৩।৩৬॥"-সূত্রের ভাষ্যে জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়া তিনিই জীবেব অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ( ১।২।১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

কিন্তু "তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২।৩।২৯॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রসমূহে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষের উক্তি; "তদ্গুণসারত্বাৎ"-সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক জীবের বিভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ২।৩।২৯-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী ২।৩।৩০-২।৩।৩২ সূত্রত্রয়ের ভাষ্যে তিনি তাহারই সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থের ১।২।৩৬-অনুচ্ছেদে "তদ্গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রের শঙ্করভাষ্য আলোচিত হইয়াছে।

সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের একটীও বিচারসহ নহে, এবং সূত্রভাষ্যেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিচারসহ নহে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সঙ্গত হয় না। যদি বলা যায়, ত্বকের সম্বন্ধবশতঃ তাহা হইতে পারে ? না, তাহা হয় না। কেননা, ত্বক তো সমগ্র শরীর ব্যাপিয়াই বর্ত্তমান। সুতরাং পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সমগ্রশরীরেই বেদনা অনুভূত হইত ; কিন্তু তাহা হয় না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—অণুপরমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও এবং হৃদয়স্থ অণুপরিমিত স্থানের বাহিরে তাহার ব্যাপ্তি না থাকিলেও, ক্ষুদ্রপ্রদীপের আলোকের ন্যায়, চন্দন-বিন্দুর শীতলত্বের ন্যায়, হৃদয়ের বাহিরেও—সমগ্রদেহেই—তাহার চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি আছে। তাহার ফলে সমগ্রদেহেই অনুভূতির যোগ্যতা জন্মে। তাহার প্রমাণ এই যে, শরীরের যে কোনও স্থানে কণ্টক বিদ্ধ হইলেই বেদনার অনুভূতি জন্মে। ইহাতেই বুঝা যায়, দেহের যে কোনও স্থানেই বেদনা উপলব্ধির যোগ্যতা আছে—সুতরাং চৈতন্যের ব্যাপ্তি আছে। পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, সমগ্র দেহে ত্বক্ ব্যাপ্ত আছে বলিয়া যে সমগ্র দেহেই বেদনার অনুভূতি জন্মিবে, তাহা নয়। কেননা, ত্বকের মধ্যে যে শিরা, উপশিরাদি আছে, তাহারাই বেদনাকে বহন করিয়া নেয় ; যতদূর পর্য্যন্ত শিরাদি বেদনাকে বহন করিয়া নিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্তই বেদনা অনুভূত হইতে পারে, সমগ্র দেহে অনুভূত না হইতেও পারে। যে শিরা বা উপশিরাটী কণ্টক বিদ্ধ হয়, তাহার ব্যাপ্তি সমগ্র দেহে না থাকিতেও পারে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত যুক্তির সার্থকতা কিছু দৃষ্ট হয় না।

"এষ অণুরাত্মা", "হৃদি হি এষ আত্মা", "স বা এষ আত্মা হৃদি"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন—অণুপরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। আবার "আলোমেভ্য আনখেভ্যঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—অণুপরিমিত আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিলেও সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। "তথা চ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥"—এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চ আত্মনোঽভিধায় তস্যৈব 'আলোমেভ্য আনখেভ্যঃ' ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্ত-শরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।" ইহা শ্রুতির বাক্য, সুতরাং স্বীকার্য্য। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"

অণুপরিমাণ জীবাত্মা অণুপরিমাণ হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহা সাধারণ লোককে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব "অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥", "গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২।৩।২৫ ॥", "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২।৩।২৬ ॥"-ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি যদি এই কয়টী সূত্রের অবতারণা করিয়া সাধারণ লোককে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলেও জীবাত্মার অণুপরিমিতত্ব এবং সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণ-ব্যাপ্তিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশ্বাসী লোকের কোনও সন্দেহ থাকিত না ; কেননা, শ্রুতিই জীবাত্মার অণুপরিমাণত্বের এবং সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণ-ব্যাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেবের উল্লিখিতরূপ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—চৈতন্য আত্মার গুণ নহে,

আত্মার স্বরূপ ; আলোকও প্রদীপশিখার গুণ নহে, স্বরূপ ; গন্ধও গন্ধদ্রব্যের গুণ নহে, স্বরূপ। সুতরাং সমগ্র দেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তিই সমগ্র দেহে আত্মার ব্যাপ্তি সূচিত করিতেছে। অতএব আত্মা অণু নহে, বিভু। আর, চৈতন্য যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলেও সমগ্র দেহে চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে সমগ্র দেহে আত্মার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ আত্মার অনণুত্ব বা বিভুত্বই সূচিত হইয়া থাকে ; কেননা, গুণ কখনও গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। গুণ-গুণি-বিভাগ নাই।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। চৈতন্য যে আত্মার স্বরূপ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, উষ্ণতা যে অগ্নির স্বরূপ, গন্ধ যে গন্ধদ্রব্যের স্বরূপ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আবার, উষ্ণতাদি যে অগ্নি-আদির ধর্ম্ম, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। উষ্ণতা হইতেছে অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম, সর্ব্বদাই অগ্নিতে বিদ্যমান। কিন্তু অগ্নির বহির্দ্দেশেও উষ্ণতার ব্যাপ্তি আছে। যে স্থানে অগ্নির ব্যাপ্তি নাই, সে স্থানেও উষ্ণতা অনুভূত হয়। যদি বলা যায়—এই উষ্ণতা হইতেছে তরল অগ্নি, আর অগ্নি হইতেছে ঘনীভূত উষ্ণত্ব। সূর্য্য ঘনীভূত তেজঃ, আর তাহার কিরণ তরল তেজঃ। উভয়ে স্বরূপতঃ একই বস্তু। ইহার উত্তরে বলা যায়—স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহাদের অবস্থাগত ভেদ—ঘনত্ব এবং তরলত্ব—স্বীকৃতই হইতেছে। তরল অবস্থাটীকে যদি গুণ বলা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি ? বস্তুর যে শক্তি বা প্রভাব, তাহার নামই গুণ। তেজোঘন সূর্য্যের তরল তেজোময় কিরণই তাহার প্রভাব বা গুণ। সূর্য্যের স্পর্শ কাহারও হয় না ; কিন্তু তাহার কিরণের স্পর্শ সকলেরই হয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্য থাকে বহু দূরে ; তথাপি পৃথিবীতে সূর্য্যের কিরণ ব্যাপ্ত হয়, অনুভূতও হয়। কিরণকে সূর্য্যের স্বরূপই বলা হউক, কিম্বা প্রভাব বা গুণই বলা হউক, যাহাই বলা হউক না কেন, সূর্য্যের বহির্দ্দেশেও যে কিরণের ব্যাপ্তি আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—সুতরাং অনস্বীকার্য্য। অগ্নির বহির্দ্দেশে তাহার উষ্ণতার, গন্ধদ্রব্যের বহির্দ্দেশে তাহার গন্ধের ব্যাপ্তিও তদ্রূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ—সুতরাং অনস্বীকার্য্য। তদ্রূপ, চৈতন্য জীবাত্মার গুণই হউক, বা স্বরূপই হউক, জীবাত্মার বাহিরে তাহার ব্যাপ্তি অস্বীকার্য্য কেন হইবে ?

২।৩।২৫-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—প্রদীপ হইতেছে ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজঃ, আর প্রভা হইতেছে তরল তেজঃ। "নিবিড়াবয়বং তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলয়াবয়ববস্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি।" এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে আত্মাকে ঘনত্ব-প্রাপ্ত চৈতন্য বলা যায়। প্রদীপ ও তাহার প্রভা স্বরূপতঃ একই তেজোদ্রব্য হইলেও ঘনত্বপ্রাপ্ত-তেজঃস্বরূপ প্রদীপের বাহিরেও যেমন তরলতেজঃস্বরূপা তাহার প্রভা বিস্তারিত হয়, তদ্রূপ ঘনত্ব-প্রাপ্ত-চৈতন্যস্বরূপ আত্মার বহির্দ্দেশে তাহার তরলচৈতন্যও বিস্তারিত হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতি যে বলিয়াছেন—অণুপরিমাণ জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্য-গুণ (তরল চৈতন্য) বিস্তার করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিসিদ্ধও হয়। এই যুক্তিসিদ্ধতা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব "অবিরোধঃ চন্দনবৎ", "গুণাৎ বা আলোকবৎ", "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ"-ইত্যাদি সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"গন্ধোহপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমর্হতি, অন্যথা গুণত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ—গন্ধদ্রব্যটী গুণ বলিয়া গন্ধের আশ্রয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হয় ; তাহা স্বীকার না করিলে গন্ধের গুণত্বহানি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাসদেবের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

"উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥

—জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ ( অজ্ঞ ) ব্যক্তি বলে যে, জলের গন্ধ আছে, তবে সেই গন্ধ পৃথিবীর গন্ধ বলিয়াই জানিবে। পৃথিবীর গন্ধই জলকে ও বায়ুকে আশ্রয় করে।"

ব্যাসদেবের বাক্যটী কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির সমর্থন করিতেছে না। কেননা, এই বাক্যে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর গন্ধ জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে। জল ও বায়ু থাকে পৃথিবীর বাহিরে; পৃথিবীর গন্ধ যদি জল ও বায়ুকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পৃথিবীর বাহিরেও পৃথিবীর গন্ধের ব্যাপ্তি আছে। যদি বলা যায়—পৃথিবীর এই গন্ধও পৃথিবীর স্বরূপ, তরল বা সূক্ষ্ম পৃথিবীই গন্ধ। ইহা স্বীকার করিলেও অণুপরিমাণ চৈতন্যঘন জীবাত্মার তরল-চৈতন্য হৃদয়ের বাহিরে সমগ্র দেহেও যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাহা অস্বীকার করিবার হেতু কি থাকিতে পারে ?

এইরূপে দেখা গেল—জীবাত্মার অণুত্ব-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেবের সূত্রগুলির যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারা সূত্রোক্তি খণ্ডিত হয় নাই। বিশেষতঃ, "এষ অণুরাত্মা", "আলোমেভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরই বা কি গতি হইবে ? ব্যাসদেবের কথিত চন্দন, আলোক বা গন্ধের দৃষ্টান্তের অসঙ্গতি যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও শ্রুতিবাক্য খণ্ডিত হইতে পারে না। কাহারও আঙ্গুল অত্যধিকরূপে স্ফীত হইয়া গেলে, তাহা দেখিয়া যদি অপর কেহ বলেন যে—"লোকটীর আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গিয়াছে", তাহা হইলে, আঙ্গুলের এবং কলাগাছের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া অপর এক ব্যক্তি যদি বলেন যে—"আঙ্গুল ফুলিয়া কখনও কলাগাছ হইতে পারে না," তাহা হইলে কি অঙ্গুলির স্ফীতিটা মিথ্যা হইয়া যাইবে ?

জীব যে বিভু নয়, তাহা দেখাইবার জন্য ব্যাসদেব একটী সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন—"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥" এই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন—জীবের যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ আছে, লোকান্তরে গমন আছে, আবার লোকান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আছে, তখন জীব বিভু হইতে পারে না। কেননা, বিভু বস্তুর উৎক্রমণাদি অসম্ভব। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিরা জীবের উৎক্রমণ, গতি ও আগতি দেখাইয়াছেন। কিন্তু "তদ্গুণসারত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—"উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্"-সূত্রে যে উৎক্রমণাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবাত্মার উৎক্রমণাদি নহে, বুদ্ধির উৎক্রমণাদির কথাই বলা হইয়াছে। অথচ নিজের উক্তির সমর্থনে তিনি একটী শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার নিজস্ব অনুমানমাত্র।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির ন্যায় উক্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাসদেব অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়াছেন—"স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ॥ ২।৩।২০॥"—পূর্ব্বসূত্রে যে গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে, সেই গতি ও আগতি জীবাত্মার নিজেরই, অপর কোনও বস্তুর গতি ও আগতি জীবাত্মাতে উপচারিত হয় নাই।

শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ শঙ্করও ভাষ্যে তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি এই। "চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ ইতি— হয় চক্ষুঃ হইতে, না হয় মস্তক হইতে, অথবা অন্য অঙ্গ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইত্যাদি", " স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্বব ক্রামতি, শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানম্-ইতি—জীব তেজোমাত্রাকে ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে ) গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করে এবং শুক্রকে ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে ) গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করে।" এই সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, দেহমধ্যেও জীবাত্মার একস্থান হইতে অন্য স্থানে গতাগতি আছে। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে 'গতি' ও 'আগতি' বা 'উৎক্রান্তি' গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেই ( স্বাত্মনা ) দেহ হইতে গমন করে, আবার দেহান্তরে আগমন করে। ইহা দ্বারা জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। "অন্তরেঽপি শরীরে শারীরস্য গত্যাগতী ভবতঃ, তস্মাদপি অস্য অণুত্বসিদ্ধিঃ।"

যদি বলা যায়—এ-সমস্ত কেবল পূর্ব্বপক্ষের কথা ; পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়ই শ্রীপাদ শঙ্কর ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সিদ্ধান্ত নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রুতিও কি পূর্ব্বপক্ষের কথা বলিয়াছেন ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষের উক্তিই ( জীবের অণুত্বই ) শ্রুতিসম্মত বলিয়া গ্রহণীয়। বুদ্ধিই যে গমনাগমন করেন, কোনও শ্রুতিবাক্যই তো তাহা বলেন নাই ; সুতরাং বুদ্ধির গতাগতির অনুমান শ্রুতিসমর্থিত নহে—সুতরাং সিদ্ধান্তরূপে আদরণীয়ও হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মই জীব, বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব, বুদ্ধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, "অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মই জীব"— এই বাক্য। অবিদ্যা হইতেছে মায়ারই একটী বৃত্তি। শ্রুতি বলেন, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, ব্রহ্মের উপর কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের অবিদ্যোপহিতত্ব শ্রুতি-বিরুদ্ধ। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার উক্তির সমর্থক কোনও শ্রুতিবাক্যই উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, "বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব"—এই বাক্য। প্রতিবিম্বের উৎপত্তির জন্য বিম্ব ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বগত ব্রহ্মের পক্ষে কোনও বস্তু হইতে ব্যবহিত থাকা সম্ভব নয় ; সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অসম্ভব।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব, তাহা হইলেও জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হয় না। কেননা, যে দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, প্রতিবিম্বের আয়তন সেই দর্পণের আয়তন অপেক্ষা বড় হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করই বলেন—বুদ্ধি হইতেছে অণুপরিমিত। অণুপরিমাণ বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বও হইবে অনুপরিমাণই, তাহা কখনও বিভু হইতে পারে না।

প্রতিবিম্ববাদে চৈতন্যস্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় না। প্রতিবিম্ব সকল স্থানেই অচেতন, চেতন পুরুষের প্রতিবিম্বও অচেতন। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব কখনও চৈতন্যস্বরূপ হইতে পারে না। অথচ, জীব যে চৈতন্য-স্বরূপ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত।

"জ্ঞঃ অতএব ॥ ২।৩।১৮"-সূত্রে ব্যাসদেব জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা এবং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥" সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী সূত্রে তিনি জীবের কর্ত্তৃত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। জীব যদি ব্রহ্ম প্রতি-বিম্বই হয়—সুতরাং অচেতনই হয়—তাহা হইলে জীবের জ্ঞাতৃত্ব-ভোক্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ?

অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—জীব স্বরূপতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বহীন, সংসারী জীবেরই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব। বুদ্ধির গুণ ( ইচ্ছা-দ্বেষাদি ) ব্যতীত আত্মার সংসারিত্ব হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে—বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বেই আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। বুদ্ধি হইতেছে সৃষ্ট জড়বস্তু। জড়বস্তুর ইচ্ছাদি বা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি থাকিতে পারে না। "ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৩৬-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ২।৩।৪০ ॥"-সূত্র পর্য্যন্ত কয়টী সূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ( ১।২।২৫ঘ-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। যুক্তির অনুরোধে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি জন্মিতে পারে না। কেননা, প্রতিবিম্ব হইতেছে মিথ্যা বস্তু ; পুরুষ সত্য হইলেও তাহার প্রতিবিম্ব সত্য হইতে পারে না। মিথ্যা বস্তুতে—যাহার বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহাতে—অপরের কর্ত্তৃত্বাদি সঞ্চারিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদি প্রতিবিম্বে সঞ্চারিত হয় না, প্রতিবিম্বে অধ্যস্ত হয় মাত্র। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অধ্যাসের কর্ত্তা কে ? বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি বলিয়া কে মনে করে ? যদি বলা যায়—জীবই তাহা মনে করে, তাহাও সম্ভবপর নয়। কেননা, মিথ্যাভূত অচেতন প্রতিবিম্বের মনন-শক্তি থাকিতে পারে না।

জীবকে স্বরূপতঃ নির্বিশেষ—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষায় "নির্গুণ"—ব্রহ্ম মনে করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—স্বরূপতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি নাই। বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব কি "নির্গুণ" ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব ? সবিশেষ বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব, নির্ব্বিশেষ বস্তুর কোনওরূপ প্রতিবিম্বই সম্ভব নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতেছে জীব—ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভবপর, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই যদি জীব হয়, তাহা হইলে জীব স্বরূপতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিহীন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারে ? বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। পুরুষ-প্রতিবিম্ব কখনও পুরুষ নহে।

অণুপরিমাণ বুদ্ধিতে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব যে অণু, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধির অণুত্ববশতঃই জীবকে অণু বলা হয়। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বের সংজ্ঞাই যদি জীব হয়, ব্রহ্মরূপ বিভু বলিয়া ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীবকে কখনও বিভু বলা যাইতে পারে না। ইহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক নহে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিম্ববাদে তাঁহার কল্পিত জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, "বুদ্ধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব"-বাক্য। সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের পরিচ্ছেদও সম্ভব নয়। পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিম্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদ কেবল যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহাই নহে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধও।

যুক্তির অনুরোধে প্রতিবিম্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলেও জীবের বিভুত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অণুপরিমাণ বুদ্ধিতে যে ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, বা অণুপরিমাণবুদ্ধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে ব্রহ্মাংশ, তাহাই জীবনামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব বা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মও অণুই, বিভু নহে; যেহেতু, দর্পণরূপেই হউক, আর পরিচ্ছেদক ঘটরূপেই হউক, বুদ্ধি হইতেছে অণুপরিমাণ।

জীবের বিভুত্ব যে শ্রুতিসম্মত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির এই বাক্যটীর উল্লেখ করিয়াছেন :—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫।৯ ॥"

এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ইত্যণুত্বং জীবস্যোক্ত্বা তস্যৈব পুনরানন্ত্যমাহ। তচ্চৈবমেব সমঞ্জসং স্যাৎ, যদ্যৌপচারিকমণুত্বং জীবস্য ভবেৎ, পারমার্থিকঞ্চ আনন্ত্যম্। ন হ্যুভয়ং মুখ্যমবকল্পয়েত। ন চ আনন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্, সর্ব্বোপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ। —এই শ্রুতি-বাক্যে জীবের অণুত্বের কথা বলিয়া পুনরায় তাহার আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য এইরূপ। জীবের অণুত্ব হইতেছে ঔপচারিক, আর আনন্ত্য পারমার্থিক। অণুত্ব ও আনন্ত্য—এই উভয়ের মুখ্যার্থ কল্পিত হইতে পারে না। আনন্ত্যকেও ঔপচারিক বলা যায় না; কেননা, সমস্ত উপনিষদেই জীবের ব্রহ্মাত্মভাব প্রতি-পাদিত হইয়াছে।" শ্রীপাদ এ-স্থলে "আনন্ত্য"-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন "বিভুত্ব।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"সমস্ত উপনিষদেই জীবের ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি হইতেছে ভিত্তিহীন; উপনিষৎসমূহ জীবের অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন; এজন্যই ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন ( ১।২।৪০-৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। পৃথক্ অস্তিত্বে অণুত্বই সূচিত হয়, কখনও বিভুত্ব বা ব্রহ্মৈক্য সূচিত হয় না।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে জীবের পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের ( অর্থাৎ অণুত্বের ) কথাই অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। কেননা, কেশাগ্রের শতভাগের একভাগে পরিমাণই বুঝায়। ইহার সহিত অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের এবং বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে কথিত মুক্তিজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের সহিতও সঙ্গতি আছে এবং স্মৃতিবাক্যেরও সঙ্গতি আছে [ ১।২।৩৬(৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]; সুতরাং শ্রুতিকথিত এই সূক্ষ্মত্বকে

ঔপচারিক মনে করা সঙ্গত হয় না। ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই "আনন্ত্য"-শব্দের অর্থ করিতে হইবে। "আনন্ত্য"-শব্দ "অনন্ত"-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। "অনন্ত"-শব্দের তিনটী অর্থ হইতে পারে—অসীম বা বিভু, অবিনাশী বা নিত্য এবং অসংখ্য। সুতরাং "আনন্ত্য"-শব্দেরও তিনটী অর্থ হইতে পারে—বিভুত্ব, নিত্যত্ব ও অসংখ্যত্ব এবং এই তিনটী অর্থই মুখ্য, কোনওটীই ঔপচারিক বা গৌণ নহে। ইহাদের মধ্যে "বিভুত্ব"-অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না ; কেননা, একই বাক্যে এক নিশ্বাসে শ্রুতি জীবকে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত বিভু বলিতে পারেন না। শ্রুতিবাক্য উন্মত্তের প্রলাপ নহে। অপর দুইটী অর্থের—নিত্যত্ব ও অসংখ্যত্বের—সঙ্গতি আছে। কেননা, যাহা পরিমাণে সূক্ষ্ম বা অণু, তাহা নিত্যও হইতে পারে এবং সংখ্যায়ও বহু হইতে পারে। এইরূপে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই—জীব পরিমাণে অতিসূক্ষ্ম, জীব নিত্য এবং সংখ্যায় বহু (অসংখ্য)। এইরূপ অর্থে প্রস্থানত্রয়ের সহিতও সঙ্গতি থাকে, কোনও শব্দের ঔপচারিক বা গৌণ অর্থও গ্রহণ করিতে হয় না। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে গৌণার্থ গ্রহণ অসঙ্গত। [ ১৷২৷৩৬ (৩)-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য ]।

এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যটী শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির সমর্থক নহে ; ইহা জীবের পরিমাণগত অণুত্বেরই সমর্থক।

জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদন-বিষয়ে "তত্ত্বমসি"-বাক্যই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তিনি "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। মূলগ্রন্থের ১৷২৷৫১-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যটী যে সামানাধিকরণ্যের বাক্য, ইহা সর্ব্বসম্মত। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (তত্ত্বোপদেশঃ। ২৬)। সামানাধিকরণ্যে এই বাক্যটীর অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সামানাধিকরণ্যের একটী নূতন লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। সামানাধিকরণ্যের অতিপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজনসম্মত লক্ষণ হইতেছে—"ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্ বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্—ভিন্নার্থবোধক শব্দসমূহের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে।" শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার নির্ণীত লক্ষণে এই অর্থটীও গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সঙ্গে একটী "ঐক্য"-শব্দের যোগ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্বে পদয়োরেকবস্তুনি।
বৃত্তিত্বং যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ॥
সামানাধিকরণ্যং তৎ সম্প্রাদায়িভিরীরিতম্।
তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণ-বিশেষ্যতা॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥ ২৭॥"

অর্থাৎ ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় এবং তাহাদের যদি "ঐক্য" হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য হইবে। তাঁহার মতে "ঐক্য" হইতেছে সর্ব্বতোভাবে "একত্ব"। যে দুইটী পদ সম্যক্‌রূপে একত্ব-বোধক, তাহারা কখনও ভিন্নার্থ-বোধক হইতে পারে না ; ভিন্নার্থ-বোধক না হইলেও সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না। যে পদগুলি ভিন্নার্থ-বোধক, তাহাদের মুখ্যার্থের ভিন্নার্থ-বোধক অংশ

পরিত্যাগ করিয়া কেবল একার্থ-বোধক অংশমাত্র গ্রহণ করিলে অবশ্য তাহাদের সম্যক্ একত্ব সিদ্ধ হইতেও পারে; কিন্তু এইরূপ করার বিধান সামানাধিকরণ্যের সর্ব্বসম্মত লক্ষণে নাই, থাকিতেও পারে না। কেননা, পদগুলিকে একার্থবোধকত্বে পরিণত করিলে তাহারা আর ভিন্নার্থবোধক থাকে না এবং ভিন্নার্থ-বোধক না থাকিলে সামানাধিকরণ্যও হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই হইতে পারে না। "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই নূতন লক্ষণের কল্পনা করিতে হইয়াছে। কেননা, সামানাধিকরণ্যের অতিপ্রসিদ্ধ লক্ষণ গ্রহণ করিলে "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপন করা যায় না। তাঁহার কথিত লক্ষণ যে তিনি তাঁহার সম্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"সম্প্রাদায়িভিরীরিতম্"।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ-করণের উপক্রমে তাঁহার তত্ত্বোপদেশের ১-২৫-শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই হইতেছে তাঁহার উদ্দেশ্য ( ১।২।৫১ ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই তাঁহাকে সামানাধিকরণ্যের এক অভিনব লক্ষণের কল্পনা করিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সামানাধিকরণ্যের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের "ঐক্য"-স্থাপনের উপায়ের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। "তৎ" ও "ত্বম্"-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থে তাহাদের "ঐক্য"-স্থাপন করা যায় না। কেননা, "তৎ"-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শুদ্ধ চিৎ ( ব্রহ্ম ); আর "ত্বম্"-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ শুদ্ধ চিৎ ( জীব )। এই দুই কখনও এক হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞতাতে এবং অল্পজ্ঞতাতে বিরোধ আছে; আবার, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাতে এবং অল্পশক্তিমত্ত্বাতেও বিরোধ আছে। সুতরাং এই বিরোধের পরিহার করা আবশ্যক। কিরূপে তাহা করা যায়?

বিরোধ-পরিহারের জন্য লক্ষণার আশ্রয় নিতে হইবে। তিনি তিন প্রকার লক্ষণার উল্লেখ করিয়াছেন—জহতী, অজহতী এবং ভাগলক্ষণা ( বা জহদজহৎস্বার্থালক্ষণা )।

জহতী-লক্ষণায় মুখ্যার্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয়; তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না; কেননা, তাহা সম্প্রদায়বিরুদ্ধ। "জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায়-বিরোধতঃ॥ তত্ত্বোপদেশঃ॥ ৩৪॥" অজহতীতে মুখ্যার্থকে ত্যাগ না করিয়া অন্যার্থ গ্রহণ করিতে হয়; ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে—"তৎ"-পদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্"-অংশকে বাদ দিয়া কেবল "শুদ্ধচৈতন্য"-অংশকে রাখা এবং "ত্বম্"-পদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত "অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্"-অংশকে বাদ দিয়া কেবল "শুদ্ধ চৈতন্য"-অংশকে রাখা। তৃতীয় প্রকার "ভাগলক্ষণাতে"ই তাহা সম্ভব। তাই তিনি "ভাগলক্ষণার" আশ্রয়ে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন। ভাগলক্ষণার সহায়তায় "তৎ"-পদের অনভীষ্ট অংশ বাদ দিলে থাকে কেবল "শুদ্ধচৈতন্য" এবং "ত্বম্"-পদেরও অনভীষ্ট অংশ বাদ দিলে থাকে কেবল "শুদ্ধচৈতন্য"। ব্রহ্মবাচী "তৎ"-পদের অর্থও দাঁড়াইল—"শুদ্ধচৈতন্য" এবং জীববাচী "ত্বম্"-পদের অর্থও দাঁড়াইল—"শুদ্ধচৈতন্য"। জীবও "শুদ্ধচৈতন্য", ব্রহ্মও "শুদ্ধচৈতন্য"; সুতরাং জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

এক্ষণে বক্তব্য এই। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই যে শ্রীপাদ শঙ্করের সম্প্রদায়ের অভিমত, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল পন্থাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাঁহার তত্ত্বোপদেশঃ-নামক গ্রন্থের ১-২৫ শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার এই-সঙ্কল্পের কথা বুঝা যায়। সে-স্থানে তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন—"তৎ"-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য হইলেও লক্ষ্যার্থ হইতেছে কিন্তু "শুদ্ধচৈতন্য।" আর "ত্বম্"-শব্দের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ শুদ্ধচৈতন্য হইলেও লক্ষ্যার্থ হইতেছে "শুদ্ধচৈতন্য।" ইহা হইতেই বুঝা যায়—"তৎ" ও "ত্বম্"-এই পদদ্বয়ের একই "শুদ্ধচৈতন্য" অর্থে উপনীত হওয়াই তাঁহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। বিশেষণগুলিকে অপসারিত করিতে না পারিলে তাঁহার এই লক্ষ্যার্থে উপনীত হওয়া যায় না; তাই বিশেষণগুলিকে অপসারিত করাও তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশেষণগুলির অপসারণকে তিনি "শোধন" বলিয়াছেন। ভাগলক্ষণার আশ্রয় ব্যতীত বিশেষণগুলিকে অপসারিত করা যায় না। এজন্য শেষ কালে তিনি ভাগলক্ষণাই গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাগলক্ষণাবৃত্তিতে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা সামানাধিকরণ্যেরই বাক্য বলিয়া সোজাসোজি ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অশোভন হইবে বলিয়া মনে করিয়াই আরম্ভে তিনি সামানাধিকরণ্যের কথা বলিয়াছেন; দেখাইয়াছেন—তিনি যেন সামানাধি-করণ্যের আশ্রয়েই বাক্যটীর অর্থ করিতেছেন। তিনি জানেন, সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে তাঁহার অভীষ্ট "ঐক্য" পাওয়া যাইবে না। তাই তিনি সামানাধিকরণ্যের এক অভিনব লক্ষণের কল্পনা কবিয়াছেন এবং তদ্দারা ভাগলক্ষণায় প্রবেশের দ্বারই উন্মুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে যে লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া অবৈধ, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য তিনি-"তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়েব মুখ্যার্থের অসঙ্গতির কথা বলিয়াছেন; ইহাও তাঁহার লক্ষণায় প্রবেশ করার অপর একটী কৌশলমাত্র। বস্তুতঃ "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের যে সঙ্গতি আছে, এই মুখ্যার্থ যে প্রকরণ-সঙ্গত এবং প্রকরণবহির্ভূত শ্রুতিবাক্যের সহিতও যে মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে, তাহা ১।২।৫১-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থের অসঙ্গতি-প্রদর্শনের জন্য তিনি বলিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ পরস্পর-বিরোধী এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও অল্পশক্তিমান্‌ও পরস্পর-বিরোধী; সুতরাং মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কিন্তু "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্" হইতেছে "তৎ"-পদের বিশেষণ এবং "অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্" হইতেছে "ত্বম্"-পদের বিশেষণ। তাঁহার কথিত পরস্পর-বিরুদ্ধ বিশেষণগুলি একই পদের বিশেষণ নহে, দুই ভিন্ন পদের বিশেষণ; সুতরাং তাহাদিগকে পরস্পর-বিরোধী বলা যায় না। অল্পজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ যদি একই পদের বিশেষণ হইত, তাহা হইলেই তাহারা পরস্পর-বিরোধী হইত; কেননা, একই অভিন্ন বস্তু যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অল্পশক্তিমান্ হইতে পারে না। এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ত্বম্-পদবাচ্য জীবের এবং তৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মের ঐক্য ধরিয়া লইয়াই বিশেষণগুলিকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়াছেন। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রতিপাদিত ধরিয়া লইয়া তিনি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহা যুক্তি নহে, যুক্তির আভাস।

যাহাহউক, ভাগলক্ষণার লক্ষণে তিনিই বলিয়াছেন—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে ভাগলক্ষণায় মুখ্যার্থের "অবিনাভূত" বস্তুকে গ্রহণ করিতে হয়। যাহা না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না—তাহাই "অবিনাভূত" বস্তু। যে-স্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ অসঙ্গত হয়, সে-স্থলে "গঙ্গাতীর" অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। "গঙ্গাতীর" হইতেছে "গঙ্গার" অবিনাভূত বস্তু ; কেননা, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিতে পারে না। গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকিলে গঙ্গা হইতে শতক্রোশ দূরে অবস্থিত কোনও স্থানকে গ্রহণ করা যায় না ; কেননা, শতক্রোশদূরবর্ত্তী স্থান গঙ্গা না থাকিলেও থাকিতে পারে ; সুতরাং তাহা গঙ্গার "অবিনাভূত" বস্তু নহে। কিন্তু ভাগলক্ষণায় "তৎ"-শব্দের মুখ্যার্থের অবিনাভূত বস্তুরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর "শুদ্ধচৈতন্য" গ্রহণ করিয়াছেন। "তৎ" শব্দে মুখ্যার্থে সবিশেষ ব্রহ্ম ( শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "সগুণ ব্রহ্ম" ) বুঝায় ; আর "শুদ্ধচৈতন্য"-শব্দে নির্বিবশেষ ( শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "নির্গুণ ব্রহ্ম" ) বুঝায়। তৎ-শব্দের মুখ্যার্থে "সগুণ" ব্রহ্ম হইলে, তাঁহার মতে "সগুণ ব্রহ্মের" অবিনাভূত বস্তু হইয়া পড়িল "নির্গুণ ব্রহ্ম।" অর্থাৎ "সগুণ" ব্রহ্ম না থাকিলে "নির্গুণ" ব্রহ্ম থাকিতে পারে না। ইহা এক অদ্ভুত কল্পনা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "নির্গুণ" ব্রহ্মই "সগুণ" হয়েন,—সুতরাং "সগুণ" ব্রহ্মই "নির্গুণ" ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন। কিন্তু "নির্গুণ" ব্রহ্ম যদি "সগুণ" ব্রহ্মের "অবিনাভূত" বস্তু হয়, তাহা হইলে "নির্গুণ" ব্রহ্ম যে "সগুণ" ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা "নির্গুণ ব্রহ্ম"-বাদী শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিবেন না। "নির্গুণ ব্রহ্ম" যদি কাহারও অপেক্ষাই রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "নির্গুণ" বা সর্ব্বতোভাবে "নির্বিবশেষই" বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—নানা কৌশলে অবৈধভাবে ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি-" বাক্যের যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও বাস্তবিক ভাগলক্ষণালব্ধ অর্থ নহে ; কেননা, "নির্গুণ ব্রহ্ম" কখনও "সগুণ ব্রহ্মের" অবিনাভূত বস্তু হইতে পারে না।

আবার, লক্ষণা হইতেছে শব্দের শক্তিবিশেষ। মুখ্যার্থ শব্দবাচ্য, লক্ষণার্থও শব্দবাচ্য। গঙ্গা ও গঙ্গাতীর—উভয়েই শব্দবাচ্য। শব্দবাচ্য বস্তুতেই লক্ষণার প্রয়োগ সম্ভব ; শব্দের অবাচ্য বস্তুতে লক্ষণার প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শুদ্ধচৈতন্য নির্বিবশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন শব্দের অবাচ্য। সুতরাং সর্ব্বশব্দাবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণার প্রয়োগ হইতেই পারে না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নেও একথা লিখিয়াছেন। "ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিস্টাভিধায়িভির্বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্বিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখণ্ডন্তু লক্ষ্যমিতি বাচ্যম্। সর্ব্বশব্দানভিধেয়স্য তস্য লক্ষ্যত্বাযোগাৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥ ১।২০॥—বিজ্ঞানত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা তাদৃশ বস্তুই বোধিত হইবে ; কিন্তু শুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্য বস্তু বোধিত হইবে না ; যেহেতু, শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য মাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতবাদীরা শুদ্ধ অখণ্ড বস্তুকে সকল শব্দেরই অবাচ্য বলিয়া থাকেন। যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও সম্ভব হয় না। —প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।"

বিদ্যাভূষণপাদ আরও বলিয়াছেন—"সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যুদিতং প্রাক্।

চিন্মাত্রাদিশব্দস্য পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যস্যাচৈতন্যত্বং ভাগত্যাগলক্ষণা তত্র ন সম্ভবেদ্ বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি তুচ্ছমেতৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥ ৪।৯ ॥ —সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা চিন্মাত্র-প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্য বস্তুর অচৈতনত্বই ঘটিবে। তজ্জন্য ভাগলক্ষণা স্বীকারও অসম্ভব হয় ; যেহেতু, বিরুদ্ধভাগই সম্ভব হয় না। —প্রভুপাদ শ্যামলালগোস্বামিকৃত অনুবাদ।"

এইরূপে দেখা গেল—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ের ব্যাপারে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণও শ্রীপাদ শঙ্করের পক্ষে অবৈধ হইয়াছে ; কেননা, "তৎ" ও "ত্বম্"-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই। আবার, ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে তিনি যে অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছেন, ভাগলক্ষণায় সেই অর্থও বস্তুতঃ পাওয়া যাইতে পারে না। "তত্ত্বমসি"-বাক্যটীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল তাঁহার নিজের—অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের—অভিমতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ; সেই অভিমত কিন্তু "তত্ত্বমসি"-বাক্যদ্বারা সমর্থিত নয়। "তত্ত্বমসি"-বাক্যদ্বারা তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব—সুতরাং জীবের বিভুত্ব—প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই।

জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ ; বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদে কথিত মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বমূলক সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের নিজের উক্তিরও বিরোধী। কেননা, তিনি বলেন—বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব। আবার, "তত্ত্বমসি"-বাক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—জীব এবং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব যে কখনও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ-সকল বাক্যে তিনি "এব"-শব্দের "অবধারণ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু "এব"-শব্দের "অবধারণ" অর্থ গ্রহণ করিলে প্রস্থানত্রয়ের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। "এব"-শব্দের "ঔপম্যার্থ" বা "তুল্যার্থ" গ্রহণ করিলে যে প্রস্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি থাকে, মূলগ্রন্থের ১।২।৪৬-৪৮, ১।২।৫২-৫৪ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মৈক্য এ-সকল বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্তিই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার এই চেষ্টাতেও তিনি শ্রুতির আনুগত্য গ্রহণ করেন নাই ; বরং শ্রুতিকেই নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

## ২০। বেদান্ত-দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব

বেদান্ত-দর্শনের বা প্রস্থানত্রয়ের মতে জগতের একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম—নিমিত্ত-কারণও ব্রহ্ম এবং উপাদান-কারণও ব্রহ্ম ( তৃতীয় পর্ব্বের ৩।৫-১১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥", "যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥ ৭।১ ॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে এই

জগৎ-রূপে পরিণত করিয়াছেন এবং জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৮ ॥ ব্রহ্মসূত্র" তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

ইহাকেই সৃষ্টিসম্বন্ধে পরিণাম-বাদ বলা হয়। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যবর্গের সকলেই পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে বহু জীব আছে ; জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ। জীবের দেহ এবং জীবের ভোগ্যবস্তু-আদিও সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত হইতেছে জড়, অচেতন। জড় অচেতন বস্তু হইতেছে মূলতঃ একটী—ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। এইরূপে দেখা যায়—সৃষ্টির সহিত ব্রহ্মের জীবশক্তির এবং মায়াশক্তিরও সম্বন্ধ আছে। বিচার করিলে দেখা যায়—সৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরও সম্বন্ধ আছে ( ৩।১২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি হইলেও জড় অচেতন বলিয়া তাহার কার্য্যসামর্থ্য নাই। চেতন বস্তুরই কার্য্যসামর্থ্য থাকিতে পারে, অচেতন বস্তুর কোনওরূপ কার্য্যসামর্থ্য থাকিতে পারে না।

সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, ত্রিগুণাত্মিকা অচেতনা মায়া বা প্রকৃতির তিনটী গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়। "স ঐক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, পরব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন—তিনি বহু হইবেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করিবেন। তাঁহার এই ঈক্ষণ এবং সঙ্কল্প হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই কার্য্য।

দৃষ্টিদ্বারা তিনি সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহাতেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হইল, প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইল, ক্রমশঃ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির উদ্ভব হইল। প্রকৃতিতে তিনি যে শক্তি সঞ্চারিত করিলেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি ; তাহা মায়াশক্তি নহে ; কেননা, মায়া তখন সাম্যাবস্থায়। যে শক্তিদ্বারা মায়ার সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়, তাহা মায়াশক্তি হইতে পারে না। তাহা যে জীবশক্তি নহে, তাহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়।

ছান্দোগ্য-শ্রুতির ৬।২।৩-৪ বাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম যথাক্রমে তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন এবং "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মানানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৩।২ ॥"-বাক্য হইতে জানা যায়, উল্লিখিত তিনটী বস্তুর ( দেবতার ) সৃষ্টি করিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন—জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া তিনি নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিবেন। পরবর্ত্তী "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি ; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৩।৩ ॥"-বাক্য হইতে জানা যায়—তেজঃ জল ও পৃথিবী ( অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ) এই তিনটী পদার্থকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়া তাহাদের মধ্যে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া তিনি নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে জানা গেল—প্রথমে তিনি তেজ-আদি তিনটী বস্তুর সৃষ্টি করিলেন, তাহার পরে জীবাত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তেজ-আদি তিনটী দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে—তাহাদের সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির বিক্ষোভ এবং তাহাদের সৃষ্টির পরে তাহাদের মধ্যে জীবাত্মার ( জীব-শক্তির ) প্রবেশ। সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জীবশক্তিদ্বারা তিনি প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া তাহাকে বিক্ষুব্ধ করেন নাই।

তাঁহার প্রধান শক্তি তিনটী—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। প্রকৃতি-ক্ষোভের কারণ যখন মায়া-শক্তিও হইতে পারে না, জীবশক্তিও হইতে পারে না, তখন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই জানা যায় যে, তাঁহার চিচ্ছক্তিই হইতেছে প্রকৃতি-ক্ষোভের হেতু, তিনি সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে চিচ্ছক্তিকেই সঞ্চারিত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—সৃষ্টিব্যাপারের সহিত ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি—এই তিনটী শক্তিরই সম্বন্ধ আছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি বা মায়া এই জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥" তাঁহার অধ্যক্ষতায়—অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া। এই গীতাবাক্যে মায়ার বা প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বের বা নিমিত্ত-কারণতার কথা জানা গেল।

আবার "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-বাক্য হইতে মায়ার প্রকৃতিত্ব বা উপাদান-কারণত্বের কথাও জানা যায়।

এইরূপে, শ্রুতিস্মৃতি-বাক্য হইতে জানা গেল—মায়া জগতের নিমিত্ত কারণও এবং উপাদান-কারণও। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। এই বিরোধের সমাধান কি ?

এই বিরোধের সমাধান-কল্পে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব এবং মায়ার জগৎ-কারণত্ব উভয়েই যখন শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত, তখন উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের মুখ্য-কারণ এবং মায়া হইতেছে গৌণ কারণ।

মায়ার দুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির প্রভাবে শক্তিমতী হইয়া ( অর্থাৎ কার্য্যসামর্থ্য লাভ করিয়া ) মায়া তাহার জীবমায়া-অংশে জগতের গৌণ-নিমিত্ত-কারণ হয় এবং গুণমায়া-অংশে গৌণ-উপাদান-কারণ হয়। ব্রহ্মের শক্তিব্যতীত মায়া কারণত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মেরই মুখ্যত্ব এবং মায়ার গৌণত্ব। বিশেষ আলোচনা ৩।১৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি—এই তিনই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া এই তিন শক্তির সহায়তায় জগৎতর সৃষ্টি করিলেও একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। কেননা, শক্তিরূপে এই সমস্ত সহায়ক দ্রব্য হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎ আনন্দ একবস্তু। বিশেষতঃ, স্বীয় শক্তির সহায়তা-গ্রহণে কাহারও স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না।

উল্লিখিত তিনটী শক্তির সহায়তা-গ্রহণের প্রয়োজনও আছে। বিচার করিলে দেখা যায়—পরব্রহ্ম

লীলাবশতঃ জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও এই সৃষ্টিদ্বারা জীবের কর্ম্মফল ভোগ হইয়া যায়, জীব সাধন-ভজনের উপযোগী দেহ পায় এবং সাধন-ভজন করিয়া মোক্ষলাভের সুযোগ পায়। (৩।১৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে জীবেরই মুখ্যত্ব; এজন্য কর্ম্মফলযুক্ত জীবকে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে পাঠাইবার প্রয়োজন। আবার জীবের দেহ এবং কর্ম্মফল অনুসারে তাহার বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুও জড়; এজন্য জড়রূপা মায়ার (গুণমায়ার) প্রয়োজন। জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জাগাইবারও প্রয়োজন আছে। ইহা জীবমায়ার কার্য্য। এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্টিব্যাপারে জীবসম্বন্ধীয় পূর্ব্বকথিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য জীবমায়া ও গুণমায়া এতদুভয়েরই প্রয়োজন। আবার, ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির সহায়তা ব্যতীত প্রকৃতির বিক্ষোভও জন্মিতে পারে না এবং বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণতি লাভ করিয়া যেমন ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিভিন্ন বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি আবার জীবমায়ারূপেও জীবের মুগ্ধতা জন্মাইতে পারে না। সুতরাং চিচ্ছক্তির সহায়তাও অপরিহার্য্য। এই তিনটী শক্তি (অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি) ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে বলিয়া ইহাদের সহায়তা-গ্রহণে যে ব্রহ্মের জগদেককারণত্বও ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও একটী কথা। জগতে আমরা যে সকল বস্তুকে জড় বলিয়া থাকি, তাহারা কিন্তু বাস্তবিক শুদ্ধ জড় নহে, তাহাদের সহিত চিৎও মিশ্রিত আছে। মহাপ্রলয়ের সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিই হইতেছে চিদ্‌বিরহিতা শুদ্ধজড়রূপা। ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিতা যে চিচ্ছক্তির প্রভাবে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইয়া মহতত্ত্বাদি নানাবিধ বিকারে পরিণত হয়, যতকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টিব্যাপার চলিতে থাকে, ততকাল পর্য্যন্তই তাহা প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্যমান থাকিবে; তাহার উপসংহারেই পুনরায় সাম্যাবস্থা, প্রলয়। সুতরাং প্রকৃতি-বিকার সৃষ্টজগৎ যে চিজ্জড়মিশ্রিত, তাহাই বুঝা যায়। অন্যভাবে বিবেচনা করিলেও তাহা বুঝা যায়। এই জগতে অনন্ত প্রকারের বস্তু দৃষ্ট হয়; দৃশ্যমান্‌ভাবে তাহাদের উপাদানও অনন্ত প্রকারের। মূল উপাদান কিন্তু মাত্র তিনটী—জড়রূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটী গুণ বিভিন্ন পরিমাণে, বিভিন্ন সংস্থানে এবং বিভিন্নভাবে অবস্থান লাভ করিয়াই অনন্ত বস্তুর অনন্ত-বিধ উপাদানরূপে পরিচিত হয়। কিন্তু গুণত্রয় জড়—সুতরাং কার্য্যসামর্থ্যহীন—বলিয়া আপনা-আপনি তাহারা উল্লিখিতরূপে সম্মিলিত হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকৃতিতে সঞ্চারিত চিচ্ছক্তিই সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া গুণত্রয়কে উল্লিখিত অবস্থা দান করে। এইরূপে দেখা গেল, যাহাকে আমরা জড় মনে করি, তাহা বস্তুতঃ কেবল জড় নহে, তাহার সঙ্গেও চিৎ আছে। সমস্তই চিজ্জড় বা চিদচিৎ মিশ্রিত। তবে এ-স্থলে চিৎ থাকে দৃশ্যমান্‌ভাবে অস্ফুট বা অনভিব্যক্তপ্রায়।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান পরমাণু-আদি জড় পদার্থের গতি স্বীকার করে এবং এই গতিকে জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, গতি হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম, ইহা অচেতনের ধর্ম্ম হইতে পারে না। জড়ের সঙ্গে যে চেতন মিশ্রিত আছে, এই গতি হইতেছে তাহারই ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকের জড়যন্ত্রের বা জড় ইন্দ্রিয়ের নিকটে চিৎ ধরা পড়ে না বলিয়াই বৈজ্ঞানিক বলেন—এই গতি হইতেছে জড়েরই ধর্ম্ম। চিদ্‌বস্তু চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তুর গোচরীভূত হইতে পারে না বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকটে চিৎ ধরা

পড়ে না। অণুবীক্ষণাদির সাহায্যে চিদ্রূপ জীবাত্মা দৃষ্ট হয় না বলিয়া, কিম্বা দেহব্যবচ্ছেদে জীবাত্মা পাওয়া যায় না বলিয়া, মনে করা সঙ্গত নয় যে, জীবাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই।

## ২১। পরিণামবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরিণামবাদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন—ব্রহ্ম নিজে জগদ্রূপে পরিণত হয়েন না, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তিতে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। মায়া ব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে। এজন্য মায়ার পরিণামকেই ব্রহ্মের পরিণাম বলা যায়। ব্রহ্মপরিণাম-বাদ এবং ব্রহ্মশক্তি-মায়াপরিণাম-বাদ অভিন্ন ( ৩।২৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

পরিণামসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ-ইত্যেবলক্ষণম্, ন তু তত্ত্বস্যেতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ ॥ ১৪৩ পৃষ্ঠা ॥—মূলবস্তু ( তত্ত্ব ) হইতে অন্যথা ভাবই পরিণামের লক্ষণ, তত্ত্বের ( মূলবস্তুর ) অন্যরূপ নহে।"

আভিধানিকগণ দুই রকম পরিণামের কথা বলেন—"প্রকৃতেরন্যথা ভাবঃ। যথা—মুখস্য বিকারঃ ক্রোধ-রক্ততা।" এবং "প্রকৃতিধ্বংসজন্যবিকারঃ। যথা—কাষ্ঠস্য বিকারো ভস্ম, মৃৎপিণ্ডস্য ঘট ইতি। ইত্যমরভরতৌ ॥" এ-স্থলে দ্বিতীয়-প্রকার বিকারে মূলবস্তু ( প্রকৃতি ) ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াই মূলবস্তু হইতে অন্য এক প্রকার বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, অগ্নিযোগে কাষ্ঠ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভস্মে পরিণত হয়। এইরূপ বিকার বা পরিণাম ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে; কেননা, তিনি বলেন—ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। ব্যাস-সম্মত পরিণামবাদে ব্রহ্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন না। প্রথম প্রকারের বিকারে মূলবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, যেমন আছে, তেমনিই থাকে, তবে অন্যভাব ধারণ করে। যেমন, মুখের বিকার ক্রোধরক্ততা ( ক্রোধবশতঃ মুখের রক্তবর্ণতা ); ক্রোধের সহায়তায় মুখে রক্তিমা সঞ্চারিত হয় মাত্র। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই দ্বিতীয় রকমের পরিণাম গ্রহণ করিয়াই ব্যাসসম্মত পরিণামবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রুতিকথিত ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তও প্রথম প্রকার পরিণামের অনুরূপ। ঊর্ণনাভি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্ব-সম্বন্ধি রস-আদি বস্তুর সহায়তায় সূত্রজাল বিস্তার করে। এই সূত্রজাল হইতেছে ঊর্ণনাভির পরিণাম বা বিকার। তদ্রূপ পরব্রহ্মও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্ব-সম্বন্ধি বস্তু—স্বীয় বহিরঙ্গা-শক্তি মায়া—দ্বারা জগৎ বিস্তার করেন। এই জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম।

ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকারী; সুতরাং তাঁহার স্বরূপের বিকার অসম্ভব। কিন্তু মায়া জড়রূপা বলিয়া তাহার বিকারযোগ্যতা আছে; ইহা মায়ার স্বভাব। এজন্য ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির প্রভাবে মায়া বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারে। বিশেষ আলোচনা ৩।২৬-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

## ২২। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ

শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেব-সম্মত পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলে অবিকারী ব্রহ্মের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অবিকারী, তাঁহাতে কোনওরূপ বিকার সম্ভবপর নহে; সুতরাং পরিণাম-বাদ স্বীকার করা যায় না।

তিনি বলেন—এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেও জগতের ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে যেমন রজতের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল শুক্তির এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে যেমন সর্পের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল রজ্জুর, তদ্রূপ দৃশ্যমান্ জগতেরও বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল ব্রহ্মের। অজ্ঞানবশতঃ যেমন লোক শুক্তিস্থলে রজত, বা রজ্জু-স্থলে সর্প দেখে, জ্ঞানের আবির্ভাবে যেমন আবার শুক্তি বা রজ্জুই দেখিতে পায়, রজত বা সর্প দেখিতে পায় না, তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানবশতঃ জীবও ব্রহ্ম-স্থলে জগৎ দেখে, অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই জগৎ আর দেখিবে না, দেখিবে কেবল ব্রহ্ম। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্ত হইতেছে ভ্রম; যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করা রূপ ভ্রম।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের প্রতি এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইতে যাইয়া শ্রুতি যে ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দৃষ্টান্তের প্রতিও তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ স্থাপনের জন্য তিনি শুক্তি-রজতের এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টিব্যাপার-প্রসঙ্গে শ্রুতি কোনও স্থলেই শুক্তি-রজতের বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের কথা বলেন নাই।

জগৎ যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, একথাও শ্রুতি কোনও স্থলেই বলেন নাই। শ্রুতি জগৎকে ব্রহ্মের বিকারই বলিয়াছেন; বিকার এবং পরিণাম একার্থক। "পরিণামঃ (পরি+নম্+ঘঞ, ভাবে) (পুং) বিকারঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥" বিকার এবং বিবর্ত্ত এক জিনিস নহে (৩।৪১খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিবর্ত্ত মিথ্যা; বিকার কিন্তু মিথ্যা নহে। শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের বাস্তবিকই কোনও অস্তিত্ব নাই; শুক্তি-স্থলে সকলে রজত দেখে না, কেহ কেহ দেখে; যাহারা শুক্তি-স্থলে রজত দেখে, তাহারাও সকল সময়ে তাহা দেখে না। আবার, কেহ কেহ শুক্তি-স্থলে রজত না দেখিয়া লবণপিণ্ড বা তদনুরূপ কোনও বস্তু দেখে; কিন্তু তাহাও সকল সময়ে নয়। কেহ কেহ আবার শুক্তি-স্থলে শুক্তিই দেখে, অন্য কিছু দেখে না। ইহাই শুক্তির বিবর্ত্ত রজত্বের মিথ্যাত্বের প্রমাণ। কিন্তু মৃৎপিণ্ডের বিকার ঘটকে সকল সময়ে সকলেই ঘটরূপেই দেখে, কেহ কখনও মৃৎপিণ্ডরূপে, বা অন্য কোনও রূপে, দেখে না। ইহাই মৃদ্বিকার ঘটের সত্যত্বের প্রমাণ।

বিকারই যে বিবর্ত্ত, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"-এই শ্রুতিবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিকার এবং বিবর্ত্ত যে এক এবং অভিন্ন, তাহা দেখাইতে হইলে মৃদ্বিকার ঘটাদির বাস্তব অস্তিত্বহীনতা দেখাইতে হয় এবং মৃত্তিকারই সত্যতা দেখাইতে হয়; তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা দেখাইতে যাইয়া "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ-করণ প্রসঙ্গে তিনি যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ৩।৪০-৪১-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি "মাত্রম্" এবং "এব" এই দুইটী শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন এবং

এবং শ্রুতিবাক্যস্থিত "ইতি"-শব্দটীর বর্জ্জন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অভীষ্ট অর্থ টী পরিস্ফুট হইতেছে না দেখিয়া এই শ্রুতিবাক্যের আশ্রয়ে নিজের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত মূল শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের সহিতই সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। যে প্রসঙ্গে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যটী কথিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ টী নিতান্ত অসঙ্গত। প্রসঙ্গটী এই ঃ—

ঋষি উদ্দালক তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর নিকটে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের" প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছিলেন। "এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জানা হইয়া যায়"—ইহাই হইতেছে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান"। শ্রুতির তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জগতের সমস্ত বস্তুকে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর উপাদানকে, জানা যায়। ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উদ্দালক মৃত্তিকা ও মৃণ্ময় দ্রব্যের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন। এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় দ্রব্যকে ( মৃণ্ময় দ্রব্যের উপাদানকে ) জানা যায়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্মোপাদানক এই সমস্ত জগৎকে জানা যায়।

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১।৪॥"

এই বাক্যটীর প্রথমাংশের—"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"-এই অংশের—তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—( উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন ) হে সোম্য, একটী মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃণ্ময় দ্রব্য ( অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত ঘট-শরাবাদি সমস্ত বস্তুই ) জ্ঞাত হয় ( তদ্রূপ এক ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত জগৎই বিজ্ঞাত হইয়া যায় )।

এই কথা শুনিয়া শ্বেতকেতুর মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে। এক মৃৎপিণ্ড জানিলে কিরূপে মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি সমস্ত জানা যাইতে পারে ? মৃৎপিণ্ড হইতেছে কারণ এবং ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতেছে তাহার কার্য্য ; কারণ হইতেছে কার্য্য হইতে ভিন্ন। মৃৎপিণ্ডের আকারাদি মৃত্তিকার কার্য্য ঘট-শরাবাদির আকারাদি হইতে ভিন্ন ; তাহাদের ব্যবহার-যোগ্যতাও ভিন্ন ; ঘট-শরাবাদিদ্বারা যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, মৃৎপিণ্ডের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। এই অবস্থায় মৃৎপিণ্ডরূপ কারণের জ্ঞানে কিরূপে তাহার কার্য্য বা বিকার ঘট-শরাবাদির জ্ঞান লাভ হইতে পারে ? ইহাই শ্বেতকেতুর সম্ভাবিত জিজ্ঞাসা। শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যের ভাষ্যে তাহা বলিয়াছেন।

"কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যম্ অন্যৎ বিজ্ঞাতং স্যাৎ ?" ইহা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন —"নৈষ দোষঃ, কারণেন অনন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, নতু এবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্। —না, ইহা দোষাবহ হয় না, যেহেতু কার্য্য-বস্তুটী কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, এক বস্তু জানিলেই অন্য বস্তু জানা যায় না, ইহা সত্যই হইত—যদি কার্য্যবস্তুটী কারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন বস্তু হইত। কিন্তু ইহা নহে, কারণ হইতে কার্য্য অন্য বা ভিন্ন নহে।"

কারণরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে তাহার কার্য্য বা বিকাররূপ মৃণ্ময়দ্রব্য ঘট-শরাবাদি যে ভিন্ন নহে, তাহা জানাইবার জন্যই উদ্দালক বলিয়াছেন—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে দুইটী শব্দের অর্থ জানা দরকার—"বাচারম্ভণম্" এবং "নামধেয়ম্।"

"বাচারম্ভণম্"-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ।" মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় বঙ্গানুবাদে লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত।" শ্রীপাদ রামানুজাদি অর্থ করিয়াছেন—বাচারম্ভণম্=বাক্যের দ্বারা যাহার আরম্ভ হয়, বাক্যারব্ধ। "জল আনয়নের জন্য ঘট প্রস্তুত কর বা করি"-ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বক যাহার আরম্ভ হয়, এতাদৃশ বাক্যারব্ধ বিকার।

উভয় প্রকারের অর্থেই "বাচারম্ভণম্"-শব্দটী হইতেছে "বিকারঃ"-শব্দের বিশেষণ-স্থানীয়।

আর, "নামধেয়ম্"-শব্দের অর্থ "নাম।" নাম-শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয়। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়াছেন। "নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ম্, স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয়ঃ।" "নামধেয়ম্" না বলিয়া শুধু "নাম" বলিলেও তাৎপর্য্য একই থাকিত। "স্বার্থে ধেয়ট্" বলিয়া "ধেয়ট্"-প্রত্যয়যোগে শব্দের নিজের অর্থই থাকিয়া যায়।

এইরূপে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যটীর সহজ অর্থ এই :—"বাক্যারব্ধ ( বা বাক্যাশ্রিত ) বিকার-নামক ( বস্তু ) মৃত্তিকা—ইহাই ( ইতি এব ) সত্য।"

উদ্দালক এই বাক্যেই মৃৎপিণ্ডরূপ কারণ হইতে মৃদ্বিকাররূপ কার্য্যের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব দেখাইয়াছেন। মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকা, তাহার বিকারও তেমনি মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। উপাদানাংশে উভয়ই মৃত্তিকা বলিয়া তাহারা অভিন্ন। এজন্যই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই মৃদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। এই উদাহরণের দ্বারাই উদ্দালক জানাইলেন—উপাদানাংশে মৃৎপিণ্ড ও মৃদ্বিকার অভিন্ন বলিয়া যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই সমস্ত মৃণ্ময়বস্তুর ( উপাদানের ) জ্ঞান জন্মিতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উপাদান বলিয়া—সুতরাং উপাদানাংশে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন বলিয়া—এক ব্রহ্মের জ্ঞানেই সমস্ত জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ ? বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্ প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণম্"-শব্দের অর্থ করিলেন—"বাগালম্বনম্—বাক্যাশ্রয়"; তাহার পরে একটী "মাত্রম্"-শব্দের অধ্যাহার করিয়া "বাগালম্বন"কে করিলেন—"বাগালম্বনমাত্রম্"—তাৎপর্য্য—বিকার হইতেছে—বাক্যাশ্রয় মাত্র, বাক্যই হইতেছে বিকারের একমাত্র আলম্বন বা আশ্রয়, ইহার আর অন্য কোনও আলম্বন বা আশ্রয় নাই। ইহাই পরিস্ফুট করার জন্য তিনি "এব" এবং "কেবলম্" শব্দদ্বয়ের অধ্যাহার

করিয়া বলিয়াছেন—"বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলম্—( বিকার ) বাক্যাশ্রয়মাত্র, নামই কেবল" অর্থাৎ নাম-ব্যতীত বিকারের আশ্রয় আর কিছুই নাই, ইহা কেবল নামই, আর কিছুই নয়। ইহাতেও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া নিজের মনের কথা তিনি খুলিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বিকার-নামে কোনও বস্তু নাই, ( বিকারের কেবল নামই আছে, তাহাতে বস্তু কিছু নাই )।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে জানাইতে চাহিয়াছেন যে—মৃত্তিকার বিকার যে ঘট-শরাবাদি, "কেবলমাত্র ঘট-শরাবাদি নামই তাহাদের একমাত্র আলম্বন বা আশ্রয়, কোনও বস্তু তাহাদের আলম্বন বা আশ্রয় নয়, কোনও বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করে না। তাহাদের কেবল নামই আছে, তাহারা বস্তু নয়, তাহাদের মধ্যে কোনও বস্তু নাই; বস্তু নাই বলিয়া তাহাদের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই।" তাৎপর্য্য এই যে—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত বলিয়া বাস্তবিক কোনও বস্তু যেমন নাই, আছে কেবল রজত-নাম, রজতের যেমন বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল শুক্তির, তদ্রূপ মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদিরও কেবল ঘট-শরাবাদি নামই আছে, ঘট-শরাবাদি বলিয়া কোনও বস্তু নাই, ঘট-শরাবাদির বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল মৃত্তিকার।

শ্রুতিবাক্যের "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-অংশের উল্লিখিতরূপ অর্থ করাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, "বাচারম্ভণং *** নামধেয়ম্"-অংশকে তিনি একটী পৃথক্ এবং সম্পূর্ণ বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এক সমস্যা দাঁড়াইয়াছে শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ লইয়া—"মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"—বাক্য লইয়া। এ-স্থলে "মৃত্তিকা"-শব্দটীকে যদি "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যাংশের সহিত অন্বিত করা যায়, তাহা হইলেই "ইতি"-শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে—বাক্যশেষে "ইতি" এবং তাহাতে সমগ্র বাক্যটী দাঁড়ায় এইরূপ ঃ—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি ( এব সত্যম্ )।" ইহার অর্থ হইবে—বাচারম্ভণ-বিকার-নামক বস্তু মৃত্তিকা—ইহাই ( সত্য )।

কিন্তু এই অর্থ শ্রীপাদের অভিপ্রেত নয়; কেননা, এইরূপ অর্থে বিকারকেও মৃত্তিকা বলা হয়; বিকার যে বস্তু এবং বস্তু বলিয়া যে বিকারের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে বিকারের বাস্তব অস্তিত্বহীনতা তিনি দেখাইতে পারেন না।

"ইতি"-শব্দটীই এই গোলমাল বাধাইতেছে; "ইতি"-শব্দ না থাকিলে এরূপ হাঙ্গামার অবকাশ থাকে না। এজন্য শ্রীপাদ শঙ্কর "ইতি"-শব্দটীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "ইতি"-শব্দটীকে বর্জ্জন করিয়া তিনি "মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"-স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র "মৃত্তিকা এব সত্যম্।" অর্থাৎ, বিকারের যখন কোনও অস্তিত্বই নাই, তখন বিকার সত্য নহে, কেবলমাত্র মৃত্তিকাই সত্য।

এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর মৃত্তিকা ও মৃদ্বিকারের দৃষ্টান্তকে রজ্জু-সর্পের বা শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে পর্য্যবসিত করার এবং তদুপলক্ষ্যে বিকারকে বিবর্ত্তে পর্য্যবসিত করার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস তাঁহার নিজের স্বীকৃতিরই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্যটীর ভাষ্যের উপক্রমেই তিনি বলিয়াছেন—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য, অভিন্ন ; এজন্যই কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান হইতে পারে। "নৈষ দোষঃ, কারণেন অনন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেব স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, নতু এবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্।" কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে তিনি বলিলেন—কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য, বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ; তাহার কার্য্যরূপ (বিকাররূপ) ঘট-শরাবাদি বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট নহে, সত্য নহে। বাস্তব-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে বাস্তব-অস্তিত্ব-হীন ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকাররূপ কার্য্য অনন্য বা অভিন্ন হইতে পারে না। সত্য এবং মিথ্যা, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—তাঁহার কৃত অর্থ তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতির বিরোধী।

শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যেরও বিরোধী। এক-বিজ্ঞানে কিরূপে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই ঋষি উদ্দালক মৃৎপিণ্ড ও মৃদ্বিকারের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন—মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকা, মৃদ্বিকারও তেমনি মৃত্তিকা ; উভয়েই অনন্য বা অভিন্ন। এজন্য মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে মৃদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মৃত্তিকাই সত্য, মৃদ্বিকার সত্য নহে ; মৃত্তিকারই অস্তিত্ব আছে, মৃদ্বিকারের কোনও অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ মৃদ্বিকার হইতেছে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, তদ্রূপ। ইহাতে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেননা, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তির জ্ঞানে রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না ; যেহেতু, শুক্তি ও রজত অনন্য বা অভিন্ন নহে। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত অর্থ মূল শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের এবং উদ্দেশ্যেরই বিরোধী।

বস্তুতঃ স্বীয় সম্প্রদায় হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তের খ্যাপনের উদ্দেশ্যে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর যেমন এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যের অর্থ-করণ-প্রসঙ্গেও তিনি আর এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কৌশলের আশ্রয়ে তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্প্রদায় হইতেই লব্ধ।

বাচারম্ভণাদি শ্রুতিবাক্যটীর প্রকৃত অর্থে যে বিকারের বিবর্ত্তত্ব বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না, বিকারের সত্যত্ব বা বাস্তবিক অস্তিত্বই যে খ্যাপিত হইয়াছে, শ্রীপাদ রামানুজাদির ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া মূলগ্রন্থের ৩।৩৭-৩৯ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অর্থের সহিত কোনও শ্রুতিবাক্যের বিরোধ নাই, উদ্দালকের উদ্দেশ্যের সহিতও বিরোধ নাই, অর্থাৎ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও সিদ্ধ হয় এবং কোনও নূতন শব্দের অধ্যাহারও করা হয় নাই, শ্রুতিকথিত কোনও শব্দের বর্জ্জনও করা হয় নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ যে শ্রুতিবাক্যটীর প্রকৃত অর্থ নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে ; তাঁহার অর্থ হইতেছে শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্যের বিরুদ্ধ।

তথাপি, যে-খানে যে-খানে শ্রীপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব-প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছেন, সে-খানে সে-খানেই তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে "বাচারম্ভণা"দি বাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব-খ্যাপনের প্রয়াসে

এই শ্রুতিবাক্যটীই—অর্থাৎ এই শ্রুতিবাক্যটীর আশ্রয়ে তিনি তাঁহার কল্পিত যে অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অর্থ ই—হইতেছে তাঁহার প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার মূল অবলম্বনটীই যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন এই অবলম্বনের সহায়তায় তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াই ব্যাসদেব **"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥** ২।১।১৪॥"-ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। সত্য কারণের পরিণাম বা বিকারও সত্য বলিয়া কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রদর্শনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই যে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব খ্যাপন করে, "আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-বাক্যে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

সূত্রস্থ "তদনন্যত্বম্"-শব্দের অর্থ হইতেছে "তয়োঃ (কার্য্যকারণয়োঃ) অনন্যত্বম্—কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব।" এই সূত্রের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "তস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে।" কিন্তু কার্য্যকালে তিনি "তদনন্যত্বম্" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"তস্য (ব্রহ্মণঃ) অনন্যত্বম্ (দ্বিতীয়বস্তুহীনত্বম্)—তাঁহার (ব্রহ্মের) অনন্যত্ব (দ্বিতীয়বস্তুহীনত্ব)"; অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগদাদি ব্রহ্মকার্য্য সত্য নহে, তাহারা মিথ্যা, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই; জগদাদি ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র; রজত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, তদ্রূপ। ব্যাসদেব "বাচারম্ভণাদি"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন; শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার উক্তির সমর্থনে "বাচারম্ভণাদি"-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা করিয়াছেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত স্বকল্পিত অর্থে, শ্রুতিবাক্যটীর স্বাভাবিক প্রকৃত অর্থে নহে। এইরূপে "তদনন্যত্বমিত্যাদি" ব্রহ্মসূত্রেও তিনি বিবর্ত্তবাদ দেখাইবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন (৩।৪৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"তদনন্যত্বমাদি"-সূত্রের পরে এই সূত্রেরই সমর্থক বা পরিপোষক "ভাবেচোপলব্ধেঃ॥ ২।১।১৫॥", "সত্ত্বাচ্চাবরস্য॥ ২।১।১৬॥", "অসদ্ব্যপদেশাৎ-ইত্যাদি॥ ২।১।১৭॥", "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ॥ ২।১।১৮॥", "পটবচ্চ॥ ২।১।১৯॥" এবং "যথা চ প্রাণাদি॥ ২।১।২০॥"—এই ছয়টী সূত্রেরও অবতারণা ব্যাসদেব করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রগুলির যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে কোনও স্থলেই বিবর্ত্তবাদের বা জগতের মিথ্যাত্বের অনুকূল কোনও কথাই তিনি বলেন নাই, বা বলিবার সুযোগ পায়েন নাই। তাঁহার ভাষ্য সর্ব্বত্রই পরিণাম-বাদের—জগতের সত্যত্বের—অনুকূল হইয়াছে (৩।৪৪-৪৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এমন কি, "সত্ত্বাচ্চাবরস্য॥ ২।১।১৬॥"-সূত্রভাষ্যের উপসংহারে তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন—কারণ ব্রহ্ম যেমন ত্রিকাল সত্য, তাঁহার কার্য্য জগৎও তেমনি ত্রিকাল সত্য; ব্রহ্মের সত্ত্বা যেমন ত্রিকালে কখনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, ব্রহ্মকার্য্য জগতের সত্ত্বাও তেমনি ত্রিকালে কখনও ব্যাভিচার প্রাপ্ত হয় না। "যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্। অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।" সত্ত্বা একই; এজন্যই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব।

উল্লিখিত ছয়টী ব্রহ্মসূত্র যখন "তদনন্যত্বমিত্যাদি"-সূত্রেরই পোষক বা সমর্থক, এবং এই ছয়টী সূত্রে যখন শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই জগতের সত্যত্বের (অর্থাৎ পরিণাম-বাদের) কথাই বলা হইয়াছে, তখন

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥ ২।১।১৪ ॥"—সূত্রটীতেও যে জগতের সত্যত্বের ( অর্থাৎ পরিণাম-বাদের ) কথাই বলা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। "তদনন্যত্বম্"-শব্দের প্রকরণ-বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর সর্ব্বপ্রথমে ( ২।১।১৪)-সূত্রে যে জগতের মিথ্যাত্বের ( অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদের ) কথা বলিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী ছয়টী সূত্রে তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, "তদনন্যত্বমিত্যাদি"-সূত্রের তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সূত্রটীর বাস্তব অর্থ নহে। জগতের মিথ্যাত্ব-খ্যাপন এই সূত্রের তাৎপর্য্য নহে, সত্যত্ব-খ্যাপনই তাৎপর্য্য। কারণরূপ ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্ম-কার্য্যরূপ জগৎ সত্য হইলেই উভয়ের অভিন্নত্ব সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা নহে। বিবর্ত্তবাদ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে, পরিণামবাদই তাঁহার অভিপ্রেত।

**প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ** ॥ ৩।২।২২ ॥-এই ব্রহ্মসূত্রটীর ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব ( তাঁহার বিবর্ত্তবাদ ) স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেল ( ৩।৪২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

এই সূত্রসম্বন্ধীয় বিবরণটী হইতেছে এই। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্তরূপ হইতেছে ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজঃ; এবং অমূর্ত্তরূপ হইতেছে মরুৎ এবং ব্যোম। পঞ্চভূতকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক জগৎকেই ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহ জাগিতে পারে এই যে—এই জগৎ যখন ব্রহ্মের রূপ, তখন এই জগতেই ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ, না কি জগতের অতিরিক্তও ব্রহ্ম আছেন? উল্লিখিত সূত্রে এই সন্দেহেরই নিরসন করা হইয়াছে—শ্রুতিকথিত "নেতি নেতি"-বাক্যের উপরই এই সূত্রটী প্রতিষ্ঠিত।

সূত্রে বলা হইয়াছে—"নেতি নেতি"-বাক্যে প্রস্তাবিত **এতাবত্ত্বই** নিষিদ্ধ হইয়াছে ( প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি )। ১।২।১৭-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু "এতাবত্ত্ব" বলিতে কি বুঝায়? "এতৎ"-শব্দের উত্তর পরিমাণ-অর্থে "বতুপ্"-প্রত্যয় করিয়া "এতাবৎ"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—অর্থ, "এতৎ পরিমাণম্ অস্য--ইহাই ইহার পরিমাণ।" "এতাবৎ"-এর ভাব হইল "এতাবত্ত্ব—এতাদৃশ-পরিমাণত্ব।" সুতরাং "এতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"-বাক্যের অর্থ যে "এতাদৃশ-পরিমাণত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে", তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে বুঝা যায়—জগৎপ্রপঞ্চের যে "পরিমাণ", ব্রহ্মসম্বন্ধে সেই "পরিমাণই" নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্ম ইত্যবগন্তব্যম্।—ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চই নিষিদ্ধ হইয়াছে; রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। ( পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়ের অনুবাদের অনুসরণে )।"

শ্রীপাদ রামানুজাদি সূত্রটীর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের অর্থ হইয়াছে—এতৎ-পরিমাণত্ব, প্রকৃত ( প্রস্তাবিত ) রূপপ্রপঞ্চের পরিমাণত্ব; সূত্রে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে—"এতাবত্ত্বম্"-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রকৃত-রূপপ্রপঞ্চ, প্রকৃত-রূপপ্রপঞ্চের পরিমাণত্ব শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত নহে। ইহাতে বুঝা যায়—"এতৎ"কেই--শ্রীপাদ শঙ্কর "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের তাৎপর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি "বতুপ্"প্রত্যয়কে বর্জ্জন করিয়া সূত্রের অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু "এতৎ" এবং "এতাবত্ত্বম্" একার্থক নহে ; "এতৎ"-শব্দে বুঝায় "ইহা", আর "এতাবত্ত্বম্"-শব্দে বুঝায় "ইহার পরিমাণত্ব।" বস্তু এবং বস্তুর পরিমাণত্ব এক কথা নহে। জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ শ্রীপাদ "এতাবত্ত্বম"-শব্দের "এতৎ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, সূত্রকথিত "এতাবত্ত্বম্"-শব্দটী রক্ষা করিলে জগৎ-প্রপঞ্চের পরিমাণত্ব-মাত্রের নিষেধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় না। জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধই শ্রীপাদ শঙ্করের অভীষ্ট বলিয়া—জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হইলেই জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা সত্যত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া—তিনি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সূত্রকথিত "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের "বতুপ্"-প্রত্যয়টী বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র "এতৎ"-শব্দটী রাখিয়াছেন এবং এই "এতৎ"-শব্দ ধরিয়াই তিনি সূত্রটীর অর্থ করিয়াছেন।

জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধই যদি ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি "প্রকৃতৈতৎ হি প্রতিষেধতি"ই বলিতেন, "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" বলিতেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে—অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব অস্তিত্ব-হীনতার কথা বলা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সূত্রের বা শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নির্ণয় করার প্রয়াস শ্রীপাদ শঙ্কর অধিকাংশ-স্থলেই করেন নাই ; সূত্রদ্বারা বা শ্রুতিবাক্যদ্বারা নিজের অভীষ্ট অর্থ প্রকাশ করাইবার চেষ্টাই প্রায় সর্ব্বত্র তিনি করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে নিজের সুবিধার জন্য কোনও স্থলে নূতন শব্দের অধ্যাহার করিতে হইয়াছে, কোনও স্থলে বা সূত্রকথিত বা শ্রুতিকথিত তাঁহার অনভিপ্রেত শব্দের বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। আলোচ্য সূত্রেও তিনি সেই ভাবেই "বতুপ্"-প্রত্যয়টী বাদ দিয়াছেন।

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। "কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থ-মালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ।—যদ্রূপ রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থসৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের ( মিথ্যার ) নিষেধ হইয়া থাকে।" তাঁহার মতে, রজ্জু হইতেছে পরমার্থ সৎ এবং রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই সর্প হইতেছে অপরামার্থ বা মিথ্যা। তদ্রূপ, ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ এবং জগৎ হইতেছে ( ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া—রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্পের ন্যায় ) অপরমার্থ বা মিথ্যা। ইহার প্রতিপাদনের নিমিত্তই, অর্থাৎ আলোচ্য সূত্র হইতে তাঁহার অভীষ্ট বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই, শ্রীপাদ শঙ্করকে "এতাবত্ত্বম্"-শব্দের "বতুপ্"-প্রত্যয়কে বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র "এতৎ"-শব্দ বাহির করিতে হইয়াছে।

অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ-স্থলেও কৌশল-বিশেষের অবলম্বনে আলোচ্য সূত্র হইতে তাঁহার অভীষ্ট বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্কর প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ যে ব্যাসদেবের সূত্রের তাৎপর্য্যের অনুকূল নহে—সুতরাং বেদান্ত-বিশ্বাসীদিগের গ্রহণীয় হইতে পারে না—উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

মূলকথা এই যে, শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ প্রস্থানত্রয়-সম্মত নহে ; ইহা তাঁহার বা তাঁহার সম্প্রদায়ের কল্পিত সিদ্ধান্ত, বেদান্ত-বিরোধী বলিয়া অবৈদিক।

বিবর্ত্তবাদ যে শ্রুতিসিদ্ধ নয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। ইহা যে যুক্তিসিদ্ধও নয়, তাহা মূলগ্রন্থের ৩।৫২ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি-স্থলে বাস্তব রজতের অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্যত্র রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে রজত-সম্বন্ধে কাহারও কোনওরূপ সংস্কারও জন্মিতে পারে না, সুতরাং শুক্তি-স্থলে রজতের ভ্রমও জন্মিতে পারে না। কেননা, পূর্ব্বদর্শনাদিজনিত সংস্কারকে আশ্রয় করিয়াই শুক্তি-আদি স্থলে রজতাদির ভ্রম জন্মে ( ৩।৫২ খ অনুচ্ছেদ )। সুতরাং বিবর্ত্তবাদেও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

আবার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সবিশেষ জগতের ভ্রমও অসম্ভব। শুক্তি সবিশেষ, রজতও সবিশেষ। শ্বেতত্ব-রূপ বিশেষত্ব শুক্তি ও রজতে সমভাবে বিদ্যমান্ থাকে বলিয়াই শুক্তিতে রজতের ভ্রম সম্ভব হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগতের দৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্বই থাকিতে পারে না বলিয়া জগতের ভ্রমও অসম্ভব হইয়া পড়ে ( ৩।৫২গ অনুচ্ছেদ )।

অনাদি-ভ্রমপরম্পরা-নিয়মও পরস্পরাশ্রয়-দোষদুষ্ট (৩।৫২ ঙ অনুচ্ছেদ )।

আবার, স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর ন্যায় জগতের মিথ্যাত্বও যুক্তিসিদ্ধ নহে ( ৩।৫৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ শাস্ত্রসিদ্ধও নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। পরিণাম-বাদই ব্যাসদেবের সম্মত; পরিণাম-বাদ স্বীকার করিলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, বিবর্ত্তবাদে তাহা হয় না।

পরিণাম-বাদই—সুতরাং জগতের সত্যত্বই—যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা শ্রুতি হইতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। শ্রুতিতে যে কেবল মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় বিকারের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইয়াছে, তাহা নহে; ছান্দোগ্যশ্রুতি ৬।১।৪-বাক্যে মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় দ্রব্যের উদাহরণ দিয়া তৎপরবর্ত্তী ৬।১।৫-বাক্যে সুবর্ণপিণ্ড এবং সুবর্ণালঙ্কারের এবং ৬।১।৬-বাক্যে লৌহ এবং লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের উদাহরণ দিয়াও এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-সিদ্ধির কথা জানাইয়াছেন। তিনটী দৃষ্টান্তই একজাতীয়—সত্যবস্তু ও তাহার সত্য বিকার-সম্বন্ধীয়। মৃদাদি বস্তুর ন্যায় মৃদাদির বিকার মৃণ্ময়-ঘটাদিও যে সত্য, এই তিনটী দৃষ্টান্তে শ্রুতি তাহা জানাইয়া প্রকাশ করিলেন যে—সৎ-ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্ম-বিকার জগৎও সত্য। বিকারের—অর্থাৎ জগতের—মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মেরই সত্যত্ব খ্যাপনই যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শুক্তি-রজতের এবং রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইত; কিন্তু শ্রুতি তাহা করেন নাই।

## জগতের সত্যত্ব

যাহা হউক, উল্লিখিত দৃষ্টান্তত্রয়ে বিকারের সত্যত্বের কথা বলিয়া, ব্রহ্ম-বিকার জগৎও যে সত্য—অস্তিত্ববিশিষ্ট—পরবর্ত্তী বাক্যদ্বয়ে শ্রুতি তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ৬।২।১॥" সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে এই জগৎ ( ইদম্ ) সৎ-স্বরূপ ( অস্তিত্ববিশিষ্ট—নামরূপে অনভিব্যক্ত—অথচ অস্তিত্ববিশিষ্ট ) ছিল, এই বাক্যে তাহাই বলা হইল। এই অস্তিত্ব ছিল অবশ্য সৎ-ব্রহ্মের

মধ্যে ; সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত জগৎ সৎ-ব্রহ্মেই অবস্থান করে। ( কিন্তু রজত যখন দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্বে তাহা শুক্তির মধ্যে থাকে না ; সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যটী বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল )।

ইহার পরে, সেই শ্রুতিবাক্যেরই শেষাংশে বলা হইয়াছে—“তদ্ধৈক আহুরসদেব ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।১ ॥—কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ ( অর্থাৎ এই জগৎ ) উৎপন্ন হইয়াছে।” এ-স্থলেও সৃষ্টির পরে দৃশ্যমান্ এই জগৎকে “সৎ” বা অস্তিত্ববিশিষ্ট বলা হইয়াছে।

অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—অসৎ হইতে কিরূপে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে ? সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎই ছিল। “কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।২ ॥” এ-স্থলেও সৃষ্টির পরবর্ত্তী এই দৃশ্যমান্ জগৎকে ( ইদম্‌কে ) “সৎ—অস্তিত্ববিশিষ্ট” বলা হইয়াছে।

কিরূপে সৎ-ব্রহ্ম হইতে সৎ-জগতের উৎপত্তি হইল, পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে শ্রুতি তাহাও বলিয়াছেন। সৎ-ব্রহ্ম সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে তেজের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পরে অপ্ বা জলের সৃষ্টি করিলেন ( ৬।২।৩ ), তাহার পরে অন্নের ( পৃথিবীর—ক্ষিতির ) সৃষ্টি করিলেন ( ৬।২।৪ ) ; তাহার পরে সৎ-ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন—তিনি ঐ তিনটী বস্তুতে ( তেজঃ, জল ও পৃথিবীতে ) জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিবেন ( ৬।৩।২ ) ; তাহার পরে তিনি ঐ তিনটী বস্তুকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়া জীবাত্মারূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের অভিব্যক্তি করিলেন ( ৬।৩।৩ )।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৎ-ব্রহ্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বকই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। যাহা সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্ট, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা, তাহার আবার তেজ-আদি বিভিন্ন নামই বা কিরূপে থাকিতে পারে ? তাহার আবার ত্রিবৃৎ-করণেরই বা সার্থকতা কি থাকিতে পারে ? জীবাত্মারূপে আবার তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মের প্রবেশই বা কিরূপে হইতে পারে ?

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”, “আনন্দাদ্ধ্যেবাতানি ভূতানি জায়ন্তে”, “তজ্জলান্”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও সত্য সৃষ্টির কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এতজ্জাতীয় শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বও মিথ্যা হইয়া পড়ে। মিথ্যাবস্তুর আবার সৃষ্টি কি ? একমাত্র সত্য বস্তুরই সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে।

কেহ কেহ শুক্তি-স্থলে যে রজত দেখেন, তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে ; শুক্তিও রজতের সৃষ্টি করে না, দ্রষ্টাও করে না। ইহা হইতেছে দ্রষ্টার পূর্ব্বসংস্কার হইতে উদ্ভূত একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। শুক্তি দৃষ্ট হইলে রজত আর দৃষ্ট হয় না, ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হয়। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম-দর্শন হইলেও এই জগৎ আর দৃষ্ট হইবে না।

কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হইলে যে এই জগৎ আর দৃষ্ট হইবে না, তাহার প্রমাণ কোথায় ? “যত্র নান্যৎ পশ্যতি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। না—তাহা নয়। ব্রহ্মদর্শন হইলে এই জগৎ যে দৃষ্ট হয় না,

তাহা এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে। এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং প্রলয়ে ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। "সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ," "তজ্জলান্"-ইত্যাদি। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন মায়ামুগ্ধ জীব ইহা বুঝিতে পারে না, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে "অন্য বা ভিন্ন" একটী পদার্থ বলিয়াই মনে করে। কিন্তু যখন ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, তখনই ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে বলিয়া বুঝিতে পারে—এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে "অন্য বা ভিন্ন" নহে, জগৎ ব্রহ্মাত্মকই। ইহাই "যত্র নান্যৎ পশ্যতি"—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্যই "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি বাক্যের সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ। মৃত্তিকা ও মৃণ্ময় দ্রব্যের দৃষ্টান্তের সহিতও ইহারই সঙ্গতি আছে। মৃৎপিণ্ড দৃষ্ট হইলেও তাহার পাশ্ববর্ত্তী মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদি দৃষ্ট হয়। মৃদ্বিকারের সহিত মৃৎপিণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ, জগতের সহিতও ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধের কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের সহিত শুক্তির যে সম্বন্ধ, জগতের সহিত যে ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধ, শ্রুতি তাহা কোনও স্থলেই বলেন নাই।

শ্রুতি হইতে এইরূপে জানা গেল—পরিণাম-বাদই শাস্ত্রসম্মত, বিবর্ত্তবাদ নহে; জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য, বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট, এই অস্তিত্ব অবশ্য অনিত্য।

"জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয় ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৫৭ ॥"

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মহামান্য স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও বলিয়াছেন—জগতের মিথ্যাত্ব বেদে দৃষ্ট হয় না, পরিণামবাদই বেদের অভিপ্রেত। (১)

## ২৩। বেদান্তে মোক্ষতত্ত্ব

মায়ামুগ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে তাহার কর্ম্মফল অনুসারে নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছে। মহাপ্রলয়ে তাহার দেহ না থাকিলেও তাহার সঙ্গে কর্ম্মফল থাকে; এই কর্ম্মফল-জড়িত রূপও তাহার একটী রূপ, স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটী রূপ। এই সমস্ত অন্যবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখনই বলা হয়, তাহার মোক্ষ বা মুক্তিলাভ হইয়াছে।

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ শ্রীভা. ২।১০।৬ ॥

তাহা হইলে, মোক্ষের স্বরূপ জানিতে হইলে জীবের স্বরূপ কি, তাহা জানা দরকার।

জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্থানত্রয়-মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্রূপ—সুতরাং নিত্য এবং জীবের

---

(১) We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rg. Veda. The world is not a purposeless phantasm, but is just the evolution of God.—Indian Philosophy Vol I, P- 103-4 ; by Sir Radhakrishnan.

There is hardly any suggesion in the Upanisads that the entire universe of changes, is a baseless fabric of fancy, a mere phenominal show, or a world of shadows.—Ibid, P. 186.

পরিমাণ হইতেছে স্বরূপতঃ অণু ; জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ। জীবের পরিমাণগত অণুত্ব তাহার স্বরূপগত বলিয়া অণুত্বও নিত্য এবং অণুত্ব নিত্য বলিয়া মোক্ষাবস্থাতেও তাহার অণুত্ব থাকিবে। মোক্ষাবস্থাতেও জীবের অণুত্ব থাকে বলিয়া মুক্তজীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে কয়েকটী সূত্রে মুক্তজীবের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি দেখাইয়াছেন, মুক্তজীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করে। ১।২।৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করে বটে ; কিন্তু সে-স্থলেও জীব অণুরূপে স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে জীব পৃথক্ দেহ লাভ করে ; কিন্তু এই পৃথক্ দেহও চিন্ময়, অপ্রাকৃত ; ইহা প্রাকৃত জড়দেহ নহে। পৃথক্ দেহ প্রাপ্তি, বা অণু-স্বরূপে দেহহীনতা, জীবের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। যাঁহারা পরব্রহ্ম ভগবানের সেবাপ্রার্থী, তাঁহারা সেবার উপযোগী পৃথক্ দেহই কামনা করেন এবং তাহা পাইয়াও থাকেন। এই সেবোপযোগী দেহ অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া, কর্ম্মফলজাত নহে বলিয়া, বন্ধনের পরিচায়ক নহে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সেবাবাসনাও বন্ধনের হেতু বা বন্ধনের পরিচায়ক নহে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাই মায়াবন্ধনের হেতু। ভগবৎ-সেবাবাসনায় স্বসুখ-বাসনা থাকে না, থাকে কেবল ভগবৎ-প্রীতি-বাসনা ; এজন্য ইহা দূষণীয় নয়। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি"-বাক্যে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়ের প্রীতিবিধানই হইতেছে প্রিয়ের উপাসনা।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায় ( ১।২।৪১-৪৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তাবস্থায় যদি জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে, তাহা হইলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে সঙ্গতি থাকিতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। প্রস্থানত্রয়ের মতে জীব যখন স্বরূপে অণুপরিমিত এবং ব্রহ্ম যখন স্বরূপে বিভু-পরিমিত, তখন জীব কোন অবস্থাতেই বিভু হইতে পারে না। কোনও বস্তুই কখনও তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না, বা হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে সার্থকতা লাভ করে নাই, জীবের বিভুত্ব যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাস্ত্রানুসারে জীব যখন স্বরূপে অণুপরিমিত, সুতরাং মোক্ষাবস্থাতেও যে তাহার অণুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সুতরাং পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং ব্যাসদেবও যে তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"-প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

"এব"-শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে—অবধারণে এবং ঔপম্যে বা সাদৃশ্যে। অবধারণ-অর্থ গ্রহণ করিলে

"ব্রহ্মৈব ভবতি"-বাক্যের অর্থ হয়—"ব্রহ্মাই হয়।" কিন্তু ইহা প্রস্থানত্রয়ের বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। দ্বিতীয় "ঔপম্য বা সাদৃশ্য"-অর্থ গ্রহণ করিলে "ব্রহ্মৈব ভবতি"-বাক্যের অর্থ হয়—"ব্রহ্মতুল্য হয়।" অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণে মুক্ত জীব ব্রহ্মতুল্য হয়েন ; অবশ্য সৃষ্টি-আদির ক্ষমতা মুক্ত জীব পাইতে পারেন না, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ৪।৪।১৭ ॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভোগ-বিষয়েও মুক্তজীবের ব্রহ্মসাম্য জন্মে, "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ৪।৪।২১ ॥"-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

মুক্তজীব যে ব্রহ্মের সমান ধর্ম্ম লাভ করেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ১৪।২ ॥"

এ-স্থলে "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন"—এই বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ—আমার সাম্য প্রাপ্ত হয়েন"; শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ।" তাৎপর্য্য—অপহতপাপ্মত্বাদি আটটী গুণে সাম্য—ইহাই সাধর্ম্ম্য।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ভেদানুভ্যুপগমাৎ।—সাধর্ম্ম্য অর্থ মৎস্বরূপতা। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। কিন্তু সাধর্ম্ম্য অর্থ সমানধর্ম্মতা নহে ; কেননা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত নহে।"

এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার পুরাতন কাহিনীই কীর্ত্তন করিয়াছেন। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ-করণ-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই তাঁহার সম্প্রদায়ের অভিমত। তাই বেদান্তের মত যাহাই হউক না কেন, এবং জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইলেও, যে-খানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সে-খানেই তিনি জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্বের কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলেও তিনি বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ভেদানুভ্যুপগমাৎ—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত হয় না বলিয়া।" কিন্তু "সাধর্ম্ম্য"-শব্দের স্বাভাবিক অর্থই হইতেছে "সমানধর্ম্মতা" ; এই অর্থ স্বীকার করিলে জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। সাম্প্রদায়িকভাবে আবিষ্ট আচার্য্যপাদ তাহা স্বীকার করিতে পারেন না বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—"সাধর্ম্ম্য"-শব্দের অর্থ "সমানধর্ম্মতা" নহে, ইহার অর্থ হইবে—"মৎস্বরূপতা—ব্রহ্মস্বরূপতা।" তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "মৎস্বরূপতা" না বলিয়া "মম সাধর্ম্ম্যং" বলা হইল কেন? তবে কি গীতাতে ভুল বলা হইয়াছে? ভুল হইলে এই ভুল কাহার? শ্রীকৃষ্ণের? না কি ব্যাসদেবের?

যাহা হউক, এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর গীতাবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, বরং গীতাবাক্যের অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া তাহা হইতে নিজের অভীষ্ট অর্থ নিষ্কাশিত করারই প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার এই অর্থ বিচারসহ হইতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কোনও স্থলেই জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হয় নাই।

যাহা হউক, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—প্রভৃতি বাক্যে "এব"-শব্দটীর "ঔপম্য" অর্থ গ্রহণ করিলেই প্রস্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে; "অবধারণ"-অর্থ গ্রহণ করিলে প্রস্থান-ত্রয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ( ২।৪৭-৫৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

"তত্ত্বমসি"-বাক্যে যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—প্রস্থানত্রয়ের মতে মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

শ্রুতি-স্মৃতিকথিত মুক্তির পাঁচটী প্রকার থাকিলেও মুক্তজীবের অবস্থানভেদেই মুক্তির প্রকারভেদ। মুক্তত্বের ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না [ ১।৩।৬৮ ক (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। কেহ ব্রহ্মের মধ্যে থাকেন, কেহ সেবোপযোগী পৃথক্ দেহে বিভিন্ন রূপ সেবার ব্যপদেশে বিভিন্ন ভাবে থাকেন—ইহাই হইতেছে মুক্তজীবের অবস্থান-ভেদ।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-কথিতা মুক্তির আত্যন্তিকত্ব স্বীকার করেন না; কেননা, এইরূপ মুক্তিতে ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। তাঁহার মতে জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখনই তাহার মুক্তি; যতক্ষণ জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিবে, ততক্ষণ তাহাকে মুক্ত বলা যায় না; কেননা, ততক্ষণ জীব তাহার স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া জীব যখন ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখনই তাহার মোক্ষ হইয়াছে বলা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতের আনুগত্যে জীবব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই, শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের সহায়তায় জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়াও তাঁহার সাম্প্রদায়িক মতই সর্ব্বত্র খ্যাপন করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মের সহিত একত্ব-প্রাপ্তিকেই তিনি মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মুক্তিকে আত্যন্তিকী বা পারমার্থিকী মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। বলাবাহুল্য মোক্ষ-সম্বন্ধে তাঁহার এই অভিমত বেদান্ত-বিরুদ্ধ। বিশেষ আলোচনা ১।২।৬৮ ক, খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

## ২৪। বেদান্তে সাধনতত্ত্ব

অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ জীব অনাদি-কাল হইতেই পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছে; তাহার ফলেই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-আদি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অনাদি কাল হইতে ভগবৎ-বিস্মৃতি, ভগবৎ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাই যখন এ-সমস্ত দুঃখদৈন্যের হেতু, তখন এই হেতুর অপসারণেই দুঃখ-দৈন্যের অবসান হইতে পারে; ইহার আর অন্য পন্থা নাই। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—তাঁহাকেই ( পরব্রহ্ম ভগবান্‌কেই ) জানিতে পারিলে মৃত্যুর ( সুতরাং জন্মের এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্য-বর্ত্তীকালের জরা-ব্যাধি-আদি দুঃখদৈন্যের ) অতীত হওয়া যায়; ইহার আর অন্য কোনও পন্থা নাই।"

অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ জীবের মায়াবন্ধন এবং মায়াবন্ধন হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি। যতদিন মায়ার বন্ধন থাকিবে, ততদিন জীবের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিও থাকিবে। মায়াবন্ধনকে, অর্থাৎ

মায়াকে, অপসারিত করিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, মোক্ষ লাভ হইতে পারে। মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি-লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে পরব্রহ্মকে জানা। ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। আলোকের আনয়ন ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যেমন অন্ধকারকে দূরীভূত করা যায় না, তদ্রূপ।

জীব নিজের শক্তিতে কি মায়াকে দূরীভূত করিতে পারে না? সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা যায়—জীবের পক্ষে মায়া দুরতিক্রমণীয়া; কেননা, ত্রিগুণময়ী মায়া হইতেছে ঈশ্বরের শক্তি। যাঁহারা ঈশ্বর-ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, কেবল তাঁহারাই মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—গীতা॥ ৭।১৪॥ অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যে, উল্লিখিত শ্লোক-প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটী প্রশ্ন করাইয়াছেন। "তোমার শরণাপন্ন না হইলে যদি মায়া হইতে অব্যাহতি পাওয়া না-ই যায়, তাহা হইলে সকলে তোমার ভজন করে না কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যাহারা মূঢ়, নরাধম, দুষ্কৃতকারী, মায়াদ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুর-সুলভ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজন করে না (সুতরাং মায়া হইতে নিষ্কৃতি, অর্থাৎ মোক্ষও লাভ করিতে পারে না)।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীতা॥ ৭।১৫॥

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—(যাঁহারা উল্লিখিতরূপ দুষ্কৃতকারী, তাঁহারাই আমার শরণ গ্রহণ করে না, আমার ভজন করে না; কিন্তু) যাঁহারা সুকৃতি, তাঁহারা আমার ভজন করেন। হে অর্জ্জুন! হে ভরতর্ষভ! যাঁহারা আমার ভজন করেন, সেই সুকৃতি লোকগণ স্ব-স্ব-অভিপ্রায় অনুসারে চারি রকমের—আর্ত্ত (রোগাদি হইতে অব্যাহতিকামী), অর্থার্থী (পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগকামী), জিজ্ঞাসু (ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানকামী) এবং জ্ঞানী (জ্ঞানমার্গের সাধনে মোক্ষকামী)।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা॥ ৭।১৬॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥

গীতা ৭।২৮-২৯॥

—যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারীদের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, (শিতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সে সকল ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার ভজন করেন। জরা ও মরণ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত

যাঁহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যত্ন ( সাধন ) করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সমস্ত আত্মতত্ত্ব এবং অখিল কর্ম্মকেও অবগত হইয়া থাকেন।”

এই সমস্ত গীতোক্তি হইতে জানা গেল—যাঁহারা ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ চাহেন, তাঁহাদিগকেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হয় ; কেননা, একমাত্র তিনিই ফলদাতা। “ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥” ; আর যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহাদিগকেও তাঁহারই ভজন করিতে হয়। অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

উল্লিখিত ৭।২৯-গীতা-শ্লোক হইতে ইহাও জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলেই ব্রহ্মকেও ( শ্রীকৃষ্ণকেও ) জানা যায়। গীতার অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ গীতা ॥ ১৮।৫৫ ॥

—আমি পরিমাণে যতখানি ( সর্ব্বব্যাপী ) এবং স্বরূপতঃ যাহা, ভক্তিদ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে জানা যায়। আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া অনন্তর ( জানার অব্যবহিত পরেই ) আমাতে প্রবেশ করিতে ( অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে ) পারা যায়।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত “তমেব বিদিত্বা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরব্রহ্মকে জানার কথা বলা হইয়াছে, সেই জানার উপায় কি ? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে জানা গেল—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। “যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ”-এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য এবং “ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি”-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন—ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়।

শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন—“মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮।১৫ ॥ মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬ ॥”—তাঁহাকে পাইলেই আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহা হইতে বুঝা গেল—ব্রহ্মকে পাওয়া এবং ব্রহ্মকে জানা একই কথা। “পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ॥ ১।৫ ॥”-এই শ্রুতিবাক্য হইতে পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাপ্তির কথা জানা যায়। “অধিগম্যতে—প্রাপ্যতে ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥” “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ”-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-১১।১৪।২১-বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। পরাবিদ্যাই ভক্তি ( ৫।৪৮ গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়, জানা যায়। তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই—মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই ; “মামেব যে প্রপদ্যন্তে”—এই গীতাবাক্যের “এব”-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্যই তাঁহার ভজনের প্রয়োজন। ইহাই হইল শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সাধন।

উল্লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ভক্তি ( সাধনভক্তি ) অপরিহার্য্যা। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। মোক্ষ-প্রাপক যত রকম সাধন-পন্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, এই গীতাবাক্যটী হইতেছে, তাহাদের সাধারণ ভূমিকা। এজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। যথা,

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥২।৬১ ॥"-শ্লোকে "মৎপরঃ"-শব্দে ; তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ-প্রসঙ্গে "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ॥ ৩০ ॥"-বাক্যে ; চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪।১০ ॥"-বাক্যে ; পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি"-ইত্যাদি ॥ ৫।১০ ॥, এবং "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ॥৫।১৭ ॥"-বাক্যে ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪ ॥", "সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ॥ ৬।১৩১ ॥", এবং "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে" ইত্যাদি ৬।৪৭ ॥"-বাক্যে ; সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ"-ইত্যাদি ৭।১ ॥-বাক্যে, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্"-ইত্যাদি ৭।১৪ ॥-বাক্যে, "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন"-ইত্যাদি ৭।১৬ ॥-বাক্যে, এবং "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে"-ইত্যাদি ৭।২৯ ॥-বাক্যে ; অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষরব্রহ্মযোগ-কথন-প্রসঙ্গে "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর"-ইত্যাদি ৮।৭ ॥-বাক্যে, "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ-ইত্যাদি" ৮।১৪ ॥-বাক্যে এবং "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ॥ ৮।২২ ॥"-বাক্যে ; নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ-প্রসঙ্গে "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসঃ ॥" ইত্যাদি ৯।১৩ ॥-বাক্যে, "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ"-ইত্যাদি ৯।১৪ ॥-বাক্যে, "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে"-ইত্যাদি ৯।২২ ॥-বাক্যে, "যৎ করোষি যদশ্নাসি"-ইত্যাদি ৯।২৭ ॥-বাক্যে, "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা"-ইত্যাদি ৯।২৯ ॥-বাক্যে এবং "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"-ইত্যাদি ৯।৩৪ ॥-বাক্যে ; দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ-প্রসঙ্গে "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং"-ইত্যাদি ১০।৯ ॥-বাক্যে ; একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনযোগ-প্রসঙ্গে "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য" ইত্যাদি ১১।৫৪ ॥-বাক্যে এবং "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ"-ইত্যাদি ১১।৫৫ ॥-বাক্যে ; দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥" ইত্যাদি ১২।২ ॥-বাক্যে এবং "অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্"-ইত্যাদি ১২।১০ ॥-বাক্যে ; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগপ্রসঙ্গে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"-ইত্যাদি ১৩।১১ ॥-বাক্যে এবং "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়"-ইত্যাদি ১৩।১৯ ॥-বাক্যে ; চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগযোগ-প্রসঙ্গে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ॥"-ইত্যাদি ১৪।২৬ ॥-বাক্যে ; পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগ-প্রসঙ্গে "স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥"-ইত্যাদি ১৫।১৯ ॥-বাক্যে, ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ-প্রসঙ্গে "মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়"-ইত্যাদি ১৬।২০ ॥-বাক্যে ; সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ-প্রসঙ্গে ১৭।২৩-শ্লোকে "ওঁ, তৎ, সৎ"-ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ-নামের উল্লেখপূর্ব্বক পরবর্ত্তী ১৭।২৪-২৭-

শ্লোকচতুষ্টয়ে যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াদিতে উল্লিখিত নামত্রয়ের উল্লেখের উপদেশে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ-প্রসঙ্গে "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"-ইত্যাদি ১৮।৫৫-৫৮॥-শ্লোকসমূহে কথিত বাক্যে এবং সর্ব্বশেষে "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদযাজী।"-ইত্যাদি ১৮।৬৫-৬৬॥-শ্লোকদ্বয়ে কথিত বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের প্রতি ভক্তিরই ( সাধনভক্তিরই ) উপদেশ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল---গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায় ব্যতীত অন্য প্রত্যেক অধ্যায়েই বিভিন্ন সাধনপন্থার প্রত্যেকটীর সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। ( প্রথম অধ্যায় হইতেছে অর্জ্জুনবিষাদযোগ ; ইহাতে কোনও সাধনপন্থার কথা বলা হয় নাই )। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়ভোগ্য কাম্য কর্ম্মলাভের জন্যই হউক, কি মোক্ষ-লাভের জন্যই হউক, ভক্তি-সাধন অপরিহার্য্য।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে ভক্তির অপরিহার্য্যতার হেতুও আছে। মোক্ষের তাৎপর্য্যই হইতেছে মায়ার এবং মায়ার প্রভাবের সম্যক্‌রূপে অপসারণ। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ( যাহার অপর নাম স্বরূপ-শক্তি ) ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে বা মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে পারে না ( ১।১।২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ( ৫।৫৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই সানভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ মায়ার গুণত্রয়কে অপসারিত করিয়া থাকে। এজন্য মোক্ষ-প্রাপক সাধনে ভক্তির সাহচর্য্য অপরিহার্য্য।

উল্লিখিত গীতাবাক্যসমূহে অন্বয়ীমুখেই ভক্তির অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যতিরেকী মুখেও সে-কথা জানা যায়।

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪॥

---( ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন ) হে বিভো! শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় যে ভক্তি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা সাধনের ক্লেশ স্বীকার করেন, সেই ক্লেশই তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে ( অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাধন সেই ক্লেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় ), অন্য কিছু না। অন্তঃসারহীন স্থূল তুষের উপরে যাঁহারা আঘাত করেন, আঘাতের ক্লেশব্যতীত অপর কিছুই যেমন তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ।"

এইরূপে দেখা গেল—বেদ এবং বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্র অন্বয়ীমুখে এবং ব্যতিরেকীমুখেও সাধন-ভক্তির সাহচর্য্যের অপরিহার্য্যতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি যেই পন্থাবলম্বীই হউন না কেন, সেই পন্থার জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভক্তির সাধন করিলেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবেন, ভক্তিকে বাদ দিলে অভীষ্ট লাভ হইবে না। ইহাই হইতেছে বেদবিহিত সাধন-পন্থার মর্ম্ম কথা।

### শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তিনি পরব্রহ্মের কোনওরূপ শক্তিই যখন

স্বীকার করেন না, তখন তাঁহার পক্ষে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির উপাদেয়তা স্বীকার সম্ভবপর হইতে পারে না।

তাঁহার মতে তাঁহার কল্পিত অর্থানুসারে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থালোচনা—চিন্তাই—মোক্ষ-লাভের একমাত্র উপায়; অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম—সোহহং" অনবরত এইরূপ চিন্তা করিলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে (তাঁহার মতে মোক্ষ হইতেছে—ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া)।

উল্লিখিতরূপে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের চিন্তাতেই যদি মোক্ষ লাভ, অর্থাৎ মায়ার সম্যক্ অপসারণ, সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, সাধক কেবল নিজের সামর্থ্যেই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেন। তাহা হইলে "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—এই গীতাবাক্যই মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"—এই শ্রুতিবাক্যও মিথ্যা হইয়া পড়ে।

অবশ্য গীতার বাক্যকে নিজের মতের অনুবর্তন করাইবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। গীতা ৮।২২-শ্লোকের "ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়াঽনন্যয়া আত্ম-বিষয়য়া"; গীতা ১৮।৫৫-শ্লোকের "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"-বাক্যের অর্থেও তিনি লিখিয়াছেন"—জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতি"; গীতা ১৮।৫৪-শ্লোকের "মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্‌ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে চতুর্বিবধা ভজন্তে মামিত্যুক্তম্।" এই সকল স্থলে তিনি "ভক্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"জ্ঞান"। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "জ্ঞান"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান"; তাহাকেই তিনি "ভক্তি" বলিয়াছেন। "ভক্তি"-শব্দের মুখ্যার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, শ্রীপাদ শঙ্করের ইহা একটী অদ্ভুত অর্থ। "ভজ্"-ধাতু হইতে "ভক্তি"-শব্দ নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা; ভক্তি-শব্দের অর্থও সেবা। যেখানে "সেবা", সেখানেই সেব্য এবং সেবকের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে; নচেৎ কে কাহাকে সেবা করিবে? ব্রহ্ম বা ভগবান্ সেব্য, সাধক তাঁহার সেবক; ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান, তাহাই সেবা, তাহাই ভজন বা ভক্তি। গোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরস্য ভজনমিহামুত্রাত্যুপাধিনৈরস্যেন অমুস্মিন্ মনঃকল্পনম্।" কিন্তু জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে সেব্যসেবক-ভাবেরই অভাব; ইহা কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? যাহা হউক, গীতোক্ত ভক্তি-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াই তিনি সেব্য-সেবক-ভাবানুগতা "ভক্তি"কে উড়াইয়া দিয়া তৎ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যভাবনারূপ "জ্ঞান"কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে, সুতরাং তাঁহার কল্পিত অর্থানুসারে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থচিন্তাতেই, মোক্ষ লাভ হইতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশ অভিমত তাঁহার নিজেরই কল্পিত, ইহা শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ।

বস্তুতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের প্রসঙ্গ গীতায় নাই। গীতায় যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহা হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের তত্ত্ব-জ্ঞান—তিনি তত্ত্বতঃ যাহা, যৎপরিমাণক, তাহার জ্ঞান, "ভক্ত্যা

মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮।৫৫ ॥” ; তিনি যে সর্ব্বভূত-মহেশ্বর, তাহার জ্ঞান—“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১ ॥” ; তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য, তৎ সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ জ্ঞান—“জন্ম কর্ম্ম মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯ ॥” এইরূপই হইতেছে গীতোক্ত জ্ঞান ; ইহা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান নহে। (১)

গীতাতে মোক্ষলাভের যে-সমস্ত উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই গীতার প্রতিপাদ্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার উপদেশ। গীতার প্রতিপাদ্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সবিশেষ ; তিনি শঙ্করকথিত নির্ব্বিশেষ-সত্তামাত্র নহেন। (২) এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেই যে মোক্ষ-প্রাপ্তি সম্ভব, গীতায় তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় এবং তাঁহার নিজস্ব-ভাষায় “সগুণ” ব্রহ্ম বা “ঈশ্বর” বলেন। শ্রীপাদ শঙ্কর ছান্দোগ্যশ্রুতির অষ্টম-প্রপাঠকের ভাষ্যোপক্রমে এবং “বিকারাবর্ত্তি চ ॥ ৪।৪।১৯”-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে না ; কেবল নিম্ন অধিকারীদের সৎপথবর্ত্তী হওয়ার জন্যই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ( ১।২।৬৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তিও শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ।

এইরূপে দেখা গেল—সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধেও শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত হইতেছে বেদবিরুদ্ধ।

## ২৫। শ্রীপাদ শঙ্কর ও মায়া

শ্রীপাদ শঙ্কর যে মায়ার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদিকী মায়ার সঙ্গতি নাই। বৈদিকী মায়া পরব্রহ্মের শক্তি, শঙ্করের মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া কেবল মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী, বৈদিকী মায়া তাহা নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা, বৈদিকী মায়া সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা নহে। শ্রীপাদ শঙ্করের

---

( ১ ) “সাধনাবলীর দিক্ থেকেও শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনো প্রমাণ গীতায় নেই।”—প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী লিখিত “গীতায় অদ্বৈতবাদ”-প্রবন্ধ, ৭৭ পৃষ্ঠা। “শুদ্ধজ্ঞানবাদী শঙ্করকে সেজন্য তাঁর গীতাভাষ্যে বহুস্থলেই কষ্টকল্পনা, অহৈতুকী শব্দযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।” ঐ ঐ, ৭৮ পৃষ্ঠা।

(২) “গীতার ‘পুরুষোত্তম’ অদ্বৈত-বেদান্ত-মতানুসারী, শুদ্ধজ্ঞানলভ্য, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute নন ; বৈষ্ণব-বেদান্ত-মতানুসারী কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, ভগবান্ বা Personal God—যাঁর স্থান কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মেরও উপরে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবিখ্যাত ‘Essays on Gita’তে সত্যই বলেছেন

**‘But the Gita is going to represent Iswara, the Puroshottama, as higher even than still and immutable Brahma and the loss of the ego in the Impersonal comes only as a great and initial step toward Union with Puroshottama. This is the supreme, divine God, who possesses both the infinite and the finite, and in whom the personal and the impersonal, the one self and the many existences are united’.**

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর-মতবিরোধী বলে, শঙ্কর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁর গীতা-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপনে সমর্থ হন নি।” ঐ ঐ ৮১ পৃষ্ঠা।

মায়া মিথ্যা, বৈদিকী মায়া মিথ্যা নহে। এই জাতীয় অনেক বিষয়ে বৈদিকীমায়া হইতে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ( ১।২।৬৯-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য )।

অথচ, শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যে যে-খানেই "মায়া"-শব্দ আছে, সেখানেই শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার স্বীকৃত মায়ার অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিয়াছেন ; তিনি কোনও স্থলেই বৈদিকী মায়ার অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এজন্যই তাঁহার অর্থে শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বেদবাক্যে যে-স্থলে "মায়া"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বৈদিকী মায়ার অর্থেই তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে ; সে-স্থলে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিলে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইতে পারে না।

জীব-জগতের মিথ্যাত্ব, প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন অপ্রাকৃতবিশেষত্বময় শ্রুতি-স্মৃতিকথিত সবিশেষ ব্রহ্মের "সগুণত্ব—মায়োপহিত্ব" এবং এই জাতীয় তাঁহার স্বীকৃত অন্যান্য তত্ত্বের প্রতিপাদন-ব্যাপারে শ্রীপাদ শঙ্কর একান্তভাবে তাঁহার কল্পিত অবৈদিকী মায়ারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার ভাষ্যকে মায়াবাদ-ভাষ্য বলা হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত, ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব—ইহাদের একটীও বেদান্ত-সম্মত নহে।

## ২৬। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত

### ক। ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন

লোকের দৃষ্ট-শ্রুত ব্যাপারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইরূপ একটী প্রবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে যে, "ইতিহাস নিজেকে পুনরাবর্ত্তিত করে"—"History repeats itself." একই ঘটনা-পরম্পরা যেন চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। বেদান্তও ইহা স্বীকার করেন। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়—ইত্যাদি রূপে প্রবাহাকারে অনাদিকাল হইতেই সৃষ্টি-প্রলয় চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মধ্যেও আবার সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই যুগ-চতুষ্টয় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতি কল্পের সৃষ্টিও আবার পূর্ব্বকল্পানুরূপই হইতেছে, বেদোপনিষদাদি তাহাও বলিয়া গিয়াছে ( অবতরণিকা। ৬-অনুচ্ছেদ, ১২ পৃষ্ঠা-দ্রষ্টব্য )। ইহাও এক জাতীয় ঘটনা-পরম্পরার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনই। যাহা হউক, প্রতি কল্পেই যখন সাধারণভাবে এক রকমের সৃষ্টিই হয়, তখন প্রতিকল্পেই যে বিভিন্ন ভাববিশিষ্ট—দৈব-স্বভাবাপন্ন, আসুর-স্বভাবাপন্ন, ইত্যাদি—লোক থাকিতে পারেন, প্রতি কল্পেই যে বেদমতাবলম্বী এবং বেদবিরুদ্ধবাদী লোকও থাকিতে পারেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং বেদমতাবলম্বী, চার্ব্বাক-মতাবলম্বী, জৈন-মতাবলম্বী, বৌদ্ধমতাবলম্বী, শঙ্করের মায়াবাদ-মতের অনুরূপ মতাবলম্বী লোকও সকল কল্পেই থাকিতে পারেন।

### খ। পদ্মপুরাণের উক্তি ও তাৎপর্য্য

সকল কল্পেই শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইয়াছে। পুরাণ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।
মযৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ॥ ২৫।৭ ॥

—( মহাদেব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন ) হে দেবি ! কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমিই মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছি। এই অসৎ-শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বলা হয়।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিতেও যে মায়াবাদ প্রচলিত ছিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিতেও যে এই মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হইত, শ্লোকস্থ "বিহিতং"-এই অতীতকালবাচী ক্রিয়াপদ হইতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা বাস্তবিক বৌদ্ধমতই, কেবল বেদবাক্যের বহিরাবরণে ইহাকে প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে, ইহাই বিশেষত্ব। শর্করাবৃত তিক্ত ( শর্করার মিষ্টত্বের বিরোধী তিক্ত ) ঔষধের ন্যায় ইহাও বেদবাক্যদ্বারা আবৃত বেদবিরোধী মত।

কিন্তু মঙ্গলময় মহাদেব কেন এইরূপ করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরও সেই পদ্মপুরাণ হইতেই জানা যায়।

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ॥ ৬২।৩১ ॥

—( শ্রীভগবান্ মহাদেবকে বলিয়াছেন ) হে শিব ! তুমি স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্রদ্বারা লোকসকলকে আমা হইতে বিমুখ ( আমার ভজনে পরাঙ্মুখ ) কর এবং আমাকেও গোপন কর—যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।"

ইহাতে বুঝা যায়—উল্লিখিত কল্পিত ( অর্থাৎ বেদবহির্ভূত ) আগম-শাস্ত্র পাঠ করিলে লোক ভগবত্তত্ত্বাদি কিছু জানিতে পারে না, ভগবদ্‌ভজনেও উন্মুখ হইতে পারে না, বিষয়সুখে মত্ত হইয়া প্রজাবৃদ্ধির জন্যই চেষ্টিত হয়।

কিন্তু পরম-করুণ ভগবান্, লোক-নিস্তারই যাঁহার স্বভাব ( লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫ ), সেই ভগবান্ কেন মহাদেবকে এইরূপ আদেশ করিলেন ?

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায় হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। সে-স্থলে ভগবান্ দুই রকম ভূত-সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—দৈব এবং আসুর ( ১৬।৬ )। গীতার ১৬।১-৩-শ্লোকে দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত লোকদের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা দম্ভাহঙ্কার-খলতাদি বিবর্জ্জিত, অহিংসা-সত্যাদি-দয়া-মার্দ্দবাদি গুণযুক্ত। তাঁহারা মোক্ষ-সাধনার অধিকারী ( ১৬।৫ )। আর, যাঁহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরত্ব, অবিবেকাদি বিশিষ্ট ( ১৬।৫ ), ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, প্রভৃতি কিছুই জানেন না, যাঁহাদের শৌচ নাই, আচার নাই ( ১৬।৭ ), যাঁহারা জগৎকে অসত্য ও অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূন্য মনে করেন, ( ১৬।৮ ), নাস্তিক্যবুদ্ধিবশতঃ যাঁহারা মলিনচিত্ত, অল্পবুদ্ধি, হিংস্রকর্ম্মা, অহিতকারী ( ১৬।৯ ), ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য সর্ব্বদা যত্নপরায়ণ ( ১৬।১০।১৩ ), এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আসুর-সৃষ্টি। এই আসুর-ভাবাপন্ন লোকগণ ভগবানের ভজন করেন না (৭।১৫)। ইঁহাদের সম্বন্ধেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৬।১৯ ২০॥
—আমি—আমার প্রতি দ্বেষপরায়ণ, ক্রূরবুদ্ধি, অশুভকারী সেই নরাধমদিগকে সংসারে আসুর-যোনিমধ্যে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত সেই সকল মূঢ়গণ আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতেও ( অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মাপেক্ষাও ) অধোগতি প্রাপ্ত হয়।"

পদ্মপুরাণও বলিয়াছেন,

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ শ্রী চৈ. চ. ১৩-অধ্যায়ধৃত-বচন॥

—এই জগতে দুই রকমের সৃষ্টি—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত ( অর্থাৎ ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে প্রীতিযুক্ত ), তাঁহারা দৈব-সৃষ্টি; আর যাঁহারা তাহার বিপরীত ( অর্থাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী ), তাঁহারা আসুর-সৃষ্টি।"

বস্তুতঃ অসুর-স্বভাব লোকগণ তাঁহাদের কর্ম্মফলেই পর-পর-জন্মেও আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়েন; তাহাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব বা অকারুণ্য কিছু নাই। "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি॥ ২।১।৩৪॥ ব্রহ্মসূত্র॥—বিষম-সৃষ্টি-দর্শনে ঈশ্বরে বৈষম্য বা, নৈর্ঘৃণ্য দোষের আরোপ করা যায় না; কেননা, এ-সমস্ত বৈষম্য নিমিত্তান্তরের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া থাকে; শ্রুতিও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন।"

যাহা হউক, উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—অসুর-স্বভাব, শাস্ত্রবিদ্বেষী, ভগবদ্বিদ্বেষী, দুষ্কৃতকারীদের কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই তিনি মহাদেবকে স্বকল্পিত বেদবহির্ভূত আগম এবং মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং তদনুসারে মহাদেব স্বকল্পিত আগমও প্রচার করিয়া থাকেন এবং প্রতি কলিতে ব্রাহ্মণরূপে মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্রও প্রচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা দৈব-সৃষ্টি, তাঁহাদের চিত্ত এই সকল শাস্ত্রে আকৃষ্ট হয় না; আসুর-সৃষ্টির মধ্যেও মহৎ-সঙ্গাদির অচিন্ত্য-প্রভাবে যাঁহাদের আসুর-ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাঁহাদের চিত্তও তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

## গ। মায়াবাদ বাস্তবিকই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত কিনা

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—মায়াবাদ বাস্তবিকই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত কিনা?

"মায়াবাদ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশম্ভু, শ্রীচতুঃসন, শ্রীদেবহূতি-নন্দন শ্রীকপিল, শ্রীমনু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্ম্মবেত্তা মহাভাগবতগণ, তথা শ্রীপরাশর, শ্রীশাণ্ডিল্যপ্রমুখ আচার্য্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ঔডুলোমি, বাদরিপ্রমুখ প্রাচীন বেদান্তচার্য্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্তভাষ্যকারগণ এবং বেদবিভাগকর্ত্তা ও ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব কাহারো অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীনাথমুনি, শ্রীযমুনাচার্য্য প্রমুখ ভাগবতাচার্য্যগণ, এমন কি ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈব-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য্য অভিনব গুপ্ত,

বাচস্পতিমিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্য্যগণ সকলেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুগত শিষ্যানুশিষ্যগণ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যবৃন্দ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্য্যের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।" *

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য পরিষ্কার ভাবেই শ্রীপাদ শঙ্করের মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। (১) শ্রীপাদ শঙ্করের অনুগত আচার্য্যগণব্যতীত অপরাপর আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ও তদ্রূপই।

আধুনিক কালের বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এবং ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—উভয়েই পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মপুরাণের শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া, এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—শ্রীপাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল-তত্ত্বগুলি গৌড়পাদের কারিকাতে দৃষ্ট হয়। ডক্টর দাশগুপ্ত বলিয়াছেন—অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্যগণের পরেই গৌড়পাদের আবির্ভাব। তাঁহার কারিকাতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গৌড়পাদ সম্ভবতঃ নিজেই বৌদ্ধ ছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশের সঙ্গে উপনিষদের উপদেশের মিল আছে। (২) ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তখনই গৌড়পাদ জীবিত ছিলেন ; স্বভাবতঃই তিনি বৌদ্ধমতের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং যখন তাঁহার অদ্বৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের বিরোধ দেখেন নাই, তখন তিনি বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছেন। (৩)

যাহা হউক, গৌড়পাদ বৌদ্ধই থাকুন, বা বৌদ্ধভাবাপন্নই থাকুন, তাঁহার কারিকাতে যে তিনি বৌদ্ধমতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ পোষণ করার কোনও হেতু নাই। উল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতদ্বয় গৌড়পাদের কারিকার আলোচনা করিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—গৌড়পাদের কারিকার ভাষা এবং ভাবের সঙ্গে বৌদ্ধমাধ্যমিক-গ্রন্থের ভাষা

---

(*) "গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর", ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

(১) ১।৪।২৫-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য।

(২) Goudapāda thus flourished (about 788 A. D.) after all the great Buddhist teachers Asvaghosha, Nagarjuna, Asanga and Vasubhandhu; and I believe that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that he was possibly himself a Buddhist, and considered that the teachings of the Upanisada tallied with those of Buddha.—A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasgupta, vol. I, 2nd impression,1932, Cambridge, P. 423.

(৩) Goudapāda lived at a time when Buddhism was widely prevalent. Naturally he was familiar with Buddhistic doctrines, which he accepted when they were not in conflict with his own Advaita. —Indian Philosophy by. S. Radhakrishnan, vol II, 1941, P. 453.

ও ভাবের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে এবং মাধ্যমিক গ্রন্থের অনেক উদাহরণও গৌড়পাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ যোগাচার-মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছয় স্থলে বুদ্ধদেবের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) ডক্‌টর দাসগুপ্তও দেখাইয়াছেন, গৌড়পাদ বুদ্ধদেবের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কারিকার উপসংহারেও খুব সম্ভব তিনি বুদ্ধদেবের স্তব করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার কারিকা-ভাষ্যে, যেস্থলে অতি পরিষ্কার ভাবেই বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধমতের উল্লেখ আছে, সে-স্থলেও অন্যরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। (৫)

গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় যাহা সংক্ষেপে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহারই বিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহার অদ্বৈত-তত্ত্বই যে উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। (৬)

গৌড়পাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়া থাকিলেও শঙ্কর তাঁহার বিচার-প্রণালী গ্রহণ করেন নাই; গৌড়পাদের বিচার-প্রণালীতে পরিষ্কার ভাবেই বৌদ্ধভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর উপনিষদ্‌বাক্যের সহায়তাতেই তাঁহার অভিমত স্থাপনের জন্য এবং বৌদ্ধভাব পরিহারের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে গৌড়পাদ এবং শঙ্করের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। (৭)

কিন্তু যুক্তির বা বিচার-প্রণালীর পার্থক্যটাই বিচার্য্য বিষয় নহে; সিদ্ধান্তই হইতেছে মুখ্য অনুসন্ধেয় বস্তু। বিভিন্ন বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াও বিভিন্ন ব্যক্তি যদি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাঁহাদের সকলকেই একমতাবলম্বী বলিতে হইবে। গৌড়পাদের মত যখন বৌদ্ধমত, তাঁহার মতের অনুগামী শঙ্করের

---

(৪) Indeed, in language and thought, The Karika of Gouḍapāda bears a striking resemblance to the Madhyamika writings and contains many illustrations used in them (c. p. specially II. 32; IV. 59. See J. R. A. S, 1910, pp 136 ff). It refers to the Yogachara views, and mentions the name of Buddha half a dozen times.—Indian Philosophy, by S. Radha Krishnan, vol. II, P. 453.

(৫) He (Gouḍapāda) closes the Karikas, with an adoration which in all probability also refers to Buddha. [Foot Note: Gouḍapādas Karika, IV, 100. In my translation I have not followed Sankara, for he has, I think, tried his level best to explain away even the most obvious references to Buddha and Buddhism in Gouḍapādas Karika]—A History of Indian Philosophy, by S. N. Dasgupta, vol I, 1932, P. 424.

(৬) Sankara carried on the work of his teacher Gouḍapāda and by writing commentaries on the ten Upanisads and the Brahma Sutras, tried to prove, that the absolutist creed was the one which was intended to be preached in the Upanisads and the Brahmasutras, Ibid. P. 432.

(৭) The main difference between the Vedanta as expounded by Gouḍapāda and as explained by Sankara consists in this, that Sankara tried as best as he could to dissociate the distinctive Buddhist traits found in the expositions of the former and to formulate the philosophy as a direct interpretation of the older Upanisad texts.—Ibid, p. 437.

মতও হইবে বৌদ্ধমত। গৌড়পাদের ন্যায় বৌদ্ধ-বিচার-প্রণালী গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার সিদ্ধান্তকে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শঙ্করের চেষ্টা হইতেছে—বৌদ্ধমতকে শ্রুতির আবরণে প্রচ্ছন্ন করার প্রয়াসমাত্র।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—শঙ্কর-প্রচারিত মত বৌদ্ধ-মাধ্যমিক মতবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। গৌড়পাদের কারিকার চতুর্থ কারিকা "অলাত-শান্তি" মাধ্যমিক-তত্ত্বে পরিপূর্ণ। শঙ্করের "ব্যবহারিক" এবং "পারমার্থিক" এই দুইরকম ভেদও মাধ্যমিকদের "সম্বৃতি" ও "পরমার্থের" তুল্যই। শঙ্করের "নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং নাগার্জ্জুনের "শূন্য"—এই দু'য়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিদ্যমান। নাগার্জ্জুনের "নেতি"-বাদই শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে। (৮)

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ আরও বলেন—প্রাচীন বৌদ্ধগণ মনে করিতেন, এই দৃশ্যমান্ জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই; কিন্তু শঙ্কর মনে করেন—সমস্তের পশ্চাতে একটা সত্য কিছু অবশ্যই আছে। তথাপি কিন্তু শঙ্করের কল্পিত "মোক্ষে"-র সহিত বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণের" পার্থক্য বিশেষ নাই। শঙ্কর বলেন—"আমি ব্রহ্ম", আর মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন—"আমি শূন্য।" পার্থক্য হইতেছে কেবল একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। প্রাচীন বৌদ্ধমতের মধ্যে ( শূন্য স্থলে ) যদি এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সত্যতা বসান যায়, তাহা হইলেই শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্ত পাওয়া যায়। ডক্টর দাসগুপ্তের উক্তির মর্ম্মও এইরূপ। (৯)

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বৌদ্ধমতে এবং শঙ্কর-মতে পার্থক্য হইতেছে কেবল "শূন্যে" এবং "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে"; আর সমস্ত বিষয়েই সমান। বৌদ্ধমতেও জগৎ মিথ্যা, শঙ্কর-মতেও জগৎ মিথ্যা; বৌদ্ধমতেও জীব কোনও তত্ত্ব নহে, শঙ্কর-মতেও জীব কোনও তত্ত্ব নহে; বৌদ্ধমতেও জীব শূন্যই, শঙ্কর-মতেও জীব ব্রহ্মই; বৌদ্ধমতেও দৃশ্যমান্ জগতের সত্যত্ব কেবল ব্যবহারিক, পরমার্থিক নহে; শঙ্করের মতও তাহাই। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সৃষ্টি-প্রলয়-আদি উভয়মতেই সমান মিথ্যা।

ডক্টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—"গৌড়পাদের ( সুতরাং শঙ্করেরও ) সিদ্ধান্তগুলি যে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকা এবং বৌদ্ধগ্রন্থ লঙ্কাবতারের বিজ্ঞানবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা অতি সুস্পষ্ট। (১০) তিনি আরও বলিয়াছেন—বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদের নিকটে শঙ্করের ঋণের আধিক্য সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না

---

( ৮ ) We need not say that the Advaita Vedanta philosophy has been very much influenced by the Madhyamika doctrine. The Alatasanti of Goudapada's Karikas is full of Madhyamika tenets. The Advaitic distinction of vyavahara, or experience, and paramartha, or reality, correspond to the Samvrti and the paramartha of the Madhyamikas. The Nirguna Brahman of Sankara and Nagarjun's Sunya have much in common, ** By his ( Nagarjun's ) negative logic, which reduces experiences to a phenomenon, he prepares the ground for the Advaita philosophy—Indian Philosophy, by S. Radhakrishnan, vol I, p. 668.

( ৯ ) Indian Philosophy, vol. II by S. Radhakrishnan, pp. 472–73. A history of Indian Philosophy, by S. N. Dasgupta, vol. I, 2nd impression, pp. 425–26.

( ১০ ) A history of Indian Philosophy by S. N. Dasgupta, vol. I, p. 429.

কেন, তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অন্যেরা যে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করের দর্শন হইতেছে প্রধানতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদের মিশ্রণ, তাহার মধ্যে শঙ্কর কেবল আত্মার নিত্যতা সংযোজিত করিয়াছেন মাত্র।” (১১)

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যে বলিয়াছেন—“শঙ্করের ‘নির্গুণ ব্রহ্ম’ এবং নাগার্জ্জুনের ‘শূন্য’-এই দু'য়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিদ্যমান্,” তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। “শূন্য” হইতেছে “কিছু না”; আর, শঙ্করের “নির্গুণ ব্রহ্ম” হইতেছে “কিছু”; কিন্তু এই “কিছু” কি? “অস্তিত্ব বা সত্ত্বা”-মাত্র। ছান্দোগ্যশ্রুতির “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ॥ ৬।২।১॥”-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর “সৎ”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্।—‘সদেব’—‘সৎ’ অর্থ অস্তিত্বমাত্র (বিদ্যমানতা বা সত্তামাত্র), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু।—দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদ।” শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শ্রুতি-কথিত “সৎ”-শব্দের অর্থ হইতেছে—কেবল “সত্ত্বা, অস্তিত্ব” মাত্র, সত্ত্বাবিশিষ্ট বস্তু নহে। শ্রুতি কিন্তু “সৎ”ই বলিয়াছেন, “সত্ত্বা বা অস্তিত্ব” বলেন নাই। যাহার “সত্ত্বা” আছে, তাহাই “সৎ”; “সত্ত্বা” হইতেছে “সৎ”-এর ভাব। “সৎ” না থাকিলে “সৎ”-এর ভাব “সত্ত্বা বা অস্তিত্ব” কিরূপে থাকিতে পারে? “সৎ”কে অবলম্বন করিয়াই “সত্ত্বা বা অস্তিত্ব” থাকে, বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই বস্তুর ভাব থাকে। “সৎ”-ব্যতীত কেবল “সত্ত্বা” কল্পনাতীত বস্তু। তথাপি শ্রীপাদ “সৎ”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“অস্তিতা—সত্ত্বা”। “সৎ” স্বীকার করিলে বিশেষত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতে পারে বলিয়াই তাঁহার এইরূপ অর্থ-কৌশল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, “সৎ”-ব্যতীত কেবল “সত্ত্বা বা অস্তিত্ব” যখন থাকিতে পারে না, এবং এই “অস্তিত্ব”-মাত্রকেই যখন শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার “নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম” বলিয়াছেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার “নির্গুণ ব্রহ্মও” “কিছু না”-দ্যোতক “শূন্য”-তেই পর্য্যবসিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার “সত্ত্বামাত্র নির্গুণব্রহ্ম” ও নাগার্জ্জুনের “শূন্য”—তুল্যই। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর কার্য্যতঃ বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের মতবাদ প্রায় অবিকৃতভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন; অস্তিত্ব-মাত্রস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম কেবল বাক্‌চাতুর্য্যমাত্র।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল যে, শঙ্করের মায়াবাদকে পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণও যে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত” বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অতিশয়োক্তি কিছু নাই।

### গ। শ্রীপাদ শঙ্কর ও বৌদ্ধধর্ম্ম

অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন—শঙ্কর স্বীয় দার্শনিক যুক্তিদ্বারা বৌদ্ধদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, ইহা বলিলে ভুল করা হইবে; বরং তিনি যে ভাবে স্বীয় মতবাদের দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোনও কোনও স্থলে যে তিনি নিজেই বৌদ্ধ-যুক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহাই মনে হয়। (১২)

(১১) Ibid, pp. 493-94.
(১২) The Cultural Heritage of India, 2nd edition, 1953, Introduction p. 6.

শঙ্করাচার্য্য যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু ( বিশেষতঃ, বসুবন্ধু তাঁহার বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে ) পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধাচার্য্য দিঙনাগের মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বসুবন্ধুর মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নাই। (১৩)

একভাবে বিবেচনা করিলে মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ ভারতবর্ষে অবিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেদের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা মজ্জাগত। ডক্‌টর দাসগুপ্তের একটী উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি কোনও সময়ে বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, উপনিষদে যাঁহাদের অগাধ জ্ঞান ছিল, তাঁহারা, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের ব্যাখ্যা হইতে তাহা কিন্তু পৃথক্ রকমের ছিল, উপনিষদের সহিতই তাঁহাদের ব্যাখ্যার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। (১৪) বেদের প্রতি মজ্জাগত শ্রদ্ধাই ইহার হেতু বলিয়া মনে হয়। শ্রীল গৌড়পাদ, শ্রীপাদ শঙ্করের গুরু শ্রীল গোবিন্দপাদ এবং শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের ভাবধারার অনুসরণকারী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধমতকে বেদান্তের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া যখন উপস্থাপিত করিলেন, তখন বেদবিশ্বাসী ভারতবাসীর নিকটে তাহাই অনাবৃত বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর চিত্তা-কর্ষক হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ এইরূপেই ভারতে অনাবৃত বৌদ্ধমতের প্রচার শৈথিল্য লাভ করিয়াছে। ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণনের একটী উক্তি হইতেও তাহাই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"কথিত হয়, ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়াছে ; এই উক্তির মধ্যে সত্য যে নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিঃশব্দে বহু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান স্বীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।" (১৫)

এইরূপে বুঝা যায়, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ভারতে অপ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রসারের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন।

## ঘ। শঙ্কর-দর্শনের মূল্য

বেদবিশ্বাসী পরমার্থকামী লোকদিগের নিকটে শঙ্করের দর্শন চিত্তাকর্ষক না হইলেও ইহার যে কোনও মূল্যই নাই, তাহা নহে। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, কোনও কোনও পাশ্চাত্য দর্শনাদির ন্যায়, যুক্তিবাদীদের নিকটে শঙ্কর-দর্শনেরও বিশেষ মূল্য আছে। শঙ্কর-দর্শনও মুখ্যতঃ যুক্তির ( বেদানুগত-যুক্তির নহে ) উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য মুখ্যতঃ যুক্তিবাদীদের নিকটে ইহা বিশেষরূপে আদরণীয়।

শঙ্কর-দর্শনকে অনেকে শঙ্কর-বেদান্ত বলিয়া থাকেন ; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব, ইহাদের কোনওটীই বেদান্ত-সম্মত নহে।

---

( ১৩ ) Ibid, p. 7.
( ১৪ ) Ibid, p. 10.
( ১৫ ) Indian Philosophy, by S. Radhakrishnan, vol. II, 1941, p. 470,

## ৬। শঙ্করপন্থীদের দ্বারা শঙ্কর-ভাষ্যের বিচার

যাঁহারা গতানুগতিক ভাবে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত পন্থায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু এবং অকপট মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, বেদান্ত-বাক্যের শঙ্কর-কথিত অর্থের সহিত মূলের সম্বন্ধ এবং সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করেন এবং যখন দেখেন যে সঙ্গতি নাই, (১৬) তখন সম্প্রদায়াচার্য্যের প্রতি মর্য্যাদাবশতঃ কিছুকাল সেই পন্থায় থাকিলেও তাঁহাদের মনের দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায় ; পরে হয়তো মোক্ষবাসনার তীব্রতা জাগিয়া উঠিলে কেহ কেহ তাহা পরিত্যাগও করেন। শ্রীপাদ বাসুদেব-সার্ব্বভৌম, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি মায়াবাদাচার্য্যগণই তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন :

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগের নিকটে শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের খণ্ডন করিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু যখন সূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুকে-বলিয়াছিলেন,

............শুনহ শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥
আচার্য্যকল্পিত (১৭) অর্থ—ইহা সভে জানি। সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি॥
শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১২৮-৯॥

ইহার পরে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দেরই তুল্য পণ্ডিত তাঁহারই এক শিষ্য বলিয়াছিলেন,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম॥
উপনিষদের করে মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান। শুনি পণ্ডিতলোকের জুড়ায় মন কাণ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া। আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে। মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে॥
শ্রীচৈ. চ. ২।২৫।২৩-২৬॥

এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়। 'শাস্ত্র' ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায়॥
পরমার্থবিচার গেল, করি মাত্র বাদ। কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন। এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন॥
শ্রীচৈ. চ. ২।২৫।৩৪-৩৬॥

---

(১৬) আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও অনেকস্থলে সঙ্গতির অভাব মনে করেন। "The application of the modern critical apparatus raises considerable doubts whether the monistic interpretation of the *Brahma-Sutra* by Sankaracharya is always loyal and faithful to the views preached in the text itself.—The Cultural Heritage of India, vol. III, second edition, 1953. Introduction by Dr. S. N. Dasgupta, p. 7.

(১৭) আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য।

ইহা শুনিয়া স্বয়ং প্রকাশানন্দও বলিয়াছিলেন,

আচার্য্যের আগ্রহ---'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে। তাতে সূত্রব্যাখ্যা করে অন্যরীতে ॥

'ভগবত্তা' মানিলে---'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন। অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥

শ্রীচৈ চ ২।২৫।৩৯-৪১ ॥

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বহু মায়াবাদী পণ্ডিত মায়াবাদ-ভাষ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহাদের মধ্যে একজন ; এইরূপে একটী সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল ; এই সম্প্রদায়ের অনুরোধেই যে শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "ভাবার্থদীপিকা"-টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই টীকা-প্রারম্ভে বলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।

শ্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥

## চ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও শ্রীপাদ শঙ্কর

পূর্ব্বোদ্ধৃত "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ"-ইত্যাদি এবং "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-প্রমাণ অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের আদেশে স্বয়ং মহাদেবই কলিযুগে শঙ্করাচার্য্য-রূপে মায়াবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধত্ব—সুতরাং অবৈদিকত্ব—প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছিলেন,

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।

বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক ॥ শ্রী চৈ. চ. ২।৬।১৫২॥

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।

অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥ শ্রী চৈ. চ. ২।৬।১৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়---বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু ( মহাদেব ) হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।

বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ শ্রীভা. ১২।১৩।১৬॥

—নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা ( শ্রেষ্ঠ ), দেবসমূহের মধ্যে যেমন অচ্যুত ( শ্রেষ্ঠ ), বৈষ্ণব-সমূহের মধ্যে যেমন শম্ভু ( শ্রেষ্ঠ ), তেমনি পুরাণ-সমূহের মধ্যেও ইহা ( এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ )।"

মহাদেব বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার উক্তির সহিত কখনও বেদবাক্যের বিরোধ থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে যে-সকল বেদবিরুদ্ধ বাক্য দেখা যায়, সে-সমস্ত হইতেছে ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী বাক্য ; আর, বেদসম্মত যে-সমস্ত বাক্য দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত হইতেছে তাঁহার মহাদেব-স্বরূপের উক্তি। বস্তুতঃ,

পদ্মপুরাণের বাক্য স্মরণে রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাদিতে উভয় প্রকারের উক্তিই সুস্পষ্ট। কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণের সূত্রগুলির দুই রকম ভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত বেদবাক্যের বিরোধ নাই; তাহা হইতেছে তাঁহার মহাদেব-স্বরূপের উক্তি। কিন্তু পরে তিনি যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার প্রথম ভাষ্যের এবং শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধ বিদ্যমান; ইহা হইতেছে ঈশ্বরাদেশের অনুবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। বেদান্তসূত্রের বহুসূত্রের শঙ্করভাষ্যই সূত্রের অনুযায়ী; এই ভাষ্য হইতেছে তাঁহার মহাদেব-স্বরূপের উক্তি; কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায়—সূত্রানুযায়ী ভাষ্য করিয়া তিনি আবার অপ্রাসঙ্গিক ভাবেও তাঁহার নিজের উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সহিত সূত্রের, বা প্রকরণের, বা শ্রুতিবাক্যেরই সঙ্গতি নাই; এই উক্তি হইতেছে তাঁহার ঈশ্বরাদেশের অনুবর্ত্তিতার পরিচায়ক।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাদির ভাষ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় বলিয়াছেন, সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন; শ্রুতি-আদির ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—সগুণব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার স্তোত্রাষ্টকাদিতে অন্যরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার "কৃষ্ণাষ্টক"-নামক গ্রন্থে তিনি "জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা", "ব্রজশিশু-বয়স্য", "অর্জ্জুনসখ", "ব্রজপতি", "অসুরহন্তা", "স্থিররুচি", "বিমল-বনমালী", "লোকেশ" শ্রীকৃষ্ণকে "বেদবিষয়—বেদের প্রতিপাদ্য", "শুদ্ধ, অমল—মায়াস্পর্শহীন", "স্বচ্ছ—সর্ব্ববিকারশূন্য", "মুনি-সুর-নরসমূহের মোক্ষদ" বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন—"সেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান না করিলে লোকসকল শূকরাদি-পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাঁহার জ্ঞানব্যতীত লোকসকল জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, তাঁহার স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শতশত জন্ম কৃমিযোনিপ্রাপ্ত হয়, তিনি সকলের শরণ্য, বিভু; সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন।"

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাং বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৬॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "গোবিন্দাষ্টকে"ও—"যশোদাতাড়ন-শৈশব-সন্ত্রাস", "ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোক-চতুর্দ্দশ-লোকালি", "লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভ", "নবনীতাহার", "গোপীখেলন", "গোবর্দ্ধন-ধৃতি", "লীলা-লালিত-গোপাল", "চিন্তামনি-মহিম", "শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দ", "স্নানব্যাকুল-যোষিদ্‌বস্ত্রহরণকারী", "কালিন্দীগত-কালিয়-শিরঃ-নর্ত্তনকারী", "কালাতীত", "কলিদোষঘ্ন", "বৃন্দাবনবিহারী" গোবিন্দকে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে "ভবরোগঘ্ন—মুক্তিদাতা"ও বলিয়াছেন।

তাঁহার "কৃষ্ণস্তোত্রেও" তিনি "ব্রজৈকমণ্ডন", "সমস্ত-পাপখণ্ডন", "স্বভক্তচিত্ত-রঞ্জন", "সুপিচ্ছগুচ্ছ-মস্তক", "সুনাদ-বেণুহস্তক", "অনঙ্গ-রঙ্গসাগর", "করারবিন্দ-ভূধর", "মহেন্দ্রমান-দারণ", "ব্রজাঙ্গনৈক-বল্লভ", "সমস্ত-গোপ-মানস", "যশোমতী-কিশোরক", "দুগ্ধচোরক", "দৃগন্ত-কান্তি-ভঙ্গিম", "নবীন-গোপনাগর", "নবীন-কেলিলম্পট", "মেঘসুন্দর", "তড়িৎপ্রভালসৎপট", "রসাল-বেণুগায়ক", "কুঞ্জমধ্যগ", "বিদগ্ধগোপিকা-

মনোমনোজ্ঞ-তল্পশায়ী”, “ভবাব্ধি-কর্ণধারক”, “নন্দনন্দনের” চরণে প্রণিপাত জানাইয়া, যাহাতে তিনি যে কোনও সময়ে যে-কোনও প্রকারে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সৎকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তদনুকূল কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

যদা তদা যথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা।
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাম্ ॥১৬॥

তাঁহার “চর্পটপঞ্জরিকা”তে তিনি পুনঃ পুনঃ গোবিন্দ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। “ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥”

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার “আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক-স্তোত্রে” অজামিলের নামোল্লেখপূর্ব্বক ভগবন্নামের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন এবং ভগবান্ নারায়ণই যে তাঁহার একমাত্র গতি, তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার “নারায়ণ-নীতি-স্তোত্রে” তিনি “অঘ-বক-বৃষ-কংসারি”, “রাধাধর-মধু-রসিক”, “গোবর্দ্ধনগিরিরমণ”, “যমুনাতীর-বিহারী”, “নারায়ণ-গোবিন্দ-গোপালের” জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য বহু স্তোত্রে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং গঙ্গাযমুনাদির মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই সমস্ত তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি, ঈশ্বরাদেশানুবর্ত্তী ভাষ্যকার শঙ্করের উক্তি হইতে পারে না। বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যের বহু উক্তিও মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি। “শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।”

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার “ষট্পদীস্তোত্রেও” সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার লাভের জন্য এবং অবিনয় দূর করার জন্য সচ্চিদানন্দ শ্রীবিষ্ণুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া বন্দনা করিয়াছেন; গোবর্দ্ধনধারী এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতাররূপে জগতের পালনকর্ত্তা গুণমন্দির দামোদরের এবং সুন্দর-বদনারবিন্দ গোবিন্দের চরণে পরম-ভয় দূর করার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এ-সমস্ত স্তব-স্তুতি এবং প্রার্থনাদি তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি।

“ষট্পদীস্তোত্রে” শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন,

“সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৩ ॥

—হে নাথ! জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও, (আমি জানি) আমি তোমারই (অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমারই অধীন), কিন্তু তুমি আমার নহ (তুমি আমার নিকট হইতে উৎপন্ন হও নাই, তুমি আমার অধীন নহ)। (তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও) তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে।”

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগতে (অন্ত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

“যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাঞি। সর্ব্বময়—পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি॥
তভো তোমা' হইতে সে হইয়াছি আমি। আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বোলে। 'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥

অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা। ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন। তারে যে না ভজে বর্জ্জ্য হয় সেই জন ॥
এই শঙ্করের শ্লোক—এই অভিপ্রায়। ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥"

বাস্তবিক উল্লিখিত শ্লোকের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যের সহিতই "ষট্‌পদীস্তোত্রের" সঙ্গতি। সমুদ্রে ও তরঙ্গে জলত্বাংশে অভিন্ন হইলেও তরঙ্গ কিন্তু সমুদ্রের অংশই; সমুদ্র ও তরঙ্গ সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে। তদ্রূপ, চিন্ময়ত্বাংশে পরব্রহ্মে এবং জীবে অভিন্ন হইলেও জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে; জীব ব্রহ্মের অংশই; শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ ১৫।৭ ॥"-বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদই নাই; সুতরাং উল্লিখিতরূপ শ্লোকোক্তি তাঁহার মহাদেব-স্বরূপেরই উক্তি।

নানাস্থানে তিনি যে ভগবদ্‌বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা বা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাও মহাদেব-স্বরূপেরই কার্য্য।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সকলের আদরণীয়ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,

"অথ যদেব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখব্যবহারাদিলিঙ্গেন নিজমতস্যাপ্যুপরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্তব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়ন্নৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন বক্ষ্যমাণস্বগোপনাদিহেতুক-ভগবদাজ্ঞা-প্রবর্ত্তিতাদ্বয়বাদেনাপি তন্মাত্রবর্ণিত-বিশ্বরূপদর্শন-কৃতব্রজেশ্বরীবিস্ময়-শ্রীব্রজকুমারী-বসনচৌর্য্যাদিকং গোবিন্দাষ্টকাদৌ বর্ণয়তা তটস্থীভূয় নিজবচঃসাফল্যায় স্পৃষ্টমিতি ॥২৩॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ। শ্রীমদ্‌ভাগবত সকলকর্ত্তৃক আদরণীয় হইলেও যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, এবম্প্রকার শ্রীভাগবতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না কেন? তদুত্তরে যুক্তি দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্করের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, কৈবল্য অতিক্রম করত ভক্তিসুখ-প্রকাশাদি চিহ্নদ্বারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নিজমতেরও উপরে বিরাজমান জানিয়া, বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতকে বিধিভঙ্গ-ভয়েই গ্রহণ করেন নাই। * কারণ, তিনি ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং ভগবদাজ্ঞা-ক্রমেই ভগবত্তত্ত্ব গোপন করতঃ মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদাদির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীমদ্‌ভাগবতকে চালিত করিলে পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হয়েন, এজন্য উহা চালিত না করিয়া, বরং উহার গ্রহণব্যতিরেকে নিজের জ্ঞান ও সুখ-সম্পদ লাভ হয় না দেখিয়া, কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবতমাত্রে বর্ণিত বিশ্বরূপদর্শন, ব্রজেশ্বরীবিস্ময়, ব্রজকুমারীদিগের বসন-চৌর্য্যাদি লীলা স্বরচিত শ্রীগোবিন্দষ্টকাদি গ্রন্থে বর্ণনদ্বারা,

---

* শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ"-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "বেদান্তপক্ষ প্রকরণে" শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। "কামক্রোধৌ লোভভয়ে মোহো ব্যোমগুণাস্তথা। উক্তোঽবধূতমার্গশ্চ কৃষ্ণেনৈবোদ্ধবং প্রতি ॥ শ্রীভাগবত-সংজ্ঞে তু পুরাণে দৃশ্যতে হি সঃ ॥ ১৮-১৯॥"

তিনি যে তটস্থ হইয়া, নিজবাক্যের সাফল্য-বিধান-মানসে ঐ শ্রীমদ্‌ভাগবতকে নীরবে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।—প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামীর অনুবাদ।

এইরূপ দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতাররূপেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকটে মাননীয়।

## ২৭। গৌড়ীয়-মতে ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাদি বেদানুগত আচার্য্যদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। ইঁহাদের সকলের মতেই ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা, অনন্ত-কল্যাণগুণালয়, কিন্তু প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত, লীলাবিলাসী।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ শাস্ত্রানুগত্যে পরব্রহ্মের শক্তিসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের প্রধানতঃ তিনটী শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এই তিনটী শক্তির অনন্ত বৈচিত্রীই হইতেছে পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। এই তিনটী শক্তিই ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিকী।

এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিচ্ছক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরাশক্তি নামে অভিহিত হয়; এই চিচ্ছক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া তাহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই চিচ্ছক্তির সহায়তাতেই পরব্রহ্ম তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলা করেন বলিয়া ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করে না।

স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী হইতেছে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের "সৎ"-অংশের শক্তি, সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি বা আধার শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি নিজের এবং অপরের সত্তা রক্ষা করেন। সম্বিৎ-শক্তি হইতেছে "চিৎ"-অংশের শক্তি, জ্ঞানসম্বন্ধিনী শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি জানেন এবং জানান। আর, হ্লাদিনী হইতেছে "আনন্দ"-অংশের শক্তি, আনন্দদায়িনী শক্তি; ইহা দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করেন এবং করান। স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; তবে তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। স্বরূপ-শক্তিতে যখন হ্লাদিনীর প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি—সাধারণতঃ হ্লাদিনী—বলা হয়। সন্ধিনী-সম্বিৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

জীবশক্তির অংশই অনন্তকোটি জীব। মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না; সর্ব্বদা ব্রহ্ম হইতে বাহিরে (অর্থাৎ অস্পৃষ্টভাবে) অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডই হইতেছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্থান।

পরব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ। আনন্দ নিজেই পরম আস্বাদ্য; এই আনন্দ যখন অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ।" পরব্রহ্ম নিত্যই অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বলিয়া তাঁহাকে রসস্বরূপ বলা হয়।

রসশব্দের দুইটী মুখ্য অর্থ—চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্য বস্তু এবং চমৎকারিত্বময় রসের আস্বাদক বা রসিক।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম অসমোর্দ্ধ-চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্য বস্তুও এবং অসাম্যাতিশয় রস-আস্বাদকও, রসিকেন্দ্র-শিরোমণিও। তিনি আস্বাদন করেন—স্বীয় স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ।

তিনি লীলাময়। সৃষ্টিও তাঁহার এক লীলা; কিন্তু ইহা হইতেছে বহিরঙ্গা মায়ার যোগে তাঁহার বহিরঙ্গা লীলা। তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলাও আছে। লীলার জন্য প্রয়োজন—লীলার স্থান বা ধাম এবং লীলা-পরিকর।

তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই লীলা-পরিকররূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত এবং সেই স্বরূপ-শক্তিই, অর্থাৎ সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই, তাঁহার ধামরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণ জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার ধামও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার ধামকে বা ধামস্থিত কোনও বস্তুকেও স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ভগবদ্ধামে মায়িক কিছু নাই। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়, ভগবদ্ধামেও প্রায় তৎসমস্তই আছে; কিন্তু তৎসমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়; তাহারাও লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে।

পরব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও অনাদিকাল হইতে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥ গোপাল-তাপনী-শ্রুতি।" বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বরূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন—পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত; স্বরূপে প্রত্যেকেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দ। শক্তিবিকাশের তারতম্যেই তাঁহাদের পার্থক্য। পরব্রহ্মেই সর্ব্বশক্তির এবং রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ; অন্যান্য স্বরূপে শক্তির এবং রসত্বের বিকাশ ন্যূন; এই ন্যূনতারও আবার অনন্ত বৈচিত্র্য; এজন্য অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান্।

শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মও (ইনি শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন) পরব্রহ্মের এক প্রকাশ। এই প্রকাশেও স্বরূপ-শক্তি আছে; যেহেতু, স্বরূপ-শক্তি হইতেছে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী অনপায়িনী শক্তি; সুতরাং প্রত্যেক প্রকাশেই তাহা থাকিবে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপ-শক্তি থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হইতেছে ন্যূনতম। যতটুকু অভিব্যক্তি লাভ করিলে এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ (আনন্দস্বরূপত্ব) রক্ষিত হইতে পারে, এই প্রকাশে স্বরূপশক্তির ততটুকু মাত্রই বিকাশ, তদতিরিক্ত নহে। এজন্য এই প্রকাশে দৃশ্যমান্ কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না, এবং এই অর্থেই ইঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়। স্বরূপ-শক্তির এবং তাহার কার্য্যের সম্যক্ প্রকাশ নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে অসম্যক্-প্রকাশও বলা হয়। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"-গীতাবাক্যে এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মাতে শক্তির অধিক বিকাশ; তাহার ফলে পরমাত্মা মূর্ত্ত। শ্রুতি পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে পরমাত্মা প্রাদেশ-প্রমাণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। কিন্তু পরমাত্মাতে ঐশ্বর্য্যের বা ভগবত্তার বিকাশ নাই।

ব্যাপক অর্থে "ব্রহ্ম" ও "পরমাত্মা"-এই শব্দদ্বয় পরব্রহ্মকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্য্যামীকেই বুঝায়।

যাহা হউক, জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা হইতেও শক্তির অধিক বিকাশে ঐশ্বর্য্য বা ভগবত্তা অভিব্যক্ত হয়। পরব্রহ্মের যে-সমস্ত প্রকাশে এই ভগবত্তা বিরাজিত, তাঁহাদিগকে "ভগবান্" বলা হয়। ভগবত্তা-বিকাশেরও অনন্ত-বৈচিত্রী; তাই ভগবৎ-স্বরূপও অনন্ত। পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বয়ংভগবান্; তাঁহাতে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে "রসো বৈ সঃ—রসস্বরূপ" যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার "সর্ব্বরসঃ"ও বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—পরব্রহ্মে কেবল একটীমাত্র রস নহে, অনন্তরস-বৈচিত্রী বিরাজিত, তিনি অশেষ-রসবৈচিত্রীর সমবায়। সকল রসবৈচিত্রী সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইলে শ্রুতিপ্রোক্ত "সর্ব্বরসঃ"-শব্দেরই সার্থকতা থাকে না। পূর্ব্বে যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইতেছে, তাঁহারা বস্তুতঃ পরব্রহ্মের অনন্ত-রসবৈচিত্রীরই মূর্ত্তরূপ। রসস্বরূপত্ব পরব্রহ্মের স্বরূপগত বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রকাশেই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও, রসত্ব থাকিবে; অবশ্য বিভিন্ন প্রকাশে যখন শক্তিবিকাশের তারতম্য আছে, তখন রসত্বেরও তারতম্য আছে। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার অনন্ত-রসবৈচিত্রীরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই ধাম আছে, লীলা-পরিকর আছেন, লীলাও আছে। যিনি যে রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ, তিনি তাঁহাতে বিকশিত সেই রসত্বের অনুরূপভাবে স্বরূপানন্দও উপভোগ করেন এবং তাঁহার পরিকরদের সহিত লীলাতে উৎসারিত শক্ত্যানন্দও উপভোগ করেন। স্বরূপ-শক্তির একটী বিলাস হইতেছে ভগবদ্বিষয়ক প্রেম; পরিকর-ভক্তগণই তাহার আশ্রয়। এই প্রেমেরও গাঢ়তা অনুসারে অনন্ত-বৈচিত্রী। লীলাব্যপদেশে পরিকর-ভক্তের চিত্ত হইতে এই প্রেমরসের নির্য্যাস উৎসারিত হয়; তাহার আস্বাদনে যে আনন্দ, তাহাই শক্ত্যানন্দ।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের ধামের নাম গোলোক বা ব্রজ। বাসুদেবের ধাম—দ্বারকা-মথুরা। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির ধাম-সমূহের সমবেত নাম পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে নারায়ণেই শক্তির সর্ব্বাধিক বিকাশ; এজন্য শ্রীনারায়ণকে পরব্যোমাধিপতি বলা হয়; ইনি চতুর্ভুজ।

প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই স্বীয় ধামে স্বীয় পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া তাঁহাদের লীলাও স্বরূপতঃ পরব্রহ্মেরই লীলা; বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে তিনিই বিভিন্ন-লীলারসবৈচিত্রী বা শক্ত্যানন্দবৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং স্বরূপানন্দ-বৈচিত্রীও আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল পরব্রহ্ম রসস্বরূপ বলিয়াই অনাদিকাল হইতে অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে তাঁহার আত্মপ্রকটন। সমবেতভাবে সমগ্র রসবৈচিত্রীর আস্বাদন এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আস্বাদনেই রস-স্বরূপত্বের সম্যক্ সিদ্ধি।

লীলাবিলাসী পরব্রহ্মের দুই রকমের লীলা—প্রকট ও অপ্রকট। যখন তিনি তাঁহার লীলাকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়া লোকনয়নের গোচরীভূত করেন, তখন তাহাকে বলে প্রকট-লীলা। যাহা লোক-নয়নের গোচরী-ভূত নহে, তাহা অপ্রকট-লীলা। প্রকট-লীলাতে তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। স্বীয় পরিকরবৃন্দকে লইয়াই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করেন। তখন, তিনি এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের প্রত্যেকেই একস্বরূপে অপ্রকট-লীলায় এবং অন্য এক স্বরূপে প্রকট-লীলায় বিহার করেন।

স্বয়ংভগবান্ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের শাস্ত্রবিহিত একটী অতি লোভনীয় গুণের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি উজ্জ্বলভাবে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুণটী হইতেছে ভগবানের করুণা। ভগবানের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে করুণাই হইতেছে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুণটীর অভাব হইলে জীবের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবদুপলব্ধিই অসম্ভব হইয়া পড়িত ; কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন, তাঁহার কৃপা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, অন্য কোনও উপায়ে নহে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈষ লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

ভগবান্ এতই করুণ যে, তিনি যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই কেবল ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য ; তাঁহার নিজের জন্য তিনি কিছু করেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের প্রীতি, তেমনি ভগবান্ও চাহেন একমাত্র ভক্তের প্রীতি। এই প্রীতি পারস্পরিকী। নিজের জন্য ভক্তও কিছু চাহেন না, ভগবান্ও কিছু চাহেন না। ভগবান্ আপ্তকাম ; তাঁহার কোনও অভাব তো নাই যে, তিনি কিছু চাহিবেন। তিনি যে ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন, তাহাও ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য ; ভক্তের প্রীতিময়ী সেবা গ্রহণ না করিলে ভক্তের মনে দুঃখ হইবে। এই সেবাও তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করেন ; সেবাগ্রহণে আগ্রহ না থাকিলেও ভক্তের চিত্তে দুঃখ জাগিবে।

তাঁহার করুণাবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫॥" এই করুণাবশতঃই তিনি অনাদিকাল হইতে বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং যুগে যুগে মন্বন্তরে মন্বন্তরে যুগাবতার-মন্বন্তরাবতাররূপে, কখনও বা লীলাবতাররূপে এবং কোনও কোনও সময়ে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ের কথা জীবকে জানাইয়া থাকেন। জীবের নিকটে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্যই যেন তিনি ব্যাকুল। তাই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে নিজেকে নিতান্ত আপন করিয়া পাওয়াইবার উপায়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং প্রীতির সহিত এক পত্র তুলসী বা এক গণ্ডুষ জলও যিনি তাঁহাকে নিবেদন করেন, তাঁহার নিকটেও তিনি আত্মবিক্রয় করেন। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রিণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥" তাঁহার এই অসাধারণ করুণত্ববশতঃই "কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ" হইয়াছেন। যাঁহারা প্রীতির সহিত তাঁহার ভজন করেন, এতাদৃশী করুণার ফলেই তিনি বলিয়াছেন—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা॥ ১০।১০॥" এবং "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা॥ ৯।২২॥"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনি দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর। তাঁহার নর-অভিমান, তিনি নরলীলা। নর-অভিমান হইলেও তিনি কিন্তু নর নহেন। তাঁহাতে সমস্ত শক্তির, সমস্ত সৌন্দর্য্যের, সমস্ত মাধুর্য্যের, সমগ্র ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। ব্রজের কেবলা প্রীতির রস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার নর-অভিমান। বিশেষতঃ, নর-অভিমান না হইলে বাৎসল্যরসের আস্বাদন

হইতে পারে না। কেননা, বাৎসল্যরসের আশ্রয় হইতেছেন পিতা-মাতা। পরব্রহ্মের বাস্তবিক কোনও পিতামাতা নাই, থাকিতেও পারে না ; কেননা, তিনি অজ অনাদি, অথচ সকলের আদি। ব্রজে নন্দ-যশোদা তাঁহার পিতামাতা ; কিন্তু বাস্তবিক পিতামাতা বা জনক-জননী নহেন। তাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ; গাঢ় বাৎসল্যপ্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণের পরিকর। গাঢ় বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র, তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনেও অনুরূপ ভাবের আবির্ভাব—তিনি মনে করেন—"আমি এই পিতামাতার সন্তান।" তাঁহাদের এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত—দৃঢ়প্রতীতিজাত, জন্মজাত নহে। অবশ্য প্রকটলীলাতে নিত্যসিদ্ধ পরিকর নন্দ-যশোদাকে পূর্ব্বে আবির্ভাবিত করাইয়া তাহার পরে তাঁহাদের যোগে তিনি আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার এতাদৃশ জন্ম প্রাকৃত লোকের জন্ম নহে, প্রাকৃত লোকের জন্মের অনুকরণমাত্র। তাঁহার জন্ম যে "দিব্য", গীতায় তিনি তাহা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার পিতামাতা আছে বলিয়া প্রতীতি, তিনি নিজেকে পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন না, দ্বিভুজ বলিয়া তিনি নিজেকে "নর" বলিয়া মনে করেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের "নর-অভিমানের" রহস্য।

এতাদৃশ নর-অভিমানে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের পরিকরদের সহিত লীলা করেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (বা কান্তাভাব)। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-রসের উৎকর্ষ।

ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির মধ্যে শান্তভাবের গুণ "কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং তজ্জন্য "কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ" আছে বটে ; কিন্তু কেবল শান্তরস ব্রজের বস্তু নহে ; শান্তভাবে পরিকরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে। বৈকুণ্ঠেই এইরূপ ভাব। সুতরাং শান্তরসের স্থান হইতেছে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সেই ধামে তাঁহার নিজেরও ঈশ্বরত্বের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত ; এজন্য বৈকুণ্ঠে তাঁহার পরিকরদের মধ্যে পিতামাতা নাই ; সুতরাং সেই ধামে বাৎসল্যরসও নাই।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের স্বয়ংভগবান্ রূপেই দুই রকমের প্রকাশ—শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ। শ্যামকৃষ্ণ হইতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন ; আর গৌরকৃষ্ণ হইতেছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর (১।১।১৯-অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। উভয় স্বরূপেরই প্রকট এবং অপ্রকট—এই দুই রকমের লীলা আছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের ন্যায় শ্রীপাদ নিম্বার্ক, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পর ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবচার্য্যদের সহিত শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতভেদ থাকিলেও ইহাকে আত্যন্তিক বিরোধ বলা যায় না ; কেননা, তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে ভেদ কিছু নাই। শ্রীনারায়ণও শ্রীকৃষ্ণেরই এক প্রকাশ, পারিভাষিক-ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১।১।১৭০-৮০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে যে নারায়ণ বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। শ্রীকৃষ্ণকেও নারায়ণ বলা হয়, চতুর্ভুজ

বৈকুণ্ঠেশ্বরকেও নারায়ণ বলা হয়। আবার কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীকেও নারায়ণ বলা হয়। কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ, তিনি কে ? অথর্ববশির-উপনিষদে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। বিভিন্ন বেদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়া এই শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম নারায়ণ হইতেছেন "ব্রহ্মণ্যো দেবকী-পুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।" "দেবকীপুত্র" হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণই, চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠেশ্বর নহেন। কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপাল-তাপনী-শ্রুতি-আদিও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। গীতায় বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণের কোনও প্রসঙ্গই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই (১।১।১৭৭-অনুচ্ছেদ)। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় বৈকুণ্ঠেশ্বরও যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত, তাহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিদ্যমান (১।১।১৮০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত থাকেন (১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে সকল স্বরূপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই গুণাতীত ; মায়ার বা মায়িক গুণের সহিত তাঁহাদের কাহারওই কোনও সম্বন্ধ নাই। তদ্ব্যতীত আরও ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, যাঁহাদের সহিত মায়ার বা মায়িক গুণের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদির সহিত অব্যবহিত ভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধ ; মায়াকে লইয়াই সৃষ্টি ; এজন্য মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। তাঁহারা হইতেছেন—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং তিন গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণের সহায়তায় গুণাবতার বিষ্ণু জগতের পালন করেন এবং তমোগুণের সহায়তায় শিব বিশ্বের সংহার করেন। ইঁহারা গুণময়। গুণময় হইলেও সংসারী জীবের ন্যায় গুণময়ী মায়াদ্বারা কবলিত নহেন ; তাঁহারা গুণের বা গুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা। জগতের সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব পরব্রহ্মের হইলেও, তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে সৃষ্ট্যাদিকার্য্য করেন না, তাঁহার অংশাংশরূপ উল্লিখিত ভগবৎ-স্বরূপগণের দ্বারাই তাহা করাইয়া থাকেন।

## ২৮। গৌড়ীয় মতে জীবতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যাদির ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেও জীব স্বরূপে অণু, চিৎকণ, নিত্য ; মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

গৌড়ীয় মতে জীবস্বরূপ হইতেছে পরব্রহ্মের জীবশক্তির (বা তটস্থাশক্তির) অংশ, চিদ্রূপ (২।৭, ৯ অনুচ্ছেদ) ; জীবশক্তি চিদ্রূপা হইলেও ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নহে (২।১০-অনুচ্ছেদ) ; জীব-স্বরূপে স্বরূপ-শক্তি থাকেও না (২।৮ অনু)। জীব ভগবান্ পরব্রহ্মের চিৎকণ অংশ (২।১২ অনুচ্ছেদ), জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ (২।১৪-অনুচ্ছেদ), কিন্তু টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ নহে (২।১৩-অনুচ্ছেদ), শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (২।১৫-অনু) ; জীব সংখ্যায় অনন্ত (২।২৩-অনু) ; জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা (২।২৪-অনু), কর্ত্তা ((২।২৫-অনু) ; কিন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন (২।২৬-২৭-অনু) ; জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ (২।২৮-অনু), স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস (২।২৯-অনু)।

অনাদি বহির্ম্মুখতাই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ( ২।৩১-অনু ); ভগবদ্‌ভজনেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে।

## ২৯। গৌড়ীয় মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামনুজাচার্য্যাদির ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতেও পরব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু। জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য, তবে অনিত্য। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান কারণ ( ৩।৮-১০-অনু )।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ব্যাসদেবের পরিণামবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকেন। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই পরিণতি প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না। মায়া ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ মায়ার পরিণাম এবং ব্রহ্মের পরিণাম অভিন্ন ( ৩।২৬-অনু )।

## ৩০। ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। বিভিন্ন দার্শনিক আচার্য্য স্ব-স্ব-দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ-বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। মূল গ্রন্থের চতুর্থ পর্ব্বে তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে সেই আলোচনার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিচারের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। অস্তিত্বহীন বস্তুর সঙ্গে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তুর কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর কেবলাভেদ-বাদী। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার এই অভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন ( ৪।১৪-১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

আবার শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য হইতেছেন কেবল-ভেদবাদী। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের আত্যন্তিক ভেদ বিদ্যমান ( ৪।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না; সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণীয় হইতে পারে না ( ৪।১৯-অনুচ্ছেদ )।

শ্রীপাদ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; তাঁহার মতে জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম হইতেছেন শরীরী। জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মে দেহ-দেহী ভেদ স্বীকার করিতে হয়, স্বগত-ভেদ স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বও রক্ষিত হয় না ( ৪।৬, ৪।২০ এবং ৪।২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করেন ( ৪।৮-অনুচ্ছেদ ); কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মে উপাধির সংযোগ স্বীকার করিতে হয়; তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ। তাহাতে আবার জীব-জগদ্‌গত দোষাদিরও ব্রহ্মে সংক্রমণ স্বীকার করিতে হয়; তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ ( ৪।১৭-অনুচ্ছেদ )।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী ( ৪।৯-অনুচ্ছেদ )। কিন্তু স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদেও

ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হয় এবং তাহাতে গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ ( ৪।১৮-অনুচ্ছেদ ) ; সুতরাং স্বাভাবিক-ভেদাভেদ-বাদও স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ( ৪।১০-অনুচ্ছেদ )। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, শ্রীপাদ জীবের সময়ে বল্লভাচার্য্যের মতবাদ বোধ হয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীপাদ বল্লভের মতবাদও যে সর্ব্বতোভাবে শ্রুতিসিদ্ধ, তাহা বলা যায় না ( ৪।১০-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন—পরিণামবাদ এবং ভেদাভেদবাদ পুরাণ-সম্মত, বাদরায়ণেরও সম্মত এবং শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণেরও সম্মত ( ৪।২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদই তাঁহাদের স্বীকৃত ; কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন, সেই ভেদাভেদ-বাদের স্বরূপটী নির্ণয় করা সহজ নহে।

ভাস্করাচার্য্য ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদের কথা এবং নিম্বার্ক স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদের কথা বলিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—উভয়েই এই দুই রকমের ভেদাভেদ-বাদের দোষ দেখাইয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত। শ্রীজীবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ অত্যন্ত ব্যাপক। অন্যান্য আচার্য্যগণ ব্রহ্মের সহিত কেবল জীব-জগতের সম্বন্ধের কথাই আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কেবল জীব-জগতের কথাই বলেন নাই ; তিনি ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থিত দ্রব্যনিচয়, ভগবৎ-পরিকর, ভগবৎ-স্বরূপগণাদি সমস্তের কথাই বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—ব্রহ্মের সহিত এই সমস্তেরই সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ জীব বলেন—শক্তিমানের সহিত শক্তির যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদিরও সেই সম্বন্ধ। কেননা, জীব-জগদাদি সমস্তই হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি।

জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীব-শক্তির অংশ—সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি। জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম—সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি। ভগবদ্ধামসমূহ ব্রহ্মের চিচ্ছক্তিরই বিলাস ; ভগবৎ-পরিকরগণ ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। এইরূপে সমস্তই স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া তাহাদের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও হইবে শক্তি ও শক্তিমানের সহিত সম্বন্ধই।

কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধটী কিরূপ ? শাস্ত্র-প্রমাণের সহায়তায় বিচার করিয়া শ্রীপাদ জীব দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ স্বীকার করিলেও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, আবার কেবল অভেদ স্বীকার করিলেও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয় ( ৪।২৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। অথচ ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির মধ্যে ভেদ নাই ; যেখানে অগ্নি, সেখানেই তাহার দাহিকা শক্তি—ইহা অস্বীকার করা যায় না। আবার, অগ্নির বহির্দ্দেশেও তাহার দাহিকা-শক্তি বা উত্তাপ অনুভূত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এই ভেদ ও অভেদ অস্বীকার করা যায় না, অথচ, তাহার হেতুও নির্ণয় করা যায় না। যাহা অস্বীকার করা যায় না, অথচ যাহার হেতু নির্ণয় করাও যায় না,

তাহাকেই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর বস্তু বলা হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন---সমস্ত ভাববস্তুর শক্তিই হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ॥" শ্রুতার্থাপত্তি-ন্যায়ের সহায়তায় শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ যে অনস্বীকার্য্য ভেদ ও অভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারই কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির, বা অচিন্ত্য-প্রভাবের, ফলেই তাহাদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান থাকে। "স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ, তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি। সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা। স্বমতে তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদৌ এব অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্বাদিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা ॥" ( ৪।২৬-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য )।

ইহাই হইতেছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। কোনও শ্রুতিবাক্যের সহিত, কিম্বা সূত্রকার ব্যাসদেবের কোনও সিদ্ধান্তের সহিত ইহার কোনওরূপ বিরোধ নাই। ইহাতে কোনও শ্রুতিবাক্যের, বা কোনও ব্রহ্মসূত্রের কষ্টকল্পিত কদর্থও করা হয় নাই, কোনও শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষাও প্রদর্শিত হয় নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যেরই সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। আবার, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে---অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের ব্যাপকত্বও সর্ব্বাতিশায়ী।

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ যে অচিন্ত্য, ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্‌ও তাহা স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন---দর্শনশাস্ত্র যদি সাহসী এবং অকপট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিবে যে, এই সম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। (১)

ডক্‌টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন---কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদই শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের, পুরাণের এবং স্বয়ং ব্যাসদেবেরও সম্মত। এ-পর্য্যন্ত তিনটী ভেদাভেদবাদই প্রকটিত হইয়াছে—ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদ, স্বাভাবিক-ভেদাভেদ-বাদ এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। প্রথম দুইটী শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শেষোক্তটী ---অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ---শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, শ্রুতার্থাপত্তি-ন্যায়-লব্ধ। চতুর্থ রকমের কোনও ভেদাভেদ-বাদের কথা এ-পর্য্যন্ত কোনও আচার্য্য বলেন নাই। সুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই যে নির্দ্দোষ, শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

## ক। আধুনিক বিজ্ঞান ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

বস্তু ও তাহার শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বিজ্ঞান-সম্মতও। বিজ্ঞান বলে---শক্তি ও পদার্থ, এই দুইটীর স্বাতন্ত্র্য নাই; পদার্থের ন্যায় শক্তিরও ভর ( mass ) আছে, ওজন আছে, জাড্যও আছে। পদার্থের ন্যায় শক্তিও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের অধীন। পদার্থ হইতেছে শক্তির সংহতিমাত্র। (২)

---

(১) If Philosophy is bold and sincere, it must say that the relation cannot be explained.—*Indian Philosophy* by S. Radhakrishnan, vol. I, Indian edition, 1941, P. 186

(২) অধ্যাপক সমর গুহ প্রণীত "পদার্থের স্বরূপ", ১৩৫৬ সাল, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা;

ইহাতে বুঝা গেল—বস্তু ও তাহার শক্তি হইতেছে অভিন্ন। ঘনীভূত শক্তিই হইতেছে বস্তু। একই জিনিসের তরল অবস্থার নাম শক্তি, ঘনীভূত অবস্থার নাম বস্তু বা পদার্থ। কস্তুরী ও কস্তুরীর গন্ধ—ঘনীভূত গন্ধ কস্তুরী, আর তরল কস্তুরী গন্ধ। কস্তুরী হইতে গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া যায়; অবশ্য কস্তুরীর ওজনের এই ক্ষয় সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য নহে; কিন্তু বিজ্ঞান বলে—অতি সামান্য হইলেও ওজন কমে। ইহা দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথা জানা গেল।

কিন্তু বস্তু হইতে তাহার শক্তি বাহিরে বিস্তারিত হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে সূর্য্যের কিরণ, কস্তুরী হইতে তাহার গন্ধ, বিস্তারিত হয়। সূর্য্যের কিরণ যখন সূর্য্য হইতে বাহিরে আসে, কস্তুরী হইতে তাহার গন্ধ যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন পদার্থের বাহিরেও যে তাহার শক্তি থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এইরূপে বহির্দ্দেশে অবস্থিতিবশতঃ শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; ভিন্ন না হইলে বাহিরে আসিবে কিরূপে? আমাদের এই পৃথিবীটীও নাকি পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় অংশই ছিল। জ্যোতিরূপ শক্তি বিকীরণ করিতে করিতে এক্ষণে জ্যোতিহীন হইয়া পড়িয়াছে; সেই জ্যোতিরূপ শক্তিও ছিল তখন পৃথিবী হইতে অভিন্ন। ইহাতে বুঝা যায়—পদার্থ হইতে শক্তি বহির্গত হইতে হইতে এক সময়ে পদার্থ সেই শক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে, কস্তুরীও স্বীয় গন্ধ বিতরণ করিতে করিতে এক সময়ে গন্ধহীন হইয়া পড়িতে পারে, অথবা তখন কস্তুরীতে গন্ধ থাকিলেও তাহা অনুভবযোগ্যরূপে থাকিবে না। ইহাতে মনে হইতে পারে—পদার্থ টীর যে অংশ তাহার শক্তিরূপে পরিণত হয়, তাহার যেন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ইহা দ্বারাও শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, ঘনত্ব-তরলত্বের ভেদ হইলেও ইহা ভেদই। এইরূপ ভেদও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ভেদ আছে মনে করিলেও সমস্যা দেখা দেয়—বস্তুগত অভেদ সম্বন্ধে। আবার অভেদ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ভেদ সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দেয়। অথচ, ভেদ এবং অভেদ—কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না।

আবার সমস্যা জাগে এই যে—একই জিনিস কেন এবং কিরূপেই বা কিছু অংশে ঘনত্ব এবং কিছু অংশে তরলত্ব – অর্থাৎ পদার্থত্ব এবং শক্তিত্ব—প্রাপ্ত হয়? ইহার কোনও উত্তর নির্ণয় করা যায় না। ইহাই অচিন্ত্য। ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ-সম্বন্ধে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—"একই (এক ব্রহ্মই) 'কোনও রকমে' দুই (ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ) হয়েন।" এ-স্থলে "কোনও রকমে" বাক্যেই "অচিন্ত্যত্ব" সূচিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য মনীষী ব্রেড্‌লীর অভিমতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রেড্‌লী বলেন—ইহা অনির্ণেয়; ইহা বুঝিতে পারা, আমাদের এবং আমাদের জ্ঞানের অতীত।" *

---

* The one *some how* becomes two. This seems to be the most logical view in the circumstances. "The immanance of the absolute infinite centres and of finite centres in the absolute I have always set down as inexplicable...to comprehend it is beyond us and even beyond all intelligence (Bradley: Mind, No. 74, P. 154)"—*Indian Philosophy* by S. Radhakrishnan, Vol. I, Indian edition, 1941, P. 186. (অবশিষ্টাংশ পরপৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীজীবগোস্বামীর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের মূল বিষয়টী হইতেছে—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ। অভিন্ন হইয়াও যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্নরূপে অবস্থান করে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই উভয়টীই বিজ্ঞানও স্বীকার করে। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা বিজ্ঞানও বলিতে পারে না। ইহাই অচিন্ত্যত্ব। এইরূপে দেখা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিতও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সঙ্গতি আছে।

এই **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বাঙ্গালার—তথা বাঙ্গালীর—এক অপূর্ব্ব গৌরবের বস্তু। বাঙ্গালীদ্বারাই ইহার প্রকটন।**

## খ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ ও অদ্বয়তত্ত্ব

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে দৃশ্যমান্ জীব-জগদাদির সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও কিরূপে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে, তাহাও শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াও শ্রুতি যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়াছেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জীব-জগতের পৃথক্ সত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের কথা বলিয়াছেন। একেই বহু ( diversity in unity ) এবং বহুতে এক ( unity in diversity )—ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব ? ভেদে অভেদ, আবার অভেদে ভেদ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইলে "ভেদ" কাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করা দরকার।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—দুইটী বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটীই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয়, কোনওটীই যদি কোনও বিষয়ে অপরটীর কোনও অপেক্ষা না রাখে, প্রত্যেকটীই যদি সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরস্পরের ভেদ বলা সঙ্গত হয় ( ৪।৩-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )।

ভেদ তিন রকমের—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ( ৪।৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

শ্রীজীব বলেন—পরব্রহ্ম হইতেছেন এই ত্রিবিধ-ভেদহীন তত্ত্ব। তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদও নাই, স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদও নাই এবং স্বয়ংসিদ্ধ স্বগত-ভেদও নাই। সুতরাং পরব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বয়-তত্ত্ব।

ব্রহ্ম চিদ্ বস্তু, জীবও চিদ্ বস্তু; সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়; কেননা, জীব স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে; জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি—সুতরাং ব্রহ্মাপেক্ষ।

মায়া এবং মায়া হইতে উদ্ভূত জগৎ চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু। আর, ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্ বস্তু; সুতরাং মায়াকে বা জগৎকে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নয়; কেননা, মায়া ও জগৎ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে। মায়া ব্রহ্মের শক্তি এবং জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি—সুতরাং ব্রহ্মাপেক্ষ।

---

"অচিন্ত্য"-শব্দের অর্থ inexplicable, অনির্ণেয়। ইহার অর্থ unthinkable নহে; **unthinkable**-শব্দে অসম্ভাব্যতা সূচিত হয়; শশশৃঙ্গ, বা আকাশ-কুসুমের অস্তিত্ব—ইত্যাদি unthinkable। কিন্তু মিশ্রীর মিষ্টত্ব unthinkable নহে; ইহা হইতেছে inexplicable, অচিন্ত্য, অনির্ণেয়।

ব্রহ্মে স্বগত ভেদও নাই। স্বগত ভেদ হইতেছে—নিজের মধ্যে যে ভেদ, উপাদানগত-ভেদ এবং উপাদানভেদবশতঃ ক্রিয়াশক্তিগত ভেদ। ব্রহ্ম হইতেছেন স্বরূপে আনন্দ; আনন্দ ব্যতীত তাঁহাতে অপর কিছু নাই। জীবের দেহ এক বস্তু—জড়, দেহী আর এক বস্তু—চিদ্রূপ জীবাত্মা। সুতরাং জীবে দেহ-দেহী ভেদ—অর্থাৎ স্বগত ভেদ—আছে। ব্রহ্মে দেহ-দেহী ভেদ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; যেই ব্রহ্ম, সেই বিগ্রহ; যেই বিগ্রহ, সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে উপাদানগত ভেদ নাই বলিয়া উপাদানভেদবশতঃ যে ক্রিয়া-শক্তিভেদ, তাহাও ব্রহ্মে নাই। জীবের মধ্যে চক্ষুঃ-কর্ণের উপাদান-গত ভেদ আছে বলিয়া—চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী এবং কর্ণে শব্দগুণ-মরুতের ভাগ বেশী বলিয়া—চক্ষুঃ কেবল দেখে, কিন্তু শুনিতে পায় না; আবার, কর্ণ কেবল শুনে, কিন্তু দেখিতে পায় না। ব্রহ্মে এতাদৃশ উপাদানগত ভেদ নাই বলিয়া তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। "অঙ্গানি যস্য সর্বেবন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি।"

যদি বলা যায়—ব্রহ্মের যখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আছে, তখন তাঁহার সচ্চিদানন্দ চক্ষু-কর্ণাদিও আছে। এই চক্ষু-কর্ণাদিই তো তাঁহার স্বগতভেদ ? না, তাহা নয়। ব্রহ্মের চক্ষুঃ-কর্ণাদি ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে; সুতরাং তাঁহার স্বগতভেদ নহে। ব্রহ্মে আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর প্রবেশ নাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে স্বগত ভেদের অভাব।

আবার যদি বলা যায়—অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম যে অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, সেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তো তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত। তাঁহারাও তো ব্রহ্মের স্বগতভেদ ? না, তাহাও নয়; কেননা, এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ নহেন; সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মের স্বগতভেদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকরাদিও স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ তত্ত্ব নহেন বলিয়া ব্রহ্মের ভেদ নহেন।

এইরূপে ব্রহ্ম হইতেছেন ত্রিবিধ-ভেদশূন্য তত্ত্ব—সুতরাং অদ্বয়-তত্ত্ব।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উক্তিও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। *

বিশেষ আলোচনা ৪।২৮-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

---

* Each higher principle is more concrete and inclusive than the lower one, and therefore, ānanda, which is Brahma, is the most inclusive of all. From it all things follow. By it all things are sustained, and into it all things are dissolved. The different parts, the mineral world, plant life, the animal kingdom and the human society, are not related to the highest in any abstract or mechanical way. They are one in and through that which is universal about them. All parts in the universe share in the light of this universal spirit and possess specific figures on account of the special functions which they have to perform. The parts are not self-subsistent factors, but are dependent aspects of the one. "Sir, on which does the infinte rest ? On its own greatness or not even on greatness." Everything else hangs on it and it hangs on nothing. The organic and living nature of the relation of the parts to the whole is brought out in many passages. "As all spokes are contained in the axle, and in the felly of a wheel, thus also, all

## ৩১। গৌড়ীয় মতে মোক্ষতত্ত্ব বা পরমার্থতত্ত্ব

শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা গৌড়ীয় মতে স্বীকৃত। এই পঞ্চবিধা-মুক্তির প্রত্যেকটিই অনাবৃত্তি-লক্ষণা।

স্বরূপতঃ যাহা মুক্তি, তাহা এক রকমই—মায়াবন্ধন হইতে সম্যক্‌রূপে অব্যাহতি। ইহার রকমভেদ থাকিতে পারে না। মুক্ত অবস্থায় মুক্তজীবের অবস্থানভেদেই পঞ্চবিধা মুক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা থাকিলেও ইহাদের কোনওটীরই পরম-পুরুষার্থতা নাই, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবাপ্রাপ্তিই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ। তাহার হেতু এই।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু ( ১।১।১৩৩-অনু ); এজন্যই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ ১।৪।৮॥"; শতপথ-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রেম্‌ণা হরিং ভজেৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভধৃত প্রমাণ॥—প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন করিবে।" প্রেম হইতেছে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা।" প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য হইতেছে—নিজের সম্বন্ধে কোনও কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া একমাত্র প্রিয়ের প্রীতিবিধান। পরব্রহ্মই যখন জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু, তখন পরব্রহ্মের প্রীতিবিধানই হইতেছে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনাই হইতেছে জীবের একমাত্র পোষণের যোগ্য কামনা। ইহাতেই জীবের কৃষ্ণদাসত্ব।

পরব্রহ্ম ভগবান্ জীবের প্রিয় বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়; কেননা, প্রিয়ত্ব-বস্তুটীই হইতেছে স্বরূপতঃ পারস্পরিক। এজন্য ভগবানেরও একটী ব্রত হইতেছে ভক্তচিত্ত-বিনোদন। তাঁহার নিজেরই উক্তি হইতেছে—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥—আমার ভক্তের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই আমি বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকি ( আমার নিজের জন্য আমি কিছু করি না )।"

জীবমাত্রের মধ্যেই একটা চিরন্তনী সুখ-বাসনা আছে এবং এই বাসনা হইতেছে জীবস্বরূপের স্বরূপগত, স্বাভাবিক ( ৫।৬-অনুচ্ছেদ )। সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত জীব-স্বরূপের নিত্য অবিচ্ছেদ্য প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই সুখস্বরূপ রসস্বরূপের জন্যই তাহার এই অনাদিসিদ্ধ বাসনা এবং সেই রসস্বরূপকে পাইলেই জীব বাস্তবিক আনন্দী হইতে পারে, ধনকে আপন করিয়া পাইলে যেমন ধনী হওয়া যায়, তদ্রূপ। তখনই জীবের আনন্দলাভের জন্য ছুটাছুটির সম্যক্‌রূপে অবসান হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি॥ শ্রুতি॥" তখন বিনা চেষ্টায়, আনুষঙ্গিক ভাবেই জীবের মায়াজনিত ভয়েরও অবসান হয়, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ শ্রুতি॥"

---

beings and all gods, all worlds and all organs, also are contained in that self ( Brh. II-5.15 )". "There is that ancient tree whose roots grow upward and whose branches go downwards. That is the bright Brahman, the immortal, all worlds are contained in it and no one goes beyond it ( Katha. II, 6-1 ; see also Tait, I, 10. B. G. XV. 1. )"—*Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, vol. I, Indian edition, 1941, pp. 165-66.

পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে পাইলেই যে পুনর্জ্জন্ম তিরোহিত হইয়া যায়, একথা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" তাঁহার যে কোনও গুণাতীত স্বরূপকে পাওয়াও তাঁহাকেই পাওয়া। সুতরাং যে কোনও গুণাতীত স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে। কিন্তু সকল স্বরূপে শক্তি-আদির সমান বিকাশ নাই বলিয়া, সকল স্বরূপই সচ্চিদানন্দ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ-বৈচিত্রী বিকাশের তারতম্য আছে, এবং সে-সকল স্বরূপের প্রাপ্তিতে জীবের আনন্দিত্বেরও অবশ্য তারতম্য থাকিবে। আবার, ভক্তচিত্ত-বিনোদনব্রত ভগবান্ আপনা হইতেই মুক্ত জীবকে যে আনন্দ দান করিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করেন, সেই আনন্দ গ্রহণ করার সামর্থ্য অনুসারেই জীব আনন্দী হইতে পারেন। প্রিয়রূপে, আপনজ্ঞানে, ভগবানের সেবার বাসনা যে পরিমাণে অভিব্যক্ত হইবে, মুক্ত জীবও সেই পরিমাণেই আনন্দ গ্রহণ করিতে এবং আনন্দী হইতে পারিবেন।

সাযুজ্যমুক্তিতে সেব্য-সেবক ভাবই থাকে না; সুতরাং প্রিয়রূপে ভগবানের সেবার বাসনাও স্ফুরিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব কিছু আনন্দ অনুভব করেন বটে; কিন্তু তাহাতে তিনি সম্যক্‌রূপে "আনন্দী" হইতে পারেন না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেবাবাসনা কিছু স্ফুরিত হইলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ফলে তাহা সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় না, ভগবানে মমত্ববুদ্ধিও স্ফুরিত হইতে পারে না। তথাপি, সাযুজ্য হইতে সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যে আনন্দিত্বের উৎকর্ষ এবং সামীপ্যে তাহা অপেক্ষাও উৎকর্ষ বিদ্যমান (৫।৯-১১-অনুচ্ছেদ)।

পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিকামীর নিজের জন্য কিছু চাওয়া আছে—মুক্তি; সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিকামীরও তাহাই। সুতরাং সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব, নিজের কথা ভুলিয়া, কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, প্রিয়রূপে, ভগবানের উপাসনা করিতে পারেন না (৫।৪২-অনু)। এজন্য এ-সমস্ত মুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও—আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং বাস্তব-সুখপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থতা থাকিলেও—পরম-পুরুষার্থতা থাকিতে পারেনা।

পরম-পুরুষার্থ হইতেছে ব্রজপ্রেম—ব্রজবিহারি-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম; এই প্রেমে স্বসুখ-বাসনার, বা স্বীয়-দুঃখনিবৃত্তি-বাসনার, এমন কি মোক্ষবাসনারও, গন্ধলেশমাত্র নাই। এই প্রেমের লক্ষ্য হইতেছে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। আবার, এই প্রেম এত গাঢ় যে, ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা—সুতরাং প্রেমসেবা-বাসনাও কোনওরূপে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না, বিকাশের পথে প্রতিহত হয় না (৫।১৩-অনু)। এই প্রেমের প্রভাবে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে; তাহাতেই প্রাণঢালা সেবা সম্ভবপর হয়, পূর্ণতম আনন্দিত্বও সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য এ-স্থলেই জীব সম্যক্‌রূপে "রসং হেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী" হইতে পারে। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথিত পরমপুরুষার্থ। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্"—বাক্যে এই পরম-পুরুষার্থের সাধনকেই পরমধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বৃহদারণ্যক-শ্রুতি এবং শতপথ-শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই।

লোকের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে ভাবে ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তদনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করিলে সেই ভাবেই তাঁহাকে পাইতে পারেন। সুতরাং ভগবান্‌কে বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্তিকামীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। নিজেদের অভীষ্ট না হইলেও পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাকামীদেরও সকলের কাম্য প্রেমসেবা এক রকম নহে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা করেন। কোনও ভাবেই স্বসুখবাসনা নাই, স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাও নাই, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও নাই। সুতরাং সকল ভাবই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মমত্ববুদ্ধিময়। তথাপি প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে এই চারি ভাবের মধ্যে মমত্ববুদ্ধির এবং সেবার স্বরূপেরও তারতম্য আছে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভাবের সেবার উৎকর্ষ; সুতরাং মধুর ভাবকেই পরমতম পুরুষার্থ বলা যায় ( ৫।১৪-অনুচ্ছেদ )।

## ৩২। গৌড়ীয়মতে সাধনতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামানুজাদির ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতেও ভক্তিই হইতেছে মোক্ষলাভের বা ভগবৎ-প্রাপ্তির মুখ্য সাধন।

শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গের সার্থকতাও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা বলেন—ভক্তির সাহচর্য্য থাকিলেই কর্ম্মমার্গাদি স্ব-স্ব-ফলদানে সমর্থ, অন্যথা নহে। একথা বলার হেতু এই।

সাধ্য-ভক্তি এবং সাধনভক্তিও হইতেছে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না ( ১।১।২৩-অনু )। সাধকের নিজের শক্তিতে মায়াকে অপসারিত করা যায় না; যিনি ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, ভক্তির সহিত ভগবানের ভজন করেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন—একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের উপলক্ষ্যে জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন ( গীতা ॥ ৭।১৪-১৬; পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত যিনি কর্ম্মাদিমার্গের অনুষ্ঠানে মোক্ষলাভ করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহার প্রয়াস হইবে—নিজের শক্তিতে মায়াকে অপসারিত করার প্রয়াসমাত্র। শাস্ত্রানুসারে, এইরূপ প্রয়াস ফলদায়ক হইতে পারে না।

কর্ম্মাদিমার্গের সহিত যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা হইবে মিশ্রাভক্তি—কর্ম্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি। মিশ্রাভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায় না। পরমপুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায়—শুদ্ধাভক্তির সাধনে।

শুদ্ধাভক্তির সঙ্গে কর্ম্মজ্ঞানাদির মিশ্রণ থাকে না, মোক্ষাদিবাসনারও মিশ্রণ থাকে না। ইহাতে থাকে কেবল ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার বাসনা।

শুদ্ধাভক্তির নয়টী অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে এ-সমস্ত অনুষ্ঠিত হইলেই তাহারা হইবে শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ, অন্যথা নহে। (৫।৫৫-অনু)।

সাধকের রুচি অনুসারে যে কোনও এক অঙ্গের সাধনেই চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

উল্লিখিত নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, নাম ও নামী ভগবান্ অভিন্ন; সুতরাং নামীর ন্যায় নামও পূর্ণ—স্বয়ংপূর্ণ। অন্য কোনও সাধনাঙ্গই ভগবানের সহিত অভিন্ন নয়। নাম স্বয়ংপূর্ণ বলিয়া অন্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতা—ত্রুটিবিচ্যুতি-আদি—পূর্ণ করিতে পারে।

ভগবন্নামে ভগবদ্বশীকরণীশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

শুদ্ধা-সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, চিত্তের মায়ামলিনতা দূরীভূত হইলে, সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সাধকের চিত্তের অবস্থা অনুসারে সাধনভক্তি দুই রকম রূপ ধারণ করে—বৈধীভক্তি এবং রাগানুগাভক্তি। শাস্ত্রবিধির ভয়ে প্রবর্ত্তিত সাধনকে বলে বৈধীভক্তি; আর, শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভবশতঃ যে সাধনভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বলে রাগানুগাভক্তি ( ৫।৪৪, ৪৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

বৈধীভক্তির সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সালোক্যাদি চতুর্বিবধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিলাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ব্রজের প্রেমসেবা পাইবেন না। রাগানুগা-মার্গের ভজনেই ব্রজের প্রেমসেবা লাভ সম্ভব।

রাগানুগার সাধনভক্তি হইতেছে আনুগত্যময়ী। অন্তশ্চিন্তিত দেহে* ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্যে লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মানসিকী সেবাই হইতেছে রাগানুগার-সাধন; অ[illegible] যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরও অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের লীলা—সুতরাং চারিভাবের পরিকর—আছেন; যথা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। যে সাধকের চিত্ত যে ভাবের সেবার জন্য লুব্ধ হয়, তিনি তাঁহার অন্ত-শ্চিন্তিত দেহে সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যে মানসিকী সেবা করিবেন। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সেবাচিন্তা করিলেও ব্রজের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না।

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরসুন্দর—এই উভয় স্বরূপই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপাস্য।

ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধক স্বীয় অভীষ্ট সেবার অনুকূল চিন্ময় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া ব্রজলীলায় এবং নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ করিয়া পার্ষদরূপে সেবা লাভ করিতে পারেন।

## ৩৩। প্রেমতত্ত্ব

প্রেমতত্ত্ব হইতেছে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য; অন্য কোনও সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ প্রেম-সম্বন্ধে গৌড়ীয়দের মত বিশেষরূপে আলোচনা করেন নাই, প্রেমের তত্ত্বও নির্দ্ধারণ করেন নাই।

---

* মূলগ্রন্থের ৫।৮৫-অনুচ্ছেদ এবং ভূমিকায় পরবর্ত্তী ৪৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত," "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এই প্রেমেরই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্‌"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যেও সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন "ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্‌॥ ১১।৩।৩১॥" টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা।"—এই টীকা অনুসারে জানা যায়, শ্লোকস্থ প্রথম "ভক্ত্যা"-শব্দের অর্থ হইতেছে—"সাধন-ভক্তিদ্বারা" এবং দ্বিতীয় "ভক্ত্যা"-শব্দের অর্থ হইতেছে "প্রেমলক্ষণাভক্তি দ্বারা—প্রেমের দ্বারা।" এই টীকানুসারে উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—"সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা সঞ্জাতা (আবির্ভূতা) যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা দ্বারা (তাহার প্রভাবে) সাধক স্বীয় দেহে উৎপুলক ধারণ করেন (অর্থাৎ দেহে পুলকের উদয় হয়)।" ইহা হইতে জানা গেল—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ভক্তিই, কিন্তু এই ভক্তি হইতেছে "প্রেমলক্ষণা ভক্তি বা প্রেম।" এই ভক্তি হইতেছে সাধনের ফলে লভ্যা ভক্তি—সাধ্যা ভক্তি; ইহাকেই "প্রেম" বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ সাধ্যভক্তি, বা প্রেমভক্তি, বা প্রেম, বা রতি একই বস্তু (৫।৪৮-অনু)।

মাঠর-শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।" ইহা হইতে জানা যায়—ভক্তিই সাধকের নিকটে ভগবান্‌কে দেখায় এবং সর্ব্ববশীকারক ভগবান্‌ও এই ভক্তির বশীভূত। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি।" এ-সকল স্থলে "ভক্তি"-শব্দে সাধ্যাভক্তিকেই বুঝায়।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে—এই ভক্তি বা প্রেম কোনও প্রাকৃত বস্তু নহে। কেননা, কোনও প্রাকৃত বস্তু সচ্চিদানন্দ এবং প্রকৃতির অতীত ভগবান্‌কে জানাইতে বা দেখাইতে পারে না, বশীভূতও করিতে পারে না। এই ভক্তি বা প্রেম নিশ্চয়ই চিদ্‌বস্তু হইবে। বস্তুতঃ, ভক্তি বা প্রেম হইতেছে ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ (৫।৪৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রেম জীবের মধ্যে থাকিতে পারে না; যেহেতু, জীবে স্বরূপ-শক্তির অভাব (২।৮-অনু)। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে এই প্রেম লাভ হইতে পারে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ইহা জন্য পদার্থ; কেননা, প্রাকৃত বস্তুই জন্য পদার্থ, অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু কখনও জন্য পদার্থ হইতে পারে না, তাহা হইবে নিত্যসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমও জন্য-পদার্থ নহে; পরন্তু ইহা হইতেছে নিত্যসিদ্ধ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব হয় মাত্র।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৫৭॥

বিশুদ্ধ চিত্তেও কৃষ্ণপ্রেম যে একই সময়ে পূর্ণতমরূপে আবির্ভূত হয়, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন স্তরে

আবির্ভূত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে যে স্তরের আবির্ভাব হয়, তাহার পারিভাষিক নাম—প্রেমাঙ্কুর, বা ভাব, বা রতি।

স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রেম, ভাব এবং রতি—এই তিনটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে তিনটী শব্দেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমকে বুঝায়; যেমন—দাস্যপ্রেম, দাস্যভাব, দাস্যরতি; সখ্যপ্রেম, সখ্যভাব, সখ্যরতি; বাৎসল্যপ্রেম, বাৎসল্যভাব, বাৎসল্যরতি; কান্তাপ্রেম, কান্তাভাব, কান্তারতি। দাস-সখাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের সকলের প্রেম কিন্তু সম-পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

বিশেষ অর্থে প্রেম-শব্দে কৃষ্ণপ্রেমের বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরকে বুঝায়; ইহাকে প্রেমের পারিভাষিক অর্থ বলা যায়। ভাব-শব্দেও প্রেমের ঊর্দ্ধতন একটী স্তরকে বুঝায় এবং প্রথম স্তরকেও বুঝায়। রতি-শব্দেও বিশেষ অর্থে প্রেমাবির্ভাবের প্রথম স্তরকে বুঝায়।

প্রেমাবির্ভাবের প্রথম স্তরকে রতি-নামে অভিহিত করিলে, বিভিন্ন স্তরগুলির নাম হইতেছে—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। মহাভাবের আবার দুইটী স্তর আছে—মোদন এবং মাদন। রতিই গাঢ়তা লাভ করিলে প্রেম নামে, প্রেম গাঢ়তা লাভ করিলে স্নেহ নামে—ইত্যাদিক্রমে অভিহিত হইয়া থাকে। মাদনই হইতেছে প্রেমের গাঢ়তম স্তর; ইহার উপরে আর কোনও স্তর নাই।

এই মাদনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের সমস্ত স্তরই বিরাজিত; এজন্য ইহাকে "স্বয়ংপ্রেম"ও বলা হয়। স্বয়ংভগবানে যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অবস্থিতি, তেমনি মাদনেও সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর অবস্থিতি। মাদন যখন উল্লসিত হয়, তখন সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই যুগপৎ উল্লসিত হইয়া থাকে। মাদন হইতেছে "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী এবং পরাৎপর।"

কেবল রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে; বিধিমার্গের ভজনে ব্রজপ্রেম পাওয়া যায় না।

ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে দাস্য-রতি "রাগের" শেষ সীমা পর্য্যন্ত, সখ্যরতি "অনুরাগ"-পর্য্যন্ত (অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নহে), বাৎসল্য-রতি "অনুরাগের শেষ সীমা" পর্য্যন্ত এবং কান্তারতি "মহাভাব" পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দাস্য-সখ্যাদি ভাবের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের কৃষ্ণরতিরই এই পরিচয়। তত্তদ্ভাবের সাধকগণও তত্তদ্ভাবোচিত রতির উপযোগী প্রেম-স্তর লাভ করিলেই তত্তদ্ভাবের পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে পারেন।

রাগানুগা-মার্গের সাধক যথাবস্থিত সাধকদেহে কৃষ্ণরতির দ্বিতীয় স্তর "প্রেম" পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন, তাহার পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদি লাভ করিতে পারেন না (৫।৬৩-ঙ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হইলেই স্বীয়ভাবোচিত-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ জাতপ্রেম-সাধককে একবার সপরিকরে দর্শন দেন এবং দেহভঙ্গের পরে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থানে স্বীয় ভাবানুরূপ-সেবার অনুরূপ চিন্ময়দেহে সেই সাধক আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পরে স্বীয় ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের এবং তাহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি শ্রবণের, মাহাত্ম্যে তাঁহার কৃষ্ণরতি ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া

প্রেমের পরবর্তী স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী স্তরে উপনীত হয়। তখনই তিনি পরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারেন ( ৫।৬৩-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না ; কেননা, ব্রজের কেবল-প্রেম অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের আয়ত্বে নহে ( ১।১। ৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

যদি কেহ বলেন—কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপকুমারীগণ তো কাত্যয়নীর পূজা করিয়াই কান্তাপ্রেম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তো বুঝা যায়—কাত্যায়নীও ব্রজপ্রেম দিতে পারেন ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপকুমারীগণও শ্রীরাধিকাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাই ছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ কান্তাপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল না। সেই প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ হইতে জানা যায়, তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে কাত্যায়নীব্রত করার উপদেশ দেন। এজন্য তাঁহারা কাত্যায়নীব্রতের আচরণ করেন। ইহা ছিল তাঁহাদের পক্ষে লৌকিকী-রীতির অনুকরণ মাত্র ; লৌকিক জগতেও যেমন কুমারী কন্যাগণ মনোমত স্বামী পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিব-পূজাদি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ। "তাসাং নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেয়সীভাবানামপি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনয়া লোকরীত্যৈব হেমন্তে দেবীপূজামাহ হেমন্তে ইতি॥ শ্রীভা. ১০।২২।১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" কেননা, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের যেমন নর-অভিমান, তাঁহার পরিকরবর্গেরও—কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকুমারীদেরও—তদ্রূপ নর-অভিমান। "ততো ব্রজস্য নর-লীলত্বাৎ॥ শ্রীভা. ১০।২২।২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা॥"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য বলবতী উৎকণ্ঠাবশতঃই তাঁহারা ব্রতাচরণ করিয়া কাত্যায়নীদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু উপাসনার ফলেই যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-প্রেমের প্রভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। "তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাসবিলসিতমেব তথোপাসনম্, প্রেম্ণৈব চ তথা তৎপ্রাপ্তিঃ, ন তথোপাসনেন ইতি বিবেক্তব্যম্॥ শ্রীভা. ১০।২২।২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা॥" ভগবান্ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। "প্রেম্ণৈব চ ভগবানপি বশীক্রিয়তে॥ বৈষ্ণবতোষণী॥"

গোপকুমারীগণ যে কাত্যায়নীর উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গামায়া নহেন। "ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তিবৃত্তিস্বরূপভূতা যোগমায়ৈব, ন তু বহিরঙ্গা মায়া॥ চক্রবর্তী॥ অস্যা দেব্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বমেব মন্তব্যম্, ন বহিরঙ্গজগৎকারণশক্তিত্বম্॥ বৈষ্ণব-তোষণী॥ শ্রীভা. ১০।২২।১॥"

## ৩৪। রসতত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপর একটী বিশেষত্ব হইতেছে রসতত্ত্ব। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "রসস্বরূপ" বলিয়াছেন ; তিনি পরম আস্বাদ্যতম রস এবং পরম রস-আস্বাদকও। তিনি স্বরূপানন্দ এবং **স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ** বা প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করেন এবং স্বীয় পরিকর-ভক্তদিগকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার আস্বাদ্য রসের স্বরূপ কি, বিশেষত্বই বা কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ নিম্বার্কও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন ; কিন্তু রসের বিস্তৃত আলোচনা বা বিশ্লেষণ তাঁহার লেখাতেও লক্ষিত হয় না। মূলগ্রন্থের সপ্তম পর্ব্বে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের আনুগত্যে, রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে সূত্রাকারে দু'য়েকটী কথার উল্লেখ করা হইতেছে।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম **শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানন্দ**। তিনি আনন্দঘন, রসঘন, মাধুর্য্যঘন বিগ্রহ। তাঁহার মাধুর্য্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৮॥", তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১১৪॥" তিনি "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১১০-১২॥"

**শক্ত্যানন্দ**। প্রেম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনজনিত আনন্দই হইতেছে শক্ত্যানন্দ। তাঁহার পরিকর-ভক্তগণই হইতেছেন এই প্রেমরস-নির্য্যাসের আশ্রয় বা আধার। তাঁহাদের সহিত লীলাতে এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয় ; তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির সহায়তায়, তিনি নিজেও তাহা আস্বাদন করেন এবং পরিকর ভক্তবৃন্দকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

> 'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
> সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২০-২১॥

ভক্তাশ্রয়া কৃষ্ণরতি পাঁচ রকমের—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং কান্তারতি বা মধুরারতি। তদনুসারে রসও পঞ্চবিধ—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুররস।

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দস্বরূপা, পরম আস্বাদ্যা। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥" তথাপি, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারি-ভাব—এই চারিটী বস্তুর সহিত মিলিত হইলেই পরম আস্বাদ্যা কৃষ্ণরতি তাহার আস্বাদ্যত্বের অনুরূপ চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয় ; দধি যেমন সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদির সহিত মিলিত হইলে অমৃত-মধুর "রসালায়" পরিণত হয়, তদ্রূপ। এজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত শান্তাদি রতিকে রসের স্থায়ী ভাব বলা হয়। স্থায়ীভাবের সহিত বিভাব-অনুভাবাদির মিলনেই কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তি অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয়।

বিভাবাদির একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

**বিভাব।** যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই বিষয়ালম্বন; কেননা, তিনিই কৃষ্ণরতির বা ভক্তির বিষয়। আর, ভক্তগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন; যেহেতু, ভক্তগণেই রতি বা ভক্তি থাকে। যাহাদ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। আলম্বন-বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং অনুকূল দেশ-কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়া ইহাদিগকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। ময়ূরপুচ্ছ দেখিলে যদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণরতি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ময়ূরপুচ্ছই হইবে উদ্দীপন-বিভাব।

**অনুভাব।** যে-সমস্ত বহির্লক্ষণদ্বারা চিত্তস্থিত রতির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে; যেমন—নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি।

**সাত্ত্বিকভাব।** অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটীকে সাত্ত্বিকভাব বলে। সত্ত্ব-শব্দে কৃষ্ণসম্বন্ধি চিত্তকে বুঝায়; সেই চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইলেই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়, অন্যথা নহে।

**ব্যভিচারী ভাব।** বি+অভি+চারী। যে সকল ভাব বিশেষরূপে স্থায়ী ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে ব্যভিচারীভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে। প্রেমজনিত নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটী ভাবকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে।

সকল রকমের কৃষ্ণরতিতে সকল সাত্ত্বিকভাব বা সঞ্চারীভাব সমানরূপে অভিব্যক্ত হয় না। রতির গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে ইহাদেরও বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে, কোনও স্থলে বা কোনওটীর অভাবও হইয়া থাকে।

উপরে যে পাঁচটী রসের কথা বলা হইল, তাহারা হইতেছে মুখ্যরস। এতদ্ব্যতীত সাতটী গৌণরসও আছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী রতি আলম্বনের উৎকর্ষজনিত যে ভাব-বিশেষকে প্রকটিত করে, তাহাকে গৌণী রতি বলে; এই গৌণী রতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন গৌণরস নামে অভিহিত হয়।

শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য বা স্থায়ীভাব যেমন তত্তদ্‌ভক্তের চিত্তকে ব্যাপিয়া সর্ব্বদাই অবস্থান করে, সাতটী গৌণীরতি সেইরূপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কিছু সময়ের জন্য উদিত হয় মাত্র।

শান্তাদি পঞ্চবিধা রতির আশ্রয়ও পাঁচ রকমের ভক্ত। শান্তরতির স্থান বৈকুণ্ঠে; ব্রজে শান্তরতিযুক্ত কোনও পরিকর-ভক্ত নাই। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তগণই শান্তরতির আশ্রয়।

দ্বারকা-মথুরাতেও দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রতি আছে; কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। দ্বারকা-পরিকরদের চিত্তে যখন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান স্ফুরিত হয়, তখন তাঁহাদের কৃষ্ণরতি সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। দ্বারকা-মথুরার

দাস্যভাবের পরিকর হইতেছেন দারুকাদি, সখ্যের—অর্জ্জুনাদি, বাৎসল্যের—বসুদেব-দেবকী-আদি, এবং কান্তাভাবের পরিকর হইতেছেন রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা বিশুদ্ধা দাস্যাদি রতির স্থান একমাত্র গোলোক বা ব্রজ। এই ধামে দাস্যভাবের পরিকর—রক্তক-পত্রকাদি, সখ্যভাবের—সুবলাদি, বাৎসল্যভাবের—নন্দ-যশোদাদি এবং কান্তাভাবের—শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই উল্লিখিত চারিটী ভাব—সুতরাং চারিটী রসও—বিদ্যমান্। প্রকট-লীলাতে সখ্য-বাৎসল্যাদির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু কান্তারসেরই এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

অপ্রকট-লীলাতে কান্তাভাবময়ী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকান্তা; তাঁহাদের লীলাতে যে প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয়, তাহাও স্বকীয়াভাবময় রস। কিন্তু প্রকট-লীলাতে যোগমায়ার প্রভাবে নিত্য-স্বকান্তা গোপীদের মধ্যেই পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যদিও নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-পতি বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে স্ব-পত্নী বলিয়া মনে করেন, তথাপি আরোপিত পরকীয়া-ভাবের প্রভাবে তাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলনবিষয়ে যে দুর্ল্লঙ্ঘনীয় বাধাবিঘ্নের উদয় হয়, তাহার ফলে তাঁহাদের মিলন সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না; যখন সম্ভবপর হয়, তখন মিলনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহাই অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলাকে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। "পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪২॥"

প্রত্যেক ভাবের—সুতরাং প্রত্যেক রসেরও—অনেক বৈচিত্রী আছে; তদনুসারে প্রত্যেক ভাবের পরিকরদেরও অনেক প্রকার ভাববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

## ৩৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব—এ-সমস্ত হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতেছে এক অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের অভিব্যক্তি। প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের কেহই বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। শ্রীপাদ রামানুজাদি ভক্তির মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে বা ভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণাত্মিকা আলোচনা কেহই করেন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, তাঁহারা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক তাঁহারা সকল শাস্ত্রেরই সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের শাস্ত্রকথিত গুণ-মহিমাদির বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একটা সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। কোনও ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহাদের নিকটে উপেক্ষিত হয়েন নাই। গৌড়ীয় মতে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা অপরাধজনক এবং ভজন-বিঘ্নকর।

শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন সাধন-প্রণালী এবং বিভিন্ন সাধনের বিভিন্ন ফল সম্বন্ধেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শাস্ত্রানুগত্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রকথিত গুণ-মহিমাদি অনুসারে যে স্থান যাহার প্রাপ্য, সেই স্থানেই তাঁহারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শাস্ত্রবিহিত কোনও সাধন-পন্থার অসারতা, কিম্বা বিভিন্ন-সাধনপন্থার লভ্য বিভিন্ন ফলের মধ্যে কোনও কোনও ফলের অসারতা বা অপারমার্থিকতা দেখাইয়া, কোনও বিশেষ পন্থারই, বা কোনও বিশেষ ফলেরই একমাত্র উপাদেয়তা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সমন্বয় স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়েন নাই। এতাদৃশ প্রয়াস—বস্তুতঃ সংহারেরই প্রয়াস, সমন্বয়ের প্রয়াস নহে ; বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রয়াসে অপৌরুষেয় শাস্ত্রের মর্য্যাদাই লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে গেলেই ব্যক্তিগত মতের বা অনুমানের অনুপ্রবেশের সুযোগ উপস্থিত হয়। পারমার্থিক ব্যাপারে শাস্ত্রের অননুমোদিত অনুমানের স্থান নাই, শাস্ত্রবহির্ভূত যুক্তি-তর্কেরও স্থান নাই। এজন্যই মহাভারত বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" এবং ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রেও বলিয়াছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের শাস্ত্রানুগত্য হইতেছে অসাধারণ। যাহা শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই ( ৫।৩১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

কেহ কেহ মনে করেন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কেবল পুরাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; ইহা শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। এ-কথা যাঁহারা বলেন, শ্রুতি ও পুরাণের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, তাহাই তাঁহারা জানেন না। শ্রুতি—পুরাণেতিহাসকে ( অর্থাৎ স্মৃতিকে ) পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন ( অবতরণিকা ॥৮-অনু )। শ্রুতির কথাই পুরাণেতিহাসে বিবৃত হইয়াছে ; পুরাণেতিহাস শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং যাহা পৌরাণিক, তাহা শ্রুতিবহির্ভূত হইতে পারে না। তথাপি, কোনও বিষয়ে যদি শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে-স্থলে শ্রুতি-প্রমাণই গরীয়ান্—ইহাই শাস্ত্র-বিধান। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বিধানের অনুসরণও করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পুরাণের বা ইতিহাসের প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রুতির প্রমাণ-শিরোমণিত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ( পরবর্ত্তী ৪৪-অনু )।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে—রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসত্বের, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের, তাঁহার রূপমাধুর্য্য-গুণমাধুর্য্য-লীলামাধুর্য্যাদির বিবৃতি। তাঁহার মাধুর্য্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥" ; তাঁহার মাধুর্য্য "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর ॥" "আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত", "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের যে লোভনীয়ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনই তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্যই এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

### ৩৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা

যাহাতে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নাই, তাহাই উদার। এতাদৃশী উদারতা হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বৈশিষ্ট্য। এই ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষাদির অভাবই হইতেছে ইহার হেতু।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে সুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সেন-মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব।

**ক। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা।** সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আগে বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন না, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক—তা' তাঁদের সংখ্যা কয়েক শত, বা কয়েক সহস্র, বা কয়েক লক্ষ, এমন কি কয়েক কোটিও হইতে পারে, এমন কতকগুলি লোক—মাত্র যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাহাকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মকেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে হয়; কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মই পৃথিবীর সমস্ত লোক কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় না। যাঁহারা একই নীতির, একই আদর্শের, বা একই ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ একটা সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। এইরূপে, হিন্দু-সম্প্রদায়, মুসলমান-সম্প্রদায়, খৃষ্টীয়ান-সম্প্রদায়, বৌদ্ধসম্প্রদায়, জৈনসম্প্রদায়, আবার হিন্দুদের মধ্যে শৈব-সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে; সুতরাং "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" কথাটার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাই থাকে না; যেহেতু, যাহা সাম্প্রদায়িক নয়, এমন কোনও একটা ধর্ম্ম হইতে পার্থক্য সূচনার জন্যই "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"-কথাটার প্রয়োগ। উল্লিখিত অর্থ মানিতে গেলে সকল ধর্ম্মই যখন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, কোনও ধর্ম্মই যখন অসাম্প্রদায়িক থাকে না, তখন নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে, সম্প্রদায়-বিশেষের আচরিত বলিয়াই কোনও ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা সমীচীন নয়।

রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান। সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত সমান ভাবে আকৃষ্ট হয় না। লোকের রুচি এবং প্রকৃতি একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্ত সমধিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই উপাস্য-ভাবের এবং উপাসনা-প্রণালীর পার্থক্য থাকিবেই এবং বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপাসকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেনই।

সম্প্রদায় হইতেছে দল বা গোষ্ঠী। জগতের সর্ব্বত্রই ইহা বিদ্যমান। জীবসমূহের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিভাগ বা সম্প্রদায় আছে। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েও আবার অন্তর্ব্বর্ত্তী সম্প্রদায় আছে—মানুষের মধ্যে পুরুষ-সম্প্রদায়, নারীসম্প্রদায়, বালকসম্প্রদায়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে প্রতিকূলতা থাকিবে, তাহারও কোনও ন্যায়সঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না। পুরুষ কেবল পুরুষ বলিয়া, নারী কেবল নারী বলিয়াই যে তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ জন্মিবে, তাহার কোনও হেতু নাই। ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শাক্ত কেবল শাক্ত বলিয়া, বৈষ্ণব কেবল বৈষ্ণব বলিয়া, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনওরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে পারে না; উভয় সম্প্রদায়ই

একই পরতত্ত্ববস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্রীর উপাসক। একজন লোক দুগ্ধ পছন্দ করেন না, দুগ্ধ তাঁহার সহ্য হয় না, দধিই তাঁহার প্রিয়। আর একজন দধি পছন্দ করেন না, দধি তাঁহার সহ্য হয় না, দুগ্ধই তাঁহার প্রিয়। এই দুই জনের মধ্যে দুগ্ধ ও দধি লইয়া কখনও বিবাদ হয় না। কেননা, তাঁহারা পরস্পারকে জানেন, পরস্পরের লক্ষ্যও জানেন। যেখানে লক্ষ্য বস্তুর সহিত, বা পরস্পরের সহিত পরিচয়ের অভাব, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থবুদ্ধিরই প্রাধান্য, সে-স্থলেই বাদ-বিসম্বাদ, সে-স্থলেই মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, সে-স্থলেই অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, সে-স্থলেই সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা যখন কোনও একটী সম্প্রদায়ে ব্যাপকতা লাভ করে, তখনই সেই সম্প্রদায়ের ভাবকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়।

এতাদৃশী সাম্প্রদায়িকতার জন্য সকল স্থলে সম্প্রদায়কে দায়ী করা সঙ্গত হয় না। বেদ-প্রতিষ্ঠিত কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রশ্রয় দেয় বলিয়া মনে হয় না। এজন্য দায়ী হইতেছেন—প্রধানতঃ সম্প্রদায়ভুক্ত মুখ্য ব্যক্তিগণের স্বার্থবুদ্ধি, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য বলবতী লালসা, দলপুষ্টির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতাতে পারমার্থিকতা হইয়া পড়ে গৌণ, স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে পারমার্থিকতার আবরণে স্বার্থ-বুদ্ধিমূলক প্রয়াসই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থবুদ্ধি, সে-খানে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

আর এক রকমের সাম্প্রদায়িকতাও আছে ; তাহাতে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বা সম্প্রদায়াচার্য্যের বাক্যকেই বেদ-বাক্যের উপর স্থান দেওয়া হয়। তাঁহার উক্তির সহিত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহারও অনুসন্ধান করা হয় না ; কোনও স্থলে এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে যদি দেখা যায় যে, সম্প্রদায়াচার্য্যের বাক্য শাস্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিম্বা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রবিরোধী, তথাপি তাঁহার বাক্যেরই অনুসরণ করা হয়, শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষিত হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা যেস্থলে, সেস্থলে পারমার্থিকতার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, প্রধানভাবে দৃষ্টি থাকে সম্প্রদায়াচার্য্যের মর্য্যাদার প্রতি ; বিচার করিলে দেখা যায়, এই দৃষ্টিও পর্য্যবসিত হয় নিজের মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিতে।

**খ। সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা।** এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা সমাজবিষয়কও হইতে পারে এবং ধর্ম্মবিষয়কও হইতে পারে। অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতাদি হইল সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা। "আমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজই কুলীন, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, আচার-সম্পন্ন ; অপর সমাজ বা অপর কোনও কোনও সমাজ আমার সমাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হেয়"—সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণতাই সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার হেতু।

আর, "আমি যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহাই মুক্তির একমাত্র উপায়, আমার যাহা সাধন-প্রণালী, তাহাই একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা ; অপরের সাধন-প্রণালী ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক ; অপরে মুক্তির যে ধারণা পোষণ করে, তাহাও ভ্রান্ত"—ইত্যাদি রূপ যে সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহাই ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার মূল। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই একটা গণ্ডীবদ্ধতার ভাব আছে—"আমি যে গণ্ডীতে বা যে মণ্ডলীতে আছি, তাহাই সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট ; অপরের গণ্ডী সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্ট"—এইরূপ একটা ভাব। বলা বাহুল্য, ইহা পরমার্থ-বিরোধী। ইহার মূল হইতেছে অভিমান। যেখানে অভিমান, সেখানে পরমার্থ বহুদূরে।

**গ। ধর্ম্মে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সাম্প্রদায়িকতা।** প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দুইটা দিক্ আছে, সামাজিক বা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সাম্প্রদায়িকতা দুই দিকেই থাকিতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতাই হইতেছে এ-স্থলে আলোচ্য; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুইটা দিকই বিচার করিতে হইবে।

সামাজিক বা ব্যবহারিক দিকেরও আবার দুইটী শাখা আছে---বংশ বা জাতিবিচারমূলক ব্যবহার এবং পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার।

গোস্বামিগ্রন্থে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে, বংশ বা জাতিবিচারমূলক যে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামাজিক উদারতার আদর্শস্থানীয়। কাশীখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ ১০।৭৮॥—ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, কি শূদ্রই হউন, কিম্বা অপর কোনও জাতিই হউন, যিনি বিষ্ণুভক্তি-যুক্ত, তিনি সর্ব্বোত্তমোত্তম।" "শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ১০।৬৮ ধৃত নারদীয় বাক্য॥—বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"---ইত্যাদি নারদীয়-বচনও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত হইয়াছে। এই মর্ম্মের বহু প্রমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবদ্‌ভক্তের বা বৈষ্ণবের কুলের বিচার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ করেন নাই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপোষণ বরং অপরাধজনক বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়া গিয়াছেন। "শূদ্রং বা ভগবদ্‌ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ১০।৮৬ ধৃত ইতিহাস-সমুচ্চয়-বাক্য॥" জাতিকুল অপেক্ষা জীবের স্বরূপের প্রতিই—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০১॥"—এই তথ্যের প্রতিই বৈষ্ণবগণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। কেবল অপরের সম্বন্ধে নয়, নিজের সম্বন্ধেও জাতিকুলের সংস্কার যাহাতে চিত্ত হইতে দূরীভূত হইতে পারে, এবং স্বরূপের সংস্কারই যাহাতে চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও আচার্য্যগণ করিয়া গিয়াছেন। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ শ্রীচৈঃ চঃ ধৃত পদ্যাবলীবচন।"—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থী নই, যতি নই—চারি বর্ণেরও কেহ আমি নই, চারি আশ্রমেরও কেহ আমি নই; আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। নিজের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তারই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এই উক্তির তাৎপর্য্য এই। জাতি, কুল, বর্ণ, আশ্রমাদি সমস্তই হইতেছে দেহের, দেহের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব মায়ার প্রভাবে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, দেহেতেই তাহার বুদ্ধি আবেশ প্রাপ্ত হয়; এজন্য দেহের পরিচয়েই নিজের পরিচয় দিয়া থাকে—ভূতাবিষ্ট লোক যেমন ওঝার জিজ্ঞাসার উত্তরে ভূতের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে, তদ্রূপ। সুতরাং দেহের পরিচয়ে যে পরিচয়, তাহা জীবের বা জীবস্বরূপের বাস্তব পরিচয় নহে। দেহমধ্যস্থিত জীবস্বরূপের পরিচয়ই হইবে লোকের বাস্তব পরিচয়। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া কৃষ্ণদাসরূপে যে পরিচয়, তাহাই হইতেছে লোকের বাস্তব পরিচয়, পারমার্থিক পরিচয়। এইরূপ পরিচয়ে জীবে-জীবে পার্থক্যবুদ্ধির—অমুক বড়,

অমুক ছোট, ইত্যাদিরূপ বুদ্ধির—অবকাশ নাই। সকলেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—সুতরাং সকলেই সমান। সকলেরই প্রভু, সকলেরই একমাত্র প্রিয়, যখন একজন—শ্রীকৃষ্ণ, তখন সকলেই সকলের প্রিয়, বন্ধু, আত্মীয়। ইহাতে পরস্পারের প্রতি প্রীতিমূলক ভাব জাগ্রত হইতে পারে।

বলা যাইতে পারে—জীবমাত্রই যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, অনাদিবহির্ম্মুখ সংসারী জীব তাহা তো অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং উল্লিখিতরূপ পরিচয় সে কিরূপে দিতে পারে? উত্তরে বলা যায়—উপলব্ধি না হইলেও তত্ত্বটী স্মরণে রাখিয়া যদি অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে তদনুরূপ একটা সংস্কার জাগ্রত হইতে পারে। দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারকে কেহ সহজে উপেক্ষা করিতে পারে না। এইরূপ সংস্কার জাগ্রত হইলে লৌকিক জগতেও সুখে স্বচ্ছন্দে পরস্পারের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করা যায়।

যাহাহউক, এইরূপে সকলেরই একই জীবত্বের সাধারণ ভূমিকায় অবস্থিতির জ্ঞানে পাছে কাহারও প্রতি ঔদাসীন্য বা আরও অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কোনও ভাব আসিয়া পড়ে, তাই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,—এমন কোনও কাজ করিবে না, বা এমন কোনও ব্যবহার করিবে না বা কথা বলিবে না, এমন কোনও ব্যবহারের চিন্তাও মনে স্থান দিবে না, যাহাতে অপরের মনে কষ্ট হইতে পারে। "প্রাণিমাত্রে মনো বাক্যে উদ্বেগ না দিবে। শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৬৬॥" সকলের অপেক্ষা সকল বিষয়ে উত্তম হইলেও নিজেকে অন্য সকল অপেক্ষা হীন মনে করিবে। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। শ্রীচৈ. চ. ২।২৩।১৪॥" কোনওরূপ হীন অভিমান যেন মনে স্থান না পায়; "উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।২০॥" আর, নিজে কাহারও নিকটে সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু অপরকে সম্মান করিবে। "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। শ্রীচৈ. চ. ৩।৬।২৩৫॥" সকলের মধ্যেই পরমাত্মা রূপে ভগবান্ সর্ব্বদা বর্ত্তমান্; সকলেই ভগবানের শ্রীমন্দির-তুল্য—এরূপ মনে করিয়া, কেবল মানুষকে নয়, পরন্তু জীবমাত্রকেই সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।২০॥" এই উপদেশটী শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর আরও পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন —"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ চৈ. ভা. অন্ত্য, ৩য় অধ্যায়।"

এই উক্তিগুলি শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তিরই প্রতিধ্বনিমাত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—"অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেব বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ ৬।৪।১৩॥—সকল জীবের দেহাভ্যন্তরেই পরমাত্মারূপে ভগবান্ হরি অবস্থিত; সুতরাং সকল জীবকেই ভগবান্ হরির স্থান (শ্রীমন্দির) রূপে অবলোকন করিবে, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেনা; এইরূপ করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।" শ্রীমন্দির সংস্কাররিহীন, ভগ্ন, বিকৃত, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন হইলেও যেমন ভক্তের নিকটে সম্মানার্হ, তদ্রূপ কোনও জীব সামাজিক দৃষ্টিতে নীচ হইলেও ভক্তের নিকটে নমস্য। "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্‌ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ শ্রীভা. ১১।২৯।১৬॥ টীকা—অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ॥ স্বামী॥ শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বর-দৃষ্ট্যা প্রণমেৎ॥ শ্রীজীব॥—অন্তর্য্যামী ঈশ্বর-দৃষ্টিতে (অর্থাৎ সকলের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান, ইহা মনে করিয়া) কুক্কুর, চাণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে।" শ্রীভাগবত আরও বলিয়াছেন—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো

ভগবানিতি ॥ ৩।২৯।৩৪॥-টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ জীবকলয়া অন্তর্য্যামিতয়া ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥—অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা ( আন্তরিক ভাবে ) বহু সম্মান পূর্ব্বক সমস্ত জীবকেই প্রণাম করিবে।" এইরূপে দেখা গেল—প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিরপেক্ষ ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের এইরূপ সামাজিক উদারতা বৈদিক ভারতের কৃষ্টির উপরেই যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা, সকলের একমাত্র গতি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার সহিত জীবের একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথায় আস্থা, সেই ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখতার প্রয়াস—এ-সমস্তই হইতেছে বৈদিক ভারতের কৃষ্টির ভিত্তি। এজন্যই লোকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের সঙ্গেই বেদবিশ্বাসী ভারতবাসী ঈশ্বরের সহিত একটা সম্বন্ধ রক্ষা করেন; শাস্ত্রের ব্যবস্থাও তদনুরূপ। বৈদিক ভারতের লক্ষ্য বস্তু হইতেছে মোক্ষ, মায়ানিবৃত্তি, মায়ার প্রভাবে যে দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহেতে আবেশ এবং সেই আবেশের ফলে যে নানাবিধ অভিমান, সে সমস্তের দূরীকরণ। অভিমানবশতঃ যাঁহারা কোনও লোককে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় বলিয়া মনে করেন, দেহাবেশই হইতেছে তাহার মূল কারণ; অথচ এই দেহাবেশ দূরীকরণই বৈদিক ভারতের লক্ষ্য। যাঁহারা অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিতেই চেষ্টা করেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যে মায়াজনিত দেহাবেশকেই গাঢ় হইতে গাঢ়তর করার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, বা বুঝিতে চেষ্টা করার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না। কোনও কোনও স্মৃতিতে অধিকারি-বিশেষের জন্য অস্পৃশ্যতাদি আচারের উপদেশ দৃষ্ট হইলেও তাহার উদ্দেশ্য কি, তদ্‌বিষয়েও তাঁহাদের অনুসন্ধান দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অভিমানবশতঃ যে অস্পৃশ্যতাদির উপাদেয়তার ভাব চিত্তে জাগ্রত হয়, তাহা যে পরমার্থের বা মোক্ষের প্রতিকূল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেননা, তাহাতে দেহাবেশ ক্রমশঃই গাঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। এজন্যই বলা যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উল্লিখিতরূপ সামাজিক উদারতা অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার বহু উর্দ্ধে; কেননা, ইহাতে দেহেতে আবেশ তরলতা লাভ করার সম্ভাবনা থাকে; ইহাই পারমার্থিক লাভ। আর, এতাদৃশী উদারতায় সমাজের মধ্যে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়, অনর্থক সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়।

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ"—বৈষ্ণব-পদকর্ত্তার এই উক্তিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সামাজিক উদারতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

## ঘ। পারমার্থিক ধর্ম্মযাজন-বিষয়ে উদারতা

জীবস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই চিদ্রূপা শক্তির অংশ বলিয়া এবং অংশীর সেবায় অংশের স্বরূপগত অধিকার আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে। অগ্নিকে যেমন তাহার দাহিকা শক্তি

হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবকেও তাহার কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত অধিকার হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না।

কিন্তু অনপসারণীয় স্বরূপগত অধিকার থাকিলেও অনাদিবহির্ম্মুখ জীবে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; সেই সেবাবাসনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভজনের প্রয়োজন। কিন্তু সকল জীবের দেহ সাধন-ভজনের উপযোগী নহে; সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তিও তাহার অনুকূল নহে। জীবসমূহের মধ্যে একমাত্র মানুষের দেহ এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই সাধন-ভজনের অনুকূল। তাই, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজনের স্বরূপগত অধিকার আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহা স্বীকার করে। এজন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার শ্রীচৈ. চ. ৩।৪।৬৩॥" যবন-কুলে আবির্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি বহু যবন-সন্তানও শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পরিকর-ভক্তও ছিলেন। তাঁহার নির্য্যানের পরে তাঁহার শবদেহ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যও করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দের সহিত মহাপ্রভু হরিদাসের শবদেহের সৎকারও করিয়াছিলেন। এইরূপ উদারতা অন্যত্র দুর্ল্লভ।

নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে, অর্চ্চন-মার্গে, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদিতেও জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল বৈষ্ণবের অধিকার আছে। শালগ্রাম-সেবার অধিকার হইতেও বৈষ্ণবশাস্ত্র কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই, এমন কি স্ত্রীলোককেও না। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম-বিলাসে ২৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্লোকস্থ "পরৈঃ" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ, অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎ-পরায়ণ—দ্বিজ, স্ত্রী এবং শূদ্র, ইঁহাদের সকলের দ্বারাই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবান্ পূজিত হইতে পারেন।" এইরূপ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্র-প্রমাণরূপে স্কন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ ৫।২৪॥" টীকা হইতে জানা যায়, ইহা শ্রীনারদের উক্তি এবং এই শ্লোকোক্ত "সচ্ছূদ্রাণাং" শব্দের অর্থ—সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং—যাঁহারা বৈষ্ণব, এরূপ শূদ্রদের এবং "অন্যেষাং" অর্থ—অসতাং শূদ্রাণাং—অবৈষ্ণব শূদ্রদের। তদনুসারে শ্লোকের অর্থ হইল এই :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৈষ্ণব শূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে; কিন্তু কখনও অবৈষ্ণব-শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। টীকায় সনাতনগোস্বামী অন্যান্য পুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "মধ্যদেশে, এই দেশে এবং দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণবদের মধ্যে উক্তরূপ আচারও প্রচলিত আছে।" গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে এখনও এই প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। তবে ইহা তত ব্যাপক নয়; তাহার কারণ বোধহয় এই যে, শালগ্রাম-চক্র সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যাত্মক বিগ্রহ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাব মাধুর্য্যময়; তাই তাঁহারা—সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নিতাইগৌর প্রভৃতির বিগ্রহ বা চিত্রপট পূজা করিয়া থাকেন। গোবর্দ্ধনশিলাকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণকলেবর বলিয়াছেন; তাই তাঁহারা এই শিলারও পূজা করেন। কুলাচার অনুসারে ব্রাহ্মণ শালগ্রামচক্রের

পূজা করিয়া থাকেন—তা তিনি বৈষ্ণবই হউন, কি শৈব বা শাক্তই হউন। তাই, ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শালগ্রামপূজার প্রচলন বেশী। ব্রাহ্মণেতর বংশোদ্ভব কাহারও তদ্রূপ কুলাচার বিরল; তাই তাঁহাদের মধ্যে শালগ্রামের পূজার প্রচলনও কম।

হরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বহু শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানাং একত্রৈব গণনা—বিপ্রদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের একত্রই গণনা।" "বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি—ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের সাম্যই সিদ্ধ হইতেছে।" যেহেতু "ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব—ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়।" তাই "ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধেরও শ্রীশালগ্রাম-পূজার কথা উক্ত হইয়াছে।" "শ্রীভাগবত-পাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ – শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবদের অধিকার দৃষ্ট হয়।" শ্রীমদ্ভাগবতের "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে শ্বপচও সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে।

**জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের পক্ষে গুরু হওয়ার অধিকার**ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১০০॥" ব্যবহারতঃও ইহা দৃষ্ট হয়। বৈদ্যবংশোদ্ভব শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, কায়স্থ-বংশোদ্ভব শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং সদ্গোপবংশোদ্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মন্ত্র-শিষ্যও ছিলেন এবং এখনও তত্তৎ-পরিবারস্থ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—ভক্ত শ্বপচকেও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধিকার দিয়াছেন, ভক্তব্রাহ্মণের অনুরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। আর যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণব-সমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা নাই; সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥", "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হেয় করি মানে॥", "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে॥"—ইত্যাদি হইতেছে যে সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বিধান, সেই সম্প্রদায়ে সম্মান-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার অবকাশ কোথায়? সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং আগ্রহ স্বাভাবিক। "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত॥"

তথাপি কিন্তু জাতি, বংশ, বিদ্যা ও ভজনাদির দোহাই দিয়া অপরের নিকট হইতে সম্মানাদি আদায়ের প্রয়াস যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে একেবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা নহে। কিন্তু এতাদৃশ প্রয়াস যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ভজনবিরুদ্ধ, পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। এইরূপে সম্মান-প্রাপ্তির দাবীর পট-ভূমিকায় রহিয়াছে দেহাবেশজাত অভিমান। কিন্তু শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"অভিমানী

ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন ॥” শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন—“পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩৷৪৷৬৪ ॥” যাঁহারা ঐরূপ সম্মানের দাবী করেন, তাঁহারা হয়তো বলিবেন—“মর্য্যাদা-রক্ষণের দাবীতে দোষ কোথায় ? শ্রীমন্মহাপ্রভুও তো বলিয়া গিয়াছেন,—‘ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ। মর্য্যাদা পালন হয়—সাধুর ভূষণ’ ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩৷৪৷১২৫ ॥” উত্তরে বক্তব্য এই—নিজের মর্য্যাদা রক্ষণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য নহে ; অপরের মর্য্যাদা রক্ষণই হইতেছে প্রভুর অভিপ্রেত। তাহা না হইলে “অমানী মানদ” কথারই সার্থকতা কিছু থাকে না। মর্য্যাদা বস্তুটী লৌকিক জগতেই “আদায়ের” জিনিস ; ইহা অভিমানের পরিচায়ক। পারমার্থিক ব্যাপারে “মর্য্যাদা” আদায়ের বস্তু নহে, ইহা “দেওয়ার” বস্তু। মর্য্যাদা-রক্ষণ শিক্ষা দিতে যিনি চাহেন, অপরের প্রতি মর্য্যাদা-প্রদর্শনের দ্বারা যদি তিনি তাহা শিক্ষা দেন, তাহা হইলেই শাস্ত্রোক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকিতে পারে।

## ৬। পারমার্থিক-উপাসনা-বিষয়ে উদারতা

পারমার্থিক-উপাসনা সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্য।

কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব, দুর্গা, পরমাত্মা, শাস্ত্রবিহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি হইতেছেন বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের উপাস্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে এই সমস্ত উপাস্যের মধ্যে স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই ; ইঁহারা সকলেই পরতত্ত্ব-বস্তুর—স্বয়ংভগবানের—বিভিন্ন স্বরূপ ; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই ; ভেদ আছে, মনে করিলে অপরাধ হয় বলিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন। “ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২৷৯৷১৪০-৪১॥” পরতত্ত্ববস্তু একই বিগ্রহে বিভিন্ন স্বরূপে নিত্য বিরাজমান—বিভিন্ন সাধককে কৃতার্থ করার নিমিত্ত। সাকার যিনি, নিরাকারও তিনি ; সবিশেষ যিনি, নির্ব্বিশেষও তিনি। সুতরাং সকল স্বরূপই সচ্চিদানন্দ ; সুতরাং সকল স্বরূপই নিত্য, সকল স্বরূপেরই পারমার্থিক সত্যতা আছে।

বৈদুর্য্যমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অভিন্নতা দেখাইয়া থাকেন। একই বৈদুর্য্যমণি যেমন স্বরূপে বহু বর্ণের সমবায়ে একই বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়াও কোনও দিক্ হইতে নীলবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে পীতবর্ণ, ইত্যাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ স্বরূপে অব্যাকৃত থাকিয়াও এক এক রকমের সাধকের নিকটে এক এক রকমে অনুভূত হন। “মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্র ॥” যে মণি একজনের নিকটে নীলবর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই মণিই আর একজনের নিকটে পীতবর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হয় ; তাহাদের অবস্থানের পার্থক্যই এই বর্ণানুভূতি-পার্থক্যের হেতু। তদ্রূপ, এক সাধকের নিকটে যিনি সদাশিবরূপে অনুভূত হন, আর এক সাধকের নিকটে তিনিই কৃষ্ণ বা রামরূপে অনুভূত হন ; উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভূতির পার্থক্য। নীলবর্ণ যে মণির, পীতবর্ণও সেই মণিরই। যিনি নীলবর্ণ মানেন, কিন্তু পীতবর্ণের নিন্দা করেন, তিনি ঐ মণিরই নিন্দা করেন। তদ্রূপ সদাশিব যিনি, কৃষ্ণও তিনি ; সুতরাং যিনি শিবকে মানেন, কিন্তু কৃষ্ণের অবজ্ঞা করেন, অথবা কৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু সদাশিবের অবজ্ঞা করেন,

তিনি স্বরূপতঃ অবজ্ঞা করেন সেই তত্ত্বের—যে তত্ত্ব শিব, কৃষ্ণাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজমান্। তাই যিনি এক ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা করেন, তিনি ভগবত্তত্ত্বেরই অবজ্ঞা করেন। কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি যিনি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্বের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন—তিনি ভগবদ্-বিদ্বেষী। এক অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে সমস্ত দেহেই তাহার ফল অনুভূত হয়। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদ-জ্ঞান পোষণ করেন না বলিয়াই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এরূপ মনে করিতে পারেন। তাই তাঁহারা শিব ও হরির নামগুণলীলাদির পার্থক্যজ্ঞানকে একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্॥ মদ্‌ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ। উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৪।৬৫॥—শ্রীহরি বলিয়াছেন, নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের বৈকুণ্ঠগতি হয় সত্য; কিন্তু মহাদেবদ্বেষী না হইলেই তাঁহাদের ঐ বিষ্ণুধামপ্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দাপূর্ব্বক নিরন্তর একান্তভাবে আমার অর্চ্চনা করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। মদ্‌ভক্ত শিবদ্বেষী হইলে, অথবা শিবভক্ত মদ্দ্বেষী হইলে চন্দ্রসূর্য্যস্থিতি-পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়।" শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে ঃ—"শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র। এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥ না-মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব। শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥" পুনরায়, শিবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ঃ—"যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে। সে আমারে মাত্র যেন অনাদর করে॥" আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—"পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর। এই পাপে অনেকে যাইবে যমঘর॥" ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মত; এই মতে কোনও সম্প্রদায়ের উপাস্যের প্রতিই অবজ্ঞা বা কটাক্ষের অবকাশ নাই; সকল স্বরূপই সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র; কারণ, সকল স্বরূপই একই বস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্রী। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ইহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও শিব, নৃসিংহ, রাম, বিষ্ণু, ভগবতী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরূপের শ্রীমন্দিরে গিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন, সকল মন্দিরেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাবেশ অক্ষুণ্ণ ছিল; যে কোনও মন্দিরে যে কোনও স্বরূপের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত; কারণ, তিনি মনে করিতেন—এই শ্রীমূর্ত্তিও তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেরই একরূপ। শ্রীকৃষ্ণরূপে রসিকশেখর যে রস আস্বাদন করেন, শিবাদিরূপেও তিনি সেই রসেরই অপর এক এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন-স্বরূপে তাঁর নিত্য-অবস্থিতির আনুষঙ্গিক কারণই হইল বিভিন্ন ভাবের উপাসককে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর অভিপ্রায়। আর, ইহার অন্তরঙ্গ কারণ হইল—রসিক-শেখরের বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর এবং বিভিন্ন প্রকারের ভক্তের বিভিন্ন প্রেম-রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন। এই রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের ব্যপদেশেই আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-বৈচিত্রীময় বিভিন্ন উপাসককে তিনি কৃতার্থ করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ এরূপ উদার মত পোষণ করেন বলিয়াই

লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থান এবং ভগবৎ-কথার আস্বাদন, রাম-উপাসক মুরারিগুপ্তের পক্ষে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তি এবং ব্রজভাবের উপাসক রূপ-সনাতনের ও রাম-উপাসক অনুপমের একত্রে পরমানন্দে ভজনানুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবতত্ত্ব-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ধারণা অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই এই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সম্ভব।

তারপর উপাসনা সম্বন্ধে। কোনও সম্প্রদায়ের উপাসনা একেবারে নিরর্থক—এমন কথা গৌড়ীয় সম্প্রদায় কখনও বলেন নাই। লক্ষ্যভেদে উপাসনাভেদ, পরতত্ত্বের অনুভূতির ভেদ। "উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। শ্রীচৈ. চ. ১।২।১৯॥" "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৩৪॥", এসমস্ত উক্তিই বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর সার্থকতার প্রমাণ। যিনি যেভাবে ভগবান্‌কে বা পরতত্ত্ববস্তুকে পাইতে চাহেন, তাঁহার উপাসনাও তদনুরূপ হইবে; নিজ নিজ ভাবের অনুকূল উপাসনাই সাধকদের পক্ষে কর্ত্তব্য। "যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম। শ্রীচৈ. চ. ২।৮।৬৫॥" এবিষয়ে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই।

তারপর লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। এই লক্ষ্যকে মোটামুটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাঁচ রকম মুক্তি এবং প্রাপ্তি। সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য—এই পাঁচ রকম মুক্তি। সাযুজ্যে সিদ্ধাবস্থায় সাধক উপাস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সাধকের পৃথক্ সত্ত্বার জ্ঞান এবং সেব্য-সেবকত্বের ভাব থাকে না বলিয়া ভক্ত সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না। সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তিতে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের পৃথক্ বিগ্রহ থাকে, সুতরাং সেবার সুযোগ থাকে; কিন্তু এই চারি রকমের মুক্তির সেবা ঐশ্বর্য্যভাবময়। তাই শুদ্ধমাধুর্য্য-মার্গের গৌড়ীয়-ভক্তগণ এসমস্তও চাহেন না। তাঁহারা চাহেন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা; তাঁহাদের লক্ষ্যকে বলে ভগবৎ-প্রাপ্তি। কিন্তু পঞ্চবিধা মুক্তি তাঁহাদের কাম্য না হইলেও এসমস্ত মুক্তির পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, এসমস্ত মুক্তি অল্পকাল স্থায়ী—একথা কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলেন না। এসমস্ত মুক্তিতেও রসস্বরূপ ভগবানের রস-আস্বাদন করিয়া জীব "আনন্দী" হইতে পারে, তবে আস্বাদনের তারতম্য আছে, সকল ভাবে, সকল মুক্তিতে রসের সকল বৈচিত্রীর আস্বাদন হয় না। সকল রকমের আস্বাদন-চমৎকারিতারও অনুভব হয় না। "কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।৬৪॥" আস্বাদনের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই মুক্তিরও বিভিন্নতা। শুদ্ধ-মাধুর্য্যভাবের প্রাপ্তিতেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে নানারকম পার্থক্য আছে।

বলা বাহুল্য, এ পার্থক্য কেবল ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনের চমৎকারিত্বে; মুক্ত কিন্তু সকলেই। যে কোনও রকমের মুক্তিতেই, কিম্বা যে কোনও রকমের ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই মায়াবন্ধন হইতে, সংসার হইতে, ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে, জন্মমৃত্যু হইতে সাধক অনন্তকালের জন্য অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। সাধকের রুচিভেদে, প্রকৃতি-ভেদে—লক্ষ্যভেদ, উপাসনাভেদ; সকল লক্ষ্যেরই সাধারণ ভূমিকা মায়ামুক্তি। গৌড়ীয়-সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করেন না। মুক্তদের মধ্যে পরতত্ত্ব-বস্তুর সেবার এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের ভেদেই মুক্তির এবং প্রাপ্তির ভেদ।

লক্ষ্য বিষয়েও গৌড়ীয়দের মত অত্যন্ত উদার। স্বীয়-উপাস্য-স্বরূপে যাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক না হইলেও তিনি যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন হইতে পারেন, শ্রীল মুরারিগুপ্তাদিই তাহার প্রমাণ। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হইয়াও মুরারিগুপ্ত এবং লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইয়াও শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন। তিনি নিজে উপযাচক হইয়া কাহারও সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই তিনি বিচার আরম্ভ করিতেন; কোনও স্থলে বা প্রসঙ্গক্রমেও বিচার আসিয়া পড়িত। কোনও সম্প্রদায়ের হেয়তা-প্রতিপাদনই এই বিচার-বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিল না। যথার্থ তত্ত্ব-নির্ণয়ই ছিল ইহার লক্ষ্য। তত্ত্ব-নির্ণয়মূলক বিচার-বিতর্কে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বেঙ্কট-ভট্টের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল; তাঁহার নিজের মত এবং উপাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রচারিত মত এবং উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তিনি কখনও ভট্টকে বলেন নাই। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সঙ্গেও উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার বিচার হইয়াছিল; বিচারে আচার্য্য তাঁহার ত্রুটি বুঝিলেন। কিন্তু প্রভুর নিজের মত গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকেও তিনি বলেন নাই। * একথা সত্য, বহু ভিন্ন সম্প্রদায়ী লোক মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ভজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সকলেই যে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তর্কের পরাজয়ে সকল সময়ে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পরতত্ত্বের যে মোহন-রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া এবং সেই মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের প্রভাবে যে সমস্ত অদ্ভুত প্রেমবিকার লোক

---

* শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির লোভনীয়তার কথা বলিয়া এক সময়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ রামচন্দ্রোপাসক মুরারি গুপ্তকে শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ মুরারিগুপ্তও সম্মত হইলেন বটে; কিন্তু পরে আসিয়া "কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥ রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা। কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা মনে পাও ব্যথা॥ শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়। তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়॥ তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥" মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গুপ্তকে চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিয়াছিলেন— "সাধু সাধু গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন। আমার বচনে তোমার না টলিল মন। এই মত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়। প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায়॥ তোমার ভক্তিনিষ্ঠা জানিবার তরে। তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥ শ্রীচৈ চ ২।১৫।১৩৭-৫৭॥" এই বিবরণ হইতে জানা গেল—স্বীয় উপাস্যের চরণে সাধকের কিরূপ সুদৃঢ়া নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক, মুরারিগুপ্তের দৃষ্টান্তে তাহা সাধকবৃন্দকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভুর এই ভঙ্গী; শ্রীরামচন্দ্রের ভজন ছাড়াইয়া মুরারিগুপ্তকে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবর্ত্তিত করানই তাঁহার বাস্তব উদ্দেশ্য ছিল না। বস্তুতঃ, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি শাস্ত্রবিহিত ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের মধ্যে যে কোনও স্বরূপের কোনও উপাসককে স্বীয় উপাস্যস্বরূপের উপাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করার জন্য তিনি কখনও আদেশ বা অনুরোধ করেন নাই।

তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই অধিকাংশ লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ-প্রেমরশ্মিও যে সকলের চিত্তে একটী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল অত্যন্ত উদার—জীবমাত্রকেই রসস্বরূপ ভগবানের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল আহ্বান। অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ-খ্যাপনের ইচ্ছা হইতে এই প্রচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মাধুর্য্যের লোভে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশও অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ সূচিত করে না; বরং এই সমস্ত লোকের অবচেতনায় যে লোভ প্রচ্ছন্ন ছিল, মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাহার পরিস্ফুরণই সূচিত করে।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইবে যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তবে ইহাও সত্য যে, বেদবিরুদ্ধ আচরণের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায় কোনওরূপ আপোষ-রফা করিতে প্রস্তুত নহেন; কেননা, তাহাতে লৌকিকতা রক্ষিত হইলেও পরমার্থকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

## ৩৭। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও লৌকিক ব্যবহার

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সকলের কথা বাদ দিলেও সমাজের অধিকাংশ লোক যদি তাহার অনুসরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও এই বাদ-বিসম্বাদময় সংসার শান্তিময় হইয়া উঠিতে পারে। সমস্ত বাদ-বিসম্বাদ এবং অশান্তিময় সংঘর্ষের মূল হেতু হইতেছে—অভিমান। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান", "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হেয় করি মানে", "অমানী কিন্তু মানদ হইবে", "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"-ইত্যাদি উপদেশ যে-স্থলে, সে-স্থলে কোনওরূপ অভিমানের স্থান থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উল্লিখিত উপদেশগুলি হইতেছে লোকের পক্ষে ক্লীবত্ব-সম্পাদক, মনুষ্যত্ব-বিকাশের প্রতিবন্ধক। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বোধহয় একমাত্র দৈহিক-সামর্থ্যকেই মনুষ্যত্বের বাস্তব ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে তাঁহারাও তাঁহাদের মতের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। দৈহিক সামর্থ্য এবং তাহার প্রয়োগ মানুষেরই বিশেষত্ব নহে; পশুদের মধ্যেও তাহা দৃষ্ট হয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য পশুরাও তাহাদের দৈহিক সামর্থ্যের প্রকাশ করে; তাহাদের অন্য কোনওরূপ সামর্থ্য নাই। এজন্য দৈহিক সামর্থ্যকে পশুশক্তিও বলা যায়। মানুষের বিশেষত্ব হইতেছে পারমার্থিক এবং নৈতিক সামর্থ্য; ইহা অন্য কোনও জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। পারমার্থিক এবং নৈতিক সামর্থ্যের প্রভাব পশুশক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক। দৈহিক সামর্থ্যে বা পশুশক্তিতে অপরের দেহকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, কিন্তু চিত্তকে বশীভূত করা যায় না। পারমার্থিক এবং নৈতিক সামর্থ্যেই দেহ-মন উভয়কেই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়—যবন মুলুকপতির আদেশে তাঁহার অনুচরগণ যখন হরিদাস ঠাকুরের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার করিতেছিল, তখন হরিদাস স্বীয় দৈহিক-সামর্থ্যের সহায়তায় তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা

করিয়াছিলেন—মুলুকপতির বা তাঁহার অনুচরগণের কাহারও যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। ফলে তাঁহাদের মনের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; মুলুকপতিও হরিদাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অত্যাচারিগণ মহাত্মা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিতেছিল, তখন তিনি কেবল তাহাদের জন্য ভগবানের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। মহাত্মা যীশুরই বাস্তব জয় হইয়াছিল। যে দুইজন মহাত্মার কথা এ-স্থলে বলা হইল, তাঁহাদের আচরণ কি ক্লৈব্যসূচক ? না কি মনুষ্যত্ব-বিরোধী ? মানুষের বিশেষত্ব যখন পারমার্থিক এবং নৈতিক সামর্থ্য, তখন যাহা এই সামর্থ্যবিকাশের অনুকূল, তাহাই হইবে মনুষ্যত্ব-বিকাশের এবং প্রকৃত-শক্তিবিকাশের সহায়ক। পশুশক্তি তাহার অনুকূল হইতে পারে না।

লৌকিক ব্যবহারের উল্লিখিত নীতিগুলি যে কেবল গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরই নিজস্ব, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। সত্যদর্শিমাত্রেই এ-সকল নীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা যীশুও বলিয়াছেন—"অপরের নিকট হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে চাহ, অপরের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিবে", "তোমার এক গালে কেহ চাপড় মারিলে, তুমি তোমার আর এক গাল পাতিয়া দিবে।" এ-সমস্ত ক্লৈব্যের লক্ষণ নহে, পারমার্থিক এবং নৈতিক শক্তির এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক।

কিন্তু এতাদৃশ আচরণের একমাত্র ভিত্তি হইতেছে ঈশ্বরে বিশ্বাস। যেখানে এই বিশ্বাসের অভাব, সেখানে উল্লিখিতরূপ আচরণ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, স্থলবিশেষে তাদৃশ বাহ্যিক আচরণ দৃষ্ট হইলেও মনোভাবের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কেননা, অন্যের প্রতি অসঙ্গত আচরণের হেতুই হইতেছে আচরণকারীর কোনও না কোনওরূপ অভিমান। সর্ব্বপ্রকারের অভিমানের হেতুই হইতেছে মায়ার প্রভাব। জীব নিজের চেষ্টাতে মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না, ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করিলেই মায়া এবং মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপতি ভগবানের নিত্য অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি কখনও নিজেকে কোনও বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে পারেন না, তদ্রূপ কোনও অভিমানও তাঁহার চিত্তে স্থান লাভ করিতে পারে না; দৈবাৎ তদ্রূপ অভিমানের উদয় হইলেও ভগবানের কথা মনে করিলে সেই অভিমান দূরীভূত হইতে পারে। তাদৃশ ভগবানের অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনিই নিজেকে কোনও বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারেন এবং তদনুরূপ আচরণেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন; তাহার ফলে অশান্তি উপদ্রবেরই সৃষ্টি হইবে, শান্তি পাওয়া যাইবে না।

মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন—তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিলে লোক এই পৃথিবীতেই ভগবানের রাজত্ব দেখিতে পাইবে। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া ভগবানের রাজত্বের কথা তিনি বলেন নাই, তাহা হইতেও পারে না।

আজকাল অনেকেই মহাত্মা গান্ধীর নীতি অনুসরণ করার কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রদর্শিত নীতি যে মহিমময়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই; পূর্ব্বোল্লিখিত নীতিই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

আচরিত এবং প্রচারিত নীতির মূল ভিত্তি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে-কথাটী কয়জনে সাধারণের নিকটে প্রচার করিয়া থাকেন ? ভগবানে মহাত্মাজীর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি অবিচলিতভাবে ভগবদ্‌ভজন করিতেন। ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা সাধারণকে জানাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রার্থনা-সভারও অনুষ্ঠান করিতেন।

বাস্তবিক, যেখানে ভগবানে বিশ্বাসের অভাব, সেখানেই উদ্বেগ, অশান্তি, সেখানেই পরধনে এবং পররাজ্যে লালসা, সেখানেই পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, বাস্তব বন্ধুত্বের অভাব, সেখানেই যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা।

জড়বাদের প্রভাবে আজকাল ঈশ্বর-বিমুখতাই সর্ব্বত্র বাহুল্যে দৃষ্ট হইতেছে, এমন কি অনেক স্থলে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও। তাহার ফলেই অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা দেখা দিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্য কেহ ইচ্ছা করেন না ; তাহা হইতে বিরত থাকার কথাই অনেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও ভাব এইরূপ যে, "আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমি যুদ্ধ করিব না।" কেহ কেহ বা নিজেদের রণনৈপুণ্যের, বা যুদ্ধাস্ত্রের মহিমা প্রচার করিয়া অপরের ত্রাস জাগাইয়া যুদ্ধবিরতি চাহেন। ইহা কিন্তু যুদ্ধবিরতির বাস্তব প্রয়াস নহে। যে মনোবৃত্তির ফলে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা, ইহাতে সেই মনোবৃত্তি থাকিয়াই যায়। কেহ কেহ আবার, নানাবিধ "শীলের" কথা প্রচার করিতেছেন ; তাহাও উত্তম। কিন্তু ভগবদ্‌বিশ্বাসকে বাদ দিয়া কেবল "বাহ্য শীল" যুদ্ধবিগ্রহের মনোবৃত্তিরূপ ব্যাধির প্রকৃষ্ট ঔষধ হইতে পারে না। এই "শীল" অনুসৃত হইলে আপাততঃ যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে বটে ; কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ভিত্তি যে মনোবৃত্তি, তাহা দূর হইবে কিনা, সন্দেহ। "যুদ্ধ বাধিয়া গেলে আমরা জয়লাভ করিতে পারিব কিনা", এইরূপ সংশয় যেখানে, সেখানেও হয়তো বাহিরে "শীলের" মহিমা স্বীকার করিয়া যুদ্ধবিরতি দেখা দিতে পারে ; কিন্তু নিজেদের জয় সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে, তখন আবার যুদ্ধ বাধিয়াও যাইতে পারে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলেই "স্নায়ুযুদ্ধের" বা "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের" আশঙ্কাও দূরীভূত হওয়া সম্ভবপর।

**বিষয়ভোগ।** যাহাহউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে সমস্ত নীতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিষয়ী লোকের পক্ষে তাহার অনুসরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

বিষয় এবং পরমার্থের মধ্যে একটা সমন্বয়ের কথাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যখন বাঙ্গালার নবাব হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের নিকটে লিখিয়াছিলেন— পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্ম্মও করিয়া থাকে ; কিন্তু গৃহকর্ম্ম করার সময়েও তাহার মনটী পড়িয়া থাকে সেই পুরুষটীর নিকটে। "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্‌॥" তদ্রূপ বিষয়কর্ম্ম করিবে, কিন্তু মনটী ফেলিয়া রাখিবে ভগবচ্চরণে।

শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকেও মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৬।২৩৬-৩৭॥"

বিষয়-ভোগ তত দোষাবহ নহে, বিষয়ে আসক্তিই পরমার্থের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, বিষয়ের—ইন্দ্রিয়-

ভোগ্য বস্তুর—দিকে মনকে আকর্ষণ করে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শিক্ষাও উল্লিখিতরূপই। রাজর্ষি জনক, মহারাজ অম্বরীষাদিও রাজত্ব করিতেন বটে; কিন্তু রাজত্বে তাঁহাদের আসক্তি ছিল না, তাঁহাদের আসক্তি ছিল ভগবচ্চরণে। অবশ্য, ভগবদ্‌ভজনব্যতীত এইরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে না।

গৃহ-পরিজন ত্যাগ করিয়া গেলেই যে সংসার ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনাই হইতেছে সংসার। গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিলেও যদি ভোগবাসনা চিত্তে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সংসার-ত্যাগ বা প্রকৃত সন্ন্যাস বলা যায় না। গৃহে অবস্থান করিয়াও যদি ভোগে অনাসক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই হইবে বাস্তব সংসার-ত্যাগ। গৃহে থাকিয়াও, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও, যদি নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্‌ভজন করা যায় এবং ভোগবাসনা দূরীকরণের জন্য ভগবচ্চরণে অকপট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যায়, তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় সংসার-বাসনা তিরোহিত হইতে পারে, তখনই অনাসক্ত ভাবে বিষয়-ভোগ করা সম্ভবপর হইতে পারে। অন্যথা নহে। ভজনের জন্যই মনুষ্যজন্ম, ভজনেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা; বিদ্যোপার্জ্জনের সার্থকতাও ভজনে।

পঢ়ে কেন লোক—কৃষ্ণ ভজিবার তরে।
সে যদি না হয়, তবে বিদ্যায় কিবা করে ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত ॥

ইহাই বৈদিক ভারতের আদর্শ। সকলেরই এই আদর্শ সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য।

## ৩৮। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং পরেও প্রায় বিশ-বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের পারমার্থিক দিক্‌টার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—মঙ্গলচণ্ডীর গীতে রাত্রি-জাগরণ, প্রতিমাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিষহরির পূজা, নানাবিধ উপচারে বাশুলীর অর্চ্চনা, মদ্যমাংস-সহযোগে যক্ষের পূজা-ইত্যাদিই ছিল তখন সাধারণ লোকের একমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম। যাঁহারা বিজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত, গীতা-ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেরও তাঁহারা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিতেন বটে; কিন্তু সে-সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁহারা কোনও রূপ চেষ্টা করিতেন না। যাঁহারা বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মুখেও ভগবন্নাম বা ভগবৎ-কথা শুনা যাইত না। ব্যবহারিক রসেই সকলে যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া থাকিতেন, কৃষ্ণপূজা-কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে কাহারও কোনওরূপ অনুসন্ধান ছিল না। ভক্ত-সাধকের সংখ্যা ছিল তখন অতি সামান্য; কিন্তু তাঁহারাও ছিলেন লোকের, এমন কি পণ্ডিতগণেরও, উপহাসের পাত্র।

পিতৃতর্পণের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের জন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন সে-স্থানে তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা প্রকটিত করেন। তাহার পর হইতেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রায় সর্ব্বদা বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাঁহার সেই ভাব উত্তরোত্তর গাঢ়তা লাভ করিতে থাকে; অধ্যাপনাদি কোনওরূপ বিষয়ব্যাপারেই তাঁহার আর মনোযোগ ছিল না। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, দলে দলে লোক তাঁহার সহিত যোগ দিতে

লাগিল। যাঁহারা বিষয়-রসে উন্মত্ত ছিলেন, প্রভুর অপূর্ব্বসুন্দর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত বিকার দর্শন করিয়া এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কি এক মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারাও সঙ্কীর্ত্তন-রসে নিমগ্ন হইলেন। নীরস মরুভূমিতে যেন অপূর্ব্ব প্রেমরসের বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সমগ্র বাঙ্গালাদেশে কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত হইয়া সকলের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। যে কয়জন ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তিভাব ব্যাপক-রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

কালক্রমে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র, অজ্ঞাত গ্রাম-কোণেও, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত হইতে লাগিলেন; সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা-আরতির মধুর কীর্ত্তনে, খোল-করতালের মধুর ধ্বনিতে, গুরুগম্ভীর শঙ্খরবে, উচ্চ হরিধ্বনিতে একটা স্নিগ্ধ পূত ভাবধারা প্রসারিত হইয়া সকলের চিত্তকে আনন্দ-স্পন্দনে স্পন্দিত করিতে লাগিল।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দেশের ধর্ম্মরাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। ভগবানের যে রূপটী তিনি জীবের সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্যই তাহার সংবাদ বিশেষ ভাবে দেন নাই। এই রূপে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা নাই, আছে মাধুর্য্যের প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ; তাঁহার হাতে পাপীর হৃৎকম্পোৎপাদনকারী তীক্ষ্ণকণ্টকময় জ্বলন্ত লৌহদণ্ড নাই, আছে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মোহনবংশী; শতযোজন দূর হইতে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রকম্পিত করযুগলকে বক্ষোপরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয়—দৌড়াইয়া গিয়া কোটি-মন্মথ-মনোমথন, স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল, সর্ব্বাত্ম-বিস্মাপন, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়, আকর্ণবিস্তৃত অরুণিম-নয়নযুগলে স্নিগ্ধ-করুণাধারাবর্ষী, সেই শ্যামসুন্দরের রাতুল চরণযুগলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ বলিয়া শ্রুতি পরতত্ত্ববস্তুর যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভু তাহারই সমুজ্জ্বল চিত্রটী জগতের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছেন। আনন্দ-স্বরূপত্বের, রস-স্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, এমন জাজ্বল্যমান ভাবে ইতঃপূর্ব্বে কেহ তাহা জানান নাই। ভগবত্তার সার কি, তাহাও এমন সুন্দর ভাবে কেহ জানান নাই। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল—ঐশ্বর্য্যই ভগবত্তার সার; তাই লোক ভগবানের নামেই যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, চমকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথমে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—"মাধুর্য্য ভগবত্তাসার।" ইহাই শ্রুতিপ্রোক্ত আনন্দ-স্বরূপত্বের, রসস্বরূপত্বের চরমতাৎপর্য্য। তিনি আরও জানাইলেন—পরতত্ত্বে এই মাধুর্য্যের বিকাশ এতই সর্ব্বাতিশায়ী যে, তাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" এই আনন্দঘনবিগ্রহ, রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ, অখিল-রসামৃত-বারিধি পরতত্ত্ব-বস্তু হইতেছেন—"পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥" তিনি "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" তাঁহাতে যিনি ভক্তি করেন, তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্যই তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার ব্রত। তিনিই জীবের একমাত্র প্রিয়। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার জন্যই তিনি ব্যাকুল। "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।" জীবমাত্রই তাঁহার নিত্যদাস, জীবমাত্রেরই তিনি প্রাপ্য। "শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ।" তাঁহার ভজনে জাতিকুলাদির বিচার নাই। তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নামকীর্ত্তন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মুখে এ-সমস্ত কথা শুনিয়া ভজনের জন্য লোক উৎসাহিত হইয়া পড়িল, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দিকে আকৃষ্ট হইল, ভগবৎ-কথা শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। ফলে, পুরাণাদির কথকতা, পাঠ, ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেও ভগবৎ-কথাদির প্রতি শ্রদ্ধা ও লালসা জাগাইয়া তুলিল। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় ভগবল্লীলা-কীর্ত্তনাদিও সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইতে-লাগিল।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রসারের জন্য মঠ-মিশানাদির প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বক্তৃতাদানের জন্য কোনও বক্তাও নিযুক্ত করেন নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বীয় অন্তরঙ্গ সঙ্গীদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে নামকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন—জীবের মঙ্গলের জন্য, দলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নহে। নামকীর্ত্তন এবং ভক্তিভাব যেন সর্ব্বত্র আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রচারিত অত্যুদার প্রেমধর্ম্মের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শত শত হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী লোকও ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি—যাঁহারা পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিয়া কিছু জানিতেন না, তাঁহারাও—এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শত-সহস্র নরনারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মরূপ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের মধ্যেও রহিয়া গিয়াছেন। এই উদারধর্ম্ম হিন্দুসমাজের ভাঙ্গনের মুখে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপেই পরিণত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম স্বীয় অদ্ভুত প্রভাবে জনসাধারণের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, বৈষ্ণব-সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাব যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা তখন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। তাহা আবার জনসাধারণের অন্তর্নিহিত ভাবের অনুকূল হইলেই আদৃত, রক্ষিত এবং প্রচারিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া কত সাহিত্য যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নির্দ্ধারিত পণ্ডিতগোষ্ঠী বা ভক্তগোষ্ঠীই যে এই সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা নহে। তদ্রূপ কোনও গোষ্ঠী ছিলও না। অনেক গ্রাম্যলোক—যাঁহারা পণ্ডিত নহেন, ধনী নহেন, সমাজে বিশেষ গণ্যমান্যও নহেন, এইরূপ লোকও—গানে কবিতায় তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, জনসাধারণও তাহা অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এ-সমস্ত গান-কবিতা যে সর্ব্বত্র পুস্তকাকারে লিখিত হইয়াছিল, তাহাও নহে; এইরূপ গান-কবিতা মুখে-মুখেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, স্থলবিশেষে এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক মুসলমানও এই ভাবের গান-কবিতাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত একটা প্রবাদ আছে—“কানু ছাড়া গান নাই।” এই কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহাদের মুখেও, এমন কি নৌকার মাঝি, দিনমজুর, দালানের ছাদ-পিটানের জন্য রাজমিস্ত্রীদের নিয়োজিত লোকদের মুখেও কানুবিষয়ক গান শুনা যায়।

বাস্তবিক শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যেও এক নূতন যুগের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালার

এবং বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। এই সাহিত্য দুই শ্রেণীর—বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত। বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যের লালিত্য এবং নিত্য-নূতন রসধারা বোধ হয় চিরকালই রসজ্ঞ ভাবুকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রথম চরিত-কথাই বোধ হয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত। তাহার পরেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল চরিত-কথাই নহে, ইহা একখানা দার্শনিক গ্রন্থও। বাঙ্গালাদেশে এই দুইখানা গ্রন্থের অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচার। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা এবং প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাও দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ—সর্ব্বত্র প্রচারিত, সমাদৃত এবং আলোচিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ সংস্কৃত-ভাষাতেও বহু তত্ত্বগ্রন্থ এবং লীলাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এ-জাতীয় গ্রন্থ পূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। কিরূপ সাধনপন্থা অবলম্বন করিলে কিভাবে রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাওয়া যাইতে পারে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে রসস্বরূপের অনন্ত-রসবৈচিত্রী কিভাবে সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি হইতেছে ভগবৎ-প্রেমসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রেমের বিভিন্ন স্তর, তাহাদের বিকাশের ধারা, তাহাদের প্রভাব প্রভৃতি এই গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপ তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের সমন্বয় এবং পরস্পর সম্বন্ধের কথা এক অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন; এই ভাবের গ্রন্থ পূর্ব্বে আর কখনও লিখিত হয় নাই। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্‌ভাগবতামৃত একটী অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ এবং সর্ব্বসম্বাদিনী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই তিনি বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু একটী অভিনব বৈদান্তিক তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধীয় বহু তত্ত্বপূর্ণ একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই তিন গোস্বামী আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নাটকাদি কোনও বিষয়ের গ্রন্থের অভাবই তাঁহারা রাখিয়া যায়েন নাই—সমস্তই কিন্তু পরমার্থবিষয়ক। জীবনের একটী মুহূর্ত্তও যেন ভগবৎ-প্রসঙ্গব্যতীত ব্যয়িত না হয়, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত গ্রন্থের অধ্যাপনের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যালঙ্কারাদিতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়; কিন্তু অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত তাঁহারা ব্যাকরণের মধ্যেও তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর হরিনামামৃত-ব্যাকরণের সূত্রসমূহও হরিনামাত্মক, উদাহরণগুলিও হরিলীলাবিষয়ক। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত এবং কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—ভক্তিমার্গের সাধকের ভজনপুষ্টির অনুকূল অতি চমৎকার লীলাগ্রন্থ। কর্ণপূর অলঙ্কার-কৌস্তভও লিখিয়াছেন। এই তিনজন সংস্কৃত ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য-নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি অনেক বিষয়ে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্যই বাঙ্গালীর কৃত সর্ব্বপ্রথম বেদান্তসূত্র-ভাষ্য।

বেদানুগত পারমার্থিক-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোকদিগের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের উক্তিসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় স্থাপনপূর্ব্বক,

যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচনা করিলে সকল সম্প্রদায়ের সাধকই উপকৃত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয়। কি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে, কি বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহাদের অবদান বাস্তবিকই বাঙ্গালার অপূর্ব্ব গৌরবের বস্তু। বাঙ্গালা ভাষায় বেদানুগত মৌলিক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার বাঙ্গালী বৈষ্ণবদেরই এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের, বা বৈষ্ণব-ভাবধারার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও অনেক স্থলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবধারা প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক অনেক গ্রন্থকার এই ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই নহে, আসামী, উড়িয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাতেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান।

ভাবের গাম্ভীর্য্য, রসের পারিপাট্য, আস্বাদনের চমৎকারিত্ব এবং ভজনের পোষকত্ব রক্ষার অনুকূল ভাবে যাহাতে বৈষ্ণব-পদাবলী সুনিপুণ ভাবে কীর্ত্তিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়াদি বৈষ্ণব মহাজনগণ অভিনব সুরতালাদিরও আবিষ্কার করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আচার-অনুষ্ঠানাদি এবং তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যাদি লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে অনেকেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের; প্রচারিত ধর্ম্ম যদি সর্ব্বতোভাবে লোকের চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা হইলেই তাহা সকলের মধ্যে সহজে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে এবং সেই বিস্তৃতি স্থায়িত্ব লাভও করিতে পারে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে ধর্ম্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক, সকলেরই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। সুখের জন্য, প্রিয়ের জন্য, জীবমাত্রেরই একটা স্বাভাবিকী চিরন্তনী বাসনা আছে; কিন্তু বাস্তব সুখ এবং বাস্তব প্রিয়কে জানে না বলিয়া তাহা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পারে না; দেহাবেশবশতঃ দেহের সুখসাধক বস্তুকেই প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং ফল হয় আত্মবঞ্চনা। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বাস্তব সুখ এবং বাস্তব প্রিয়ের সংবাদই সকলকে জানাইলেন—সেই সুখ এবং প্রিয় হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। যে সাধনে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহার কথাও তিনি জানাইয়া গিয়াছেন; এই সাধনে কোনওরূপ দুঃখ নাই, কষ্ট নাই—আছে আনন্দ—সাধনেই আনন্দ, সিদ্ধাবস্থার কথা তো দূরে। এই সাধনের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট নাই, বিধিনিষেধের কড়াকড়ি নাই, সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতেই ইহার ব্যাপ্তি। তিনি আরও জানাইয়া গেলেন—কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যে কোনও মার্গের সাধকই হউন না কেন, নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট বস্তু পাইতে পারেন। তাঁহার এই উদার বাণী সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত নহেন, তাঁহারাও নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নামসঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে "হরির লুটের" আয়োজন করিয়া থাকেন। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়েও নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবেশ লাভ করিয়াছে। নামসঙ্কীর্ত্তনের এবং ভজনবিষয়ক লীলাকীর্ত্তনাদির প্রবর্ত্তক

হইতেছেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু। অন্য সম্প্রদায়ীরা নামসঙ্কীর্ত্তন তো গ্রহণ করিয়াছেনই, বৈষ্ণবদের ভজন-গানের অনুকরণে তাঁহারা নিজেদের ভজন-বিষয়ক গানাদিও রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদের পুরাণাদির পাঠ-ব্যাখ্যায় এবং কথকতায় সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন; বৈষ্ণবদের পুরাণ-পাঠাদির অনুকরণে অন্য সম্প্রদায়ীরাও নিজেদের সম্প্রদায়ানুকূল গ্রন্থাদির পাঠ-ব্যাখ্যাদি প্রচলিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আশ্রয়ে বহু যাত্রা, পালা-কীর্ত্তনাদির উদ্ভব হইয়াছে; সকলেই তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গেই গ্রামে গ্রামে কত হরিসভা, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে; অন্য সম্প্রদায়ের নিকটেও সে সমস্ত উপেক্ষণীয় নয়। ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সকলকে জানাইয়া গিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভক্তিবাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকোত্তম তাঁহার উপাস্যা দেবীর নিকটে "শুদ্ধাভক্তি" প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ বা মাহাত্ম্যের কথা তো দূরে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে "শুদ্ধাভক্তি"-শব্দটীই বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ।

অধুনা অনেকের মুখেই ভগবৎ-প্রেম, জীবে-প্রেম-ইত্যাদি কথা শুনা যায়। কিন্তু এই দুইটী বস্তুর কথাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাব বাঙ্গালার জনসাধারণের হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিয়াছিল; অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সেই স্পর্শের প্রভাব এখনও সর্ব্বত্র বিরাজিত। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালার সাহিত্যে, বাঙ্গালার সমাজে, বাঙ্গালার ভাবধারায় এবং বাঙ্গালার কৃষ্টিতে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্। বস্তুতঃ, বাঙ্গালার কৃষ্টিই হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে পরিপুষ্ট কৃষ্টি। আজকাল যে সকল নূতন নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সংস্কৃতি অনুপ্রবিষ্ট; যে সকল মহাত্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভব, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব দেদীপ্যমান্ ভাবে বিরাজিত ছিল।

এ-সমস্ত নূতন সম্প্রদায়ও নিজেদের সম্প্রদায়ের কথা জনসমাজে প্রচার করিতে যাইয়া লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সমাদৃত গ্রন্থাদিরই আলোচনা করেন এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গুণমহিমাদিও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোনও কোনও সম্প্রদায় আবার স্বীয় অভীষ্ট মহাত্মার সঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কোনও এক প্রকারের সম্বন্ধ স্থাপনেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সম্বন্ধহীন কোনও ব্যাপারই যেন বাঙ্গালী সহজে গ্রহণ করিতে চায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাব কেবল যে বাঙ্গালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাও নয়। সমগ্র ভারতেই ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উড়িষ্যায় নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সমগ্র উড়িষ্যাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ উড়িষ্যার কৃষ্টিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসধারায় পরিনিষিক্ত।

নীলাচল হইতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তীর্থদর্শনের উপলক্ষ্যে পদব্রজে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন— দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত—সমস্ত স্থানেই তিনি গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন মাত্র একজন, নীরব সঙ্গী। মহাপ্রভু কোথাও কোনও বক্তৃতা দেন নাই, কোনও সভাও আহ্বান করেন নাই। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রভাবই সকলকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছে। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যপুরাণের একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুরাণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" —ইত্যাদি শ্লোকটীও দৃষ্ট হয়; পার্থক্য কেবল এই যে, শ্রীরূপের শ্লোকে যে-স্থলে "বঃ" আছে, এই পুরাণের শ্লোকে সে-স্থলে "নঃ" আছে। ইহাতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবদ্বীপের নাম, নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথের যোগে মহাপ্রভুর আবির্ভাবাদির কথাও আছে। অনেকে এই বিষয়গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্তই। কিন্তু তত্রত্য জনসাধারণের চিত্তে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রভাব কিরূপ গভীর ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই কি এই প্রক্ষেপ প্রমাণ করিতেছে না? এইরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে—তেলেগু, মালায়ালম্ প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য দক্ষিণদেশবাসী কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষাও শিক্ষা করিতেছেন। এ-সমস্ত হইতেই বুঝা যায়—দক্ষিণদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব এখনও বিদ্যমান্।

নীলাচল হইতে ঝাড়িখণ্ড-পথে কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একবার শ্রীবৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। তখনও শত সহস্র লোক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীতে সুপ্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীও প্রভুর মুখে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের সহিত ভক্তি-ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয় এবং তাঁহাদের পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীও বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহারা অন্যত্র কোথাও যায়েন নাই। তথাপি তাঁহাদের প্রভাবে উত্তর ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতির হেতুই হইতেছে বস্তুতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের লোভনীয়তা; ব্যক্তিগত প্রভাব এ-স্থলে গৌণ বলিয়াই মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতেছে লোকের প্রাণের ধর্ম্ম; তাই ইহা সকলের পক্ষেই লোভনীয়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবের প্রভাবে ব্যবহারিক জগতের অনেক জটিলতারও সহজে সমাধান হইয়া গিয়াছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, তখন গলিতে গলিতে, গৃহে গৃহে, খোল-করতাল-যোগে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী নবদ্বীপের যবন কাজির তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি ঘরে ঘরে লোক পাঠাইয়া কীর্ত্তনকারীদের খোল ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন—আবার যদি কীর্ত্তন হয়, তাহা হইলে তাহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিবেন, জাতি নষ্ট করিবেন। সকলে প্রমাদ গণিলেন, গিয়া প্রভুর নিকটে সমস্ত জানাইলেন। তখন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। সমস্ত নবদ্বীপ আলোক-মালায় ভূষিত হইল, প্রতি গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইল। সহস্র সহস্র লোক সঙ্কীর্ত্তনে যোগ

দিলেন। শত শত খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল। উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন কাজির গৃহে উপনীত হইল; কাজি অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি আসিলেন। প্রীতিপূর্ণ সাদর-সম্ভাষণ চলিল। কাজির মনোভাবের সম্যক্ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল; তিনি শপথ করিয়া বলিলেন—আর কখনও তিনি কীর্ত্তনে বিঘ্ন জন্মাইবেন না এবং তাঁহার বংশধরগণের কেহও যেন কীর্ত্তনে বিঘ্ন না জন্মায়, তদনুকূল ব্যবস্থা করার কথাও তিনি অকপট চিত্তে প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ, ইহার পরে আর কেহই কীর্ত্তনে কোনওরূপ বিঘ্ন জন্মায় নাই। প্রভুর এই বিরাট সঙ্কীর্ত্তনও এক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-বিশেষই এবং ইহা সম্যক্‌রূপেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সেই কাজির সমাধিতে পুষ্পাদি অর্পণ করিয়া এখনও ভক্তগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালাদেশে, সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতেই, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই বোধ হয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক।

সন্ন্যাসের পরে, নীলাচল হইতে প্রভু একবার বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের উচ্চপদস্থ বহু কর্ম্মচারী রাজত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। অপর সীমায় ছিল এক যবন রাজার রাজত্ব; তখন তাঁহার সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল। সঙ্গের রাজকর্ম্মচারিগণ বলিলেন—যবন রাজার সহিত সন্ধি না করিলে প্রভুর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। যবনরাজ তাঁহার চরের মুখে প্রভুর এবং তাঁহার সঙ্গীদের কথা শুনিয়া প্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং হিন্দুর পোষাক পরিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দৈন্যবিনতি জানাইলেন এবং বলিলেন—"আজই প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে আমার যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইল।" তিনি নিজেই সৈন্যসামন্ত লইয়া দস্যু-তস্করের দ্বারা অধ্যুষিত এক নদী পার করিয়া দিয়া প্রভুকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুর প্রবর্ত্তিত সমুদার ধর্ম্মের ইহা এক অপূর্ব্ব প্রভাব।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রভাব সম্বন্ধে, "প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ"-নামক গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ২৭।১০।১৩৬৩ বাং তারিখের "রবিবাসরের যুগান্তর" যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। যুগান্তর-পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

"বাংলার এবং বাঙালীর এত বড় গৌরব এত বড় গর্ব্ব বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই যে, আমাদের নিজেদের ঘরেই একদিন আবির্ভাব হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের। বাঙ্গালী-জীবনে এবং বাংলাদেশে যখন ঘোর দুর্যোগের কালো ছায়া পড়েছে, ধর্ম্মের গ্লানি এবং কুসংস্কারে যখন সুস্থ সমাজ-জীবন অধ্যুষিত, জাতিভেদ, জাত্যাভিমান, অস্পৃশ্যতা, ভেদজ্ঞানে আমাদের মানবিক জীবন যখন বিধ্বস্তপ্রায়, দিকে দিকে দেশের বুকে যখন চলেছে জড়-পঙ্গু ছায়া-ভয় বিমূঢ়ের তমিস্রসাধনা—বাংলার সেই ধ্বংসমুখী ঘোর দুর্দিনে মানবরূপে আবির্ভাব এই সর্ব্বতমিস্রনাশী সূর্য্য-সৈনিকের, আবির্ভাব এই অলৌকিক ব্যক্তি-সত্তার। জাতির ভাণ্ডারে, ইতিহাসের ভাণ্ডারে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে এত বড় আবির্ভাবের বুঝি তুলনা নেই। প্রেম-ভক্তিতে, স্নেহ-করুণায়, প্রীতি-বাৎসল্যে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের এমন সুসম্পূর্ণ সমাবেশ কোন কল্পিত চরিত্রেও সম্ভব হয়নি কখনো।"

সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের একটী অনুরূপ উক্তিও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

The religious life of Caitanya unfolds unique pathological symptoms of

devotion which are perhaps unparalleled in the history of any other saints that we know of. ......His love for Kṛṣṇa gradually so increased that he developed symptoms almost of madness and epilepsy. Blood came out of the pores of his hair, his teeth chattered, his body shrank in a moment and at the next appeared to swell up. He used to rub his mouth against the floor and weep, and had no sleep at night. Once he jumped into the sea ; sometimes the joints of his bones apparently became dislocated, and sometimes the body seemed to contract. The only burden of his songs was that his heart was aching and breaking for Kṛṣṇa, the Lord.......without the life of Caitanya our storehouse of pathological religious experience would have been wanting in one of the most fruitful harvests of pure emotionalism in religion. ......He gave but little instruction, his preaching practically consisted in the demonstration of his own mystic faith and love for Kṛṣṇa ; yet the influence that he exerted on his contemporaries and also during some centuries after his death was enormous. Sanskrit and Bengali literature during this time received **a** new impetus, and Bengali became in a sense saturated with devotional lyrics. —*A History of Indian Philosophy* by Dr. S. N. Dasgupta, vol. IV., 1955, P. 385-86.

## ৩৭। মুক্তি ও জীবন্মুক্তি

শ্রুতি-স্মৃতিতে মুক্তির কথা যেমন আছে, তেমনি আবার জীবন্মুক্তির কথাও আছে। মায়ার বন্ধন হইতে সম্যক্‌রূপে অব্যাহতিই হইতেছে মুক্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ২।১০।৬॥—অন্যথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মার স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলে।" মায়ার প্রভাবে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের যে দেহাদি অন্যবস্তুতে আবেশ জন্মে, সেই আবেশের ফলেই অন্যথা (জীবস্বরূপ অপেক্ষা অন্য)-রূপ জন্মে। ভগবান্‌ব্যতীত অন্যবস্তুতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবেশ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই জীবের অন্যথা-রূপ থাকিবে। মহাপ্রলয়ে দেহ থাকে না, কিন্তু কর্ম্ম-সংস্কার থাকে, এবং কর্ম্মসংস্কারে আবেশ থাকে ; সুতরাং তখনও তাহার অন্যথারূপই থাকে। সমস্ত কর্ম্মসংস্কার সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি। মুক্ত জীবের আর সংসারে আসিতে হয় না, তাঁহার আর পুনর্জন্মাদি থাকে না। ইহাতে মনে হইতে পারে—এই সংসারে যতক্ষণ যথাবস্থিত দেহে থাকিবে, ততক্ষণ জীব মুক্ত নহে।

কিন্তু শ্রুতি যখন জীবন্মুক্তির কথাও বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়—সংসারে যথাবস্থিত দেহেও জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ অন্যথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা পিতামাতা হইতে লব্ধ যথাবস্থিত দেহে অবস্থান করিয়াও (অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও) স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? তাঁহারা যে যথাবস্থিত দেহে

অবস্থিত, সেই দেহই তো তাঁহাদের "অন্যথারূপ" ? এই অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে "স্বরূপে অবস্থিতি-"রূপ মুক্তি লাভ করিতে পারেন ?

উত্তরে বলা যায়—যথাবস্থিত দেহে থাকিয়াও দেহেতে এবং দেহসম্বন্ধি বস্তুতে, কোনওরূপ কর্ম্মসংস্কারে বা কর্ম্মে, যদি তাঁহাদের আবেশ না থাকে, তাহা হইলে দেহ বা কর্ম্ম তাঁহাদের "অন্যথারূপ" জন্মাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্যবিষয়ে আবেশই হইতেছে অন্যথা-রূপের মূল হেতু। অন্যাবেশ না থাকিলে অন্যথা-রূপও থাকিতে পারে না। অন্যথারূপ না থাকিলেই জীব মুক্ত। জীবের এই অবস্থাকেই শ্রুতি জীবন্মুক্তি বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—সর্ব্ববিধ কর্ম্ম এবং কর্ম্মসংস্কার সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইলেই তো অন্যাবেশ দূরীভূত হইতে পারে। সর্ব্ববিধ-কর্ম্ম-ক্ষয়ে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ও বুঝায়। প্রারব্ধ কর্ম্মই সংস্কার জাগায় এবং এই সংস্কারের বশীভূত হইয়াই জীব অন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মও যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ জীবকে মুক্ত বলা যায় না ; কেননা, প্রারব্ধও মায়া। আবার, যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিবে, ততদিনই জীব জীবিত থাকিতে পারে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলে ক্ষণকালও জীব জীবিত থাকিতে পারে না, তখনই তাহার মৃত্যু। যাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, তাঁহারা তো জীবিতই আছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মও আছে—তাঁহাদের উপর মায়ার প্রভাবও আছে। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে কিরূপে মুক্ত বা জীবন্মুক্ত বলা যায় ?

এ-সমস্ত হেতুতে শ্রীপাদ রামানুজ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য আচার্য্যগণ জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতি যখন জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর কি ? জীবিত অবস্থায়, প্রারব্ধ বর্ত্তমানে, কিরূপে জীব স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্ম ভজনের ফলে ভগবৎকৃপায় বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু প্রারব্ধ থাকে ; নচেৎ জীবিত থাকাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ভজনের প্রভাবে প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই ভজনের প্রভাবেই প্রারব্ধেরও প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায় ; প্রারব্ধ তখন হয় দংষ্ট্রাহীন বিষধরের তুল্য ; ভোগোপযোগী কোনও ফল প্রসব করিতে পারে না। কুম্ভকারের চাকা দণ্ডের সাহায্যে একবার ঘুরাইয়া দিলেই যেমন দণ্ডের সহায়তাব্যতীতও কতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের চাকাও ঘুরিতে থাকে ; তাহার ফলেই সাধক জীব কর্ম্ম করে, কিন্তু সেই কর্ম্ম কোনও ফল প্রসব করিতে পারে না, সাধক জীবকে বদ্ধ করিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেই ইহার সমর্থক বাক্য পাওয়া যায়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন,

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭ ॥

--সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির ( মায়ার ) গুণসমূহদ্বারা ( মায়িক ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক ) নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু ( দেহাত্মবুদ্ধিজনিত ) অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত জীব নিজেকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।"

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ৩।২৮ ॥

—কিন্তু হে মহাবাহো! আত্মা (জীবাত্মা) হইতে গুণ ও কর্ম্ম পৃথক্ (অর্থাৎ গুণময় দেহ 'আমি' নহি, দেহের কর্ম্ম ও আমার কর্ম্ম নহে)—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে (অর্থাৎ দেহাভিমান বা দেহেতে আত্মবুদ্ধি যাঁহাদের দূরীভূত হইয়াছে), তাঁহারা জানেন—গুণময় ইন্দ্রিয়গণই গুণময় কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, 'আমরা' নহি; সুতরাং তাঁহারা সে-সমস্ত কর্ম্মে আর আসক্ত হয়েন না।"

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮।১৭ ॥

—'আমি কর্ত্তা'-এইরূপ অহঙ্কৃত-ভাব যাঁহার নাই, সুতরাং যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত (আসক্ত) হয় না, তিনি এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না এবং (বিনাশরূপ কর্ম্মের ফলের দ্বারাও) আবদ্ধ হয়েন না (অর্থাৎ কর্ম্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না)।"

"নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ॥ ৩।১৮ ॥

—এতাদৃশ (দেহাভিমানশূন্য) ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার কোনও পাপ বা প্রত্যবায় হয় না।"

শ্রীমদ্ভাগবতের "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ১০।৩৩।২৯ ॥"-শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও গীতোক্তির অনুরূপই (১।১।১৬৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য হইতে জানা গেল—সাধন-ভজনের ফলে—ভগবৎ-কৃপায় যাঁহাদের প্রারব্ধব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিনষ্ট হইয়াছে, দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের প্রারব্ধ থাকিলেও প্রারব্ধের ফলাদায়কত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; প্রারব্ধের ফলে তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মের ফলে তাঁহারা আবদ্ধ হয়েন না; আবদ্ধ হয়েন না বলিয়াই তাঁহারা মুক্ত এবং তখনও যথাবস্থিত দেহে অবস্থিত থাকেন বলিয়া, জীবিত বলিয়া, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। তখন তাঁহাদের দেহ এবং দেহদ্বারা কৃত কর্ম্ম হয় একটী আবরণমাত্র—যে আবরণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ফলপ্রসবে অসমর্থ প্রারব্ধই দেহকে এবং কর্ম্মকে রক্ষা করে; প্রারব্ধ শেষ হইয়া গেলে বাহিরের আবরণও খসিয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবন্মুক্তের দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের পূর্ব্বেও তিনি মায়ানির্ম্মুক্তই থাকেন। এইরূপ অর্থেই শ্রুতি জীবন্মুক্তির কথা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারা বলেন—সাধনভক্তির, বিশেষতঃ নামসঙ্কীর্ত্তনের, ফলে সাধকের প্রারব্ধ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রারব্ধ বিনষ্ট হইলে সাধক জীবিত থাকেন কিরূপে? জীবিত না থাকিলে "জীবন্মুক্তি" শব্দটাই তো অসার্থক হইয়া পড়ে? এই প্রশ্নের উত্তরে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—বাঁচিয়া থাকার জন্য সাধক-ভক্তের ইচ্ছা

হইলে ভক্তি বা ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্ত-সাধকের ভক্তিপুষ্টির জন্য তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। সাধক ভক্ত বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন কেন ? ভজনের জন্যই তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, সাধারণ লোকের ন্যায় দৈহিক সুখ ভোগের জন্য নহে। ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি সর্ব্বোত্তম হইলেও নিজেকে হেয় বলিয়া মনে করেন। তিনি মনে করেন—"আমার মানব-জন্ম বৃথাই গেল ; সাধন-ভজন কিছুই হইল না। তাঁর কৃপায় ভজনের উপযোগী মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি ; পরজন্মে মনুষ্য-জন্ম না পাইতেও পারি, না পাইলে ভজন হইবে না। এই জন্মে যদি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে ভজনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি ;" এজন্যই তাঁহার বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা ; এই ইচ্ছা ভজনমুখী বলিয়া সাধনভক্তির অন্তরায় হয় না। ভক্তবৎসল ভগবান্ও ভক্তের ভজনপুষ্টির জন্য তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। তখন তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁহার প্রারব্ধও থাকে না বলিয়া কোনওরূপ মায়াবন্ধনই তাঁহার থাকে না ( ৫।১০৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

## ক। শ্রীপাদ শঙ্কর ও জীবন্মুক্তি

শ্রীপাদ শঙ্কারাচার্য্যও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন ; তাঁহার কৃত "জীবন্মুক্তানন্দলহরী"-নামক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের নিকটে দীক্ষা লাভ করিয়া যাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় আচরণাদি করিয়াও মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। পূর্ব্ব আলোচনায় "জীবন্মুক্তি"-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির কোনওরূপ বিরোধ নাই।

কিন্তু মনে একটী প্রশ্ন জাগে এই যে—মুক্তিসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের যে ধারণা, তাহাতে জীবন্মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

তিনি জীব বলিয়া কোনও তত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সর্ব্ববিধ বিশেষত্বহীন ( নির্ব্বিশেষ ) ব্রহ্মই মায়াকবলিত অবস্থায় জীব-নামে অভিহিত হয়েন এবং নিজেকেও জীব বলিয়া মনে করেন। এইরূপ মনে করাটা হইতেছে অজ্ঞান—ভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ, জীব বলিয়াও কিছু নাই, জীবের দেহও নাই, জগৎও নাই। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, অজ্ঞান দূর হইলে যেমন দেখা যায়, সর্প বলিয়া, কিছু নাই, আছে কেবল রজ্জু, তদ্রূপ জীব-জগৎ বলিয়াও কিছু নাই, মায়াজনিত অজ্ঞানবশতঃই জীব-জগৎ—জীবের দেহাদিও—আছে বলিয়া মনে হয়। এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই বুঝা যায়—আছে কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই তথাকথিত জীবের মুক্তি, তথাকথিত জীব তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হইয়া যায়। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের মুক্তি।

ইহাতে বুঝা যায়—যিনি মুক্ত হইবেন, তিনি তখন বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার দেহাদিও নাই, এই জগৎ-প্রপঞ্চও নাই, আছে কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনিও সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই। মুক্ত জীব এইরূপ বুঝিতে পারিবেনই বা কিরূপে বলা যায় ? কেননা, তিনি তো তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনি "বুঝিবেন" কিরূপে ? যিনি সবিশেষ, তিনিই "বুঝিতে পারেন" ; বুঝিবার সামর্থ্যরূপ বিশেষত্ব তাঁহারই থাকিবে।

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত মুক্তি যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত জানে যে, তাহার দেহ আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দেহের সহায়তায় জীব সাংসারিক কার্য্যাদি করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "রজ্জুতে সর্পভ্রমের" ন্যায় ব্রহ্মেতে জগদ্ভ্রম তাহার বর্ত্তমান থাকিবেই। মুক্ত হইয়া গেলে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের ন্যায়, তাঁহার দেহের অস্তিত্বও থাকিবে না (অন্ততঃ তাঁহার নিকটে); সুতরাং তিনি কিরূপে অন্যলোকের ন্যায় ব্যবহারাদি করিবেন? তাঁহাকে "জীবিত"ই বা কিরূপে বলা যায়? সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের মতে "জীবন্মুক্তি" কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, বুঝা যায় না। মনে হয়, মহাদেবরূপেই তিনি "জীবন্মুক্তি"র কথা বলিয়াছেন, ভাষ্যকার শঙ্কররূপে নহে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

## ৪০। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং মাধ্ব-সম্প্রদায়

আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই একটী শাখা, মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখা দরকার।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরও সেই মত। কিন্তু কেবল সেব্য-সেবক-ভাবে মিল দেখিয়াই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শাখা বলা সঙ্গত হয় না; কেননা, রামানুজ-নিম্বার্কাদি সম্প্রদায়েরও সেব্য-সেবক-ভাব। ভাবের সমতাতেই যদি সম্প্রদায়ের একত্ব হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত সকল সম্প্রদায়কেই এক সম্প্রদায় বলা হইত; কিন্তু তাহা বলা হয় না।

উপাস্য-স্বরূপেও মাধ্ব-সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে মিল নাই। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাস্য—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। মাধ্ব-সম্প্রদায় বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেই পরব্রহ্ম মনে করেন; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রজবিলাসী নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম মনে করেন এবং নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ, বিলাসরূপ, বলিয়া মনে করেন।

এই দুই সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালীও এক রকম নহে। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।২৩৮॥ ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধাচেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্॥—মধ্বাচার্য্যের উপদিষ্ট ভজন সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের উক্তি॥—ভজন দশ রকমের। সত্য, হিত ও প্রিয়কথন এবং শাস্ত্রানুশীলন—এই চারিটী বাচিক ভজন। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই তিনটী মানসিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটী কায়িক ভজন। ইহাদের এক একটী সম্পাদন পূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে।" কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান।

লক্ষ্যবিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান্। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতেছে "পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২৷৯৷২৩৯ ॥" কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইতেছে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা, পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে কোনও মুক্তিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্য নহে।

উপাস্যাদির মিল থাকিলেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইত না। কেননা, রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্যও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। তথাপি মাধ্ব-সম্প্রদায় এবং রামানুজ সম্প্রদায়-এই দুইটী সম্প্রদায়ের একটীকে অপরটীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না। এই দুইটী হইতেছে পৃথক্ সম্প্রদায়। এই দুইটী সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হইলেও ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে। ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য অনুসারেই সম্প্রদায়-পার্থক্য হয় বলিয়া মনে হয়। কেননা, সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদবশতঃ এই দুইটী সম্প্রদায় যেমন পৃথক্ বলিয়া কথিত হয়, তেমনি সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে প্রায়শঃ একরূপ হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ীয় সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায় উল্লিখিত সম্বন্ধবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলিয়া ইঁহারাও দুইটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মিল যদি দেখা যায়, তাহা হইলেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা সমীচীন হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়েও এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতেছে ভেদবাদী ; আর গৌড়ীয় সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ।

এইরূপে দেখা গেল—কেবল সেব্য-সেবক-ভাবব্যতীত আর সমস্ত বিষয়েই মাধ্ব-সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ রকমের ভেদ বিদ্যমান। আবার, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের এমন কতকগুলি উক্তি আছে, যাহা কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধই নহে, পরন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের হৃদয়বিদারক। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ; তাঁহারা জীব-তত্ত্ব নহেন ( ১৷১৷১৪৬-অনুচ্ছেদ ) ; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহাদিগকে "অপ্সরঃস্ত্রী" বলিয়াছেন। অপ্সরা হইতেছে প্রাকৃত স্বর্গবাসিনী রমণী, জীবতত্ত্ব, দেহসুখ-ভোগ-পরায়ণা, স্বীয় দেহের দ্বারা অপরের প্রীতিবিধানেও সঙ্কোচহীনা। (১)

অথচ, ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম যে সর্ব্বতোভাবে কামগন্ধলেশহীন, তাহা শাস্ত্রসম্মত ( ১৷১৷১৫৪-৫৫ অনু )।

---

(১) বিমুক্তাবপি কামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ। দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ ॥
স্নেহভক্তাঃ সদা দেবাঃ কামিন্যেনাপ্সরঃস্ত্রিয়ঃ। কাশ্চিৎ কাশ্চিন্ন কামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥ ** ॥
ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ। কামভক্ত্যাপ্সরঃস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ ॥
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দ্দনঃ। জারত্বেনাপ্সরঃস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ॥
—মধ্বাচার্য্যরচিত ভাগবত-তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রানুসারে ব্রজগোপীগণই হইতেছেন ভক্তকুল-মুকুটমণি, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ; তাঁহাদের প্রেমেরই তিনি সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, রুদ্র, এমনকি বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার তত প্রিয় নহেন, গোপীগণ যত প্রিয় ( ১।১।১৫৪-অনু )। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব এবং ব্রহ্মাদিও গোপীদিগের চরণ-রেণু কামনা করিয়া থাকেন ( ১।১।১৫৫-অনু )। ব্রজগোপীদিগের মহাভাব মুকুন্দ-মহিষীদের পক্ষেও "অতিদুর্ল্লভ"। কিন্তু শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে—ভক্তিতে গোপীগণ অপেক্ষাও অষ্টমহিষী দ্বিগুণ শ্রেষ্ঠা, তাঁহাদের অপেক্ষা নন্দগেহিনী যশোদা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠা, যশোদা অপেক্ষা দেবকীদেবী শ্রেষ্ঠা, দেবকী অপেক্ষা বসুদেব, বসুদেব অপেক্ষা জিষ্ণু (অর্জ্জুন) এবং অর্জ্জুন অপেক্ষা বলরাম হইতেছেন ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাব্যতীত অপর কেহই ভক্তিতে বলরাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই ; ব্রহ্মাই সর্ব্বাধিক, তিনি "ঈশেশ"। (২) ইহা হইতে জানা গেল—ভক্তির তারতম্য-বিচারে মাধ্বমতে গোপীগণ হইতেছেন সর্ব্বনিম্নস্তরে এবং ব্রহ্মা হইতেছেন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত। ইহা হইতেছে সমস্ত শাস্ত্রোক্তির বিরোধী উক্তি। মাধ্ব-সম্প্রদায় ব্রহ্মাকেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলিয়া মনে করেন ; এজন্যই বোধহয় ব্রহ্মার এতাদৃশ মহিমা-কীর্ত্তন। কিন্তু বামন-পুরাণ হইতে জানা যায়, ভৃগু-প্রভৃতি মহর্ষিগণের নিকট ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরাঃ।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥

লঘুভাগবতামৃত। ভক্তামৃত-৩১ ধৃত বৃহদ্‌বামন-বচন॥

—( ব্রহ্মা বলিয়াছেন ) পুরাকালে নন্দব্রজস্থ গোপীগণের চরণরেণু-প্রাপ্তির জন্য ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলাম ; তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।"

ব্রহ্মা সে-স্থলে আরও বলিয়াছেন—"নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ॥ —আমি, শিব, শেষ-নামক অনন্তদেব এবং লক্ষ্মীদেবী—এই আমাদের কেহই কোনও কালেই তাঁহাদের ( ব্রজগোপীদের ) সমান নহি।"

ভক্তিবিষয়ে ব্রহ্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন না বলিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্-ভাগবতের ব্রহ্মমোহন-লীলাসম্বন্ধীয় দশমস্কন্ধের ১২শ, ১৩শ, এবং ১৪শ-এই অধ্যায়ত্রয় স্বীকার করেন নাই, ইহাদের মধ্বভাষ্য নাই।

এই অবস্থায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে কিরূপে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে ?

---

(২) "কৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ। মহিষ্যষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥ তাভ্যঃ সহস্রসমিতা যশোদা নন্দগেহিনী। ততোহপ্যভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতস্ততঃ॥ বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ। ন ততোহভ্যধিকঃ কশ্চিৎ ভক্ত্যাদৌ পুরুষোত্তমে॥ বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্ব্বাধিকঃ স্মৃতঃ॥ —ভাগবত-তাৎপর্য্যম্॥ ১১।১২।২২॥"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কোনও উক্তি হইতেই জানা যায়না যে, তিনি মাধ্বমত স্বীকার করিয়াছেন ; বরং তিনি যে মাধ্বমতের অনুমোদন করেন নাই, তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান্‌। দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে মধ্বানুগত তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের সঙ্গে বিচার করিয়া তিনি মাধ্বমতের খণ্ডনই করিয়াছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে সাক্ষাদ্‌ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামী এবং তাঁহাদের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—ইঁহাদের কোনও উক্তি হইতেও জানা যায়না যে, তাঁহারা মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের মত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি হইতে বরং তাহার বিপরীত কথাই জানা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।১২।১-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তত্ত্ববাদীদের (মাধ্বসম্প্রাদায়ের) মতের প্রতিবাদই করিয়া গিয়াছেন।(৩) তিনি লিখিয়াছেন—তত্ত্ববাদিগণ মুক্তিরই পরম-পুরুষার্থতা মনে করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অসুর-মুক্তি এবং গোপীস্তন্যপানাদি সহ্য করিতে পারেন না ; তাই তাঁহারা শ্রীভা. ১০।৬ অধ্যায়ের পূতনা-সদ্‌গতি-প্রতিপাদক "পূতনা লোকবালঘ্নী"-আদি ছয়টী এবং "য এতৎ পূতনামোক্ষম্‌"-ইত্যাদি শ্লোকটীর ন্যায় দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ এই অধ্যায়ত্রয়কেও স্বীকার করেন নাই ; কিন্তু ইহা অসঙ্গত। কেননা, বহুপুস্তকেই তৎসমস্ত দৃষ্ট হয়, শ্রীধরস্বামিপাদাদি বহু প্রাক্তন এবং আধুনিক মহাত্মাগণ তৎসমস্তের সমাদর করিয়াছেন ; শ্রীবৃন্দাবনে অঘাসুরবধাদির এবং ব্রহ্মস্তুত্যাদির স্থান অতি প্রসিদ্ধরূপে এখনও বিরাজিত ; বিশেষতঃ, পদ্মপুরাণাদিতেও তৎসমস্ত কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-প্রবরগণের সিদ্ধান্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। ভক্তিনিষ্ঠদের নিকটে মুক্তির উপাদেয়তা নাই। ভাগবতের সর্ব্বত্রই ইহা সুব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের স্তন্য পান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় শ্রীযশোদার ন্যায় মাননীয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পরা নবতরুণীও সহস্র সহস্র আছেন। সুতরাং কোনও বিরোধই নাই। বিশেষতঃ (মাধ্ব-সম্প্রাদায়ের অস্বীকৃত) এই অধ্যায়ত্রয়ে ভক্তির, ভক্তের এবং ভগবানের অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহ-বিশেষেই তাহার অনুভব সম্ভবপর হইতে পারে ; সুতরাং ইহা

---

(৩) "অথ যথাক্রমমধ্যায়ত্রয়েণ কৌমারলীলামেব বদন্‌ তত্রাদাবেকেনাঘাসুরবধমাহ—ক্বচিদিত্যাদিনা। এতচ্চাধ্যায়ত্রয়ং কেচিত্তত্ত্ববাদিনো বৈষ্ণবা মুক্তেরেব পরমপুরুষার্থতাং মন্যমানা শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধয়োঽত্রাসুরমুক্তিগোপীস্তন্যপানাদিকঞ্চাসহমানাঃ পূতনা-সদ্‌গতি-প্রতিপাদকং (শ্রীভা. ১০।৬।৩৫) 'পূতনা লোকবালঘ্নী' ইত্যাদি শ্লোকষট্‌কমিব (শ্রীভা. ১০।৬।৪৪) 'য এতৎ পূতনামোক্ষম্‌' ইতি শ্লোকমিব চ বিগীতমিত্যাহুঃ, তচ্চাসঙ্গতম্‌—বহুপুস্তকেষু দৃশ্যমানত্বাৎ তথা প্রাক্তনৈরাধুনিকৈশ্চ সৎসাম্প্রদায়িকৈঃ শ্রীধরস্বামিপাদ-প্রভৃতিভির্মহদ্ভিরাদৃতত্বাৎ, তথা শ্রীবৃন্দাবনে অঘাসুরবধ-শাদ্বলজেমন-ব্রহ্মস্তুত্যাদিস্থান-প্রসিদ্ধেশ্চ ; কিঞ্চ পদ্মপুরাণাদৌ তদাখ্যানং ব্যক্তং বর্ত্তত এব, তথা বৈষ্ণবপ্রবরগণ-সিদ্ধান্তেনাপি ন বিরুধ্যত এব—ভক্তিনিষ্ঠানাং মুক্তেরনুপাদেয়ত্বাৎ। তচ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্‌ সর্ব্বত্রৈব সুব্যক্তম্‌। পীতস্তন্যাশ্চ গোপ্যঃ প্রায়ঃ শ্রীযশোদাতুল্যা মান্যা এব। তৎপ্রিয়তমাস্তু পরা নবতরুণ্যঃ সহস্রশঃ সন্তি। তচ্চাগ্রেঽভিব্যক্তং ভাবি। অতঃ কোঽপি বিরোধো ন স্যাদেব। বিশেষতশ্চাধ্যায়ত্রয়েঽস্মিন্‌ ভক্তেভক্তানাং শ্রীভগবতশ্চ সর্ব্বতোঽসাধারণং মাহাত্ম্যমতস্তত্তদনুভবঃ শ্রীভগবদনুগ্রহ-বিশেষেণৈব সম্পদ্যত ইতি তৎ সুগোপ্যমেবেত্যেবং তেষাং বচনমপি উপপদ্যত ইত্যলং বিস্তরেণ।"—বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী ॥ শ্রীভা. ১০।১২।১ ॥

অতি সুগোপ্য ; এইরূপে তত্ত্ববাদীদের বচনও উপপন্ন হয় ( অর্থাৎ তাঁহারা সেই সুগোপ্য মহিমা অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়াই উল্লিখিতরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন )।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার লঘু-বৈষ্ণবতোষণীতে, মধ্বাচার্য্যকর্তৃক ব্রহ্মমোহন-লীলা-সম্পর্কিত অধ্যায়ত্রয়ের অনঙ্গীকারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা এবং অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মার ভক্তশিরোমণিত্ব-খ্যাপনের উৎকট প্রয়াসে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো"-ইত্যাদি শ্রীভা. ৩।৪।৩১-শ্লোকেরও স্বকপোলকল্পিত এক অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্যের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন এবং ব্রজগোপীদের অপকর্ষ-খ্যাপনের প্রয়াসে শ্রীভা. ১০।২৯-অধ্যায়ের প্রসঙ্গে তাঁহাদের ঔপপত্য-ভাবের নিন্দা করিয়াছেন ( রাস-পঞ্চাধ্যায়ীর অন্য কোনও অধ্যায়ের ভাষ্য তিনি করেন নাই ; তাহার কারণ সহজবোধ্য )।

উল্লিখিত কারণসমূহ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়— মাধ্বমতের সহিত গৌড়ীয় মতের কোনওরূপ মিল নাই, কোনও কোনও বিষয়ে বরং মাধ্বমত গৌড়ীয় মতের বিরোধী। এই অবস্থায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা শাখা বলার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কেহই এবং মহাপ্রভুর চরিতকারদের মধ্যে কেহও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা শাখা বলেন নাই।

শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্ ॥ ৮।১ ॥

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন—( দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণকালে ) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি ; তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসক। অপর বৈষ্ণব ( মাধ্বসম্প্রদায়ী ) তত্ত্ববাদিগণকেও দেখিয়াছি ; তাঁহারাও সেইরূপ— অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসক। তাঁহাদের মত নিরবদ্য ( অনিন্দনীয় ) নহে।"

এ-স্থলে কবি কর্ণপূরের উক্তি হইতেই জানা যায়— স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতের অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার চরণাশ্রিত আচার্য্যগণ মাধ্ব-সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার করিয়াছেন —এইরূপ অনুমানের কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মাধ্ব-সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাবেই "অন্য সম্প্রদায়" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভা. ১০।১২।১-শ্লোকের লঘু-বৈষ্ণবতোষণীতে, মধ্বাচার্য্যকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১২-১৪ অধ্যায়ত্রয়ের অনঙ্গীকার-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"তদীয়-স্বসম্প্রদায়ানঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন তস্যাপ্রামাণ্যং চেৎ, অন্য-সম্প্রদায়াঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ ॥—তাঁহার ( শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ) স্বীয়-সম্প্রদায়কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের দ্বাদশাদি অধ্যায়ত্রয় অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া যদি সেই অধ্যায়ত্রয় অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে, অন্যসম্প্রদায় কর্তৃক সেই অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকৃত হইলে সেই প্রমাণবলে

তাহা বিপরীত কেন হইবে না ?" এ-স্থলে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মাধ্ব-সম্প্রদায়কে "তদীয় সম্প্রদায়—তাঁহার অর্থাৎ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়" বলিয়াছেন এবং আলোচ্য অধ্যায়ত্রয় সম্বন্ধে যাঁহারা মধ্বাচার্য্যের মতের অনুমোদন করেন না, পরন্তু মধ্বাচার্য্যের বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে "অন্য সম্প্রদায়—মাধ্বসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ সম্প্রদায়"—বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও উল্লিখিত মাধ্বমতের অনুমোদন করেন না, বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন। সুতরাং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির তাৎপর্য্য হইল এই যে—মাধ্বসম্প্রদায় হইতেছে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতেও মাধ্বমতকে গৌড়ীয় মত হইতে ভিন্ন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ( ব্রহ্ম সূঃ ২।১।১১ )' ভেদেহপ্যভেদেহপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ, তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যাভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। * *। শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যাভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়াত্বাদিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা ॥" শ্রীজীবপাদের এই উক্তিতে "শ্রীরামানুজমত", "মধ্বাচার্য্যমত" এবং "স্ব-মত—অর্থাৎ শ্রীজীবের স্বসম্প্রদায়ের মত"—এইরূপ ভেদবাচক শব্দ থাকায় পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, গৌড়ীয় মত যে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন, তাহাই শ্রীপাদ জীবের অভিপ্রায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগ্রন্থে একাধিক স্থলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে "তত্ত্ববাদগুরু" বলিয়াছেন ; কিন্তু কোনও স্থলেই "স্বসম্প্রদায়-গুরু বা গৌড়ীয়সম্প্রদায়-গুরু" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—মাধ্বসম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন একটী সম্প্রদায়, ইহাই শ্রীজীবগোস্বামীর অভিপ্রায়।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও মাধ্বসম্প্রদায়ের ন্যায় সবিশেষবাদী। এজন্য ব্রহ্মের সবিশেষত্বাদি-বিষয়ে শ্রীমধ্বাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনও কোনও অংশ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের কোনও কোনও উক্তিও, সময় সময়, উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের কোনও কোনও উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া যদি কেহ বলেন যে, তিনি মাধ্বমতাবলম্বী ছিলেন, তাহা হইলে সেই যুক্তিবলেই বলা যায় যে, শ্রীজীব শঙ্কর-মতাবলম্বী ছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি যেমন শঙ্কর-মতাবলম্বী ছিলেন না, তেমনি মাধ্বমতাবলম্বীও ছিলেন না। স্বীয় মতের অনুকূল উক্তিগুলিই তিনি উভয় সম্প্রদায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; ঠিক সেই ভাবে শ্রীপাদ রামানুজের কোনও কোনও ভাষ্যোক্তিও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে মাধ্বমতকে "প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ" বলিয়াছেন। "ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি চ তত্ত্ববাদগুরূণাম্ অনাধুনিকানাং প্রচুরপ্রচারিতবৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্যোপ-শিষ্যীভূতবিজয়ধ্বজ-ব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিদ্বদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্য-চরণানাং ভাগবততাৎপর্য্য-ভারত-তাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেভ্যঃ সংগৃহীতানি ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ ॥ প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামি-সংস্করণ ॥ ২৮ ॥" শ্রীজীবপাদ যদি মাধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীয় সম্প্রদায় বলিয়াই স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে মাধ্বমতকে "বৈষ্ণব-মত-বিশেষ" বলিতেন না।

দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের সহিত সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,

"—কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে করহ নির্ণয়ে ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।২৪৯-৫০ ॥

এ-স্থলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তত্ত্ববাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়কে দুইবার "তোমার সম্প্রদায়" বলিয়াছেন। তিনি যদি মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তই হইতেন, তাহা হইলে কখনও "তোমার সম্প্রদায়" বলিতেন না এবং মাধ্বমতের দোষও দেখাইতেন না।

অধুনা কেহ কেহ বলিতে চাহেন—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের "ভেদবাদ"ই হইতেছে গৌড়ীয়দের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের" মূল। এজন্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা শাখা বলা যায়। কিন্তু "ভেদবাদ"ই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূল—এইরূপ অনুমানের সারবত্তা যে কিছু নাই, তাহা এই গ্রন্থের চতুর্থ পর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ( ৪।৩১ অনুচ্ছেদ )।

তাহা হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে ? এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মধ্যে কথোপকথন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

সার্ব্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য মতকর্ত্তৃতা। স্বামিন্! অতঃপরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি ॥ ৮।১ ॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন—( দক্ষিণদেশে ) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসকই। অপর তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবদেরও দেখিয়াছি; তাঁহারাও তদ্রূপই ( অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসকই )। তাঁহাদের মত নিরবদ্য ( নির্দ্দোষ ) নহে। অপর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈবই বহু। কিন্তু মহাপ্রবল পাষণ্ডগণের সংখ্যাই ভূয়সী। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত।

( একথা শুনিয়া ) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—প্রভু! তোমার মতেই রামানন্দ ( রায় ) প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তাঁহার মতকর্ত্তৃতা নাই, অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের প্রবর্ত্তক নহেন, তোমার মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমাদেরও এই মতই শ্রেষ্ঠ মত, তাহাই বহু লোকের স্বীকৃত মত এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য।"

কবিকর্ণপূরের উল্লিখিত উক্তি হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত"-গ্রন্থের টীকার উপসংহারে টীকাকার শ্রীআনন্দী লিখিয়াছেন—"স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসক-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকো ভবতি। * * অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুঃ স্বয়ংভগবানেব সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো, নান্যে ॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—**শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক** এবং তদীয় পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণই এই সম্প্রদায়ের গুরু।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিষয়ক তত্ত্ব, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব এবং পরম-রসস্বরূপত্বাদি, এবং নারায়ণাদি অন্যভগবৎ-স্বরূপগণের শ্রীকৃষ্ণাংশত্বাদি সর্ব্ববিধ তত্ত্বই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই যে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক—ইহা অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নহে।

## বিরুদ্ধমতের আলোচনা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"তে লিখিয়াছেন,

"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥

—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৩২০ সাল ॥ ২১ ॥

—কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত। এ-বিষয়ে পদ্মপুরাণ বলেন—কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইবেন; এই সমস্ত বৈষ্ণব ক্ষিতিপাবন।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই যদি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হয়েন, তিনি যদি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তই না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় হইবে পদ্মপুরাণকথিত চারিটী সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়। পদ্মপুরাণের প্রমাণ বিদ্যমান্ থাকিতে একটী পঞ্চম সম্প্রদায় কিরূপে স্বীকার করা যায়? বিশেষতঃ, কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পারার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গুরুপরম্পারার বিচারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

আবার, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকাতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা, "তথাচোক্তম্, সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥ শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ইতি ॥" ইহার পরে উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের আদি গুরু কে, তাহার উল্লেখ করিয়া সূক্ষ্মা নাম্নী টীকাতে, গৌরগণোদ্দেশের অনুরূপ ভাবেই, অবশ্য অবিকল এক রকম বাক্যে নহে, মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পারার উল্লেখ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাধ্বসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। ইহার সমাধান কি?

উল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার উক্তিসম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। অনেকে মনে করেন, এই উক্তিগুলি কবিকর্ণপূরের লিখিত নহে, পরবর্ত্তী কালে অপর কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক কর্ণপূরের গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমানের হেতু এই :—

(১) পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। সুতরাং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় অন্যরূপ অভিমত প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

(২) গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে উদ্ধৃত "প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে"—ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটী হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুসম্বন্ধে—"যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে। সোহয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥ ২০ ॥—যিনি দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শ্যাম-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই কলিযুগে গৌরচন্দ্র-নামে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" "প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে"-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের পরে যে কয়টী শ্লোকে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকটী হইতেছে—"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে। অন্তর্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোহপি সন্ ॥ ২৬ ॥—রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন পূর্ব্বে সুদুষ্কর রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহিরে স্বীকার করিয়া-ইত্যাদি।" এই শ্লোকটীর সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত "যঃ শ্যামো"-ইত্যাদি ২০তম শ্লোকটীরই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ—দ্বাপরের "শ্যাম" কিরূপে কলিতে "গৌর" হইলেন, তাহাই শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকের মধ্যবর্ত্তী অপর শ্লোকগুলির সহিত এই শ্লোকদ্বয়ের কোনওরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না; অপর শ্লোকগুলি পরবর্ত্তী কালে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

(৩) মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির শিষ্য বলা হইয়াছে, তাহাও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। যিনি যে-সম্প্রদায়ের শিষ্য, তাঁহার উপাস্যাদিও হইবে সেই সম্প্রদায়ের অনুরূপ। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাস্য হইতেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্য—মুক্তি; কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর উপাস্য হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্য হইতেছে ব্রজে গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর উপাস্যও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও গোপীজনবল্লভের উপাসনার উপযোগী মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়াছেন। মাধ্বসম্প্রদায়ে গোপীগণ এবং তাঁহাদের ভাব নিন্দিত। সুতরাং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে কিরূপে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়? শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ব্যাসতীর্থের শিষ্য 'লক্ষ্মীপতি' বা লক্ষ্মীপতির শিষ্য 'মাধবেন্দ্রপুরী', ইহা তত্ত্ববাদিগণের কোন মঠাম্নায়েই পাওয়া যায় নাই।"(ক)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সন্ন্যাসাশ্রমের উপাধি হইতেছে "পুরী"; কিন্তু মাধ্বসম্প্রদায়ে সন্ন্যাসাশ্রমের উপাধি হয় "তীর্থ", "পুরী" নহে। শ্রীমৎ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ পুরীপাদের

---

(ক) শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ", ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, ২২৪ পৃষ্ঠা।

শিষ্য শ্রীঈশ্বরানন্দ পুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি সকলেই 'পুরী' উপাধিধৃক্। শ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাসি-শিষ্য-পারম্পর্য্যে এ-পর্য্যন্ত কোথাও 'তীর্থ'-সন্ন্যাস-নামের পরিবর্ত্তে 'পুরী' নাম-গ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না।"(খ)

উল্লিখিত যুক্তিবলে বুঝা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন না।

(৪) গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে চারি সম্প্রদায়-বাচক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হয়, বলা হইয়াছে, সে সমস্ত নাকি পদ্মপুরাণের শ্লোক। এ-সম্বন্ধে শ্রীমৎ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ-পর্য্যন্ত শ্রীপদ্মপুরাণের যে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাদের কোনটিতে উক্ত চারি সম্প্রদায়ের প্রমাণসূচক এই-সকল শ্লোকের অস্তিত্ব নাই" (গ)

"সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকাতে কিন্তু পদ্মপুরাণের নামের উল্লেখ নাই ; বলা হইয়াছে "তথাচোক্তম্।" শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিপাদগণও কোনও স্থলে বলেন নাই যে, কলিযুগে বৈষ্ণবদের মাত্র চারিটী সম্প্রদায় আছে বা হইবে। তাঁহারা নানা স্থানে পদ্মপুরাণের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যদি পদ্মপুরাণের কোনও স্থলে চারিসম্প্রদায়-সূচক শ্লোক তাঁহারা পাইতেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উল্লেখ বা আলোচনা করিতেন, অন্ততঃ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বা তাহার টীকাতেও তাহা থাকিত—এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকার উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—চারি সম্প্রদায়সূচক শ্লোকগুলি যে পদ্মপুরাণে আছে, "সূক্ষ্মা"-টীকাতে তাহা বলা হয় নাই, কেবল "তথাচোক্তম্" মাত্র বলা হইয়াছে।

এই "সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকাটী যে কাহার লিখিত, তাহা বলা যায় না। প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণে টীকার প্রারম্ভে বা উপসংহারে টীকাকারের নাম দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—এই টীকাটী স্বয়ং ভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণেরই লিখিত ; কিন্তু তাহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, টীকার প্রারম্ভাংশে বলা হইয়াছে "ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা—ধীমান্ বলদেব-কর্ত্তৃক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে।" পরমভাগবত শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ যে নিজেকে নিজে "ধীমান্" বলিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। সে-স্থলে আরও বলা হইয়াছে—"ভাষ্যং যস্য নির্দ্দেশাদ্ রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্। গোবিন্দঃ স পরমাত্মা মমাপি সূক্ষ্মং করোত্যস্মিন্॥ —যে পরামাত্মা শ্রীগোবিন্দের নির্দ্দেশে বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে, তিনিই এই বিষয়ে আমারও সূক্ষ্মা করিতেছেন (অর্থাৎ তাঁহার কৃপাতেই আমি সূক্ষ্মা-নাম্নী টীকা লিখিতেছি)।" এ-স্থলে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—টীকাকার হইতেছেন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। এই টীকাকারই "তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা" বলিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—টীকাকার নিজেই ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, 'তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা"-বাক্যে তাহা তিনি

(খ) ঐ ১৯৪ পৃষ্ঠা।

(গ) ঐ ১৯৪ পৃষ্ঠা।

স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। "আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"—আনন্দতীর্থ-নামা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যসম্বন্ধে টীকাকারের এই প্রশংসা-বাক্যেও তাহাই সমর্থিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে যে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি নহে, ইহা টীকাকারেরই উক্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত না বলিলেও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র" যে মাধ্বমত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥১৫॥

—শ্রীমধ্ব বলিয়াছেন—(১) বিষ্ণু পরতম তত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) বিশ্ব ও বিষ্ণুতে ভেদ বর্ত্তমান্, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরির চরণসেবক (দাস), (৬) জীবসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে, (৭) বিষ্ণু-পাদপদ্মলাভই হইতেছে মোক্ষ, (৮) বিষ্ণুর অমল-ভজনই মোক্ষের হেতু, (৯) প্রত্যক্ষাদি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-এই ) ত্রিবিধ প্রমাণ। হরি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রও ইহা উপদেশ করিয়াছেন।"

উক্ত শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকথিত যে কয়টী বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব-প্রচারিত তত্ত্বের আত্যন্তিক বিরোধী, তাহা নহে। কয়েকটী বিষয় মহাপ্রভুরও অনুমোদিত। যথা বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব ( "বিষ্ণু"-শব্দ সর্ব্বব্যাপকত্ব-বাচক; শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণু; এই অর্থে বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব ), বিশ্ব সত্য, জীবসমূহ শ্রীহরির চরণ-সেবক, বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভই পরম-পুরুষার্থরূপ মোক্ষ, বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের অমল ভজন (অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিই) পরম-পুরুষার্থের হেতু—এ সমস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুরও অনুমোদিত।

কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকের উক্তি হইতে মনে হয়, মধ্বোপদিষ্ট সমস্ত বিষয়ই যেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের অনুমোদিত, অর্থাৎ তিনিও মাধ্বমত উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মত যে বিদ্যাভূষণপাদের অবিদিত ছিল, তাহা নহে। বিদ্যাভূষণপাদ নিজেও যে তাঁহার বেদান্তভাষ্যে এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাধ্বমত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে (৪।৩০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাপি "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে উল্লিখিতরূপ উক্তি কেন দৃষ্ট হয় ? ইহার হেতু এইরূপ মনে হয়।

শ্রীপাদ বলদেব পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ে ছিলেন, পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেন। ইহাতে মধ্বানুগত লোকগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন অনুমান করিয়া যদি কেহ বলেন—তাঁহাদের তুষ্টির জন্যই বলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়া তাহাতে উল্লিখিত শ্লোকটী সংযোজিত করিয়াছেন, তাহা হইলে মনে করিতে হয়—বলদেব ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত এবং বালবুদ্ধি। এইরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মত কিরূপ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশের পরে বলদেবের আচরণাদিই বা কিরূপ ছিল, মধ্বানুগত লোকগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন। শ্লোকোক্তিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন কেন ?

ইহাতে মনে হয়—মাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীবলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়াছেন; পরবর্ত্তী কালে "সূক্ষ্মা"-টীকাকারের ন্যায় কেহ উল্লিখিত শ্লোকটী, বা তাহার শেষাংশ তাহাতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলদেবের লেখা হইতে পারে না।

বস্তুতঃ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংখ্যা যে কেবল চারিটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইহা শ্রীপাদ বলদেবও স্বীকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

জয়পুরে গল্‌তাগদী সম্বন্ধে যে গোলযোগ উঠিয়াছিল, সেই গোলযোগ-প্রসঙ্গেই বিরুদ্ধপক্ষীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের জন্য শ্রীপাদ বলদেব গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। এই গোবিন্দভাষ্যে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, তৎ-সমস্ত সর্ব্বতোভাবে মাধ্ব-সম্প্রদায়েরও সম্মত নয়, রামানুজাদি-সম্প্রদায়েরও সম্মত নয়, অর্থাৎ উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়েরই সম্মত নয়। বিশেষতঃ, যাহাদ্বারা সম্প্রদায় নির্দ্ধারিত হয়, সেই-ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধবিষয়ক-তত্ত্বও বিদ্যাভূষণপাদ যাহা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের প্রকটিত কোনও তত্ত্ব নহে। ইহা হইতেছে তদতিরিক্ত একটী ভিন্ন, অর্থাৎ পঞ্চম, মত। অবশ্য ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদও নহে (৪।৩০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাও বলদেবের ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বলদেব যে মত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা যে উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের মত হইতে একটী পৃথক্—অর্থাৎ পঞ্চম—মত, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই মনে করিলে তাঁহাদের অবমাননাই করা হইবে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদি চারিটীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, আর, বলদেব এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণও যদি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে বলদেবও তাঁহার নূতন মত তাঁহাদের নিকটে উপস্থাপিত করিতে সাহস পাইতেন না এবং তাঁহারাও তাঁহাকে অসম্প্রদায়ী বলিয়া ধিক্কার দিতেন। ইহাতেই পরিষ্কার ভাবে জানা যায়—অন্ততঃ সেই সময় পর্য্যন্ত পদ্মপুরাণের উক্তি বলিয়া প্রচারিত চারি সম্প্রদায়-বাচক শ্লোকগুলি পণ্ডিতসমাজে কেহ জানিতেন না, অর্থাৎ বৈষ্ণবদের কেবল চারিটীমাত্রই সম্প্রদায় থাকিতে পারে, তাহার বেশী থাকিতে পারে না, ইহা কেহ জানিতেন না।

পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—পদ্মপুরাণের উক্তি বলিয়া প্রচারিত শ্লোকগুলি আধুনিক; মাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতে উৎসুক কোনও লোকই ঐ শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন এবং ইহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল—গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তথাপি কিন্তু কোনওরূপ বিচার না করিয়া অনেকেই গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে অকৃত্রিম বলিয়া মনে করিয়াছেন, এমন কি বৈষ্ণবদের প্রেমধ্বনিরও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন—"চারি সম্প্রদায় কী জয়।"

## ৪২। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সন্ন্যাস

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত শ্রীল রূপসনাতনাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে নাম ছিল, গৃহত্যাগের পরেও তাঁহার সেই নামই ছিল এবং অদ্যাপিও সেই নামেই তিনি পরিচিত। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সন্ন্যাস-কালে কিন্তু তাঁহার আশ্রমোচিত নূতন নাম দেওয়া হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনার্থী সনাতন গৃহত্যাগ করিয়া যখন বারাণসীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তখন মহাপ্রভুও সেই স্থানে ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন এক বস্ত্রেই গিয়াছিলেন; স্নানান্তে আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া আছেন দেখিয়া শ্রীল তপন মিশ্র তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন; সনাতন তাহা অঙ্গীকার করিলেন না; মিশ্রের ব্যবহৃত একখানা পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা চিরিয়া দুইখণ্ড করিলেন এবং একখণ্ড কৌপীনের আকারে, অপর খণ্ড বহির্ব্বাসের আকারে ধারণ করিলেন। তপনমিশ্র ছিলেন গৃহস্থ; তাঁহার ব্যবহৃত বস্ত্র সন্ন্যাসীর বস্ত্রের ন্যায় রঞ্জিত ছিল না। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীকৃষ্ণমাত্রৈক-সর্ব্বস্ব অকিঞ্চন বা নিষ্কিঞ্চনের বেশই ধারণ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গৌর-চরণানুগত অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এইরূপ অকিঞ্চনই ছিলেন, কেহ সন্ন্যাসী ছিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও কাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন নাই। তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীকেও তিনি বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীল রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলেন নাই। চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির উপদেশ-প্রসঙ্গেও প্রভু সন্ন্যাসের উপদেশ দেন নাই; তিনি বরং বলিয়াছেন—"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৮২॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং আদেশের অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদি ভজন-পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও কোনও স্থলেই সন্ন্যাসের উপদেশ দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের উপদেশ দেন নাই বটে; কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন কিনা?

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে অভিধেয়তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৪৯-৫০॥

মহাপ্রভুর এই উপদেশে বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগের কথা পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলিতে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম-ধর্ম্ম বুঝায়। শাস্ত্রে চারিটী আশ্রমের বিধান দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হইতেছে চতুর্থ আশ্রম-ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়েও সন্ন্যাসকে আশ্রমধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশেঽব্রবীদ্ধর্ম্মং বনস্থ-ন্যাসিনোঃ ক্রমাৎ। ভক্তস্যানাশ্রমিত্বঞ্চ ধর্ম্মং সাধারণং তথা॥—

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ক্রমে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তের সাধারণ ধর্ম্ম যে অনাশ্রমিত্ব, তাহাও বলা হইয়াছে।”

উল্লিখিত বাক্যে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস বর্জ্জনের কথা জানা যায়; শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাতেও “ভক্তস্যানাশ্রমিত্বঞ্চ”-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর একটী উক্তিও উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীপাদ জগদানন্দ পণ্ডিত যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন একদিন তিনি শ্রীপাদ সনাতনকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সরস্বতী নামক কোনও এক সন্ন্যাসী শ্রীপাদ সনাতনকে একখানা বহির্ব্বাস দিয়াছিলেন। অবশ্য সনাতন তাহা ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু তিনি সেই বহির্ব্বাসখানাই মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তখন “রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা। ‘মহাপ্রভুর প্রসাদ’ জানি তাঁহাকে পুছিলা॥ কাঁহা পাইলে এই তুমি রাতুল বসন। ‘মুকুন্দ সরস্বতী দিল’ কহে সনাতন॥ শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল। ভাতের হাণ্ডি লঞা তাঁরে মারিতে আসিল॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।১৩।৫১-৫৩॥” সনাতন লজ্জিত হইলেন। তাহা দেখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত ভাতের হাঁড়ী “চুলাতে ধরিয়া” সনাতনকে বলিলেন—“তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥” তখন সনাতন বলিলেন, “—সাধু, পণ্ডিত মহাশয়। চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহ নয়॥ ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষে দেখিল॥ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায়॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।১৩।৫৫-৬০॥” এ-স্থলে শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—**“রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।”** এ-স্থলে রক্তবস্ত্র—“রক্তবর্ণের বা লাল রংএর বস্ত্র” নহে। মহাপ্রভু যে বর্ণের বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই বর্ণের বস্ত্র; কেননা, ইহাকেই জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুকুন্দ সরস্বতী নামক সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস। সন্ন্যাসীরা যে বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করেন, ইহাও ছিল সেই বর্ণের বস্ত্র। রক্ত অর্থ—রঞ্জিত, রংকরা। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি হইতে জানা গেল—সন্ন্যাস গ্রহণ তো দূরে, সন্ন্যাসীরা যে রকম রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন, তদ্রূপ বস্ত্র পরিধানও বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি এবং আচরণ হইতে জানা গেল, যাঁহারা নিষ্কিঞ্চনের বেশ ধারণ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও রঞ্জিত বস্ত্রের ব্যবহার সঙ্গত নয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ নিষেধই করিয়াছেন; শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রায়ও তদ্রূপই।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্য। তৃতীয় অধ্যায়) হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেকে উপলক্ষ্য করাইয়া শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে সন্ন্যাসের ভক্তিধর্ম্ম-বিরোধিতার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিয়াছেন,

বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হৈয়াছে তোমারে। সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে॥

পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে। তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে। প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে। কাহারেও বোল হস্ত জোড় নাহি করে॥
যার পদধূলী লৈতে বেদের বিহিত। হেন জন নমস্করে, তভু নহে ভীত॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে। বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥
"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥"
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সভারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥
শিখাসূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ। নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" কিন্তু চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস এই উপদেশ পালনের পথেও অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং "নাহং বর্ণী ন চ নরপতিঃ"—ইত্যাদি প্রভুকথিত সাধকের পরিচায়ক পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—রামানুজ-সম্প্রদায় এবং মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ও তো বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায়েও সন্ন্যাসের রীতি দেখা যায়। সন্ন্যাস যদি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিকূলই হইবে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায়-দ্বয়ে সন্ন্যাসের রীতি দেখা যায় কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। উল্লিখিত সম্প্রদায়দ্বয় বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের লক্ষ্য এবং সাধন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং সাধন হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে মুক্তি; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্য—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা; গৌড়ীয় সম্প্রদায় মুক্তি কামনা করেন না; মুক্তিকামনা হইতেছে এই সম্প্রদায়ের ভজন-বিরোধী। সন্ন্যাস হইতেছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত; নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হইতে পারে; এজন্য তদ্রূপ সাধন—সুতরাং সন্ন্যাসও—উল্লিখিত সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনের এবং লক্ষ্যেরও বিরোধী নহে। কিন্তু তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনের বিরোধী। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন* এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন—"অন্যাভিলাসিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" এই শ্লোকে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"-শব্দেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তদন্তঃপাতী সন্ন্যাসের সংস্রব-ত্যাগের উপদেশ রহিয়াছে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী (লৌকিকী লীলায় মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু), শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী প্রভৃতি তো ব্রজভাবের উপাসকই ছিলেন, মুক্তিকামী ছিলেন না। তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন ?

উত্তর। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রাদির "পুরী"-উপাধি হইতেই জানা যায়, তাঁহারা শ্রীপাদ শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত "পুরী"-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—পূর্ব্বে তাঁহারা

---

* অবশ্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগের অধিকার-বিচার আছে। মূলগ্রন্থে ৫।৩৫-চ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর-সম্প্রদায়েই ছিলেন, পরে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন ; কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াও—"পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৩।৬ ॥"—ইহা ভাবিয়া, অথবা "মর্য্যাদা-রক্ষণ এই সাধুর ভূষণ"—এই নীতির অনুসরণে পূর্ব্বাচার্য্যদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্য, অথবা এতাদৃশ অন্য কোনও কারণে—তাঁহারা পূর্ব্ব সন্ন্যাসাশ্রমের নাম-আদি পরিত্যাগ করেন নাই। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে যে তাঁহারা ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গিয়াছেন—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। এইরূপে দেখা যায়—ভক্তিমার্গের সাধনের অনুকূল মনে করিয়া তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যও তো সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ-দামোদর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিমার্গাবলম্বী এবং নবদ্বীপে অবস্থান-কালেও প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ভক্তিমার্গাবলম্বী হইয়া তিনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ?

উত্তর। ভক্তি-সাধনের আনুকূল্যবিধায়ক মনে করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন গৌরগত-প্রাণ। তিনি যখন শুনিলেন—প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভাবিলেন—"আমার প্রাণকোটিপ্রিয় প্রভু সন্ন্যাসাশ্রমের দুঃখ ভোগ করিবেন, আর আমি গৃহসুখ ভোগ করিব ! ইহা কিছুতেই হইতে পারে না ; আমিও সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিব, সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।" এইরূপ ভাবিয়া, প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কঠোরতার চিন্তায় অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ; তাহাও পুরোপুরী সন্ন্যাস নহে, তিনি যোগপট্ট নেন নাই, দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে তিনি কেবল সংসার-সুখের পথ রুদ্ধ করিলেন মাত্র ; কিন্তু সন্ন্যাসোচিত আচরণ করেন নাই। বেদান্ত ( মায়াবাদ ভাষ্য সমন্বিত ) পড়িয়া অপরকে পড়াইবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাসের গুরু তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন ; তিনি সে-সব কিছুই করেন নাই ; শুনিয়াছিলেন, প্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণে গিয়াছেন ; কখন প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন—এই অপেক্ষাতেই তিনি কাশীতে বসিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন। যখনই শুনিলনে,'প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনই তিনি ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে উপনীত হইলেন, আর প্রভুকে ছাড়িয়া যায়েন নাই, কখনও যোগপট্ট বা দণ্ড-কমণ্ডলুও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কঠোরতার অংশ গ্রহণের জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ছিলেন সিদ্ধভক্ত, মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ। সিদ্ধভক্তদের সকল আচরণও অনুসরণীয় নহে ; ভক্তের যে আচরণ ভক্তিশাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই সাধকের পক্ষে অনুসরণীয় ( ১।১।১৬৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তো অবতীর্ণ হইয়াছেন—"আপনি আচরি ভক্তি জীবেরে" শিক্ষাদান করার জন্য। তাঁহার আচরণের অনুবর্ত্তন করাই হইবে সাধক জীবের কর্ত্তব্য। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ; সাধক জীব তাঁহার অনুকরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কি দোষ হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার উপদেশের অনুসরণই সাধক জীবের কর্ত্তব্য ; তাঁহার যে আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণের অনুসরণই করা

যায়; কিন্তু অন্য আচরণের অনুকরণ বা অনুসরণ করিলে যে বিশেষ অমঙ্গল হয়, "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যম্" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩৩।৩১-শ্লোকে শ্রীশুকদেবগোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (১।১।১৬৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভু কখনও যে সন্ন্যাস-গ্রহণের উপদেশ দেন নাই, বরং সন্ন্যাস-গ্রহণ যে তিনি নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণরূপ আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত নহে বলিয়া তাহা সাধকজীবের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় হইতে পারেন না।

তবে মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন?

ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের হেতু হইতেছে এই। গত দ্বাপর যুগে স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছিলেন যে—কোনও বিশেষ কলিতে তিনি নিজেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত লোকদিগকেও (অর্থাৎ নির্ব্বিচারে) হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥ শ্রীচৈ. চ. ধৃত পুরাণ-বচন॥" মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥ বিষ্ণু-সহস্রনাম॥" এ-সমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়, বিশেষ কলিতে (অর্থাৎ যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে) গৌর-কৃষ্ণরূপে যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার লীলা। কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধিতে লীলার অনুষ্ঠান হয় না। স্বীয় প্রয়োজন-বুদ্ধিতে লীলার অনুষ্ঠান না হইলেও আনুষঙ্গিক ভাবে যে ফলের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, সন্ন্যাস-লীলা-সম্বন্ধে প্রভু তাহা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ॥ ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত। এ-সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
— শ্রীচৈ. চ. ১।১৭।২৫ -৫৫॥

এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ * * * *
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় শ্রীচৈ. চ. ১।১৭।২৫৭-৫৯॥

এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব, ব্রজলীলার বলদেব। ঈশ্বরের সকল আচরণ যে অনুসরণীয় নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের সন্ন্যাসও হইতেছে তাঁহার লীলা। আবার, নবদ্বীপে আসার পরে তিনি নিজ হাতেই তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু সেই ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দাদির সঙ্গে মহাপ্রভু

যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একস্থানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডও ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আর সন্ন্যাসাশ্রমের দণ্ড ব্যবহার করেন নাই। স্বরূপদামোদর তো দণ্ড গ্রহণই করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, লীলানুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু, বা তাঁহার পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীস্বরূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের কেহই দণ্ড ব্যবহার করিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বোল্লিখিত কারণবশতঃ, তাঁহাদের কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের রীতি নাই, ইহা বরং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনাদিতে যে সকল নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়েন, তাঁহারা যে বেশ ধারণ করেন, তাহা সন্ন্যাসের বেশ নহে; তাহা হইতেছে শ্রীপাদ সনাতনাদির অনুসরণে নিষ্কিঞ্চনের বেশ। সন্ন্যাসীদের ন্যায় রঞ্জিত বস্ত্রও তাঁহারা ব্যবহার করেন না।

## ৪২। ধর্ম্মের নব-রূপায়ণ

আজকাল কোনও কোনও মনীষী বলিয়া থাকেন, আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এখন আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মকে নূতন ভাবে রূপায়িত করার প্রয়োজন; নচেৎ লোক-সমাজে তাহা অচল হইয়া পড়িবে। কথাটী একেবারে যুক্তিহীন নহে; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের কোন্ অংশটী পরিবর্ত্তনের যোগ্য এবং কোন্ অংশটী তাহা নয়, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়? যাহা ধরিয়া রাখে, বা যদ্দ্বারা ধৃত হইয়া থাকা যায়, তাহাই ধর্ম্ম; ইহাই ধর্ম্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ। যাহা ধরিয়া রাখে, বা যাহাতে ধৃত হইয়া থাকা যায়, তাহার স্বরূপের উপরই ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ভর করে; সেই বস্তুটী নানা রকমের হইতে পারে; তজ্জন্য ধর্ম্মও নানারকমের হইতে পারে। এই নানারকমের ধর্ম্মকে মোটামোটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পারমার্থিক ধর্ম্ম এবং লৌকিক ধর্ম্ম।

পারমার্থিক ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইতেছে—ভগবানের সঙ্গে জীবস্বরূপের ( জীবাত্মার ) যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ নিত্যবস্তু, জীবস্বরূপও নিত্যবস্তু, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও নিত্যবস্তু। সুতরাং এই ধর্ম্মটীও নিত্যবস্তু, নিত্য বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তন, বা নূতন ভাবে রূপায়ণ অসম্ভব; তাহাকে নূতন রূপ দেওয়ার অর্থই হইতেছে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। যাঁহারা ভগবান্‌কে একটা কল্পিত বস্তু মনে করেন, ভগবানের সহিত জীবস্বরূপের সম্বন্ধকেও কল্পিত সম্বন্ধমাত্র মনে করেন, তাঁহারাই এই পারমার্থিক সম্বন্ধের নূতন রূপায়ণের কথা বলিতে পারেন; কিন্তু বেদবিশ্বাসী লোকগণ তাঁহাদের কথায় কতটুকু আস্থা স্থাপন করিবেন, বলা যায় না।

পারমার্থিক ধর্ম্মের অনুকূল যে সাধন—অর্থাৎ যে সাধনের অনুষ্ঠানে লোক অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, সেই সাধন—অবশ্য অনিত্য দেহের সহায়তায় অনুষ্ঠেয়। দেহ এবং দেহ-

সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়াদির, মনেরও—শক্তি-সামর্থ্যাদি পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য এই সাধনের রূপও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শাস্ত্রে তাহার বিধানও দৃষ্ট হয়।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ শ্রীভা. ১২।৩।৫২ ॥

—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাপরে বিষ্ণুর পরিচর্য্যাদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিতে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই সেই ফল পাওয়া যায়।"

বিভিন্নযুগে সাধনের বিভিন্নতা থাকিলেও সাধ্যবস্তু যে এক এবং অভিন্ন, এই শ্লোকের "যৎ" এবং "তৎ" শব্দদ্বয় হইতেই তাহা জানা যায়। এই সাধ্যবস্তু অপরিবর্ত্তনীয়; যেহেতু তাহা নিত্য; কিন্তু বিভিন্ন যুগে লোকের দেহেন্দ্রিয়াদির অবস্থাভেদে সাধনের ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

লৌকিক ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইতেছে মুখ্যতঃ দেহের সঙ্গে। দেহ হইতেছে অনাত্মবস্তু, জড়বস্তু—সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং লৌকিক ধর্ম্মও অবস্থাবিশেষে, পারমার্থিক ধর্ম্মের অবিরোধী ভাবে, পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

লৌকিক ধর্ম্মও ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে দুই রকমের হইতে পারে। ব্যক্তিগত লৌকিক ধর্ম্ম হইতেছে লৌকিক ব্যবহার—পরস্পারের প্রতি সৌজন্যাদি-প্রদর্শন, প্রতিবেশি-জনোচিত ব্যবহারাদি, কিম্বা স্বীয় দেহ-মনের সুস্থতা-রক্ষণোপযোগী আচরণ। ইহা দেশ-কালাদির অপেক্ষা রাখে। দেশ-কাল-ভেদে ইহারও পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

সমষ্টিগত লৌকিক ধর্ম্ম হইতেছে সমাজ-ধর্ম্ম। সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক সমাজের রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহার—সেই সমাজের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের পালন না করিলে সমাজে থাকা যায় না; সুতরাং ইহা পালনীয়। সমাজ-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতেছে, সমাজে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সকলের সুখ-সুবিধাদির প্রতি এবং সকলের নৈতিক মঙ্গলের প্রতি, লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষণ। সুতরাং সমাজ-ধর্ম্মও অবশ্য-পালনীয়।

সমাজ-ধর্ম্ম দেশ-কালাদির অপেক্ষা রাখে; সুতরাং ইহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে, মানব-জীবনের মূল লক্ষ্য পারমার্থিকতার বিরোধী কোনও রীতি-নীতি সমাজে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতিও অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে নানা সময়ে বাহির হইতে নানাজাতীয় লোকের সমাগম হইয়াছে; তাঁহাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারও ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সত্য এবং তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ভারতবাসী কখনও স্বীয় পারমার্থিক সত্যকে ত্যাগ করেন নাই; তাহার অপ্রতিকূল ভাবে যাহা গ্রহণীয়, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই বহুকালব্যাপী নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কাঠামোটী বাঁচিয়া রহিয়াছে। যদি ভারত তাহাকে হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ভারত আর ভারত থাকিবে না, ভারতের বৈশিষ্ট্যই তখন বিলুপ্ত হইবে। লোকের জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত

সমস্ত ব্যাপারের সহিতই ঈশ্বর-স্মৃতি বিজড়িত, ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য ; অন্য দেশেও যে তাহা একেবারে নাই, তাহা নহে। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যেন মানুষমাত্রের মধ্যেই অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। ভারতে এই ব্যাপকত্ব অত্যন্ত বেশী। এজন্যই কোনও কোনও নাস্তিক-ধর্ম্ম ভারতে উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও পরমার্থ-কামীদের নিকটে তাহাদের কোনওটীই আদৃত হয় নাই, এখনও হইতেছে না।

পাশ্চাত্য জড়বাদী মনীষীদিগের প্রভাবে অধুনা কোনও কোনও ভারতীয় মনীষীও অনেকটা জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের অপৌরুষেয়ত্বও স্বীকার করেন না, বেদকথিত ঈশ্বরকেও লোক-কল্পিত বলিয়া মনে করেন, অথবা কোনও বিষয়ে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষই তাঁহার অনুগত স্তাবকগণ কর্ত্তৃক ঈশ্বরত্বে উন্নীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। ইহাকেও নাস্তিকত্বেরই এক বৈচিত্র্য মনে করা যায়। পাশ্চাত্য জড়বাদী মনীষীদিগের সহিত ইঁহাদের গবেষণার ফলের ঐক্য আছে বলিয়া তাঁহাদের অভিমতই আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের নিকটে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং শিক্ষার্থিদিগকেও সেই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা হইতেছে। এতাদৃশ গবেষকগণ যে বৈদিক শাস্ত্রাদির আলোচনা করেন না, তাহাও নয়। কিন্তু আলোচনা করিলেও শাস্ত্রের যে অংশটী তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধারণার অনুকূল, সেই অংশটীই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত ধারণার সহিত সমগ্র শাস্ত্রের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন না, সঙ্গতি-স্থাপনের চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতই অনেক স্থলে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, ব্যক্তিগত অভিমতের আনুগত্যেই তাঁহারা বিচার করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইতে পারে না।

কেহ কেহ আবার আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাইও দিয়া থাকেন এবং বলেন—এই বিজ্ঞানের যুগে শাস্ত্রকথিত ঈশ্বরে কে বিশ্বাস করিবে ? কেহ কেহ বিশ্বাস না করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে একদেশী, তাহা বোধহয় তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। বিজ্ঞানের কার্য্য হইতেছে জড়জগৎ লইয়া ; কিন্তু জড়জগতের অতীত যে কিছুই থাকিতে পারে না, একথাই বা তাঁহারা বা বিজ্ঞানীরা কিরূপে বলিতে পারেন ? আধুনিক বিজ্ঞানই কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ? যখন যে সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, তাহাদ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়, ততক্ষণই তাহা পূর্ণ সত্যরূপে স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরে যখন দেখা যায়, তাহাদ্বারা সমস্ত সমস্যার সন্তোষ-জনক সমাধান পাওয়া যায় না, তখন বিজ্ঞানী আরও সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা জড়াতীত "চিৎ" স্বীকার করেন না ; যেহেতু এতাদৃশ কোনও বস্তু তাঁহাদের পরীক্ষায় ধরা পড়ে নাই। যাহা এখনও ধরা পড়ে নাই, তাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, সত্যানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর পক্ষে এইরূপ কথা বলা শোভন বলিয়া মনে হয় না। বৃক্ষাদির যে অনুভূতি আছে, বিজ্ঞান তো পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিত না ; কিন্তু আচার্য্য জগদীশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারাই তো তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বৃক্ষাদির অনুভূতির অস্তিত্বকে যদি একেবারেই তিনি উপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় এ-বিষয়ে তাঁহার গবেষণাও অগ্রসর হইত না। কিন্তু এই অনুভূতির মূল হেতু বিজ্ঞানীর নিকটে এখনও অনাবিষ্কৃত। শাস্ত্র বলেন—এই মূল হইতেছে "চিৎ"। অনুভূতি চেতনেরই ধর্ম্ম। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের জড়যন্ত্রাদিদ্বারা, বা জড় মস্তিষ্কদ্বারা জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তুকে গোচরীভূত করা যায় না।

তাহার সহিত পরিচিত হইতে হইলে জড়াতীত এক বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে ; সেই জড়াতীত বিজ্ঞানই হইতেছে বেদাদিশাস্ত্র-কথিত সাধন। এই জড়াতীত বিজ্ঞান-মন্দিরে যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা জড়াতীত চিদ্‌বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহারা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া সেই বস্তুর প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আনুগত্যে এখনও যে কেহ সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন না, তাহা নয়। সুতরাং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া বেদকথিত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রলাপ-বাক্যমাত্র মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

বৈদিক ভারতের প্রাণবস্তুই হইতেছে এক অনাদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। যে-স্থলে লৌকিক ধর্ম্মের কোনওরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, সে স্থলে এই প্রাণবস্তুর অবিরোধী পরিবর্ত্তনই বাঞ্ছনীয়।

## ৪৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও পরকীয়াভাবের ভজন

রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলায় একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই অপেক্ষা রাখেন ; তিনি স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়। তাঁহার এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সকলেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ( ১।১।১০৬ অনুচ্ছেদ )। প্রত্যেক লীলাতেই সেবার অনেক রকম বৈচিত্রী আছে ; প্রত্যেক বৈচিত্রীর সেবার উপযোগী পরিকরও তাঁহার আছেন এবং তাঁহারাও সকলে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। সাধনসিদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত জীবও অবশ্য পরিকররূপে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না, অর্থাৎ তাঁহারা না থাকিলে যে তাঁহার লীলা চলিতে পারে না, তাহা নহে ; তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই তিনি সেবার অধিকার দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন ; সেবার মূল অধিকার হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির, স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই নিত্যমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ জীবগণ সেবা পাইয়া থাকেন ( ২।৩০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবের লীলাতে তাঁহার পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। শান্তরসের স্থান কেবল পরব্যোমে ; দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে অন্য চারি ভাবের লীলা আছে। মধুর-ভাবের বা কান্তাভাবের লীলা সকল ধামেই আছে। কান্তাভাবের লীলার পরিকরগণ হইতেছেন তাঁহার প্রেয়সী—হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বা হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ( ১।১।১৪৫-৪৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

হ্লাদিনী, বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাভাবিকী স্বকীয়া শক্তি বলিয়া তাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ কৃষ্ণকান্তাগণও হইবেন—স্বরূপতঃ তাঁহারই স্বকীয়া কান্তা। স্বরূপতঃ তাঁহারা তাঁহার পক্ষে পরকীয়া কান্তা হইতে পারেন না ; কেননা, তাঁহারা যে-স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই স্বরূপ-শক্তি তাঁহার পক্ষে পরকীয়া নহে। এজন্য পরব্যোমের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং অপ্রকটব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ—সকলেই তাঁহার স্বকীয়া কান্তা এবং স্বকীয়া কান্তারূপেই সেই-সেই ধামে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কিন্তু কান্তারসের দুই রকম বৈচিত্রী আছে—স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস এবং পরকীয়া কান্তার প্রেমরস। এই দুই রকম রসবৈচিত্রীর আস্বাদনেই কান্তারসের বা মধুর-রসের পূর্ণ আস্বাদন ; কোনও এক বৈচিত্রীর

আস্বাদন না হইলে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পরব্যোমে, প্রকট ও অপ্রকট দ্বারকায় এবং অপ্রকট ব্রজে তিনি স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস-বৈচিত্রীই আস্বাদন করিয়া থাকেন; এ-সকল ধামে পরকীয়া কান্তা নাই। বস্তুতঃ তিনি যখন স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায় এবং তাঁহার কান্তাগণও যখন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, তখন তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ পরকীয়া কান্তা থাকিতেও পারেন না। অথচ পরকীয়া কান্তার প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন না করিলেও তাঁহার রসস্বরূপত্ব অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি পূর্ণতম স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তাঁহাতে কোনওরূপ অপূর্ণতারই স্থান নাই। বিশেষতঃ, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই যখন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্, পূর্ণতম স্বরূপ, অন্যান্য স্বরূপগণ যখন তাঁহার অংশ-প্রকাশ—সুতরাং রসত্বের বিকাশে অপূর্ণ—তখন অন্ততঃ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার রসস্বরূপত্বের পূর্ণতা অপরিহার্য্য; এই স্বরূপে তাঁহার পক্ষে পরকীয়া কান্তারসের আস্বাদনও অপরিহার্য্য। কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ পরকীয়া কান্তা যখন থাকিতেই পারে না, তখন কিরূপে তিনি পরকীয়া কান্তার প্রেমরস আস্বাদন করিতে পারেন ?

অপ্রকট ব্রজে তাহা সম্ভবপর নহে; কেননা, সে-স্থলে তিনি অনাদিকাল হইতেই স্বকীয়া কান্তার প্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন বলিয়া এবং অপ্রকট-ব্রজের লীলা (বস্তুতঃ তাঁহার সকল ধামের লীলাই) নিত্য বলিয়া সে-স্থলে পরকীয়া-ভাবের লীলা সম্ভব নয়। যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন, তখনই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার সমস্ত পরিকরের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণকেও তিনি অবতারিত করাইয়া থাকেন। নরলীল ভগবান্ জন্মলীলার যোগেই অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহার পরিকরগণকেও জন্মলীলার যোগেই অবতারিত করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর হইলেও সখ্য-বাৎসল্যের বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে প্রকটলীলায় বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন; তাঁহার কান্তাভাবের পরিকর গোপীগণও নিত্য কিশোরী বটেন; কিন্তু প্রকটলীলায় লীলাসৌকর্য্যার্থ তাঁহাদিগকেও তাঁহার লীলাশক্তি বাল্য-পৌগণ্ড অঙ্গীকার করাইয়া থাকেন। এইরূপে জন্মলীলার এবং বাল্য-পৌগণ্ডের আবেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার লীলা-সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তিরূপা (স্বরূপ-শক্তিরূপা) যোগমায়া এক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা গোপসুন্দরীদিগের উপরে পরকীয়া কান্তার ভাব আরোপিত হয়। (বিশেষ আলোচনা ১।১।১৫৮-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ইহাতেই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তার প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে—তাহাও কেবল প্রকট-ব্রজলীলাতে। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নিত্য (১।১।১১৪-অনুচ্ছেদ); সুতরাং আরোপিত-পয়কীয়া-ভাবময়ী লীলারও নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

প্রকট-লীলাকে অবলম্বন করিয়াই সাধকের উপাসনা; প্রাপ্তিও হয় প্রকট-লীলার যোগে। সুতরাং যাঁহারা ব্রজের মধুর ভাবের বা কান্তাভাবের উপাসক, তাঁহাদিগকে প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী লীলারই উপাসনা করিতে হয়। ইহা হইতেছে রাগানুগা-মার্গের উপাসনা। এই উপাসনার দুইটী অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য-সাধন হইতেছে—যথাবস্থিত সাধকদেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান। আর,

অন্তর সাধন হইতেছে—কেবল মনে মনে সেবার চিন্তা। এই ভাবের সাধকের চরম কাম্য হইতেছে—গোপ-কিশোরীরূপে কান্তাভাবময়ী লীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে, মনে মনে নিজের একটী গোপকিশোরী-দেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহেই ব্রজে গোপীগণ-পরিবেষ্টিত এবং গোপীগণকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করিতে হয়। মনে মনে এইরূপে যে গোপকিশোরী-দেহের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে "অন্তশ্চিন্তিত দেহ" বলে, "অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ" বা কেবল "সিদ্ধদেহ"ও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীদিগের আনুগত্যেই সেবার চিন্তা করিতে হয়। কেননা, "গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেহো নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৮৫ ॥" "অন্তশ্চিন্তিত দেহেই" কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের আনুগত্য করিতে হয়। সাধকের যথাবস্থিত দেহে সাক্ষাদ্‌ভাবে গোপীদের আনুগত্য সম্ভবও নয়; কেননা, গোপীগণ থাকেন ব্রজে, আর সাধক থাকেন এই সংসারে। ইহাই পরকীয়াভাবের ভজনের "অন্তর-সাধন।" এই "অন্তর সাধনে" মনের কাজ ব্যতীত যথাবস্থিত দেহের অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের—কোনও কাজই নাই। বাহ্য-সাধনে অবশ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির জন্য যথাবস্থিত দেহের যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের কাজ আছে।

কিন্তু দেশে এমন কতকগুলি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন—তাঁহারাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপদেশের অনুসরণে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও সে-সমস্ত গ্রন্থেরই অনুসরণ করেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রজপরকীয়াভাবেরই উপাসক। তাঁহাদের সাধনে প্রত্যেকেরই একজন পরকীয়ারমণী অপরিহার্য্যা। এই পরকীয়া রমণীকে তাঁহারা "গোপী"-আখ্যা দিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই এই প্রাকৃত পরকীয়া রমণীরূপ "গোপীর" আনুগত্য করিয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ করেন। যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থাদির, বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের বিশেষ আলোচনা করেন না, তাঁহারা উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলিকেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন এবং তাহার ফলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। যদি তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন—উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির আচরণাদি সম্পূর্ণরূপেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মবিরোধী। তাঁহাদের আচরণাদি নীতিধর্ম্মের এবং সমাজ-ধর্ম্মেরও বিরোধী, পারমার্থিক ধর্ম্মের কথা আর কি বলা যাইবে। ইহা সামান্য-সদাচারেরও বিরোধী; অথচ মহাপ্রভু সামান্য-সদাচার-পালনের উপদেশও দিয়া গিয়াছেন।

পরস্ত্রীর সঙ্গ তো দূরে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন—নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতে আসক্তিও ভজনবিরোধী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেন, যে কোনও পরমার্থকামী সাধকের পক্ষেই স্ত্রীলোকে আসক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। শিশ্নোদর-পরায়ণতা মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে তো প্রায় স্বাভাবিকই; মায়ার প্রভাবেই ইহা হইয়া থাকে। নিজের সুখবাসনা, বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি মোক্ষাদির বাসনা পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের জন্য সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার কথা তো দূরে, যিনি কেবল মোক্ষাকাঙ্ক্ষী—যিনি কেবল মায়ার বন্ধন হইতেই

অব্যাহতি লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহার পক্ষেও যে শিশ্নোদর-পরায়ণতাকে প্রশমিত করার চেষ্টাই শ্রেয়োলাভের অনুকূল, পরস্ত্রীসঙ্গাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনার অনলে ঘৃতাহুতি দেওয়া যে তাঁহার সাধনের প্রতিকূল, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। অনাদি-বহির্ম্মুখ সংসারী জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনা এতই বলবতী যে, অন্য স্ত্রীলোকের কথা দূরে, মাতা, ভগিনী বা কন্যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও যে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জন্মাইতে পারে—সুতরাং তাহাদেরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ শ্রীভা. ১।১৯।১৭ ; মনুসংহিতা. ২।২।১৫॥

উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহের লোকগণের প্রত্যেকে যে পররমণীকে নিজের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে "গোপী" বলেন এবং তাঁহার আনুগত্য করেন। ইহাকেই "গোপী-অনুগতি" বলেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন না—শাস্ত্রে যে গোপীদের আনুগত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত জীব নহেন ; তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, মায়ার স্পর্শহীন। আর, যাঁহাকে সঙ্গিনী করা হয়, সেই প্রাকৃত রমণী হইতেছেন জীবতত্ত্ব, তাহাতেও আবার মায়াবদ্ধ জীব। ব্রজের গোপীগণ হইতেছেন—মহাভাববতী, যে মহাভাব দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ। এই মহাভাবই হইতেছে গোপীত্বের বিশেষ লক্ষণ। প্রাকৃত রমণী মহাভাব কোথায় পাইবেন ? সুতরাং "গোপী"ই বা কিরূপে হইতে পারেন ? শাস্ত্রানুগত্যে যাঁহারা কান্তাভাবের সাধন করেন, তাঁহারাও যথাবস্থিত দেহে মহাভাব পাইতে পারেন না, কৃষ্ণরতি-বিকাশের দ্বিতীয় স্তর "প্রেম" পর্য্যন্তই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, তাহার অতিরিক্ত নহে ( ৫।৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং একজন মায়াবদ্ধ প্রাকৃত পরনারীকে "গোপী" বলিয়া মনে করা এবং তাঁহার আনুগত্যে ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া আত্মবঞ্চনামাত্র।

এই সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কতকগুলি কৃত্রিম গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বরূপদামোদর ও শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের নামে চালাইতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহারা বৈষ্ণবগ্রন্থের বাক্যাদিও উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য তাঁহারা যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের গ্রন্থের তাৎপর্য্যের কোনও সঙ্গতিই নাই, বরং তাহা বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতের বিরোধী। তাঁহাদের এ-সমস্ত গ্রন্থের প্রচারও আত্মবঞ্চনা এবং লোক-বঞ্চনামাত্র। তাঁহাদের ভাবের অনুসরণ তাহারা করিতে পারেন ; কে তাঁহাদিগকে বাধা দিবে ? কিন্তু তাঁহাদের আচরণাদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আচরণাদি বলিয়া প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ লোকদের চক্ষুতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে হেয়রূপেই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

আবার, এমন সম্প্রদায়ও আছে, যে সম্প্রদায়ের কোনও কোনও সাধক, পুরুষ হইয়াও বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা নিজেকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া মনে করেন—তিনি "সখী" হইয়াছেন এবং সেই বেশে "সখীভাবে সাধন" করিতেছেন বলিয়া মনে করেন—"ললিতা", "বিশাখা"-ইত্যাদি কৃষ্ণকান্তা সখীগণের নামও ধারণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের উপদিষ্ট রাগানুগা-ভজন-প্রাণালীতে কোনও স্থলেই এইরূপ আচরণের কথা পাওয়া যায় না। এইরূপ "সখীবেশ ধারণ" হইতেছে যথাবস্থিত দেহের ব্যাপার। যথাবস্থিত সাধকদেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিব্যতীত অন্য কোনও অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। আবার, কোনও জীবের পক্ষে নিজেকে "ললিতা-বিশাখাদি" নিত্যসিদ্ধ

ভগবৎ-পরিকররূপে পরিচিত করাও অপরাধ-জনক। কেননা, ভগবত্তত্ত্বে ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরতত্ত্বে স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই [ ৫।৬১ (৭)-আ. অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ] ; স্বরূপের বিচারে ব্রজগোপীগণও ঈশ্বর-তত্ত্ব। জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধি অপরাধজনক ( ৫।১০৫. ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নামে পরিচিত উল্লিখিত সম্প্রদায়-সমূহের আচরণাদি দেখিয়া অনেকেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা অবাঞ্ছনীয় ধারণার পোষণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কোনও কোনও বিজ্ঞ লোক ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে গর্হিত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র হেতু। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখে রাসলীলার কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ যে কয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তরে শ্রীল শুকদেব দেখাইয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা সর্ব্বতোভাবে নিরবদ্য ( ৫।১৬৪-৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

## ৪৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে শ্রৌতধর্ম্ম

কেহ কেহ বলেন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতেছে একটী পৌরাণিক ধর্ম্ম, শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এই ধর্ম্মটী বৈদিক বা শ্রৌত ধর্ম্ম নহে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

কোনও ধর্ম্ম যদি কেবল পুরাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ধর্ম্মের আচার্য্যগণ কেবল মাত্র যদি পুরাণবাক্যই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন, একটী শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ না করেন, তাহা হইলেও সেই ধর্ম্মকে অবৈদিক বা বেদবহির্ভূত বলা সঙ্গত হয় না। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্"—এই মৈত্রেয়ী শ্রুতি ( ৬।৩২ )-বাক্য হইতে জানা যায়—চারিবেদের ন্যায় ইতিহাস ( মহাভারত ) এবং পুরাণও পরব্রহ্মের নিশ্বাস-স্বরূপ—সুতরাং অপৌরুষেয়।

দ্বিতীয়তঃ, "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"—এই ছান্দোগ্য-শ্রুতি ( ৭।১।২ )-বাক্যে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে।

ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ কেন বলা হয়, তাহার হেতু মহাভারত এবং মনুসংহিতার বাক্য হইতে জানা যায়। এই দুই গ্রন্থ বলিয়াছেন—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি ( তত্ত্বসন্দর্ভ। ১২। ধৃত-প্রমাণ )—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থকে স্পষ্ট করিতে হইবে।" অন্যত্রও দেখা যায়—"পূরণাৎ পুরাণম্—বেদার্থ-পরিপূরক শাস্ত্রই পুরাণ।" যাহা বেদ নয়, তাহাদ্বারা বেদার্থের পূরণ সম্ভব নয়। যাহা বেদবহির্ভূত, তাহা দ্বারাও বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইতে পারে না।

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা গেল—বেদের তাৎপর্য্য ও পুরাণেতিহাসের তাৎপর্য্যে প্রভেদ কিছু নাই ( বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের অবতরণিকায় ৮ম অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র

পুরাণের প্রমাণই উদ্ধৃত করেন, শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করেন না, তাঁহাদের উক্তিকেও বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ বলা সঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ কোনও আচার্য্যই এইরূপ করেন নাই; সকল আচার্য্যই পুরাণের প্রমাণ যেমন উদ্ধৃত করিয়াছেন, বেদের প্রমাণও তেমনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে সকলেই "সর্ব্বোপনিষৎসার" বলিয়া থাকেন; অথচ, গীতা হইতেছে মহাভারতের—ইতিহাসের—অঙ্গ। ইতিহাস যদি বেদবহির্ভূত হইত, তাহা হইলে গীতাকে কিরূপে "সর্ব্বোপনিষৎসার" বলা যায়?

জৈমিনি-দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। লোকের চিত্তবৃত্তির ভেদেই অধিকার-ভেদ। সংসারী লোকের চিত্ত মুখ্যতঃ মায়িকগুণত্রয়ের দ্বারাই পরিচালিত হয়। যাঁহার চিত্তবৃত্তি মুখ্যতঃ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহার চিত্তবৃত্তিও হয় সাত্ত্বিকী। এইরূপে কাহারও চিত্তবৃত্তি হয় রাজসিকী, কাহারও বা তামসিকী। বেদ কাহাকেও বাদ দেন নাই; সকলের জন্যই যথাযথ বিধান বেদে দৃষ্ট হয়। বেদানুগত পুরাণেও তদনুরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। মূল পুরাণ একখানা হইলেও তাহা অষ্টাদশ ভাগে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রকটিত (অবতরণিকা। ৯-অনু)। এই অষ্টাদশ পুরাণও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সাত্ত্বিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ এবং তামসিক পুরাণ (অবতরণিকা।১০-অনু)। সাত্ত্বিক পুরাণ মোক্ষদ, রাজসপুরাণ স্বর্গদ এবং তামস পুরাণ নিরয়-প্রাপক (অবতরণিকা। ১০-অনু)। বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ—এই ছয়খানি পুরাণ হইতেছে সাত্ত্বিকপুরাণ। মোক্ষদ বলিয়া সাত্ত্বিক পুরাণগুলি যে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদ্‌ভাগের অনুগত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাত্ত্বিকপুরাণ সমূহের মধ্যে আবার শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অবতরণিকা। ১১-অনু); কেননা, এই শ্রীমদ্‌ভাগবতেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমাদি বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং চারিপুরুষার্থের অতীত পরম-পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"-ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (১।৪।৮)-বাক্যে, "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ"-ইত্যাদি শতপথ-শ্রুতি-বাক্যেও যে পরম-ধর্ম্মের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, সাত্ত্বিক-পুরাণ সমূহের মধ্যে একমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতেই সেই পরম-ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এসমস্ত কারণে শ্রীমদ্‌ভাগবতই সাত্ত্বিক পুরাণ সমূহের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তত্ত্ববিষয়ক সমস্ত শ্লোকই শ্রুতিবাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, টীকাকারগণ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্। শ্রীভা. ১।৩।৪২॥—সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের সারভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে", "সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে॥ শ্রীভা. ১২।১৩।১৫॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত।" সুতরাং যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায়, কোনও আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে কেবলমাত্র শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার উক্তিকে বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ বলা সঙ্গত হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ বাহুল্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্য প্রমাণের প্রতিও তাঁহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই; অন্য পুরাণাদির প্রমাণ এবং শ্রুতিপ্রমাণও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন; বহু বেদান্ত-সূত্রও তাঁহাদের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বেদান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত, মূলগ্রন্থে সর্ব্বত্র তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও সংক্ষেপে কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

**ব্রহ্মতত্ত্ব**—গৌড়ীয় মতে নরলীল, নরবপু, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। গোপাল-তাপনীশ্রুতি ( মুক্তিকোপনিষৎ যাহাকে মুখ্য অষ্টোত্তরশত-উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, সেই গোপালতাপনী শ্রুতি ), কৃষ্ণোপনিষৎ, অথর্ববশির-উপনিষৎ প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। গোপালতাপনী তাঁহাকে নরবপু, নরলীলও বলিয়া গিয়াছেন। ছান্দোগ্য-শ্রুতি ৩।১৭।৬-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে "দেবকীপুত্র" বলিয়াছেন; "দেবকীপুত্রত্ব"ও তাঁহার নরলীলত্বের পরিচায়ক। "রসো বৈ সঃ", "সর্ব্বরসঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

**জীবতত্ত্ব**—গৌড়ীয় মতে জীব হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ, চিৎকণ অংশ, স্বরূপে অণু, মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও ৭।৫-শ্লোকে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তি, ১৫।৭-শ্লোকে অংশ বলিয়াছেন। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। "এষ অণুরাত্মা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্রও জীবের অণুত্বের কথা বলিয়াছেন এবং বেদান্ত-দর্শনের সর্ববশেষ অধ্যায়ে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন; ইহাও জীবের অণুত্ব-সূচক।

**সৃষ্টিতত্ত্ব**—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন। "তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও পরিণাম-বাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

**মোক্ষতত্ত্ব**—গৌড়ীয় মতে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত পঞ্চবিধা মুক্তিও স্বীকৃত এবং "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"-ইত্যাদি "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্-ভগবদ্‌গীতার "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো * * * মামেবৈষ্যসি"-ইত্যাদি বাক্যে যে ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্বীকৃত। এই প্রাপ্তি হইতেছে—রসস্বরূপ-পরব্রহ্মকে "প্রিয়রূপে" পাওয়া, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ অস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥"-ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ( ১।৪।৮ )-বাক্যে যে-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রাপ্তি, "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"-ইত্যাদি মাঠর-শ্রুতিবাক্যে রসস্বরূপ-পরব্রহ্মকে যে ভক্তিবশ্য বা প্রেমবশ্যরূপে পাওয়ার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রাপ্তি। এইরূপ প্রাপ্তিতে সাধনসিদ্ধ জীব পৃথক্ অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্ত-দর্শনের সর্ববশেষ অধ্যায়ে এইরূপ পৃথক্‌দেহে মুক্তজীবের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের উল্লিখিত বাক্যের অনুসরণে প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনা করিলে প্রিয়রূপেই—নিতান্ত আপনজনরূপেই—যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহাও সেই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। প্রিয়ত্ব-বস্তুটীই পারস্পরিক। জীবের প্রিয় পরব্রহ্ম ভগবান্, তাঁহার প্রিয়ও জীব। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা"-ইত্যাদি ৯।২৯ ॥, "শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।২০ ॥"-ইত্যাদি বহু গীতাবাক্যে পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়ের একান্ত অভীষ্টই হইতেছে প্রিয়ের প্রীতিবিধান।

যিনি ভগবান্‌কে "প্রিয়রূপে" প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও প্রিয়জ্ঞানে, নিতান্ত আপন-জ্ঞানে ভগবানের প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবা করিবেন ( বৃহদারণ্যকের উক্তির তাৎপর্য্যই এইরূপ ), আর ভগবান্‌ও তাঁহার প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন ( মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি )। প্রিয়রূপে উপাসনার সাধনে সিদ্ধ জীব পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভাবেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাই প্রাপ্তির তাৎপর্য্য।

**সাধনতত্ত্ব**—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই হইতেছে সাধন। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"-ইত্যাদি, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯।১৪ ॥", "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০।৯ ॥"-ইত্যাদি বহু গীতাবাক্যেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয় মতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিমার্গেও ভক্তির সাধন অপরিহার্য্য। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪ ॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬ ॥"-বাক্যে যে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই ( ভূ-২৪-অনু ) প্রদর্শিত হইয়াছে। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও সে-কথাই জানাইয়া গিয়াছেন।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির উপদেশ বেদেও দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের পঞ্চম পর্ব্বের ৫।৬০ ক (৮)-অনুচ্ছেদে বেদবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদের ১।৫৬।২-মন্ত্রে শ্রবণের, ১।১৫৪।১, ১।১৫৬।৩ এবং ৭।৯৯।৭-মন্ত্রে কীর্ত্তনের, ১।১৫৪।৩-মন্ত্রে স্মরণের, ১।১৫৪।৪-মন্ত্রে পাদসেবনের, ১।৫৫।১-মন্ত্রে অর্চ্চনের, ১।১৫৬।৩-মন্ত্রে দাস্যের, ১।১৫৪।৫-মন্ত্রে সখ্যের, ১।১৫৬।২-মন্ত্রে আত্মনিবেদনের এবং যজুর্ব্বেদের ৩১।২০-মন্ত্রে বন্দনের কথা বলা হইয়াছে।

রাগানুগা-ভজনও শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাগানুগার ভজনে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অত্যন্ত প্রিয়ত্ববুদ্ধি, মমত্ববুদ্ধি পোষণ করা হয়। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির "তদাত্মনমেব প্রিয়ম্ উপাসীত ইতি ॥ ১।১।৪।৮ ॥"-বাক্যেও পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববুদ্ধি পোষণের উপদেশ দৃষ্ট হয়। রাগানুগার ভজনে—প্রেমের সহিত, অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার সহিতই ভজনের ব্যবস্থা। শতপথ-শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন, "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ ॥"

**ব্রজগোপীদের** কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদপরিশিষ্টে শ্রীরাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি ॥" অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিতে আছে—"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ ॥ ২।৩।৪৫-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত প্রমাণ ॥" কৃষ্ণোপনিষদে গোপীদের উল্লেখ আছে। "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপীসুরৈঃ সহ ॥ ৭ ॥" গোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতিতে "গোপীজনবল্লভঃ", "গোপীজন-মনোহরঃ", "গোপীনাথঃ"-ইত্যাদি শব্দে গোপীদিগের উল্লেখ পাওয়া যায় (২।১১, ১।২, ২।২-বাক্যে )। গোপালোত্তরতাপনীতে ১-বাক্যে ব্রজস্ত্রীগণের এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীর ( শ্রীরাধার ) উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোপালোত্তর-তাপনীতে বলা হইয়াছে—ব্রজগোপীগণ হইতেছেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ( স বো হি স্বামী ভবতি ); কিন্তু প্রকটলীলাতে তাঁহাদের পরকীয়া ভাব ( ১।১।১৫৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

**ধাম**—ভগবানের ধামের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের "তাং বাং বাস্তূন্যস্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ১।১৫৪।৬ ॥"-মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ধাম **গোলোকের** কথা, নারায়ণাথর্ব্বশির উপনিষদের ৪-বাক্যে **বৈকুণ্ঠলোকের** কথা, কৃষ্ণোপনিষদের ৭-বাক্যে **বৃন্দাবনের** কথা এবং ৯-বাক্যে **বনবৈকুণ্ঠ গোকুলের** কথা, গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতির ১২-বাক্যে **মথুরা** এবং বৃহদ্‌বনাদি **দ্বাদশ বনের** কথা এবং যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতিতেও **গোলোকের** কথা দৃষ্ট হয় ( ১।১।৯৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

**পরিকর**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিকরের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণোপনিষদে নন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব, বলরাম, গোপ, গোপী, রোহিণী, সত্যভামা, সুদামা, অক্রূর প্রভৃতির এবং গোপাল-পূর্ব্বতাপনী ও গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতেও উল্লিখিত অনেক পরিকরের এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ঋগ্বেদপরিশিষ্টেও শ্রীরাধার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ( ১।১।১০৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

**লীলা**—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ২।১।৩৩ ॥"-ব্রহ্মসূত্রে সাধারণভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা জানা যায়। কৃষ্ণোপনিষদে "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপী-সুরৈঃ সহ ॥ ৭ ॥"-বাক্যে গোপ-গোপীদের সহিত তাঁহার ক্রীড়ার ( লীলার ) কথা জানা যায়। গোপালপূর্ব্বতাপনীতে "নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥ ২।৮ ॥"-বাক্যে গোবর্দ্ধন-ধারণ, পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্তাসুর-বধাদির কথা দৃষ্ট হয় এবং "গোপ-গোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥"-বাক্যে এবং "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর ॥ ২।১১ ॥"-বাক্যেও গোপীদিগের সহিত লীলাবিশেষের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদপরিশিষ্টেও কালীয়-দমনলীলার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। "কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ ॥" বিস্তৃত আলোচনা মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তই শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা পুরাণাদি-স্মৃতিপ্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে-সমস্ত প্রমাণও শ্রুতির অনুগত। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সর্ব্বতোভাবে শ্রৌত ধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

৩০শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ,
শুক্লাত্রয়োদশী, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবতিথি।
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

কৃপাপ্রার্থী
**শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**

# অবতরণিকা

## বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

# অবতরণিকা

## ১। ভিত্তি

নীলাচলে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্বাদিসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত জানা যায়।

প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীকে এবং বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকেও মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব ( বা ব্রহ্মতত্ত্ব ), জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে—অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে—শিক্ষা দান করিয়াছেন। তাহা হইতেও এই সকল তত্ত্ব-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অভিমত জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বা কথিত তত্ত্বাদিই হইতেছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার রচিত বৃহদ্ভাগবতামৃতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের টীকাদিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষারই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-নাম্নী টীকাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এবং উপদিষ্ট তত্ত্বাদিকে ভিত্তি করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আবার একখানা দার্শনিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন; এই গ্রন্থের নাম শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ। ইহা ছয়টি সন্দর্ভে বিভক্ত বলিয়া ষট্সন্দর্ভ নামেও পরিচিত। এই ছয়টী সন্দর্ভের নাম এই—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্মা-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ। এই ষট্সন্দর্ভই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ।

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীজীবগোস্বামী ব্রহ্মসন্দর্ভ লিখিলেন না কেন? শ্রীজীব তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। "ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজতে স্বয়ম্। অতোঽত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোঽপ্যবান্তরতয়া মতঃ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ॥ ৩৪॥ —ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ পাইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে; সুতরাং ব্রহ্মসন্দর্ভ অবান্তর বলিয়া মনে করা যায়।" নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে ভগবানেরই অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীজীব তাঁহার সন্দর্ভে একাধিক স্থলে তাহা দেখাইয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত; ভগবতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়া যায়। এজন্য পৃথক্ একটী ব্রহ্মসন্দর্ভ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই।

ষট্সন্দর্ভ ব্যতীত শ্রীজীবগোস্বামী আরও একখানা দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন—সর্ব্বসম্বাদিনী। এই সর্ব্বসম্বাদিনী হইতেছে ষট্সন্দর্ভেরই অনুব্যাখ্যা বা পরিশিষ্ট। সর্ব্বসম্বাদিনীতে বিশেষ-বিচারপূর্ব্বক তিনি

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদও স্থাপন করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের বিশেষত্ব।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বা তাঁহার চরণানুগত গোস্বামিপাদগণের কেহই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীপাদরামানুজা-চার্য্যাদির ন্যায় ব্রহ্মসূত্রের কোনও ধারাবাহিক ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। তবে গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের তত্ত্ব-প্রতিপাদক মুখ্যসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এক সর্ব্বসম্বাদিনীতেই অন্যূন একশত পনরটী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু। কবিরাজ গোস্বামী বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচিত তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সমস্ত তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচারের কথা এবং শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষার কথাও বিবৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে প্রায়শঃ পূর্ব্বোল্লিখিত গোস্বামিপাদগণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের একখানা ভাষ্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; এই ভাষ্যের নাম গোবিন্দভাষ্য। বিদ্যাভূষণপাদ সিদ্ধান্ত-রত্ন এবং প্রমেয়-রত্নাবলী প্রভৃতি অপরাপর তত্ত্ব-নির্ণায়ক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমাদের প্রস্তাবিত গ্রন্থে উল্লিখিত বৈষ্ণবাচার্য্যাদির গ্রন্থই প্রধান ভাবে অনুসৃত হইবে।

## ২। প্রমাণ

যাহার সহায়তায় কোনও বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে সেই বস্তুসম্বন্ধে প্রমাণ বলে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দশ রকম প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন---প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও শব্দ। সংক্ষেপে এই দশ রকম প্রমাণের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

**প্রত্যক্ষ**---মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্---এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবার ছয় রকমের। চক্ষু দ্বারা দর্শনের ফলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা চাক্ষুষ জ্ঞান; কর্ণদ্বারা শ্রবণের ফলে জাত জ্ঞানকে শ্রাবণ-জ্ঞান; নাসিকাদ্বারা গন্ধগ্রহণের ফলে জাত জ্ঞানকে ঘ্রাণজ-জ্ঞান; জিহ্বা বা রসনাদ্বারা আস্বাদনের ফলে জাত জ্ঞানকে রাসন-জ্ঞান; ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পার্শন-জ্ঞান এবং চক্ষু-কর্ণাদির সহায়তাব্যতীত কেবল মনের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মানস-জ্ঞান বলে। ইহাদেরও আবার অনেক ভেদ আছে।

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সর্ব্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। কামলা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শুভ্র শঙ্খ বা দুগ্ধকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; তাহার এই চাক্ষুষ-জ্ঞান ভ্রান্ত। কোনও কারণে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা জন্মিলে ইন্দ্রিয়-জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে। রোগাদিবশতঃ মানসিক শক্তির বিকলতা জন্মিলে মানস-জ্ঞানও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের পটুতাদি অন্যবস্তুর অপেক্ষা রাখে; তাই অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বস্তুর যথার্থ-জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

**অনুমান**—ব্যাপ্য বস্তু দেখিয়া ব্যাপকের যে জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। যেমন, কোনও স্থানে ধূম দেখিলে মনে হয়, সেস্থানে আগুন আছে। এস্থলে ধূম হইল ব্যাপ্য, আর আগুন হইল ব্যাপক। ধূম দেখিয়া আগুনের অস্তিত্বের যে জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। কিন্তু অনুমান-প্রমাণও সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। কোনও কোনও পর্ব্বত স্বভাবতঃই ধূমায়মান দেখা যায়; বাস্তবিক সেস্থানে আগুন থাকে না। এরূপস্থলে ধূম দেখিয়া আগুনের অস্তিত্বের অনুমান হইবে ভ্রান্ত। বারিপাতাদির কালে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলেও কতকক্ষণ সেস্থানে ধূম দৃষ্ট হয়; কিন্তু তখন আগুন থাকে না; এইরূপ স্থলেও ধূম-দর্শনে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান হইবে ভ্রান্ত।

**আর্ষ**—ঋষিদিগের বাক্যকে আর্ষ প্রমাণ বলে।

**উপমান**—কোনও প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্য দ্বারা অপর বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বলে উপমান। যেমন, গরু আমাদের পরিচিত; এক রকম জন্তু আছে, তাহার নাম গবয়। গরুর সঙ্গে গবয়ের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যে ব্যক্তি গবয় দেখে নাই, অথচ গবয় কি রকম, তাহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহাকে যদি বলা হয়—গবয় হইতেছে অনেকটা গরুর মতন—গো-সদৃশ গবয়—তাহা হইলে গবয়-সম্বন্ধে সেই ব্যক্তির যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা হইতেছে উপমান-জাত জ্ঞান।

**অর্থাপত্তি**—যাহা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করা যায়না, অথচ যাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়না, তাহার স্বীকৃতির অনুকূল যে কারণের কল্পনা করা হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি। যেমন, একটি লোক দিবাভাগে আহার করেনা, অথচ তাহার দেহও কৃশ হইতেছেনা; যে লোক রীতিমত আহার করে, তাহার দেহের মতনই ঐ ব্যক্তির দেহ। তাহার দেহের স্বাভাবিক অবস্থা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাহার কোনও কারণ দেখা যায় না। এস্থলে মনে করিতে হইবে—সেই ব্যক্তি দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে আহার করে। এইরূপ অর্থানুসারে কারণের কল্পনা যে প্রমাণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তি সম্বন্ধে পরে প্রসঙ্গক্রমে আরও আলোচনা করা হইবে।

**অভাব**—কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় হয়না। যেমন, একটি প্রাচীরের এক দিকে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, অপর দিকে একটা ঘট আছে; এই অবস্থায় লোকটী ঐ ঘটটীকে দেখিবেনা। সেই লোকের পক্ষে ঘটটীর অস্তিত্বের অনুপলব্ধিকে বলে অভাব-প্রমাণ।

**সম্ভব**—হাজারের মধ্যে শত আছে, এইরূপ বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা ঘটে, তাহাকে বলে সম্ভব-প্রমাণ।

**ঐতিহ্য**—কে কখন বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না; অথচ পরম্পরাক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাকে বলে ঐতিহ্য প্রমাণ।

**চেষ্টা**—অঙ্গুলি-আদির উত্তোলন পূর্ব্বক দ্রব্য ও সংখ্যাদির জ্ঞান যে প্রমাণে জন্মে, তাহার নাম চেষ্টা।

**শব্দ**—অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বাক্য। ইহাকে আপ্তবাক্যও বলে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক রচনাকে বলে পৌরুষেয় শাস্ত্র; আর যাহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, যাহা ভগবৎকর্ত্তৃকই প্রকটিত, তাহাকে বলে অপৌরুষেয় শাস্ত্র। ব্যক্তিবিশেষের রচিত গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব এমন মতও থাকিতে পারে—যাহা

অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সহিত সঙ্গতিহীন এবং কেবল লোক-প্রতীতিমূলক বাক্যও থাকিতে পারে---যাহা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বিরোধী। পৌরুষেয় শাস্ত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না।

"ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ শ্রী চৈ, চ, ১।৭।১০২ ॥"

আপ্ত বাক্য বা অপৌরুষেয়-শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহাতে ভ্রম (যে বস্তুর যে ধর্ম্ম নাই, তাহাতে সেই ধর্ম্ম আছে বলিয়া মনে করা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনার ইচ্ছা) এবং করণাপাটব (করণের বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারেনা; যেহেতু ঈশ্বর হইলেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলময় এবং পরম করুণ। *

## ৩। শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থে লিখিয়াছেন---"যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপমানার্থাপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ-প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়পুরুষ-ভ্রমাদিদোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি-দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসং বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ তস্য তদভাবাৎ। অতো রাজ্ঞা ভৃত্যানামিব তেনৈবান্যেষাং বদ্ধমূলত্বাৎ। তস্য তু নৈরপেক্ষ্যাৎ। যথাশক্তি ক্বচিদেব তস্য তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনস্য তস্য তু তান্যুপমর্দ্দ্যাপি প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। তেন প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈর্বিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ। তেষাং শক্তিভিরস্পৃশ্যে বস্তুনি তস্যৈব তু সাধকতমত্বাৎ। সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ৫-৬ পৃষ্ঠা ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥—যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা---এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে শব্দ-প্রমাণই মূল প্রমাণ; যেহেতু, শব্দ হইতেছে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব–এই দোষচতুষ্টয়রহিত বচনাত্মক। অন্যান্য প্রমাণ-সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদি-দোষ-সম্ভাবনা বশতঃ মিথ্যা-প্রতীতি ঘটিতে পারে; এইজন্য উহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রমাণ, না কি প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করা প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ-সম্বন্ধে সেই আশঙ্কা নাই। ভৃত্যগণ যেমন রাজার অপেক্ষাধীন, অন্যান্য প্রমাণগুলিও তদ্রূপ শব্দ-প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ অন্য প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে; উহা স্বতঃপ্রমাণ। স্থল-বিশেষে শব্দ-প্রমাণের যথাশক্তি সহায়রূপে

---

* যদি কেহ বলেন—বুদ্ধদেবও ঈশ্বর, ভগবানের এক অবতার। বুদ্ধদেবের বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে কিনা? সর্ব্বসম্বাদিনী-গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। "ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যম্। যেন শাস্ত্রেণ তস্য ঈশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহন-শাস্ত্র-কারিত্বেনোক্তত্বাৎ। সর্ব্বসম্বাদিনী ॥৯ পৃষ্ঠা ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥—বুদ্ধদেব ঈশ্বর হইলেও তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কেননা, যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, তিনি দৈত্যমোহন-শাস্ত্রকারী—তিনি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহ উৎপাদনের জন্যই (পরমার্থ-নির্ণয়ের জন্য নহে)।"

অন্যান্য প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দ-প্রমাণ স্বাধীন—ইহা অন্যান্য প্রমাণ-সমূহকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্যান্য প্রমাণ বিরোধ উত্থাপনে অসমর্থ। অন্যান্য প্রমাণের শক্তি যে বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্দপ্রমাণ সেস্থলেও সাধকতম।”

শ্রীজীবের এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-রহিত অপৌরুষেয় শব্দ-প্রমাণকেই তিনি মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেস্থলে অন্যান্য প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের সহায়ক হয়, সেস্থলে তাহাদের সহায়তাও তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু শব্দ-প্রমাণের প্রতিকূল কোনও প্রমাণই তিনি স্বীকার করেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, অপৌরুষেয় শাস্ত্র কি ?

## ৪। অপৌরুষেয় শাস্ত্র

মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ বলেন—“এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ ৬।৩২॥—অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ—এই সমস্তই সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের নিশ্বাস (অর্থাৎ তাঁহা হইতেই অবলীলাক্রমে প্রকটিত হইয়াছে)।”

প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত কতকগুলি উপনিষৎ আছে; এই সমস্ত উপনিষৎও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বেদ বলিতে উপনিষৎসমূহকেও বুঝায়। তাহা হইলে, মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ হইতে জানা গেল—চারি বেদ এবং চারিবেদের অন্তর্গত উপনিষৎসমূহ, ইতিহাস এবং পুরাণ—এসমস্ত হইল অপৌরুষেয় শাস্ত্র; যেহেতু, এই সমস্ত শাস্ত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে, পরন্তু পরব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকটিত, তাঁহারই বাক্য। এই সমস্ত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বাক্যই শব্দ-প্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি। “স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি॥ শ্রীচৈঃ চঃ ১।৭।১২৫॥”

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বেদে ঋষিদিগের নাম দৃষ্ট হয়, ঋষিদের নামেও বেদের কথা কথিত হইয়াছে; সুতরাং ঋষিরাই বেদের কর্ত্তা; ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন; এই অবস্থায় বেদকে অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না, নিত্যও বলা যাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (১১-১৩ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—“অতএব চ নিত্যত্বম্।”-এই ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।২৯) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ (ঋগ্বেদসংহিতা॥ ১০।৭১।৩॥)—পূর্ব্ব-সুকৃতিবলে যাজ্ঞিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভ করিয়া ঋষিদিগের হৃদয়নিহিত বেদবাক্য লাভ করেন। (‘যজ্ঞেন’ পূর্ব্বসুকৃতেন, ‘বাচো’ বেদস্য লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাম্ ঋষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ ইতি মন্ত্রার্থঃ—রত্নপ্রভাব্যাখ্যা)।” মহাভারতেও বলা হইয়াছে—“যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভুবা॥ শান্তিপর্ব্ব॥ ২১০।১৯॥—যুগান্তে বেদাদি বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যাদ্বারা ইতিহাসসহ সেই সকল বেদকে পুনরায় লাভ করেন।” সুতরাং ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন।

বেদ নিত্যসিদ্ধ, ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করেন ; ঋষিগণ বেদকে প্রাপ্ত হয়েন মাত্র ; তাঁহারা বেদের দ্রষ্টা, কিন্তু স্রষ্টা নহেন। যিনি যেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম সেই মন্ত্রের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য।

বেদে যে প্রতিকল্পে ঋষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ। বেদান্তদর্শনের "সমান-নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥১।৩।৩০॥"-এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য দুইটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ॥ —ঋগ্‌বেদসংহিতা ॥১০।১৯০।৩॥ তথৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথা। তস্মান্নানীদৃশং ক্বাপি বিশ্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ তৈ. নারা. উপ. ৬।১।৩৮॥— পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিধাতা যেমন সূর্য্য-চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী কল্পেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বরাদির নিয়ম প্রকল্পিত হইয়াছে। বিশ্ব কখনও অসদৃশভাবে সৃষ্ট হয় না।" মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও দেখা যায়—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥২৩১।৫৬-৫৭॥ —স্বয়ম্ভু সর্ব্বাগ্রে বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন ; এই বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই ; সুতরাং ইহা নিত্য। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইল, উহা হইতেই ঋষিদিগের নাম এবং বেদে যাহা কিছু দেখা যায়, তত্তাবৎ পদার্থের সৃষ্টি হইল। মহেশ্বর বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন।"

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হইয়া থাকে, বেদান্তদর্শনের ১।৩।২৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও "এত ইতি বৈ প্রজাপতি র্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄন্" ইত্যাদি এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজও ১।৩।২৭-সূত্রভাষ্যে "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি ( তৈ. ব্রা. অষ্ট ২ ; প্রশ্ন ৬, অনু ২, প. ৭ ) বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং **বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারেনা** এবং সেইজন্য **বেদের প্রামাণ্যও নিরপেক্ষ—স্বয়ংসিদ্ধ।**

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন-"ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধসর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃত-বচনলক্ষণোবেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্য-স্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্ ॥১০॥ —সত্যানন্দগোস্বামিসংস্করণ ॥— ( ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-সম্ভাবনাবশতঃ প্রত্যক্ষাদি ) পূর্ব্বকথিত প্রমাণসমূহ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য এবং আশ্চর্য্য-স্বভাব-বিশিষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে অনাদিসিদ্ধ, সর্ব্বপুরুষ-পরম্পরায় আগত, লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র নিদান, অপ্রাকৃত-বাক্যস্বরূপ বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ।"

## ৫। প্রমেয় বস্তু

যে তত্ত্বটী সম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া শ্রীজীব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বটি কি বস্তু, তাহা জানিলে তাঁহার উক্তির সারবত্তা বুঝা যাইবে। শ্রীজীব বলিয়াছেন—সেই তত্ত্বটি সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য এবং আশ্চর্য্যস্বভাববিশিষ্ট। কি সেই বস্তুটি ? ইহাই দর্শন-শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু।

আপাতঃদৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সংখ্যায় একাধিক বলিয়া মনে হইলেও মূল তত্ত্ব কিন্তু একটি—ব্রহ্মতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্বাদি অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বই এই ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গীভূত, তদ্রূপ। বৃক্ষকে জানিতে পারিলেই তাহার শাখাপ্রশাখাদিকেও জানা হইয়া যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই যে সমস্তই জানা হইয়া যায়, অজ্ঞাত আর কিছু থাকে না—একথা শ্রুতিশাস্ত্র একাধিক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাক্যে উপনিষৎ জানাইয়া গিয়াছেন—এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বাদি সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেরই এক রকম বিকাশ; ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোথাও কিছু নাই। "ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি॥ ১।৮॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব।" এই বিশ্ব হইল কালের প্রভাবের অধীন। যাহা কালাতীত, তাহাও ব্রহ্ম। "ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব॥ মাণ্ডুক্যশ্রুতি॥১॥—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছুআছে, তাহাও এই ওঙ্কারই অর্থাৎ ব্রহ্মই।" আরও বলা হইয়াছে—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥মাণ্ডুক্য॥৬॥—ইনি (এই ওঙ্কার বা ব্রহ্ম) সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান।" সকলের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান বলিয়া ব্রহ্মই সর্ব্বাশ্রয়; জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন, জগতের মধ্যে থাকিয়াও জগতের সহিত তাঁহার যোগ নাই, ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য এবং অচিন্ত্য স্বভাব এবং শক্তি এবং ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বাতীতত্বও সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ ব্রহ্মতত্ত্বের কথাই শ্রীজীব বলিয়াছেন।

## ৬। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর

ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। আমাদের নিকটে, ভিতরে এবং বাহিরেও ব্রহ্ম আছেন। কিন্তু চক্ষু-কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারাই আমরা তাঁহার কোনওরূপ উপলব্ধি পাই না। তাহার কারণ এই যে, আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত—প্রকৃতি বা মায়া হইতে জাত। এই প্রকৃতি বা মায়া হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু। আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত, জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু। এজন্য আমরা কোনওরূপেই ব্রহ্মের উপলব্ধি পাই না। যেহেতু, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর॥ শ্রী চৈঃ চঃ ২।৯।১৭৯॥" অপ্রাকৃত বস্তু আমাদের চিন্তারও অতীত; যেহেতু, আমরা চিন্তা বা বিচার বা তর্ক করি আমাদের মন, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সহায়তায়; কিন্তু আমাদের মন, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা—সমস্তই প্রাকৃত এবং প্রাকৃত জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; প্রকৃতির অতীত কোনও বস্তুতে এই সমস্ত পৌঁছাইতে পারে না। তাই প্রকৃতির অতীত বস্তুমাত্রই আমাদের অচিন্ত্য—চিন্তার বা বিচারের বা তর্কের অতীত। এজন্যই মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে বলা হইয়াছে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্

—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা অচিন্ত্য। অচিন্ত্য-বস্তুসম্বন্ধে ( প্রাকৃতবুদ্ধিমূলক ) তর্কের অবতারণা করিবেনা ( যেহেতু, এইরূপ তর্কের দ্বারা কোনও অচিন্ত্য-বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না )।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্বীয় উক্তির সমর্থনে একাধিক স্থলে উল্লিখিত উদ্যোগপর্ব্ব-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রকৃতির অতীত বলিয়া ব্রহ্মও হইতেছেন অচিন্ত্য বস্তু, সুতরাং জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের এবং তর্কাদিরও অগোচর। "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও (২।১।১১) তাহাই বলিয়াছেন।

## ৭। ব্রহ্ম একমাত্র শ্রুতিবেদ্য

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? উপায় হইতেছে একমাত্র অপৌরুষেয় শাস্ত্র; শাস্ত্রই ব্রহ্মের পরিচয় দিতে সমর্থ, অপর কেহ সমর্থ নহে। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩)", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ (২।১।২৭)" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রও তাহাই বলেন। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রের ভাষ্যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ঋগ্‌বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে।—ব্রহ্মের স্বরূপ যথাযথরূপে জানিবার পক্ষে ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রই হইতেছে প্রমাণ।" এবং "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" সূত্রের ভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকম্।—শব্দই (বেদাদি অপৌরুষেয় শাস্ত্রের বাক্যই) ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদিজাত প্রত্যক্ষাদি এই বিষয়ে প্রমাণ নহে।" শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও তাহাই জানা যায়।

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥ শ্রী ভাঃ ১১।২০।৪ ॥

—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—মুক্তি ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য-সাধন-বিষয়েও তোমার ( শ্রীকৃষ্ণের ) বাক্যরূপ বেদই পিতৃগণের, দেবগণের এবং মনুষ্যগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্বরূপ।"

এই শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তি হইতেও জানা গেল, বেদই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং বেদান্তসূত্রেরও অনুমোদিত এবং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও অনুমোদিত।

## ৮। ইতিহাস-পুরাণের বেদত্ব

কিন্তু **বেদ বলিতে কি বুঝায়?** পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২০।৪ শ্লোকের টীকায় "তব বেদঃ"-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "তব ত্বদ্‌বাক্যরূপো বেদঃ—তোমার ( পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ) বাক্যরূপ বেদ।" ইহাতে স্বামিপাদ বলিলেন—পরব্রহ্মের বাক্যই বেদ।

পূর্ব্বোল্লিখিত মৈত্রেয়ী-উপনিষদের বাক্য হইতে জানা গিয়াছে—চারিবেদ এবং চারিবেদান্তর্গত উপনিষৎ, ইতিহাস এবং পুরাণ-এসমস্ত হইতেছে পরব্রহ্মের নিশ্বাস বা অবলীলায় প্রকটিত বাক্য। সুতরাং চারিবেদ এবং তদন্তর্গত উপনিষৎসমূহের ন্যায় ইতিহাস এবং পুরাণও ভগবানের বাক্য এবং অপৌরুষেয়-শাস্ত্র বলিয়া বেদশব্দের বাচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদম্। ৩।১২।৩৯॥—ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পঞ্চম বেদ।"

ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝায়। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সর্ব্বোপনিষৎসার বলা হয়। ইহাদ্বারাও মহাভারতরূপ ইতিহাসের বেদত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

ঋগ্যজুরাদি বেদে অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে যাহা লিখিত হইয়াছে, ইতিহাস-পুরাণে তাহাই বিশদ্ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতে এবং মনুসংহিতাতেও বলা হইয়াছে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপ-বৃংহয়েদিতি॥ (তত্ত্বসন্দর্ভ।১২। ধৃত প্রমাণ)—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থকে স্পষ্ট করিতে হইবে।" অন্যত্রও "পূরণাৎ পুরাণম্—বেদার্থ-পরিপূরক শাস্ত্রই পুরাণ"—এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যাহা বেদ নয়, তাহা দ্বারা বেদার্থের পূরণ সম্ভব নয়। যাহা বেদবহির্ভূত, তাহা দ্বারাও বেদার্থ স্পষ্টীকৃত হইতে পারে না। এ জন্যই বলা হইয়াছে—"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ। ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্। ইত্যাদি। তত্ত্বসন্দর্ভধৃত বচন॥—পুরাণ পঞ্চমবেদ। মহাভারত যাহার পঞ্চম, এমন বেদ সকল অধ্যাপন করিয়াছিলেন।" ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানা যায়—"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্॥ তত্ত্বসন্দর্ভ॥ ১৩॥ ধৃত-বচন॥—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারত পঞ্চম বেদ।"

এ স্থলে যে সকল প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। ছান্দোগ্য-উপনিষদে একটী বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই ঃ—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ (৭।১।২)॥—হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদ এবং প্রসিদ্ধ বেদসকলের মধ্যে যাহা বেদ বলিয়া পরিগণিত, সেই ইতিহাস-পুরাণ-নামক পঞ্চম বেদও অধ্যয়ন করিতেছি।" এই শ্রুতিবাক্যে ইতিহাস ও পুরাণকে স্পষ্টাক্ষরেই পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (১৫-অনুচ্ছেদে) ইতিহাস-পুরাণের বেদার্থ-নির্ণায়কত্বসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।"
"বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্রশংসয়ঃ। ইত্যাদি।"

—মহাভারতব্যপদেশে বেদের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদসকল যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদও অপৌরুষেয়, ইতিহাস-পুরাণও অপৌরুষেয়। তাহাদের তাৎপর্য্যও এক এবং অভিন্ন। এই হিসাবে বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণে কোনও ভেদ নাই। ইহাদের ভেদের কারণ কেবলমাত্র স্বরক্রম, অর্থাৎ ঋক্-আদিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বিশেষ বিধি আছে; ইতিহাস-পুরাণ-ভাগে ঐরূপ স্বরের কোনও নিয়ম নাই। "বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্য অপৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বরক্রমভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে॥ তত্ত্বসন্দর্ভধৃত-প্রমাণ।১২-অনুচ্ছেদ॥"

পুরাণেতিহাস-সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ হইতে শ্রীসূতগোস্বামীর একটী বাক্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (১৪-অনুচ্ছেদে) উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :—

"ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ॥
এক আসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়" ইতি।

—শ্রীসূত বলিতেছেন—"ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ বেদব্যাস ইতিহাস-পুরাণের বক্তারূপে আমাকে সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন; বেদব্যাস ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়-নিষ্পাদ্য চাতুর্হোত্ররূপ যজ্ঞের সৌকর্য্যার্থই এইরূপ বিভাগ করা হয়। আগে এক বেদ হইতেই চারিজন ঋত্বিকের কর্ম্মানুসন্ধান করিতে হইত। পরে, বেদীনির্ম্মাণ-প্রভৃতি যজ্ঞশরীর-সম্পাদনরূপ অধ্বর্য্যুর অধ্বর-ক্রিয়া যজুর্ব্বেদ-বিভাগে, বেদীতে-হোমাদি-যজ্ঞালঙ্কার-সম্পাদনরূপ হোতার হোতৃক্রিয়া ঋগ্বেদ-বিভাগে, হোমাদি-সমকালে উদ্‌গাতার শ্রীবিষ্ণুস্মরণাদি উদ্‌গান-ক্রিয়া সামবেদ-বিভাগে এবং ত্রুটিসংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি ব্রহ্মার ব্রহ্মক্রিয়া অথর্ব্ববেদ-বিভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাণার্থ-বিশারদ মহর্ষি বেদের অন্তর্গত আখ্যান (স্বয়ং দৃষ্টবিষয়ের কথন হইতেছে আখ্যান), উপাখ্যান (শ্রুতবিষয়ের কথন হইতেছে উপাখ্যান), গাথা (পিতৃ ও পৃথ্বী প্রভৃতির গীতি হইতেছে গাথা) এবং কল্পশুদ্ধি (শ্রাদ্ধকল্পাদি-নির্ণয় হইতেছে কল্পশুদ্ধি) দ্বারা পুরাণেতিহাস রচনা করিয়াছেন। বেদচতুষ্টয়াত্মক যজুর্ব্বেদে যাহা অপ্রকাশিত (অবশিষ্ট) ছিল, তাহাই পুরাণে ও ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।"

ঋত্বিক-চতুষ্টয়-সম্পাদ্য চাতুর্হোত্র-যজ্ঞ যেভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, ঋগাদি চতুর্ব্বেদ হইতে তাহা জানা যায়; পুরাণেতিহাস হইতে তাহা জানা যায় না। অথচ বেদের অন্তর্গত আখ্যান-উপাখ্যানাদির যোগে বেদে যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, অথবা যে তথ্যের ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে, পুরাণেতিহাসে তাহাই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এজন্য পুরাণেতিহাসকে পঞ্চমবেদ বলা হয়—ইহাই বায়ুপুরাণস্থ সূতবাক্য হইতে জানা যায়।

উল্লিখিত বায়ুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করার পরে শ্রীজীবগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম-যজ্ঞাধ্যয়নে চ বিনিয়োগো দৃশ্যতেঽমীষাম্। 'যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানীতি।' সোঽপি নাবেদত্বে সম্ভবতি।—

ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেও এই ইতিহাস-পুরাণাদির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস-পুরাণ যদি বেদ না হইত, তাহা হইলে এই ভাবে তাহাদের বিনিয়োগ সম্ভব হইত না।"

উল্লিখিত স্মৃতিশ্রুতি-প্রমাণসমূহের বলেই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী—চারিবেদ এবং তদন্তর্গত উপনিষৎ-সমূহের ন্যায় ইতিহাস-পুরাণকেও বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

## ৯। পুরাণ-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বে অপৌরুষেয়-শাস্ত্র সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী-শ্রুতির যে বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—"ইতিহাসঃ পুরাণম্।" ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও লিখিত হইয়াছে—"অধ্যেমি ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" উভয় শ্রুতিবাক্যেই "ইতিহাস"-শব্দও একবচনান্ত এবং "পুরাণ"-শব্দও একবচনান্ত। ইতিহাস—একখানি গ্রন্থই—মহাভারত; সুতরাং "ইতিহাস"-শব্দকে একবচনান্ত করার হেতু বুঝা যায়। কিন্তু আমরা অনেক পুরাণ দেখিতে পাই। তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যে "পুরাণ-"শব্দ কি জাতিবাচক একবচনান্ত, না কি বস্তুতঃ মহাভারতের ন্যায় কেবলমাত্র একখানি পুরাণ বুঝাইবার জন্যই একবচনান্ত করা হইয়াছে? মৎস্যপুরাণ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

মৎস্যপুরাণ বলেন—কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল; তাহা ছিল শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ; এই পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন এবং পাবন।

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৫৩।৪

ইহা ভগবান্ মৎস্যদেবের উক্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন—

নির্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্॥
মীমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়াকৃতম্।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে॥
অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ।
শ্রুত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতি দেবান্ চতুর্ম্মুখঃ॥
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্যাভবৎ ততঃ।
কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ॥
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা॥
তথাষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ ৫৩।৫-১০

—"লোক সকল দগ্ধ হইয়া গেলে, আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গসকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়-বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রহণান্তে সম্পাদিত করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় একার্ণবজলের অভ্যন্তরে অবস্থানকরতঃ ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুর্ম্মুখ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ সকল প্রবর্ত্তিত হইল। হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ-প্রস্তাব গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা প্রবর্ত্তন ( সঙ্কলন ) করিয়া থাকি। প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোক-সম্বলিত পুরাণ অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে আমি প্রকাশ করি। এই দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটি-শ্লোক-সংখ্যক পুরাণ প্রচলিত আছে।"

পুরাণের লক্ষণও মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় ঃ—

"পঞ্চাঙ্গানি পুরাণেষু আখ্যানকমিতি স্মৃতম্।
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥৫৪।৬৪ ॥

—পুরাণ-গ্রন্থ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত এবং নানা আখ্যান সমন্বিত। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পাঁচটী হইতেছে পুরাণের লক্ষণ।"

## ১০। পুরাণ তিন শ্রেণীর

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন শ্রেণীর পুরাণ আছে। শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ অনুসারে এই তিন শ্রেণীর পুরাণসমূহের নাম এস্থলে লিখিত হইতেছে।

**সাত্ত্বিক পুরাণ**—বিষ্ণুপুরাণ, নারদায়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ।

**রাজসিক পুরাণ**—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বামনপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ।

**তামসিক পুরাণ**—মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণ।

শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণবচনে জানা যায়—সাত্ত্বিকপুরাণ মোক্ষদ, রাজসপুরাণ স্বর্গদ, তামসপুরাণ নিরয়-প্রাপক।

সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়-প্রাপ্তি-হেতবঃ ॥ পাদ্মোত্তরখণ্ড ॥৪৩শ অধ্যায়।

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়—সাত্ত্বিকপুরাণে শ্রীহরির মাহাত্ম্যই সমধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাজসপুরাণে ব্রহ্মার ও অগ্নির মাহাত্ম্য এবং তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ ॥ মৎস্যপুরাণ ॥৫৪।৬৭-৬৮॥

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—রাজস-পুরাণে যে অগ্নির মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে, তত্তৎ-অগ্নিতে প্রতিপাদ্য যজ্ঞের মাহাত্ম্য এবং তামসপুরাণ-সম্বন্ধে যে "শিবস্য চ" বলা হইয়াছে, তদন্তর্গত "চ"-শব্দে "শিবার বা ভগবতীর মাহাত্ম্য" সূচিত হইতেছে। "অত্রাগ্নেস্তত্তদগ্নৌ প্রতিপাদ্যস্য তত্তদ্‌যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। শিবস্য চেতি চ-কারাচ্ছিবায়াশ্চ॥ "তত্ত্বসন্দর্ভঃ।১৭॥"

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—পরমার্থ-বিষয়ে সাত্ত্বিক-পুরাণেরই মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক। যেহেতু, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মায়িক গুণের মধ্যে জ্ঞানের দ্বার বলিয়া সত্ত্বগুণেরই উৎকর্ষ। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" এবং "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি", "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনমিতি" ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ।১৮॥"

## ১১। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব

সাত্ত্বিক-পুরাণসমূহের মধ্যে আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতই শ্রেষ্ঠ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"শ্রীমদ্‌ভাগবতস্য ভগবৎপ্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেন চ পরমসাত্ত্বিকত্বম্—শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভক্তগণেরও অভীষ্ট বলিয়া পরমসাত্ত্বিক।" এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীব শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উক্তি এইরূপ :—

পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো হরেঃ।
চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্য চ ভূপতে॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ॥ ২০ অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ॥

—হে ভূপতে! তুমি কি শ্রীহরির সম্মুখে শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ পাঠ কর—যাহাতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর এবং প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে?

উক্ত পুরাণে ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গেও অম্বরীষের প্রতি গৌতমের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

রাত্রৌ তু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা।
গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতম্।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণম্॥-তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২০ অনুচ্ছেদে ধৃত প্রমাণ॥

—ব্যঞ্জুলী মহদ্বাদশীতে রাত্রি জাগরণ করতঃ বিষ্ণুর লীলাকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য এবং ভগবানের সন্তোষ-বিধানের জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা, সহস্রনাম-স্তোত্র এবং শুকপ্রোক্ত পুরাণ ( শ্রীমদ্‌ভাগবত ) যত্নের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পদ্মপুরাণের অন্যস্থলেও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ দৃষ্ট হয় :—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥-তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২০ অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ॥

—হে অম্বরীষ ! যদি ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত নিত্য শ্রবণ কর, অথবা নিত্য নিজ মুখে পাঠ কর।

স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে ঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২০ অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ ॥

—শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করতঃ যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন, কুলবৃন্দের সহিত তিনি ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—শ্রীমদ্‌ভাগবত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিজনক। ইহা হইতে সাত্ত্বিক-পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুরাণ-শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক অনেক শাস্ত্রবচন শ্রীজীব তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এস্থলে কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

গরুড়-পুরাণ হইতে জানা যায় ঃ—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২১-অনুচ্ছেদ-ধৃত-প্রমাণ ॥

—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-নামক গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশস্কন্দযুক্ত, শতবিচ্ছেদযুক্ত এবং অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের ( মহাভারতের অর্থের ) নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক। বেদসমূহের মধ্যে সামবেদের ন্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছেন পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুরাণ-শ্রেষ্ঠত্বের কথা অন্যত্রও দৃষ্ট হয় ঃ—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬ ॥

—নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবসমূহের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবসমূহের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণসমূহের মধ্যেও তেমনি ইহা ( শ্রীমদ্‌ভাগবত ) শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছেন সর্ব্ববেদান্তসার ঃ—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ ॥ শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৫ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সারস্বরূপ। শ্রীমদ্‌ভাগবত-রসামৃত-পানে যিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য কোনও বিষয়ে রতি জন্মেনা।

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্। শ্রীভাঃ ১।৩।৪২ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতে সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে।

তত্ত্বসন্দর্ভধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন হইতেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুরাণশ্রেষ্ঠত্বের কথা জানা যায় ঃ—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ॥

* * *

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২২-অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ ॥

—এই কলিকালে যাঁহার গৃহে শ্রীমদ্‌ভাগবত নাই, তাঁহার অপরাপর শতসহস্র শাস্ত্রগ্রন্থের সংগ্রহই বৃথা। * * *। যিনি সংযতচিত্ত হইয়া নিত্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন।

## ১২। শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবির্ভাব

শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবির্ভাবের ইতিহাস যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও পরমার্থ-বিষয়ে এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। ইতিহাসটী এইরূপ ঃ—

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথমস্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় হইতে জানা যায়—ব্যাসদেব লোকের কল্যাণের জন্য বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মহাভারতও প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মনের সম্যক্ প্রসন্নতা জন্মে নাই। একদিন তিনি সরস্বতী-নদীর তীরে এক নির্জন স্থানে বসিয়া তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতার হেতু সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তিনি মনে করিলেন—পরমহংসদিগের প্রিয় বস্তু যে ভাগবতধর্ম্ম, তাহা বাহুল্যরূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি আমার চিত্তের এইরূপ অপ্রসন্নতা ? বস্তুতঃ ভাগবতধর্ম্মই ভগবানের প্রিয়। "কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ শ্রীভাঃ ১।৪।৩১॥" এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপনীত হইয়া ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকহিতার্থ তুমি অনেক কিছু করিয়াছ; সনাতন ব্রহ্মের স্বরূপও (তোমার ব্রহ্মসূত্রে তুমি) নির্ণয় করিয়াছ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিও তোমার হইয়াছে। তথাপি অকৃতার্থের ন্যায় তোমাকে অপ্রসন্ন দেখাইতেছে কেন ?" তখন ব্যাসদেব বলিলেন—"দেবর্ষি, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু আমার মনের অপ্রসন্নতা কেন, কৃপা করিয়া আপনি তাহা বলুন।" তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন ঃ—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্।

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥
ন যদ্‌বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ॥শ্রীভাঃ ১।৫।৮-১০॥

—মুনিবর্য্য! তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ বাহুল্যে বর্ণন কর নাই। ভগবানের যশঃকথা বর্ণন না করিলে কেবল ধর্ম্মাদির জ্ঞানে ভগবান্ পরিতুষ্ট হয়েন না। ইহাই তোমার ন্যূনতা বলিয়া মনে হইতেছে। তোমার গ্রন্থে তুমি ধর্ম্মাদির যেরূপ বাহুল্যে বর্ণনা করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেইরূপ বাহুল্যে কীর্ত্তন কর নাই। গুণালঙ্কারাদি-যুক্ত বিচিত্রপদ-সম্বলিত গ্রন্থ যদি জগৎ-পবিত্রকারক শ্রীহরির যশঃ প্রকাশ না করে, জ্ঞানিগণ তাহাকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী পুরুষদিগের চিত্ত-বিনোদক) বলিয়া মনে করেন; সত্ত্বপ্রধান মনে রমণশীল পরমহংসগণ তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন না।

দেবর্ষি আরও বলিলেন ঃ—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥ শ্রীভাঃ ১।৫।১৩॥

—হে মহাভাগ! তুমি যথার্থদর্শী, নির্ম্মলযশা, সত্যপরায়ণ এবং তুমি শমদমাদি ব্রত ধারণ করিয়াছ; মায়াবন্ধ-বিমোচনের জন্য চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা (সমাধি দ্বারা) উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বর্ণন কর।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা॥ শ্রীভাঃ ১।৫।৪০॥

—হে অদভ্রশ্রুত (সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব), যদ্দ্বারা পণ্ডিতদিগের জ্ঞানপিপাসা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, যাহা ব্যতীত বারম্বার দুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীবসকলের ক্লেশ নিবারণের আর অন্য উপায় নাই, পরমেশ্বরের সেই যশঃ তুমি প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন কর।

দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের নিকটে স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি ভগবদ্ভক্তগণের এবং ভগবানের কৃপার কথাও বলিলেন, পরে যদৃচ্ছাক্রমে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

নারদের উপদেশানুসারে ব্যাসদেব সরস্বতী-নদীতীরস্থ স্বীয় আশ্রমে, মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ভক্তিযোগের প্রভাবে তাঁহার নির্ম্মলচিত্ত যখন সমাধিস্থ হইল, তখন তিনি পূর্ণতম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত স্বরূপ-শক্তিকে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাস্থানীয় ভগবৎস্বরূপ-সমূহকে এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব ব্রহ্মকেও দর্শন করিলেন। আর যাহার প্রভাবে স্বরূপতঃ চিৎ-স্বরূপ হইয়াও—সুতরাং স্বরূপতঃ মায়িকগুণমুক্ত হইয়াও—জীব নিজেকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতা সেই বহিরঙ্গা মায়ার দর্শনও পাইলেন। তারপর, যাহা হইতে মায়াজনিত অনর্থ দূরীভূত হইতে পারে, অধোক্ষজ ভগবানে তাদৃশ ভক্তিযোগকেও (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিযোগকেও) দর্শন করিলেন। এই সমস্ত দর্শন করিয়া ব্যাসদেব অজ্ঞানাহত অখিল লোকের মঙ্গলার্থ সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রবর্ত্তিত করিলেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মন্যতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ শ্রীভাঃ ১।৭।৪-৬॥

টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি নিরুপাধিশ্চ বর্ত্ততে বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাবষ্টম্ভেন। তথা, কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্। আকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ যজেত পুরুষং পরমিত্যস্য বাক্যদ্বয়স্য পূর্ব্ববাক্যে পুরুষং পরং প্রকৃত্যুপাধিং উত্তরবাক্যে পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিমিতি টীকানুসারেণ (শ্রীধরস্বামিটীকানুসারেণ) পূর্ণঃ পুরুষোঽত্র স্বয়ংভগবানেবোচ্যতে। তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তিমন্তমেবেত্যেতৎ স্বয়মেব লব্ধম্। পূর্ণচন্দ্রমপশ্যদিত্যুক্তে কান্তিমন্তমপশ্যদিতি হি লভ্যত এব। বক্ষ্যতে চ। ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনীতি। অতএব মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিত্যনেন তস্মিন্ অপ অপকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্যাঃ নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়য়া ন স্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে। বক্ষ্যতে চ। মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানেতি। স্বরূপশক্তিরিয়মত্রৈব ব্যক্তীভবিষ্যতি। অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যনেন। আত্মারামাশ্চ মুনয় ইত্যনেন চ। পূর্ব্বত্র হি ভক্তিযোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে। পরত্র তে গুণা ব্রহ্মানন্দস্যাপ্যুপরিচরতয়া স্বরূপশক্তেঃ পরমবৃত্তিতায়ামেবার্হন্তি। মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্তু তদংশত্বেন ব্রহ্ম চ তদীয়নির্ব্বিশেষাবির্ভাবরূপত্বেন তদন্তর্ভাবেনাপৃথগ্‌দৃষ্টত্বাৎ পৃথঙ্‌নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—"পুরুষং পুরুষাকারং পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণে পরমপুরুষে ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। পূর্ণমিতিপদেন তস্য স্বরূপভূতাং চিচ্ছক্তিং অংশকলাবতারান্। পূর্ত্তিলিঙ্গেন ব্রহ্ম চ অপশ্যদিতি গম্যতে। পূর্ণং চন্দ্রমপশ্যদিত্যুক্তে চন্দ্রস্য কান্তিরংশকলানাঞ্চ পূর্ত্তেশ্চ দর্শনং স্বতএব ভবেদিত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য বহিরঙ্গায়াঃ শক্তেঃ মায়ায়াঃ তদ্বিপরীতধর্ম্মবত্যাঃ তদ্দর্শনেন দর্শনং ন ভবতীতি তাং পৃথগুল্লিখতি মায়াং চেতি।"

ব্যাসদেব যখন ধ্যান করিতেছিলেন, তখন আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপনীত হইয়া ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকী * প্রকাশ

---

* চতুঃশ্লোকী :—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্ নিজে ব্রহ্মার নিকট এই চতুঃশ্লোকী ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মা আবার নারদের নিকটে একটু বিস্তৃত ভাবে এই চতুঃশ্লোকী প্রকাশ করেন; তাহাই নারদও ব্যাসদেবের নিকটে প্রকাশ করেন। শ্রীভা. ( ২।৯।৪৩-৪৪ )।

এই সম্বন্ধে বারাণসীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ ॥
চারিবেদ উপনিষদ্—যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোকনিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ ॥

শ্রীচৈ. চ. ২।২৫।৭৮-৮৪ ॥

বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যৎখলু সর্ব্বপুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। তথাহি তৎস্বরূপং মাৎস্যে। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্‌ভাগবতমিষ্যতে ॥ ( মৎস্যপুরাণ ॥ ৫৩।২১ ॥) ॥—ভগবান্ বেদব্যাস সমস্ত পুরাণাদি প্রকটিত করার পরে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন পরিতুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজকৃত সূত্রসমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত

---

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥

শ্রীভা. ২।৯।৩২-৩৫

সমাধি-অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে সকল শাস্ত্রেরই সমন্বয় দৃষ্ট হয়। যেহেতু, সমস্ত বেদার্থের সূত্রস্বরূপ যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গায়ত্রী অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা মৎস্যপুরাণ হইতেও জানা যায়—যাহাতে গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবিস্তর ( পরমধর্ম্ম ) বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত-নামে অভিহিত।"

## ১৪। পরমধর্ম্ম

পরম-ধর্ম্মের বিবরণই শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদিতে ধর্ম্মের কথাই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু পরম-ধর্ম্মের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের "কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।" ইত্যাদি ( ১।৪।৩১ )-শ্লোকে যে ভাগবত-ধর্ম্ম বাহুল্যে নিরূপিত হয় নাই বলিয়া ব্যাসদেবের চিত্তে অপ্রসন্নতা জন্মিয়াছিল এবং "ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।"-ইত্যাদি ( শ্রীভা. ১।৫।৮-১০ ) শ্লোকে দেবর্ষি নারদও যে ভাগবত-ধর্ম্মের সূত্রাকারে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভাগবত-ধর্ম্মই হইতেছে—পরমধর্ম্ম। এই পরম-ধর্ম্মই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তু, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে এবং সেস্থলে পরম-ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণটিও বলা হইয়াছে—নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্॥ ১।১।২ ॥—নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুষ্ঠেয় 'প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্ম' এই গ্রন্থে ( শ্রীমদ্ভাগবতে ) বর্ণিত হইয়াছে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। অধিকারিতোঽপি পরমত্বমাহ। নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যম্।"

টীকার তাৎপর্য্য ঃ—"ধর্ম্মঃ"-ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের হেতু এই যে—এই ধর্ম্মে ( ধর্ম্মানুষ্ঠানে ) ফলাভিসন্ধানরূপ কৈতব ( বা কপটতা ) প্রকৃষ্টরূপে বর্জ্জিত হইয়াছে। প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে। ( ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগের বাসনা, এমন কি, সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনা পর্য্যন্ত, প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয় যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। তাহা হইলে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাধকের লক্ষ্য কি ? তাহাই বলা হইতেছে ) এই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ হইতেছে—কেবল ঈশ্বরের আরাধনা, ( একমাত্র ভগবানের প্রীতিবিধানের বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা সাধকের চিত্তে থাকে না )। এতাদৃশ পরম-ধর্ম্মই এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপে, কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক ( নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক ) শাস্ত্র হইতেও এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত

হইতেছে—বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্—ইত্যাদি বাক্যে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরমার্থভূত বস্তু নিরূপিত হইয়াছে।”

পরম-ধর্ম্মের লক্ষণ হইতেছে এই যে—ইহাতে একমাত্র কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা-বাসনাই থাকে, স্বসুখ-বাসনা বা স্ব-দুঃখনিবৃত্তির বাসনা ইহাতে থাকে না। মুক্তি-বাসনা বা মোক্ষ-বাসনা হইতেছে স্ব-দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা—মায়াবন্ধন হইতে, মায়াবন্ধন-জনিত জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভের বাসনা। ইহাও ইহকালের সুখসম্পদের বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখবাসনার ন্যায় নিজের জন্য কিছু চাওয়া। পরম-ধর্ম্মের সাধক নিজের জন্য কিছুই চাহেন না ; সুতরাং তিনি মুক্তিও চাহেন না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক পুরাণসমূহ মোক্ষদ বলিয়া অন্যান্য পুরাণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতও একটি সাত্ত্বিক পুরাণ। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরম-ধর্ম্মে যদি মোক্ষ-বাসনাই না থাকে, তাহা হইলে পরম-ধর্ম্মের সাধক মায়া বন্ধন হইতে কিরূপেই বা মুক্তিলাভ করিবেন ? আর, মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে পরম-ধর্ম্মই বা কিরূপে মোক্ষদ হইতে পারে এবং পরম-ধর্ম্মের প্রতিপাদক শ্রীমদ্‌ভাগবতই বা কিরূপে মোক্ষদ সাত্ত্বিক-পুরাণরূপে পরিগণিত—সুতরাং পুরাণশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত—হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে পরম-ধর্ম্মের সাধক ভগবচ্চরণ-সেবা এবং ভগবচ্চরণ-সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, মায়াবন্ধন আপনা-আপনিই, বিনা প্রচেষ্টায়, আনুষঙ্গিক ভাবেই দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রুতিও বলেন—পরতত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলে মায়াজনিত হৃদয়গ্রন্থি, সর্ব্ববিধ সংশয় এবং ( প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য ) সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অবসান হয়, সুতরাং মায়া বন্ধনেরও অবসান হইয়া যায়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ॥ ২।২।৮ ॥

সুতরাং পরম-ধর্ম্মের সাধকের মুক্তিবাসনা না থাকিলেও ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ মুক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি বলা হয়। ( এই বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখক-সম্পাদিত গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে “মুক্তি”-নামক প্রবন্ধের “ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি”-অংশ দেখিতে পারেন )। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরম-ধর্ম্ম যে আনুষঙ্গিক ভাবেই মোক্ষদ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতও যে মোক্ষদ সাত্ত্বিক পুরাণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না ; অধিকন্তু, যে ভগবচ্চরণ-সেবা-লাভের আনুষঙ্গিক ভাবেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহা যে পরমার্থ-শিরোমণি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যান্য কোনও পুরাণে এই ভগবচ্চরণ-সেবা-প্রাপক পরম-ধর্ম্মের কথা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই বলিয়া এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতই হইল পুরাণ-শিরোমণি।

পূর্ব্বোদ্ধৃত গরুড়-পুরাণ-বচনে জানা গিয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছে “সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ—সাক্ষাৎ

ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত।" পূর্ব্বোদ্ধৃত মৎস্যপুরাণ-বচন হইতেও জানা গিয়াছে—অন্যান্য পুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতকেও ভগবান্ই ব্যাসরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থটি যে অন্যান্য অপৌরুষেয় শাস্ত্রের ন্যায় অপৌরুষেয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে—শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর এবং ব্রহ্মসূত্রের ( স্বয়ং সূত্রকার ব্যাসদেবের দ্বারা প্রকটিত বলিয়া অকৃত্রিম ) ভাষ্যস্বরূপ ; ইহাতে সমস্ত বেদেতিহাসের সার সন্নিবেশিত হইয়াছে, সমস্ত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সমন্বয় করা হইয়াছে, বেদার্থের দ্বারা ইহা পরিবর্দ্ধিত, ইহা মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক এবং ইহাতে পরম-ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে—যে পরম-ধর্ম্ম হইতেছে চারি পুরুষার্থের অতীত। এই সমস্ত কারণেই শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন "পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ—এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ।"

## পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার সার মর্ম্ম

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই ঃ—শব্দ-প্রমাণই মুখ্যপ্রমাণ ; অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণ যদি শব্দ-প্রমাণের সহায়ক হয়, অর্থাৎ শব্দ-কথিত তত্ত্ব-নির্ণয়ের আনুকূল্য করে, তাহা হইলে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে, অন্যথা নহে। শব্দ বলিতে অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্যকে বুঝায়। চারি বেদ ও তদন্তর্গত উপনিষৎসমূহ, ইতিহাস ( মহাভারত ) এবং পুরাণ—এই সমস্ত হইল অপৌরুষেয় শাস্ত্র। পুরাণ তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পরমার্থ-বিষয়ে রাজসিক ও তামসিক পুরাণ অপেক্ষা সাত্ত্বিক পুরাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব ; সাত্ত্বিক পুরাণ সমূহের মধ্যে আবার শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শব্দ-প্রমাণকেই মূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অপৌরুষেয় শব্দকে আপ্তবাক্যও বলা হয়। অপৌরুষেয় বলিয়া শাস্ত্রবাক্য হইতেছে নিত্য, অনাদি।

## ১৫। বিদ্বদনুভব

বিদ্বদনুভব বা বিজ্ঞানুভবও একটী প্রমাণ। যিনি কোনও তত্ত্বের যথার্থ অনুভব—অপরোক্ষ অনুভব—লাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাকে বিদ্বান্ বা বিজ্ঞ বলা হয় এবং তাঁহার অনুভবকে বিদ্বদনুভব বা বিজ্ঞানুভব বলা হয়।

পরমার্থ-বিষয়ে কোনও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে শাস্ত্র ; যেহেতু, একমাত্র শাস্ত্র হইতেই পরমার্থবিষয়ক তত্ত্ব জানা যায়। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং কাহারও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি শাস্ত্রের সহিত তাহার সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহা যথার্থ অনুভব এবং তখনই তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। যদি শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাহা যথার্থ অনুভব নহে, দিগ্ভ্রান্ত লোকের দিক্সম্বন্ধে অনুভবের ন্যায় তাহা ভ্রান্তিমাত্র ; সুতরাং তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

বিদ্বদনুভব শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। এস্থলেও বস্তুতঃ শাস্ত্রের প্রামাণ্যত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে।

যদি কেহ বলেন—ভগবত্তত্ত্ব অনন্ত, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও অনন্ত; এ-সমস্তের সম্যক্ উল্লেখ সম্ভব নয়; শাস্ত্রে সম্যক্ উল্লেখ নাইও; সুতরাং কাহারও কোনও অনুভবের সহিত শাস্ত্রোক্তির মিল না থাকিলেই যে তাহা যথার্থ অনুভব নহে, এইরূপ মনে করার কি হেতু থাকিতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ভগবানের নাম-রূপ-লীলাদি অনন্ত বলিয়া তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ শাস্ত্রে না থাকিতে পারে; কিন্তু যে কিছু উল্লেখ আছে, তাহাকে দিগ্‌দর্শনরূপে গ্রহণ করা যায়। কাহারও অনুভবলব্ধ কোনও বস্তুর উল্লেখ শাস্ত্রে না থাকিলেও, সেই অনুভবের সহিত শাস্ত্রোক্তির যদি কোনও বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সুধী ব্যক্তি তাহাকে প্রমাণরূপে ব্যবহার করিবেন কিনা, বলা যায় না। কিন্তু তত্ত্বের বিচারে, সিদ্ধান্তের বিচারে, ভাবের বিচারে, রসের বিচারে, গুণ-মহিমাদির বিচারে, কোনও অনুভবের সহিত যদি শাস্ত্রোক্তির কোনওরূপ বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অনুভব যথার্থ অনুভব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, সুতরাং প্রমাণরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ জীগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে অনুভব-সম্বন্ধে পুরোষত্তম-তন্ত্রের নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

শাস্ত্রার্থযুক্তোঽনুভবঃ প্রমাণং তূত্তমং মতম্।
অনুমানাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণপদবীং যযুঃ॥
—তত্ত্বসন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনী। ১৪ পৃষ্ঠা॥

—শাস্ত্রার্থযুক্ত অনুভবই উত্তম প্রমাণ। স্বতন্ত্র ( যাহা শাস্ত্রার্থযুক্ত নহে, তাদৃশ ) অনুমানাদি তাদৃশ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

## ১৬। শব্দার্থ-নির্ণয়ের রীতি

শব্দের অর্থ-নির্ণয়ের তিনটী রীতি বা প্রণালী আছে—মুখ্যাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি এবং গৌণী-বৃত্তি। কোন্ অবস্থায় কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে শব্দের অর্থ করিতে হইবে, তাহার বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এস্থলে এই তিনটী বৃত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

## ১৭। মুখ্যাবৃত্তি

কোনও শব্দের স্বাভাবিক-শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে বলে সেই শব্দের মুখ্যার্থ এবং যে বৃত্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে মুখ্যাবৃত্তি।

মুখ্যাবৃত্তি আবার দুই রকম—রূঢ়ী এবং যৌগিকী।

## ১৮। যৌগিকী মুখ্যা

কোনও শব্দ যে ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতু ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে বলে সেই শব্দের যৌগিক অর্থ এবং যেই বৃত্তিতে সেই যৌগিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে যৌগিকী মুখ্যাবৃত্তি। যেমন, পাচক-শব্দ; পচ্-ধাতুর উত্তর ণক্-প্রত্যয়যোগে পাচক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পচ্-ধাতুর অর্থ পাক ( রন্ধন ) করা ; আর ণক্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কর্ত্তৃবাচ্যে ; সুতরাং ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে পাচক-শব্দের অর্থ হইল—পাক-কর্ত্তা, রন্ধনকর্ত্তা ; ইহাই পাচক-শব্দের যৌগিক মুখ্যার্থ।

## ১৯। রূঢ়ী মুখ্যা

যে নাম যাদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত হয়, তাহাকেই রূঢ়ী বলে ; ইহা যৌগিক অর্থ নহে। "যন্নাম যাদৃশার্থে সঙ্কেতিতমেব—নতু যৌগিকমপি তদ্‌রূঢ়ম্।"—শব্দশক্তি-প্রকাশিকা-গ্রন্থের "রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্ত্যতে।"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকা।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—"রূঢ়িস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দ্দেশার্হে বস্তুনি সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে।—স্বরূপ, জাতি ও গুণের দ্বারা বস্তুর নির্দ্দেশ হয় ; সুতরাং এই তিন রকম উপায়ে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।" গো-সংজ্ঞা দ্বারা ( গো-শব্দদ্বারা ) যে বস্তুকে বুঝায়, তাহাই গো-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সঙ্কেতকেই 'সংজ্ঞা-সংজ্ঞী' সঙ্কেত বলে। এই সংজ্ঞা-সংজ্ঞী সঙ্কেত দ্বারা জাত্যাদি ভেদে রূঢ়ী অর্থ প্রবর্ত্তিত হয়।"

রূঢ়ী অর্থের অনেক ভেদ আছে। মোটামোটি অর্থ—প্রসিদ্ধ ; রূঢ়ম্ প্রসিদ্ধম্—ইতি মেদিনী। প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থমনপেক্ষ্য শাব্দবোধজনকঃ শব্দঃ—শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান। ধাতু-প্রত্যয়-যোগে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া, যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং যে শব্দটী দ্বারা শব্দের লক্ষিত বস্তুটীকে বুঝা যায়, সেই শব্দটীই হইল ঐ বস্তুর রূঢ়ী অর্থ। যেমন, সংস্কৃত ভাষায় গৌঃ-শব্দ। গৌঃ-শব্দের বাঙ্গালা অর্থ গো বা গরু। কিন্তু ইহা গৌঃ-শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত ( অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়গত ) অর্থ নহে ; গম্-ধাতুর উত্তর ডো-প্রত্যয় যোগে গৌঃ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। গম্-ধাতুর অর্থ গমন করা। কেবল গরুই যে গমন করে, তাহা নয় ; বহু জীবই গমন করিতে পারে। তথাপি "গৌঃ" বলিলেই সাস্নাবিশিষ্ট ( গলদেশে দোলায়মান কম্বলের ন্যায় বস্তুবিশেষযুক্ত ) গরুকেই বুঝায়। সাস্নাবিশিষ্ট পশুবিশেষই হইল গৌঃ-শব্দের রূঢ়ী অর্থ এবং ইহাই গৌঃ-শব্দের অতি প্রসিদ্ধ অর্থ ; "গৌঃ" বলিলে সকলের মনেই ঐ পশুবিশেষের কথাই উদিত হয়। দারুময় হস্তীকে ডিত্থ বলে ; "ডিত্থ" বলিলে দারুময় হস্তী ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর কথা মনে পড়ে না ; ইহাই ডিত্থ-শব্দের রূঢ়ী অর্থ। "শুক্ল" বলিলে দুগ্ধের বা শঙ্খের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশেষের কথাই মনে জাগে ; অথচ শুক্ল-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ তাহা নয়। শুচ্-ধাতু হইতে শুক্ল-শব্দ নিষ্পন্ন ; শুচ্-ধাতুর অর্থ শুচিতায়। মণ্ডপ-শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ—মণ্ডপানকারী ; কিন্তু মণ্ডপ-শব্দে মণ্ডপানকারীকে বুঝায়না, বুঝায় গৃহবিশেষকে। এই সমস্তই রূঢ়ী অর্থের উদাহরণ। বস্তুর পরিচায়ক অতিপ্রসিদ্ধ সঙ্কেতই হইতেছে রূঢ়ী অর্থ। অতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাও মুখ্যার্থ।

## ২০। যোগরূঢ়

যোগরূঢ়ও রূঢ়ী অর্থের একটী ভেদ। পূর্ব্বে যে রূঢ়ী অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে শব্দের যৌগিক ( অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত ) অর্থের কোনও সম্বন্ধ নাই ; কিন্তু যোগরূঢ় অর্থে যৌগিক অর্থের সহিত কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। "যোগরূঢ়ঃ—যোগার্থসহভাবেন রূঢ়ার্থবোধক-শব্দঃ।—শব্দকল্পদ্রুম।" একটী দৃষ্টান্ত

দেওয়া হইতেছে। পঙ্কজ-শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যাহা পঙ্কে জন্মে। পঙ্কমধ্যে পদ্ম যেমন জন্মে, তেমনি কুমুদ-কহ্লারাদিও জন্মে এবং নানারকমের পোকা-আদিও জন্মে। তথাপি কিন্তু পঙ্কজ-শব্দে কেবল পদ্মকেই বুঝায়; ইহাই পঙ্কজ-শব্দের যোগরূঢ় অর্থ। কেবলমাত্র পদ্মকে বুঝায় বলিয়া, পদ্মই পঙ্কজ-শব্দের অতি প্রসিদ্ধ অর্থ বলিয়া, ইহা হইল রূঢ়ী অর্থ; আবার পদ্মও পঙ্কে জন্মে বলিয়া যৌগিক অর্থের সঙ্গে ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে; এজন্য পদ্ম হইল পঙ্কজ-শব্দের যোগরূঢ়ার্থ। পদ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তু যদি পঙ্কে না জন্মিত, তাহা হইলে পদ্ম হইত পঙ্কজ-শব্দের যৌগিক অর্থ।

যোগরূঢ় অর্থও অতি প্রসিদ্ধ অর্থ বলিয়া ইহাও মুখ্যার্থ।

## ২১। অভিধা বৃত্তি

মুখ্যাবৃত্তিকে অভিধা-বৃত্তিও বলে। অভিধা—ন্যায়মতে শব্দশক্তিঃ। মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধি-ব্যাপারীভূতপদার্থঃ। তস্যা লক্ষণম্—স মুখ্যোঽর্থস্তত্র মুখ্যোব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে। ইতি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত-কাব্যপ্রকাশ-বচনম্।

## ২২। লক্ষণাবৃত্তি

শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"তেনৈব সঙ্কেতেন অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী লক্ষণা (সর্ব্বসম্বাদিনী)।—পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেত দ্বারা অভিহিত অর্থের (মুখ্যার্থের) সহিত সম্বন্ধযুক্তা শব্দবৃত্তিই লক্ষণা নামে অভিহিত হয়।" ভাষাপরিচ্ছেদকারের মতে—"লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ।—মুখ্যার্থের তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। শক্য—মুখ্যার্থ।" অলঙ্কার-কৌস্তুভের মতে—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) অন্যপদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলা হয়। "মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যাঽন্যধীর্ভবেৎ। সা লক্ষণা। অলঙ্কার-কৌস্তুভ ॥২।১২॥" যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।" এস্থলে "গঙ্গা"-শব্দের মুখ্যার্থে একটী স্রোতস্বিনীকে বুঝায়; স্রোতোময়ী গঙ্গায় বাস করা অর্থ—স্রোতের মধ্যে বাস করা; কিন্তু তাহা সম্ভব নয়; সুতরাং এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না। সুতরাং এস্থলে "গঙ্গা"-শব্দে "গঙ্গাতীর" বুঝিতে হইবে। "গঙ্গা"-শব্দের "গঙ্গাতীর" অর্থই লক্ষণালব্ধ অর্থ। গঙ্গার সঙ্গে গঙ্গাতীরের সম্বন্ধ আছে (শক্যস্য সম্বন্ধে); এজন্য গঙ্গাতীর অর্থ গ্রহণীয়। ইহাও একটী সঙ্কেতমাত্র; কেননা, গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে গঙ্গাতীর বুঝায় না। এই সঙ্কেতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীজীব বলিয়াছেন—"তেনৈব সঙ্কেতেন অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী লক্ষণা।" আবার মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়াই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হইল। এজন্যই ভাষাপরিচ্ছেদকার বলিয়াছেন—"লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎ-পর্য্যানুপপত্তিতঃ।" এইরূপে দেখা গেল—লক্ষণাসম্বন্ধে যে তিনজনের মত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, মতেরও কোনওরূপ ভেদ নাই; বরং অলঙ্কার-কৌস্তুভের প্রমাণটী অতি পরিষ্কার।

## ২৩। লক্ষণা তিন প্রকার

যাহা হউক, শ্রীজীব বলেন, লক্ষণা তিন রকমের—অজহৎস্বার্থা, জহৎস্বার্থা এবং জহদজহৎস্বার্থা। এই তিন প্রকারের লক্ষণার তাৎপর্য্য বলা হইতেছে।

হা-ধাতু হইতে জহৎ-শব্দ নিষ্পন্ন। হা-ধাতুর অর্থ---ত্যাগে। সুতরাং "জহৎ"-শব্দে ত্যাগ বুঝায় এবং "অজহৎ"-শব্দে "ত্যাগের অভাব" বা "গ্রহণ" বুঝায়। স্বার্থ অর্থ—শব্দের স্বকীয় অর্থ বা মুখ্যার্থ।

## ২৪। অজহৎস্বার্থা লক্ষণা

অজহৎস্বার্থা---ন জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা---যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থ ( মুখ্যার্থ ) ত্যাগ করে না, তাহাই "অজহৎস্বার্থা লক্ষণা।" যেমন, "কাকেভ্যঃ দধি রক্ষতাম্---কাকসমূহ হইতে দধিকে রক্ষা কর।" যদি কাহাকেও দধি রক্ষার জন্য এইরূপ আদেশ করা হয়, তাহা হইলে, দধি নষ্ট করার জন্য কেবল কাক আসিলেই যে কাককে তাড়াইতে হইবে, কুক্কুরাদি আসিলে কুক্কুরাদিকে তাড়াইতে হইবে না---ইহা কখনও আদেশদাতার অভিপ্রায় হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রায়---দধিকে রক্ষা করা ; দধি নষ্ট করার জন্য যাহা কিছু আসিবে, তাহাকেই তাড়াইয়া দিতে হইবে। কাককে তো তাড়াইতে হইবেই, কুক্কুরাদিকেও তাড়াইতে হইবে। সুতরাং "কাকেভ্যঃ দধি রক্ষতাম্"-বাক্যে "কাকেভ্যঃ"-শব্দের মুখ্যার্থ "কাক" তো রাখিতেই হইবে, তদতিরিক্ত দধি-নষ্ট করার জন্য অপর যাহা কিছু আসে, তাহাকেও বুঝিতে হইবে। "কাক"-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করা হইল না বলিয়া ইহা হইল "অজহৎস্বার্থা"। আর, কেবলমাত্র মুখ্যার্থ কাক গ্রহণ করিলে আদেশদাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না—দধি রক্ষিত হইতে পারে না---বলিয়া—সুতরাং কেবলমাত্র মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া---দধি-নষ্টকারী কুক্কুরাদিকে গ্রহণ করিতে হইল বলিয়া ইহা হইল লক্ষণা। এইরূপে এস্থলে "অজহৎস্বার্থা লক্ষণা" হইল।

যদি বলা হয়, মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তু মাত্রই লক্ষণায় গৃহীত হইতে পারে ; মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধহীন কোনও বস্তু গ্রহণের তো বিধান নাই। এস্থলে মুখ্যার্থ কাকের সহিত কুক্কুরাদির কি সম্বন্ধ ? দধির নষ্টীকরণ-কার্য্যে মুখ্যার্থ কাকের সহিত কুক্কুরাদির সম্বন্ধ আছে—কাক যেমন দধি নষ্ট করিতে পারে, তেমনি কুক্কুরাদিও তাহা নষ্ট করিতে পারে ; এই বিষয়ে কুক্কুরাদি হইল মুখ্যার্থ কাকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

## ২৫। জহৎস্বার্থা লক্ষণা

জহৎস্বার্থা—জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাম্---যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ ( মুখ্যার্থ ) ত্যাগ করে, তাহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।" যেমন, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি---মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে।" এস্থলে মঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই ; যেহেতু, মঞ্চের পক্ষে চীৎকার করা সম্ভব নয়। মঞ্চের সহিত সম্বন্ধযুক্ত---মঞ্চের উপরে স্থিত লোকসমূহই এস্থলে মঞ্চ-শব্দের তাৎপর্য্য। মঞ্চস্থিত লোকগণ চীৎকার করিতেছে—ইহাই হইবে তাৎপর্য্য। এস্থলে মঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এজন্য ইহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।" আর একটী দৃষ্টান্ত---"আয়ুর্ঘৃতম্---আয়ুঃ হইতেছে ঘৃত।" বস্তুতঃ ঘৃত কাহারও আয়ুঃ হইতে পারে না ; সুতরাং মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই। আয়ুর সহিত ঘৃতের একটা সম্বন্ধ আছে---ঘৃত পানে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং এস্থলে "আয়ুঃ"-শব্দে "আয়ুর সাধন" বুঝিতে হইবে। "আয়ুঃ"-শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা হইল "জহৎস্বার্থা লক্ষণা।"

## ২৬। জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা

“যত্র বাচ্যৈকদেশত্যাগেনৈকদেশান্বয়স্তত্র জহদজহতী লক্ষণা॥— যে লক্ষণায় বাচ্যের একদেশ ( একাংশ ) পরিত্যাগ করিয়া অন্য একদেশের সহিত অন্বয় করা হয়, তাহাকে জহদজহতী লক্ষণা বলে ( তর্কদীপিকা )।” অর্থাৎ মুখ্যার্থের এক অংশকে ত্যাগ করিয়া আর এক অংশকে গ্রহণ করা হয় যে লক্ষণায়, তাহাই জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা। “বাচ্যার্থৈকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তিঃ লক্ষণা। বাচস্পতিমিশ্র।” জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণাকে ভাগ-লক্ষণাও বলে।

উদাহরণ। মায়াবাদীরা ছান্দোগ্য উপনিষদের “অয়মাত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”—এই বাক্যের অন্তর্গত “তৎ ত্বম্ অসি”-বাক্যের যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণার একটী দৃষ্টান্ত। এস্থলে “তৎ”-শব্দে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যকে ( অর্থাৎ ব্রহ্মকে ) বুঝায়। “তৎপদবাচ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টে চৈতন্যে।” আর, “ত্বম্”-শব্দে কিঞ্চিদ্জ্ঞত্ব-অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে ( অণুচৈতন্য জীবকে ) বুঝায়। ‘তৎ-শব্দের অর্থে ‘সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট’ অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল “চৈতন্য”-অংশ রাখা হয়; আর, “ত্বম্”-শব্দের অর্থে ‘কিঞ্চিদ্জ্ঞত্ব-অন্তঃকরণবিশিষ্ট’-অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল ‘চৈতন্য’-অংশ রাখা হয়। উভয় শব্দের বিশেষণাংশ বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্য অংশমাত্র রাখিলে ‘তৎ’-শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কেবল ‘চৈতন্য’, আর ‘ত্বম্’-শব্দের অর্থও দাঁড়ায় কেবল ‘চৈতন্য।’ এইরূপে ব্রহ্মবাচক ‘তৎ’ শব্দের অর্থও দাঁড়ায়—‘চৈতন্য’ এবং জীববাচক ‘ত্বম্’-শব্দের অর্থও দাঁড়ায়—‘চৈতন্য।’ এইরূপ অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; যেহেতু, উভয়ই চৈতন্য।

## ২৭। উপলক্ষণ

লক্ষণাবৃত্তির একটী ভেদই হইতেছে উপলক্ষণ। ইহার লক্ষণ এইরূপ। “একপদেন তদর্থান্যপদার্থকথনম্। যথা। দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥ অত্র পাদুকাদ্বয়মিতি উপলক্ষণম্ দ্রব্যান্তরমপি॥ ইতি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত-শুদ্ধিতত্ত্ব-বচনম্॥” ইহার তাৎপর্য্য এই:—একটী পদের ( শব্দের ) দ্বারা তদর্থক অন্য পদের কথনকে উপলক্ষণ বলে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে। কোনও সাধ্বী রমণীর স্বামী দেশান্তরে, দূরদেশে, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রমণী আছেন নিজ গৃহে। সাধ্বী রমণী পতির সঙ্গে সহমরণের অভিলাষিণী; কিন্তু পতির শবদেহ দূরদেশে বলিয়া তাহা সম্ভব হয় না। গৃহে ছিল পতির পাদুকাদ্বয়। পতিব্রতা রমণী ঐ পাদুকাদ্বয়কেই স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন। পতির শবদেহের অভাবে পতির পাদুকাদ্বয়কেই পতির শবদেহ-স্থানীয় করিয়া সাধ্বী রমণী তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পাদুকাদ্বয় সাধ্বী রমণীর বস্তুতঃ স্বামী না হইলেও—স্বামী হইতে ভিন্ন বস্তু হওয়া সত্ত্বেও—রমণী পাদুকাদ্বয়কেই স্বামিজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। এ-স্থলে পাদুকাদ্বয় দ্বারা স্বামী উপলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া পাদুকাদ্বয় হইল স্বামীর উপলক্ষণ।

কাব্যপ্রকাশ-নামক গ্রন্থে উপলক্ষণের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—“গঙ্গায়াং ঘোষঃ—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে।” স্রোতঃস্বরূপা গঙ্গায় কাহারও বাস করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে—

গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে। গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গা হইতে ভিন্ন বস্তু। এ-স্থলে গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গা-শব্দের উপলক্ষণ।

## ২৮। গৌণীবৃত্তি

মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে মুখ্যার্থের কোনও একটী গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে গৌণ অর্থ। "গৌণী চ অভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে— সর্ব্বসম্বাদিনী।" আর, যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে গৌণীবৃত্তি।

যেমন, "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ—এই দেবদত্ত একটী সিংহ।" সিংহ-শব্দের মুখ্যার্থে অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষকে বুঝায়। দেবদত্ত একজন মানুষ; তাহার চারিটী পদ নাই, লেজ নাই, রোম নাই, সিংহের ন্যায় কেশর নাই। সুতরাং "দেবদত্ত একটী সিংহ"-বাক্যে "সিংহ"-শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে অর্থ-প্রতীতি হইতে পারে না। "সিংহ"-শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের "বিক্রমশালিত্ব" গুণটীকে গ্রহণ করিয়া সিংহ-শব্দের অর্থ করা হয়—"সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী"। "এই দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী"—ইহাই হইবে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ" বাক্যের অর্থ; গুণেতে সিংহের সহিত দেবদত্তের কিছু সাদৃশ্য আছে।

কোনও কোনও বৈয়াকরণ গৌণীবৃত্তিকে পৃথক্ একটী বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, গৌণীবৃত্তিও একরকম লক্ষণা। তাঁহাদের মতে লক্ষণা দুই রকমের—গৌণী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্যমাত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাই গৌণীলক্ষণালব্ধ অর্থ। গুণসাদৃশ্যব্যতীত অন্য প্রকারের লক্ষণালব্ধ অর্থকে শুদ্ধালক্ষণালব্ধ অর্থ বলা হয়। "সাদৃশ্যেতরসম্বন্ধাঃ শুদ্ধাস্তাঃ সকলা অপি। সাদৃশ্যাৎ তু মতা গৌণ্যাঃ॥ সাহিত্যদর্পণ॥" উপরে "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের অর্থপ্রসঙ্গে সিংহশব্দের মুখ্যার্থ "বিক্রমশালী পশুবিশেষ" হইতে "পশুবিশেষ"-অংশ ত্যাগ করিয়া "বিক্রমশালী"-অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই অর্থকে জহদজহৎস্বার্থালক্ষণা হইতে লব্ধ অর্থ বলিয়াও মনে করা যায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে লক্ষণা ও গৌণীর একটু পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—রূঢ়ী ও প্রয়োজনভেদে লক্ষণা সাধারণতঃ দুই রকমের। রূঢ়ীর দৃষ্টান্তে তিনি লিখিয়াছেন—যথা "কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ।—কলিঙ্গ (দেশবিশেষ) সাহসী।" কিন্তু কলিঙ্গ হইতেছে একটী অচেতন স্থান বিশেষ; সাহস হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম; অচেতন কলিঙ্গ-নামক স্থানের "সাহসিকতা" ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; এস্থলে "কলিঙ্গ"-শব্দে কলিঙ্গ-দেশস্থ পুরুষকেই বুঝায়—কলিঙ্গ-দেশবাসীরা সাহসী, ইহাই অর্থ। ইহাকে রূঢ়ী লক্ষণা বলা হয়।

আর, প্রয়োজনের দৃষ্টান্তে তিনি লিখিয়াছেন—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ। অত্র তটস্থশীতলত্ব-পাবনত্বাদের্বোধনং প্রয়োজনম্।" গঙ্গার তটস্থ শীতলত্ব ও পাবনতাই এস্থলে প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য।

তিনি বলেন—"গৌণী তু প্রয়োজনমেব অপেক্ষ্য; যথা—গৌর্বাহিকঃ অজ্ঞত্বাদ্যতিশয়-বোধনমত্র প্রয়োজনম্।—কিন্তু গৌণী কেবল প্রয়োজনেরই অপেক্ষা রাখে, যথা, বাহিক গরু।" বাহিকঃ-শব্দের অর্থ —বাহিক-দেশোদ্ভব লোক। আর গৌঃ-শব্দের অর্থ গরু। একজন লোক গরু হইতে পারে না। সুতরাং

এস্থলে গৌঃ-শব্দের অর্থ হইবে---গরুর মত অজ্ঞ। উক্ত বাক্যে লোকটার অজ্ঞতাদি বুঝাইবার প্রয়োজনেই ঐরূপ গৌণীবৃত্তিতে অর্থ করা হইয়াছে।

## ২৯। বিশেষ দ্রষ্টব্য

মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী---এই তিনটী বৃত্তিসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—

(ক) মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থনির্ণয় করার সময়ে কোনও যুক্তি-আদির সাহায্য লইতে হয় না; কেবল শব্দ-শক্তি হইতেই অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে; সুতরাং মুখ্যাবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ স্বতঃপ্রমাণ, নিজেই নিজের প্রমাণ; তাহার প্রমাণতা-স্থাপনের জন্য অন্য কিছুর সহায়তার প্রয়োজন হয় না।

(খ) লক্ষণাবৃত্তিতে এবং গৌণীবৃত্তিতে অর্থনির্ণয় করার সময়ে যুক্তির সহায়তা অপরিহার্য্য। "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"-স্থলে, মঞ্চ চীৎকার করিতে পারে না; তজ্জন্য মঞ্চ-শব্দে "মঞ্চস্থ লোক" বুঝিতে হইবে; ইহাই যুক্তি। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"-স্থলে গঙ্গার স্রোতে কাহারও বাস করা সম্ভব নয়; তজ্জন্য গঙ্গা-শব্দে "গঙ্গাতীর" বুঝিতে হইবে; ইহাই যুক্তি। "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"-স্থলে দেবদত্ত-নামক লোক সিংহ-নামক পশু-বিশেষ নহে বলিয়া সিংহ-শব্দে "সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী" বুঝিতে হইবে; ইহাই যুক্তি।

সুতরাং লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ স্বতঃপ্রমাণ নহে; যুক্তির সহায়তাতেই তাহার প্রমাণতা; যেহেতু, যুক্তির অবতারণা না করিলে সেই অর্থ পাওয়া যায় না।

(গ) যে-স্থলে মুখ্যাবৃত্তি-লব্ধ অর্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সেই স্থলেই লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তির সহায়তায় অর্থ নির্ণয় করার বিধি। যে-স্থলে মুখ্যাবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থের ( মুখ্যার্থের ) সঙ্গতি থাকে, সে-স্থলে লক্ষণাবৃত্তি বা গৌণীবৃত্তির সহায়তা লওয়ার বিধান শাস্ত্রে নাই। প্রশ্নোপনিষদের ৬।৩-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও একথা বলিয়া গিয়াছেন—"তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্য যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি।---যে-স্থলে মুখ্যার্থ সম্ভব হয় না ( সঙ্গত হয়না ), কেবলমাত্র সে-স্থলেই শব্দের গৌণার্থ কল্পনা করা যায়।" সুতরাং যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে, সে-স্থলে লক্ষণাবৃত্তি হইতে বা গৌণীবৃত্তি হইতে লব্ধ অর্থ শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না—সুতরাং প্রামাণ্য অর্থরূপেও পরিগণিত হইতে পারে না।

(ঘ) বেদ হইতেছে অপৌরুষেয় শাস্ত্র—ঈশ্বরের বাক্য। অপর কাহারও বাক্যের বা যুক্তির সহায়তায় ঈশ্বরের বাক্যের প্রমাণতা স্থাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য নিজেই নিজের প্রমাণ। সুতরাং **বেদ স্বতঃপ্রমাণ।** শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ---প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রী চৈ. চ. ১।৭।১২৫॥"

বেদবাক্যের অর্থ মুখ্যাবৃত্তিতেই করিতে হইবে; নচেৎ তাহার স্বতঃপ্রমাণতা থাকিবে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥ শ্রী চৈ. চ. ১।৭।১২৫॥"

বেদের মুখ্যার্থ যাহা বলে, তাহাই প্রমাণ; তাহাতে কোনওরূপ যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"-সূত্রে বেদান্তও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১২৭ ॥"

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। শঙ্খ হইল একটী জীবের অস্থি—সুতরাং সাধারণ বিচারে ইহা অপবিত্র। আর, গোময় হইল একটী জীবের বিষ্ঠা—সাধারণ বিচারে ইহাও অপবিত্র, অস্পৃশ্য। কিন্তু বেদবিহিত অর্চ্চনাদিতে এই দুইটী বস্তুই অতি পবিত্র বস্তুরূপে পরিগণিত। শঙ্খোদকে শ্রীবিগ্রহের স্নানাদি করান হয়, পঞ্চগব্যে (গোময় পঞ্চগব্যের অন্তর্ভুক্ত) তাঁহার অভিষেকাদি করান হয়। বেদ এই দুইটী বস্তুকে পবিত্র বলিয়াছেন বলিয়াই সাধারণ বিচারে অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও এই দুইটী বস্তু পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

"জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১২৮ ॥"

## ৩০। অন্যান্য বৃত্তি

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী বৃত্তি ব্যতীত তাহাদেরই অনুগতা আরও কোনও কোনও বৃত্তি শব্দার্থ-নির্ণয়ে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এস্থলে দুই একটীর কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

## ৩১। ব্যঞ্জনাবৃত্তি

ব্যঞ্জনাবৃত্তি সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। সে-সমস্ত আলোচনার অবতারণা না করিয়া একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে এস্থলে ব্যঞ্জনাবৃত্তির একটু দিগ্‌দর্শন দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—এই বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গা-শব্দের গঙ্গাতীর অর্থ পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গাতীরের শীতলত্ব-পাবনত্বাদি লক্ষণাবৃত্তিতেও পাওয়া যায় না, মুখ্যাবৃত্তি-লব্ধ গঙ্গা-শব্দ হইতেও পাওয়া যায় না। যে বৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীরের শীতলত্ব-পাবনত্বাদি উপপন্ন হয়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জনাবৃত্তি। বলা হয়—গঙ্গাতীর-শব্দে গঙ্গাতীরের শীতলত্বাদিও ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ধ্বনি, প্রত্যায়ন, ভাব, অভিপ্রায়াদিও ব্যঞ্জনারই অনুভুর্ক্ত।

## ৩২। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি

ইহা দ্বারা ব্যাপকতম অর্থ পাওয়া যায়। প্রগ্রহ-শব্দের অর্থ—ঘোড়ার লাগাম। যে ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বলে মুক্তপ্রগ্রহ অশ্ব। ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া দিলে ঘোড়া যেমন নিজের শক্তি অনুসারে যতদূর ইচ্ছা যাইতে পারে, তদ্রূপ কোনও শব্দের প্রকৃতি (ধাতু) ও প্রত্যয়কে যদি কোনওরূপে সঙ্কুচিত করা না হয়, তাহা হইলে শব্দের যে ব্যাপকতম অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকেই বলে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তির অর্থ।

যেমন রস-শব্দ। রস্-ধাতু হইতে কর্ম্মবাচ্যে ও কর্ত্তৃবাচ্যে রস-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রস্-ধাতুর অর্থ—আস্বাদন। রস-শব্দের অর্থ হইবে—কর্ম্মবাচ্যে, রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ, আস্বাদ্য বস্তু; আর, কর্ত্তৃবাচ্যে, রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ, রস-আস্বাদক বা রসিক। মুক্ত-প্রগ্রহা-বৃত্তিতে, উভয় বাচ্যই গ্রহণ করিতে হইবে; একটী বাচ্য ত্যাগ করিলে সেই বাচ্যের অর্থ-প্রকাশে বাধা দেওয়া হইবে, সেই বাচ্যের অর্থ পাওয়া যাইবে না; তাহাতে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিও হইবে না। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে উভয় বাচ্যের অর্থ ব্যাপকতম ভাবে প্রকাশ পাইবে এবং ব্যাপকতম অর্থে রস-শব্দের অর্থ হইবে—(১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আস্বাদ্য বস্তু, আস্বাদ্যতম বস্তু এবং (২) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-আস্বাদক বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসিক, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি।

## ৩৩। বাক্য বা বাক্যসমুদয়ের অর্থ-নির্ণয়-রীতি

বাক্য বা বাক্যসমুদয়ের অর্থ উপক্রম-উপসংহারাদি দ্বারা নির্ণীত হয়।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই সমস্ত হইতেছে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের উপায়।

উপক্রম—আরম্ভ। উপসংহার—শেষ। অভ্যাস—পুনঃপৌন্য। অপূর্ব্বতা—অনধিগতত্ব। অর্থবাদ—প্রশংসা। উপপত্তি—যুক্তিমত্ত্বা; শুষ্কতর্কমূলক যুক্তিমত্ত্বা নহে, শাস্ত্রানুগত যুক্তিমত্ত্বা।

উপক্রম, উপসংহারাদির সহিত যেই অর্থের সঙ্গতি থাকে, সেই অর্থই গ্রহণীয়।

## ৩৪। বাক্যের বলাবল

কোনও বাক্যের অর্থ-নির্ণয়-কালে যদি বাক্যান্তরের দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাক্যগুলির বলাবল বিবেচনা করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। "যত্র তু বাক্যান্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাৎ, তত্র বলাবলত্বং বিবেচনীয়ম্। সর্ব্বসম্বাদিনী।"

এই বলাবল দুই রকমে বিবেচিত হয়—শাস্ত্রগত এবং বচনগত।

(১) শাস্ত্রগত বিরোধের স্থলে—শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া মনে করিতে হইবে। "শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী।"

(২) বচনগত বিরোধস্থলে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—ইহাদের সমবায়ে ক্রম-পর-প্রমাণের দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে।

শ্রুতি—শব্দ; শব্দশ্রবণ মাত্রেই যেই অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ। লিঙ্গ—শব্দসামর্থ্য। বাক্য—পদ-সংহতি। প্রকরণ—করণ; ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষ কর্ত্তব্যের বচন। স্থান—দেশসামান্য; সাকাঙ্ক্ষ স্থান—ক্রম। সমাখ্যা—যোগবল; যৌগিক শব্দই সমাখ্যা

ইহাদের দুইটী দুইটী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ শ্রুতি ও লিঙ্গে, লিঙ্গে ও বাক্যে, বাক্যে ও

প্রকরণে, প্রকরণে ও স্থানে, এবং স্থানে ও সমাখ্যায় বিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্ব্বেরটী বলবৎ হইবে এবং পরেরটী দুর্ব্বল হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

## ৩৫। সামানাধিকরণ্য

শাব্দিকগণ বলেন—"ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।—ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে একই অর্থে ( বস্তুতে ) বৃত্তি, তাহার নাম সামানাধিকরণ্য।"

ভিন্নার্থ-বোধক শব্দগুলি হইতেছে বিশেষণ। আর যে একই অর্থে তাহাদের বৃত্তি, তাহা হইতেছে বিশেষ্য। অধিকরণ-শব্দের অর্থ হইতেছে আধার। একই বিশেষ্যরূপ অধিকরণে ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণ-শব্দগুলির বৃত্তি বলিয়াই, একই বিশেষ্য সমান ভাবে সকল বিশেষণের অধিকরণ বা আধার বলিয়াই, ইহাকে সামানাধিকরণ্য বলা হয়। "সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যস্য, তত্তথেত্যাশয়ঃ।—বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত শ্রীভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ-মহোদয়ের উক্তি।"

একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" এই শ্রুতিবাক্যে "সত্যম্, জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্"—এই তিনটী শব্দ হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক। "সত্যম"—শব্দের যে অর্থ, "জ্ঞানম্" বা "অনন্তম্"—শব্দের সেই অর্থ নহে ; "জ্ঞানম্"—শব্দের যে অর্থ, "সত্যম্" বা "অনন্তম্"—শব্দের সেই অর্থ নহে ; আবার, "অনন্তম্"—শব্দের যে অর্থ, "সত্যম্" বা "জ্ঞানম্"—শব্দেরও সেই অর্থ নহে। এই তিনটী ভিন্নার্থক শব্দই হইতেছে বিশেষণ ; আর "ব্রহ্ম" শব্দটী হইতেছে বিশেষ্য। তিনটী বিশেষণেরই বৃত্তি হইতেছে একই বিশেষ্য "ব্রহ্ম"-শব্দে। তিনটী বিশেষণ-শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও তাহারা একই বিশেষ্য ব্রহ্মেরই পরিচায়ক। এ-স্থলে ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলির অধিকরণ বা আধারভূত বস্তু একই বিশেষ্য "ব্রহ্ম" বলিয়া সামানাধিকরণ্য হইল।

সামানাধিকরণ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, প্রথমতঃ, বিশেষণ হইবে একাধিক। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষণগুলি হইবে ভিন্নার্থ-বোধক। বিশেষণ একাধিক না হইলে "সমান অধিকরণের" প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর, বিশেষণগুলিও ভিন্নার্থ-বোধক না হইয়া একার্থ-বোধক হইলে সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না।

# বেদ ও উপনিষৎ

## ৩৬। বেদ

ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ—এই চারিটী বেদ। প্রত্যেক বেদেরই দুইটী করিয়া অংশ আছে; এক অংশের নাম মন্ত্র, আর এক অংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণাংশে মন্ত্রের অর্থ থাকে।

ঋগ্‌বেদে ঐতরেয় নামে একটী ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয় ও শতপথ নামে দুইটী ব্রাহ্মণ। সামবেদে তাণ্ড্য নামে একটী ব্রাহ্মণ। অথর্ব্ববেদে গোপথ-নামে একটী ব্রাহ্মণ।

সামগ্রিক ভাবে বেদের তিনটী কাণ্ড বা অংশ আছে—কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি-কর্ম্মের কথা আছে; দেবতা-কাণ্ডে নানাবিধ দেব-দেবীর উপাসনার কথা আছে; এবং জ্ঞান-কাণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যার কথা আছে।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম আবার দুই রকম—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম-কর্ম্মের লক্ষ্য ইহকালের সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ। ইহাতে সংসার-নিবৃত্তি হয় না। নিষ্কাম-কর্ম্মে ভোগ-বাসনামূলক কষায়ের ক্ষয় হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিষ্কাম-কর্ম্মই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের চরম উপদেশ।

দেবতাকাণ্ডে উল্লিখিত দেবতাসকল আবার দুই শ্রেণীর—সগুণ এবং নির্গুণ; এস্থলে গুণ-শব্দের অর্থ—মায়িকগুণ। সগুণ দেব-দেবীর উপাসনায় দেহেন্দ্রিয়ের ভোগসুখ-সাধক গুণময় বস্তু পাওয়া যায়। নির্গুণ দেব-দেবীর উপাসনায় গুণাতীতত্ব লাভ হইতে পারে।

জ্ঞান-কাণ্ডের জ্ঞানও দুই রকম—পরোক্ষ জ্ঞান এবং অপরোক্ষ জ্ঞান। শাস্ত্রোক্তবিষয়ের সাধারণ জ্ঞানকে বলে পরোক্ষ জ্ঞান; আর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞানকে বলে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ বা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয়ের এবং ( প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য ) কর্ম্ম-বন্ধনের অবসান হয়।

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ॥ ২।২।৮ ॥

## ৩৭। উপনিষৎ

উপনিষৎ সকল এই জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সকল বেদের মধ্যেই উপনিষৎ আছে। উপ-পূর্ব্বক-নি-পূর্ব্বক সদ্‌-ধাতু হইতে উপনিষৎ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সদ্‌-ধাতুর অর্থ—অবসাদনে, গতিতে ও বিনাশে। যাহা দেহাত্মবুদ্ধিকে, বা সংসারই সার বস্তু—এই বুদ্ধিকে, অবসাদিত বা শিথিল করে, যাহা পরব্রহ্মে গতির উপায়, বা পরব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায়, জানাইয়া দেয় এবং যাহা সংসার-বীজভূতা মায়ার বা অবিদ্যার বিনাশ করে বা

বিনাশের উপায় জানাইয়া দেয়, তাহাই উপনিষৎ। ব্রহ্মবিদ্যাই এই সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক গ্রন্থই হইল উপনিষৎ। উপনিষৎকে শ্রুতিও বলা হয়। সমস্ত বেদের পর্য্যবসানই ব্রহ্মবিদ্যায় বা উপনিষদে। উপনিষদেই বেদের অভীষ্ট চরম-বাক্য নিহিত আছে; ইহাই বেদের শেষ বা অন্ত, ইহার পরে আর কিছু নাই। এজন্য উপনিষৎ-সমূহকে বেদান্তও বলা হয়।

## ৩৮। উপনিষদের সংখ্যা

উপনিষদের মোট সংখ্যা কত, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ দশ-এগার খানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না যে—উপনিষদের সংখ্যা মাত্র দশ-এগার; যেহেতু, তদপেক্ষা অনেক বেশী উপনিষৎ প্রচলিত আছে, দেখা যায়, এবং ভাষ্যকারগণ যে সকল উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সে-সকল উপনিষদ্ ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের প্রমাণ বা উল্লেখ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতেও দৃষ্ট হয়। ইহাও অনুমান করা সঙ্গত হয় না যে—ঐ দশ-এগারখানি উপনিষৎই মুখ্য, অন্যগুলি গৌণ বা অবান্তর। কেননা, উপনিষৎ হইতেছে পরব্রহ্মের বাক্য, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত প্রকটিত। তাঁহার বাক্যের কোনও অংশ মুখ্য, কোনও অংশ গৌণ বা অবান্তর—ইহা বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানে দুই শতেরও অধিক উপনিষদের প্রচলন দেখা যায়। নানা কারণে অনেক উপনিষদ্ যে নষ্ট বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক নহে। বোম্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদিবিংশোত্তর-শতোপনিষদঃ"-নামক গ্রন্থে একশত বিশখানি উপনিষদের মূল দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই উপনিষদ্গুলির নাম লিখিত হইতেছে ঃ—

(১) ঈশাবাস্যোপনিষৎ, (২) কেনোপনিষৎ, (৩) কঠোপনিষৎ, (৪) প্রশ্নোপনিষৎ, (৫) মুণ্ডকোপনিষৎ, (৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, (৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, (৮) ঐতরেয়োপনিষৎ, (৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, (১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, (১১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, (১২) ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, (১৩) কৈবল্যোপনিষৎ, (১৪) জাবালোপনিষৎ, (১৫) হংসোপনিষৎ, (১৬) আরুণিকোপনিষৎ, (১৭) গর্ভোপনিষৎ, (১৮) নারায়ণা-থর্ববশির উপনিষৎ, (১৯) মহানারায়ণোপনিষৎ, (২০) পরমহংসোপনিষৎ, (২১) ব্রহ্মোপনিষৎ, (২২) অমৃতনাদোপনিষৎ, (২৩) অথর্ববশির-উপনিষৎ, (২৪) অথর্ববশিখোপনিষৎ, (২৫) মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, (২৬) কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, (২৭) বৃহজ্জাবালোপনিষৎ, (২৮) নৃসিংহপূর্ববতাপনীয়োপনিষৎ, (২৯) নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়োপনিষৎ, (৩০) কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, (৩১) মৈত্রেয়্যুপনিষৎ, (৩২) সুবালোপনিষৎ, (৩৩) ক্ষুরিকোপনিষৎ, (৩৪) মন্ত্রিকোপনিষৎ, (৩৫) সর্ববসারোপনিষৎ, (৩৬) নিরালম্বোপনিষৎ, (৩৭) শুকরহস্যোপনিষৎ. (৩৮) বজ্রসূচিকোপনিষৎ, (৩৯) তেজবিন্দূপনিষৎ, (৪০) নাদবিন্দূপনিষৎ, (৪১) ধ্যানবিন্দূপনিষৎ, (৪২) ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, (৪৩) যোগতত্ত্বোপনিষৎ, (৪৪) আত্মপ্রবোধোপনিষৎ, (৪৫) নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, (৪৬) ত্রিশিখিব্রাহ্মণোপনিষৎ, (৪৭) সীতোপনিষৎ, (৪৮) যোগ-চূড়ামণ্যুপনিষৎ, (৪৯) নির্ববাণোপনিষৎ, (৫০) মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষৎ, (৫১) দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপনিষৎ,

(৫২) শরভোপনিষৎ, (৫৩) স্কন্দোপনিষৎ, (৫৪) ত্রিপাদ্‌বিভূতি-মহানারায়ণোপনিষৎ, (৫৫) অদ্বয়তারকোপনিষৎ, (৫৬) রামরহস্যোপনিষৎ, (৫৭) শ্রীরাম-পূর্ব্বতাপন্যোপনিষৎ, (৫৮) শ্রীরামোত্তরতাপন্যুপনিষৎ, (৫৯) বাসুদেবোপনিষৎ, (৬০) মুদ্‌গলোপনিষৎ, (৬১) শাণ্ডিল্যোপনিষৎ, (৬২) পৈঙ্গলোপনিষৎ, (৬৩) ভিক্ষুকোপনিষৎ, (৬৪) মহোপনিষৎ, (৬৫) শারীরকোপনিষৎ, (৬৬) যোগশিখোপনিষৎ, (৬৭) তুরীয়াতীতোপনিষৎ, (৬৮) সন্ন্যাসোপনিষৎ, (৬৯) পরমহংস-পরিব্রাজকোপনিষৎ, (৭০) অক্ষমালিকোপনিষৎ, (৭১) অব্যক্তোপনিষৎ, (৭২) একাক্ষরোপনিষৎ, (৭৩) অন্নপূর্ণোপনিষৎ, (৭৪) সূর্য্যোপনিষৎ, (৭৫) অক্ষ্যুপনিষৎ, (৭৬) অধ্যাত্মোপনিষৎ, (৭৭) কুণ্ডিকোপনিষৎ, (৭৮) সাবিত্র্যুপনিষৎ, (৭৯) আত্মোপনিষৎ, (৮০) পাশুপতব্রহ্মোপনিষৎ, (৮১) পরব্রহ্মোপনিষৎ, (৮২) অবধূতোপনিষৎ, (৮৩) ত্রিপুরাতাপিন্যোপনিষৎ, (৮৪) দেব্যুপনিষৎ, (৮৫) ত্রিপুরোপনিষৎ, (৮৬) কঠরুদ্রোপনিষৎ, (৮৭) ভাবনোপনিষৎ, (৮৮) রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ, (৮৯) যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ, (৯০) ভস্মজাবালোপনিষৎ, (৯১) রুদ্রাক্ষজাবালোপনিষৎ, (৯২) গণপত্যুপনিষৎ, (৯৩) শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ, (৯৪) তারসারোপনিষৎ, (৯৫) মহাবাক্যোপনিষৎ, (৯৬) পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ, (৯৭) প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ, (৯৮) গোপালপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ, (৯৯) গোপালোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, (১০০) কৃষ্ণোপনিষৎ, (১০১) যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ, (১০২) বরাহোপনিষৎ, (১০৩) শাট্যায়নীয়োপনিষৎ, (১০৪) হয়গ্রীবোপনিষৎ, (১০৫) দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, (১০৬) গারুড়োপনিষৎ, (১০৭) কলিসন্তরণোপনিষৎ, (১০৮) জাবাল্যুপনিষৎ, (১০৯) গণেশপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ, (১১০) গণেশোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ, (১১১) সন্ন্যাসোপনিষৎ, (১১২) গোপীচন্দনোপনিষৎ, (১১৩) সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ, (১১৪) পিণ্ডোপনিষৎ, (১১৫) মহোপনিষৎ, (১১৬) বহ্‌বৃচোপনিষৎ, (১১৭) আশ্রমোপনিষৎ, (১১৮) সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ, (১১৯) যোগশিখোপনিষৎ এবং (১২০) মুক্তিকোপনিষৎ।

**মন্তব্য**। উল্লিখিত তালিকায়, ৬৮-সংখ্যক এবং ১১১-সংখ্যক উপনিষদ্দ্বয়ের একই নাম—সন্ন্যাসোপনিষৎ। তাহাদের বিবরণও ভিন্ন এবং শান্তিমন্ত্র হইতে জানা যায়, তাহারা বিভিন্ন বেদের অন্তর্গত। ৬৮-সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১১-সংখ্যক সন্ন্যাসোপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত। একই নামের দুইখানা উপনিষৎ আরও দুইস্থলে দৃষ্ট হয়। ৬৪-সংখ্যক মহোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং ১১৫-সংখ্যক মহোপনিষৎ অথর্ব্ববেদান্তর্গত। আবার, ৬৬-সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত এবং ১১৯-সংখ্যক যোগশিখোপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত।

১৩-সংখ্যক কঠোপনিষৎকে কোনও কোনও সংস্করণে কঠকোপনিষৎও বলা হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষৎসারঃ"-নামে আর একখানা মুদ্রিত উপনিষৎ দৃষ্ট হয়। ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত।

## ৩৯। মুক্তিকোপনিষদুক্ত উপনিষৎ-সমূহের নাম

মুক্তিকোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ৩০-৩৯ মন্ত্রে একশত আটটী উপনিষদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে আবার, এই অষ্টোত্তর-শতোপনিষদের মধ্যে কোন্ কোন্ উপনিষৎ কোন্ কোন্ বেদের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও বলা হইয়াছে। এ-স্থলে পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া উপনিষৎ-সমূহের নাম উল্লিখিত হইতেছে।

" ঐতরেয়-কৌষীতকী-নাদবিন্দ্বাত্মপ্রবোধনির্ব্বাণ মুদ্গলাক্ষমালিকা-ত্রিপুরা-সৌভাগ্য-বহ্বৃচানামৃগ্বেদগতানাং দশসংখ্যাকানামুপনিষদাং বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ ১ ॥

ঈশাবাস্য-বৃহদারণ্য-জাবাল-হংস-পরমহংস-সুবাল-মন্ত্রিকা-নিরালম্ব-ত্রিশিখী-ব্রাহ্মণমণ্ডলব্রাহ্মণাদ্বয়-তারক-পৈঙ্গল-ভিক্ষু-তুরীয়াতীতাধ্যাত্ম-তারসার-যাজ্ঞবল্ক্য-শাট্যায়নী-মুক্তিকানাং শুক্লযজুর্ব্বেদগতানামেকোনবিংশতিসংখ্যা-কানামুপনিষদাং পূর্ণমদ ইতি শান্তিঃ ॥ ২ ॥

কঠবল্লী-তৈত্তিরীয়ক-ব্রহ্ম-কৈবল্য-শ্বেতাশ্বতর-গর্ভ-নারায়ণামৃতবিন্দ্বমৃতনাদ-কালাগ্নিরুদ্র-ক্ষুরিকা-সর্ব্বসার-শুক-রহস্য-তেজোবিন্দু-ধ্যানবিন্দু-ব্রহ্মবিদ্যা-যোগতত্ত্ব-দক্ষিণামূর্ত্তি-স্কন্দ-শারীরক-যোগশিখৈকাক্ষরাক্ষ্যবধূত-কঠরুদ্রে-হৃদয়-যোগ-কুণ্ডলিনী-পঞ্চব্রহ্ম-প্রাণাগ্নিহোত্র-বরাহ-কলিসংতরণ-সরস্বতীরহস্যানাং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদগতানাং দ্বাত্রিশ-সংখ্যাকানা-মুপনিষদাং সহ নাববত্বিতি শান্তিঃ ॥ ৩ ॥

কেন-ছান্দোগ্যারুণি-মৈত্রায়ণি-মৈত্রেয়ী-বজ্রসূচিকা-যোগচূড়ামণি-বাসুদেব-মহৎ-সংন্যাসাব্যক্ত-কুণ্ডিকা-সাবিত্রী-রুদ্রাক্ষ-জাবালদর্শনি-জাবালীনাং সামবেদগতানাং ষোড়শসংখ্যাকানামুপনিষদামপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যাথর্ব্বশিরোঽথর্ব্বশিখা-বৃহজ্জাবাল-নৃসিংহতাপনী-নারদপরিব্রাজক-সীতা-শরভ-মহানারায়ণ-রামরহস্য-রামতাপনী-শাণ্ডিল্য-পরমহংস-পরিব্রাজকান্নপূর্ণা-সূর্য্যাত্ম-পাশুপত-পরব্রহ্ম-ত্রিপুরাতপন-দেবী-ভাবনা-ভস্ম-জাবাল-গণপতি-মহাবাক্য-গোপালতপন-কৃষ্ণ-হয়গ্রীব-দত্তাত্রেয়-গারুড়ানামথর্ব্ববেদগতানামেকত্রিংশসংখ্যাকানামুপ নিষদাং ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ ॥৫॥"

বঙ্গানুবাদ। ঐতরেয়, কৌষীতকি, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, নির্ব্বাণ, মুদ্গল, অক্ষমালিকা, ত্রিপুরা, সৌভাগ্য এবং বহ্বৃচ—এই দশখানি উপনিষৎ হইতেছে ঋগ্বেদের অন্তর্গত। "বাঙ্মে মনসি"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥১॥

ঈশ ( বা ঈশাবাস্য ), বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয়-তারক, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, তুরীয়াতীত, অধ্যাত্ম, তারসার, যাজ্ঞবল্ক্য, শাট্যায়নী এবং মুক্তিকা—এই একোনবিংশতি সংখ্যাক উপনিষৎ হইতেছে শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। "পূর্ণমদঃ"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥২॥

কঠবল্লী ( কঠ ), তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ ( নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ), অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিকা, সর্ব্বসার, শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, স্কন্দ, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষর, অক্ষি, অবধূত, কঠরুদ্র, হৃদয় ( রুদ্র-হৃদয় ), যোগকুণ্ডলিনী, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, বরাহ, কলিসন্তরণ এবং সরস্বতীরহস্য—এই দ্বাত্রিংশ-সংখ্যক ( বত্রিশখানি ) উপনিষৎ হইতেছে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। "সহ নাববতু"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥৩॥

কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, বজ্রসূচিকা, যোগচূড়ামণি, বাসুদেব, মহৎ ( মহোপনিষৎ ), সংন্যাস, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল-দর্শন এবং জাবালী—এই ষোলখানি উপনিষৎ হইতেছে সামবেদের অন্তর্গত। "আপ্যায়ন্তু"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥৪॥

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহতাপনী, নারদপরিব্রাজক, সীতা,

শরভ, মহানারায়ণ ( ত্রিপাদ্‌বিভূতি-মহানারায়ণ ), রামরহস্য, রামতাপনী, শাণ্ডিল্য, পরমহংস-পরিব্রাজক, অন্নপূর্ণা, সূর্য্যাত্ম, পাশুপত, পরব্রহ্ম, ত্রিপুরাতাপন, দেবী, ভাবনা, ভস্ম ( ভস্মজাবাল ), জাবাল, গণপতি, মহাবাক্য, গোপাল-তাপন ( গোপাল-তাপনী ), কৃষ্ণ, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয় এবং গারুড়—এই একত্রিশ খানি উপনিষৎ হইতেছে অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। "ভদ্রং কর্ণেভিঃ"—ইত্যাদি হইতেছে ইহাদের শান্তিমন্ত্র ॥৫॥

এইরূপে দেখা গেল—ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত দশখানি, শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত উনিশখানি, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বত্রিশখানি, সামবেদের অন্তর্গত ষোলখানি এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত একত্রিশখানি—মোট একশত আটখানি উপনিষদের নাম মুক্তিকা-উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থে একশত বিশখানির নাম আছে—বারখানা উপনিষদের নাম বেশী। এই বারখানা উপনিষদের সমস্তই যে মুক্তিকোপনিষদুক্ত উপনিষৎ-সমূহ হইতে অতিরিক্ত, তাহা নহে। নয়-খানা উপনিষৎ-মাত্র অতিরিক্ত।

মুক্তিকোপনিষদে নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং গোপালতাপনী-এই তিন নামে তিনখানা মাত্র উপনিষদের নাম আছে। কিন্তু নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে প্রত্যেক খানি উপনিষৎকে—পূর্ব্বতাপনী ও উত্তরতাপনী-এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইখানি উপনিষদ্‌রূপে উল্লিখিত করা হইয়াছে। তাহাতে মুক্তিকোপনিষদের তিনখানি উপনিষৎই নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে ছয় খানা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে উপনিষদের সংখ্যা তিনখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব্বে ( ৩৮-অনুচ্ছেদের শেষভাগে মন্তব্যে ) বলা হইয়াছে, নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে—মহোপনিষৎ আছে দুইখানি, একখানা সামবেদান্তর্গত, আর একখানা অথর্ব্ববেদান্তর্গত ; সন্ন্যাসোপনিষদ্‌ও আছে দুইখানি, এক খানা সামবেদান্তর্গত, আর একখানা শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত ; এবং যোগশিখোপনিষৎও আছে দুইখানি, একখানা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত, আর একখানা শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত। ইহাদের মধ্যে সামবেদান্তর্গত মহোপনিষৎ, সাম-বেদান্তর্গত সন্ন্যাসোপনিষৎ এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত যোগশিখোপনিষৎ—এই তিনখানার নাম মুক্তিকোপনিষদে দৃষ্ট হয়। অপর তিনখানার নাম নির্ণয়-সাগরের গ্রন্থে অতিরিক্ত। এতদ্ব্যতীত আরও ছয়খানা অতিরিক্ত উপনিষদের নামও নির্ণয়সাগরের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মোট নয়খানা অতিরিক্ত উপনিষদের নাম এই ঃ—

মহোপনিষৎ ( অথর্ব্ববেদান্তর্গত), সন্ন্যাসোপনিষৎ ( শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত ), যোগশিখোপনিষৎ (শুক্লযজু-র্ব্বেদান্তর্গত), গণেশপূর্ব্বতাপনী, গণেশোত্তরতাপনী, ব্রহ্মবিন্দু, গোপীচন্দন, পিণ্ড এবং আশ্রম।

এইরূপে নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থে অতিরিক্ত বারখানা উপনিষদের নামের সমাধান হইল।

## ৪০। অষ্টোত্তর শতের অতিরিক্ত উপনিষৎ

মুক্তিকোপনিষৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ১০৮টী শ্রুতির নাম উল্লেখ করিয়াও বলিয়াছেন—

"সর্ব্বোপনিষদাং মধ্যে সারমষ্টোত্তরশতম্ ॥ ৪৪ ॥—সমস্ত উপনিষদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টোত্তর-শত-উপনিষৎই সার।"

ইহাতে বুঝা যায়, এই একশত আটখানা উপনিষদ্ ব্যতীত আরও অনেক উপনিষৎ আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থেও এমন কয়েকখানা শ্রুতির নাম আছে, যাহা মুক্তিকোপনিষদোক্ত অষ্টোত্তর-শতোপনিষদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আবার, প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থাদিতেও এরূপ উপনিষদের নাম দৃষ্ট হয়, যাহা নির্ণয়সাগর-প্রেসের গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। যথা—মাঠর-শ্রুতি, সৌপর্ণ-শ্রুতি, ভাল্লবেয়-শ্রুতি, কোটরব্য-শ্রুতি, চতুর্ব্বেদশিখা, কৃষ্ণতাপনী, মাধ্যন্দিনী-শ্রুতি, নারায়ণ-বাসুদেবোপনিষৎ ইত্যাদি।

শ্রুতির নাম উল্লেখ না করিয়াও প্রাচীন আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যে কোনও কোনওটী হয়তো বর্ত্তমান সময়ে অজ্ঞাত কোনও শ্রুতির অস্তিত্বের কথাই জানাইতেছে।

## ৪১। মুক্তিকোপনিষদে উল্লিখিত শ্রুতিগুলিকে "সার" বলার তাৎপর্য্য

মুক্তিকোপনিষদে উল্লিখিত একশত আটটী উপনিষৎকে সমস্ত উপনিষদের "সার" বলার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে—যে সমস্ত শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সেই সমস্ত শ্রুতি "অসার।" কেননা, পরব্রহ্মের নিশ্বাসস্বরূপ কোনও শ্রুতিই "অসার" হইতে পারে না। মুক্তিকোপনিষদের এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াই মনে হয় যে—যে সকল শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সে-সকল শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি এই একশত আটটী শ্রুতির মধ্যেই বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ মনে করার হেতু এই যে, এই একশত আটটী শ্রুতির মধ্যেও একই তত্ত্ব একাধিক শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে—কোনও স্থলে বা সংক্ষেপে, কোনও স্থলে বা বিস্তৃতরূপে।

ইহাই যে মুক্তিকা-শ্রুতির অভিপ্রায়, মুক্তিকা-শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। অঞ্জনা-তনয় শ্রীহনুমান্ মুক্তিলাভের উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন—"মুক্তির নিমিত্ত একমাত্র মাণ্ডুক্য-শ্রুতিই যথেষ্ট। কিন্তু কেবল মাণ্ডুক্য-শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াও যদি জ্ঞান-বিকাশ না হয়, তাহা হইলে দশখানি উপনিষৎ পাঠ করিবে এবং শীঘ্রই আমার ধামে গমন করিতে পারিবে। তাহাতেও যদি জ্ঞানের দৃঢ়তা না জন্মে, তাহা হইলে বত্রিশখানি উপনিষৎ অভ্যাস করিবে। বিদেহ-মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে। শান্তিমন্ত্রসহ এই সকল উপনিষদের ক্রম বলিতেছি, তুমি তাহা শুন।

মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে ॥
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং দশোনিষদং পঠ।
জ্ঞানং লব্ধ্বাঽচিরাদেব মামকং ধাম যাস্যসি ॥
তথাপি দৃঢ়তা নো চেদ্‌বিজ্ঞানস্যাঞ্জনাসুত।
দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যস্য নিবর্ত্তয় ॥
বিদেহমুক্তাবিচ্ছা চেদষ্টোত্তরশতং পঠ।
তাসাং ক্রমং সশান্তিঞ্চ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ১।২৬-২৯ ॥"

এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—মাণ্ডুক্য-শ্রুতিতে যাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়াছে,

দশখানি শ্রুতিতে তাহাই একটু বিস্তৃতরূপে এবং অষ্টোত্তরশত উপনিষদে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। সকল শ্রুতির সার মর্ম্ম একই—ইহাই তাৎপর্য্য।

সুতরাং মুক্তিকোপনিষদে অনুল্লিখিত শ্রুতিগুলিতে যাহা আছে, উল্লিখিত শ্রুতিগুলিতেও সেই সকল তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে; এজন্যই এই শ্রুতিগুলিকে সমস্ত শ্রুতির "সার" বলা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য। অনুল্লিখিত শ্রুতিগুলি "অসার"—ইহা তাৎপর্য্য হইতে পারে না।

## ৪২। বিভিন্ন-শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের বিভিন্ন ধর্ম্ম—সমস্তই গ্রহণীয়

সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্যই হইতেছেন—একই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থভূত তত্ত্ব। ব্রহ্ম যখন এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহার তত্ত্বও হইবে এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং বিভিন্ন শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরুদ্ধও হইতে পারে না। তবে একই তত্ত্ব বিভিন্ন ঋষির নিকটে বিভিন্ন বৈচিত্রীতে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে, করিয়াছেও। এজন্যই বিভিন্ন ঋষির উপলব্ধিতে একই তত্ত্ব বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় হইয়াছে; তাহাতেই শ্রুতিসমূহও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বৈশিষ্ট্যের কোনওটীই অসত্য নয়। পরব্রহ্মের অনন্ত বৈচিত্রী; কাহারও নিকটে কোনও কোনও বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঋষির নিকটে যে বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি বলিতে পারেন না—ব্রহ্মের মধ্যে সেই বৈচিত্রী ব্যতীত অপর কোনও বৈচিত্রীই নাই। তাহা বলিলে অসীম ব্রহ্মকে সসীম করিয়া তোলা হইবে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

বেদের সকল শাখায় হয়তো ব্রহ্মের সকল বৈশিষ্ট্যের—সকল মাহাত্ম্যের—কথা সমান ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। কোনও এক শাখায় বা কোনও এক শ্রুতিতে যদি পরব্রহ্মের কোনও ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত না থাকে, অথচ তাহা যদি অন্য শাখায় বা অন্য শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে যে স্থলে উল্লেখ নাই, সে-স্থলেও অন্যশ্রুতির উল্লিখিত ধর্ম্মের উপসংহার করিতে হইবে। বেদান্তের "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥"—এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষু আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ ক্বচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা যাবন্তো যত্র শ্রূয়ন্তে, তাবন্ত এব তত্র প্রতিপ্রত্তব্যাঃ ? কিংবা সর্ব্বে সর্ব্বত্র ? ইতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে। —আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ। কস্মাৎ ? সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাম্।"

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহের মধ্যে কোনও কোনও শ্রুতিতে ব্রহ্মের-আনন্দস্বরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্বাদি ধর্ম্মের মধ্যে কোনও কোনও ধর্ম্মের উল্লেখ আছে; আবার কোনও কোনও শ্রুতিতে সে-সকল ধর্ম্মের সমস্তের উল্লেখ নাই। ইহাতে সংশয় জন্মিতে পারে যে—যেখানে যে ধর্ম্মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে কি কেবল সেই ধর্ম্মটীই গৃহীত হইবে ? না কি সকল স্থলেই সকল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে ? পূর্ব্বপক্ষ হয়তো বলিতে পারেন—যেখানে যে ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সেখানে কেবল সেইটীই গ্রহণীয়, অন্যগুলি গ্রহণীয় নয়। ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।" অর্থাৎ—

আনন্দাদি সমস্ত ব্রহ্মধর্ম্মই সর্ব্বত্র গ্রহণীয়; সর্ব্বত্র সমুদয় ধর্ম্ম সমাবেশিত করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যেহেতু, সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক—অভিন্ন। তাই, এক শাখায় বা এক শ্রুতিতে কথিত ব্রহ্মধর্ম্ম অন্য শাখায় বা অন্য শ্রুতিতেও নীত হয়। সুতরাং ব্রহ্মধর্ম্মসমূহের সার্ব্বত্রিকত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—কোনও শ্রুতি বা কোনও শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ে উপেক্ষণীয় নহে। সকল শ্রুতিবাক্যেরই সমান গুরুত্ব।

এই আলোচনা হইতে ইহাও বুঝা গেল যে—মুক্তিকোপনিষদে যে সমস্ত শ্রুতির নাম উল্লিখিত হয় নাই, সে সমস্ত শ্রুতিতেও, কিম্বা তাহাদের কোনও একটীতেও, যদি পরব্রহ্মের কোনও ধর্ম্মের বিশেষভাবে পরিস্ফুট কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাও সর্ব্বত্র গ্রহণীয় হইবে।

## ৪৩। গোপাল-তাপনী-আদি শ্রুতি

সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ যে একশত আট খানা উপনিষদের নাম মুক্তিকা-শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, গোপাল-তাপিনী-শ্রুতি, কৃষ্ণোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, নারায়ণোপনিষৎ ( নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ )-আদি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গোপাল-তাপনী-আদি শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব, মুখ্যত্ব, পারমার্থিকত্ব, এবং প্রামাণ্যত্বাদি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

গোপাল-তাপনী-আদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্ব, নরলীলত্ব, গোপীজনবল্লভত্ব, গোপ-গোপী-গবাবীতত্ব, মায়াতীতত্ব, রসিকত্ব, আনন্দঘন-বিগ্রহত্ব, পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মানতাসত্ত্বেও স্বরূপগত অপরিচ্ছন্নত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, বেদান্তসূত্র-সিদ্ধান্ত অনুসারে সে-সমস্তও যে ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে সর্ব্বত্র গ্রহণীয়, তাহাতেও সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারেনা ( পূর্ব্ববর্ত্তী ৪২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। বেদার্থ-পরিপূরক অপৌরুষেয় পুরাণাদি শাস্ত্রে গোপালতাপনী-আদি শ্রুতিপ্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্মসমূহই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ঋষিগণ এবং প্রাচীন আচার্য্যগণ এই সমস্ত পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে শ্রুতিবাক্যকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া বস্তুতঃ সে-সমস্ত শ্রুতিরই সারবত্তা এবং প্রামাণ্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার গোবিন্দাষ্টকাদি স্তোত্রে শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুরাণ-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার বন্দনা করিয়া এবং বিষ্ণুসহস্র-নামের ভাষ্য করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও শ্রীমদ্ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদির টীকায় এই সমস্ত শ্রুতির অনুকূল অর্থ প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত শ্রুতির যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং গোপাল-তাপিনী-আদি শ্রুতির প্রামাণ্যত্বাদি সম্বন্ধে কোনওরূপ আপত্তির কারণই থাকিতে পারেনা।

## ৪৪। বেদাঙ্গ

বেদের আবার ছয়টী অঙ্গ আছে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ্। সর্ব্বসম্বাদিনী ( ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা ) হইতে এস্থলে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে।

**শিক্ষা**—"শ্রীবিষ্ণুসূক্তাদীনাং কর-স্বরাদের্জ্ঞানায় শিক্ষা।" অমরকোষ বলেন—"অকারাদিবর্ণানাং স্থূলকরণ-প্রযত্নবোধিকা অ-কু-হ-বিসর্জ্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যা ইত্যাদিকা শিক্ষা।" বিষ্ণুসূক্তাদির উচ্চারণাদির বিষয় যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিক্ষা।

**কল্প**—"আনুপূর্ব্ব্যাঃ কল্পঃ।" "যাগক্রিয়াণাম্ উপদেশঃ কল্পঃ (অমর)।" যাগক্রিয়াতে কোন্ কার্য্য অগ্রে এবং কোন্ কার্য্য পরে কর্ত্তব্য—তৎসমস্ত যে শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম কল্প।

**ব্যাকরণ**—"সাধুত্বস্য—ব্যাকরণম্।" "সাধুশব্দান্বাখ্যানং ব্যাকরণম্ (অমর)।" শব্দের, পদের এবং বাক্যের সাধুত্ব বা নির্ভুলত্বাদির বিষয় যে শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম ব্যাকরণ।

**নিরুক্ত**—"পদার্থস্য—নিরুক্তম্।" "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চয়েনোক্তং নিরুক্তম্ (অমর)।" বেদোক্ত পদের বা শব্দের অর্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত।

**ছন্দ**—"মন্ত্রাণাং ছন্দঃ।" "শ্রুতিচ্ছন্দসাং প্রত্যায়কং শাস্ত্রং ছন্দোবিচিতিঃ (অমর)।" শ্রুতিমন্ত্রাদি ছন্দোবন্ধভাবে কিরূপে পাঠ করিতে হয়, তাহা যাহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম ছন্দ।

**জ্যোতিষ্**—"শ্রীবিষ্ণোর্মহোৎসবাদিসময়স্য জ্যোতিঃ।" "গ্রহণাদিগণনাশাস্ত্রং জ্যোতিঃ (অমর)।" ভগবানের পর্ব্বমহোৎসবাদির সময়-নির্দ্ধারণাদি এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদি ও তিথি-আদি যদ্দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহার নাম জ্যোতিষ্।

বেদাঙ্গ-সমূহও উপাসনার আনুকূল্যবিধায়ক।

৪৫। প্রস্থানত্রয়

**প্রস্থান।** তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রকে প্রস্থান বলে। তিনটী প্রস্থান আছে—শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান এবং ন্যায়-প্রস্থান।

**শ্রুতি-প্রস্থান।** বেদোপনিষদাদিকে শ্রুতি-প্রস্থান বলে। গুরু-মুখে শুনিয়া শুনিয়া শিষ্যগণ বেদাদি-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন বলিয়া বেদোপনিষদাদিকে শ্রুতি বলে।

**স্মৃতি-প্রস্থান।** পুরাণ, ইতিহাসাদিকে স্মৃতি বলে। বেদার্থ-পরিপূরক ইতিহাস-পুরাণাদি বেদার্থ স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া এবং বেদার্থ-স্মরণেই ইতিহাস-পুরাণাদি প্রকটিত বলিয়া, এই সকল শাস্ত্রকে স্মৃতি-শাস্ত্র বলা হয়। মহাভারতরূপ ইতিহাসের অঙ্গীভূত বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও স্মৃতি-শাস্ত্র।

**ন্যায়-প্রস্থান।** ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়-প্রস্থান বলে। ব্রহ্মসূত্রে সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক শ্রুতিবাক্য-সমূহের সমন্বয় স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থকে ন্যায়-প্রস্থান বলে।*

বেদান্ত-ভাষ্যকারগণের সকলেই স্ব-স্ব-ভাষ্যকে এই প্রস্থান-ত্রয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক যাহা এই প্রস্থানত্রয়ের অনুমোদিত নহে, ভারতীয় সাধনমার্গে, বা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে, তাহা কখনও সমাদৃত হয় নাই। ইহাই ভারতীয় কৃষ্টির এবং ঐতিহ্যের একটী বৈশিষ্ট্য। বেদানুগত্যই ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল রহস্য।

নমো বেদান্তবেদ্যায়

* শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য উল্লিখিত প্রস্থানত্রয় ব্যতীতও একটী চতুর্থ প্রস্থান স্বীকার করেন—শ্রীমদ্ভাগবত। তিনি বলেন, শ্রুতিবাক্যের অর্থসম্বন্ধে কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্বারা তাহার নিরসন হইতে পারে; গীতাবাক্যের সংশয় নিরসিত হইতে পারে ব্রহ্মসূত্র (ন্যায়প্রস্থান) দ্বারা এবং ব্রহ্মসূত্র-সম্বন্ধীয় সংশয় দূরীভূত হইতে পারে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা। শ্রীমদ্ভাগবতকে তিনি "সমাধিভাষা" বলেন—ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতে ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা তিনটী প্রস্থান স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

# গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

## প্রথম পর্ব্ব

## ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

### প্রথমাংশ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণসম্মত ব্রহ্মতত্ত্ব

# বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৬-শ্লোক ॥

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১-শ্লোক ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥
—শ্রীচৈ. চ. ৩।২।১-শ্লোক ॥

# শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তি

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান ॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান-পরিবার।

—শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১০৬-৮

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ ॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥

—শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১৩১-৩৩

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
অপাদান করণাধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তার চিহ্ন ॥

—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৩৪-৩৫

ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।...
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।...
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।

—শ্রীচৈ চ. ২।৬।১৪২-৪৪

# ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

## প্রথম অধ্যায়

( ব্রহ্ম-শব্দের তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম সশক্তিক )

### ১। ব্রহ্ম

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তের মূল যিনি, অথবা যাঁহাতে তৎসমস্ত অবস্থিত, বেদ-শাস্ত্র তাঁহাকেই ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-শব্দটী তাঁহার স্বরূপ-বাচক; ইহার অর্থ বৃহত্তম বস্তু। সেই বস্তুটী কিসে বৃহৎ এবং কিরূপেই বা বৃহৎ, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

### ২। ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ

বৃংহ-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন। বৃংহ-ধাতু বৃহত্ত্ব-বাচক। ব্রহ্ম—বৃংহ + মন্, ঘে। বৃংহ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয়-যোগে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; ইহার অর্থ—বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। যিনি নিজে বৃহৎ ( বৃংহতি ) এবং যিনি বৃহৎ ( বড় ) করেন ( বৃংহয়তি ), তিনি ব্রহ্ম। তাহা হইলে জানা গেল—যিনি ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য, তিনি নিজে বৃহৎ বা বড় এবং তিনি বড় করেনও। যিনি বড় করিতে পারেন, নিশ্চয়ই বড় করিবার শক্তিও তাঁহার আছে; সুতরাং "বৃংহয়তি"-অর্থে—ব্রহ্মের যে অন্ততঃ একটা শক্তি—বড় করার শক্তি—আছে, তাহাই বুঝা যায়। শ্রুতি বলেন, একটা নয়, ব্রহ্মের অনেক শক্তি আছে এবং এ-সমস্তই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি; অর্থাৎ কস্তুরীর গন্ধের ন্যায়, অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়, জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্বের ন্যায়, ব্রহ্মের শক্তিও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। এ-সমস্ত শক্তি তাঁহার স্বরূপগত, তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। "পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ॥৬।৮॥—এই ব্রহ্মের বিবিধ পরা শক্তি আছে; জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে। এই পরাশক্তি এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী।" বাস্তবিক, ব্রহ্মের বিবিধ—অনন্তবিধ—শক্তিই থাকার কথা; কারণ, তিনি "বৃংহতি"—বৃহৎ, বড়। কাহা অপেক্ষা, কিসে এবং কতটুকু বড়, তাহার কোনও উল্লেখ কোথাও না থাকায় বুঝিতে হইবে, তিনি সকল অপেক্ষা সকল বিষয়ে সর্ব্বাধিক রূপেই বৃহৎ বা বড়। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। ইহা অনুমান মাত্র নহে, শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই তাঁহার এইরূপ বৃহত্ত্বার কথা বলিয়াছেন। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ।৬।৮॥—তাঁহার সমান বা তাঁহার অধিকও দেখা যায় না।" সুতরাং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপেক্ষা বৃহৎ—তিনি স্বরূপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। স্বরূপে বৃহৎ হওয়াতে তিনি সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। শক্তিতে বৃহৎ হওয়ায় শক্তির সংখ্যায় এবং প্রত্যেক শক্তির

পরিমাণেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বৃহৎ। তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং প্রত্যেক শক্তির পরিমাণও তাঁহাতে অনন্ত। শক্তি অর্থ কার্য্যক্ষমতা ; শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ কার্য্যদ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব সূচিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি-বাক্যই ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়ার কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে—"জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের বা ইচ্ছার ক্রিয়াও আছে। তিনি যখন সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে বৃহৎ, তখন বুঝিতে হইবে—তাঁহার শক্তির কার্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অধিক। শ্রুতি বলেন—"অনন্তং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মের এই আনন্ত্য সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্যে, শক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রীতে।

শব্দার্থ প্রকাশ করিবার জন্য মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি প্রয়োগের সর্ব্বোত্তম স্থল যদি কিছু থাকে, তবে তাহা হইতেছে পরতত্ত্ব-বাচক শব্দ ; কারণ, পরতত্ত্বই একমাত্র পরম-স্বতন্ত্র- সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্নের অতীত—তত্ত্ব। তাই, পরতত্ত্ব-বাচক "ব্রহ্ম"-শব্দের অর্থ মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতেই করা সঙ্গত। এই বৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি" এতদুভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং এতদুভয় অর্থের চরম-সীমাপর্য্যন্তই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝা যাইবে—ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব আনন্ত্য পর্য্যন্ত ব্যাপক এবং এই আনন্ত্য কেবল স্বরূপে নয়, পরন্তু শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং প্রকাশ-বৈচিত্রীতেও।

ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া যদি "বৃংহতি" এবং "বৃংহয়তি"—এই দুইটী অংশের কোনও একটীকে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থ হইবে অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের অপূর্ণত্বজ্ঞাপক, ব্রহ্মত্বের হানিজ্ঞাপক। উভয় অংশের অর্থ গ্রহণে এবং উভয় অর্থের সর্ব্বোত্তম ব্যাপকতাতেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব এবং পরতত্ত্ব সূচিত হইতে পারে। ভগবৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি ইতি শ্রুতিশ্চ—ব্রহ্ম নিজে বড় এবং বড় করেন, এইরূপ শ্রুতিও আছে।" এ জন্যই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥১।১২।৫৭॥ —বৃহত্ত্ব এবং বৃংহণত্ব আছে বলিয়াই ব্রহ্ম হইতেছেন পরমতত্ত্ব।" শ্রুতিও ইহার সমর্থন করেন। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥—তাঁহার সমানও কিছু দেখা যায় না, তাঁহা অপেক্ষা বড়ও কিছু দেখা যায় না।" এই উক্তি দ্বারা "বৃংহতি"-অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পূর্ব্বোদ্ধৃত "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥"—এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির এবং শক্তিক্রিয়ার কথা জানা যায় বলিয়া "বৃংহয়তি"-অংশ গ্রহণের কথাই জানা যায়।

এ-স্থলে ব্রহ্ম-শব্দের যে অর্থ করা হইল, তাহা প্রকৃতি-প্রত্যয়-লব্ধ মুখ্যাবৃত্তির অর্থ এবং এই অর্থ যে শ্রুতিবাক্যদ্বারা সমর্থিত, তাহাও দেখান হইয়াছে।

## ৩। শক্তির স্বাভাবিকত্ব

কোনও বস্তুর যে শক্তি বস্তুর সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান, তাহাকেই সেই বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি বলে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি ; ইহাকে অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব-শক্তিকেও জল হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; অত্যন্ত শীতল অবস্থাতেই থাকুক, কি অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থাতেই থাকুক, জল অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবেই। ইহা জলের স্বাভাবিকী শক্তি।

অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহেরও অগ্নির ন্যায় দাহিকাশক্তি দৃষ্ট হয়। আগুনে রাখার পূর্ব্বে লৌহের এই দাহিকা শক্তি থাকে না, আগুন হইতে তুলিয়া আনার কতক্ষণ পরেও তাহা থাকে না। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের এই দাহিকা-শক্তি লৌহের স্বাভাবিকী শক্তি নহে, ইহা আগন্তুকী শক্তি মাত্র; স্বাভাবিকী হইলে সকল সময়েই ইহা লৌহে থাকিত। বস্তুতঃ, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত অবস্থাতেও ইহা লৌহের দাহিকা শক্তি নহে; যে অগ্নি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের সহিত লৌহকে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়াছে, ইহা সেই অগ্নিরই শক্তি, লৌহের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় মাত্র। এজন্য অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অবস্থায় লৌহের দাহিকা শক্তি থাকিলেও সেই দাহিকা-শক্তিকে কেহই লৌহের শক্তি বলে না; অর্থাৎ কোনও বস্তুতে কোনও আগন্তুকী শক্তির আবির্ভাব হইলেও সেই আগন্তুকী শক্তিকে সেই বস্তুর শক্তি বলা হয় না। যাহা বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি, যে শক্তি কোনও বস্তুর সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাকেই সেই বস্তুর শক্তি বলা হয়। সুতরাং কোনও বস্তুর শক্তি আছে বলিলেই বুঝিতে হইবে, এই শক্তিটী সেই বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি, আগন্তুকী নহে; "স্বাভাবিকী"-শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও ইহাই বুঝিতে হইবে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বলিলেই বুঝা যায়—এই দাহিকা শক্তিটী হইতেছে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি।

এইরূপে ব্রহ্মেরও শক্তি আছে বলিলেই বুঝা যায়, ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী। তথাপি, ব্রহ্মের শক্তিমত্তার কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী" শক্তি আছে। "পরাহস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥৬।৮॥"

## ৪। শক্তির নিত্যত্ব

শক্তির সহিত শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, তাহা যদি নিত্য হয় এবং শক্তিমান্ বস্তুও যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই শক্তিও হইবে নিত্য। ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদি এবং নিত্য বস্তু; তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিও তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত; সুতরাং এই সম্বন্ধও নিত্য। কাজেই ব্রহ্মের শক্তিও যে নিত্য, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ( ব্রহ্মের শক্তি )

[ ব্রহ্মের শক্তি যখন স্বাভাবিকী এবং নিত্যা, তখন ব্রহ্মের উল্লেখ না করিয়া ব্রহ্মের শক্তির আলোচনাও সম্ভব নয়, আবার ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ না করিয়াও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা সম্ভব নয়। অগ্নির উল্লেখ না করিয়া দাহিকা-শক্তির আলোচনা যেমন সম্ভব নয়, আবার দাহিকা-শক্তির উল্লেখ না করিয়া অগ্নি-সম্বন্ধে আলোচনাও যেমন সম্ভব নয়. তদ্রূপ।

পরবর্ত্তী আলোচনায় শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইবে যে—ব্রহ্ম সবিশেষ, ব্রহ্ম ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণই পর-ব্রহ্ম। কিন্তু এই আলোচনায় ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে ; সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিলেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ও ভগবত্ত্বাদির আলোচনা করার সুবিধা হইবে, ভগবত্ত্বাদির আলোচনার অনুসরণ করারও সুবিধা হইবে। এজন্য ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু আলোচনা করা হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় তাঁহার সবিশেষত্বের ও ভগবত্ত্বাদির উল্লেখ অপরিহার্য্য হইবে। কেবল শক্তিসম্বন্ধীয় আলোচনায় নহে, পরবর্ত্তী কয়েক অনুচ্ছেদেও তাহা অপরিহার্য্য হইবে। সবিশেষত্ব ও ভগবত্ত্বাদি প্রমাণিত করার পূর্ব্বে তাহাদের উল্লেখের জন্য সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ]

### ৫। ব্রহ্মের শক্তি

ব্রহ্মের যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, তাহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্রহ্মের তিন রকম শক্তির কথা দৃষ্ট হয়।

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-বাক্যে "পরা শক্তির" কথা, "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানাং স্বরূপাঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৫॥", "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১০॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥৭।১৪ ॥" —ইত্যাদি গীতাবাক্যে ত্রিগুণাত্মিকা "মায়াশক্তির" কথা এবং "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( ৭।৫ )-বাক্যে "জীবশক্তির" কথা জানা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি, অথচ এস্থলে কেবল তিন রকম শক্তির কথা বলা হইতেছে। ইহার সমাধান কি ? সমাধান এই যে, উল্লিখিত তিন রকম শক্তিরই অনন্ত বৈচিত্রী আছে ; সে-সমস্ত বৈচিত্রীও শক্তিই ; সুতরাং প্রধান-শক্তি তিনটী হইলেও অনন্ত-বৈচিত্রীরূপে তাহাদের অভিব্যক্তিতে শক্তির সংখ্যা অনন্তই হয়। "কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১১৬ ॥" পরাশক্তির অপর নামই চিচ্ছক্তি।

## ৬। তিনটী প্রধান শক্তি

এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মের তিনটী প্রধান শক্তি আছে---পরাশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। পরাশক্তিকে স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে এবং মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। আর, জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তিও বলা হয়। এজন্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ভগবৎসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন---"তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশক্তৌ সা চ ত্রিবিধা---অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ ॥ ( বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ ॥ ৬১ পৃষ্ঠা ) ॥" এই তিনটী শক্তিসম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

## ৭। স্বরূপ-শক্তি

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যে যে "পরাশক্তির"কথা বলা হইয়াছে, তাহারই অপর নাম হইল স্বরূপ-শক্তি। এই শক্তিটী ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-ভূতা শক্তি বলে। ইহা জড়-প্রতিযোগী ও জড়-বিরোধী চিন্ময়ী( চেতনাময়ী ) শক্তি ; এজন্য ইহাকে **চিচ্ছক্তিও** বলা হয়। এই শক্তিটীর সহিতই ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ ( স্বরূপে অবস্থিতিবশতঃ ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ ) আছে বলিয়া ইহাকে **অন্তরঙ্গা** শক্তিও বলা হয়। স্বরূপে এবং মহিমায় এই শক্তিটী অপর দুইটী শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিয়া ইহাকে **"পরাশক্তিও"** বলে। এইরূপে, এই শক্তিটীর এই কয়টী নাম পাওয়া গেল---চিচ্ছক্তি, স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি এবং পরাশক্তি।

স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির তিনটী বৃত্তি---সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তাঁহার শক্তিই চিচ্ছক্তি। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ।১৮০-৮৮॥" "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥১।১২।৬৯॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন---"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। * *। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। **। অত্র হ্লাদকরোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী, তথা সত্তরূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র চ উত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনীসংবিৎ হ্লদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ।" এই সমস্ত উক্তির মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে।

পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সৎ, চিৎ ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অভিব্যক্তিপ্রাপ্তা চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী নামে কথিত হয়। "সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৪-৫৫॥"

পরব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটী বস্তুর কোনও একটীকে যেমন অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়না, তদ্রূপ সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী—এই তিনটী শক্তিরও ( অথবা একই চিচ্ছক্তির এই তিনটী বৃত্তিরও ) কোনও একটীকে অপর দুইটী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে-স্থলেই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিতের যুগপৎ বিকাশ দৃষ্ট হয়। চিদ্ বস্তু স্বপ্রকাশ ; চিচ্ছক্তিও স্বপ্রকাশ এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিও স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে। সূর্য্য উদিত হইয়া নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ বৃত্তিবিশেষের দ্বারা পরব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তি ( স্বরূপ-শক্তির পরিণতি ) বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়, সেই বৃত্তিবিশেষকে **বিশুদ্ধ-সত্ত্ব** বলে। "তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি, তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং তচ্চান্য-নিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞান-বৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯॥-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী॥" বহিরঙ্গা মায়ার সহিত ইহার কোনওরূপ স্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বলে।

এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এই তিনটী শক্তি যুগপৎ অভিব্যক্ত থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান থাকে না। কোনও স্থলে তিনটী শক্তিই হয়তো সমপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার কোনও স্থলে বা কোনও একটী অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। যখন সন্ধিনী শক্তি অপর দুইটী শক্তি হইতে অধিকরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে **সন্ধিনী-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব** ; এইরূপে সম্বিতের প্রাধান্য হইলে **সম্বিৎ-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব** এবং হ্লাদিনীর প্রাধান্য হইলে **হ্লাদিনী-প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্ব** বলা হয়। সাধারণতঃ হ্লাদিনী--শব্দে হ্লাদিনী-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্বকে ( বা হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তিকে ), সন্ধিনী-শব্দে সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধ-সত্ত্বকে ( বা সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তিকে ) এবং সম্বিৎ-শব্দে সম্বিৎ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বকেই ( বা সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকেই ) বুঝায়।

আর, বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন তিনটী শক্তিই যুগপৎ সমান ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বলে **মূর্ত্তি**। "যুগপৎ শক্তিত্রয়-প্রধানং মূর্ত্তিঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ৯৮॥" শক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় ( ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শক্তিত্রয়-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বময় ) বলিয়া ইহাকে "মূর্ত্তি" বলা হয়। "ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৯৮॥"

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তিনটী শক্তির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

## ৮। সন্ধিনী

সন্ধিনী-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি। ইহা পরব্রহ্মের সৎ-অংশের শক্তি। ইহা দ্বারা পরব্রহ্ম নিজের ও অপরের সত্তাকে ধারণ করেন এবং সত্তা দান করেন। ইহার অপর একটী নাম **আধার-শক্তি**। "ইদমেব সন্ধিন্যংশ-প্রধানঞ্চেৎ আধার-শক্তিঃ॥ অত্র আধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে॥ শ্রীধরস্বামী॥" আধার-শক্তি দ্বারা ভগবানের ধাম প্রকাশিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বলিয়াছেন "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৫৬॥"

## ৯। সম্বিৎ

সম্বিৎ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব বা সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তি। ইহা পরব্রহ্মের চিৎ-অংশের শক্তি। স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা পরব্রহ্ম নিজেও জানেন এবং অপরকেও জানাইয়া থাকেন, তাহার নাম সম্বিৎ-শক্তি।

বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সম্বিৎ-শক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে **আত্মবিদ্যা**। আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—জ্ঞান এবং জ্ঞানের প্রবর্ত্তক ; ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। "জ্ঞান-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণ-বৃত্তিদ্বয়-কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্‌বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে॥ শ্রীধরস্বামী॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥৯৮॥" ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবলমাত্র এই আত্মবিদ্যার সহায়তাতেই সম্ভব।

## ১০। হ্লাদিনী

হ্লাদিনী-প্রধান-শুদ্ধসত্ত্ব বা হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তি। স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও পরব্রহ্ম যদ্দ্বারা নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন, তাহাকে বলে হ্লাদিনী ( আনন্দ-দায়িনী ) শক্তি।

বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে **গুহ্য-বিদ্যা**। গুহ্যবিদ্যার দুইটী বৃত্তি—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্ত্তক। ইহা দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি ( প্রেমভক্তি ) প্রকাশিত হয়। প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিও এই গুহ্যবিদ্যারই বৃত্তি বিশেষ। "ইদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং .. হ্লাদিনী-সারাংশ-প্রধানং গুহ্যবিদ্যা।……এবং ভক্তি-তৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্‌বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে॥ যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবী ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি। যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা। মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ। গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ। আত্মবিদ্যা জ্ঞানম্। ত্বৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ ত্বমেব তত্তদ্‌রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামন্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ॥ শ্রীধর স্বামী॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ৯৮॥—হে শোভনে! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা হইয়াছ এবং এই সমস্তের আশ্রয়স্বরূপা বলিয়া তত্তৎ-স্বরূপা হইয়া তুমিই বিবিধ মুক্তি দান কর এবং অন্যান্য ফলও দান কর। এস্থলে যজ্ঞবিদ্যার অর্থ কর্ম্মবিদ্যা ; মহাবিদ্যার অর্থ অষ্টাঙ্গযোগ, গুহ্যবিদ্যার অর্থ ভক্তি এবং আত্মবিদ্যার অর্থ জ্ঞান।" ইহা হইতে জানা গেল—**সমস্ত সাধনের ফল ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই লাভ হইতে পারে।**

## ১১। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥৪।৫॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা॥৭।৪॥ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ গীতা।৭।১৪॥ ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ শ্রীভা ২।৯।৩৩॥" ইত্যাদি অপৌরুষেয় শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যে মায়ার কথা জানা যায়।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" ইত্যাদি গীতাবাক্যে মায়াকে **"গুণময়ী"** বলা হইয়াছে।

মায়ার তিনটী গুণ আছে বলিয়া মায়াকে "গুণময়ী" বলা হইয়াছে; ত্রিগুণাত্মিকাও বলে। সেই তিনটী গুণ হইতেছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটী গুণই সংসারী জীবের দেহ মধ্যে জীবত্মাকে আবদ্ধ করে। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা॥ ১৪।৫॥" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্"-বাক্যে এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথাই বলা হইয়াছে। লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ এই তিনটী শব্দে যথাক্রমে মায়ার রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ গুণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই শব্দত্রয়ে যে তিনটী গুণের ধর্ম্মই সূচিত হইয়াছে, এই তিনটী গুণের স্বরূপ জানিলেই তাহা বুঝা যাইবে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এই তিনটী গুণের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

## ১২। তমোগুণ

তমোগুণ অজ্ঞানজাত, সর্ব্বজীবের মোহজনক, প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদি দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। "তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ গীতা॥১৪।৮॥" যে বস্তু যথার্থতঃ যাহা, তাহা যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান। অজ্ঞান হইল জ্ঞানের বিপরীত। তমঃ-শব্দের অর্থ অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকারে যেমন কোনও বস্তুকে ঠিকমত চিনিতে পারা যায় না, তমোগুণের প্রভাবেও জীব বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেনা। অন্ধকারে যেমন গাছের গুড়ীকেও মানুষ বলিয়া মনে হয়, দণ্ডায়মান মানুষকেও যেমন আবার গাছের গুড়ী বলিয়া মনে হয়, তমোগুণও তেমনি এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া মনে করায়, বুদ্ধির বিপর্য্যয় জন্মায়; যথার্থ জ্ঞানের শক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে। তমোগুণের এইরূপ **আবরণাত্মিকা শক্তি** আছে। এই তমোগুণ প্রমাদ ( অর্থাৎ অনবধানতা, যেরূপ অনবধানতাবশতঃ কর্ত্তব্য-কার্য্য হইতে অন্যকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই অনবধানতা ) জন্মায়, আলস্য এবং নিদ্রাও জন্মায়। আলস্যবশতঃ কাজ না করাতেই জীব আরাম বোধ করে এবং নিদ্রাতেই সুখ-শান্তির অনুভব হয় বলিয়া মনে করে। তমঃ বা অন্ধকারের ধর্ম্মের সহিত মায়ার এই গুণটীর ধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে তমোগুণ বলা হয়। গাঢ় তমঃ বা অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "কৃষ্ণ"-শব্দে এই তমোগুণকে সূচিত করিয়াছেন।

জীবের দেহে যখন তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন তাহার অবিবেকিতা জন্মে—প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসহকারে কোনও বিষয় জানিবার অক্ষমতা জন্মে; শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, উপদেশ-পালনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। আর জন্মে—কার্য্যে অনুদ্যমতা; উৎসাহসহকারে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ তখন জীবের থাকে না। তমোগুণের আর একটী লক্ষণ প্রমাদ ( প্রমাদঃ করাদিস্থিতেঽপি

অর্থে ন্যস্তীতি প্রত্যয়ঃ। বলদেববিদ্যাভূষণ ॥ প্রমাদস্তৎকালকর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তস্য অর্থস্য অনুসন্ধানাভাবঃ ॥ মধুসূদন ॥ )—লব্ধ অর্থের অস্তিত্বেও প্রত্যয় হয় না, তাহার অনুসন্ধানেও প্রবৃত্তি জন্মেনা। আর একটী লক্ষণ হইতেছে—মোহ ( মিথ্যাভিনিবেশঃ। বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ), মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ জন্মে। "অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন। গীতা ॥১৪।১৩॥"

তমোগুণ দুঃখের হেতু। এজন্য তমোগুণের শক্তিকে বিষ্ণুপুরাণে "তাপকরী" বলা হইয়াছে। "হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ইত্যাদি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥১।১২।৬৯॥"

## ১৩। রজোগুণ

রজোগুণ রাগাত্মক এবং বিষয়-তৃষ্ণার এবং বিষয়ে আসক্তির উৎপাদক। ইহা জীবকে কর্ম্মাসক্তি দ্বারা বন্ধন করে। "রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্‌ভবম্। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ গীতা ॥১৪।৭॥" রজোগুণ প্রবল হইলে লোভ জন্মে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও কর্ম্মে উদ্যম জন্মে, কর্ম্ম-প্রবাহের উপশম হয় না এবং বিষয়-ভোগে স্পৃহা জন্মে। "লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ গীতা ॥১৪।১২॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার মর্ম্ম লিখিত হইতেছে। রজোগুণ স্ত্রী-পুরুষের মিলনেচ্ছা জন্মায়। প্রাকৃত-রূপ-রসাদি-ভোগের ইচ্ছা জন্মায়, পুত্র-মিত্রাদির সহিত সংযোগেচ্ছা জন্মায় এবং সেই-সেই-ইচ্ছার পরিপূরক কর্ম্মাদিতেও প্রবৃত্তি জন্মায়। বিষয়েতে আসক্তি জন্মায়। রজোগুণের প্রভাবে লোক ধনাদি উপার্জ্জনের জন্য নানারকমে চেষ্টা করিয়া থাকে, প্রচুর-ধনসম্পত্তি-আদি থাকা সত্ত্বেও ধনাদি বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, বলবান্ লোভের বশীভূত হইয়া অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণে, দর্শনমাত্রেই বস্তুবিশেষ হস্তগত করিবার চেষ্টায়, এক কার্য্যের পরে আর এক কার্য্যে, মান-সম্মান-প্রসার-প্রতিপত্তির উৎকর্ষ সাধনাদিতে—সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর বাসনায় রজোগুণ-প্রধান লোকের চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। ক্রোধ-দম্ভাদিও রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্‌ভবঃ ॥ গীতা ॥৩।৩৭॥" রজোগুণ সুখ-দুঃখ মিশ্রিত; এজন্য বিষ্ণুপুরাণ রজোগুণের শক্তিকে "মিশ্রা" বলিয়াছেন—"হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা।" ভোগবাসনা-তৃপ্তিতে সুখ, অতৃপ্তিতে দুঃখ, ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, প্রাপ্তির চেষ্টায় দুঃখ, অন্তিমেও দুঃখ।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"রজো রাগাত্মকং রঞ্জনাৎ রাগঃ গৈরিকাদিবৎ রাগাত্মকম্—রজোগুণ গৈরি-কাদিবৎ বর্ণবিশিষ্ট।" রজোগুণের এতাদৃশ ধর্ম্মবশতঃই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে রজোগুণকে "লোহিত"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। নানাবিধ ভোগবাসনার বর্ণে রজোগুণ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

## ১৪। সত্ত্বগুণ

ইহা নির্ম্মল ( অর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ); এজন্য ইহা প্রকাশক ও অনাময় ( শান্ত ও উদাসীন )।

এই সত্ত্ব সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। "অত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ॥১৪।৬॥" সত্ত্বগুণ সুখ-বিধায়ক। "সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি ॥ গীতা ॥১৪।৯॥" সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে। "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ॥ গীতা ॥১৪।১৭॥" সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলও নির্ম্মল। "কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ॥ গীতা ॥১৪।১৬॥"

সত্ত্বগুণ হইতে জাত যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে লৌকিক-বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, মায়িক বা প্রাকৃত জ্ঞান ; ইহা লোকাতীত মায়াতীত ব্রহ্মবস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে। আর সত্ত্ব হইতে যে সুখ জন্মে, তাহাও ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তিতে এবং আস্বাদনে যে সুখ জন্মে, তাহা ; এই সুখ হইতেছে বাস্তবিক দেহেন্দ্রিয়ের প্রসন্নতামাত্র ; এই সুখও মায়িক বা প্রাকৃত। "জ্ঞানং চেদং লৌকিক-বস্তু-যাথাত্ম্যবিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়-প্রসাদ-রূপং বোধ্যম্। বলদেববিদ্যাভূষণাদি।" এই সুখ অল্প-বস্তু ( দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ বস্তু ) হইতে জাত বলিয়া অল্পকালস্থায়ী—নিজেও অল্প। যাহা বাস্তব সুখ, তাহা হইতেছে—ভূমা—"ভূমৈব সুখম্। শ্রুতিঃ ॥"—দেশে এবং কালে অসীম। তাই অল্প বস্তু—সসীম-বস্তু, দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ বস্তু—হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। এজন্যই শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি।" বাস্তব সুখ—ভূমা সুখ—হইতেছে সুখস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ ভূমাবস্তু পরব্রহ্ম। তাঁহাকে পাইলেই জীবের আনন্দ-লাভের জন্য ছুটাছুটির অবসান হয়। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥ ব্রহ্মবল্লী ॥৭॥"

নির্ম্মল স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া যেমন বস্তু দেখা যায়, সত্ত্বগুণের সহায়তাতেও বস্তুর স্বরূপের বা যথার্থ-তত্ত্বের জ্ঞান জন্মে বলিয়া সত্ত্বকে নির্ম্মল এবং প্রকাশক বলা হইয়াছে। নির্ম্মল ও প্রকাশক শব্দদ্বয়ের ধ্বনি হইতেছে এই যে, রজঃ ও তমোগুণের ন্যায় সত্ত্বগুণের কোনওরূপ আবরণ নাই। রজঃ ও তমঃ যেমন চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মায়, সত্ত্ব তাহা জন্মায় না বলিয়া সত্ত্বকে শান্ত বা উদাসীন বলা হইয়াছে। রঞ্জিত কাচের ভিতর দিয়া, বস্তু দৃষ্ট হইলেও, যথার্থরূপে—স্বরূপে—দৃষ্ট হয় না ; রঞ্জিত হইয়াই দৃষ্ট হয়। রজস্তমোগুণের প্রভাবেও এইরূপই বিকৃত ভাবে বস্তুর স্বরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ—সত্ত্বগুণে কোনও বর্ণ নাই বলিয়া বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারে।

সত্ত্বগুণকে অনাময় বলা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা নিরুপদ্রব, বিঘ্নহীন, রোগহীনতার হেতু, দুঃখ-বিরোধী।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্"—ইত্যাদি বাক্যে "শুক্ল"-শব্দে "লোহিত-কৃষ্ণাদি"-বর্ণহীনতাই বুঝায়। রজোগুণের লোহিতত্ব এবং তমোগুণের কৃষ্ণত্ব সত্ত্বে নাই বলিয়া সত্ত্বকে "শুক্ল" বলা হইয়াছে।

## ১৫। মায়া ব্রহ্মের শক্তি

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ গীতা ॥৭।১৪॥ ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা ॥৭।৪॥" ইত্যাদি গীতা-বাক্যে মায়াকে পরব্রহ্মের শক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

## ১৬। মায়া জড়রূপা শক্তি।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তি হইলেও কিন্তু চেতনাময়ী শক্তি নহে, পরন্তু জড়রূপা শক্তি। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি ৭।৪-শ্লোকে মায়াশক্তির কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্"—ইত্যাদি ৭।৫-শ্লোকে মায়াকে "অপরা" বলা হইয়াছে। "অপরা" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অপরা ন পরা, নিকৃষ্টা শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা—পরা নহে বলিয়া, নিকৃষ্টা বলিয়া, শুদ্ধ-অনর্থকরী এবং সংসাররূপা এবং বন্ধনাত্মিকা বলিয়া মায়াকে অপরা বলা হইয়াছে।" এই মায়া নিকৃষ্টা কেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন "ইতস্তু অন্যামিতোঽচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ—এই মায়া অচেতনা, চেতন-ভোগ্যভূতা।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ—জড় বলিয়া মায়া নিকৃষ্টা।" শ্রীপাদ বলদেব, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ইঁহাদের প্রত্যেকেই লিখিয়াছেন—"নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ—জড়রূপা বলিয়াই মায়াকে নিকৃষ্টা ( অপরা ) বলা হইয়াছে।"

এইরূপে জানা গেল, মায়া পরব্রহ্মের শক্তি হইলেও জড়রূপা শক্তি। যাহা অচিৎ—চিদ্‌বিরোধী, তাহাই জড়; আর যাহা অজড়—জড়-বিরোধী, তাহাই চিৎ। সুতরাং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি এবং মায়া-শক্তি—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্টা। চিচ্ছক্তি—চেতনাময়ী; মায়া-শক্তি—অচেতনা। চিচ্ছক্তি—স্বপ্রকাশ, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে; মায়াশক্তি—স্বপ্রকাশ নহে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে না। চিচ্ছক্তি সূর্য্যস্থানীয়া; মায়াশক্তি অন্ধকার-স্থানীয়া।

## ১৭। মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না

পরব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু, মহা-স্বপ্রকাশ বস্তু, মহাসূর্য্যস্থানীয়। আর, মায়া চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু বলিয়া অন্ধকার-স্থানীয়। অন্ধকার যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়া অজ্ঞান; আর ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ। অজ্ঞান কখনও জ্ঞান-স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়া যে পবব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারেনা, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেই তাহা জানা যায়।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ॥৯।৪-৫॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

"আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৭৪-৭৫॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ঠিক অনুরূপ কথা দৃষ্ট হয়।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া। শ্রীভা- ১।১১।৩৯॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—প্রকৃতির ( মায়ার ) মধ্যে থাকিয়াও মায়ার গুণের সহিত ঈশ্বর-পরব্রহ্মের যোগ বা স্পর্শ হয় না। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য।

পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব; কোথাও অণুপরিমিত স্থানও নাই, যে স্থানে তিনি নাই; সুতরাং মায়াতে এবং মায়িক বস্তুতেও তিনি আছেন; কিন্তু থাকিলেও তৎসমস্তের সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। পদ্মপত্রে জল থাকে; তথাপি পদ্মপত্রে জল প্রবেশ করেনা; কিন্তু জলের উষ্ণতাদি গুণ পত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে, উত্তপ্ত জল পদ্মপত্রকেও উত্তপ্ত করে, দগ্ধ করে। পাঁকাল মাছ পঙ্কমধ্যে থাকে; তাহার গায়ে পঙ্ক লাগিয়া থাকেনা বটে; কিন্তু পঙ্কের শীতলত্বাদি পাঁকাল মাছ অনুভব করে। মায়াস্থিত ব্রহ্মের অবস্থা কিন্তু তদ্রূপ নয়; তিনি মায়ার এবং মায়িক বস্তুর ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আছেন। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যং পৃথিবীং ন বেদ, য আত্মনি তিষ্ঠন্ যং আত্মানং ন বেদ। যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি॥ গীতা॥৯।৪॥-শ্লোকের টীকায় রামানুজাচার্য্যধৃত শ্রুতিবচন॥" তথাপি কিন্তু মায়ার গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, তাঁহার উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—মায়া ব্রহ্মের দৃষ্টিপথে থাকিতেও লজ্জিত হয়। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া॥ শ্রীভা. ২।৫।১৩॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ ২।২২।২১॥"

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ এই বৃত্তিত্রয়ময়ী স্বরূপ-শক্তিই পরব্রহ্মে আছে; হ্লাদকরী শক্তিযুক্ত সত্ত্ব, তাপকরী শক্তিযুক্ত তমঃ এবং মিশ্রাশক্তিযুক্ত রজঃ—অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁহাতে নাই। "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণু-পুরাণ॥১।১২।৬৯॥"

বিষ্ণুপুরাণ অন্যত্রও বলিয়াছেন—"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ ১।৯।৪৩॥—ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই; তিনি সমস্ত শুদ্ধ বস্তু অপেক্ষাও শুদ্ধ; সেই আদ্য-পুরুষ প্রসন্ন হউন।"

মায়া যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, ব্রহ্মের বাহিরেই যে মায়ার অবস্থিতি, নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "মায়য়া বা এতৎ সর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি ন আত্মানং মায়া স্পৃশতি। তস্মাৎ মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥৫।১॥—মায়া দ্বারা এই সমস্ত ( বিশ্ব ) বেষ্টিত আছে। আত্মাকে ( ব্রহ্মকে ) মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। সেই হেতু, মায়া দ্বারা বহির্ভাগই ( বহিঃস্থিত বিশ্বই ) বেষ্টিত আছে।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিয়াছেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৩।৮॥"—এই বাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম তমোগুণের ( উপলক্ষণে ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ) অতীত।

মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাদের কোনওটী যে পরমব্রহ্মে নাই, গোপালতাপনীশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন।

"যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদাম বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ বিদ্যাময়ো হি যঃ ॥ গোপাল-তাপনী-উত্তরবিভাগ ॥২১॥ —পরব্রহ্মে বিদ্যা এবং অবিদ্যা যে আছে, তাহা জানিনা। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। তিনি কেবল চিচ্ছক্তিরূপা বিদ্যাময়।"

বিদ্যা হইতেছে মায়িক সত্ত্বগুণ, আর অবিদ্যা হইতেছে রজঃ ও তমোগুণ ( পরবর্ত্তী ১।১।২২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। বিদ্যা এবং অবিদ্যা তাঁহাতে নাই বলিয়া, মায়িক গুণত্রয়ের একটীও যে তাঁহাতে নাই, তাহাই জানা গেল। তাঁহাকে যে আবার "বিদ্যাময়" বলা হইয়াছে, এ-স্থলে বিদ্যা-শব্দে মায়িকী বিদ্যা বুঝাইতেছে না; যেহেতু, তাঁহাতে মায়িকী বিদ্যা এবং অবিদ্যা নাই বলার সঙ্গেই আবার তাঁহাকে মায়িক-বিদ্যাময় বলা সম্ভব নয়। "বিদ্যাময়"-শব্দের অন্তর্গত "বিদ্যা"-শব্দে চিচ্ছক্তিকে বুঝাইতেছে। "বিদ্যা এব মহাবিদ্যা চিচ্ছক্তিস্তৎপ্রাচুর্য্যবান্—চিচ্ছক্তিরূপা মহাবিদ্যা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া তাঁহাকে বিদ্যাময় বলা হইয়াছে ( টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী )।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও ব্রহ্মের মায়াতীতত্ব জানা যায়। "পরংব্রহ্ম পরংধাম"-ইত্যাদি ১০।১২-গীতাবাক্যে যে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥৭।১৩॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—'মাম্ এভ্যঃ যথোক্তেভ্যঃ গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণঞ্চ অব্যয়ম্ ব্যয়রহিতম্ জন্মাদি-সর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "এভ্যঃ ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিঃ অস্পৃষ্টম্ এতেষাং নিয়ন্তারম্ অতএব অব্যয়ম্ নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥" শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"এভ্যঃ পরম্ ইতি অপ্রপঞ্চকত্বম্ উচ্যতে।" এই সমস্ত টীকা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম মায়াগুণাতীত, মায়াগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি প্রপঞ্চাতীত।

এই সমস্ত কারণে বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥১।১২।৬৯

—তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তি, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। আর, হ্লাদকরী ( মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী ), তাপকরী ( মানসিক তাপদায়িনী তামসী ) এবং ( সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ—এই উভয় ) মিশ্রা ( বিষয়জন্যা রাজসী )—এই তিনটী মায়িকী শক্তি মায়িক-গুণবর্জ্জিত তোমাতে নাই।"

## ১৮। মায়ার ব্রহ্ম-শক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মায়া ব্রহ্মের শক্তি; কিন্তু আবার বলা হইল—মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে

না। তাহা হইলে মায়াকে কিরূপে ব্রহ্মের শক্তি বলা যায় ? যাহার সহিত স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই, তাহা কিরূপে শক্তি হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তিও তাহার শক্তিমান্ ব্যতীত অপরের আশ্রয়ে থাকে না। যাহার শ্রবণ-শক্তি আছে, সেই শ্রবণ-শক্তি তাহারই সেবা করে, অন্যের উচ্চারিত শব্দ তাহাকে শুনায়, কোনও বধিরকে শুনায় না। সুতরাং যদি দেখা যায়---মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও ব্রহ্মের আশ্রয়েই অবস্থান করে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি।

আরও একটী বিষয় বিবেচ্য আছে। শক্তি কেবল শক্তিমান্ কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়, পরিচালিত হয়। এক জনের শক্তি অপর একজন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। অন্ধ ব্যক্তি অপর একজনের দৃষ্টিশক্তিকে নিজের কাজে লাগাইতে পারে না। সুতরাং যদি দেখা যায়---মায়া কেবল ব্রহ্মকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়, অপর কাহারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মায়ার ব্রহ্মাশ্রয়ত্ব এবং ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিতত্ব আছে কিনা।

প্রথমে **মায়ার ব্রহ্মাশ্রয়ত্বের** অনুসন্ধান করা যাউক। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩৩॥"-শ্লোকে মায়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই ঃ---"পরমার্থ-বস্তু আমাব্যতিরেকে ( অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই ) যাহার প্রতীতি হয় ( অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি হয় ), ( আমার আশ্রয়ত্বব্যতীতও আবার ) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন তমঃ---অন্ধকার।" ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

এই শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন---"অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎপ্রতীয়েত, মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ। মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চ আত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতিঃ নাস্তীত্যর্থঃ তথালক্ষণং বস্তু। * * *। যথা ভাস ইতি। আভাসো জ্যোতির্ব্বিম্বস্য স্বকীয়-প্রকাশাদ্ব্যবহিতদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতচ্ছটাবিশেষঃ স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিঃ, তথা সা অপীত্যর্থঃ। অনেন আভাসধর্ম্মত্বেন তস্যাম্ আভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্। অতস্তৎকার্য্যস্য আভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ। আভাসশ্চ নিরোধশ্চ ইত্যাদৌ। অত স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্ব-চাক্‌চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি। তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্বৈনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি। তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি। কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্ত্বাদিগুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চ ইত্যপি জ্ঞেয়ম্। * *। যথা তম ইতি। তমঃ-শব্দেনাত্র পূর্ব্বোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূল-জ্যোতিষি অসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদীয়মপি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ ১৭॥ পুরীদাস-মহোদয়-সংস্করণ॥

এই উক্তির সার মর্ম্ম এই ঃ---আমার ( ভগবানের ) প্রতীতি ( বা অনুভূতি ) যে স্থলে আছে, সে স্থলে

যাহার প্রতীতি নাই এবং আমার প্রতীতি যে স্থলে নাই, সে-স্থলেই যাহার প্রতীতি—সুতরাং আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি এবং আমার আশ্রয়ত্বব্যতীত স্বতঃ যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই আমার মায়া। যথা, আভাস—জ্যোতির্বিবম্ব সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি ; সূর্য্য থাকে আকাশে, আর তাহার প্রতিচ্ছবি হয় সূর্য্যের বাহিরে—পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে। অথচ, আকাশে সূর্য্য না থাকিলে পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে তাহার প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যের আশ্রয়েই প্রতিচ্ছবির অস্তিত্ব এবং অনুভূতি। মায়াও তদ্রূপ। পরব্রহ্ম ভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি। আর একটী দৃষ্টান্ত—যথা তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির প্রতি যাহারা দৃষ্টিপাত করে, প্রতিচ্ছবি স্বকীয় অত্যন্ত উদ্ভট চাক্‌চিক্য-চ্ছটায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করিয়া স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য প্রকাশ করে। এই বর্ণশাবল্য হইতেছে—অন্ধকারময়, তমঃ। এই বর্ণশাবল্য ( বা তমঃ ) যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের বহির্দ্দেশেই থাকে, সূর্য্যের মধ্যে থাকে না, অথচ আকাশে সূর্য্য না থাকিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে প্রতিচ্ছবিও থাকে না—সুতরাং প্রতিচ্ছবির উপকণ্ঠস্থিত বর্ণশাবল্যও থাকিতে পারে না—সূর্য্যের আশ্রয়েই যেমন এই বর্ণশাবল্যের অস্তিত্ব এবং অনুভূতি, তদ্রূপ পরব্রহ্মের বাহিরে এবং পরব্রহ্মের আশ্রয়েই মায়ার অস্তিত্ব এবং অনুভূতি।

এইরূপে "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি"-ইত্যাদি মায়ার স্বরূপ-বাচক শ্লোক হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়, পরব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতীত মায়ার অস্তিত্ব নাই। তাহাতে বুঝা গেল—মায়া পরব্রহ্মেরই শক্তি।

এক্ষণে পরব্রহ্মকর্তৃক **মায়ার নিয়ন্ত্রিতত্বের** কথা বিবেচনা করা যাউক।

মায়ার একটী নাম প্রকৃতি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় দেখা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০॥—আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি ( মায়া ) চরাচর ( স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ) বিশ্বকে সৃজন করে। এজন্য জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

অন্যত্রও দেখা যায়—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ॥১৮।৬১॥—ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ( কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাইয়া ) সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন—ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় বা নিয়ন্ত্রণে মায়া জীবকে ভ্রমণ করাইতেছে।" পরব্রহ্ম যে মায়ার অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা, এ-সমস্ত গীতাবাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

মায়া-সৃষ্ট বস্তুরও যে তিনিই নিয়ন্তা, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত ইত্যাদি॥ বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ ॥৩।৮।৯॥"

পরব্রহ্ম মায়ার এবং মায়ার সৃষ্ট বস্তুর নিয়ন্তা বলিয়া মায়া যে পরব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাই বুঝা গেল।

বেদান্তদর্শনের "তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র॥১।৪।৩॥"-সূত্রে "তৎ"-শব্দে অব্যক্তকে বুঝায়। এই অব্যক্তকে ব্রহ্মের অধীন বলা হইয়াছে ( তদধীনত্বাৎ ) ; অব্যক্তকে ব্রহ্মের অধীন মনে করিলেই শ্রুতিবাক্যের

সার্থকতা থাকে। এই অব্যক্ত যে শ্রুতিবিহিতা মায়া, সাংখ্যের প্রধান নয়, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও বিষ্ণুপুরাণের "অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১।২।১৯॥"— শ্লোকের আলোচনা করিয়া তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে ( বহরমপুর-সংস্করণ ॥ ১৭৮ পৃষ্ঠায় ) বলিয়াছেন— "ইদমেব প্রধানম্ অনাদে র্জগতঃ সূক্ষ্মাবস্থারূপং অব্যাকৃতাব্যক্তাদ্যভিধং বেদান্তিভিরপি পরমেশ্বরাধীনতয়া মন্যতে। তদধীনত্বাদর্থবদিত্যাদি ন্যায়েষু ॥—এই প্রধানই অনাদি জগতের সূক্ষ্ম-অবস্থারূপ। অব্যাকৃত, অব্যক্ত—ইত্যাদি নামে অভিহিত এই প্রধানকে ( প্রকৃতি বা মায়াকে ) বেদান্তীরা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া মানিয়া থাকেন। "তদধীনত্বাদর্থবৎ"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রই তাহার প্রমাণ ॥"

মায়া যে পরব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা গেল। শক্তিই শক্তিমানের অধীনে থাকে। সুতরাং মায়া যে পরব্রহ্মের শক্তি, তাহা বেদান্ত হইতেও জানা গেল।

এ-সমস্ত কারণেই শ্রুতিতে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইয়াছে।

## ১৯। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, ব্রহ্মের বহির্দ্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। এজন্য মায়াকে ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি বলে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার কার্য্যস্থল এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার বৈভব। "জগল্লক্ষ্মী রাখি যাহাঁ রহে মায়া দাসী ॥ শ্রীচৈ চ. ২।২১।৩৯ ॥"

## ২০। মায়া ও সৃষ্টি

মায়ার একটী নাম প্রকৃতি। সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। শক্তিমান্ ব্রহ্ম দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে বা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করেন; তাহাতে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়, তাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়। প্রকৃতি ক্রমশঃ বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে; পরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মাণ্ড-সমূহও প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত।

ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন গুণাবতারের আবির্ভাব হয়। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করেন, তমোগুণের সহায়তায় শিব সংহার করেন এবং সত্ত্বগুণের সহায়তায় বিষ্ণু জগতের পালন করেন। এইরূপে দেখা যায়—মায়া বা প্রকৃতি হইল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি। "এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কি ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।১৬॥— নিমিমহারাজের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি অন্তরীক্ষ বলিলেন—এই মায়া ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী শক্তি; ইহা ত্রিবর্ণা—অর্থাৎ সত্ত্বগুণরূপ শুক্লবর্ণ, রজোগুণরূপ লোহিত বর্ণ এবং তমোগুণরূপ কৃষ্ণবর্ণ—এই তিনটী বর্ণ এই মায়ায় আছে। তটস্থ লক্ষণে মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম। আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন, বলুন।" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভের ৪৮-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"তথা আথর্ব্বণিকাঃ পঠন্তি ॥ সিতাসিতা চ কৃষ্ণা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোরিতি ॥—অথর্ব্ববেদীরা বলেন, বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের শুক্লা ( সিতা ), রক্তা ( অসিতা ) এবং কৃষ্ণা—এই ত্রিবর্ণা মায়া হইতেছে সর্ব্বকাম-পূরণী বিশ্বসৃষ্ট্যাদির সঙ্কল্প-পরিপূরণ-কর্ত্রী ॥"

মায়া জড়রূপা অচেতনা শক্তি বলিয়া তাহার কোনওরূপ কার্য্যকরণের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। কার্য্য-সামর্থ্য কেবলমাত্র চেতনাময়ী শক্তিরই থাকিতে পারে। এই অবস্থায় মায়া কিরূপে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্য করিতে সমর্থা ?

ইহার উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাওয়া যায়। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে চ চরাচরম্ ॥" ব্রহ্মের অধ্যক্ষতাতেই মায়া সৃষ্টি-আদি করিয়া থাকে। শ্রুতি হইতে জানা যায়—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।৩ ॥" সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া পরব্রহ্ম মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; এই দৃষ্টিদ্বারাই তিনি সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। এই চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়া জগতের সৃষ্টি-আদি করিয়া থাকে। "জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা ॥ কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৫১-২॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের "যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ। * * ॥ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়োঽমী"—ইত্যাদি ৬।১৬।২৩-২৪ ॥" শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি। অতো যথা লোহমগ্নিশক্ত্যৈব দাহকং সৎ অগ্নিং ন দহতি। এবং ব্রহ্মগত-জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুশ্চ ইতি ভাবঃ ইত্যেষা ॥১০৭॥" উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক-দ্বয়ের টীকায় শ্রীধরস্বামীও অনুরূপ অর্থই করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পয়ারেই ভাগবত-সন্দর্ভের উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥১।১।৫॥"—এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। "অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃ-পিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বম্। তথা সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি ॥" ভগবৎ-সন্দর্ভের ১০৮ অনুচ্ছেদে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—মায়ার জগৎকর্ত্তৃত্ব হইতেছে গৌণ, ব্রহ্মের শক্তিতেই মায়ার কর্ত্তৃত্ব। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যে ব্রহ্মেরই মুখ্য কর্ত্তৃত্ব। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই বেদান্তসূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে।

মায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্বে তাহার নিমিত্ত-কারণত্বই সূচিত হইতেছে। কিন্তু ঘটের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ যেমন কুম্ভকার, চক্র-দণ্ডাদি হইতেছে গৌণ-নিমিত্ত কারণ মাত্র, তদ্রূপ বিশ্বেরও মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম, **মায়া-গৌণ-নিমিত্ত-কারণ-মাত্র**। "মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ। সেহো নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার। তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়। ঘটের কারণ দণ্ড-চক্রাদি উপায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৫৪-৫৬ ॥"

মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ হইতেছে বিশ্বের উপাদান-কারণ ; মৃত্তিকা যেমন ঘটের

উপাদান-কারণ, তদ্রূপ। কিন্তু জড়রূপা মায়ার পক্ষে জগতের উপাদান-কারণত্বও সম্ভব নয়। ব্রহ্মের শক্তিতেই জড়রূপা অচেতনা প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্রীময় বস্তুর অনন্ত বৈচিত্রীময় উপাদান রূপে পরিণত হইয়াছে। তিনটী জড়গুণ বিভিন্ন ভাবে মিলিত হইয়াই অনন্ত-বৈচিত্রীময় উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই গুণত্রয় জড় বলিয়া বিভিন্ন ভাবে মিলনের সামর্থ্য তাহাদের থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির সহায়তাতেই তাহাদের এই ভাবে মিলন সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মই মুখ্য উপাদান-কারণ, মায়া বা প্রকৃতি বিশ্বের **গৌণ উপাদান-কারণ মাত্র।**

ব্রহ্মই যে জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং মুখ্য উপাদান কারণ, বেদান্তদর্শন তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥ সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নাৎ ॥ ১।৪।২৫॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬॥ যোনিশ্চ হি ॥ ১।৪।২৭॥"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই জড়রূপা মায়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কার্য্যে এবং জগতের উপাদানরূপে স্বীয় পরিণতি-কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। মায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান কারণ।

সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইবে।

## ২১। জীবমায়া ও গুণমায়া

মায়ার দুইটী বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়াগুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১০০॥" তিনি বলেন—উক্ত শ্লোকের "যথাভাসঃ"-অংশে জীবমায়ার কথা এবং "যথাতমঃ" অংশে গুণমায়ার কথা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

**জীবমায়া**—পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি যেমন স্বকীয় অত্যন্ত উদ্ভট তেজোরাশিদ্বারা দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে, জীবমায়াও তেমনি জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে। "অত্র স (আভাসঃ) যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মস্বচাকচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি ** তথা ইয়ম্ (জীবমায়া) অপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥১০২॥" মহাসংহিতার "শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদ্গুণমায়া জড়াত্মিকা॥"—এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"অস্যার্থঃ। শ্রীরত্র জগৎপালন-শক্তিঃ ভূস্তৎ-সৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা তৎ-প্রলয়-শক্তিঃ। তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা সা জীববিষয়া তচ্ছক্তিঃ জীবমায়া ইত্যুচ্যতে॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ ১২০॥—এস্থলে শ্রী-শব্দে জগৎ-পালন-শক্তি, ভূ-শব্দে সৃষ্টি-শক্তি এবং দুর্গা-শব্দে তাঁহার প্রলয়-শক্তি বুঝাইতেছে। এই তিন রূপে যাহা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার জীববিষয়া শক্তি—জীবমায়া।" ইহাতে বুঝা গেল—মায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী বৃত্তিই জীবমায়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সৃষ্ট্যাদিকারিণীরূপে মায়া হইতেছে জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং মায়ার যে বৃত্তি জগতের গৌণ-নিমিত্ত কারণ, সেই বৃত্তিই জীবমায়া।

জীবমায়ার আবার দুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। "দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ব্বা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়-স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা উত্তরা চ তং তদন্যথাজ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তত ইতি ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ ৫৯ ॥—আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের মধ্যে থাকিয়া জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে ( স্বরূপের জ্ঞানকে ) আবৃত করে ; আর বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি জীবের মধ্যে অন্যথা জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।"

এইরূপে দেখা গেল—জীবমায়া তাহার আবরণাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে—জীব স্বরূপতঃ যে চিদ্‌বস্তু, তাহা জানিতে দেয় না। আর বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের মধ্যে অন্যথা-জ্ঞান জন্মায়—চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তুতে—জড়দেহে—আত্মবুদ্ধি জন্মায়, দেহের সুখের জন্য ইচ্ছা জন্মায় এবং দেহেন্দ্রিয়ের ভোগযোগ্য মায়িক ভোগ্যবস্তুতে চিত্তবৃত্তিকে বিক্ষিপ্ত করে, দেহেতে এবং দেহের ভোগ্য বস্তুতে আবেশ জন্মায়। "ত্রিভি র্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥৭।১৩॥ ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৭।১৫॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৭।১২॥ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনব্যয়ম্ ॥১৪।৫॥"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাবাক্যে সংসারী জীবের যে মুগ্ধত্বের কথা এবং পরব্রহ্মের তত্ত্বসমূহে অজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে, জীবমায়াই স্বীয় মোহিনী শক্তিতে দেহে এবং দেহের ভোগ্য বস্তুতে আবেশ জন্মাইয়া জীবের সেই মুগ্ধতা জন্মাইয়া থাকে এবং পরব্রহ্ম-সম্বন্ধেও অজ্ঞতা জন্মাইয়া থাকে।

**গুণমায়া**—"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত"-ইত্যাদি শ্লোকের "যথা তমঃ" অংশের আলোচনায়, শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—অত্যন্ত উদ্‌ভট চাকচিক্যময় সূর্য্য-প্রতিচ্ছবি যেমন স্বীয় উপকণ্ঠে বর্ণশাবল্য উদ্‌গিরিত করে, কখনও বা সেই বর্ণশাবল্যকে পৃথগ্‌ভাবে নানাকারে পরিণত করে, তদ্রূপ মায়াও সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপা গুণমায়াখ্যা জড়া প্রকৃতিকে উদ্‌গিরিত করে, কখনও বা সত্ত্বাদি গুণসকলকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নানাকারে পরিণত করে। ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১০২॥" অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—"গুণমায়া ত্রিগুণসাম্যং প্রধানমিতি ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥১২৬॥"

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই গুণমায়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মায়ার এই তিনটী গুণই জগতের গৌণ উপাদান-কারণ। সুতরাং মায়ার যে বৃত্তি জগতের গৌণ উপাদান-কারণ, তাহাই গুণমায়া।

## ২২। বিদ্যা ও অবিদ্যা

মায়ার নিমিত্তাংশের দুইটী বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। "অথ নিমিত্তরূপাংশস্য প্রথমে দ্বে বৃত্তী আহ ॥ বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতা ॥ শ্রীভা. ১১।১১।৩॥ টীকাচ ( শ্রীধরস্বামিনঃ ) ॥ তন্যেতে বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তনূ শক্তী মে মায়য়া বিনির্ম্মিতে। মায়াবৃত্তিত্বাৎ। বন্ধমোক্ষকরীত্যেকবচনং দ্বিবচনার্থে। ননু তৎকার্য্যত্বে বন্ধমোক্ষয়োরনাদিত্বনিত্যত্বে ন স্যাতাং তত্রাহ। আদ্যে অনাদী ততো যাবদবিদ্যাং প্রেরয়ামি তাবদ্ বন্ধঃ যদা বিদ্যাং দদামি তদা মোক্ষঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। ইত্যেষা ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫৯॥" এই উক্তির মর্ম্মার্থ এই—"বিদ্যাবিদ্যে"—ইত্যাদি শ্লোকের "তনূ"-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

অর্থ হইতেছে—শক্তিদ্বয় ; আর, "বন্ধমোক্ষকরী"-শব্দটী একবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও "বিদ্যাবিদ্যে" এই দ্বিবচনান্ত-শব্দের বিশেষণ বলিয়া ইহার অর্থ দ্বিবচনে ( শ্রীধরস্বামীর টীকা ) ; বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই দুইটী শক্তির একটী মোক্ষকরী, আর একটী বন্ধকরী। মায়ার নিমিত্তরূপ অংশের দুইটী বৃত্তির কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। "হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ই আমার শক্তি, উভয়েই শরীরীদিগের বন্ধমোক্ষকরী, উভয়েই অনাদি, উভয়েই আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত। যখন আমি অবিদ্যাকে প্রেরণ করি, তখনই জীবের বন্ধন হইয়া থাকে ; আর যখন আমি বিদ্যাকে প্রেরণ করি, তখন মোক্ষের স্ফূর্ত্তি হয়।"

এই উক্তি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাউক। উপরে উদ্ধৃত "বিদ্যাবিদ্যে"---ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা যায়---বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ই মায়ার বৃত্তি। ইহা দ্বারা তাহাদের সাধারণ পরিচয়মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু বিশেষ পরিচয় কি? মায়ার কোন্ বৃত্তিকে বিদ্যা বলে, আর কোন্ বৃত্তিকেই বা অবিদ্যা বলে?

**বিদ্যার স্বরূপ**। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"---ইত্যাদি ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সত্ত্বগুণময্যাঃ *** সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্ ( গীতা ১৪।১৭ ) ইতি স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব তচ্চ সত্ত্বম্ বিদ্যাশব্দেন উচ্যতে।" আবার "যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ( ১।৩।৩৪ )—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"দেবী দ্যোতমানা মতিঃ বিদ্যা তদ্রূপা যা মায়া *** সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়—মায়ার যে বৃত্তির নাম বিদ্যা, তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণময়ী, সত্ত্বগুণজাত জ্ঞান। সত্ত্ব হইতেছে নির্ম্মল, স্বচ্ছ এবং উদাসীন অর্থাৎ ইহা রজোগুণের ন্যায় চিত্ত-বিক্ষেপও জন্মায় না, তমোগুণের ন্যায় স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবৃতও করে না সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যারও এই সমস্ত গুণ থাকিবে।

**অবিদ্যার স্বরূপ**। পরমাত্মসন্দর্ভ বলেন—"অথ অবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্ব্বা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা উত্তরা চ তং তদন্যথা-জ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তত ইতি॥৫৭॥—মায়ার যে অবিদ্যা-অংশ, তাহার দুইটী বৃত্তি---আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকাবৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি স্বাভাবিক জ্ঞানের অন্যথা জ্ঞান জন্মায়। আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবেই বিরাজিত থাকিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করে।" পূর্ব্বে জীবমায়ার যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, অবিদ্যারও সেই লক্ষণই। তাহাতে বুঝা যায়—জীবমায়াই অবিদ্যা। অবিদ্যাতে যে রজঃ ও তমঃ গুণেরই প্রাধান্য, তাহাও বুঝা যায়—রজোগুণের দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ এবং তমোগুণের দ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞানের আবরণ জন্মায়।

বিদ্যা ও অবিদ্যার বিশেষত্ব এই যে---বিদ্যা সত্ত্বগুণময়ী, আর, অবিদ্যা রজস্তমোময়ী বা রজস্তমঃ-প্রধানা।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। "বিদ্যাবিদ্যে"—ইত্যাদি মূল শ্লোকে বিদ্যাকে মোক্ষকরী বলা হইয়াছে ; কিন্তু মোক্ষ-শব্দে মায়ার সম্যক্ নিবৃত্তিই বুঝায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার কিছু অংশ-

মাত্রও জীবের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। বিদ্যাও যখন সত্ত্বগুণময়ী, তখন যতক্ষণ জীবের মধ্যে বিদ্যা বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না। মায়িকসত্ত্ব বরং বন্ধনই জন্মায়। "অত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ॥১৪।৬॥"

"বিদ্যাবিদ্যে"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"যখন ভগবান্ অবিদ্যাকে পাঠান, তখন জীবের বন্ধন হয়; আর যখন তিনি বিদ্যাকে পাঠান, তখন মোক্ষের স্ফূর্ত্তি হয়।" কিন্তু কখন তিনি অবিদ্যাকে পাঠান, আর কখনই বা বিদ্যাকে পাঠান? মায়া জীবকে কর্ম্মফলই ভোগ করাইয়া থাকে। কর্ম্মফলদাতা কিন্তু ভগবানই। "ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥৩।২।৩৮॥" সুতরাং অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়ই লাভ হয় কর্ম্মফল অনুসারে। সাধনের কৃপায় অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া গেলে বিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারে (সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে এই বিষয়টী আলোচিত হইবে)। এই বিদ্যাকে মূল শ্লোকে "মোক্ষকরী" বলা হইয়া থাকিলেও ইহা মায়ার বৃত্তি বলিয়া বাস্তবপক্ষে মোক্ষকরী হইতে পারে না; তাই শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—মোক্ষকরী-শব্দে এস্থলে মোক্ষের স্ফুরণকরী। শ্রীজীবগোস্বামীও "এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩।১৬-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বিদ্যা মায়ার বৃত্তিবিশেষ বলিয়া তাহার মোক্ষপ্রদত্ব উপলক্ষণমাত্র, বিদ্যা নিজে মুক্তি দান করিতে পারে না, ইহা মোক্ষের দ্বারমাত্র। "এষা মায়েত্যাদৌ সামান্যলক্ষণে মোক্ষপ্রদত্বং তস্যা নোক্তমিত্যসম্যক্তমিতি। অন্তকারিত্বেন অত্যন্তপ্রলয়রূপস্য মোক্ষস্যাপ্যুপ-লক্ষিতত্বাৎ। অত্র **বিদ্যাখ্যা** বৃত্তিরিয়ং স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ-বিদ্যাপ্রকাশে দ্বারমেব ন তু স্বয়মেব সা ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫৭॥"

বিদ্যা কিরূপে মোক্ষের দ্বার হয়, তাহাও শ্রীজীব উল্লিখিত বাক্যে বলিয়াছেন—স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে বিদ্যা (যাহাকে আত্মবিদ্যা বা গুহ্যবিদ্যা বলা হয়, সেই বিদ্যা বা পরা বিদ্যা), তাহার প্রকাশের পক্ষে এই সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা হয় দ্বারস্বরূপ। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যে পরা বিদ্যা, তাহার আবির্ভাবেই মায়া এবং মায়ার প্রভাব সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারে; তখনই মোক্ষ সম্ভব। কাজেই যাহা পরবিদ্যা-প্রকাশের দ্বারস্বরূপ, তাহা মোক্ষেরও দ্বারস্বরূপ।

বস্তুতঃ পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ব্যতীত মায়া এবং মায়ার প্রভাব সম্যক্রূপে দূরীভূত হইতে পারে না। শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক-শ্রুতি ॥২।২।৮॥" আবার শ্রুতি একথাও বলেন যে, তাঁহার কৃপাব্যতীতও সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠোপনিষৎ ॥১।২।২৩॥" নারায়ণাধ্যাত্মবচন হইতেও তাহাই জানা যায়। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ —ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও তাঁহার নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার শক্তি ব্যতীত সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে?" পরব্রহ্ম ভগবানের যে শক্তিটী দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তাহা হইতেছে তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ —এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধসত্ত্ব (স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে---ভগবানের কৃপা এবং তাঁহার স্ব-প্রকাশতা-শক্তিই যদি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের---সুতরাং মোক্ষের---হেতু হয়, তাহা হইলে সাধন-ভজনের কি প্রয়োজন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে। "ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ। যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ শ্রীভা. ৪।২৪।৫৯॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন---"তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ত্বদ্ভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যস্যেতি। যেষাং সতাং ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং বিশুদ্ধং সৎ চিত্তং বাহ্যার্থ বিক্ষিপ্তং ন ভবতি, তমোরূপায়াং গুহায়াঞ্চ নাবিশৎ লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তত্ত্বং পশ্যতি।" টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই ঃ---"সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বাহ্যিক বিষয়ে যাঁহার চিত্ত ভ্রান্ত হয় না, তমোগুহাতেও যাঁহার চিত্ত প্রবেশ করে না, সেই নির্ম্মলচিত্ত মুনিই ভগবানের গতি---তত্ত্ব---দর্শন করিতে পারেন।" এই শ্লোক হইতে জানা গেল---যিনি তত্ত্বদর্শনের যোগ্য, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল (বিশুদ্ধম্) হওয়া প্রয়োজন। নির্ম্মলত্বের লক্ষণও শ্লোক হইতে জানা যায়---বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত ভ্রান্ত না হওয়া (ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমম্) অর্থাৎ রজোগুণের প্রভাব না থাকা এবং তমোগুহাতেও চিত্তের প্রবেশ না থাকা (তমোগুহায়াঞ্চ ন আবিশৎ) অর্থাৎ চিত্তে তমোগুণের প্রভাব না থাকা। "যদ্ ভক্তিযোগেনানুগৃহীতম্"-বাক্য হইতে জানা যায়---ভজনের ফলেই রজঃ ও তমঃগুণ দূরীভূত হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হয়। এই রজস্তমোগুণের দূরীকরণের জন্যই সাধন-ভজনের প্রয়োজন। রজস্তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া গেলে থাকিবে কেবল সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া চিত্তও তখন হয় নির্ম্মল।

সত্ত্ব স্বচ্ছ বলিয়া তাহার প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে, স্বচ্ছ কাচের যেমন থাকে, তদ্রূপ। স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যাতে ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়। চিত্তের সহিত এই বিদ্যার তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে চিত্তেরও প্রতিফলন-ক্ষমতা জন্মে এবং সেই চিত্তেও ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হইতে পারে। চিত্তের এই প্রতিফলন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির জন্যই সাধন-ভজনের প্রয়োজন। "ততস্তৎকরণশুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎ-শক্তি-প্রতিফলনার্থমেব জ্ঞেয়া॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৭॥"

বিদ্যার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত চিত্তে যখন ভগবানের স্ব-প্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়সকলও সেই শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, সেই শক্তির ধর্ম্ম লাভ করে---অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ। এইরূপে স্বপ্রকাশতা-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত হইতে তখন মায়ার বৃত্তি বিদ্যাও দূরীভূত হইয়া যায়, চিত্ত তখন নিঃশেষরূপে বিশুদ্ধ হয়, তখনই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব। "তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধচিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়-স্বপ্রকাশতা-শক্তি-তাদাত্ম্যাপন্নতয়া এব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি স্যুঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৭॥"

এইরূপে দেখা গেল---তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য সাধকের চিত্তে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রতিফলনের প্রয়োজন, স্বপ্রকাশতা-শক্তির প্রতিফলনের নিমিত্ত চিত্তের স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতার প্রয়োজন ; স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতার জন্য স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার প্রয়োজন। সুতরাং বিদ্যাই হইল স্ব-প্রকাশতা-শক্তি-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ

এবং স্বপ্রকাশতা-শক্তিই স্বরূপশক্তির বৃত্তি পরাবিদ্যা বলিয়া সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা হইল পরাবিদ্যা-প্রবেশেরও দ্বারস্বরূপ, সুতরাং মোক্ষেরও দ্বারস্বরূপ ; যেহেতু পরাবিদ্যার প্রবেশেই মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায়, সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যাও তিরোহিত হইয়া যায়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মায়ার বৃত্তি অবিদ্যা হইল রজস্তমোময়ী বা রজস্তমঃ-প্রধানা। ইহা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়। ইহা বন্ধনও জন্মায়। আর বিদ্যা হইল সত্ত্বগুণময়ী ; ইহা নির্ম্মল, স্বচ্ছ ; পরাবিদ্যা প্রকাশের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং মোক্ষেরও দ্বারস্বরূপ।

## ২৩। একমাত্র স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই মায়া নিরসণীয়া

স্বরূপশক্তি চিন্ময়ী, জড়-বিরোধিনী, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতা। আর মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা, চিদ্‌বিরোধিনী, ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই দুইটী শক্তি হইতেছে পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্টা—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়। যে স্থানে আলোক, সে-স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যে স্থানে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, সে স্থানে মায়া থাকিতে পারে না। অন্ধকারকে অপসারিত করিবার একমাত্র উপায় যেমন আলোক, তদ্রূপ মায়াকে অপসারিত করিবারও একমাত্র উপায় হইতেছে স্বরূপ-শক্তি। স্বরূপ-শক্তি নিত্য অবিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত আছে বলিয়াই মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম মায়াকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ শ্রীভা. ১।১।১॥ —যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা কুহক বা মায়াকে সর্ব্বদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পর-সত্যের ধ্যান করি।" "স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত-মায়াগুণ-প্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ শ্রীভা. ১০।৩৭।২২ ॥—যিনি স্বীয় তেজের বা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা মায়ার গুণ-প্রবাহকে ( মায়া এবং মায়ার কার্য্যকে ) নিত্য নিবৃত্ত করিতেছেন, সেই নিরতিশয়-ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের শরণাপন্ন হই। "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ শ্রীভা. ১।৭।২৩॥—হে ভগবন্ ! স্বীয় চিচ্ছক্তি-দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া তুমি কৈবল্যস্বরূপ-স্বীয় আত্মাতে অবস্থিত।" —ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তিদ্বারা মায়ার অভিভবের কথা জানা যায়।

গায়ত্রী হইতেও তাহা জানা যায়। "ভর্গো দেবস্য ধীমহি ॥ —সেই দেবতার তেজের ধ্যান করি।" গায়ত্রীর অর্থে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য ভর্গঃ-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—"ভর্গঃ অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ।" ভ্রস্‌জ্ ধাতু হইতে ভর্গঃ-শব্দ নিষ্পন্ন। ভ্রস্‌জ্ + অসুন্ = ভর্গস্। ভ্রস্‌জ্ ধাতুর অর্থ ভাজা—যেমন ধান ভাজা, ডাইল ভাজা। ভর্গঃ-শব্দের অর্থ তেজঃ বা শক্তি। পরম-দেবতা ব্রহ্মের তেজঃ বা শক্তিকে ধ্যান করি—ইহাই হইতেছে "ভর্গো দেবস্য ধীমহি"—বাক্যের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মের কোন্ শক্তির ধ্যানের কথা হইতেছে ? শ্রীপাদ সায়নের ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই তেজের বা সেই শক্তির ধ্যান করি, যেই তেজঃ বা শক্তি ভাজিয়া দিতে পারে। কাহাকে ভাজিবে ? অবিদ্যা এবং অবিদ্যার

কার্য্যকে। "অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ।" ধানকে আগুনের উপরে খোলায় ভাজিয়া ফেলিলে যেমন তাহার আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না, তদ্রূপ যেই তেজের বা শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার এবং অবিদ্যা-কার্য্যের ফল প্রসব করার ক্ষমতা সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইয়া যায়, সেই তেজের বা শক্তির ধ্যান করি। ইহা কোন্ শক্তি ? মায়াশক্তি নহে ; যেহেতু, মায়াকে ভাজিয়া দেওয়ার কথাই বলা হইয়াছে ; মায়া নিজেকে নিজে নষ্ট করিতে পারে না। আগুনের দাহিকা-শক্তি আগুনকে পুড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে না। জীবশক্তিও নহে ; যেহেতু, জীবশক্তির অংশ জীবাত্মাকেও মায়া কবলিত করিতে পারে ; সুতরাং জীবশক্তির পক্ষে মায়াকে নষ্ট করা সম্ভব নহে। জীবের পক্ষে মায়া যে দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া, গীতায় তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥৭।১৪॥" আর বাকী থাকে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। সুতরাং যে শক্তি মায়াশক্তিকে ভাজিয়া দিতে পারে, তাহা হইতেছে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মায়াকে অপসারিত করার সামর্থ্য একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই আছে, অন্য কোনও শক্তিরই নাই।

## ২৪। মায়া ও যোগমায়া

মায়ার স্বরূপ পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মায়া হইতেছে জড়রূপা শক্তি। ব্রহ্মের চিদ্‌রূপা শক্তির আশ্রয়েই মায়া সংসারী জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

আর যোগমায়া হইতেছে—চিচ্ছক্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১০।২৯।১॥"—শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—"যোগ-মায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ। —যোগমায়া হইতেছে পরানাম্নী অচিন্ত্যশক্তি।" চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির একটী নামই পরাশক্তি। সুতরাং যোগমায়া হইল স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। "যন্মর্ত্ত্য-লীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২।১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তের্বীর্য্যম্।" এ স্থলে শ্রীজীব যোগমায়াকে চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। ভগবৎ-সন্দর্ভেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়া মহোদয়ম্॥ ১০।৬৯।৪২॥" এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অত্র যোগমায়া দুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥৪৫॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন— "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতি ॥২।২১।৮৫॥"

মায়া এবং যোগমায়া—এই উভয়েরই অচিন্ত্যা মোহিনী শক্তি আছে ; কিন্তু তাহাদের এই মোহিনী শক্তির প্রয়োগ-স্থান এক নহে। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখদিগকে মুগ্ধ করে মায়া, আর ভগবদুন্মুখদিগকে মুগ্ধ করে যোগমায়া। "বিমুখমোহনং মায়য়া, উন্মুখমোহনং যোগমায়য়া ইতি ব্যবস্থিতঃ॥ শ্রীভাগবতের 'ইত্যাদিশ্যামরগণান্'—ইত্যাদি ১০।১।২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

প্রশ্ন হইতে পারে, বহিরঙ্গা মায়া বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কিন্তু উন্মুখ জীবকে যোগমায়া মুগ্ধ করে কেন ?

উত্তর এই। এস্থলে উন্মুখ বলিতে ভগবানের পরিকরগণকেই বুঝাইতেছে। তাঁহারা লীলাতে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন, সেবার সৌষ্ঠব বিধানের জন্য তাঁহাদের মুগ্ধত্বের প্রয়োজন হয় বলিয়াই যোগমায়া তাঁহাদিগকে মোহিত করে। ইহা দ্বারা যোগমায়া ভগবৎ-সেবারই আনুকূল্য করিয়া থাকে। যোগমায়া ভগবৎ-শক্তি বলিয়া ভগবানের সেবা তাঁহারও স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যোগমায়া যেমন ভগবানের শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াও তেমনি ভগবানের শক্তি। ভগবানের সেবা ব্যতীত কেবল বহির্ম্মুখ-জীবমোহন-কার্য্যে তাহার শক্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ?

উত্তর এই। মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি ; সুতরাং মায়ার ভগবৎ-সেবাও হইবে বহিরঙ্গা সেবা। সৃষ্টিলীলা হইতেছে ভগবানের বহিরঙ্গা লীলা। সৃষ্টিলীলাতে জীবমোহনের প্রয়োজন আছে ; জীবমোহনের দ্বারা মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা সেবা করিয়া থাকে ; তাহাতেই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।

পরিকরবর্গের সহিত ভগবানের যে লীলা, তাহা হইতেছে তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলা ; এই অন্তরঙ্গা লীলাতে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে।

## ২৫। বহিরঙ্গা মায়া যোগমায়ার বিভূতি

যোগমায়া ও বহিরঙ্গা মায়া সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, ব্যাপকভাবে বিবেচনা করিলে তাহা হইতে মনে হয়—উভয়ের মধ্যেই কিছু সমান-ধর্ম্ম আছে ; সেই সমান-ধর্ম্ম হইতেছে—মোহনকারিত্ব এবং ভগবানের সেবা। অবশ্য তাহাদের মোহনকারিত্বের স্থান এবং স্বরূপ এক নহে, ভগবৎ-সেবারও স্বরূপ এক নহে। যোগমায়া মুগ্ধ করে ভগবদুন্মুখ পরিকরগণকে এবং বহিরঙ্গা মায়া মুগ্ধ করে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ সংসারী জীবগণকে। যোগমায়ার সেবা ভগবানের অন্তরঙ্গা লীলাতে ; আর বহিরঙ্গা মায়ার সেবা ভগবানের বহিরঙ্গা লীলাতে, সৃষ্টিলীলাতে। তাহা হইলেও কেবল মোহনকারিত্ব এবং সেবার বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাদের সমান-ধর্ম্মত্ব আছে বলিয়া মনে করা যায়। এই সমান-ধর্ম্মত্বের কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, যোগমায়া এবং বহিরঙ্গা মায়া যেন একই শক্তির দুইটী বৃত্তি—একটী অন্তর্ম্মুখী, অপরটী বহির্ম্মুখী। স্বরূপ-তত্ত্বও যে তাহাই, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের "স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ। ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ১০।৮৭।৩৮ ॥"—এই শ্লোকটীর আলোচনা করিলেই প্রকৃত তথ্যটী জানা যাইবে। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ ঃ—"জীব যখন মুগ্ধ হইয়া ( বহিরঙ্গা ) মায়াকে আলিঙ্গন করে, তখন জীব দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করিয়া তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। আর যখন ভগবান্ ত্বচ্‌বিনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সেই ( বহিরঙ্গা ) মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয়েন, তখন অণিমাদি অষ্টগুণিত ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়েন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"* * *

অয়মর্থঃ। মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থা তদ্বিভূতিরেব যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে। অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥ ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেনানভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্য ত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহি র্যথা স্বতঃ পৃথক্ কৃত্য ত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ। এতদেবোক্তপোষণন্যায়েনাহুঃ। মহসি পরমৈশ্বর্য্যে অষ্টগুণিতে স্বতঃসিদ্ধাণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতিমহীয়সে পূজ্যসে কথম্ভূতঃ অপরিমেয়ভগঃ অপরিমিতৈশ্বর্য্যঃ। নহি অন্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তব ঐশ্বর্য্যম্। অপিতু স্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ অপরিমিতমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ। 'অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ' ইত্যাদ্যাঃ॥"

এই টীকার সারমর্ম্ম এই ঃ—শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"***মায়াশক্তি আপনার স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতেই উদ্ভূতা, যোগমায়ার বিভূতিই। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে বলা হইয়াছে—'যেই মহামায়া দ্বারা সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে এবং সকলেই দেহে আত্মাভিমান পোষণ করিতেছে, সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরী সেই মহামায়া ইঁহার ( অর্থাৎ যোগমায়ার ) আবরিকাশক্তি।' সেই মহামায়া যোগমায়ার অংশভূতা ; ( কিন্তু মহামায়া যোগমায়ার অংশভূতা হইলেও ) যোগমায়া তাহাকে নিজের স্বরূপভূত বলিয়া অভিমান করেন না ( মনে করেন না ), যোগমায়া তাহাকে আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; যোগমায়াকর্ত্তৃক এই ভাবে পরিত্যক্তা সেই মহামায়াকেই 'বহিরঙ্গা মায়াশক্তি' বলা হইয়াছে। ( মূল শ্লোকে ) একটী দৃষ্টান্তদ্বারা এই বিষয়টীকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সর্প যেমন তাহার জীর্ণ ত্বক্‌কে ( খোলসকে ) নিজ শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করে, এই পরিত্যক্ত ত্বক্‌কে ( খোলসকে ) সর্প যেমন আর স্বীয় স্বরূপভূত বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ আপনিও ( পরব্রহ্মও ) সেই বহিরঙ্গা মায়াকে পরিত্যাগ করেন ; যেহেতু, আপনি নিত্য ঐশ্বর্য্যশালী।****এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। "এক অজ ( জীব ) এই মায়াকে ভোগ করিয়া মায়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া থাকে, অপর এক অজ ( পরমাত্মা ) ভুক্তপদার্থবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন।"

উক্ত টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি নারদপঞ্চরাত্রের এবং শ্রুতির প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। এই উক্তি হইতে জানা যায়, সাপের খোলস যেমন স্বরূপতঃ সাপের অংশ হইলেও সাপের দেহের বাহিরেই থাকে, এই খোলস সাপকে স্পর্শও করিতে পারে না, সাপও যেমন এই খোলসকে কখনও স্পর্শ করে না, তদ্রূপ বহিরঙ্গা মায়াও স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই অংশ ; কিন্তু অংশ হইলেও যোগমায়া তাহাকে স্পর্শ করেন না, বহিরঙ্গা মায়াও যোগমায়াকে এবং যোগমায়াসমাবৃত পরব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে পারে না, যোগমায়ার এবং যোগমায়াযুক্ত পরব্রহ্মের বহির্দ্দেশেই তাহার স্থিতি, এই জন্যই তাহার নাম বহিরঙ্গা মায়া। সাপের খোলসের দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায়—সাপ চেতন বস্তু হইলেও তাহার পরিত্যক্ত খোলস যেমন অচেতন, তদ্রূপ চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অংশভূতা—অথচ তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—বহিরঙ্গা মায়াও অচেতনা—জড়রূপা।

এই রূপে দেখা গেল—বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়াশক্তি স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি যোগমায়ারই অংশভূতা এবং যোগমায়ারই বিভূতি—জড়বিভূতি।

## ২৬। মায়া-শব্দের বিভিন্ন অর্থ

প্রসিদ্ধ অর্থে মায়া-শব্দে "বহিরঙ্গা মায়া" বুঝাইলেও ইহার অন্য অর্থও আছে। নিম্নে কয়েকটী অন্য অর্থ দেওয়া হইল। কোন্‌স্থলে কোন্ অর্থ গ্রহণীয়—প্রকরণ, পূর্বাপর-সঙ্গতি এবং অন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি-আদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা নির্ণয় করিতে হয়।

**ক**। মায়া=শক্তি। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়াশব্দেন শক্তিমাত্রং হি ভণ্যতে॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥১২১॥"

**খ**। মায়া=ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা। "আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভঃ॥ ১০৬॥

**গ**। মায়া=স্বরূপ-শক্তি। "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতবতি। মধ্বভাষ্যধৃত-চতুর্বেদ-শিখাতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ১৫৮॥ স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর সংস্করণ॥ ২২৯ পৃষ্ঠা॥"

মায়া=অন্তরঙ্গা শক্তি; স্বরূপ-শক্তি। "মায়া স্যাদান্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা॥ পরমাত্মসন্দর্ভ-ধৃত প্রমাণ॥ বহরমপুর-সংস্করণ॥ ১৮০ পৃষ্ঠা॥

মায়া=বিষ্ণুশক্তি। "ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থ-বেদিভিরিতি শব্দমহাদধৌ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ॥১২২॥"

**ঘ**। মায়া=প্রতারণা-শক্তি। "মায়া অত্র প্রতারণাশক্তিঃ। স্যাৎকৃপাদম্ভয়োঃ মায়া ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর-সংস্করণ। ২২ পৃষ্ঠা॥

**ঙ**। মায়া=কৃপা। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বপ্রকাশে॥" ভক্তবিষয়িণী কৃপা। "মম মায়য়া ভক্তবিষয়-কৃপয়া॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ॥৩৫৩ পৃষ্ঠা॥"

**চ**। মায়া=দম্ভ। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বপ্রকাশে॥"

**ছ**। মায়া=জ্ঞান। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নৈর্ঘণ্টুকাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥১০৬॥ ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈবচ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহাদধৌ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ॥ বহরমপুর-সংস্করণ। ১১৯-২০ পৃষ্ঠা।

**জ**। মায়া=বয়ুন।

বয়ুন=জ্ঞান। "হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ। শ্রীভা. ১০।৮।৩০॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"বয়ুনং জ্ঞানম্।"

বয়ুন=অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান। "বয়ুনেনানুসন্ধানাত্মকজ্ঞানেন।—'ইতি সঞ্চিন্ত্য'-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৩।৩৮-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা।"

বয়ুন = দেবতাগার ( শব্দকল্পদ্রুমধৃত উণাদিকোষবাক্য )।

**ঝ।** মায়া = শাম্বরী। "মায়া স্যাৎ শাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।"

শাম্বরী = শম্বর-নামক-দৈত্য-নির্ম্মিতা মায়া।

**ঞ।** মায়া=বুদ্ধি। "মায়া স্যাৎ শাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।"

**ট।** মায়া=ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়া। "মায়া স্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভধৃতবচন॥ ১৮০ পৃষ্ঠা॥ ত্রিগুণাত্মিকাঽথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈবচ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থ-বেদিভিরিতি শব্দমহাদধৌ॥ ভগবৎসন্দর্ভধৃত বচন। ১১৯-২০ পৃষ্ঠা।"

**ঠ।** মায়া=গুণমায়া বা প্রধান। জগতের গৌণ-উপাদান-কারণভূত গুণত্রয়॥ "গুণমায়া ত্রিগুণসাম্যং প্রধানম্॥ ভগবৎসন্দর্ভধৃত বচন। ১২৩ পৃষ্ঠা॥ মায়াস্যাদন্তরঙ্গায়াং বহিরঙ্গা চ সা স্মৃতা। প্রধানোঽপি ক্বচিৎ দৃষ্টা তদ্বৃত্তি মোহিনী চ সা॥ পরমাত্মসন্দর্ভ-ধৃত বচন। ১৮০ পৃষ্ঠা।"

**ড।** মায়া=প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাপন্না মায়ার বৃত্তিকে প্রকৃতি বলে। "সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াং জড়াং প্রকৃতিম্ উদ্গিরতি॥—'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' ইত্যাদি শ্রীভা. ২।৯।৩৩-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা॥" এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে গুণমায়াও বলা হয়। এজন্য মায়া হইতে জাত বস্তুকে মায়িক বস্তুও বলে, প্রাকৃত বস্তুও বলে। প্রাকৃত=প্রকৃতি হইতে জাত। অপ্রাকৃত=যাহা প্রাকৃত বা মায়িক নহে।

সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়।

**ঢ।** আত্মমায়া=স্বরূপ-শক্তি। "আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ। মীয়তে অনয়া ইতি মায়াশব্দেন শক্তিমাত্রং হি ভণ্যতে॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১২১॥"

আত্মমায়া=ভগবানের ইচ্ছা। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতোক্তেঃ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-ধৃত-প্রমাণ। ১০৬॥"

**ণ।** গুণমায়া=প্রধান; জগতের গৌণ উপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। পূর্ব্ববর্ত্তী **ঠ**।-দ্রষ্টব্য। ১।১।২১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**ত।** জীবমায়া=১।১।২১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ২৭। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা

মুণ্ডক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বার নিকটে সমস্ত বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা ( যদ্দারা ব্রহ্মকে জানা যায়, সেই বিদ্যা ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথর্ব্বা আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার নিকটে, অঙ্গিরা আবার ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবহকে এবং সত্যবহ স্বপুত্র অঙ্গিরসের নিকটে বলিয়াছিলেন।

পরে গৃহস্থ-শ্রেষ্ঠ শৌনক অঙ্গিরসের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ মুণ্ডক ১।১।৩—কোন্ বস্তুকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে সমস্তই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?"

তখন অঙ্গিরস শৌনককে বলিয়াছিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চ এব অপরা চ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৪॥ ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দুইটী বিদ্যা জানিতে হইবে—একটী পরা বিদ্যা, অপরটী অপরা বিদ্যা।"

ইহার পরে এই দুইটী বিদ্যার স্বরূপের কথাও বলা হইয়াছে।

"তত্র অপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥১।১।৫॥—তন্মধ্যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ্—এ-সমস্ত হইতেছে অপরা বিদ্যা। আর, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর ( অবিনাশী ) ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহার নাম পরা বিদ্যা।" ( অধিগম্যতে প্রাপ্যতে। অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ—অধি-পূর্ব্বক-গম্‌ধাতু প্রায়শঃ প্রাপ্তি-অর্থে প্রযুক্ত হয় ; সুতরাং "অধিগম্যতে" অর্থ—প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য )।

**পরাবিদ্যা।** উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—যে বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। পরা বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহারই অপর নাম আত্মবিদ্যা এবং গুহ্য বিদ্যা ( ১।১।৯-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই পরাবিদ্যা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ।

পরাবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদক্ষরম্ অধিগম্যতে—ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি বা বিজ্ঞান—লাভ হয়। বরফ হাতে পাইলে বরফ-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বরফ-সম্বন্ধে বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি।

**অপরা বিদ্যা।** যাহা পরা নহে, তাহাই অপরা। পরা বিদ্যার লক্ষণ যাহাতে নাই, তাহাই অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যায় পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ হয়। যে বিদ্যায় ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি, সাক্ষাৎ অনুভূতি বা বিজ্ঞান লাভ হয় না, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না, অথচ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাই অপরা বিদ্যা। কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে বলিয়াই ইহাকেও বিদ্যা বলা হইয়াছে। এই কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতেছে—আক্ষরিক জ্ঞান, শাস্ত্রবাক্য হইতে লব্ধ বিবরণ। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বা কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ্-সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই হইতেছে বরফ্‌সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান, আক্ষরিক জ্ঞান। ইহাকে পরোক্ষ জ্ঞানও বলা হয়। যে বিদ্যা দ্বারা এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মেনা, তাহাকে বলে অপরা বিদ্যা।

অপরা বিদ্যার বিবরণে শ্রুতিতে চারিবেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ এবং জোতিষের উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষা-কল্পাদি ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলা হয় ( অবতরণিকা ৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। বেদাঙ্গগুলিও বেদবিহিত কর্ত্তব্যের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। বেদ-বেদাঙ্গ হইতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই অপরা বিদ্যা। ইহাকে আগমোত্থ জ্ঞানও বলে।

## ২৮। পরা ও অপরা উভয় বিদ্যার উপদেশ কেন ?

যাহা হউক, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার লক্ষণ দেখিলে স্বভাবতঃই মনে একটা প্রশ্ন জাগে। তাহা

হইতেছে এই। অঙ্গিরসের নিকটে শৌনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন---কোন্ বস্তুকে জানিলে সমস্ত জানা হইয়া যায় ? উত্তরে অঙ্গিরস যাহা বলিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায়---পরব্রহ্মকে পাইলেই, সাক্ষাদ্ভাবে জানিলেই, সমস্ত জানা হইয়া যায় এবং সেই পরব্রহ্মকে পাওয়ার উপায়ও হইল পরা বিদ্যা। ইহাতেই শৌনকের প্রশ্নের উত্তর হইয়া যায়। তথাপি কিন্তু আবার অপরা বিদ্যার কথা বলা হইল কেন ? এবং পরাবিদ্যার কথা বলিবার পূর্ব্বেই অপরা বিদ্যার কথা বলা হইল কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে---"যাহা সার, তাহা সম্যক্‌রূপে জানাইতে হইলে, যাহা অসার, তাহার কথাও বলা আবশ্যক। অসার অপরা বিদ্যার কথা আগে জানাইয়া পরে সারবস্তু পরবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে।" কিন্তু এই উত্তর বিচারসহ বলিয়া মনে হয়না। কেননা, অঙ্গিরস বলিয়াছেন---"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে---দুই বিদ্যাই জানিতে হইবে।" পরা বিদ্যা কি, তাহা যেমন জানিতে হইবে, অপরা বিদ্যা কি, তাহাও তেমনি জানিতে হইবে। পরা বিদ্যার পূর্ব্বেই অপরা বিদ্যার কথা বলাতে ইহাও মনে হয় যে, পরাবিদ্যার পূর্ব্বেই অপরা বিদ্যা জানিতে হইবে---ইহাই যেন অঙ্গিরসের অভিপ্রায়। ইহার হেতু কি ?

ইহার হেতু এই।---পরা বিদ্যা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, সুতরাং স্বপ্রকাশ। অবস্থাবিশেষে ইহা চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারে, ইহা জন্য-পদার্থ নহে। কিন্তু মায়ামলিন-চিত্তে এই পরা বিদ্যার আবির্ভাব হইতে পারে না। ইহার আবির্ভাবের জন্য চিত্তের মলিনতা দূর করার প্রয়োজন। সাধন-ভজন ব্যতীত চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে না। সাধন-ভজনের জন্য শাস্ত্রজ্ঞানের---আগমোত্থ-জ্ঞানের বা অপরাবিদ্যার প্রয়োজন। জীবের সংসার-যন্ত্রণা কেন, কি উপায়ে সংসার-যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে, জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়---তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। বেদ বলিয়াছেন---"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি। ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।---ব্রহ্মকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য উপায় নাই।" যাঁহাকে জানার কথা বলা হইল, সেই ব্রহ্মবস্তু কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধই বা কি, তাহাও জানা দরকার। বেদাদি-শাস্ত্রই তাহা জানাইয়া দেন। তাঁহাকে জানিবার জন্য যে সাধন-ভজনের প্রয়োজন, "প্রস্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ---সেই ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে"---ইত্যাদি বাক্যে বেদাদি শাস্ত্রই তাহা জানাইয়াছেন। সুতরাং সাধন-ভজনে প্রবর্ত্তিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র-জ্ঞানের বা অপরা বিদ্যার প্রয়োজন আছে।

পরাবিদ্যার আবির্ভাবের উপযোগী সাধনের প্রবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞান বা অপরাবিদ্যার প্রয়োজন প্রথমেই ; এজন্য পরাবিদ্যার পূর্ব্বেই অপরাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছ।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান---এই উভয়ের উপদেশই দিয়াছেন।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩০॥

---হে ব্রহ্মন্! আমার সম্বন্ধে পরম-গোপনীয় যে জ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

ঐ জ্ঞান তোমাকে বিজ্ঞান-সমন্বিত ভাবেই বলিতেছি, তাহাতে যে রহস্য আছে, তাহার যে অঙ্গ আছে, তাহাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।”

এস্থলে, জ্ঞান-শব্দে শব্দদ্বারা যাথার্থ্য নির্দ্ধারণকে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান বা আগমোত্থ-জ্ঞানকে বুঝায় ( ১।১।৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। “জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণম্॥ শ্রীজীব॥” আর, বিজ্ঞান-শব্দে অনুভব—অপরোক্ষ অনুভবকে বুঝায়। “বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ॥ শ্রীজীব॥” এই অনুভব হইতেছে পরাবিদ্যার ফল—বিজ্ঞান। আর, জ্ঞান—কাহারও মুখে শুনিয়া বা শাস্ত্রালোচনা করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহা। উভয়েরই প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে উভয়ের কথাই বলিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়ঃ—

“দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ বি. পু. ৬।৫।৬৪॥

—দুই ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য—শব্দব্রহ্ম ( বেদ ) এবং পরব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মে ( বেদে ) নিষ্ণাত হইলেই ( শ্রবণাদি-দ্বারা জ্ঞানলাভ করিলেই ) পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়।”

এ স্থলেও পরাবিদ্যার ফলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শাস্ত্রজ্ঞানের ( অপরা বিদ্যার ) অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ যাহা বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিন্দূপনিষদেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হয়।

“দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলানমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ॥১৭-১৮॥

—শব্দ ( শ্রুতি )-বিদ্যা এবং ব্রহ্ম বিদ্যা—এই উভয়ই জ্ঞাতব্য ; কারণ, শব্দবিদ্যায় ( শাস্ত্রজ্ঞানে ) নিপুণ হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা জানিতে পারা যায়। শব্দময়ী শ্রুতিবিদ্যায় অধিকারী না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেমন ধান্যার্থী লোক তৃণসহিত ধান্য সংগ্রহ করে, পরে তৃণ পরিত্যাগ করিয়া ধান্য সংগ্রহ করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তি গ্রন্থালোচনা দ্বারা শাব্দিক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে গ্রন্থালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।”

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ শ্রীচৈ. চ. ১।২।৯৯॥”

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানা থাকিলেই ইষ্টবস্তুতে নিষ্ঠার দৃঢ়তা জন্মিতে পারে। সুতরাং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র-জ্ঞান উপেক্ষণীয় নহে।

অপরা বিদ্যার বা বেদাদি শাস্ত্র-জ্ঞানের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। লোক-সমাজে বেদ-বিহিত-যাগ-

যজ্ঞাদির মহিমার কথাও শুনা যায় ; সুতরাং মহিমার কথা শুনিয়া যাগ-যজ্ঞাদির প্রতিও কাহারও কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদির যে ফল, তাহার স্বরূপ অবগত হইলে শ্রেয়ঃকামীর চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না ; কেননা, তাহাতে স্বর্গাদি-লোকের সুখ লাভ হইলেও আনন্দস্বরূপ-রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় না, এমন কি জন্ম-মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি লাভ হয় না। বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই তাহা জানা যায়।

পরা ও অপরা বিদ্যার কথা বলিয়া মুণ্ডক-শ্রুতি অপরা বিদ্যার অনুসরণে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফলের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—"নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ মুণ্ডক ॥১।২।১০॥— এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানকারী লোকগণ স্বর্গবাস করিয়া পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যযোনি, অথবা তদপেক্ষাও হীন তির্য্যক্ যোনিতেও প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা নরকাদিতেও গমন করিয়া থাকে।" আরও বলিয়াছেন—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ॥ মুণ্ডক ।১।২।৭॥—বেদবিহিত যজ্ঞাদি হইতেছে সংসার-সমুদ্র-উত্তরণের পক্ষে অদৃঢ় নৌকার তুল্য ( যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না )।"

সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারেন, যে ব্রহ্মবিদ্যা ( পরাবিদ্যা ) দ্বারা পরব্রহ্মকে বাস্তবরূপে জানা যায়। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।১২॥ তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমন্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ মণ্ডুক ॥১।২।১৩॥"

এইরূপে দেখা গেল, পরা বিদ্যার ন্যায় অপরা বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। অপরা বিদ্যার প্রয়োজন— অপরা বিদ্যারূপ বেদাদি-শাস্ত্র বিহিত অনিত্য-ফলপ্রসূ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নহে ; পরন্তু যজ্ঞাদির ফলের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য। এই জ্ঞান লাভ হইলেই পরাবিদ্যার জন্য সাধনের সূচনা হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণের "সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্। সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥৬।৫।৮৭ ॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্জ্ঞানং পরাবিদ্যা। অজ্ঞানং অবিদ্যান্তবর্ত্তিনী অপরাবিদ্যা ইত্যর্থঃ ॥" এ-স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ অপরাবিদ্যাকে অবিদ্যান্তবর্ত্তিনী বলিলেন। তাহা হইলে **অপরা বিদ্যা হইল অবিদ্যার বা মায়ার বৃত্তি** ; কিন্তু পরাবিদ্যা যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

## ২৯। জীবশক্তি

ব্রহ্মের জীবাখ্যা শক্তি হইতেছে চিদ্রূপা, জড়রূপা নহে। জীবশক্তিকে তটস্থা-শক্তিও বলে। এই শক্তির অংশই হইতেছে অনন্তকোটি জীব।

জীব দুই শ্রেণীর—এক নিত্যমুক্ত, আর এক অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ। মায়াবদ্ধ জীবগণই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম-মৃত্যু-শোক-তাপাদিদ্বারা কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ভগবৎ-কৃপায় সাধন-প্রভাবে তাহারাও

মায়ামুক্ত হইয়া যাইতে পারে। জীবশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে থাকেনা ; তবে চিদ্‌রূপা বলিয়া ব্রহ্মের সহিত তাহার স্পার্শ হইতে পারে।

জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে জীবশক্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

## ৩০। মূর্ত্ত-শক্তি ও অমূর্ত্ত-শক্তি

শক্তির দুই রকমে স্থিতি—অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত। কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে ভগবদ্‌বিগ্রহাদির সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত ভাবে। আর মূর্ত্ত অধিষ্ঠাত্রীরূপে শক্তি অবস্থান করে ভগবৎ-আবরণরূপে। "তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্‌বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতঃ। তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ১৮৮॥"

কেনোপনিষদে মূর্ত্ত-শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হ বৈ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩।১২ এবং ৪।১॥" এই কেনোপিনিষদ্‌বাক্যে হৈমবতী উমাই মূর্ত্তা মায়াশক্তি। পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া তিনি মায়াশক্তির অবিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কার্য্য করেন।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানও শক্তির মূর্ত্তরূপ স্বীকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের মতে, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতেছে শক্তির পরিণতি।

# তৃতীয় অধ্যায়

( পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব )

## ৩১। ব্রহ্ম সবিশেষ

বিশেষ বা বিশেষত্বের সহিত বর্ত্তমান—সবিশেষ। যাহার কোনওরূপ বিশেষত্ব আছে, তাহাই সবিশেষ। বস্তুর শক্তি বস্তুকে বিশেষত্ব দান করে। যে লোকের শক্তি আছে, তাহাকে শক্তিমান্ বলা হয় ; এই শক্তিমত্ত্বাই তাহার বিশেষত্ব বা বিশেষণ। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বলিয়াই অগ্নির দাহকত্ব ; এই দাহকত্বই অগ্নির বিশেষত্ব। শক্তির ক্রিয়াতে বস্তুর মধ্যে গুণের উদ্ভব হয় ; গুণও বস্তুর বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা যায়, যে বস্তুর শক্তি আছে এবং শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ আছে, তাহাই সবিশেষ।

ব্রহ্ম-শব্দের শ্রুতিসম্মত মুখ্যার্থ হইতে জানা গিয়াছে, ব্রহ্মের শক্তি আছে। এই শক্তি ব্রহ্মকে বিশেষত্ব দান করে ; সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ। ইহাও জানা গিয়াছে—ব্রহ্মের শক্তি ক্রিয়াশীলা ; শক্তির ক্রিয়ায় গুণের উদ্ভব হয় ; সুতরাং ইহাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের গুণও আছে ; এই গুণও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের পরিচায়ক।

শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২।২।৭॥" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের মহিমার কথাও বলা হইয়াছে। এই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ব্রহ্মের সবিশেষত্বের পরিচায়ক।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ কঠোপনিষৎ॥ ১।২।২৬॥, মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ৩।২।৩॥—এই আত্মা ( ব্রহ্ম ) প্রবচনের দ্বারা ( শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যাদ্বারা ) লভ্য নহেন, মেধাদ্বারা ( শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানের দ্বারা ) লভ্য নহেন, বহু শাস্ত্রকথা শ্রবণের দ্বারাও লভ্য নহেন। এই ব্রহ্ম যাঁহাকে বরণ ( কৃপা ) করেন, তাঁহার পক্ষেই এই ব্রহ্ম লভ্য, তাঁহাকে ব্রহ্ম কৃপা করিয়া স্বীয় তনু পর্য্যন্ত দান করেন।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের বরণ-শক্তির বা কৃপা-শক্তির কথা—সুতরাং সশক্তিকত্বের এবং সবিশেষত্বের কথা জানা যায়।

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়াছেন। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্য-শুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ॥ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য॥" এই ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্কর বৃংহ-ধাতুর এবং মন্-প্রত্যয়ের মুখ্যার্থে ( ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ) নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব ব্রহ্ম যে "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত,", তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২।১।২৪॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের পূর্ণশক্তি-মত্ত্বার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "পূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্য অন্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা ॥—ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিক, অন্য কাহারও দ্বারা তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা নহে।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটী শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন —"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ॥ ৬।৮॥" তাঁহার বেদান্তভাষ্যে আরও অনেক স্থলে তিনি অনুরূপ কথা বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত করিয়াছেন।

সমগ্র বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্র হইতেছে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহাই এই সূত্রের জিজ্ঞাস্য। তৎপরবর্ত্তী সূত্রেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ১।১।২॥—যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি ( সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ) হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" পরবর্ত্তী সূত্রসমূহে বিবিধ বিরুদ্ধমতের খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জগৎ-কর্ত্তা, তিনি সবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেন না।

উপনিষদ্‌ও বহুস্থানে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী ॥১॥—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা প্রাণিসকল জীবিত থাকে, যাঁহার মধ্যে ( মহাপ্রলয়ে ) প্রাণিসকল প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জান।" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

> "ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
> সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
> অপাদান-করণাধিকরণ-কারক তিন।
> ভগবানের সবিশেষ এই তার চিহ্ন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৬৪-৬৫ ॥"

ব্রহ্ম যে সমস্তের নিয়ন্তা, সুতরাং সবিশেষ, বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়ঃ—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽ-ন্বায়ত্তাঃ ॥৩।৮।৯॥—চন্দ্রসূর্য্য, স্বর্গ-পৃথিবী, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা-রাত্রি, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, বৎসরাদি, সমস্ত নদ-নদী-পর্ব্বতাদি এই অক্ষর-ব্রহ্মেরই প্রশাসনে অবস্থিত; হোম-যাগ-তপস্যাদিও এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বের কথাই জানা গেল।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মই সকল-ফল-প্রদাতা। "স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥৪।৪।২৪ ॥" ব্রহ্মসূত্রও এ-কথা বলেন—"ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮॥"

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতি-সংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশ-কালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে।—তিনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই বিচিত্র সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কর্ত্তা, তিনিই দেশ-কাল-বিশেষজ্ঞ ; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানকারীদের কর্ম্মানুরূপ ফল তিনিই দান করিয়া থাকেন।"

ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলেন—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ॥৩।১৪।৪॥—এই ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম ( তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ ), সর্ব্বগন্ধ ( সমস্ত গন্ধ তাঁহাতেই ), সর্ব্বরস ( সকল রসের আধার ), তিনি সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অবাকী ( মৌন ) এবং অনাদর ( কোনও বস্তুর জন্য তাঁহার আগ্রহ নাই )" ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়য়েতি ॥—তিনি ( ব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব ॥—আনন্দবল্লী ।৬॥ এষ হি এব আনন্দয়াতি—ইনিই ( ব্রহ্মই ) আনন্দ দান করেন ॥ আনন্দবল্লী ।৭॥"

ঐতেরেয়-উপনিষদ্ বলেন—"স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকানসৃজত ॥—তিনি ( ব্রহ্ম ) সঙ্কল্প করিলেন, লোক সৃষ্টি করিব। তিনি এই সমস্ত লোকের সৃষ্টি করিলেন ॥১।১॥"

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলেন—"সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥—( সেই ব্রহ্ম ) সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ ॥৩।১৭॥ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥—তিনি ঈশ্বরদিগের পরম-মহেশ্বর, তিনি দেবতাদিগের পরম-দেবতা, পতিদিগের পরম-পতি, তিনি ভুবনেশ্বর ॥৬।৭॥ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥—যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥৬।১৮ ॥"

এস্থলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এই জাতীয় আরও বহু শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা যায় ; বাহুল্যভয়ে তাহা করা হইল না।

গায়ত্রী হইতেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের এবং সশক্তিকত্বের কথা জানা যায়। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এস্থলে "সবিতুঃ দেবস্য"-পদে ব্রহ্মকে জগতের প্রসবিতা বা জগৎ-কর্ত্তা বলা হইয়াছে, "ভর্গঃ—তেজঃ"-শব্দে তাঁহার শক্তির কথা বলা হইয়াছে এবং "প্রচোদয়াৎ"-শব্দে সর্ব্বান্তর্য্যামিতাহেতু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি-প্রেরকত্বের কথাই বলা হইয়াছে। এ-সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়াছেন : এস্থলে কেবল দু-একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৭-১৮ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ ; আমিই জ্ঞেয় পবিত্র ওঙ্কার এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ। আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ ; আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, স্থিতিকর্ত্তা এবং সংহার-কর্ত্তা ; আমিই অবিনাশী বীজ।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥১০।৮॥—আমি সকলের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে।"

বৈদিক গায়ত্রীর তাৎপর্য্য এবং বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥"-এই সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
—শ্রীভা, ১।১।১ ॥

—যিনি সৃষ্টবস্তু মাত্রেই সৎস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং তেজ, জল, বা মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে [ অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা ( যাঁহার পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে )], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ —প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু বলা হইয়াছে, তাঁহাকে অভিজ্ঞ ( সর্ব্বজ্ঞ ) এবং স্বরাট্ ( পরম-স্বতন্ত্র, স্ব-শক্ত্যেক-সহায় ) বলা হইয়াছে, তিনি যে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বীয় তেজঃ বা শক্তির প্রভাবে কুহক বা মায়াকে সর্ব্বদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাও বলা হইয়াছে। এই সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত করিতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রত্রয়—উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাদি—ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মের সবিশেষত্ব তাঁহার স্বরূপভূত, পরন্তু ঔপাধিক নহে। পরবর্ত্তী ১।১।৫২-৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ৩২। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্য

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ; কিন্তু ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যেরও অভাব নাই। এ-স্থলে দু'য়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্ অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্,

অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্, ন তদ্ অশ্নাতি কিঞ্চন, ন তদ্ অশ্নাতি কশ্চন ॥—৩।৮।৮॥—ব্রহ্ম স্থূল নহেন, অণু ( ক্ষুদ্র ) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন। তাঁহাতে স্নেহ নাই, ছায়া নাই, তমঃ নাই, বায়ু নাই, আকাশ নাই, সঙ্গ ( আসক্তি ) নাই, রস নাই, গন্ধ নাই ; তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাক্য নাই, মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, মাত্রা ( অংশ ) নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, তিনি কিছু ভোজন করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভোজন করে না ( তিনি অবিনাশী )।"

কঠোপনিষদ্ বলেন—"অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, তথা অরসম্, নিত্যম্, অগন্ধবচ্চ যৎ ॥ ১।৩।১৫ ॥ —ব্রহ্মের শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ব্যয় নাই, রস নাই, তিনি অগন্ধবৎ, নিত্য ॥"

এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, যাহা হইতে মনে হয়—ব্রহ্ম নির্বিবশেষ। আবার ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচকও যে অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। ইহার সমাধান কি ?

## ৩৩। নির্বিশেষত্ব-বাচক ও সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যের সমাধান

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উভয় রকম শ্রুতিবাক্যই যখন দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্ম কি স্বরূপতঃ সবিশেষ, না কি নির্বিবশেষ ? অথবা, শ্রুতিকথিত নির্বিবশেষত্বের এবং সবিশেষত্বের স্বরূপ বা তাৎপর্য্য কি ?

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—একই অভিন্ন বস্তু যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিবশেষ হইতে পারে না ; যেহেতু, সবিশেষত্ব এবং নির্বিবশেষত্ব হইতেছে পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং সবিশেষত্ব-বাচক এবং নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সমান গুরুত্ব থাকিতে পারে না, সমান পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তাহা হইলে সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিরই পারমার্থিক ( অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক ) মূল্য থাকিতে পারে, নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিগুলির পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে না। তদ্রূপ, যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিবশেষই হয়েন, তাহা হইলে নির্বিবশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলিরই পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে, সবিশেষত্ব-বাচক বাক্যগুলির পারমার্থিক মূল্য থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে, সর্ব্বপ্রথমে শ্রুতিবাক্যের গুরুত্বের কথাই বিবেচনা করা যাউক। শ্রুতিবাক্য হইতেছে অপৌরুষেয়, স্বয়ং-পরব্রহ্মের নিশ্বাস-স্বরূপ। জগতের জীবকে ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির প্রকটন। শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোনও অংশের পারমার্থিক মূল্য আছে, কোনও অংশের তাহা নাই, এইরূপ মর্ম্ম-জ্ঞাপক কোনও শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়না। সুতরাং এইরূপ অনুমানও শ্রুতিসম্মত নহে। শ্রুতি যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া, পারমার্থিক বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।১।২৭॥" "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৩।২।১৫ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ ॥—বেদবাক্যসমূহের মধ্যে কোনটী অর্থযুক্ত, কোনটী তাহা নয়—এইরূপ মনে করা সঙ্গত নয় ; যেহেতু, বেদবাক্য-সমূহ প্রমাণত্ব-বিষয়ে বিশেষত্বহীন ( অর্থাৎ কোনও বেদবাক্যের বিশেষ প্রমাণত্ব আছে, কোনও বেদবাক্যের বিশেষ প্রমাণত্ব নাই—তাহা নহে। সকল বেদবাক্যই সমান প্রমাণ। )"

সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য এবং নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য-এই উভয়ই যে ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক, তাহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়। কিরূপে জানা যায়, তাহা বলা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের "তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্" ইত্যাদি ৩।৮।৮ শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যেই বলা হইয়াছে—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য বা প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত—ইত্যাদি ॥৩।৮।৯॥" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—যিনি "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" ইত্যাদি, তিনিই চন্দ্রসূর্য্য-নদ-নদী-পর্ব্বতাদির নিয়ন্তা; অর্থাৎ ৩।৮।৮-বাক্যে যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী ৩।৮।৯-বাক্যে তাঁহাকেই সবিশেষ বলা হইয়াছে। ইহার পরে এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি ॥৩।৮।১১—এই অক্ষর ব্রহ্ম অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, অচিন্তিত হইয়াও মনন-কর্ত্তা, অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অপর কোনও দ্রষ্টা, শ্রোতা, মনন-কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। সেই অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওত-প্রোত হইয়া আছে।" এই বাক্যেও ব্রহ্মকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার সবিশেষত্বের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

আবার পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে কঠোপনিষদের "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্"-ইত্যাদি যে ১।৩।১৫-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গেই পরে বলা হইয়াছে—"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-ইত্যাদি ॥ ২।২।১২॥—তিনি এক অদ্বিতীয়, বশী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বেও ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ ॥১।২।২১॥—তিনি উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বদিকে গমন করেন।" এবং "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥১।২।২৩॥—এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীয় তনু পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন।" এই বাক্যগুলিও সবিশেষত্ব-বাচক। "অশব্দম্ অস্পর্শম্"-ইত্যাদি বাক্যে যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, উদ্ধৃত অন্য বাক্যগুলিতে তাঁহাকেই আবার সবিশেষ বলা হইয়াছে।

যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, কোনও আগন্তুক—সুতরাং অস্থায়ী—উপাধির যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে সবিশেষ হইয়াছেন, তাহাও শ্রুতিতে বলা হয় নাই। ইহা হইতেই জানা যায়—স্বরূপতঃ বা পরমার্থিকভাবেই ব্রহ্ম উল্লিখিতরূপ নির্ব্বিশেষ এবং সবিশেষ।

## ৩৪। সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্বের সমাধান

কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? একই অভিন্ন বস্তু কিরূপে যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর এই। বস্তুর বিশেষণ বা গুণাদি হইতেছে তাহার বিশেষত্বের

হেতু। একই অভিন্ন বিশেষণের যুগপৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব একই বস্তুতে সম্ভব নয়—ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যদি একাধিক বিশেষণ থাকে, অর্থাৎ যদি বিশেষত্বের একাধিক হেতু থাকে, তাহা হইলে বিশেষত্বও হইবে একাধিক রকমের। এইরূপ স্থলে এক জাতীয় বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং অপর জাতীয় বিশেষত্বের অভাব একই বস্তুতে অসম্ভব নয়। একই লোকের যুগপৎ শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু যাহার শ্রবণ-শক্তি নাই, দৃষ্টিশক্তি আছে, শ্রবণ-শক্তিজনিত বিশেষণ তাহার থাকিবে না, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিজনিত বিশেষণ তাহার থাকিবে। সুতরাং এক বিষয়ে তাহার বিশেষত্ব না থাকিলেও অন্য বিষয়ে বিশেষত্ব থাকিতে পারে।

শ্রুতিবাক্যানুসারে যখন জানা যায়—ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্বিবশেষও, তখন মনে করিতে হইবে—একই অভিন্ন বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিবশেষ নহেন, তদ্রূপ হইতেও পারেন না; যেহেতু, একই বিশেষণ-সম্বন্ধীয় সবিশেষত্ব এবং নির্বিবশেষত্ব পরস্পর-বিরোধী। শ্রুতিবাক্য যখন মিথ্যা হইতে পারে না, তখন মনে করিতে হইবে—যে-জাতীয় বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি নির্বিবশেষ, সেই-জাতীয় বিশেষণ-সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ নহেন; অপর-জাতীয় বিশেষণেই তিনি সবিশেষ। লৌকিক জগতে দেখা যায়—শ্রবণ-শক্তি না থাকিলেও লোকের দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে এবং দৃষ্টিশক্তি না থাকিলেও শ্রবণ-শক্তি থাকিতে পারে। ইহারা পরস্পর-বিরোধী নহে, একে অন্যের অপেক্ষাও রাখে না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে—কোন্ বিশেষণ-সম্বন্ধে ব্রহ্ম নির্বিবশেষ এবং কোন্ বিশেষণ-সম্বন্ধেই বা তিনি সবিশেষ।

উপরে ( ১।১।৩২-অনুচ্ছেদে ) উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্বসূচক যে সমস্ত শব্দ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই হইতেছে বিশেষত্বের অভাব-বাচক; যেমন, "অস্থূলম্, অনণু, অগন্ধম্, অরসম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্ ইত্যাদি"—ব্রহ্মে স্থূলত্বের অভাব, অণুত্বের অভাব, গন্ধের অভাব, রসের অভাব, চক্ষুর অভাব, কর্ণের অভাব ইত্যাদি। অন্যত্র আবার ব্রহ্মকে "সর্ববসন্ধঃ সর্ববরসঃ" বলা হইয়াছে (ছান্দোগ্যশ্রুতি ॥৩।১৪।২॥)। ইহা হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের গন্ধ এবং রস আছে। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্মের দর্শন-শক্তির বা মনন-শক্তির কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এক জাতীয় গন্ধ, রস, দর্শন-শক্তি, মনন-শক্তি ইত্যাদি তাঁহার মধ্যে নাই এবং অপর এক জাতীয় গন্ধ, রস, দর্শন-শক্তি ( বা চক্ষু ), মনন-শক্তি ( বা মন )-আদি তাঁহার আছে। গন্ধ, রস ইত্যাদি হইতেছে শক্তির কার্য্য। তাহাতে বুঝা যায়—এক জাতীয়-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে নাই; কিন্তু অপর-জাতীয় শক্তি তাঁহাতে আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ জাতীয় শক্তি তাঁহার স্বরূপে নাই এবং কোন্ জাতীয় শক্তি তাঁহাতে আছে।

ব্রহ্ম হইলেন স্বরূপে চিদ্‌বস্তু; সুতরাং চিৎ জাতীয় শক্তি তাঁহাতে থাকিতে পারে। "পরাহস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে চিৎ-জাতীয়শক্তি এবং ইহা ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে এবং আছেও। এই পরা শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বাদিও ব্রহ্মে থাকিতে

পারে এবং আছে ; এই শক্তি হইতে উদ্ভূত গন্ধ, রস, দর্শন-শক্তি ( বা চক্ষু ), মনন-শক্তি ( বা মন ) ইত্যাদি ব্রহ্মের থাকিতে পারে এবং "সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ, তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সে সমস্ত ব্রহ্মের আছেও।

ব্রহ্মের এমন একটী শক্তিও আছে, যাহা জড়রূপা—চিদ্‌বিরোধী ; চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে এই চিদ্‌বিরোধী জড়রূপা শক্তির স্পর্শ হইতে পারে না ( ১।১।১৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) এবং এই জড়রূপা শক্তি হইতে উদ্ভূত কোনওরূপ বিশেষত্ব—স্থূলত্ব, অণুত্ব, গন্ধ, রস, চক্ষু, কর্ণাদিও—চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। এজন্যই "অস্থূলম্, অনণু"—ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের মধ্যে সেই জড়রূপা শক্তি হইতে উদ্ভূত স্থূলত্বাদির অভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই জড়রূপা শক্তির নাম প্রকৃতি বা মায়া এবং এই শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বের নাম প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব।

নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক এবং সবিশেষত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সমন্বয়মূলক অর্থ করিলে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে—নির্ব্বিশেষত্ব-বাচক বাক্যগুলিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত বা মায়িক বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে এবং সবিশেষত্ব-বাচক বাক্যগুলিতে তাঁহার অপ্রাকৃত বা পরাশক্তিজাত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। একই বস্তুতে এতাদৃশ নির্ব্বিশেষত্বের এবং বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে ; যেহেতু, এক এবং অভিন্ন শক্তি তাহাদের হেতু নহে। "অস্থূলমনণু"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

এইরূপে জানা গেল—চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে চিদ্‌বিরোধী প্রাকৃত বিশেষত্বই নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়-বিশেষত্ব আছে। সুতরাং ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ সবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উক্ত সিদ্ধান্তে একটী প্রশ্ন জাগিতে পারে। তাহা পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে।

### ৩৫। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামীদের সাধন অসার্থক নহে

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সবিশেষই হয়েন, তিনি যদি স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ না-ই হয়েন, তাহা হইলে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী, তাঁহাদের সাধন কি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে ? অলীক আকাশ-কুসুমের ধ্যান-ধারণায় কখনও কি কুসুমের গন্ধের বাস্তব অনুভব হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্তিরূপ সাযুজ্য মুক্তির কথা যখন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তখন এই মুক্তিও পারমার্থিকী মুক্তিই। এইরূপ মুক্তিকামীদের উপাসনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সবিশেষ হইলেও তাঁহাদের ধ্যেয় নির্ব্বিশেষত্ব আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বস্তু নহে। তাহার হেতু এই।

সশক্তিক আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দমাত্র হইল বিশেষ্য, শক্তি হইল তাহার বিশেষণ। "আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ঃ বিশেষণানি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥৯॥" বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই হইতেছে সবিশেষ বস্তু। বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ে মিলিয়া তাহার পূর্ণস্বরূপ হইলেও কেবলমাত্র বিশেষ্য তাহার স্বরূপের বহির্ভূত বস্তু নহে ; তাহাও স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত, স্বরূপের একাংশ। দুগ্ধের শ্বেতত্ব আছে, তরলত্ব আছে, মিষ্টত্ব আছে,

সুগন্ধও আছে। যে ব্যক্তি দূর হইতে দুগ্ধের দর্শন পায়, দুগ্ধকে স্পর্শ করে না, দুগ্ধের স্বাদাদি গ্রহণ করে না—কখনও করেও নাই, তাহার নিকটে দুগ্ধের শ্বেতত্বমাত্রই অনুভূত হইবে, তরলত্বের বা মিষ্টত্ব-সৌগন্ধাদির অনুভব তাহার হইবে না; দুগ্ধসম্বন্ধে তাহার শ্বেতত্বের অনুভব অলীক বা অবাস্তব নহে, দুগ্ধের শ্বেতত্বও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বস্তু নহে।

যাঁহারা নির্বিবশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, ব্রহ্মের বিশেষণকে বাদ দিয়া কেবল বিশেষ্যের—সত্তামাত্রের অনুসন্ধানে বা ধ্যানেই তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীভূততার চরমতম পরাকাষ্ঠায় তাঁহারা কেবল বিশেষ্যের—ব্রহ্মের সত্তামাত্রেরই—অনুভব লাভ করিবেন। বিশেষ্যরূপ সত্তামাত্র যেমন অলীক বা অবাস্তব নহে, সত্তামাত্রের অনুভবও অলীক বা অবাস্তব নহে। এই অনুভব সত্য; তবে ইহা সম্যক্ অনুভব বা পূর্ণবস্তুর অনুভব নহে, ইহা অসম্যক্ বা আংশিক অনুভব মাত্র। বিশেষ্য ও বিশেষণ এতদুভয়ের অনুভবেই সম্যক্ অনুভব। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ। যত্র স্বরূপভূত-নানা-বৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥৭০॥—যে স্থলে বিশেষ ( বা বিশেষণ ) ব্যতীত ( বিশেষ্য ) বস্তুর স্ফূর্ত্তি হয়, সেস্থলে দৃষ্টি হয় অসম্পূর্ণা, যেমন ( নির্বিবশেষ ) ব্রহ্ম-স্বরূপে। আর যেস্থলে স্বরূপগত-নানাবৈচিত্রীময় বিশেষত্বযুক্তাকারে স্ফূর্ত্তি হয়, সে স্থলে দৃষ্টি হয় সম্পূর্ণা।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তত্রাপি একস্য দর্শনস্য বাস্তবত্বম্ অন্যস্য ভ্রমজত্বম্ ইতি ন মন্তব্যম্। উভয়োরপি যাথার্থ্যেন দর্শিতত্বাৎ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥৬৯॥ —এস্থলে একের দর্শন বাস্তব, অন্যের দর্শন অবাস্তব, তাহা নহে। উভয়ের দর্শনই যথার্থ দর্শন।"

যাহা হউক, শ্রুতিবাক্যসমূহের আলোচনা হইতে বুঝা গেল, সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য সবিশেষ-ব্রহ্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার সত্তামাত্রের অনুভব যাঁহারা লাভ করিয়াছেন বা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের ধ্যেয় বস্তুকে নির্বিবশেষ ব্রহ্ম বলেন। এই ব্রহ্ম-সত্তামাত্র সত্য হইলেও ইহাই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নহে, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের একদেশমাত্র।

শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের **সবিশেষত্বেরও অনেক বৈচিত্রী** আছে। ক্রমশঃ তৎসমস্তের কিছু কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

## ৩৬। ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ

বস্তুর পরিচয় হয় তাহার লক্ষণের দ্বারা। এই লক্ষণ দুই রকমের—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ।

**স্বরূপ-লক্ষণ**—যে লক্ষণটী অপরাপর বস্তু হইতে লক্ষ্যবস্তুর ভেদ দেখাইয়া কেবল লক্ষ্যবস্তুকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং যাহা লক্ষ্যবস্তুরই অঙ্গীভূত, তাহাকে বলে লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। যেমন দুই হাত ও দুই পা, মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও নাই; এই লক্ষণটী অপর প্রাণী হইতে মানুষের ভেদ দেখাইয়া একমাত্র মানুষকেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং ইহা মানুষেরই অঙ্গীভূত। ইহা হইল মানুষের স্বরূপ-লক্ষণ।

বস্তুর উপাদানও তাহার স্বরূপ-লক্ষণ ; কারণ, উপাদান সর্ব্বদাই বস্তুর মধ্যে থাকে এবং উপাদানের বৈশিষ্ট্যই বস্তুর স্বরূপ-গত বৈশিষ্ট্য। লবণ এবং মিছরী বা চিনি দেখিতে একরকম হইলেও তাহাদের উপাদান এক নহে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ ॥ শ্রীচৈ চ. ২।২০।২৯৬॥" আকৃতি এবং প্রকৃতি, অথবা আকৃতির প্রকৃতি—অঙ্গ-সন্নিবেশের বিশিষ্টতা, কি রূপগত বিশিষ্টতা, কিম্বা উপাদানগত বিশিষ্টতাই হইল বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ।

**তটস্থ-লক্ষণ**—ইহাও অপরাপর বস্তু হইতে লক্ষ্য বস্তুর ভেদ দেখাইয়া লক্ষ্য বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় ; কিন্তু ইহা লক্ষ্য বস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও কার্য্যদ্বারাই ইহার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। যেমন, হিতাহিত-বিচার-শক্তি। ইহা মানুষের তটস্থ-লক্ষণ ; অপর কোনও প্রাণীর ইহা নাই, মানুষেরই আছে ; এবং কোনও সমস্যা উপস্থিত হইলেই তাহার মীমাংসা-ব্যাপারে মানুষের এই বিচার-শক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। মিছ্‌রীর মিষ্টতা হইল মিছরীর তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ ॥ শ্রীচৈ চ ২।২০।২৯৬॥

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণই বা কি এবং তটস্থ-লক্ষণই বা কি।

ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতিবলেন—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ॥—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি, আনন্দবল্লী ॥১॥ আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ ॥—ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল ॥ তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী ॥৬॥ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কো হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদি এষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী ॥৭॥—ইনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ। জীব এই রসস্বরূপকে লাভ করিলেই আনন্দী হয়। এই ব্রহ্ম যদি আনন্দ না হইতেন, তাহা হইলে কে-ইবা জীবন ধারণ করিত, কে-ইবা প্রাণের ব্যাপার সম্পন্ন করিত। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৯।২৮॥—ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ"। বেদান্তদর্শনও বলেন—"আনন্দময়োভ্যাসাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥১।১।১২—ব্রহ্মকে শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ আনন্দময়ই বলা হইয়াছে।"

উল্লিখিত শ্রুতি-বেদান্ত-দর্শন-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ বা বিজ্ঞান-স্বরূপ, রস-স্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। সত্য-শব্দে সৎ বা নিত্যসত্ত্বাবিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। জ্ঞানম্ চিদেকরূপম্ (শ্রীজীব গোস্বামী, তত্ত্বসন্দর্ভঃ ॥৫১॥); জ্ঞান এবং বিজ্ঞান একই। জ্ঞান-শব্দে জড়-প্রতিযোগী চিদ্ বস্তুকে বুঝায় ; চিদ্‌বস্তু চেতনাময়, স্ব-প্রকাশ ; জড়বস্তু তাহার বিপরীত—অচেতন, স্বপ্রকাশ নহে। আনন্দ-শব্দে দুঃখ-প্রতিযোগী সুখ-স্বরূপ বস্তুকে বুঝায়। আর, অনন্ত-শব্দে সর্ব্ববিষয়ে অন্তহীনতা বা অসীমতা বুঝায়। রস-শব্দে আস্বাদ্যত্ব এবং আস্বাদকত্ব বুঝায়—রস্যতে রসয়তি চ ইতি রসঃ। এই রস-স্বরূপত্বেও তিনি অনন্ত।

তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতেছেন—সৎ চিৎ আনন্দ—সচ্চিদানন্দ এবং রস-স্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ; ব্রহ্মের এই আনন্দ হইতেছে চিৎ—জড়-প্রতিযোগী, এবং স্বপ্রকাশ এবং তাহা আবার সৎ—নিত্য, নিত্যসত্ত্বা-বিশিষ্ট। এই **সচ্চিদানন্দত্বই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ**। এই লক্ষণ ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান এবং এই

লক্ষণ জড়, দুঃখস্বরূপ বা দুঃখময় এবং অনিত্য বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য সূচিত করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ * * * সত্যং পরং ধীমহি॥" ১।১।১-শ্লোক প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"সত্য-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯৮॥"

আর, "জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ব্রহ্মসূত্র॥১।১।১॥", "স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ স ইমান্ লোকানসৃজত॥ ঐতরেয়-শ্রুতি॥১।১॥ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥ শ্বেতাশ্বতর॥৬।১৮॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি॥ মুণ্ডকশ্রুতি—॥ ২।২।৭॥" ইত্যাদি শ্রুতি-বেদান্তদর্শন-বাক্যে ব্রহ্মের শক্তি-কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তিকার্য্যই ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোল্লিখিত "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ। শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯৯-৩০০"॥

রস-স্বরূপত্বেও ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে—পরমতম আস্বাদ্য এবং পরম-তম আস্বাদক বলিয়া।

শক্তি থাকিলেই শক্তির কার্য্য থাকিবে এবং তটস্থ-লক্ষণ থাকিবে। ব্রহ্মের শক্তি যখন স্বাভাবিকী, তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ না থাকিয়া পারে না। যাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি-ব্যতিরিক্ত কেবল সত্তামাত্রের অনুভব লাভ করেন বা করিতে প্রয়াসী, শক্তির এবং শক্তিকার্য্যের প্রতি তাঁহাদের অনুসন্ধান থাকেনা বলিয়া ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের অনুভবও তাঁহারা পায়েন না; তাই তাঁহারা মনে করিতে পারেন—ব্রহ্মের কেবল স্বরূপ-লক্ষণই আছে; কিন্তু কোনও তটস্থ-লক্ষণ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অনুভব অসম্পূর্ণ ( ১।১।৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। তাঁহারা তটস্থ-লক্ষণের অনুভব পায়েন না বলিয়াই যে ব্রহ্মে তটস্থ-লক্ষণের অভাব আছে, এইরূপ অনুমান বিচার-সহ নয়। যে ব্যক্তি দূরস্থান হইতে দীপশিখার জ্যোতির্মাত্র দেখিয়াছে, দীপের নিকটে আসিয়া শিখার তলদেশস্থিত তাপহীন সলিতামূলভাগ কখনও দেখে নাই, সে যদি বলে—দীপের কোনও স্থানেই তাপহীন কোনও অংশ নাই, তাহা হইলে প্রদীপের অতি নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি তাহার কথার কোনও মূল্যই আছে বলিয়া মনে করিবে না। সত্য বস্তুর কোনও এক অংশেরও বাস্তব অনুভব হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ আংশিক অনুভব-কর্ত্তা তাহার অননুভূত অংশ সম্বন্ধে অনুমানে যদি কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে যায়, এবং তাহার এই অনুমান যদি সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা আদরণীয় হইতে পারে না।

## ৩৭। ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি

অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে অস্বীকার করা যায় না, অথচ কোনও যুক্তিদ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা—যাহা চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কের অতীত—তাহাকেই অচিন্ত্য বলা হয়। যেমন মিশ্রী মিষ্ট; ইহা অতি প্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনবিদিত; সুতরাং মিশ্রীর মিষ্টতাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মিশ্রী কেন মিষ্ট—

কোনওরূপ যুক্তিতর্কদ্বারাই তাহা নির্ণয় করা যায় না। এস্থলে মিশ্রীর মিষ্টত্ব হইতেছে একটী অচিন্ত্যবস্তু। এইরূপে অগ্নির দাহিকা-শক্তি, জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব-শক্তি, যবক্ষারের তিক্ততা, বিষের প্রাণ-নাশকত্বাদি সমস্তই অচিন্ত্য বস্তু।

বিষ্ণুপুরাণের "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ॥ ১।৩।২॥"-শ্লোকের টীকায় "অচিন্ত্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানম্—যে বিষয়ে তর্ক চলেনা, যুক্তিতর্কদ্বারা যাহা নির্ণয় করা যায় না, তাহাই অচিন্ত্য।"

যুক্তিতর্কের বিচারে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ যাহা দুর্ঘট, তাহাও যে সম্ভব হয়, ইহাও অচিন্ত্যত্ব। "দুর্ঘটঘটকত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ।" স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, মন্ত্র সাপকে বশীভূত করে, মহৌষধ-বিশেষ অকস্মাৎ ভীষণ রোগকে দূরীভূত করে—এ-সমস্ত হইল লৌকিক জগতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদির অচিন্ত্য-শক্তি।

ব্রহ্মের এইরূপ অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তি আছে। এই সমস্ত শক্তির প্রভাব বা কার্য্যাদি যুক্তিতর্কের অতীত, চিন্তার অতীত।

শ্রুতিও ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ১৪৪-পৃষ্ঠাধৃত মধ্বাচার্য্যোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য।—

—সেই পুরাণ (অনাদি) পুরুষ ব্রহ্মের বিচিত্র (অচিন্ত্য) শক্তি আছে; অন্য কাহারও এইরূপ বিচিত্রশক্তি-নাই।" কৈবল্যোপনিষদে দেখাযায়—"আপণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ ॥১।২১॥—আমি (ব্রহ্ম) অপাণিপাদ এবং অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন ॥"

বেদান্তও ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির কথা বলিয়াছেন। "আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।১।২৮॥" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে এই বেদান্ত-সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং উপক্রমে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বতোঽপি আশ্চর্য্যশক্তিত্বং তস্য—তাঁহার (ব্রহ্মের) সর্ব্বতঃই আশ্চর্য্যশক্তিত্ব।" এই উক্তির প্রমাণরূপেই তিনি উক্ত সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সূত্রের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যধৃত ভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি। সর্ব্বসম্বাদিনী. বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ। ১৪৪ পৃষ্ঠা।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্‌বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।—উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২।১।২৪॥—সূত্রভাষ্য।" অন্যত্রও তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। শ্বেতাশ্বতর॥ ৩।২০॥ কঠোপনিষৎ ॥ ২।২০॥—ব্রহ্ম অণু হইতেও ক্ষুদ্র, আবার মহৎ (বৃহত্তম) বস্তু হইতেও বৃহৎ।" "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র ইতি কাঠকে ১।২।২১॥—উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরদেশে গমন করেন, শায়িত থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন॥"—এই-সমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির পরিচায়ক।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥১।৪।২৬॥ আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।১।২৮॥" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন -ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন।

## ৩৮। ব্রহ্ম সধর্ম্মক

শক্তি হইতেই ধর্ম্মের উদ্ভব। পোড়াইয়া দেওয়ার শক্তি আছে বলিয়াই আগুনের দাহকত্ব-ধর্ম্ম। আগুন নিভাইয়া দেওয়ার শক্তি আছে বলিয়াই জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব-ধর্ম্ম। বস্তুতঃ, সবিশেষত্বই হইতেছে বস্তুর ধর্ম্ম। ব্রহ্ম যখন সশক্তিক এবং সবিশেষ, তখন ব্রহ্ম যে সধর্ম্মক, ব্রহ্মের যে ধর্ম্ম আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বৃহত্ত্ব এবং বৃহৎ-কারিত্ব—এই দুইটী ধর্ম্ম যে ব্রহ্মের আছে, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা জানা যায়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায়—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিত্ব ধর্ম্মও তাঁহার আছে। "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—শিবত্ব ( মঙ্গলময়ত্ব ) এবং সুন্দরত্ব এবং সত্যত্ব ( নিত্যত্ব )—এই সমস্ত ধর্ম্মও ব্রহ্মের আছে। বস্তুত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সধর্ম্মকই, নির্ধর্ম্মক নহেন। নিত্যত্ব এবং বিভুত্বও ব্রহ্মের ধর্ম্ম।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে কথিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও ব্রহ্মের ধর্ম্ম। "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥১।২।২১॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাঁহার স্বরূপভূত ; পরন্তু ঔপাধিক নহে। পরবর্ত্তী ১।১।৫২-৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ৩৯। ব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়

শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ॥৩।২০॥ ব্রহ্ম অণু হইতেও সূক্ষ্ম, আবার বৃহত্তম বস্তু হইতেও বৃহৎ।" অণুত্ব ও বিভুত্ব হইতেছে পরস্পর বিরুদ্ধ।

ঈশোপনিষৎ বলেন—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ ॥৪॥—সেই আত্মা স্বয়ং এক এবং অনেজৎ—নিশ্চল। অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্ ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে ॥৫॥—তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন ; তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন।"

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন—"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ ॥১।৩।৭॥—সেই ব্রহ্ম মহৎ অলৌকিক এবং অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, দূর হইতেও দূরবর্ত্তী, অথচ নিকটেও প্রকাশ পায়েন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের "তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।"—ইত্যাদি (১০।৯।১৪)-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ব্রহ্মের পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। "শ্রুতিশ্চ অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব ইত্যাদ্যা। **। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি

ন্যায়েন অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকো হরিরিত্যাদি অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চাপি সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়ত ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যদর্শিত-শ্রুতিপুরাণ-প্রামাণ্যেন তথৈব। তুরীয়মতুরীয়ম্ আত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদি শ্রীনৃসিংহতাপনীদৃষ্ট্যা, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি সাক্ষাৎ শ্রীস্বয়ংভগবদুপদেশেন প্রত্যেকাচিন্ত্যবিরুদ্ধাবিরুদ্ধানন্তশক্তিময়ত্বাৎ ঘটত এব যুগপত্তদ্দ্বয়মপীত্যর্থঃ।" এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম অস্থূল এবং স্থূলও, অনণু এবং অণুও, অমধ্যম এবং মধ্যমও, অবর্ণ এবং শ্যাম ও রক্তান্তলোচনও, তুরীয় এবং অতুরীয়, আত্মা এবং অনাত্মা, উগ্র এবং অনুগ্র, বীর এবং অবীর, মহান্ত এবং অমহান্ত, বিষ্ণু এবং অবিষ্ণু, জ্বলন্ত এবং অজ্বলন্ত, সর্ব্বতোমুখ এবং অসর্ব্বতোমুখ ( নৃসিংহতাপনী শ্রুতি ) ইত্যাদি। গীতাতেও দেখা যায়—তিনি ভূতসমূহে আছেন, তিনি ভূতসমূহে নাই। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মে এইরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমবায়।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের কথা জানা যায়। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিব ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপি অমিতত্বঞ্চ। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃদ্বিশ্বকৃদ্বিদাত্মযোনিঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতৌ (৬।১৯)। সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি॥ গোবিন্দভাষ্য॥"—তাৎপর্য্য—মাণ্ডুক্য-শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অমাত্র এবং অনন্তমাত্র ( মাত্রা শব্দের অর্থ অংশ ) বলা হইয়াছে ; এস্থলে ব্রহ্মের নিরংশত্ব ও সাংশত্বের কথা জানা যায়। কাঠক-শ্রুতি বলেন—উপবিষ্ট থাকিয়াও ব্রহ্ম দূরদেশে গমন করেন এবং শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। এস্থলে ব্রহ্মের মিতত্ব ও অমিতত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর- শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকৃৎ ( বিশ্বসৃষ্টিকারী ) এবং নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। এস্থলে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও নির্ব্বিকারত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের কথা জানা যায়।

সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৫৭ পৃষ্ঠায় ) ধৃত পৈঙ্গীশ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"যো বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধোমনুরমনুর্বাগবাগিন্দ্রোঽনিন্দ্রঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ স পরমাত্মা ইতি।—যিনি বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ, মনু এবং অমনু, বাক্ এবং অবাক্, ইন্দ্র এবং অনিন্দ্র, প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি, তিনি পরমাত্মা।" এই শ্রুতিবাক্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বকেই পরমাত্মার বা ব্রহ্মের লক্ষণরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বও অচিন্ত্য বস্তু ; অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয়। শ্রুতিতে যখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কথা এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥ ব্রহ্মসূত্র॥"

## ৪০। ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব

**শক্তি হইতেই** গুণের উদ্ভব। যাঁহার শক্তি আছে, তাঁহার গুণও থাকিবে। তিনি যেমন সবিশেষ, তেমনি সগুণও।

গুণ থাকে, গুণবানের মধ্যে; সুতরাং গুণবানের মধ্যে যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণই গুণবানে থাকিতে পারে; যে শক্তি গুণবানের বাহিরে থাকে, সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রহ্মের শক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্মের গুণও থাকিবে, ব্রহ্ম সগুণ। কিন্তু কেবলমাত্র স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত; সুতরাং কেবলমাত্র চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণই—চিন্ময় গুণই—তাঁহাতে থাকিতে পারে।

মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও তাহা ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করে না, ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মায়া হইতে উদ্ভূত গুণও ব্রহ্মের মধ্যে থাকিতে পারে না; ব্রহ্ম মায়িক গুণহীন।

এইরূপে দেখাগেল—**ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই**; চিন্ময় গুণে ব্রহ্ম সগুণ, মায়িক গুণে তিনি নির্গুণ। এই দুই জাতীয় গুণ দুইটী ভিন্নশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া একই ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং নির্গুণত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে (১।১।৩৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই সিদ্ধান্ত যে শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, তাহা দেখান হইতেছে।

বোম্বাই-নির্ণয়সাগর-প্রেস হইতে ১৮৭০-শকাব্দায় প্রকাশিত গোপাল-পূর্ব্বতাপণী শ্রুতির সর্ব্ব প্রথম বাক্যেই বলা হইয়াছে "শ্রীমৎপঞ্চপদাগারং সবিশেষতয়োজ্জ্বলম্। প্রতিযোগিবিনির্মুক্তং নির্ব্বিশেষং হরিং ভজে॥—পঞ্চপদাগার হরির ভজন করি। (তিনি কিরূপ?) তিনি সবিশেষতাবশতঃ উজ্জ্বল এবং প্রতিযোগিবিনির্মুক্ত বলিয়া নির্ব্বিশেষ।"

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী এবং গোপাল-উত্তর-তাপনী এই উভয় শ্রুতিতেই হরির পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চপদযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রে তাঁহার উপাসনার কথাও বলা হইয়াছে; এজন্য তাঁহাকে "পঞ্চপদাগার" বলা হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম হরি যে সচ্চিদানন্দ, তাহাও উভয় শ্রুতিতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরব্রহ্মকেই উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে সবিশেষ (সগুণ) এবং নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ)—উভয়ই বলা হইয়াছে। নির্ব্বিশেষত্বের হেতুরূপে বলা হইয়াছে—"প্রতিযোগিবিনির্মুক্তম্—প্রতিযোগী হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলিয়া তিনি নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ)।" প্রতিযোগী হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব বা গুণ তাঁহাতে একেবারেই নাই বলিয়া তিনি নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ।

কিন্তু "প্রতিযোগী" বলিতে কি বুঝায়? "প্রতিযোগী" হইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপের প্রতিযোগী, স্বরূপের বিরুদ্ধ। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেছে—সচ্চিদানন্দ; তাহার প্রতিযোগী হইবে তাহা, যাহা চিৎও নয়, আনন্দও নয়। যাহা চিদ্‌বিরোধী, তাহা হইবে জড়—ব্রহ্মের স্বরূপের প্রতিযোগী। সুতরাং বুঝা গেল—জড় বিশেষত্ব (অর্থাৎ

জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব ) ব্রহ্মে নাই বলিয়া তিনি নির্বিবশেষ। আবার বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্ম "বিশেষতয়োজ্জ্বলম্—বিশেষত্ব দ্বারা উজ্জ্বল।" যে বিশেষত্ব তাঁহাতে আছে, তাহা হইতেছে "উজ্জ্বল—স্বপ্রকাশ—সুতরাং চিৎ-স্বরূপ।" একমাত্র চিন্ময় ( চিচ্ছশক্তি হইতে উদ্ভূত ) বিশেষত্বই "উজ্জ্বল—স্বপ্রকাশ" হইতে পারে। এই উজ্জ্বলবিশেষত্বই ব্রহ্মকেও উজ্জ্বল করিয়াছে।

এইরূপে গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব বা গুণ আছে; কিন্তু তাঁহার বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব বা গুণ তাঁহাতে নাই।

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥১৮॥" এই শ্রুতিবাক্যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে "নির্গুণও" বলা হইয়াছে, আবার কর্ম্মাধ্যক্ষ ( কর্ম্মফলদাতা ), সাক্ষী ( ঈক্ষণমাত্র কর্ত্তা—ঈক্ষণকর্ত্তা ) ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে সগুণও বলা হইয়াছে। ইহার সমাধান এই যে—বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত গুণ তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি নির্গুণ; কিন্তু চিচ্ছক্তির সহায়তাতে তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষতা ও ঈক্ষণাদি হইয়া থাকে বলিয়া চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণে তিনি সগুণ।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎষঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥৮।১।৫॥ —এই আত্মা (ব্রহ্ম ) পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।" এই শ্রুতিবাক্যে দুই রকমে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—প্রথমতঃ, তাঁহাতে কি কি নাই, তাহা বলিয়া; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাতে কি কি আছে, তাহা বলিয়া।

ব্রহ্মে কি কি নাই, তাহা বলিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহাতে পাপ নাই, জরা ( বার্দ্ধক্য ) নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই। পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক এবং ক্ষুৎ-পিপাসা এসমস্ত হইতেছে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত; মায়ার প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীবেরই এই সমস্ত থাকে। ব্রহ্মে এই সমস্ত নাই, অর্থাৎ মায়া হইতে উদ্ভূত কোনও কিছুই ব্রহ্মে নাই।

আর ব্রহ্মে কি কি আছে, তাহা বলিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। ব্রহ্মের যে সত্যকামতা ও সত্যসঙ্কল্পতা আছে, তাহাই বলা হইল। সত্যকামতা-সত্যসঙ্কল্পতাদি গুণ হইতেছে ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত। এই সমস্ত কল্যাণ-গুণে ব্রহ্ম সগুণ।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম "অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ ইত্যাদি ॥ ৩।৮।৮॥—ব্রহ্মের রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু নাই, ইত্যাদি।" আবার ছান্দোগ্য-শ্রুতি কিন্তু বলিয়াছেন—ব্রহ্ম "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যাদি ।৩।১৪।৪॥" শ্রুতি একবার বলিলেন—ব্রহ্ম "অরসম্", আবার বলিলেন—ব্রহ্ম "সর্ব্বরসঃ"; একবার বলিলেন—ব্রহ্ম "অগন্ধম্", আবার বলিলেন—ব্রহ্ম "সর্ব্বগন্ধঃ", একবার বলিলেন—ব্রহ্ম "অচক্ষুষ্কম্ ( ব্রহ্মের চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি নাই )", আবার বলিলেন—"তদৈক্ষত। ছান্দোগ্য-শ্রুতি ॥ ৬।২।৩॥—ব্রহ্ম দর্শন করিলেন।"

পরস্পর-বিরুদ্ধবাক্যগুলির মধ্যে কতকগুলি অর্থহীন, অপ্রামাণিক, একথা বলা চলে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও "প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩।২।১৫॥"---এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন--"নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিৎ অর্থবত্ত্বং কস্যচিৎ অনর্থবত্ত্বম্ ইতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। --বেদবাক্যসমূহের মধ্যে কোনও বাক্য অর্থযুক্ত, কোনও বাক্য অর্থহীন--এইরূপ প্রতিপাদনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে। সমস্ত বেদবাক্যই সমান ভাবে প্রামাণিক, ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছু নাই।" মূল ব্রহ্মসূত্রটীও "অবৈয়র্থ্যাৎ"-শব্দে তাহাই বলিয়াছেন।

এ-সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান এই যে, ব্রহ্মে মায়া হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ প্রাকৃত) রস নাই, গন্ধ নাই, দৃষ্টিশক্তি নাই ; কিন্তু তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ চিন্ময় বা অপ্রাকৃত) রস, গন্ধ, দৃষ্টিশক্তি-আদি তাঁহার আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রাকৃত গুণ নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণ আছে।

এ-সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন---"যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ইতি ॥ বহরমপুর-সংস্করণ ॥ ২২৯ পৃষ্ঠা ॥ ---শাস্ত্রে যে জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, হেয়-প্রাকৃত ( মায়া হইতে উদ্ভূত ) গুণ তাঁহাতে নাই।"

ব্রহ্মে প্রাকৃত গুণ নাই বটে, কিন্তু চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত অনন্ত কল্যাণগুণ যে তাঁহাতে আছে, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব তাহাও দেখাইয়াছেন। "অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহীতি। তথা : জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুর্ণাদিভিরিতি ॥— ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ ২২৮ পৃষ্ঠা ॥---অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। 'হে মুনে ! ভগবান্ দোষ-গুণ-সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন ( অর্থাৎ তাঁহাতে দোষও নাই, গুণও নাই )—ইহা বলিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে—তিনি সকল-কল্যাণ-গুণাত্মকই। যেমন—হেয় ( প্রাকৃত ) গুণ তাঁহাতে নাই ; কিন্তু অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ—ভগবচ্ছব্দবাচ্য এই সকল গুণ তাঁহাতে আছে।" এই উক্তি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে প্রাকৃত কোনও দোষ বা গুণ নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত অনন্ত-কল্যাণ-গুণ আছে।

নারদ-পঞ্চরাত্র হইতেও তাহা জানা যায়। "নারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে ॥ নমঃ সর্ব্বগুণাতীত ষড়্গুণায়াদিবেধস ইতি ॥ তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে ॥ গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৩২-পৃষ্ঠাধৃত প্রমাণ ॥—নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে বলা হইয়াছে--তুমি সর্ব্বগুণাতীত, ষড়্গুণ,আদি বিধাতা, তোমাকে নমস্কার। ব্রহ্মতর্কে বলা হইয়াছে--এই ঈশ্বর হরি স্বরূপভূত গুণসমূহদ্বারা গুণবান্।" এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ব্রহ্ম প্রাকৃত-গুণহীন, কিন্তু স্বরূপভূত অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার আছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যম-গ্রাহ্যম্ ( মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ১।১।৫-৬। )" ইত্যাদৌ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি-কল্যাণ-গুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" ( মুণ্ডক ১।১।৬ ) ইত্যাদিনা এবং "নির্গুণং নিরঞ্জনং"

ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিষয়নিষেধত্বমেব। সর্ব্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।—তাৎপর্য্য এই ঃ উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য-সমূহে ব্রহ্মে প্রাকৃত হেয়গুণের অভাবের কথা এবং তাঁহার নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি কল্যাণগুণসমূহের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয়ে নির্গুণ—এইরূপ মনে করিলে তাঁহার নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি স্বস্বীকৃত গুণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রহ্মের অনন্ত গুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ শ্রীভাগবত॥ ১০।১৪।৭॥" ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে জানা যায়—পৃথিবীর বালুকা-কণা, এমন কি আকাশস্থিত মিহিকার বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের জ্যোতিঃকণার সংখ্যা নির্ণয় করাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি গুণাত্মক ব্রহ্মের গুণাবলীর নির্ণয় সম্ভব নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত কোনও প্রাকৃত গুণ নাই; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ আছে।

**প্রাকৃত গুণ-বিষয়ে ব্রহ্ম নির্গুণ, অপ্রাকৃত গুণ-বিষয়ে সগুণ।**

ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার স্বরূপভূত, পরন্তু ঔপাধিক নহে। পরবর্ত্তী ১।১।৫২-৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যদি কেহ বলেন—ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-গুণযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে গেলেও যেন গুণের দ্বারা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহার উত্তরে বলা যায়—গুণের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন; যেহেতু, তাঁহার গুণ অনন্ত, অসীম—সংখ্যাতেও অসীম এবং পরিমাণেও অসীম।

## ৪১। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্তা

ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে পারেন; সুতরাং তিনি ঈশ্বর—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। এই ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মে চরমকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে "পরম মহেশ্বর" বলিয়াছেন। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ শ্বেতাশ্বতর ।৬।৭॥"—সেই ব্রহ্ম ঈশ্বর-সমূহেরও পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম-দৈবত, পতিদিগেরও পরম-পতি, ইত্যাদি।

ঈশ্বরের ভাবই ঐশ্বর্য্য। যিনি ঈশ্বর, তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যও আছে। ভগ-শব্দ ঐশ্বর্য্যবাচক। সুতরাং যিনি ঐশ্বর্য্যবান্, তিনি ভগবান্, তাঁহার ভগবত্তা আছে। শ্রুতিও ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিয়াছেন। "সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ।৩।১১॥"

## ৪২। বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ

পরব্রহ্মের ভগবত্তাসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কয়েকটী শ্লোক আছে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৬৫-৭০ পৃষ্ঠায় ) সে-সমস্ত শ্লোক এবং তাহাদের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে সেই আলোচনা উদ্ধৃত হইতেছে।

"নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ-সুখভাবৈকলক্ষণা।
ভেষজং ভগবৎ-প্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥ বি. পু. ৬।৫।৫৯॥

**টীকা।** নিরস্তোঽতিশয়াহ্লাদো নির্বৃতিঃ যস্মিন্ সুখে তদ্ভাবঃ তদাত্মত্বমেব একলক্ষণং যস্যাঃ সা তথা। কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেণ অবশ্যম্ভাবিনী ন তু ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্ম্মফলাদিবদনিত্যা। আত্যন্তিকী চ নিত্যা।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "যে সুখে অতিশয় আহ্লাদ নিরস্ত হইয়াছে, এতাদৃশী একান্ত আত্যন্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ।" টীকার মর্ম্ম ঃ—"নিরস্ত হইয়াছে অতিশয় আহ্লাদ—নির্বৃতি—যে সুখে, তাহাই নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ সুখ। তদ্ভাব—তদাত্মত্ব। তদাত্মত্বই হইতেছে একমাত্র লক্ষণ যে ভগবৎ-প্রাপ্তির, তাহাই হইতেছে নিরস্তাতিশয়-সুখভাব-লক্ষণা ভগবৎ-প্রাপ্তি। উহা একান্তা—অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেই ঐরূপ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। ঋত্বিকাদির বৈগুণ্যবশতঃ কর্ম্মফল যেমন অনিত্য হয়, এই ভগবৎ-প্রাপ্তি তদ্রূপ অনিত্য নহে। ইহা আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্যা।" জীবের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং চরমতম-সুখপ্রাপ্তি যে একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই সম্ভব, এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিতে যে সুখ, তাহার তুলনায় সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখও যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—

## ৪৩। আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ জ্ঞান

"তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে ॥ বি, পু, ৬।৫।৬০ ॥"

**টীকা।** যত্নস্য সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ—তৎপ্রাপ্তীতি কর্ম্মসত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানং সাক্ষাৎ। তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমাহ—

"আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।" তদ্বিবৃণোতি—"শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥ বি, পু, ৬।৫।৬১ ॥"

**টীকা।** আগমময়ম্ আগমোত্থং জ্ঞানং শব্দাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইত্যাদিবাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম শ্রবণজং জ্ঞানম্ আগমোত্থমিত্যর্থঃ। দেহাদিবিবিক্তাত্মাকারচিত্তবৃত্তৌ নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃত্তিব্যঙ্গ্যস্য ব্রহ্মণ এব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব জ্ঞানমিত্যুক্তম্।

**মর্ম্মানুবাদ।** "এজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য অবশ্য যত্ন করিবেন। হে মহামুনে! ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতু হইতেছে জ্ঞান এবং কর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" টীকার মর্ম্ম ঃ—"যত্ন হইতেছে সাধন-বিষয়ক। এজন্য মূল শ্লোকে সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই উপদেশ এই। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞান দুই রকম—আগমোত্থ ও বিবেকোত্থ। শব্দব্রহ্ম আগমময় এবং পরব্রহ্ম—বিবেকজ। আগমময়—আগমোত্থ জ্ঞান। শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত" ইত্যাদি শব্দ হইতে ব্রহ্মের বিষয় যাহা জানা যায়, তাহা শ্রবণজ জ্ঞান; তাহাই আগমোত্থ জ্ঞান।

দেহাদিজ্ঞান হইতে পৃথক্কৃত আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে নিদিধ্যাসনযোগে প্রকাশমান ব্রহ্ম হইতেছে বিবেকজ জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ্য ব্রহ্মের জ্ঞানই হইতেছে অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জ্ঞান।”

ইহা হইতে বুঝা গেল—শাস্ত্রাদির অধ্যয়নজনিত বা শ্রবণ-জনিত জ্ঞানই হইতেছে আগমোত্থ জ্ঞান; ইহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর দেহাত্মবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে শুদ্ধচিত্তে ধ্যানাদিদ্বারা প্রকাশমান যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে বিবেকজ জ্ঞান; ইহা হইতেছে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে, অপরোক্ষ জ্ঞানের স্থান বিশুদ্ধ চিত্তে। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, গ্রন্থালোচনাদ্বারা বা অপর কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ-সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান। আর, বরফ হাতে পাওয়া গেলে, তাহা মুখে দিয়া গায়ে মাখিয়া বরফ-সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে বরফ-সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান।

“ননু শব্দশ্রবণাদপি ব্রহ্মজ্ঞানমেব উৎপাদ্যতে। তেনৈব অজ্ঞাননির্ব্বর্ত্ত্য-ভগবৎ-প্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজ-জ্ঞানেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি কেহ বলেন—শব্দ শ্রবণ (শ্রুতি) হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে; তাহা দ্বারাই অজ্ঞাননিবর্ত্তক ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। আবার বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন কি?

এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

“অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥ বি, পু, ৬।৫।৬২॥”

**টীকা।** নিবিড়ং তম ইব অজ্ঞানং ব্যাপকমাবরণম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জ্ঞাতং জ্ঞানং দীপবৎ অসম্ভাবনাদ্যভিভূতং ন সর্ব্বাত্মনাজ্ঞাননিবর্ত্তকং বিবেকজন্তু জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্ব্বাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ।

**মর্ম্মানুবাদ।** “অজ্ঞান হইতেছে অন্ধতমের—অতি গাঢ় অন্ধকারের—তুল্য; আর ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভূত জ্ঞান দীপের তুল্য। বিবেকজ জ্ঞান হইতেছে সূর্য্যতুল্য।” টীকা। অজ্ঞান হইতেছে নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় ব্যাপক আবরণস্বরূপ; শ্রুতি-আদি হইতে ইন্দ্রিয়যোগে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দীপের ন্যায়, অসম্ভাবনাদিদ্বারা অভিভূত; ইহা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান-নিবর্ত্তক নহে। বিবেকজ জ্ঞান কিন্তু সূর্য্যতুল্য বলিয়া সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক।” এজন্য বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন।

“উক্তলক্ষণজ্ঞানদ্বৈধে মনুসম্মতিমাহ—

মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা চ মুনিসত্তম।
যদেতৎ শ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম॥ বি, পু, ৬।৫।৬৩॥”

অত্র সম্বন্ধেঽস্মিন্ প্রসঙ্গে—

“দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মাণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ বি, পু, ৬।৫।৬৪॥”

**টীকা।** শব্দব্রহ্মণি শ্রবণেন নিষ্ণাতো বিবেকজজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋর্গ্বেদাদিময়াপরা ॥ বি, পু, ৬।৫।৬৫ ॥"

**টীকা।** বিদ্যাশব্দেন তদ্ধেতুকর্ম্মব্রহ্মবিষয়ৌ বেদভাগৌ গৃহ্যেতে, তদাহ পরয়েতি। ব্রহ্মভাগোঽক্ষর-প্রতিপাদক-পরাখ্যবেদভাগাদিনা কর্ম্মভাগ-ঋগ্বেদাদিশব্দেনোচ্যতে। "ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবৎ" সা ত্বপরা সাধনগোচরত্বাৎ। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ( মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ১।১।৫ ॥) যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্ ( মণ্ডুক ॥ ১।১।৬ ॥)" ইত্যাদ্যথর্ব্বশ্রুত্যুক্তম্ পরবিষয়মক্ষরাখ্যং পরং তত্ত্বমাহ ত্রিভিঃ।

**মর্ম্মানুবাদ।** "জ্ঞান যে দুই রকম, তাহা মনুরও সম্মত। হে মুনিসত্তম! বেদার্থ স্মরণ করিয়া এ-সম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, শুন। মনু বলেন—শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম এই উভয় ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।" টীকা। "বেদাদি-শ্রবণ দ্বারা শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি বিবেকজজ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু জ্ঞান ও কর্ম্ম, তাহাই এস্থলে বলা হইল। এই বিষয়ে শ্রুতিরও সম্মতি আছে। যথা ( মূল গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণে )—আথর্ব্বণী শ্রুতি বলেন, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা এই দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। পরা বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অপরা ঋগ্বেদাদিময়ী।" টীকা। "এস্থলে বিদ্যাশব্দে বিদ্যার হেতুরূপে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই উভয়কেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মকাণ্ড হইতেছে অক্ষর-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক; আর কর্ম্মকাণ্ড—ঋগ্বেদাদিশাস্ত্র। 'ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক'* ন্যায়-অনুসারে সেই অপরা বিদ্যাও সাধনলভ্যা। অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত মুণ্ডক-শ্রুতি বলেন—"যদ্দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।" "যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য" ইত্যাদি বাক্য অক্ষর-নামক পরতত্ত্ব বিষয়ক। তিনটী শ্লোকে এই পরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।" সেই তিনটী শ্লোক এই।

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥—বি. পু. ৬।৫।৬৬-৬৮ ॥"

**টীকা।** বিভুং প্রভুং, সর্ব্বগতং অপরিচ্ছিন্নং, ব্যাপি সর্ব্বকার্য্যানুগতং, স্বয়ং তু অন্যেন অব্যাপ্যম্।

---

* ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায়। এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই। "ব্রাহ্মণগণ ভোজন করুন"—এই কথা বলিলে যাঁহারা পরিব্রাজক নহেন, এরূপ ব্রাহ্মণগণকেই বুঝায়। পরিব্রাজকগণ ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদিগকে বুঝায় না। পরিব্রাজক-শব্দেই পরিব্রাজকগণকে বুঝায়।

যতঃ সর্ব্বং ভবতি তৎ পরং ব্রহ্মৈব স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যং পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদি-পরবিদ্যোপাসনয়া ভক্তৈঃ সুলভদর্শনমিত্যাহ—

"তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৬৯॥"

**মর্ম্মানুবাদ**। যাঁহা অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ এবং পাণি-পাদাদিসংযুক্ত নহেন, যিনি বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপী, অব্যাপ্য এবং যাঁহা হইতে সমস্তের উদ্ভব হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের ধ্যেয়; তিনিই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষ্ণুর পরম পদ।"

**টীকা**। "বিভু-শব্দের অর্থ—প্রভু। সর্ব্বগত—অপরিচ্ছিন্ন। ব্যাপি—সর্ব্বকার্য্যানুগত; স্বয়ং কিন্তু অন্য দ্বারা অবাপ্য। যাঁহা হইতে সমস্ত বস্তুরই উদ্ভব হয়, সেই পরব্রহ্মই স্বকীয়-ইচ্ছায় ষাড়্গুণ্য ( ষড়ৈশ্বর্য্য ) আবিষ্কার করিয়া পরমেশ্বরাখ্য ভগবৎ-শব্দবাচ্য হয়েন এবং দ্বাদশাক্ষরাদি-পরাবিদ্যার উপাসনাদ্বারা ভক্তগণের সুলভ-দর্শন হয়েন। এজন্যই বলা হইয়াছে—যথা ( মূল গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণে ) পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শব্দ সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক।"

"ঈদৃগ্‌বিষয়ঞ্চ জ্ঞানং পরাবিদ্যা ইত্যাহ—
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যৎত্রয়ীময়ম্ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭০॥"

**টীকা**। নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাক্ষরাদিভিরুক্তার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্ত্বং স্বরূপং তত্ত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরা বিদ্যা ত্রয়ীময়ং তু অন্যৎ অপরা অবিদ্যা কর্ম্মাখ্যা।

**মর্ম্মানুবাদ**। "ঈদৃগ্‌বিষয়ক জ্ঞানই পরা বিদ্যা। এজন্য বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—যদ্দারা এইরূপে ( পূর্ব্বোক্তরূপে ) নিরূপিত তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপ জানা যায়, তাহাই পরম জ্ঞান এবং তাহা বেদময়।"

**টীকা**। "নিগদিতার্থ—দ্বাদশাক্ষরাদিদ্বারা কথিত ঈশ্বরের স্বরূপ, তত্ত্বতঃ—যথাযথ ব্রহ্মরূপে, অপ্রচ্যুত-ব্রহ্মস্বরূপে, যথাযথ-ব্রহ্মরূপে—যে দ্বাদশাক্ষরাদি-মন্ত্রদ্বারা জানা যায়, তাহাই পরম-জ্ঞান, পরা বিদ্যা এবং তাহা বেদময়। এতদ্ব্যতীত অন্য জ্ঞান হইতেছে—অপরা বিদ্যা, কর্ম্মাখ্যা অবিদ্যা।" দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র যথা—ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

## ৪৪। অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা কেন

"ননু যদি ঈশ্বরো ব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্য অনির্দ্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্বম্ ইত্যাশঙ্কাহ—

"অশব্দগোচরস্যাপি তস্যৈব ব্রহ্মণো দ্বিজ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭১॥"
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণে ॥ বি. পু. ৬।৫।৭২॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবান্ ইতি সত্তম ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৬॥"

**টীকা**। অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে। তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাৎ উপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে। তদ্‌ভেদবিবক্ষায়াম্॥ ৬।৫।৭১ ॥ ইত্থম্ভূতে মুখ্য এব ভগবচ্ছব্দো বর্ত্তত ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি—শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে ॥ ৬।৫।৭২ ॥"

**মর্ম্মানুবাদ**। "যদি বলা হয়—ঈশ্বর যদি ব্রহ্মই হয়েন, তাহা হইলে সেই অনির্দ্দেশ্য বস্তু কিরূপে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ? এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্যই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—হে দ্বিজ ! অশব্দগোচর-ব্রহ্মের উপাসনায় ঔপচারিকভাবেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হে মৈত্রেয় ! বিশুদ্ধ, সর্ব্বকারণ-কারণ এবং মহাবিভূতি-স্বরূপ পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দ বর্ত্তমান। হে সত্তম ! "ভগবান্" এই মহাশব্দটী এইরূপই বটে।" টীকা। "পূজার নিমিত্ত ষড়্গুণের প্রকাশনিবন্ধন ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়। ব্রহ্মের গুণসমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া ভেদভাব প্রকাশের জন্য ঔপচারিকভাবেই ভগ-শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। পরবর্ত্তী "শুদ্ধে ইত্যাদি ৬।৫।৭২"-শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। এস্থলে শুদ্ধ অর্থ—অসঙ্গ। মহাবিভূত্যাখ্যে অর্থ—অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যযুক্তে।"

ব্রহ্মকে ঔপচারিক ভাবে কেন ভগবান্ বলা হয়, শ্রীধরগোস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাৎ—ব্রহ্মের গুণসমূহ হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, স্বরূপ হইতে অভিন্ন।" অথচ উপাসনাকালে স্তবাদিতে ব্রহ্ম হইতে যেন একটু পৃথগ্‌ভাবেই গুণাদির উল্লেখ করা হয়—ব্রহ্মের মহিমা করুণা ইত্যাদি রূপে। শ্রুতিতেও এইরূপ দৃষ্ট হয়—ব্রহ্ম কোথায় অবস্থান করেন ?—স্বে মহিম্নি—নিজের মহিমায়। এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায়—ব্রহ্ম হইতে তাঁহার মহিমা যেন পৃথক্ বস্তু। কোনও লোক তাহার স্ব-গৃহে বাস করে বলিলে যেমন বুঝা যায়—লোকটী এক বস্তু, তাহার গৃহ আর একটী বস্তু, তদ্রূপ। ব্রহ্মের "ভগ" কিন্তু ব্রহ্ম হইতে একটী পৃথক্ বস্তু নহে, ইহা ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। তথাপি, উপাসনাকালে তাঁহার ভগকে—গুণাদিকে—পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ করা হয় বলিয়াই উপচারবশতঃ ভগ-শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া তাঁহাকে "ভগবান্" বলা হয়। দুইটী পৃথক্ বস্তু বুঝাইতে হইলেই মতুপ্-প্রত্যয় হয়। যেমন ধনবান্—ধন-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। ধনবান্ শব্দের অর্থ—ধন আছে যাহার। ধন এক বস্তু, ধনবান্ আর একটী পৃথক্ বস্তু। সেইরূপ, ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্যও হইতেছে—ভগ (ঐশ্বর্য্য) আছে যাঁহার। ভগবান্ একটী বস্তু, ভগ হইল যেন আর একটী বস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এইরূপ মনে করা সঙ্গত হয় না; যেহেতু, ধনবান্ এবং ধনের ন্যায়—ব্রহ্ম এবং তাঁহার ভগ ( ঐশ্বর্য্য ) পৃথক্ বস্তু নহে। ভগ হইতেছে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তত্ত্বের বিচারে ব্রহ্ম হইতেছেন—ভগাত্মক, ভগবান্ নহেন। তিনি গুণাত্মক—গুণী বা গুণবান্ নহেন। তথাপি যে তাঁহাকে ভগবান্ বা গুণবান্ বা ঐশ্বর্য্যবান্ বলা হয়, ইহাই উপচার। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মস্তবেও দেখা যায়—"গুণাত্মনস্তে গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ॥১০।১৪।৭॥—গুণাত্মা তোমার গুণসমূহের সংখ্যা কে-ইবা নির্ণয় করিতে পারে ?" এস্থলে ব্রহ্মকে "গুণাত্মা" অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, তাহাই বলা হইয়াছে; অথচ আবার "তোমার গুণসমূহও" বলা হইয়াছে, গুণসমূহ যেন তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু, এইরূপ ভাবেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাই উপচার; ইহা ভাষার একটী ভঙ্গী। ব্রহ্মের

গুণাদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও এইরূপ উপচারের বা ভাষা-ভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে গুণাদির স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। তাই ইহার প্রয়োজনও আছে। এইরূপই শ্রীধরস্বামীর টীকায় "উপচার"-শব্দের তাৎপর্য্য।

"ব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্য নাই, তথাপি উপাসনার সুবিধার জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয় বলিয়া তাঁহার ভগবত্তা হইতেছে ঔপচারিক, বাস্তব নহে"—ইহা স্বামিপাদের অভিপ্রায় নহে। "ব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্য আছে, সেই ভগ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত ; সুতরাং তিনি বস্তুতঃ 'ভগাত্মক'—'ভগবান্' নহেন ( ভগবান্ বলিলে ব্রহ্মের ভগকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা হয়, এজন্য বস্তুতঃ তিনি ভগবান্ নহেন ), তথাপি উপাসনা-কালে যে তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়,"—ইহাই উপচার। "তদ্ ভেদবিবক্ষায়াম্। মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে।"-বাক্যে শ্রীধরস্বামী তাহাই বলিয়াছেন। স্বামিপাদের এই উক্তি যে যুক্তিসঙ্গত, তাহার সমর্থনে তিনি পরবর্ত্তী "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই শ্লোকে "শুদ্ধ"-শব্দের অর্থ—অসঙ্গ। কোনও বস্তুর সহিত তাহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুর যোগ না থাকিলেই তাহাকে "শুদ্ধ" বলা হয়। ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই ; এজন্য ব্রহ্মকে শুদ্ধ বলা হইয়াছে। "অসঙ্গ"-শব্দে শ্রীধরস্বামী একথাই বলিয়াছেন। "সঙ্গ" বলিলেই অন্ততঃ দুইটী পৃথক্ বস্তু ধ্বনিত হয় ; তাহাদের পরস্পর মিলনই "সঙ্গ"। ব্রহ্ম শুদ্ধ—অর্থাৎ অসঙ্গ, ব্রহ্মে ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর মিশ্রণ নাই। তাঁহার গুণাদি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে ব্রহ্ম "গুণাত্মক" বা "ভগাত্মক" হইলেও তাঁহাকে যে "গুণবান্" বা "ভগবান্" বলা হয়, ইহাই উপচার। "মহাবিভূত্যাখ্যে"-শব্দের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে। মহাবিভূতি ( অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যই ) তাঁহার "আখ্যা"-স্বরূপ। তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। তথাপি যে তাঁহাকে অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যবান্ বলা হয়, ইহা কেবল উপচারমাত্র।

স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন—ইত্থম্ভূতে মুখ্য এব ভগবচ্ছব্দো বর্ত্ততে—অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যাত্মক শুদ্ধ ব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ।

## ৪৫। পরব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ

এই সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"পরস্যাপি ব্রহ্মণস্তস্যৈব ভগবচ্ছব্দঃ ন অন্যস্য। অন্যস্য তু পূজায়াং পূজ্যত্বং প্রতিপাদনে নিমিত্তে ঔপচারিক এব ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি। শুদ্ধ এব সতি মহাবিভূতিঃ আখ্যা খ্যাতিঃ যস্য তস্মিন্। বক্ষ্যতে হি-'এবমেব মহাশব্দঃ'—ইত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন অন্যত্র এষ চাত্র তা ইত্যন্তেন।"—পরব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, অপরে নহে ; অপরে যখন ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন সেই অপরের পূজ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই ঔপচারিক ভাবে তাহা প্রযুক্ত হয়। "শুদ্ধে"—ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। কোন্ ব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ ? যিনি "শুদ্ধ" এবং যাঁহার আখ্যা বা খ্যাতি হইতেছে "মহাবিভূতি", তাঁহাতেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ। বিষ্ণুপুরাণের "এবমেষ মহাশব্দঃ ॥ ৬।৫।৭৬ ॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥৬।৫।৭৭॥" পর্য্যন্ত—শ্লোকে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। ( এই শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা পরে করা হইবে )।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ—সম্ভর্ত্তেত্যা-দিনা"—অক্ষরার্থ-নিরুক্তিদ্বারা ( অর্থাৎ ভগ-শব্দের ভ এবং গ-এই অক্ষরদ্বয়ের অর্থদ্বারা ) ভগবৎ-শব্দ যে পরমেশ্বরত্ব-বাচক, তাহা বিষ্ণুপুরাণের "সম্ভর্ত্তেতি"-শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্লোকটী এই ঃ—

"সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভ-কারার্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গ-করার্থস্তথা মুনে॥ বি. পু. ৬৷৫৷৭৩॥"

**টীকা**। সম্ভর্ত্তা—পোষকঃ, ভর্ত্তা আধারঃ ইত্যর্থদ্বয়েনান্বিতঃ। নেতা কর্ম্ম-জ্ঞান-ফলপ্রাপকঃ। নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গ-কারার্থঃ। গময়িতা প্রলয়ে কার্য্যাণাং কারণং প্রতি, স্রষ্টা পুনরপি তেষাম্ উদ্‌গময়িতা সর্গকর্ত্তেতি বা গ-কারার্থ ইতি।

**মর্ম্মানুবাদ**। "ভ-কারের দুইটী অর্থ—সম্ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তা। গ-কারের তিনটী অর্থ—নেতা, গময়িতা এবং স্রষ্টা।" টীকা। "সম্ভর্ত্তা-শব্দের অর্থ—পোষক ; ভর্ত্তা-শব্দের অর্থ—আধার। নেতা-শব্দের অর্থ—কর্ম্মজ্ঞান-ফলপ্রাপক। নেতৃত্ব-শব্দের অর্থ—প্রযোজ্যগমনগর্ভ, প্রযোজ্যের পরিচালন-শক্তিত্ব। গময়িতা—প্রলয়ে কার্য্যসমূহের কারণের অভিমুখে পরিচালক। স্রষ্টা—পুনরায় তাহাদের উদ্‌গময়িতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা ; ইহাই গ-কারের অর্থ।"

এই নিরুক্তি হইতে জানা গেল—ভগাত্মক ( ভগবান্ ) ব্রহ্ম হইতেছেন পোষণকর্ত্তা এবং আধার, সমস্তের আধার বা আশ্রয়। আর, তিনি কর্ম্মজ্ঞানের ফলদাতা। যাহাকে কোনও কার্য্যে প্রয়োজিত করা হয়, তাহাকে যেই কার্য্যে প্রয়োজিত করার শক্তি তাঁহার আছে। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থিত বস্তু-নিচয়কে তিনি কারণের ( যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ) দিকে পরিচালন করেন এবং যথাসময়ে ( মহাপ্রলয়ের অবসানে ) সৃষ্টিকালে তিনি আবার ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি করেন। এই অর্থদ্বারা ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের কথাই জানা গেল।

ইহার পরে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"ইদানীমক্ষরদ্বয়াত্মকস্য পদস্যার্থমাহ—এক্ষণে বিষ্ণুপুরাণে ভ এবং গ এই দুইটী অক্ষরযুক্ত ভগ-শব্দের অর্থ বলা হইতেছে।" তাহা এই—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ বি. পু. ৬৷৫৷৭৪॥"

ইঙ্গনা ঈরণং সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অত্র তৈর্ব্যাখ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্য্যস্য বীর্য্যস্য মণিমন্ত্রাদীনামিব প্রভাবস্য যশসঃ বিখ্যাতসদ্‌গুণত্বস্য, শ্রিয়ঃ সর্ব্বপ্রকার-সম্পত্তেঃ, জ্ঞানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বস্য, বৈরাগ্যস্য যাবৎ-প্রাপঞ্চিক-বস্তুনাসঙ্গস্য চ। সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রান্বিতমিতি।

**মর্ম্মানুবাদ**। "সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—ইহাদের সমষ্টির নামই ভগ।" টীকা। "ইঙ্গনা-শব্দের অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা। স্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপ—ঐশ্বর্য্যের এবং বীর্য্যের—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাবের ; যশের—বিখ্যাত সদ্‌গুণত্বের ; শ্রীর—সর্ব্বপ্রকার

সম্পত্তির ; জ্ঞানের সর্ব্বজ্ঞত্বের ; বৈরাগ্যের—নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তুসম্বন্ধে অনাসক্তির। উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী পদের প্রত্যেকের সহিতই শ্লোকস্থ 'সমগ্র'-শব্দের অন্বয় করিতে হইবে।"

ইহা হইতে জানা গেল—ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী বস্তুর প্রত্যেকটীই সমগ্ররূপে—পূর্ণতম অখণ্ডরূপে—ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই ছয়টী বস্তুর সমবেত নামই যখন ভগ, এবং এই ভগ যখন ব্রহ্মে পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান, তখন ব্রহ্মই যে ভগবৎ-শব্দের মুখ্য বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আরও জানা গেল—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের এবং বীর্য্যের প্রভাবও মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবের ন্যায় অচিন্ত্য। এ জন্যই পূর্ব্বোল্লিখিত ৬।৫।৭২-শ্লোকস্থিত "মহাবিভূত্যাখ্যে" শব্দের অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে।"

যাহা হউক, "ভগবান্"-শব্দের অন্তর্গত "ভগ"-শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অক্ষর "ব" এর অর্থ প্রকাশ করিতেছেন।

"বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু ব-কারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৫॥"

তত্রাধিষ্ঠানভূতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেষু বসতীতি ব-কারার্থঃ।

**মর্ম্মানুবাদ**। "ভূতাত্মরূপ, অখিলাত্মরূপ সেই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মে সমস্ত ভূত, অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ, অবস্থান করে, এবং তিনিও সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন—ইহাই ব-কারের অর্থ। সুতরাং এই ব-কারার্থ—অব্যয়।"

ইহার পরেই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৬ ॥"

এবমেষ মহাশব্দো বাসুদেবস্য বাচকঃ, ন তু অন্যস্য ইত্যর্থঃ। অক্ষরনিরুক্তিপক্ষে ভশ্চ গশ্চ বশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ ততশ্চ ভগবা ইতি নামরূপাবিচ্ছন্নে যস্য স ভগবান্ পৃষোদরাদিত্বাদ্ ব-লোপঃ।

**মর্ম্মানুবাদ**। "হে সত্তম! 'ভগবান্'-এই মহাশব্দটী পরমব্রহ্মভূত বাসুদেবেরই বাচক ; এই শব্দটী অন্যের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে না।" টীকার তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বে নিরুক্তিবলে 'ভ', 'গ' এবং 'ব' এই অক্ষরত্রয়ের যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই অর্থযুক্ত তিনটী অক্ষর দ্বন্দ্ব-সমাসে মিলিত হইয়া "ভগবা" হইয়াছে। 'ভশ্চ গশ্চ বশ্চ ইতি ভগবা।' এই 'ভগবা' যাঁহার নামরূপ, তিনিই 'ভগববান্।' ব্যাকরণের 'পৃষোদরাদিত্বাৎ'-এই বিধানমতে ব-কার লুপ্ত হইয়া "ভগবান্" পদ সাধিত হইয়াছে।" ( ভগববান্—ভগবান্ )।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্র তু একদেশেঽপি অর্থশক্তিম্ অপি অক্ষরসাম্যাৎ নির্ব্রূয়াৎ ইতি নিরুক্তাৎ।—অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের একদেশেও অর্থশক্তি নির্দ্ধারণ করিতে হয়—এইরূপ নিরুক্তি আছে।"

ইহার পরে লিখিয়াছেন—"তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোঽয়ং শব্দঃ। অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ—

"তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষা-সমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥ বি. পু ঃ ৬।৫।৭৭॥"

পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠপদার্থস্য উক্তৌ যা পরিভাষা, সংকেতরূপগ্রহঃ, যদা তৎসমন্বিতোহয়ং শব্দঃ, তদা ভগবতি নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে—অন্যত্র দেবাদৌ উপচারেণ প্রবর্ত্ততে। উপাচারে বীজমাহ—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ বি. পু ঃ ৬।৫।৭৮॥"

**মর্ম্মানুবাদ।** এইরূপে নিরতিশয়-ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরেই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যত্র গৌণ প্রয়োগ হয়। বিষ্ণুপুরাণ তাহাই বলিয়াছেন। যথা—পূজ্য-পদার্থের পরিভাষাস্বরূপ এই (ভগবান্) শব্দটী তাঁহাতে (তত্র—বাসুদেবে) উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় না, মুখ্যরূপেই ব্যবহৃত হয়। অন্যত্র ইহার প্রয়োগ ঔপচারিক।" টীকার তাৎপর্য্য এই। "পূজ্য বা শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরিভাষারূপে—সংকেতরূপে—যখন ভগবান্-শব্দটী ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা ঔপচারিক নহে। কিন্তু অন্যত্র—যেমন দেবতাদিতে—ইহা ঔপচারিক বা গৌণভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগের হেতুর কথাও বলা হইয়াছে। তাহা এই। যিনি ভূতসমূহের, অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থসমূহের, উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিদ্যা এবং অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি 'ভগবান্'-এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।"

উল্লিখিতরূপে পরব্রহ্মেরই মুখ্য ভগবৎ-শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত করিয়া বিষ্ণুপুরাণ প্রকারান্তরেও ভগবৎ-শব্দবাচ্য ষাড়্গুণ্যের কথা বলিয়াছেন—"ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়্গুণ্যং প্রকারান্তরেণাহ"—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হৈয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯ ॥"

**টীকা।** "হেয়ৈঃ প্রকৃতিগুণৈঃ তৎকার্য্যৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি।" অত্র জ্ঞানমন্তঃকরণজং বলম্, শক্তিরিন্দ্রিয়জং বলম্, শরীরজং তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্।

**মর্ম্মানুবাদ।** "হেয়গুণ-বিবর্জিত সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শক্তি, সমগ্র বল, সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র তেজ—এই ছয়টীই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। টীকার মর্ম্ম—হেয়গুণ—প্রকৃতিজাত গুণ, আদিশব্দে প্রকৃতির (মায়ার) কার্য্য, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সমূহকে বুঝায়; এই সমস্ত পরব্রহ্মে নাই। এস্থলে জ্ঞান-শব্দের অর্থ—অন্তঃকরণের বল; শক্তি—ইন্দ্রিয়জ বল; তেজঃ—শরীরজ তেজঃ, কান্তি; অশেষ-শব্দের অর্থ—সমগ্ররূপে।"

ইহা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মে প্রকৃতির (অর্থাৎ মায়ার) সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ নাই, এই সমস্ত গুণের কার্য্য—মায়িক কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদিও তাঁহাতে নাই। তাঁহাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, তৎসমস্তই মায়াতীত - তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিজাত, সুতরাং সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়। পরব্রহ্মের অন্তঃকরণের বল, ইন্দ্রিয়ের বল, তাঁহার শারীরিক তেজঃ বা কান্তি—সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তাঁহার জ্ঞান-শক্তি-আদি সমস্তই পরিপূর্ণ, অসীম। পরব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণাদি অভিন্ন বলিয়াই তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য-বলাদিকেও "ভগবান্" বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-স্বরূপভূত-গুণাদিসমন্বিত পরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দবাচ্য।

## ৪৬। পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণের সারমর্ম্ম

উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—আত্যন্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্তিই হইতেছে ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। সেই ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধনের প্রয়োজন। সাধনে চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান দুই রকমের—আগমোত্থ এবং বিবেকোত্থ। শাস্ত্রজ্ঞানই আগমোত্থ জ্ঞান এবং পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হইতেছে বিবেকোত্থ জ্ঞান। শ্রুতিপ্রোক্ত পরাবিদ্যাই বিবেকজ-জ্ঞান এবং অপরা বিদ্যাই আগমোত্থ জ্ঞান। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য উভয় প্রকার জ্ঞানেরই প্রয়োজন। অপরা বিদ্যা বা শাস্ত্রজ্ঞানের পরেই পরাবিদ্যা লাভ হইতে পারে। এ স্থলে যে ভগবানের প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। ইহার হেতু এই।

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, ( সম্পত্তি ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণকে "ভগ" বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটী গুণই পরব্রহ্মে পূর্ণতমরূপে বর্ত্তমান। অন্তঃকরণের বল, ইন্দ্রিয়জ বল, শারীরিক তেজঃ-আদিও তাঁহাতে পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান। অন্যত্র এইরূপ গুণাদির পূর্ণতম অভিব্যক্তির একান্ত অভাব। তাই ভগবৎ-শব্দের মুখ্য এবং একমাত্র বাচ্যই হইতেছেন পরব্রহ্ম। তাঁহার এই সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত, চিন্ময়। মায়িক গুণের এবং মায়া-সম্পর্কিত সর্ব্ববিধ বস্তুরই তাঁহাতে ঐকান্তিক অভাব ; তিনি এবং তাঁহার গুণাদি মায়াতীত, অপ্রাকৃত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

## ৪৭। ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ

শ্রুতিতেও পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

**মুণ্ডকশ্রুতি** বলেন—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥ ১।১।৯॥—যে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ ; অর্থাৎ যিনি সামান্যতঃ সমস্তই জানেন ( সর্ব্বজ্ঞ ) এবং যিনি বিশেষরূপেও সমস্তের পরিজ্ঞাতা ( সর্ব্ববিৎ )।"

সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববিত্ত্বাদি হইতেছে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য মহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে ॥ মুণ্ডক ॥৩।২।৭॥—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ; মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে এবং মায়াতীত দিব্যধামে যাঁহার মহিমা দীপ্যমান।"

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক।

**কৈবল্যোপনিষৎ** বলেন—"অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্। পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥ ১।২০॥—আমি ( ব্রহ্ম ) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আবার মহৎ হইতেও মহৎ ; এই বিচিত্র বিশ্বও আমি। আমি পুরাতন পুরুষ ( পরিপূর্ণ ), আমি ঈশ্বর ( সর্ব্বনিয়ন্তা ), আমি হিরণ্ময় ( জ্ঞানময় ), আমি শিবরূপ ( মঙ্গলস্বরূপ )।"

এ স্থলেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যের কথা পাওয়া যায়।

"অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ। কৈবল্যশ্রুতি ॥ ১।২১॥— আমি হস্তপদবিহীন ; আমার অচিন্ত্য-শক্তি ; চক্ষুর্ব্বিহীন হইয়াও আমি সমস্ত দর্শন করি, কর্ণহীন হইয়াও সমস্ত শ্রবণ করি।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যের কথা জানা যায়।

**বৃহদারণ্যক**-শ্রুতিতে ব্রহ্মের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বের কথা দৃষ্ট হয়।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা তিষ্ঠন্তি। ইত্যাদি ॥ ৩৮।৯॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী, কাল এবং কালের বিভিন্ন অংশাদি, নদ-নদী পর্ব্বতাদি সমস্তই ব্রহ্মের প্রশাসনে—ব্রহ্মেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদ্যমান। এই নিয়ন্তৃত্বই তাঁহার ঐশ্বর্য্য।

**ছান্দোগ্য**-উপনিষৎ বলেন—"স এষ যে চ এতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে মনুষ্যকামানাং চ ॥ ১।৭।৬॥—অধোভাগে যে সকল লোক ( পৃথিব্যাদি ), ইনি ( অক্ষি-মধ্যস্থ পুরুষ ) তাহাদের ঈশ্বর এবং মানুষের যে সকল ইচ্ছা, ইনি তাহাদেরও ঈশ্বর ( ইনি মনুষ্যদিগেরও অভীষ্টদাতা )।"

"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ১।১।২০॥"—এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে অক্ষি-মধ্যস্থ পুরুষও ব্রহ্মই। সুতরাং উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের কথাই বলা হইয়াছে।

**মাণ্ডুক্য**-শ্রুতি বলেন—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬॥—এই ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি ( সমস্তের কারণ ); ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিলয়ের স্থান।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের কথাই বলা হইয়াছে।

**শ্বেতাশ্বতর**-শ্রুতি বলেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তদ্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬।৭॥

—তিনি ঈশ্বরগণের পরম-মহেশ্বর, দেবতাগণের পরমদেবতা ; তিনি কারণ এবং কারণসমূহের অধিপতিরও অধিপতি ; তাঁহাকে জন্মায় এমন কেহ নাই ; তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই।"

**ঋগ্বেদেও** ব্রহ্মের মহিমার কথা দৃষ্ট হয়—

"এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥১০।৯॥

—এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা ( ঐশ্বর্য্য ) তৎপরিমিত ( ব্রহ্মের সমান ); এই পুরুষ ইহা হইতেও বৃহত্তর। সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ঐ ব্রহ্মের একটী পাদ। ইঁহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় অপ্রাকৃত লোকে বিরাজিত।"

এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের **চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্যের** কথা জানা যায়।

উল্লিখিত ঋগ্বেদ-বাক্যের একটু আলোচনা করা হইতেছে।

"এতাবান্ অস্য মহিমা"—ব্রহ্মের যে পরিমাণ, তাঁহার মহিমার বা ঐশ্বর্য্যেরও সেই পরিমাণ। ব্রহ্ম

অপরিমিত—অনন্ত ; সুতরাং তাঁহার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যও অনন্ত। ইহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য অনন্ত, সীমাবদ্ধ নহে।

"অতঃ জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ"—পুরুষ ইহা হইতেও বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠ। কাহা হইতে বৃহত্তর বা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতে হইলে আর একটী শ্রুতিবাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

মাণ্ডুক্য-শ্রুতি বলেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥১॥—এই জগৎ "ওম্"-এই অক্ষরাত্মক ( অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক )। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্তই ওঙ্কারাত্মক ( ব্রহ্মাত্মক ) এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা আছে, তাহাও ওঙ্কারই—ব্রহ্মই।"

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ"-আদি চতুর্দ্দশভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই ত্রিকালের অধীন—ইহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, পরিবর্ত্তন আছে ; তথাপি এই কালের প্রভাবাধীন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও ব্রহ্মাত্মক ; যেহেতু, ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ। "যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব"—এই উক্তি হইতে জানা যায়—ত্রিকালের অধীন নহে—সুতরাং যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বিকৃতি নাই—এইরূপ বস্তুও আছে। কালাধীন ব্রহ্মাণ্ড একটী লোক ; তাহার সঙ্গে উল্লিখিত কালাতীত বস্তুটীও হইবে একটী লোক ; কালাতীত বলিয়া তাহা নিত্য এবং তাহা হইবে নিত্যলোক বা দিব্য লোক। তাহাও ব্রহ্মাত্মক। এই দিব্যলোকও যখন ব্রহ্মাত্মক, তখন ব্রহ্ম যে এই ব্রহ্মাণ্ড-লোক হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তর, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং "অতঃ জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড-লোক বা বিশ্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ।

"পাদোঽস্য বিশ্ব-ভূতানি"—সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ( কালাধীন ব্রহ্মাণ্ড ) ঐ ব্রহ্মের একটী পাদ ( এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার এক পাদ বিভূতি )।

"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইঁহার ( ব্রহ্মের ) অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় দিব্যলোকে বিরাজিত ( কালাতীত বা মায়াতীত নিত্য দিব্যলোকে তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি বিরাজিত )। এ-স্থলে "দিবি"-শব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত দিব্যলোককেই বুঝাইতেছে ; স্বর্গলোককে বুঝাইতেছে না ; যেহেতু, স্বর্গলোক ত্রিকালাধীন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। "বিশ্বভূতানি"-শব্দে যে কালাধীন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝাইতেছে, "দিবি"-শব্দে তদতিরিক্ত একটী বস্তুকে বুঝাইতেছে—যাহা কালাধীন নহে। তাহাই দিব্যলোক।

এইরূপে উল্লিখিত ঋগ্‌বেদবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের এক পাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত ; আর তিন পাদ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ত্রিকালাতীত—সুতরাং মায়াতীত অপ্রাকৃত—দিব্যলোকে। লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের বাক্যটী এই—

"ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥৫।২৮৬॥

—ত্রিপাদ্‌বিভূতির ( ঐশ্বর্য্যের ) আশ্রয় বলিয়া সেই মায়াতীত লোক ত্রিপাদ্‌ভূত। সমস্ত মায়িকী বিভূতিকে ( মায়িক ঐশ্বর্য্যকে ) একপাদ বলে।”

ইহা হইতে জানা গেল—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের একপাদ ঐশ্বর্য্য অভিব্যক্ত এবং মায়াতীত লোকে তাঁহার ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য বিরাজিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও একথাই বলিয়াছেন—

“গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতি ধাম—‘ত্রিপাদৈশ্বর্য্য’ নাম।
মায়িক বিভূতি—‘এক পাদ’ অভিধান ॥২।২১।৪০–৪১॥”

এস্থলে “মায়িক বিভূতি”-শব্দে “বহিরঙ্গা মায়া শক্তি হইতে জাত ঐশ্বর্য্যকে” বুঝাইতেছে না। কারণ, ব্রহ্মের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই যে তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত, পরবর্ত্তী ১।১।৪৮-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এ-স্থলে “মায়িক বিভূতি”-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির যে অংশ বহিরঙ্গা জড় মায়াকে শক্তিসম্পন্না করিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে, মায়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া চিচ্ছক্তির সেই অংশকেই “মায়িক বিভূতি বা মায়িক ঐশ্বর্য্য” বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋগ্‌বেদবাক্যের অনুরূপ একটী উক্তি ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট হয়।

“তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩।১২।৬॥”

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়।

## ৪৮। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য চিন্ময়

ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব। স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী বলিয়া এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূতা বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যও চিন্ময় এবং স্বরূপভূত। এই ঐশ্বর্য্য আগন্তুক বা আরোপিত নহে।

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য যে চিৎস্বরূপ, ১।৩।৪০-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যধৃত চতুর্ব্বেদ-শিখা-শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৭৪ পৃষ্ঠায় ) এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“শ্রুত্যন্তরেঽপি যস্য চিৎস্বরূপমৈশ্বর্য্যমিত্যভিধীয়তে। চতুর্ব্বেদশিখায়াঞ্চ—‘বিষ্ণুরেব জ্যোতিঃ বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ’ ( মাধ্বভাষ্য-১।৩।৪০-ব্রহ্মসূত্রম্ ) ইত্যাদি।—অপর শ্রুতিতেও ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। চতুর্ব্বেদশিখাতে আছে—বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ ইত্যাদি।”

বল হইতেছে ঐশ্বর্য্য। এই বলকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলাতে এবং বিষ্ণুকেই জ্যোতিঃ এবং ব্রহ্ম বলাতে বলাদি ঐশ্বর্য্যও যে ব্রহ্ম-স্বরূপভূত—সুতরাং চিন্ময়, তাহাই বলা হইয়াছে।

এ-সমস্ত কারণেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪৭॥"

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারেনা বলিয়া ব্রহ্মে কোনওরূপ মায়িক ঐশ্বর্য্যও থাকিতে পারে না।

## ৪৯। পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দ-প্রয়োগের ঔপচারিকত্ব

পূর্ববর্ত্তী ১।১৪৪-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—অনির্দ্দেশ্য এবং অশব্দগোচর পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক। "অশব্দগোচরস্যাপি তস্যৈব ব্রহ্মণো দ্বিজ। পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭১॥"-পূজার নিমিত্ত এই উপচার। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উপচার-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"সেবা। ব্যবহারঃ। উৎকোচঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥" তৃতীয় অর্থ "উৎকোচ" উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। প্রথম অর্থ "সেবা"-শব্দে "সেবার উপকরণ" বুঝায়; ইহাও উপচার-শব্দের একটী প্রচলিত অর্থ; আলোচ্য শ্লোকের অর্থে সেবার উপকরণ রূপ অর্থেরও অবকাশ নাই। একমাত্র দ্বিতীয় অর্থ—ব্যবহার—গৃহীত হইতে পারে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যায়—পূজার নিমিত্ত অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে "ভগবান্" বলার উপচার বা ব্যবহার আছে; ইহা ভাষার একটী ভঙ্গীমাত্র। এইরূপ উপচারের আবশ্যকতা কি, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশ প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগকে দুই কারণে উপচার বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অভেদে ভেদ-প্রতীতি-জনকত্ব বশতঃ উপচার। দ্বিতীয়তঃ, অনির্দ্দেশ্য বস্তুতে নির্দ্দেশ-সূচকত্ববশতঃ উপচার। এই দুইটী কারণের আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অভেদে ভেদ-প্রতীতি-জনকত্ব। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকায় এই হেতুটীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের "ভগ" বা ঐশ্বর্য্য হইতেছে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত; কিন্তু মতুপ্-প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন "ভগবান্"-শব্দে মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থে—ব্রহ্ম ও তাঁহার ভগ-এই দুইটী বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য সূচিত হয় ( ১।১।৪৪-অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের "ভগ" স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভেদ-প্রতীতিজনক "ভগবান্"-শব্দে তাঁহাকে অভিহিত করায় "ভগবান্"-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে উপচার।

দ্বিতীয়তঃ, অনির্দ্দেশ্য বস্তুতে নির্দ্দেশ-সূচকত্ব। ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্ব্ববিষয়ে অসীম তত্ত্ব। কোনও শব্দের দ্বারাই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে পরিচিত করা যায় না। এজন্য তাঁহাকে "অশব্দ-গোচর" বলা হয়। "অনির্দ্দেশ্য"-শব্দের তাৎপর্য্যও তাহাই। কোনও শব্দের দ্বারাই তাঁহার সামান্য আভাসও দেওয়া যায় না, আংশিক বা অসম্যক্ ভাবেও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না—ইহাই "অশব্দগোচর"-শব্দের তাৎপর্য্য নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনাই সম্ভব হইত না, বেদাদি-শাস্ত্রের প্রচারও অসম্ভব হইত। অথচ বেদাদি শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তুই হইতেছেন ব্রহ্ম। বেদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে,

তাহা হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপের আংশিক প্রকাশ মাত্র ; ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সর্ববিষয়ে অসীম বলিয়া ভাষাদ্বারা, শব্দ-দ্বারা, তাঁহার তত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয়। বর্ণনায় যাহা অপূর্ণ থাকে, "অনন্ত, অসীম"-ইত্যাদি শব্দদ্বারাই তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। "ব্রহ্ম" একটী শব্দ ; এই শব্দদ্বারা পরতত্ত্ব-বস্তুকে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দেও তাঁহার সম্যক্ পরিচয় ব্যক্ত হয় না ; যেহেতু, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—বৃহৎ। বৃহত্ত্বায় অসমান, এইরূপ একাধিক বৃহৎ বস্তু থাকিতে পারে ; এই সকল বস্তুর মধ্যে কোন্ বৃহৎ বস্তুটী ব্রহ্ম, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-শব্দের অর্থে তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে বুঝা যায় না। মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে অর্থ করিলে বুঝা যায়—বৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বৃহত্ত্বায় অসমান কতকগুলি বৃহৎ বস্তুর মধ্যে সর্ববৃহত্তম বস্তুই ব্রহ্ম—ইহা মনে করিলেও পরতত্ত্ব-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইবে না ; কেন না সেই বৃহৎ বস্তুগুলির সমস্তই সসীম হইতে পারে। তথাপি "ব্রহ্ম"-শব্দদ্বারাই সেই পরতত্ত্ব বস্তুকে পরিচিত করার চেষ্টা করা হয়। এই ব্রহ্ম-শব্দটীর একটা ব্যঞ্জনা এই যে, ইহার বৃহত্ত্বার সীমা নাই, ইহা অসীম ; তাহাতেই ব্রহ্ম-শব্দে সেই অসীম-পরতত্ত্ব-বস্তুর পরিচয় দানের চেষ্টার সার্থকতা। শ্রুতিতে এই ব্রহ্মবস্তুর ধ্যানের উপদেশ আছে, শ্রবণ-মননাদির উপদেশও আছে—শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ-ইত্যাদি। কিন্তু যাহা অসীম, তাহার ধ্যান—শ্রবণ-মননাদি কি সম্ভব ? সাধকের চিত্তবৃত্তি কি অসীমে পৌঁছিতে পারে ? তাহা পারে না। তাহা হইলে শ্রুতির উপদেশ কি নিরর্থক ? তাহাও নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের পরিচয় দানের জন্য তাঁহার স্বরূপের—তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি গুণের—যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা অসম্যক্ হইলেও মিথ্যা নহে। তাহারই ধ্যান-ধারণাদি করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য। বেদান্ত-দর্শনে "জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়"—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অসম্যক্ পরিচয় ; যেহেতু, কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ই ব্রহ্মের কার্য্য নহে। "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ,'—এই ব্রহ্মসূত্রে তাঁহাকে "আনন্দময়" বলা হইয়াছে ; ইহাও ব্রহ্মের অসম্যক্ পরিচয় ; কেননা, এই আনন্দময়ত্বের স্বরূপ কি, আনন্দময়ত্বের বৈচিত্রী কি, তাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত—এ-সমস্ত কেবল এই সূত্রটী হইতেই জানা যায় না। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম-স্বরূপের সমগ্রত্ব শব্দগোচর নহে, ব্রহ্ম-স্বরূপের অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ শব্দের গোচরীভূত—ইহাই ব্রহ্মকে "অশব্দ-গোচর" বলার তাৎপর্য্য।

শব্দদ্বারা যাহা প্রকাশ করা হয়, শব্দের বৃত্তি যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেই পর্য্যন্তই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং শব্দদ্বারা যে বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়, তাহাকে যেন একটু সীমাবদ্ধ করা হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের ঔপচারিক-প্রয়োগের কথা আলোচনার সূচনায় শ্রীজীব পূর্ব্বপক্ষ তুলিয়াছেন—"ননু যদি ঈশ্বরোব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্য অনির্দ্দেশ্যস্য ভগচ্ছব্দবাচ্যত্বম্।—ঈশ্বর যদি ব্রহ্মই হয়েন, তিনি কিরূপে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ? ব্রহ্ম যে অনির্দ্দেশ্য ?" তাৎপর্য্য এই—যিনি ভগবান্, তাঁহার ভগ বা ঐশ্বর্য্য আছে। ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি ছয়টী বস্তুকেই "ভগ" বলা হয়। ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিলে মনে হয়—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি ছয়টী গুণই আছে, তদরিক্ত যেন নাই। সুতরাং ব্রহ্মকে ভগবান্ বলিলেই যেন মনে হয়—এই ছয়টী গুণের মধ্যেই অসীম ব্রহ্মবস্তুকে সীমাবদ্ধ করা হইল, এই ছয়টী গুণের দ্বারাই যেন

অসীমত্ববশতঃ অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং ব্রহ্মবস্তুকে "ভগবান্" বলা কি সঙ্গত ? ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তরেই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ। —পূজার বা উপাসনার সুবিধার জন্য ঔপচারিক ভাবেই অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে 'ভগবান্' বলা হইয়া থাকে।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অনির্দ্দেশ্য বা অশব্দগোচর বস্তুর ধ্যান-ধারণাদি উপাসনা সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যাদি গুণসমূহ সংখ্যাতেও অনন্ত, প্রত্যেক গুণের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্যও অনন্ত। ঐশ্বর্য্যাদি কয়টীমাত্র গুণের উল্লেখ করিয়া দিগ্‌দর্শনমাত্র দেওয়া হইল—উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত। কিন্তু উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মে এই কয়টী গুণের যে কল্পনা করা হইল, কিম্বা এইগুলি যে ব্রহ্মে আগন্তুক গুণ—তাহা নহে; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীধরস্বামিচরণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মের এই সমস্ত গুণ তাঁহার স্বরূপভূত, অলীক বা কাল্পনিক নহে, আগন্তুকও নহে। স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্য তাঁহার আছে; তাহাও সর্ব্ববিষয়ে অনন্ত—সুতরাং অনির্দ্দেশ্য, অশব্দগোচর, অর্থাৎ শব্দদ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রকাশের অযোগ্য। তথাপি উপসনার সুবিধার জন্য, ধ্যান-ধারণাদির সুবিধার জন্য, দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটী গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে—"ভগ"-শব্দে। ব্রহ্মকে "ভগবান্"-নামে অভিহিত করিয়া যেন নির্দ্দেশ্যরূপে পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মের ভগবৎ-শব্দবাচ্যত্বকে ঔপচারিক বলা হইয়াছে। এস্থলে সম্যক্‌পরিচয়ের পরিবর্ত্তে অসম্যক্ পরিচয় দেওয়াটাই হইতেছে উপচার। অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মবস্তুতে নির্দ্দেশ-সূচক ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে যে পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা করা হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক হইতে এইভাবেই তাহার মীমাংসা পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদের "অশব্দেতি—পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃত-ষাড়্‌গুণ্যেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে" এই উক্তির মধ্যেই উল্লিখিতরূপ মীমাংসা ধ্বনিত হইতেছে।

ভগবৎ-শব্দে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের গুণাদির দিগ্‌দর্শনরূপে নির্দ্দেশ দেওয়া হইলেও "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য"—ইত্যাদি ভগ-শব্দবাচক শ্লোকে "সমগ্রস্য"-শব্দের উল্লেখে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই কিন্তু "সমগ্র—পূর্ণতম—অসীম" হইলেই ভগ-শব্দবাচ্য হইবে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের গুণাদির অনন্তত্ব বা অনির্দ্দেশ্যত্বও সূচিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ নির্দ্দেশ-সূচক ভগবৎশব্দের বাচ্য ব্রহ্মের গুণাদি যে অনির্দ্দেশ্য, তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

যাহাহউক, "ভগাত্মক" পরব্রহ্মকে ঔপচারিক ভাবে "ভগবান্" বলা হইলেও বিষ্ণুপুরাণ ইহাও বলিয়াছেন যে, অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বকারণ-কারণ শুদ্ধ পরব্রহ্মেরই "ভগবান"—এই নাম, অপর কাহারও নহে। "ভগবান্"-শব্দের অক্ষরার্থ নিরুক্তিদ্বারাও ভগবচ্ছব্দের পরমেশ্বরত্ব-বাচকত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"ভগবান্"-এই মহাশব্দটী পরব্রহ্মভূত বাসুদেবেরই, অপর কাহারও নহে, অর্থাৎ **একমাত্র পরব্রহ্ম বাসুদেবই ভগবৎ-শব্দবাচ্য,** অপর কেহ নহেন; কেননা, "ভগ"-বস্তুটী পরব্রহ্ম বাসুদেবেরই স্বরূপভূত, একমাত্র তাঁহাতেই বিদ্যমান, অপর কাহারও মধ্যে তাহা নাই। নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত পরব্রহ্মেই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ,অন্যত্র নহে। **পরব্রহ্মই মুখ্য ভগবান্।**

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণের আর একটী কথাও বিবেচ্য—"তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।

শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥ ৬।৫।৭৭॥”—এস্থলে বলা হইল, পূজ্যপদার্থোক্তির যে পরিভাষা বা সঙ্কেত, তৎসমন্বিত ভগবৎ-শব্দ কেবলমাত্র পরব্রহ্মে ( তত্র ) উপাচার নহে, অন্যত্র কিন্তু উপাচার। পরমেশ্বরত্ব-বশতঃ পরব্রহ্মই পূজ্যতম বস্তু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ; “ভগবান্”-এই শব্দটী হইতেছে এইরূপ পূজ্যতমত্বের—পরমেশ্বরত্বের—পরিভাষা বা সঙ্কেত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজ্যতম পরমেশ্বর পরব্রহ্মে যখন এই “ভগবান্”-শব্দটীর প্রয়োগ হয়, তখন ব্যাকরণের মতুপ্-প্রত্যয়াদির বিচারে ইহা উপচার বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাস্তবিক উপচার নহে। ইহার হেতু এই যে, পরব্রহ্মে স্বরূপভূত “ভগ” বর্ত্তমান। “অন্যত্র হ্যুপচারতঃ”—অন্যত্র যখন “ভগবান্”-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন তাহা বাস্তবিকই উপচার ; যেহেতু, অন্যত্র স্বরূপভূত “ভগ” নাই। পরব্রহ্মই মুখ্য ভগবান্ ; অন্যত্র “ভগবান্”-শব্দের মুখ্যত্ব নাই। অন্যত্র কোথায় ? “অন্যত্র—দেবাদৌ উপচারেণ প্রবর্ত্ততে—দেবাদিতেই কেবল উপচারবশতঃ ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ। সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ৭০ পৃষ্ঠা ॥” দেবাদিতে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগকে শ্রীধরস্বামী গৌণ প্রয়োগ বলিয়াছেন—“অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ—তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি”-ইত্যাদি।

## ৫০। দেবাদিতে ভগবৎ-শব্দ প্রয়োগের ঔপচারিকত্ব বা গৌণত্ব

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের মতে পরব্রহ্মে ভগবৎ-শব্দের প্রয়োগ বস্তুতঃ উপচার নহে, অন্যত্রই উপচার। “অন্যত্র”-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—“দেবাদৌ-দেবতাদিতে।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“উপচারে বীজমাহ—উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব”-ইত্যাদি শ্লোক। সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিদ্যা এবং অবিদ্যা—এই সকল বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহাকে “ভগবান্” বলা হয়। এই স্থলে “ভগবান্”-শব্দটী নিতান্তই ঔপচারিক ; যেহেতু, ভূতসমূহের উৎপত্তি-প্রলয়াদির তত্ত্ব যিনি জানেন, তাঁহার মধ্যে “ভগ”-নাই। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময় পরব্রহ্মের মহাবিভূতির এক কণিকা প্রাপ্ত হইয়াই তিনি এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। এ-স্থলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই তাঁহাকে “ভগবান্” বলা হয়, বাস্তবিক তিনি “ভগবান্” নহেন। সুতরাং এস্থলে “ভগবান্”-শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে, গৌণ—নিতান্তই উপচার।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই হইতেছেন ভগবৎ-শব্দের মুখ্য বাচ্য। শ্রুতি কেন যে পরব্রহ্মকে “ভগবান্’ বলিয়াছেন, এই আলোচনা হইতে তাহা জানা গেল।

পরব্রহ্মের ভগবত্তা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

## ৫১। বাসুদেবের পরব্রহ্মত্ব

**বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ।** পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৪২-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের “এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥৬।৫।৭৬॥”-শ্লোকে বলা হইয়াছে—“পরব্রহ্মভূত বাসুদেবেই ‘ভগবান্’ এই মহাশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, অপর কাহাতেও নহে।” এস্থলে বাসুদেবকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। “বাসুদেব”-শব্দের অর্থালোচনাদ্বারা বিষ্ণুপুরাণ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৭০-৭২ পৃষ্ঠায় ) এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলির যে আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।

ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ বি. পু. ৬৷৫৷৮০॥"

**টীকা।** "বসনাদ্ বাসনাচ্চ বাসুঃ সাধনাৎ সাধুরিতিবৎ। দ্যোতনাদ্দেবঃ।" বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। তদুক্তম্ মোক্ষধর্ম্মে—

বসনাদ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততোবিদুঃ"-ইতি।

**মর্ম্মানুবাদ।** "সেই পরমাত্মায় সমস্ত ভূত ( অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টবস্তু ) অবস্থান করে এবং সেই সর্ব্বাত্মা পরমাত্মাও সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন ; এজন্য সেই পরমাত্মাকে বাসুদেব বলা হয়।" টীকা। "বসন এবং বাসন হইতে 'বাসু'-শব্দ সাধু-শব্দের ন্যায় সাধিত হয়। দ্যোতন অর্থাৎ দ্যুতি আছে বলিয়া 'দেব'। ইনি বাসুও এবং দেবও—এই অর্থে ( কর্ম্মধারয় সমাসে ) বাসুদেব-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহাভারতের মোক্ষ-ধর্ম্মেও বলা হইয়াছে—'বসনবশতঃ এবং দ্যোতনবশতঃ বাসুদেব বলা হয়', ( বসনবশতঃ—সর্ব্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত এবং তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া, দ্যোতনবশতঃ—তিনি জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া, তাঁহাকে বাসুদেব বলা হয় )।

খাণ্ডিক্যজনকের নিকটে পুরাকালে কেশিধ্বজ অনন্ত বাসুদেবের নামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে তাহাও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥ বি. পু. ৬৷৫৷৮২॥"

**টীকা।** "ভূতেষু সোঽন্তরিতি বাসুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা দেবশব্দো দিবের্ধাতোরনেকার্থ-প্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্ব্বভূত যাঁহাতে বাস করে এবং যিনি সর্ব্বজগতের ধাতা এবং বিধাতা, সেই প্রভুই বাসুদেব নামে অভিহিত হয়েন"। টীকা। "সর্ব্বভূতে বাস করেন," ইত্যাদি বাক্যে "বাসু"-শব্দের অর্থ এবং "ধাতা ও বিধাতা" দ্বারা দেব-শব্দের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। দিব্-ধাতুর অনেক অর্থ হয় ; এস্থলে ধাতৃত্ব ও বিধাতৃত্ব অর্থে দিব্-ধাতু ব্যবহৃত হইয়াছে।"

"স সর্ব্বভূতঃ প্রকৃতের্ব্বিকারান্

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।

অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা

তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥ বি, পু, ৬৷৫৷৮৩ ॥"

**টীকা।** "ভুবনান্তরালে যদস্তি তৎ সর্ব্বন্তেনাস্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ।"

**টীকানুযায়ী মর্ম্মানুবাদ।** "তিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ ; তিনি প্রকৃতির বিকারের এবং প্রকৃতির গুণ-দোষ সমূহেরও অতীত, সমস্ত আবরণের অতীত, তিনি অখিলাত্মা। ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাদ্বারা ব্যাপ্ত।"

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃত-ভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥ বি, পু, ৬।৫।৮৪ ॥"

**টীকা।** "অত্র গ্রহিঃ প্রাদুর্ভাবনার্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীবৃত্তিষু পরমায়াস্তদ্দেহ-শোভাসম্পত্তের্ভগান্তঃপাতেন স্বাভাবিকত্বাৎ। উত্তরত্র শারীরবলাদেরপ্যুক্তত্বাৎ।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক, তাঁহার শক্তি-লেশদ্বারা সমস্ত সৃষ্টজগৎ সমাবৃত। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে বহু দেহ প্রকটিত করেন এবং জগতের অশেষ-হিত-সাধন করিয়া থাকেন।" টীকা। "শ্লোকের অন্তর্গত 'ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ'-শব্দে যে 'গ্রহ'-ধাতু আছে, তাহার অর্থ—প্রাদুর্ভাবন, প্রকটন। ( ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্তর্ভুক্ত যে 'শ্রী' আছে, সেই শ্রী-শব্দে সর্ববিধ সম্পত্তি বুঝায় ; তাহারই বৃত্তি-বিশেষ হইতেছে দেহশোভারূপ সম্পত্তি ) সেই শ্রীরই বৃত্তিবিশেষ তাঁহার পরমা দেহশোভা ; ইহাও তাঁহার 'ভগের—ঐশ্বর্য্যের' অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁহার দেহ-শোভাও স্বাভাবিকী। ইহার পরে তাঁহার শারীরিক বলাদির কথাও বলা হইতেছে।"

"তথৈব কল্যাণগুণানাহ—

তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥ বি, পু, ৬।৫।৮৫ ॥
স ঈশ্বরোব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽ
ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক সর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥ বি, পু, ৬।৫।৮৬ ॥"

**টীকা।** "ব্যষ্টিঃ সংকর্ষণাদিরূপঃ, সমষ্টির্বাসুদেবাত্মা। অত্র প্রকটস্বরূপঃ শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যেনেতি জ্ঞেয়ম্।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "তাঁহার কল্যাণ-গুণসমূহও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই। তিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, মহাবুদ্ধি, স্বীয় বীর্য্য, শক্তি-আদির একমাত্র আধার। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ; সেই পরাৎপর ঈশ্বরে কোনও ক্লেশাদিই নাই। তিনি ঈশ্বর, ব্যষ্টিরূপ ( সঙ্কর্ষণাদিরূপ ) এবং সমষ্টিরূপ ( বাসুদেবাত্মা ) ; তিনিই ব্যক্তস্বরূপ, তিনিই অব্যক্তস্বরূপ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর।" টীকা :—ব্যষ্টি—সঙ্কর্ষণাদিরূপ। সমষ্টি—বাসুদেবাত্মা। এই স্থলে যে 'প্রকটস্বরূপ'-পদটী আছে, তাহার অর্থ—শ্রীবিগ্রহের প্রকটন ( অর্থাৎ তিনি তাঁহার শ্রীবিগ্রহও প্রকটিত করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে )।"

**আলোচনার সার মর্ম্ম।** উক্ত আলোচনায় বাসুদেব-শব্দের অর্থ যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম এই :—তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে বাস করেন, সর্ব্বভূতও তাঁহাতে বাস করে ; তিনি দ্যোতমান্, সমস্ত জগতের ধাতা ও বিধাতা। তিনি সর্ব্বভূত-স্বরূপ ; তিনি প্রকৃতির বা মায়ার অতীত, সমস্ত মায়িক গুণ-দোষেরও অতীত, সমস্ত আবরণের অতীত, অখিলাত্মা। ভুবনের অন্তরালে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাদ্বারা সমাবৃত। তিনি সমস্ত-কল্যাণ-গুণাত্মক, তিনি স্বেচ্ছায় জগতের হিতের জন্য বহু দেহ প্রকটিত করেন। তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, মহাবুদ্ধি, বীর্য্য, শক্তি আদি তাঁহার অনন্ত-কল্যাণগুণ। তিনি পরাৎপর, সর্ব্বক্লেশাদিশূন্য, পরমেশ্বর, সমষ্টিরূপ, ব্যষ্টিরূপ। ইত্যাদি। এই সমস্তই পরব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া এবং বাসুদেব-শব্দের অর্থও বলিয়া পরব্রহ্মকে বাসুদেব বলা হইয়াছে।

যিনি পরব্রহ্ম, তিনি বাসুদেব হওয়ায় বাসুদেবেরই পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইল।

**শ্রুতিপ্রমাণ।** বিষ্ণুপুরাণ যে বাসুদেবকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, ইহা শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। শ্রীভা. ২।৯।৩২-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ এবং সারার্থসন্দর্শিনী টীকাধৃত শ্রুতি-বাক্য।—সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।" সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরব্রহ্মই থাকেন। এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল- সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন ; সুতরাং বাসুদেবকে পরব্রহ্মই বলা হইল ;

গীতার "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥৭।১৯॥"-শ্লোকে বাসুদেবকে "সর্ব্বম্—সর্ব্বাত্মা" বলা হইয়াছে। একমাত্র পরব্রহ্মই হইতেছেন "সর্ব্বম্—সর্ব্বাত্মা", সুতরাং বাসুদেবকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। গীতার "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥১০।৮॥"-শ্লোকের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"* * অহং পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ"-ইত্যাদি। "বাসুদেব" যে পরব্রহ্মেরই আখ্যা, এ-স্থলে তিনি তাহাই বলিলেন।

"সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি ॥"-ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৮০)-শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতিও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। "সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ভূতেষু বসত্যপি। সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ ॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ॥২৩॥"

## ৫২। পরব্রহ্মের ভগবত্তা তাঁহার স্বরূপভূত

গুণের সমষ্টিই হইতেছে ভগবত্তা। শক্তি হইতেই শক্তিমানের গুণের উদ্ভব। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি হইতেই তাঁহার ভগবত্তা।

যে শক্তি পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা—স্বরূপে অবস্থিতা—তাহা হইতে উদ্ভূত গুণসমূহও হইবে স্বরূপভূত, সেই সমস্ত গুণই পরব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিবে। যে শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত নয়, ব্রহ্মের বাহিরেই যাহার অবস্থিতি, সেই শক্তি হইতে জাত গুণসমূহও ব্রহ্মের মধ্যে থাকিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৭-অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে, মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না ; সুতরাং মায়া বা প্রকৃতি হইতে জাত কোনও গুণও ব্রহ্মে থাকিতে পারে না ; পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৪০-অনুচ্ছেদে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

একমাত্র স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত ; সুতরাং একমাত্র স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে এবং ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া এই সমস্ত গুণই হইবে ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন—ব্রহ্মের স্বরূপভূত। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৪৪-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত এবং আলোচিত বিষ্ণুপুরাণের "অশব্দগোচরস্যাপি"-ইত্যাদি ৬।৫।৭১-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাৎ—ব্রহ্মের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন।" এজন্যই ব্রহ্মকে "গুণাত্মা" বলা হয়। "গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুম্॥ শ্রী. ভা. ১০।১৪।৭॥ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহি॥ বি. পু. ৬।৫।৮৪॥" গুণই আত্মা বা স্বরূপ যাঁহার, তিনিই গুণাত্মক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৭২-৭৫ পৃষ্ঠায় ) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও ভগবত্ত্বা সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৪২-অনুচ্ছেদে সর্ব্বসম্বাদিনী হইতে যে আলোচনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথমেই বলা হইয়াছে—ভগবৎ-প্রাপ্তিই ভবরোগ দূরীকরণের একমাত্র ঔষধ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির বা ভগবদনুভবের একমাত্র উপায়ও হইতেছে পরাবিদ্যা। সেই আলোচনার উপসংহার করিতে যাইয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—"প্রকৃতমুপসংহরতি—বিষ্ণুপুরাণ এইভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—

"সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে চাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদুক্তম্॥—বি. পু. ৬।৫।৮৭॥"

শ্রীধরস্বামীর টীকা। "যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্জ্ঞানং পরাবিদ্যা। অজ্ঞানং অবিদ্যান্তর্ব্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যা ইত্যর্থ ইতি।"

**মর্ম্মানুবাদ**। "যাহাদ্বারা সেই নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল এবং একরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক্রূপে জানা যায়, সম্যক্রূপে দেখা যায়, বা লাভ করা যায়, তাহাই জ্ঞান ( বা পরা বিদ্যা ) ; তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান।" টীকা। "যাহাদ্বারা পরব্রহ্ম বাসুদেবকে জানিতে পারা যায়, পরোক্ষবৃত্তিতে সাক্ষাৎ করা যায় এবং অবিদ্যা নিঃশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তাহারই ফলে যদ্দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানের নামই পরাবিদ্যা। অবিদ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী অপরাবিদ্যাই অজ্ঞান।"

এস্থলে বলা হইল—পরাবিদ্যা দ্বারা পরব্রহ্ম বাসুদেবকে জানা যায়, দেখা যায় এবং লাভ করা যায়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রীজীব সেই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিতেছেন।

"অত্রৈতদুক্তং ভবতি—স এবংভূত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তো যেন জ্ঞানেন তদেকরূপমেব তত্ত্বমিত্যেব জ্ঞায়তে তদেব জ্ঞানম্ ইত্যস্য কিং বিবক্ষিতম্? কিম্ অতদংশানাং তত্তদ্গুণানাং পরিত্যাগেন ভেদগন্ধরহিতং তজ্জ্ঞায়েত? কিম্বা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া একমেব তত্ত্বং গুণগুণিরূপমিতি ইত্থমেব অভেদং তজ্জ্ঞায়েত ইতি।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "সেই পরব্রহ্ম বাসুদেব তো এবম্বিধ ( পূর্ব্বোক্তরূপ ) ঐশ্বর্য্যাদি-গুণযুক্ত। সেই তত্ত্ব যে একরূপ—যদ্দ্বারা তাহা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, একথা বলার তাৎপর্য্য কি ? তাঁহার অনংশীভূত সেই-সেই গুণসমূহের পরিত্যাগপূর্ব্বক ভেদগন্ধ-রহিতরূপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই কি তাৎপর্য্য ? না কি, তিনি অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই একই তত্ত্ব গুণ-গুণিরূপ, তাঁহাতে গুণ ও গুণী অভিন্ন—এইরূপ অভেদরূপে তাঁহাকে জানা যায়—ইহাই তাৎপর্য্য ?"

এ-স্থলে প্রশ্নটী উঠিতেছে শ্লোকস্থ "একরূপ"-শব্দটী লইয়া। পরাবিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্ম বাসুদেবকে "একরূপ" জানা যায়। "একরূপ" বলিতে কি বুঝায় ? "তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি-গুণসমূহ তাঁহার অংশ নহে, তাঁহা হইতে ভিন্ন"—এইরূপ মনে করিয়া ঐশ্বর্য্যাদি-গুণহীন ভাবে কেবল তাঁহাকে জানাই কি "একরূপ" জ্ঞান ? না কি—"তিনি গুণ-গুণিরূপ, তাঁহার গুণ তাঁহা হইতে অভিন্ন"—এইরূপ মনে করিয়া গুণসমন্বিত-ভাবে তাঁহাকে জানাই "একরূপ" জ্ঞান ? অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপের বহির্ভূত ( অনংশীভূত ), না কি তাঁহার স্বরূপের অন্তর্ভূত—ইহাই প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য" ইত্যত্র হেয়গুণমিশ্রতা-নিষেধাৎ, তথা 'গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ,' 'সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকো হি' ইতি গুণান্তর-নিষেধ-পূর্ব্বক-তদাত্মভূত-গুণান্তর-স্থাপনেন তেষাং স্বরূপরূপতা-প্রতিপাদনাচ্চ তে পরিত্যক্তুং ন শক্যন্তে। অতএব 'অস্তদোষম্' ইতি এব উক্তং ন তু 'অস্তদ্গুণদোষম্' ইতি। তস্মাৎ তেষামপি যেন যথাবস্থিতানামেব স্বরূপত্বং জ্ঞায়তে তজ্জ্ঞানমিত্যেব তাৎপর্য্যম্।

অতএব ভগোপলক্ষণত্বেন কেবলাদ্বয়স্বরূপমেব উচ্যতে ইতি চ প্রত্যাখ্যাতম্—ভগবচ্ছব্দেন ভগবতশ্চ ভগস্য চ বাচ্যত্ব-স্বীকারাৎ, 'তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।'—ইত্যনেন, 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি' ইত্যনেন চ।

এবঞ্চ ভগস্যাপি স্বরূপভূতত্বমেব ব্যক্তম্। তদ্ব্যক্তয়ে এব চ শুদ্ধ-স্বরূপ-নিরূপণ এব 'বিভুং সর্ব্বগতম্'-ইত্যত্র প্রভুতাবাচকবিশেষণং দত্তম্।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "বিষ্ণুপুরাণের 'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ ৬।৫।৭৯ ॥'—শ্লোকের অন্তর্গত 'বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ'—এই বাক্যে, পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যে মায়িক হেয়গুণের মিশ্রণ নাই, তাহা বলা হইয়াছে। আবার বিষ্ণুপুরাণের 'স সর্ব্বভূত-প্রকৃতিং বিকারান্ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ ॥৬।৫।৮৩'—এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে—তিনি মায়াজনিত গুণ-দোষের অতীত এবং 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি ॥ বি. পু. ৬।৫।৮৪॥'-শ্লোকে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক। বিষ্ণুপুরাণের এই সমস্ত উক্তিতে বলা হইয়াছে—মায়িক কোনও গুণই তাঁহাতে নাই, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদিতেও নাই ; কিন্তু মায়াতীত অনন্ত-কল্যাণগুণ তাঁহাতে আছে এবং এই সমস্ত কল্যাণগুণ তাঁহার আত্মভূত—স্বরূপভূত ( কল্যাণ-গুণাত্মকঃ )। ইহাদ্বারা ঐশ্বর্য্যাদি কল্যাণ-গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায়, এই সমস্ত কল্যাণগুণকে বাদ দিয়া তাঁহাকে জানার কথা উঠিতে পারে না।

তাঁহাকে জানা অর্থ—তাঁহার স্বরূপকে জানা, তাঁহার স্বরূপে যাহা-যাহা আছে, তৎসমস্ত জানা। কল্যাণ-গুণসমূহ যখন তাঁহার স্বরূপভূত, তখন তাঁহার কল্যাণগুণসমূহের জ্ঞানও তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তই। এজন্যই পূর্ব্বোদ্ধৃত 'সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্॥ বি. পু. ৬।৫।৮৭॥'-শ্লোকে তাঁহাকে "অস্তদোষ—দোষহীন—মায়িক-হেয়গুণরূপ-দোষহীন" বলা হইয়াছে, 'অস্তুতদ্গুণদোষম্—গুণদোষহীন' বলা হয় নাই—তাঁহাতে কোনও দোষ যেমন নাই, তেমনি কোনও গুণও—কল্যাণগুণও—নাই, একথা বলা হয় নাই। ইহা দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে—তাঁহাতে মায়িক হেয়গুণরূপ দোষ নাই, কিন্তু মায়াতীত কল্যাণগুণ আছে। সুতরাং এই সমস্ত যথাবস্থিত কল্যাণগুণসমূহের স্বরূপ যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান—পরাবিদ্যা।

অতএব, 'ব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্য কেবল উপলক্ষণ মাত্র—সুতরাং 'ভগ' তাঁহা হইতে ভিন্ন একটী দ্বিতীয় বস্তু'—ইহা মনে করিয়া 'ভগকে বাদ দিয়া, ভগরূপ-দ্বিতীয়-বস্তুহীন কেবল ব্রহ্মকে জানাই পরাবিদ্যার লক্ষ্য'—এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। তাহার আরও হেতু এই—বিষ্ণুপুরাণের 'তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ৬।৫।৬৯॥"—এই শ্লোকে পরমাত্মার স্বরূপকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। আবার, 'জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯॥'-শ্লোকে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি-আদি 'ভগ'কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য—'ভগবান্'—বলা হইয়াছে। অর্থাৎ পরব্রহ্ম যেমন 'ভগবান্', তাঁহার ভগকেও তেমনি 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। উভয়েই একই ভগবান্-শব্দের বাচ্য হওয়ায় ব্রহ্মের 'ভগ—ঐশ্বর্য্যাদিগুণ' যে তাঁহারই স্বরূপান্তর্গত, তাহাই বলা হইল। ব্রহ্মের 'ভগ'—ঐশ্বর্য্যাদিগুণ—যে তাঁহার স্বরূপের অন্তর্ভূত, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাঁহার শুদ্ধ-স্বরূপ-নিরূপণাত্মক 'বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্॥ বি, পু, ৬।৫।৬৭॥'-শ্লোকে তাঁহার প্রভুতা-বাচক বিশেষণ 'বিভু'-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে।"

উক্তরূপ সিদ্ধান্ত মহাভারতে বহু-প্রশংসিত নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। "জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবল-তেজাংসি গুণা হ্যাত্মান এব তে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ॥—'বিপ্রতিষেধাচ্চ॥'-এই ২।২।৪৫-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত নারদপঞ্চরাত্র বচন॥" ইহার তাৎপর্য্য এই—"জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল ও তেজ—এই সমস্তই পরমাত্মা ব্রহ্মের গুণ; এই সমস্ত গুণকেও 'ভগবান্ বাসুদেব' বলা হয়।" এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—পরব্রহ্ম বাসুদেব এবং তাঁহার গুণসমূহ—উভয়েই ভগবৎ-শব্দবাচ্য; সুতরাং উভয়েই অভিন্ন। ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণসমূহ ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

"যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥২।১।১৮॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যুক্তি-বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্।—শক্তি কারণেরই আত্মভূত বা স্বরূপভূত এবং কার্য্যও শক্তির আত্মভূত বা স্বরূপভূত।" সুতরাং ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তি যে—সুতরাং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহও যে—ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ড হইতে একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥ ইতি"

—"ভগবান্" এই শব্দটী এবং "পুরুষ"-এই শব্দও নিরুপাধি। এই দুইটী শব্দ অখিলাত্মা বাসুদেবেই প্রযুক্ত হয়।

ইহার পরেই শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ ভগবিশিষ্টস্যৈব ভগবতো ব্রহ্মবৎ পরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বেন স্বপ্রকাশত্বং স্পষ্টমেব। —এই নিমিত্ত ব্রহ্মের ন্যায় ভগবিশিষ্ট ভগবান্ একমাত্র পরাবিদ্যাদ্বারাই প্রকাশ্য বলিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশত্ব স্পষ্টরূপেই নির্ণীত হইয়াছে।"

পরাবিদ্যা পরব্রহ্ম ভগবানেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং স্বীয় স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষদ্বারা —তাঁহার নিজেরই শক্তির দ্বারা—প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার স্বপ্রকাশতাই সূচিত হইতেছে। এই আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে—পরা বিদ্যা দ্বারা তিনি ভগবিশিষ্টরূপেই—ঐশ্বর্য্যাদি-গুণবিশিষ্টরূপেই—প্রকাশিত হয়েন, ঐশ্বর্য্যাদিগুণহীনভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েন না; সুতরাং ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। পরাবিদ্যা প্রকাশ করেন, পরব্রহ্মের স্বরূপকে; ঐশ্বর্য্যাদিও তদ্দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় ঐশ্বর্য্যাদিও যে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল **শ্রুতিপ্রমাণও** শ্রীজীব উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অত্র শ্রুত্যন্তরঞ্চ শ্রীমধ্বভাষ্যে প্রমাণিতম্—'অথ দ্বে বাব বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা অপরা চ। তত্র যে বেদাস্থা যান্যঙ্গানি যান্যুপাঙ্গানি সা অপরা। অথ পরা যয়া স হরির্বেদিতব্যো যোঽসাবদৃশ্যো নির্গুণঃ পরঃ পরমাত্মা' ইতি (১।২।২১-ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্য।)— ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত-ভাষ্যে একটী শ্রুতি-বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই— 'দুইটী বিদ্যা জ্ঞাতব্য—পরা ও অপরা। অঙ্গোপাঙ্গ-সমন্বিত বেদাদি-শাস্ত্র হইতেছে অপরা বিদ্যা। আর যদ্দ্বারা হরিকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা। এই হরি হইতেছেন অদৃশ্য (প্রাকৃত-নয়নের অদৃশ্য), নির্গুণ (হেয়-প্রাকৃত গুণহীন), পর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) এবং পরমাত্মা।"

পরমাত্মা—পরব্রহ্ম—যে শ্রীহরি এবং তিনি যে পরা বিদ্যাদ্বারাই জ্ঞাতব্য, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল। ঐশ্বর্য্যাদি অনন্ত-কল্যাণগুণাত্মক পরব্রহ্মই হইতেছেন শ্রীহরি। সুতরাং পরা বিদ্যাদ্বারা ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ-সমন্বিত পরব্রহ্মকেই যে জানা যায়, এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীজীব অপর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কোটরব্যশ্রুতাবপি তেষাং গুণানাং পরাবিদ্যা-মাত্রব্যঙ্গ্যত্বং ব্যঞ্জিতম্—

'অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্যং সুখং জ্ঞানমোজোবলম্'-ইতি।
'ব্রহ্মণস্তস্মাদ্ ব্রহ্ম ইতি আচক্ষ্যত ইতি।"

অন্যত্র চ—

'অন্যজ্জ্ঞানস্তু জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ।
নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়তে॥' ইতি।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "এই সকল ভগবদ্গুণ যে কেবল পরাবিদ্যামাত্রেরই প্রকাশ্য, তাহা কোটরব্য-শ্রুতিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। সেই শ্রুতি বলেন—'অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অব্যপদেশ্য—সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি।'

কোটরব্য-শ্রুতির আর একটী প্রমাণ এই—'ব্রহ্মণস্তস্মাদ্ ব্রহ্ম ইতি আচক্ষ্যত ইতি।—( সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি ) ব্রহ্মেরই গুণ ; এজন্য তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়।' অন্যত্রও একটী প্রমাণ আছে এইরূপ—'জীবের ( জীবসম্বন্ধীয় ) জ্ঞান অন্য, পরমের ( পরম-ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ) জ্ঞান অন্য। পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান—নিত্যানন্দ, অব্যয়, পূর্ণ-ইতি।"

মাধ্বভাষ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত অপর একটী শ্রুতিবাক্যও প্রতিপাদন করিতেছে যে—সেই গুণী ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গুণসমূহের এবং গুণব্যঞ্জক শক্তিরও একাত্মকত্ব বিদ্যমান ; "অতো মাধ্বভাষ্য এব প্রমাণিতং শ্রুত্যন্তরমপি তেন গুণিনা তেষাং গুণানাং তদ্ব্যঞ্জকশক্তেশ্চ একাত্মকত্বমেব প্রতিপাদয়তি।"

সেই শ্রুতিবাক্যটী এই—"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্ ? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ" ( ২।১।৪১ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন ) ইতি, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ( ১।২।২২-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৯-বাক্য ) ইতি।"

**মর্ম্মানুবাদ**। "ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। ভগবান্ কিরূপ আত্মক ? উত্তরে বলা হইতেছে—তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ; তাঁহার তপঃ হইতেছে জ্ঞানময়। অর্থাৎ তাঁহার তপস্যা ( কার্য্য বা লীলা ) হইতেছে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি-গুণেরই বিলাস-বিশেষ, চেষ্টাকৃত নহে।"

ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, সমস্তই যে ব্রহ্মাত্মক—এই শ্রুতিবাক্য তাহা স্পষ্ট কথাতেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য যে চিৎ-স্বরূপ, অপ্রাকৃত—অন্যশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন। "শ্রুত্যন্তরেঽপি যস্য চিৎ-স্বরূপমেব ঐশ্বর্য্যম্ ইতি অভিধীয়তে।" এই শ্রুতিটী হইতেছে—চতুর্ব্বেদশিখা। তাহাতে বলা হইয়াছে—

চতুর্ব্বেদশিখায়াঞ্চ—"বিষ্ণুরেব জ্যোতিঃ, বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম, বিষ্ণুরেব আত্মা, বিষ্ণুরেব বলম্, বিষ্ণুরেব আনন্দঃ" ইত্যাদি ( ১।৩।৪০-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যে ধৃত শ্রুতিবচন )। —বিষ্ণুই জ্যোতিঃ, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল, বিষ্ণুই আনন্দ, ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্যে বিষ্ণুকে জ্যোতিঃ বা চিৎস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং তাঁহার বল-আদিকেও বিষ্ণু বলাতে বল-আদি ঐশ্বর্য্যেরও চিৎ-স্বরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ইহার পরে শ্রীজীব ভাগবত-তন্ত্র এবং বিষ্ণু-সংহিতার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাগবত-তন্ত্রে—

"শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।
অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে॥" ইতি

—( ২।৩।১০ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত প্রমাণ )।

বিষ্ণুসংহিতায়াঞ্চ—

"ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতিত্রিধা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে॥" ইতি।

**মর্ম্মানুবাদ**। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিভিন্না হইলেও স্বেচ্ছাদি ভেদসমূহদ্বারাও ( শক্তিমান্ ব্রহ্ম ) বিভাবিত হইয়া থাকেন ( অর্থাৎ স্বরূপভূত-শক্তিক ব্রহ্মের স্বেচ্ছাদি-শক্তিও উল্লিখিত হইয়া থাকে। শক্তিমান্ ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়ায়, "ব্রহ্মের শক্তি"—এইরূপ উল্লেখের কোনও সার্থকতা নাই ; কারণ, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তির পার্থক্য সূচিত হয়। তথাপি ব্রহ্মের স্ব-ইচ্ছা-আদি শক্তির পৃথগ্‌ভাবেও উল্লেখ করা হয়। এই ভাগবত-তন্ত্রের প্রমাণটী শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তৎকৃত ২।৩।১০-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন )।

বিষ্ণুসংহিতা বলেন—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—শক্তির এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই।"

অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের শক্তিসমূহও ব্রহ্মের স্বাভাবিকী—অবিচ্ছেদ্যা—শক্তি বলিয়াই ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তিকে অভিন্ন বলা হয়।

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তস্মাদ্ ভগবতৈকরূপত্বমেব গুণানাম্। অতএব ভারত-তাৎপর্য্য-প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। 'সত্যঃ সোঽস্য মহিমহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্য' ইতি ( ভারত-তাৎপর্য্য ১।৬৭ অঃ )। অতো মায়িক-সর্ব্বনিষেধাবধি স্বরূপমুক্ত্বা পশ্চাৎ তস্য এব ঐশ্বর্য্যাদিকম্ উচ্যতে 'এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ ( বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ ॥ ৪।৪।২২॥ )' ইত্যাদি। অতো গুণগুণিনোর্ভেদপক্ষেঽপি তদেকরূপমিতিবচনং গুণানামন্তরঙ্গত্বেন গুণিনা সহ তুল্যত্বাৎ তাদাত্ম্যাপত্তেশ্চ সঙ্গচ্ছত এব।"

**মর্ম্মানুবাদ**। "সুতরাং ( পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে ) ভগবদ্‌গুণ-সমূহও ভগবানেরই স্বরূপভূত। ( শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের ) ভারত-তাৎপর্য্য-নামক গ্রন্থে প্রমাণরূপে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। 'সত্যঃ সোঽস্য মহিমহিমা গৃণেশবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্য'-ইত্যাদি ( ভারত-তাৎপর্য্য ১।৬৭ অঃ )। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতেও, মায়িক-সর্ব্ববস্তু-নিষেধ পর্য্যন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া, তাহার পরে তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির কথা বলা হইয়াছে—'এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ—এই ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর'—ইত্যাদি বাক্যে। অতএব, যাঁহারা গুণ ও গুণীর ভেদ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেও—গুণসমূহ গুণীর অন্তরঙ্গ, সুতরাং গুণীরই তুল্য এবং গুণীর সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া—গুণ এবং গুণীর একরূপত্ব-সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হয়।"

অতঃপর শ্রীজীব বলেন—"দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১।৩।১৪ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্রে ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে বাক্যটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতেও অন্তরঙ্গ-গুণসমূহের সহিতই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধানের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যটী এই ঃ—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশস্তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যম্ তদ্‌বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ॥ ছান্দোগ্য ।৮।১।১॥—এই ব্রহ্মপুরে ( অর্থাৎ দেহে ) যে ক্ষুদ্র ( দহর ) পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহার মধ্যে যে দহরাকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা আছে ( তদন্তঃ ), তাহা অন্বেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।"

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকে বেশ্মেত্যনুষ্য তস্মিন্ দহরে পুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশো যচ্চ তদন্তবর্ত্তি গুণজাতং তদুভয়মন্বেষ্টব্যং

বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ ইতি বিধীয়তে” ইত্যর্থঃ　'অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ' ( ছান্দোগ্য ।৮।১।৫। ) ইতি হি কামন্বাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাঃ তদন্তঃস্থা উচ্যন্তে। 'তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে' ইত্যাদিভিঃ বিভূত্বাদয়ঃ, 'আয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদিভিঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ তত্র বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সন্তীতি। বাক্যকারৈশ্চ ত এব তদন্তরস্থত্বেনোক্তাঃ—'তস্মিন্ যদন্তর' ইতি 'কামব্যপদেশঃ' ইত্যাদিনেতি।”

**মর্ম্মানুবাদ।** “ 'এই ব্রহ্মপুরে ( দেহে ) যে ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক-গৃহ'-এই শ্রুতিতে পুনরুল্লেখপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-গৃহে ( পদ্মাকৃতি ক্ষুদ্রগৃহে ) যে দহরাকাশ ( ব্রহ্ম ) এবং তন্মধ্যগত যে সমস্ত গুণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য বলেন—'ইঁহাতে ( এই ব্রহ্মে ) কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে।'—এ স্থলে কাম-শব্দে কামত্বনিবন্ধন কামসমূহ, অর্থাৎ কল্যাণগুণসমূহ বুঝাইতেছে এবং এই কল্যাণগুণসমূহ যে সেই দহর ব্রহ্মের অন্তঃস্থিত, তাহাই বলা হইয়াছে। আবার, 'তে চ গুণা অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে'-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিভূতিসমূহ এবং 'অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার অপহতপাপ্মত্ব, বিজরত্ব, বিশোকত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি বহুগুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাক্যকার বলিয়াছেন—এই সমস্ত গুণ তাঁহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এই নির্দ্দেশের হেতু শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—'যদন্তর', 'কামব্যপদেশঃ'-ইত্যাদি।”

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে দহরাকাশ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়; সমস্ত আচার্য্যগণই তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত গুণের সহিতই তাঁহার অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—ইহাই উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যের নির্দ্দেশ। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়—ব্রহ্মের গুণসমূহ তাঁহারই স্বরূপভূত; নচেৎ, ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মের গুণাদির অনুসন্ধানের কথা বলা হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—স্মৃতি-শ্রুতি অনুসারে পরব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐশ্বর্য্যাদি গুণসমূহ—সুতরাং পরব্রহ্মের ভগবত্তা—হইতেছে তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

## ৫৩। অদ্বয়-ব্রহ্মের সম্যক্-জ্ঞান-লাভের ব্যাপারে তাঁহার ভগের জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য

পরব্রহ্ম হইতেছেন এক এবং দ্বিতীয়হীন বস্তু। “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” তাঁহাতেও অপর—দ্বিতীয় কোনও বস্তু নাই, তাঁহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও বস্তু অন্যত্রও নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—পরব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্যাদি তাঁহা হইতে দ্বিতীয় বস্তু কিনা? দ্বিতীয় বস্তু বলিতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তুকেই বুঝায়।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। পরব্রহ্মের পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিকী—তাঁহা হইতে অবিচ্ছেদ্যা-শক্তি, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়। অবিচ্ছেদ্যা বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও হইতেছে তাঁহা হইতে অভিন্না, তাঁহার স্বরূপভূতা; সুতরাং শক্তিমান্ ব্রহ্ম এবং স্বরূপ-শক্তি—এই উভয়ে মিলিয়াই ব্রহ্ম একবস্তু; ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্-আনন্দ—একবস্তু। তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি তাঁহা হইতে অভিন্না বলিয়া তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু নহে। তাঁহার ভগ বা ঐশ্বর্য্যাদিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন

বস্তু নহে, তাঁহারই স্বরূপভূত ; সুতরাং ব্রহ্মের ভগও ব্রহ্মের পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু নহে। ভগবান্ ব্রহ্ম এবং তাঁহার ভগ —এই উভয়ে মিলিয়াই পরব্রহ্ম—একবস্তু, দ্বিতীয়হীন একবস্তু। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তেজোবান্ সূর্য্য এবং সূর্য্য—ইহারা দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে, উভয়ে মিলিয়াই এক বস্তু—সূর্য্য। যেহেতু, সূর্য্যের তেজ—সূর্য্য হইতে ভিন্ন বস্তু নহে ; তেজ হইতেছে সূর্য্যেরই স্বরূপভূত বস্তু। তেজ তেজোবান্ সূর্য্যের বিশেষণ হইলেও ইহা স্বরূপভূত বিশেষণ, অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির ন্যায় আগন্তুক বিশেষণ নহে। তাই তেজোবান্ সূর্য্য এবং সূর্য্য-উভয় মিলিয়া একই বস্তু হয়। অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহ এবং লৌহ হইতে ভিন্ন তাহার দাহিকা শক্তি—এই উভয়ে মিলিয়া এক বস্তু লৌহ হয় না ; যেহেতু, লৌহের স্বরূপে দাহিকা শক্তি নাই। তদ্রূপ, ভগবান্ ব্রহ্ম এবং তাঁহার স্বরূপভূত ভগ—এই উভয়ে মিলিয়াই একবস্তু—দ্বিতীয়হীন একবস্তু-পরব্রহ্ম, অদ্বয়-ব্রহ্ম।

শাস্ত্রপ্রমাণপ্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পরাবিদ্যার বা বিবেকোত্থ জ্ঞানের সহায়তায় ভগবান্ ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বরূপভূত ভগের জ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপভূত ভগকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মের সম্যক্জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে ; সূর্য্যের স্বরূপভূত তেজকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যের সম্যক্ দর্শন, কিম্বা দীপশিখার স্বরূপভূত তেজকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র দীপশিখার সম্যক্ দর্শন যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ।

সুতরাং পরব্রহ্মের সম্যক্ অনুভবের বা সম্যক্ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাঁহার ভগের জ্ঞানলাভ অপরিহার্য্য।

## ৫৪। ভগ ব্রহ্মের উপলক্ষণ নহে

ভগ পরব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তু হওয়া সত্ত্বেও ভেদ-প্রতীতি-জ্ঞাপক মতুপ্-প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ "ভগবান্"-শব্দকে তাঁহার বিশেষণরূপে ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থে যে ভেদের প্রতীতি জন্মে, সেই ভেদ হইতেছে ঔপচারিক, বাস্তব নহে। সুতরাং "ভগবান্" বা ভগ-শব্দটীও ব্রহ্মের স্বরূপগত বিশেষণ ; ইহা উপলক্ষণ নহে। যেহেতু, যে দুইটী বস্তুর মধ্যে একটী দ্বারা অপরটীকে উপলক্ষিত করা হয়, তাহারা হইতেছে পরস্পর হইতে ভিন্ন বস্তু ( অবতরণিকা। ২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ), তাহারা অভিন্ন বস্তু নহে। ব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্যাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নহে বলিয়া তাহা ব্রহ্মের উপলক্ষণ হইতে পারে না।

যাহা হউক, ভেদ-প্রতীতিজ্ঞাপক মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থের প্রতি প্রাধান্য দিয়া যদি কেহ মনে করেন—ব্রহ্মের ভগের সহিত ব্রহ্মের ভেদ আছে, তাহা হইলেও এই ভগের জ্ঞানও যে অপরিহার্য্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহার হেতু এই। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের ভগ বা ঐশ্বর্য্যাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাহা হইলেও সেই ভগ বা ঐশ্বর্য্যাদি যে ব্রহ্মেরই অভ্যন্তরে, ব্রহ্মেরই অন্তরঙ্গ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রুতির দহর-বাক্যের এবং ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—জীবের চিত্তরূপ ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিত ব্রহ্মের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রহ্মের মধ্যস্থিত তাঁহার গুণাদিরও অনুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। সুতরাং

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সম্যক্ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাঁহার ভগের বা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের জ্ঞানলাভও অপরিহার্য্য।

পরব্রহ্মের ভগবত্তা-বিচার-প্রসঙ্গের উপসংহারে শ্রীজীবগোস্বামীও উল্লিখিত কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"তদেবং ভগপদমত্র—'ভাস্বানয়মুদয়তে' ইত্যাদৌ ভা-শব্দাদিবৎ স্বরূপাংশভূতং বিশেষণং—ন তু উপলক্ষণম্।

ততশ্চ ভেদবৃত্তিপ্রাধান্যেন বা কেবলয়া ভেদবৃত্ত্যা বা কৃতেঽপি মত্বর্থীয়ে স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তীনামদ্বয়ে জ্ঞানেঽপ্যপরিহণীয়ত্বাৎ স্বরূপ-শক্তি-বৃত্তি-লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেনাদ্বয়জ্ঞানেনৈকবস্তুত্বমেব সিদ্ধ্যতীতি।"

**মর্ম্মানুবাদ।** ( ভাস্—প্রভা, জ্যোতিঃ, তেজ। ভাস্বান্=ভাস্+বতু=ভাস্বান্=তেজোময়-সূর্য্য )।

"ভাস্বান্ অয়ম্ উদয়তে—এই ভাস্বান্ ( সূর্য্য ) উদিত হইতেছে"—এই স্থলে ভা-শব্দ যেমন স্বরূপাংশ-ভূত বিশেষণ, পরন্তু উপলক্ষণ নহে, তদ্রূপ 'ভগবান্'-এই স্থলে 'ভগ'-পদটীও স্বরূপাংশভূত বিশেষণমাত্র, উপলক্ষণ নহে। তারপর, ভেদবৃত্তি-প্রাধান্যভাবেই হউক, কিম্বা কেবল ভেদবৃত্তিতেই হউক, মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থ করিলে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ( ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ )-সমূহ অদ্বয়-জ্ঞানেও অপরিহার্য্য বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ঐশ্বর্য্যাদি-গুণরূপ ভগের সহিত ভগবানের অদ্বয়-জ্ঞানের দ্বারা একবস্তুত্বই সিদ্ধ হয়।"

ভগ এবং ভগবান্ পরব্রহ্ম—এই উভয়ে মিলিয়া একবস্তু হওয়ায় ভগ যে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপভূত—তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

## ৫৫। পরব্রহ্মের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যাদি গুণ তাঁহার উপাধি নহে।

উপাধি-শব্দের একটী আভিধানিক অর্থ আছে—বিশেষণ। সবিশেষ বস্তুমাত্রেরই এই বিশেষণার্থক উপাধি আছে। পরব্রহ্মও সবিশেষ, সুতরাং তাঁহারও এই বিশেষণার্থক উপাধি আছে। তবে ব্রহ্মরূপ সবিশেষ বস্তুর এবং অপর সবিশেষ বস্তুর পার্থক্য এই যে—ব্রহ্মের বিশেষণ বা বিশেষণার্থক উপাধি হইতেছে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত; অন্যান্য সবিশেষ বস্তুর মধ্যে সকলের বিশেষণ বা বিশেষণার্থক উপাধি স্বরূপভূত নহে, ইহা আগন্তুক।

পরব্রহ্মের উপাধি-বিচারে বিশেষণার্থক উপাধি আমাদের বিবেচ্য নহে। ন্যায়-শাস্ত্র-মতে উপাধির একটী পারিভাষিক অর্থ আছে। এই পারিভাষিক উপাধিই এ-স্থলে বিবেচ্য।

ন্যায়শাস্ত্র-মতে উপাধির লক্ষণ হইতেছে এইরূপ। "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপক স্তথা। স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বম্ উপাধিঃ।—যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু হেতুর ( বা সাধনের ) ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। যেমন, 'ধূমবান্ বহ্নি'-এস্থলে আর্দ্রকাষ্ঠত্ব হইতেছে উপাধি।"

বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়। এ-স্থলে ধূম হইল সাধ্যবস্তু; আর বহ্নি বা আগুন হইল তাহার হেতু বা সাধন; কেননা, আগুন না থাকিলে ধূমের উৎপত্তি হইতে পারে না।

আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু ধূমের হেতু বা সাধন যে বহ্নি, তাহাতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব নাই; যেহেতু, আগুন জ্বালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না। এ-স্থলে ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইল আগুনের উপাধি। আর্দ্রকাষ্ঠ বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব অগ্নির স্বরূপভূত বস্তু নহে; ইহা আগুনের বাহিরের একটী বস্তু, আগন্তুক। আর্দ্রতা হইতে যে ধূমের উৎপত্তি হয়, তাহাও অগ্নির স্বরূপভূত বস্তু নহে, আগন্তুক বস্তু মাত্র। এইরূপে দেখা গেল—ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির উপাধি যে আর্দ্রকাষ্ঠত্ব বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব, তাহাও অগ্নির স্বরূপভূত নহে, তাহা হইতে উৎপন্ন ধূমও অগ্নির স্বরূপভূত নহে; উভয়ই হইতেছে অগ্নির বহির্দ্দেশ হইতে আগত—আগন্তুক। এইরূপই হইল উপাধির স্বরূপ—উপাধি হইতেছে এমন একটী বস্তু, যাহা—যাহার উপাধি, তাহার—স্বরূপে অবস্থিত থাকে না, থাকে তাহার বাহিরে, বাহির হইতে আগন্তুকরূপে আসিয়া উপাধিবান্ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোৎপাদনের সহায়তা করে মাত্র।

ধূমোৎপাদনকার্য্যে আগন্তুক আর্দ্রত্ব ধূমোৎপাদনের সহায়তা মাত্র করে; ধূমোৎপাদন করে অগ্নি বা অগ্নির দাহিকা শক্তি। এই দাহিকা-শক্তি অগ্নির স্বরূপভূতা বলিয়া ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয় না।

পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা—স্বাভাবিকী। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ॥৬।৮॥" ব্রহ্মের পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তি যে অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় স্বাভাবিকী, আগন্তুকী নহে, এই শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। আর, এই স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ-সমূহও—অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকা-শক্তি হইতে উদ্ভূত উত্তাপের ন্যায়—ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণবলে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐশ্বর্য্যাদিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপভূত বলিয়া, আগন্তুক নহে বলিয়া, তাঁহার উপাধি নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—আর্দ্রকাষ্ঠের সহায়তায় অগ্নি ধূমোৎপাদন করে। পরব্রহ্মও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণের সহায়তায় নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। ধূমোৎপাদন-কার্য্যে অগ্নির সহায় হইল আর্দ্রকাষ্ঠ, আর ব্রহ্মের অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাঁহার সহায় হইল তাঁহার স্বরূপ-শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণ। আর্দ্র-কাষ্ঠও সহায়, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণও সহায়। এই অবস্থায়, আর্দ্রকাষ্ঠকে অগ্নির উপাধি বলা হয়, কিন্তু শক্তি বা ঐশ্বর্য্যাদি গুণকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ন্যায়-শাস্ত্রমতে উপাধি-বস্তুটী হইতেছে একটী আগন্তুক বস্তু, ইহা উপাধিবান্ বস্তুর স্বরূপভূত নহে। অগ্নির ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ সহায় হইলেও আর্দ্রকাষ্ঠ হইতেছে অগ্নির বহির্দ্দেশ হইতে আগত একটী আগন্তুক বস্তু; এজন্য ইহাকে অগ্নির উপাধি বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কার্য্যে ব্রহ্মের শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদিগুণ সহায় হইলেও ইহারা ব্রহ্মের বহির্দ্দেশ হইতে আগত আগন্তুক বস্তু নহে; ইহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত; এজন্য ইহাদিগকে ব্রহ্মের উপাধি বলা যায় না।

অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকা-শক্তিকে এবং তদুত্থ উত্তাপকে যেমন অগ্নির উপাধি বলা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপভূত স্বরূপ-শক্তিকে এবং তদুত্থ ঐশ্বর্য্যাদিগুণ-সমূহকেও ব্রহ্মের উপাধি বলা যায় না।

এ-সমস্ত কারণেই পরব্রহ্ম ভগবচ্ছব্দবাচ্য হইলেও—সুতরাং পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যাদি অনন্ত কল্যাণ গুণ থাকা সত্ত্বেও—তাঁহাকে "নিরুপাধি" বলা হয়।

"ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ॥
—সর্ব্বসম্বাদিনী ৭৩ পৃষ্ঠাধৃত পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড—প্রমাণ।"

এইরূপে দেখা দেল---পরব্রহ্মের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যাদিগুণ তাঁহার উপাধি নহে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## পরব্রহ্মের আকার-সম্বন্ধে আলোচনা

### ৫৬। প্রারম্ভিক আলোচনা

আকার, আকৃতি, রূপ এবং বিগ্রহ—এই সমস্তই একার্থক। আকার বা রূপ হইতেছে সবিশেষত্বের পরিচায়ক। সবিশেষ বস্তুরই আকার থাকিতে পারে। পরব্রহ্ম যখন সবিশেষ বস্তু, তখন তাঁহারও আকার বা রূপ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল এই সম্ভাবনা হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তাঁহার রূপ আছে; যেহেতু, প্রাকৃত জগতেও সবিশেষ অথচ নিরাকার বস্তু দৃষ্ট হয়। যেমন বায়ু। বায়ুর কোনও পরিদৃশ্যমান্ রূপ নাই; কিন্তু শব্দ-স্পর্শাদি গুণ আছে।

আধুনিক যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হয়; কিন্তু এই নিরাকার ব্রহ্মের কৃপাদি গুণ স্বীকৃত হয়। এই মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নিরাকার অথচ সবিশেষ। ইহা বেদান্ত-সম্মত কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

মহাত্মা যীশু-প্রবর্ত্তিত খ্রীস্ট-ধর্ম্মেও ঈশ্বরকে নিরাকার অথচ সবিশেষ বলা হয়। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মগ্রন্থে গড্ (ঈশ্বর), তাঁহার থ্রোণ (সিংহাসন) এবং সিংহাসনের এক পার্শ্বে যীশুখ্রীস্ট এবং অপর পার্শ্বে হলিঘোস্ট বা পবিত্র আত্মার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়—নিরাকার স্বরূপ ব্যতীতও একটী স্বরূপের ইঙ্গিত ঐ ধর্ম্মগ্রন্থে আছে। যাঁহার আকার নাই, তাঁহার উপবেশনের জন্য সিংহাসনেরই বা কি প্রয়োজন? তাঁহার পার্ষদই বা কিরূপে থাকিতে পারেন?

অধুনা মুসলমান-সমাজে যে সাধন-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা হইতে মনে হয়—মুসলমান্ ধর্ম্মেও ঈশ্বরকে নিরাকার অথচ সবিশেষ মনে করা হয়। দুই একজন মুসলমান সাধক এবং শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মৌলবীর সঙ্গে আলাপের ফলে মনে হইতেছে—কোরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের নিরাকার অথচ সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখই আছে; এতদ্ব্যতীত আরও একটী স্বরূপেরও একটু প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলিয়াও মনে হয়। মুসলমান-সাধকদের প্রার্থনীয় ধামের মধ্যে বেহেস্ত, আরস্, লা-মোকাম প্রভৃতি ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল ধামের প্রত্যেকটীই চিন্ময়, প্রত্যেকটীই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।" বেহেস্তে সাধনসিদ্ধ লোকগণ পরিচ্ছিন্ন দেহ পায়েন; এই দেহ চিন্ময় ও নিত্যকিশোর। বেহেস্তে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগের প্রবাহ বিদ্যমান। ইহা কতকটা হিন্দুদের স্বর্গের মতন। পার্থক্য এই যে—বেহেস্ত নিত্য, স্বর্গ অনিত্য; বেহেস্ত অপ্রাকৃত, চিন্ময়; স্বর্গ প্রাকৃত, জড়। পুণ্যকর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে জীবকে আবার মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু বেহেস্ত হইতে কাহাকেও ফিরিয়া আসিতে হয় না। বেহেস্ত-লাভ এক রকমের মুক্তি; কিন্তু স্বর্গলাভ মুক্তি নহে। সম্ভবতঃ বেহেস্তও পরব্যোমস্থ অনন্তসংখ্যক বৈকুণ্ঠেরই একটী বৈকুণ্ঠ।

আর, লা-মোকাম হইতেছে একটী নির্ব্বিশেষ ধাম ; এই ধামে পরিদৃশ্যরূপে কোনও কিছু নাই। লা-মোকাম হইতেছে হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সাযুজ্যকামী, তাঁহাদের লভ্য সিদ্ধলোকের অনুরূপ। আরস্‌ও একটী ধাম। এই ধামে ভগবানের দরবার হয়। এই দরবারে প্রধানতঃ চারিটী জিনিস আছে—আরস্, কুর্সি, লক্ ও কলম। আরস্ ও কুর্সি হইতেছে ভগবানের আসন ; আরস্ থাকে নীচে, তাহার উপরে কুর্সি বসান হয়। দরবারের সময়ে ভগবান্ এই কুর্সিতে উপবেশন করেন। কুর্সি বোধ হয় সিংহাসন-জাতীয় কোনও জিনিস। লক্ হইল স্কুল্-বোর্ডের মতন বা বড় শ্লেটের মতন একটা জিনিস—যাহাতে লিখিতে পারা যায়। কলম হইতেছে—লেখনী। ভগবান্ কলমের দ্বারা লক্-এ কোরাণের বাণী লিখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দরবারে ভগবানের পার্ষদগণও আছেন—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে ফেরিস্তা বলে। এই আরস্ ব্যতীত ভগবানের নাকি আরও একটী ধাম আছে ; সেই ধামে বহু শত বা বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে ভগবান্ অবস্থান করেন। কিন্তু সেই ধামে তিনি কি স্বরূপে আছেন, কি করেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাকি শাস্ত্রে নাই। নিত্যসিদ্ধ ফেরিস্তা বা সাধনসিদ্ধ জনগণেরও নাকি সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার নাই। হজরত মহম্মদ নাকি এক সময়ে কয়েকটী পর্দ্দা অতিক্রম করিয়া কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ; তখনই ভগবান্ সেই স্থানে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন। হজরতের সঙ্গে তখন নাকি ভগবানের কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ কি স্বরূপে হজরতকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাকি মুসলমান-শাস্ত্রে নাই। হজরত-মুসাও নাকি একবার ভগবদ্দর্শন পাইয়াছিলেন—এই দর্শন নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নহে। জ্যোতিঃস্বরূপের দর্শন নাকি তিনি প্রথমেই একবার পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হওয়ায় ভগবানের দর্শনের জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন ; তদনুসারে ভগবান্ কৃপা করিয়া এক পর্ব্বতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শন পাইয়া হজরত-মুসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি স্বরূপের দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

যাহা হউক, আরস্-ধামে দরবারগৃহে বসিবার কুর্সি, বহু সহস্র পর্দ্দার অন্তরালে ভগবানের অবস্থান, হজরত-মহম্মদের ভগদ্দর্শন ও ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন, হজরত-মুসার জ্যোতিঃস্বরূপের অতীত অপর একটী স্বরূপের দর্শনাদির উল্লেখ হইতে অনুমিত হয়, মুসলমান-শাস্ত্রে নিরাকার স্বরূপ ব্যতীত আরও একটী স্বরূপের ইঙ্গিতও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্বরূপটী সাকার বলিয়াই মনে হয়। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত থ্রোণ ( সিংহাসন ) এবং পার্ষদাদি হইতেও সাকার স্বরূপই অনুমিত হয়।

কিন্তু আমাদের প্রধান এবং একমাত্র অনুসন্ধেয় হইতেছে শ্রুতি-বাক্য। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"-প্রভৃতি বেদান্ত-সূত্র অনুসারে পরব্রহ্মের তত্ত্ব-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রুতিই হইতেছে একমাত্র প্রমাণ।

এক্ষণে আমরা শ্রুতিবাক্যের এবং শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র-বাক্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

## ৫৭। শ্রুতিতে পরব্রহ্মের আকার-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি

শ্রুতিতে পরব্রহ্মের আকার বা রূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। (ক) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; (খ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে রূপের উল্লেখ না থাকিলেও

ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু, মন-আদির—কার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; (গ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের বিগ্রহের স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয় ; (ঘ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের কর-চরণাদির অস্তিত্ব নাই বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু কর-চরণাদির ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; আবার (ঙ) কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে রূপহীনও বলা হইয়াছে।

আপাতঃদৃষ্টিতে এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের একটা সমাধান অবশ্যই থাকিবে ; যেহেতু, কোনও শ্রুতিবাক্যই যে নিরর্থক নহে, সকল শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যত্বই যে সমান, "প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩।২।১৫॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন—"ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ ॥ —বেদবাক্য-সমূহের মধ্যে কোনওটী অর্থযুক্ত, কোনওটী নিরর্থক—এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে ; যেহেতু, প্রমাণত্ব-বিষয়ে কোনও বেদবাক্যের কোনওরূপ বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ সকল বেদবাক্যেরই সমান প্রমাণত্ব।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৭৬-৯৬ পৃষ্ঠায় ) পরব্রহ্মের রূপাদিসম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে তাঁহারই আনুগত্যে পরব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধীয় কয়েকটী শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইতেছে।

## ৩৮। পরব্রহ্মের রূপের ইঙ্গিতপূর্ণ শ্রুতিবাক্য

(১) **মুণ্ডক-শ্রুতি** বলেন—

**ক।** "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ **দৃষ্টে** পরাবরে ॥ ২।২।৮ ॥

—সেই পরব্রহ্মের **দর্শন পাইলে** হৃদয়গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে দর্শন করার কথা বলা হইয়াছে ; ইহাতে বুঝা যায়—পরব্রহ্মের রূপ আছে। রূপহীন বস্তুর দর্শন সম্ভব নয়। রূপহীন বায়ুকে বা কোন বায়বীয় পদার্থকে দর্শন করা যায় না। দর্শন হইতেছে চক্ষুর কার্য্য। যাহার বাস্তব কোনও দৃশ্যমান্ রূপ নাই, তাহা কখনও চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারে না। কল্পিত বস্তুরও দর্শন হইতে পারে না ; আকাশ-কুসুমের কল্পনা করা যায় ; কিন্তু তাহার দর্শন হয় না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনিতে ( ৮০ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন—"দর্শনাদিক্রিয়ায়াং ন মনোরথকল্পনামাত্রত্বং চিন্ত্যম্—দর্শনাদিক্রিয়ায় 'মনোরথ-কল্পনামাত্র' অর্থ করা সঙ্গত নহে।" বেদান্তের "ঈক্ষতিকর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।১৩॥"—সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটী শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—'যঃ পুনরেতম্ ত্রিমাত্রেণ ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। প্রশ্নোপনিষৎ ॥ ৫।৫॥—যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কারের দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোরূপ সূর্য্যের

সহিত এক হইয়া যায়েন।” এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত “অভিধ্যায়ীত” শব্দের প্রসঙ্গে শ্রীপাদশঙ্কর বলিয়াছেন—“অত্র অভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি বস্তু কর্ম্ম ভবতি মনোরথকল্পিতস্যাপি অভিধ্যায়তিকর্ম্মকত্বাৎ। ঈক্ষতেস্তু তথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্ম্ম দৃষ্টম্ ইত্যতঃ পরমাত্মা এব অয়ম্ সম্যগ্‌দর্শন-বিষয়ভূতঃ ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেন ব্যপদিষ্ট গম্যতে।—এস্থলে-‘অভিধ্যায়তি’ এই ক্রিয়াপদের কর্ম্ম অতথাভূত বস্তুও হইতে পারে, মনোরথ-কল্পিত বস্তুও হইতে পারে। কিন্তু ঈক্ষণের (দর্শনের) কর্ম্ম তথাভূতই (বাস্তব বস্তুই) হইয়া থাকে; লৌকিক জগতেও দেখা যায়—লোকে যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তাহাই ঈক্ষণের (দর্শনের) কর্ম্ম হয়। অতএব (মূল-বেদান্তসূত্রে –ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ-সূত্রে) এই পরমাত্মাই সম্যক্‌রূপে দর্শনের বিষয়ভূত—ইহাই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।” এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিলেন—দর্শনের বিষয় যাহা, তাহা বাস্তব বস্তুই। ধ্যান—কল্পিত বস্তুরও হইতে পারে, যেমন লোকে কল্পিত আকাশ-কুসুমেরও ধ্যান করিতে পারে। কিন্তু কল্পিত বস্তুর দর্শন সম্ভব নহে। রূপহীন বস্তুর দর্শনও সম্ভব নহে।

সুতরাং উল্লিখিত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

খ। “হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ মুণ্ডক॥ ২।২।৯॥

—এই ব্রহ্ম নিষ্কল, বিরজ (মায়াতীত); তিনি শ্রেষ্ঠ হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) কোশে বর্ত্তমান; তিনি জ্যোতিঃসমূহের (জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরও) শুভ্র জ্যোতিঃ; আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানেন।”

এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্ম্ময়-রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জ্যোতির্ম্ময়-রূপ হইতেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকে।

গ। “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ববম্
তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি॥
—মুণ্ডক॥ ২।২।১০; কঠোপনিষৎ॥ ২।২।১৫॥

—সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নির কথা আর কি-ই বা বলা যাইবে? সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়াই (সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই) সূর্য্যাদি সকলে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ব্রহ্মের জ্যোতিতেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

(২) **প্রশ্নোপনিষৎ** বলেন—

"যঃ পুনরেতম্ ত্রিমাত্রেণ এব ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবম্ হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্ম-লোকম্। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ **ঈক্ষতে**॥ ৫।৫॥—যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত 'ওম্' এই অক্ষরদ্বারাই পরম-পুরুষের ধ্যান—উপাসনা করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যের সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্প যেরূপ তাহার ত্বক্‌কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তিনিও তদ্রূপ পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয়েন। তিনি সামবেদ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েন। তিনি এই জীবঘন (হিরণ্যগর্ভ) হইতেও উত্তম—হৃদয়স্থ পুরুষকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করেন।"

এই শ্রুতিবাক্যেও পরমাত্মাকে—পরব্রহ্মকে—দর্শন করার কথা পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যেও পরব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দৃষ্ট হইতেছে।

(৩) **বৃহদারণ্যক-শ্রুতি** বলেন :—

**ক**। "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি॥ ৪।৩।৫॥—রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—আদিত্য ও চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে এবং অগ্নি শান্ত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃ অবলম্বন করেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তৎকালে বাক্‌ই পুরুষের জ্যোতিঃ রূপে পরিগৃহীত হয়েন। তিনি বাক্যদ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের বাক্‌কেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরও জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে; সুতরাং এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

**খ**। "অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তে অগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি॥ ৪।৩।৬

—রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—আদিত্য ও চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি শান্ত হইলে এবং বাক্যও নিরস্ত হইলে পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃ অবলম্বন করেন? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তৎকালে আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃরূপে পরিগৃহীত হয়েন। তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে "আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ"-বাক্যে ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

### (৪) তৈত্তিরীয়-শ্রুতিবাক্য :—

"সুবর্ণজ্যোতিঃ॥ ৩।১০।৬॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটী সুবর্ণ-জ্যোতির্বিশিষ্ট রূপের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়।

### (৫) মহানারায়নোপনিষদ্ বাক্য :—

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি॥ ১।৮॥

—বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষসকল উৎপন্ন হইয়াছে।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটী বিদ্যুদ্বর্ণ রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

**(৬) ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্য ঃ—**

**ক।** “শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে ॥ ৮।১৩।১॥

—শ্যাম হইতে শবলকে আশ্রয় করি ; শবল হইতে শ্যামকে আশ্রয় করি।”

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের অনুগত শ্রীমৎ গোপালানন্দস্বামী উক্তবাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—শ্যামাৎ—দিব্যবিগ্রহযোগেন ইদং দিব্যাকারং সাক্ষাৎ প্রপদ্য—ধ্যাত্বা শবলম্–মিশ্রম্–চিদচিন্মিশ্রং চিচ্ছরীরকমচিচ্ছরীরকম্ চ প্রপদ্যে ধ্যায়ামি। শবলাৎ তস্মাৎ—তং ধ্যাত্বা পুনঃ শ্যামং দিব্যাকারং সাক্ষাৎ পরমাত্মানং প্রপদ্যে—ধ্যায়ামীতি।

এই টীকার তাৎপর্য্যে বুঝা যায়—শ্যাম হইতেছেন সাক্ষাৎ পরমাত্মা-ব্রহ্ম। তিনি দিব্যাকার এবং দিব্যবিগ্রহযোগেই এই দিব্যাকারত্ব।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের একটী দিব্যাকার রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

**খ।** মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ৩।১৪।২॥

—ব্রহ্ম মনোময় (বিশুদ্ধমনোগ্রাহ্য), প্রাণশরীর (জীবদেহে-পরমাত্মারূপে-অবস্থিত), ভাস্বরূপ (জ্যোতিঃস্বরূপ), সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা (সর্ব্বব্যাপক), সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। তিনি এই সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিনি (পরিপূর্ণ বলিয়া) অবাকী, (কোনও বস্তুতে তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া) তিনি অনাদর।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে “ভারূপ—জ্যোতিঃস্বরূপ” বলাতে একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। সত্যসঙ্কল্পত্বাদিতেও রূপের ইঙ্গিত (মনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত) পাওয়া যাইতেছে।

(গ) “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেম্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥৩।১৩।৭॥—এই স্বর্গলোক হইতেও উৎকৃষ্ট যে জ্যোতিঃ দীপ্ত হয়েন, বিশ্বের উত্তম অনুত্তম সকল লোকেই যে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দীপ্ত হয়েন, ইনিই সেই ব্রহ্ম। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতিঃরূপে বিরাজ করেন।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের এক জ্যোতির্ম্ময় রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৭) **ব্রহ্মসূত্র**-বাক্য ঃ—

“জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥১।১।২৫॥”, “জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥১।৩।৩২”, ॥ “জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥১।৩।৪৫॥”, “জ্যোতিরুপক্রমাৎ তু তথাহ্যধীয়ত একে ॥১।৪।৯॥” এবং “জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥ ২।৪।১৪॥” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে “জ্যোতিঃ”-শব্দে ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতেও এইরূপ একটী ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মের একটী জ্যোতির্ম্ময় রূপ আছে।

(৮) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**-বাক্য ঃ—

পূর্ব্বালোচিত শ্রুতিবাক্যসমূহে এবং ব্রহ্মসূত্র-সমূহে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের যে জ্যোতির্ম্ময় একটী রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

> "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১৫।১২॥

—সূর্য্যে অবস্থিত যে তেজঃ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজঃ চন্দ্রে অবস্থিত, অগ্নিতে অবস্থিত, তাহাকে আমারই তেজঃ বলিয়া জানিবে।"

এ-স্থলেও তেজোবান্ এক পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গীতাবাক্যের মর্ম্ম হইতে জানা যায়—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"-বাক্যে কঠোপনিষৎ এবং মুণ্ডকোপনিষৎ যাঁহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, গীতার এই তেজোবান্-জ্যোতির্ম্ময়-পুরুষ সেই পরব্রহ্মই। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং জ্যোতিঃ তাঁহার ধর্ম্ম, জ্যোতিঃ তাঁহার রূপের ধর্ম্ম।

## ৫৯। পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-সাধ্য-কার্য্যবাচক শ্রুতিবাক্য

ক। **ছান্দোগ্য-শ্রুতি**-বাক্য ঃ—

> "তদ্ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥৬।২।৩॥

—সেই ব্রহ্ম চিন্তা ( সঙ্কল্প ) করিলেন—আমি বহু হইব।"

সঙ্কল্প বা চিন্তা হইতেছে মনের কার্য্য। এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের মনের কার্য্যের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, তাঁহার **মন** আছে।

ঈক্ষ-ধাতু হইতে "ঐক্ষত।" ঈক্ষ-ধাতুর অর্থ—দর্শন। দর্শন বলিতে প্রণিধানও ( চিন্তা, সঙ্কল্প ) বুঝায়, চক্ষুর্দ্বারা দর্শনও বুঝায়। "ঈক্ষ দর্শনে। দর্শনমিহ চাক্ষুষজ্ঞানং প্রণিধানঞ্চ। শব্দকল্পদ্রুম-পরিশিষ্ট ॥" ঈক্ষ-ধাতুর চাক্ষুষ-দর্শন অর্থ ধরিলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ অর্থও হইতে পারে ঃ—

"সেই ব্রহ্ম দর্শন করিলেন। আমি বহু হইব ( এইরূপ সঙ্কল্পও করিলেন )।" অর্থাৎ বহু হওয়ার সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্ম ( সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতির প্রতি ) দৃষ্টি করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে বলিয়াছেন—

> "ভগবান্ বহু হৈতে—যবে কৈল মন।
> প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৩৬॥"

এই পয়ারে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-স্থলে প্রাকৃতশক্তি—প্রকৃতি, মায়া।

এইরূপ অর্থে ব্রহ্মের **দর্শনেন্দ্রিয়ের** বা **চক্ষুর** কথাও জানা যায়।

ছান্দোগ্য অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"অহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি।৬।৩।২॥

—তেজ, জল ও অন্ন সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম ভাবিলেন—আমি জীবরূপ আত্মাদ্বারা তেজ, জল ও অন্ন—এই তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব।"

চিন্তা বা ভাবনা হইতেছে মনের কার্য্য। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের **মন** আছে বলিয়া জানা যায়।

**খ। ঐতরেয়-শ্রুতিবাক্য ঃ—**

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১।১॥

—তিনি ( সেই ব্রহ্ম ) সঙ্কল্প করিলেন—লোক সৃষ্টি করিবেন।" অথবা—"লোক সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি ( মায়ার প্রতি ) দৃষ্টি করিলেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের **মন** এবং **চক্ষু** আছে বলিয়া জানা যায়।

**উপসংহার**। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সাধ্য ক্রিয়ার —দর্শন, মননাদির—উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে দুইটী বিষয় অনুমিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-সাধ্য-ক্রিয়ার উল্লেখেই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্যের উল্লেখে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হয় না। "রামের চক্ষু আছে, তাই তিনি বৃক্ষটী দেখিলেন"—ইহা না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয়—"রাম বৃক্ষটী দেখিলেন।" দর্শন-ক্রিয়ার উল্লেখেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। "ব্রহ্ম দর্শন করিলেন, মনন করিলেন" —ইত্যাদি উক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের দর্শনেন্দ্রিয়ের এবং মননেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৫৮-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে ব্রহ্মের রূপের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক হয় না যে, ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

## ৬০। ভঙ্গীতে রূপবাচক শ্রুতিবাক্য

শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যও দৃষ্ট হয়, যাহাতে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের রূপের কথা না থাকিলেও ভঙ্গীপূর্ব্বক তাহা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে এইরূপ একটী বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সঃ অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৭।১॥ —যেই আত্মার ( ব্রহ্মের ) পাপ নাই, জরা ( বার্দ্ধক্য ) নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই এবং যেই আত্মা সত্যকাম ( যাহাই ইচ্ছা করেন, তাহাই যাঁহার সত্য হয় ) এবং সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, সেই আত্মা সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।"

এ-স্থলে অপহতপাপ্মা-আদি এবং সত্যসঙ্কল্প-আদি কয়েকটী বিশেষণে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প—এই দুইটী বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মের মনের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে ; যেহেতু,

কামনা এবং সঙ্কল্প মনেরই ধর্ম্ম। মনের উপলক্ষণে ইন্দ্রিয়াদির কথাও বলা হইয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়াদি থাকে দেহে। সুতরাং এই দুইটী বিশেষণের দ্বারা, হয়তো একটু প্রচ্ছন্নভাবেই, ব্রহ্মের দেহের বা বিগ্রহের কথাও বলা হইয়াছে।

অপহতপাপ্মা-আদি বিশেষণের দ্বারা এই দেহের বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা হইয়াছে—এই দেহের জরা নাই, মৃত্যু নাই, ইত্যাদি। জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, পাপ, মৃত্যু—এই সমস্তই হইতেছে দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তু। দেহেরই জরা বা বার্দ্ধক্য, দেহেরই মৃত্যু, দেহেরই ক্ষুৎ-পিপাসা, দেহেরই শোক-তাপ এবং পাপ। সুতরাং এই সমস্ত বিশেষণেও দেহেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জরা-মৃত্যু-আদি দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও কেবলমাত্র প্রাকৃত-সৃষ্ট-দেহের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট। অপহতপাপ্মাদি কয়েকটী বিশেষণে বলা হইল—ব্রহ্মের দেহ প্রাকৃত দেহ নহে, ইহা অপ্রাকৃত দেহ।

## ৬১। ব্রহ্মের বিগ্রহের স্পষ্টোল্লেখ-সূচক শ্রুতিবাক্য

(১) **মুণ্ডক-শ্রুতিতে** আছে ঃ—

**ক**। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে **রুক্মবর্ণং** কর্ত্তারমীশং **পুরুষং** ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩।১।৩॥ —যখন কেহ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মযোনি **রুক্মবর্ণ পুরুষকে** দর্শন করেন, তখন তাঁহার পুণ্যপাপরূপ সমস্ত কর্ম্মফল বিধৌত হইয়া যায়, মায়ার অঞ্জন-রহিত হইয়া তিনি বিদ্বান্ ( পরাবিদ্যাযুক্ত ) হয়েন এবং ( সেই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনজনিত যে প্রভাবে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে, সেই প্রভাব-বিষয়ে ) তিনিও ( রুক্মবর্ণ পুরুষের সঙ্গে ) পরম-সাম্য লাভ করেন )।"

এস্থলে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি যে **রুক্মবর্ণ** ( স্বর্ণবর্ণ ) **পুরুষ**, তাহাই স্পষ্ট কথায় বলা হইয়াছে। দর্শন-ক্রিয়ার ( পশ্যতে-ক্রিয়াপদের ) কর্ম্ম রুক্মবর্ণ পুরুষ রূপহীন বায়বীয় পদার্থ হইতে পারেন না ( ১।১।৫৮-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )।

**খ**।　　"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩।২।৩॥

—এই আত্মা ( পরব্রহ্ম ) বেদশাস্ত্রাধ্যায়নবহুল-প্রবচনের দ্বারা লভ্য নহেন, মেধা ( গ্রন্থার্থ-ধারণ-শক্তির ) দ্বারা লভ্য নহেন, প্রচুর বেদবাক্য-শ্রবণদ্বারাও লভ্য নহেন। ইনি যাঁহাকে বরণ ( কৃপা ) করেন, তিনিই ইঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটে ইনি ( এই পরব্রহ্ম ) স্বীয় **তনুও** দান করেন।

এই বচনটী **কঠোপনিষদেও** দৃষ্ট হয় ( ২।২৩ )।

এ-স্থলে পরব্রহ্মের তনুর বা **শরীরের** কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) **মহানারায়ণোপনিষৎ** বলেন ঃ—

"ন সন্দৃশ্যে তিষ্ঠতি **রূপমস্য** ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ॥১।১১॥ —এই পরব্রহ্মের **রূপ** কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না।"

এ-স্থলেও পরব্রহ্মের রূপের কথা বলা হইল ; তাহা কিন্তু ( লোকের প্রাকৃত ) চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাহাই বলা হইল।

(৩) **শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি** বলেন ঃ—

"বেদাহমেতং পুরুষং **মহান্তমাদিত্যবর্ণং** তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥৩।৮

—মায়ার অতীত সেই **আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে** আমি জানি। তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে "মহান্ পুরুষ" বলা হইয়াছে, তাঁহাকে **আদিত্যবর্ণ**—সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট—পরম-জ্যোতির্ম্ময়—বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বলা হইল—মহান্ পুরুষ পরব্রহ্মের **রূপ** আছে।

(৪) **ছান্দোগ্য-উপনিষদে** বলা হইয়াছে ঃ—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ১।৬।৬॥ তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্ এবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ১।৬।৭॥

—এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ আছেন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, তাঁহার কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সমস্তই সুবর্ণ—সুবর্ণবর্ণ। তাঁহার নয়নদ্বয় সূর্য্যকিরণে সম্যক্ প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। তাঁহার নাম—উৎ। সমস্ত পাপরাশি অতিক্রম করিয়া তিনি উদিত হইয়াছেন। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে—যিনি "অপহত-পাপ্মা", "যাঁহাকে জানিলে সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়।" ইহাও বলা হইয়াছে—তাঁহার শ্মশ্রু আছে, কেশ আছে, নখ আছে, নয়ন আছে। এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের **রূপ-সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনাই** দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার নয়নদ্বয়—পুণ্ডরীকসদৃশ। পুণ্ডরীক-শব্দের অর্থ শ্বেতপদ্ম। "পুণ্ডরীকং শ্বেতাম্ভোজম্। অমর-কোষ॥" কি রকম পুণ্ডরীক, তাহাও বলা হইয়াছে—"কপ্যাসম্"—এই বিশেষণের দ্বারা। "কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্"। কপ্যাস-শব্দের কয়েক রকম অর্থই হইতে পারে ; কিন্তু সকল রকম অর্থের তাৎপর্য্য একই। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—কপি + আস। কপি-শব্দের অর্থ সূর্য্য—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ সূর্য্যঃ—ক-শব্দের অর্থ জল ; তাহা যিনি পান করেন—কিরণদ্বারা বাষ্পরূপে আকর্ষণ করেন, তিনি কপি—সূর্য্য।" আর, আস-শব্দের অর্থ এইরূপ। অস্-ধাতু হইতে আস-শব্দ নিষ্পন্ন। অস্-ধাতু বিকসনার্থক। এইরূপে আস-শব্দের অর্থ—বিকসিত। এইরূপে "কপ্যাস"-শব্দের অর্থ হইল—সূর্য্যদ্বারা বিকসিত, সূর্য্যকিরণে সম্যক্ প্রস্ফুটিত—সুতরাং পরম-শোভাসম্পন্ন, প্রফুল্ল। শ্রীমৎগোপালানন্দস্বামী অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন ; "কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালম্। তত্র আস্তে ইতি কপ্যাসম্।—যাহা জল আকর্ষণ করে, তাহা কপি

( ক—জল )—নাল, পদ্মের মৃণাল। সেই মৃণালে যাহা অবস্থিত, তাহা কপ্যাস—সনাল। "সনালমিতি যাবৎ, নালতো বিভক্তে পুণ্ডরীকে লেশতো ম্লানেঃ প্রসক্তিরিতি সা ব্যবর্ত্ত্যতেঽনেন—পদ্মের নাল হইতে যদি পদ্মকে পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে পদ্ম কিছু ম্লান হইয়া যায়। নালের সঙ্গে জলের মধ্যে যথাবস্থিত অবস্থায়—অচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে পদ্ম বেশ সমুজ্জ্বল থাকে; কপ্যাস-শব্দের 'সনাল—নালযুক্ত' অর্থে তাহাই বুঝাইতেছে।" সরোবরে মৃণালের উপরে অচ্ছিন্ন অবস্থায় পদ্ম যেমন অম্লান—প্রফুল্ল—পরম-শোভাসম্পন্ন থাকে, হিরণ্ময় পুরুষের নয়নদ্বয়—তদ্রূপ প্রফুল্ল—শোভাসম্পন্ন। আর এক রকম অর্থও তিনি করিয়াছেন। "অসধাতুরপিপূর্ব্বকঃ, 'বৃষ্টিবাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরূপসর্গয়ো' রিতি বচনাৎ অকারলোপঃ। কে—জলে অপ্যাস্তে ইতি কপ্যাসং সলিলে বর্ত্তমানম্। সলিলাৎ উদ্ধৃতে লেশতো ম্লানিসম্ভাবনয়া সলিলস্থমিতি বিশেষণম্।" তাৎপর্য্য এই—ক+অপ্যাস=কপ্যাস। সন্ধি করিলে ক+অপ্যাস=কাপ্যাস হওয়ার কথা; কিন্তু "বৃষ্টিবাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরূপসর্গয়োঃ"—এই প্রমাণ অনুসারে "অপ্যাস"-শব্দের প্রথম "অ-কার" লোপ পায় বলিয়া "কাপ্যাস" না হইয়া "কপ্যাস" হইয়াছে। অপি-পূর্ব্বক আস্ ধাতু হইতে "অপ্যাস"-শব্দ নিষ্পন্ন। কে ( জলে ) অপ্যাস্তে ( বর্ত্তমান )=কপ্যাস—সলিলে বর্ত্তমান। যে পুণ্ডরীক সলিলে বর্ত্তমান, তাহাই কপ্যাস পুণ্ডরীক। জল হইতে তুলিয়া আনিলে পদ্ম কিছু ম্লান হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কপ্যাস-শব্দের—"সলিলে বর্ত্তমান" অর্থ করিলে ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যে পদ্ম স্বাভাবিক অবস্থাতে নালের সহিত জলেই থাকে, তাহা যেমন সর্ব্বদা অম্লান, প্রফুল্ল, শোভাসম্পন্ন, হিরণ্ময় পুরুষের নয়নদ্বয়ও তদ্রূপ সদা প্রফুল্ল, শোভমান—ইহাই তাৎপর্য্য।

(৫) **বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও** পরব্রহ্মের রূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

**আলোচনার পূর্ব্বাভাস।**

প্রশ্নোপনিষদে পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম-এই দুই ব্রহ্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ওঙ্কারঃ ॥৫।২॥ —হে সত্যকাম! যাহা 'ওঙ্কার' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।"

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—"পরং সত্যম্ অক্ষরম্ পুরুষাখ্যম্—সত্য, অক্ষর ( অবিনাশী ) পুরুষাখ্য ব্রহ্মাই পরব্রহ্ম।" আর "অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ—প্রাণনামক যে পদার্থটী প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই অপর ব্রহ্ম।" প্রশ্নোপনিষদে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"আত্মন এষ প্রাণোজায়তে ॥৩।৩॥ —আত্মা ( পরব্রহ্ম ) হইতে প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে।" এইরূপে জানা গেল—প্রাণ হইল সৃষ্ট বস্তু। এই সৃষ্ট বস্তু প্রাণকেই অপর ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। প্রাণ যেমন পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তদ্রূপ সমগ্র সৃষ্ট-বিশ্বও পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ। ১।১।২ ॥", "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥"—এই সকল ব্রহ্মসূত্র অনুসারে জানা যায়—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়াই পরব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। "অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥" এবং "সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নানাৎ ॥১।৪।২৫॥"-প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র-অনুসারে জানা যায়—জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান

কারণও পরব্রহ্মই। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বও যে পরব্রহ্মের একটী রূপ, তাহাই বুঝা যায়। উল্লিখিত প্রশ্নোপনিষদের বাক্যে সৃষ্ট-প্রাণের উপলক্ষণে সমগ্র-সৃষ্ট-বিশ্বকেই অপর ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের অ-পররূপ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "ওঁম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বম্। তস্য উপব্যাখ্যানম্ ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব ॥ মাণ্ডুক্য ॥১॥ —এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই 'ওম্'-এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারস্বরূপই।"

এই বাক্যে বলা হইল—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের অধীনে যে বিশ্ব, তাহাও ওঙ্কার-ব্রহ্ম ( ওম্ ইতি ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥৮।১॥ ) এবং ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ওঙ্কার বা ব্রহ্ম। শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে লিখিয়াছেন—"তস্য এতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্য অক্ষরস্য ওম্ ইতি এতস্য অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানম্।" সুতরাং এ-স্থলে কালত্রয়ের অধীন বিশ্বকেই অপর ব্রহ্ম এবং কালাতীত ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের—বৃহদারণ্যকে পরব্রহ্মের রূপের উল্লেখের কথা—আলোচনা করা যাইতেছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে প্রথমে এই অপর-ব্রহ্মের রূপের কথা বলিয়া তাহার পরে পরব্রহ্মের রূপের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে এই শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চ এব অমূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চ অমৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ॥২।৩।১॥ —ব্রহ্মের দুইটী রূপ—মূর্ত্ত (সাবয়ব—সাকার) এবং অমূর্ত্ত ( নিরবয়ব—নিরাকার )। তন্মধ্যে, মূর্ত্তরূপ হইতেছে —মর্ত্ত্য ( মরণশীল, নশ্বর ), স্থিত ( পরিচ্ছিন্ন ) এবং সৎ ( উদ্ভূতরূপ-বিশিষ্ট বা দৃশ্যমান্ রূপবিশিষ্ট ); আর, অমূর্ত্ত হইতেছে—অমৃত ( স্থায়ী ), যৎ ( ব্যাপক ) এবং ত্যৎ ( অনুদ্ভূতরূপবিশিষ্ট বা পরিদৃশ্যমান্ রূপহীন )।

ইহার পরে—কোন্ কোন্ বস্তু মূর্ত্ত এবং কোন্ কোন্ বস্তু অমূর্ত্ত তাহাও বলা হইয়াছে।

"তদেতৎ মূর্ত্তং যদ্ অন্যৎ বায়োশ্চ অন্তরিক্ষাৎ চ এতৎ মর্ত্ত্যম্ এতৎ স্থিতম্ এতৎ সৎ তস্য এতস্য মূর্ত্তস্য এতস্য মর্ত্ত্যস্য এতস্য স্থিতস্য এতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হি এষ রসঃ ॥ বৃ, আ, ২।৩।২॥ অথ অমূর্ত্তং বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষঞ্চ এতদ্ অমৃতম্ এতদ্ যৎ এতদ্ ত্যম্ তস্য এতস্য অমূর্ত্তস্য এতস্য অমৃতস্য এতস্য যত এতস্য ত্যস্য এষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ তস্য হি এষ রসঃ ইতি অধিদৈবতম্ ॥ ২।৩।৩॥

—( পঞ্চমহাভূতের মধ্যে ) বায়ু ও আকাশ ব্যতীত অপর ভূতত্রয়কে (ক্ষতি, অপ্ এবং তেজকে ) বলা হয় মূর্ত্ত। এই মূর্ত্ত ( ভূতত্রয় ) হইতেছে—মর্ত্ত্য ( নশ্বর ), স্থিত ( পরিচ্ছিন্ন ), সৎ ( পরিদৃশ্যমান্ রূপ-বিশিষ্ট )। এই মূর্ত্তকে, এই মর্ত্ত্যকে, এই স্থিতকে এবং এই সৎকে—অর্থাৎ মূর্ত্তত্বাদি-গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট ক্ষিতি-অপ্-তেজোরূপ ভূতত্রয়কে—যিনি উত্তাপ দান করেন, তিনি ( সেই সবিতা বা সূর্য্য ) হইতেছেন এই গুণত্রয়ের রস বা সার। আর, বায়ু ও আকাশ—এই ভূতদ্বয় হইতেছে অমূর্ত্ত ( পরিদৃশ্যমান্ রূপহীন )। ইহা ( এই ভূতদ্বয় ) হইতেছে—অমৃত ( ক্ষিতি-আদি-ভূতত্রয়ের তুলনায় অধিককালস্থায়ী ), যৎ ( গমনশীল—কেবল সম্মুখের দিকেই যাহা গমন করে, শেষ সীমা পায় না ; সুতরাং ব্যাপক ) এবং ত্যৎ ( অচাক্ষুষ—দৃশ্যমান্

রূপহীন )। এই অমূর্ত্তত্বাদি গুণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট—বায়ু ও আকাশ—এই ভূতদ্বয়ের সার হইতেছেন সবিতৃমণ্ডল-মধ্যস্থিত পুরুষ। এই অধিদৈবত ব্যাখ্যাত হইল।”

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই যে দুইটী রূপের কথা বলা হইল, সেই দুইটী রূপের মধ্যে একটী হইতেছে—ক্ষিতি, অপ্ (জল) এবং তেজঃ—এই ভূতত্রয় এবং অপরটী—বায়ু ও আকাশ। প্রথম ভূতত্রয় স্থূল—পরিদৃশ্যমান্—বলিয়া মূর্ত্ত এবং অপর ভূতদ্বয় স্থূলভূতত্রয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম—সুতরাং পরিদৃশ্যমান্ নহে—বলিয়া অমূর্ত্ত। এই দুইটী রূপের দ্বারা প্রাকৃত পঞ্চভূত—সৃষ্ট-বস্তুই—লক্ষিত হইয়াছে ; সুতরাং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই দুইটী রূপই হইতেছে অপর-ব্রহ্মের।

ইহার পরে ২।৩।৪ বাক্যে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—পূর্ব্বোল্লিখিত মূর্ত্তরূপের সার হইতেছেন চক্ষু এবং ২।৩।৫-বাক্যে বলিয়াছেন—অমূর্ত্তরূপের সার হইতেছেন—দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ। ইনিই সমস্তের কারণ—পরব্রহ্ম। তাহার পরে এই কারণাত্মক পুরুষের বা পরব্রহ্মের রূপের কথা বলা হইয়াছে।

“তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাহগ্ন্যর্চ্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্‌বিদ্যুত্তং সকৃদ্‌বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদ অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হি এতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরম্ অস্তি অথ নামধেয়ম্ সতস্য সত্যম্ ইতি প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২।৩।৬॥

—এই পুরুষের রূপ এই প্রকার। তাঁহার রূপ হইতেছে হরিদ্রারঞ্জিত বসনের ন্যায় পীতবর্ণ, রোমজ-বসনের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ-নামক কীটবিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নি-শিখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পুণ্ডরীকের ( শ্বেত পদ্মের ) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ক্ষণ-প্রভা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল-বর্ণ বিশিষ্ট। যিনি এই পুরুষকে জানেন, তিনি বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল-শ্রীসম্পন্ন হয়েন। অতঃপর এই পুরুষের স্বরূপের উপদেশ করিতেছেন—নেতি নেতি—ন ইতি ( ইয়ত্তা ), ন ইতি ( ইয়ত্তা )—ইহাই ইয়ত্তা নহে। এই পুরুষ অপেক্ষা ( এই পুরুষের অতিরিক্ত ) বস্তু কিছু নাই, এই পুরুষ অপেক্ষা পর—শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ; ইঁহার নাম—সত্যের সত্য। প্রাণসমূহ ( জীবস্বরূপ-সমূহ ) হইতেছে সত্য ; এই পুরুষ প্রাণসমূহেরও সত্য।”

**আলোচনা।** মহারজন-শব্দের অর্থ হরিদ্রা। মাহারজন=হরিদ্রাসমন্ধী, হরিদ্রারঞ্জিত, পীত। পাণ্ড্বাবিক=পাণ্ডু+আবিক=আবিকের ন্যায় পাণ্ডু। অমরকোষের মতে অবি-শব্দের অর্থ মেষ। আবিক=মেষজাত, মেষের রোম। পাণ্ড্বাবিক=মেষের রোমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ।

নেতি=ন+ইতি=ইতি নহে। ইতি-শব্দের অনেক অর্থ আছে ; অমরকোষের মতে একটী অর্থ—সমাপ্তি। সমাপ্তি-শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বা পরিমাণ বুঝায় ; যেহেতু, কোনও বস্তুর শেষ সীমাতেই তাহার সমাপ্তি। এ-স্থলে ইতি-শব্দ ইয়ত্তা বা পরিমাণই বুঝাইতেছে। নেতি=ন+ইতি=ইয়ত্তা নহে ; যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই ইয়ত্তা বা শেষ সীমা নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া “নেতি নেতি” বলা হইয়াছে ! উত্তর এই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের দুইটী রূপ আছে—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত ; অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ স্থূলজগৎ ( মূর্ত্ত ) এবং যাহা

পরিদৃশ্যমান্ নহে, সেই সূক্ষ্মজগৎ ( অমূর্ত্ত )। এই দুইটী বস্তুকে ব্রহ্মের রূপ বলাতে কাহারও মনে আশঙ্কা জন্মিতে পারে—এই দুইটী বস্তুতেই—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত জগতেই—ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ, এই দুইটী বস্তুতেই ব্রহ্মের ইয়ত্ত্বা শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার বাহিরে আর ব্রহ্ম নাই। এই আশঙ্কা নিরসনের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—নেতি নেতি—না, ইহাই ব্রহ্মের ইয়ত্ত্বা নহে। মূর্ত্তরূপেও ব্রহ্মের ইয়ত্ত্বা শেষ হয় নাই—নেতি, অমূর্ত্তরূপেও তাঁহার ইয়ত্ত্বা শেষ হয় নাই। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই দুইটী বস্তুতেই ব্রহ্মের ইয়ত্ত্বা শেষ হয় নাই—ইহা বিশেষরূপে জানাইবার জন্যই দুইবার "নেতি" বলা হইয়াছে। এই দুইটী রূপেই যে ব্রহ্মের ইয়ত্ত্বা সীমাবদ্ধ নহে, এই দুইটী রূপের বাহিরেও যে ব্রহ্ম আছেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। মাণ্ডুক্য-শ্রুতি বলিতেছেন—"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ ইদম্ সর্ব্বম্। তস্য উপব্যাখ্যানম্—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১॥—এই দৃশ্যমান্ সমস্তজগৎই 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং ত্রিকালাতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও—এই ওঙ্কার-স্বরূপই।" কালত্রয়ের অধীন পরিদৃশ্যমান্ জগৎই হইতেছে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ। ইহার অতীত—কালত্রয়ের অতীত—যাহা কিছু আছে, তাহাও ব্রহ্ম—একথাই মাণ্ডুক্য বলিতেছেন। তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপের মধ্যেই ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ নহেন, তাহার অতীতও যাহা কিছু আছে, তাহাও ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই রূপদ্বয়ের মধ্যেই ব্রহ্মের ইয়ত্তার শেষ নহে। বৃহদারণ্যক "নেতি নেতি"—বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন—বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি" বাক্যে ইয়ত্ত্বা বুঝাইতেছে না, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপদ্বয়কেই বুঝাইতেছে—মূর্ত্ত স্থূল জগৎ এবং অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম জগৎ যে ব্রহ্ম নহেন, তাহাই বুঝাইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্রাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ইহা নয়, ইহা নয়—নেতি নেতি"—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—মূর্ত্ত স্থূল জগৎও ব্রহ্ম নহেন, অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম জগৎও ব্রহ্ম নহেন, এবং হরিদ্রাদি-নানাবর্ণ বিশিষ্ট রূপও ব্রহ্ম নহেন। এই সমস্ত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই কেবল সত্ত্বামাত্র বস্তুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ "নেতি নেতি"—বাক্যে রূপাদি বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—"নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "নেতি নেতি"–বাক্যের পরে আবার ব্রহ্মের বিশেষত্ব উল্লিখিত হইত না। "নেতি নেতি"–বাক্যের পরে "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি অথ নামধেয়ম্"–ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার নাম সত্যের সত্য ; তিনি প্রাণসমূহেরও সত্য।" এই সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য। বিশেষত্ব নিষেধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিশেষত্বের উল্লেখ নিতান্ত অস্বাভাবিক। সুতরাং, উল্লিখিত "নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্ত্বাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"নেতি নেতি"–বাক্যে যে কেবল ইয়ত্ত্বাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রটী আলোচিত হইতেছে।

**প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ** ॥৩।২।২২॥

এই ব্রহ্মসূত্রটী যে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির পূর্ব্বোদ্ধৃত "দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে" হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্॥"-পর্য্যন্ত কয়টী বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্কর-রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃত-শব্দের অর্থ—প্রকরণ-প্রাপ্ত ( শব্দকল্পদ্রুম ); যে প্রকরণ আলোচিত হইতেছে, সেই প্রকরণ হইতে লব্ধ বিষয়—অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়। এতাবৎ-শব্দের অর্থ—এই পর্য্যন্ত পরিমাণ, বা ইয়ৎ। এতাবত্ত্ব—এতাবতের ভাব বা ইয়ত্তা। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং—প্রকৃতের ( প্রস্তাবিত বিষয়ের ) এতাবত্ত্বং ( ইয়ত্তা )। এক্ষণে ব্রহ্মসূত্রটীর পদচ্ছেদ করা হইতেছে।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি ( প্রস্তাবিত বিষয়ের ইয়ত্তাই ) প্রতিষেধতি ( নিষেধ করিতেছেন ; যেহেতু ) ততঃ ( তাহার পরে ) ব্রবীতি চ ( বলিতেছেনও ) ভূয়ঃ ( পুনরায় )। তাৎপর্য্য এই—"নেতি নেতি"-বাক্যে আলোচ্য প্রকরণস্থ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বিষয়ের কেবল ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু, "নেতি নেতি"-বাক্যের পরেও আবার বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"যে ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ, তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানেয়ত্তা 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষিধ্যতে। নেতি নেতি—নৈবম্ নৈবম্, উক্ত প্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম। উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি শব্দেন পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ। যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি। অতশ্চ প্রকৃতবিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি। ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং 'ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্' ইতি। অয়মর্থঃ—'ইতি নেতি' যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ বস্তু পরং নহি অস্তি। ব্রহ্মণোঽন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চ উৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্। তস্য চ নির্ব্বচনং 'প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্' ইতি। প্রাণশব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরামৃশ্যন্তে। তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ। তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোঽপি এষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কর্ম্মানুগুণ্যেন জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে। পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপ্মনস্তৌ ন বিদ্যেতে। অতস্তেভ্যোঽপি এষ সত্যম্। অতশ্চ এবং বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ 'নেতি নেতি' ইতি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে, অপিতু পূর্ব্বপ্রকৃতেয়ত্তামাত্রম্।"

**উক্ত ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ।** ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রকৃত ( প্রস্তাবিত ) হইয়াছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রতীত হইয়াছিল 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। 'নেতি নেতি' অর্থ—এরূপ নহে, এরূপ নহে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহেন। অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা ( তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা ) এখানে ইতি-শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু, নিষেধের পরেও ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই কারণেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধই

কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন। কারণ, শ্রুতি আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—'নহ্যেতস্মাদ্ ইতি নেতি'-ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, 'ইতি ন' ( ইহা নহে ) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে 'সত্যের সত্য', সেই নামের নির্ব্বাচন বা যৌগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতঃই প্রাণসহচর ( প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ); এইজন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় তাহারও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ ( জীবগণ ) সত্যপদবাচ্য ; ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরমপুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ ; কেননা, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাসমূহের জ্ঞানে সঙ্কোচ ও বিকাশ ঘটে ; কিন্তু অপহতপাপ্মা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই। এজন্যই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য। অতএব উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকাতেই বুঝিতে হইবে যে, 'নেতি নেতি' কথায় ব্রহ্মের সবিশেষ-ভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না ; পরন্তু পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাবই—প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।—( শ্রীল দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ )।

এইরূপে উপরে উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র হইতে জানা গেল—বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি"-বাক্যে ব্রহ্মের ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও পরব্রহ্মের নানাবর্ণবিশিষ্ট একটী রূপের কথা বলিয়াছেন।

(৬) **মধ্বভাষ্যধৃত-শ্রুতি**-বাক্য ঃ—

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য ২।২।৪১-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বুদ্ধিমান্ মনোবান্ **অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্**"-ইত্যাদ্যৈঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ৭৯ পৃঃ ধৃত॥—তিনি ( পরব্রহ্ম ) বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্।"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথাও জানা গেল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রীবিগ্রহই সূচিত করিতেছে।

উক্ত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য অপর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"সদেহঃ সুখগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানঃ সুখী মুখ্যঃ স বিষ্ণুঃ পরমাক্ষরঃ॥

—সর্ব্বসম্বাদিনী ( ৮৬ পৃষ্ঠায় ) ধৃত।

—সেই বিষ্ণু পরম-অক্ষয়-দেহবিশিষ্ট, সুখময়, সৎপরাক্রমবিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট, সুখী ও মুখ্য।"

এ স্থলেও পরম অক্ষর ব্রহ্মের বিগ্রহের কথা জানা গেল।

(৭) **ঋগ্বেদ্-সংহিতার** ব্রহ্মসূক্তে ব্রহ্মের প্রাণ-ক্রিয়ার কথা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মসূক্তের প্রথমসূক্তে এবং দ্বিতীয় সূক্তের প্রথমার্দ্ধে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ( মহাপ্রলয়-কালের ) অবস্থা বর্ণন করিয়া বলা হইয়াছে—

তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না ( প্রকৃতির কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা ছিলনা ) ; মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির গুণত্রয় ছিল না (মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া তখন) প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত রজঃ ( উপলক্ষণে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণেরও পৃথক্ অস্তিত্ব ) ছিল না, ব্যোম ছিল না, মৃত্যু ছিল না, ( সুতরাং জন্মও ছিল না ), রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না।" তাহার পরে, দ্বিতীয় সূক্তের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন, অন্য কিছু ( কোনও সৃষ্টবস্তুই ) ছিল না। তখন সেই 'অবাত—বায়ুহীন' ব্রহ্ম "আনীৎ।"

"আনীৎ"-শব্দ হইতেছে একটী ক্রিয়াপদ—অন্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্-ধাতুর অর্থ—প্রাণনে। প্র-পূর্ব্বক অন্-ধাতু হইতেই "প্রাণ"-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "আনীৎ"-ক্রিয়াপদে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বুঝায়। "ব্রহ্ম আনীৎ—ব্রহ্ম প্রাণবায়ুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।" শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণাদিতেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বুঝায়।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
　　নাসীদ্রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্
　　অম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহণং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
　　ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেত।
**আনীদ**বাতং স্বধয়া তদেকং
　　তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ঋক্ সং ॥১০।১২৯।১-২॥"

উল্লিখিত ব্রহ্মসূক্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৮২ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন—"অত্র স আনীৎ ইতি প্রাণকর্ম্মোৎপাদানাৎ প্রাক্ উৎপত্তেঃ সন্তমেব প্রাণং সূচয়তি। —সূক্তে 'আনীৎ'-শব্দদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাণকর্ম্মোৎপাদনের পূর্ব্বেও ( সৃষ্টির পূর্ব্বেও ) সৎ-স্বরূপ ( নিত্য, অপ্রাকৃত ) প্রাণ বর্ত্তমান ছিল।"

উল্লিখিত ঋক্‌সূক্তের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্যও "আনীৎ"-শব্দের অর্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—"তৎসকল-বেদান্তপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মতত্ত্বমানীৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ। শুদ্ধ ইতি তস্য—প্রাণসম্বন্ধাভাবাৎ। —সর্ব্ব-বেদান্ত-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব 'আনীৎ—প্রাণিতবৎ।" প্রাণিতবৎ অর্থ—প্রাণিততুল্য। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের ন্যায় ব্রহ্মের প্রাণ-ক্রিয়া, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ-ক্রিয়া, ব্রহ্মেরও সেইরূপ প্রাণ-ক্রিয়া। প্রাণ-ক্রিয়াতে—শ্বাস-প্রশ্বাসাদিতেই—প্রাণীদিগের সহিত ব্রহ্মের তুল্যতা, প্রাণে তুল্যতা নহে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ, ব্রহ্মের সেইরূপ প্রাণ নহে। ইহাই 'প্রাণিতবৎ'-শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রাণ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের প্রাণের তুল্য নহে কেন, তাহার উত্তরেই সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—'অপ্রাণো হ্যমনাঃ'—শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের প্রাণ নাই, মন নাই, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদিগের যেরূপ প্রাণ এবং মন আছে, ব্রহ্মের সেইরূপ প্রাণ এবং মন নাই। সেইজন্যই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের প্রাণ প্রাকৃত জীবের প্রাণের তুল্য নহে। প্রাকৃত জীবের প্রাণ হইতেছে—প্রাকৃত, জড় এবং সৃষ্ট ; ব্রহ্মের প্রাণ তদ্রূপ নহে—প্রাকৃত নহে, জড় নহে এবং

সৃষ্ট নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন 'শুদ্ধ'—যেহেতু, ব্রহ্মের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ নাই। 'শুদ্ধ ইতি তস্য প্রাণসম্বন্ধা-ভাবাৎ।' প্রাকৃত প্রাণ জড় বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ। ব্রহ্মের সহিত অশুদ্ধ প্রাকৃত প্রাণের সম্বন্ধ নাই বলিয়া ব্রহ্ম ( সুতরাং ব্রহ্মের প্রাণও ) হইতেছেন—শুদ্ধ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ। এইরূপে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্যের উক্তির ধ্বনি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাণ আছে ; কিন্তু তাহা প্রাকৃত প্রাণ নহে, তাহা হইতেছে অপ্রাকৃত।

যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এবং বা 'অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদ'—ইতি শ্রুত্যন্তরে চ তৎ সম্ভাবস্তস্মিন্ লক্ষ্যতে। তত্র 'অবাতম্' ইতি বিশেষণাত্তু প্রাকৃতবাতত্বং নিষেধতীতি স্পষ্টমেব। ততস্তথাবিধ-প্রাণত্ব-শ্রবণেন তৎসহচারিণঃ শ্রীবিগ্রহস্য সম্ভাবস্তাদৃশভাবশ্চ গম্যত এব।—ঋক্‌সূক্তের ন্যায় অন্যশ্রুতিতেও ব্রহ্মের নিশ্বাসের কথা দৃষ্ট হয়। যথা, ( মৈত্রেয়ী শ্রুতিতে ৬।৩২-বাক্যে ) আছে—ঋগ্‌বেদাদি হইতেছে সেই মহত্তম তত্ত্ব পরব্রহ্মের নিশ্বাস। ( প্রশ্ন হইতে পারে—নিশ্বাস ত হইল প্রাণবায়ুর ক্রিয়া। ব্রহ্মের যদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়াই থাকিবে, তাহা হইলে ঋক্‌সূক্তে ব্রহ্মের বিশেষণরূপে 'অবাতম্—বায়ুহীন'-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে ) ঋক্ সূক্তে 'অবাতম্' বিশেষণে—ব্রহ্মে যে প্রাকৃত বায়ু নাই, তাহাই সূচিত করা হইয়াছে। 'অবাতম্'-বিশেষণের উল্লেখসত্ত্বেও যখন 'আনীৎ—প্রাণবায়ুর ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন'—একথা বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেই যখন এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—এই প্রাণবায়ু সৃষ্ট বা প্রাকৃত প্রাণবায়ু নহে, ইহা অপ্রাকৃত, নিত্য; চিন্ময় এবং ইহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—'অবাতম্'-বিশেষণে যে 'বাত—বায়ুর' কথা বলা হইয়াছে—ব্রহ্মে যে বায়ুর অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে—তাহা হইতেছে সৃষ্ট বা প্রাকৃত বায়ু। তাহা হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের এইরূপ—অপ্রাকৃত, নিত্য, চিন্ময়—প্রাণ আছে বলাতে এতাদৃশ প্রাণের সহচর তথাবিধ—অর্থাৎ প্রাণেরই ন্যায় অপ্রাকৃত, নিত্য, চিন্ময়—শ্রীবিগ্রহের সদ্‌ভাবও জানা যাইতেছে।"

তাৎপর্য্য হইল এই যে—ব্রহ্মের যেমন অপ্রাকৃত প্রাণ আছে, তেমনি অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—শরীরও—আছে ; যেহেতু, শরীরের সহিতই প্রাণ থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী (৬)—উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা গিয়াছে যে—ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে। শ্রীবিগ্রহের বা শরীরেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ব্রহ্মের প্রাণেরই ন্যায় অপ্রাকৃত, তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে।

**(৮) নৃসিংহোত্তর-তাপনী** শ্রুতিতেও পরব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দরূপম্" বলা হইয়াছে ( ৭ম খণ্ড )। তাঁহার রূপ বা বিগ্রহ হইতেছে—সচ্চিদানন্দ, প্রাকৃত নহে। রূপ—আকার ; "আকৃতিঃ কথিতা রূপে।"

**(৯) গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥" ১।৮॥—ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ব্রহ্ম-বিগ্রহ প্রাকৃত নহে।

**(১০) মৈত্রেয়ী উপনিষদে** বলা হইয়াছে ঃ—

"নিত্যচিন্মাত্ররূপোঽস্মি সদা সচ্চিন্ময়োঽস্ম্যহম্॥ ৩।১৬॥—আমি ( ব্রহ্ম ) নিত্য-চিন্মাত্ররূপ, আমি সচ্চিন্ময়।"

এই বাক্য হইতেও জানা যায়–ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

(১১) শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে ( ২৮৫ পৃষ্ঠায় ) এইরূপ একটী **স্মৃতিবাক্য** উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আনন্দমাত্র-কর-পাদ-মুখোদরাদিরিত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

—ব্রহ্মের হস্ত, পদ, মুখ, উদরাদি সমস্তই আনন্দমাত্র।"

এই বাক্য হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি প্রাকৃত নহে, পরন্তু আনন্দমাত্র।

(১২) **মহাভারতের** উদ্যোগ-পর্ব্ব হইতে শ্রীজীব গোস্বামী একটী শ্লোক তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৮৮ পৃষ্ঠায় ) উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ।

—পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক ( প্রাকৃত ) নহে।"

এস্থলে বলা হইল—পরমাত্মার দেহ আছে; কিন্তু তাহা প্রাকৃত নহে। অর্থাৎ তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত।

**উপসংহার**। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৫৯- অনুচ্ছেদের উপসংহারে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের রূপের এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অস্তিত্বের ইঙ্গিত শ্রুতিতে পাওয়া যায়। আর এই ১।১।৬১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিময় রূপের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল এবং ইহাও জানা গেল যে, ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিময় শ্রীবিগ্রহ মায়িক পঞ্চভূতে গঠিত নহে; শ্রীবিগ্রহ হইতেছে সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। এই সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ অনাদি, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বিরাজমান।

"তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়॥"-এই ছান্দোগ্যশ্রুতি ( ৬।২।৩ )-বাক্যে, এবং 'স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥"-এই ঐতরেয়শ্রুতি (১।১ )-বাক্যে যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক ঈক্ষণের কথা দৃষ্ট হয়, সেই ঈক্ষণ যে তিনি তাঁহার ঈক্ষণেন্দ্রিয় দ্বারাই করিয়াছেন, তাহাও এখন স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে; সুতরাং তাঁহার এই ঈক্ষণেন্দ্রিয়—চক্ষু বা মন—যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং অনাদি এবং অপ্রাকৃত, তাহাও পরিষ্কারভাবে জানা গেল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও একথাই জানা যায়। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান ?
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন॥ ২।৬।১৩১-৩৩॥

ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥
সে কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন ॥
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥　২।৬।১৩৬-৩৭॥

**৬২। ব্রহ্মের কর-চরণাদির অস্তিত্ব-হীনতাসূচক অথচ কর-চরণাদির ক্রিয়া-বাচক শ্রুতিবাক্য।**

(১) **শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি** বলেন --

'-অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ —৩।১৯॥

—তাঁহার পদ নাই, অথচ তিনি দ্রুত গমন করেন। তাঁহার হস্ত নাই, অথচ তিনি গ্রহণ করেন ; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন ; তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ তিনি শ্রবণ করেন। জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই তিনি জানেন ; কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। তাঁহাকে আদি এবং মহাপুরুষ বলা হয়।"

(২) **মৈত্রেয়ী উপনিষৎ** বলেন—

"সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনোঽহস্মি সর্ব্বকর্ম্মকৃদপ্যহম্ ॥ ৩।১৫॥

—আমি ( ব্রহ্ম ) সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বিহীন, অথচ আমি সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া থাকি।"

**উপসংহার।** উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের কর-চরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই ; অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য্য আছে। তাঁহার কোনও ইন্দ্রিয়ও নাই ; অথচ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে।

ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য থাকিলেই বুঝিতে হইবে ইন্দ্রিয়ও আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৬১-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা গিয়াছে---সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গময় বিগ্রহ—বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদি একেবারেই নাই, তাহা বলিতে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাচক শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১,১।৫৭-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রাদি অনুসারে কোনও শ্রুতিবাক্যই ব্যর্থ বা নিরর্থক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের যে অনাদিসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিগ্রহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ "অপাণিপাদঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদি নাই বলা হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহের একটা সমাধান অবশ্যই আছে। কি সেই সমাধান ?

বিগ্রহ হইবে হয়তো অপ্রাকৃত, আর না হয় প্রাকৃত। যাঁহার অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে, তাঁহার নিশ্চয়ই আবার প্রাকৃত বিগ্রহ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের অনাদিসিদ্ধ অপ্রাকৃত বিগ্রহ-সম্বন্ধে যখন শ্রুতির স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহার প্রাকৃত বিগ্রহ—প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নাই।

"অপাণিপাদঃ"-আদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নাই। প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তাঁহার থাকিতেও পারে না; যেহেতু, প্রাকৃত-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহের অস্তিত্বের কথা শ্রুতি হইতে জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমের নিকটে বলিয়াছেন—

'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ।'
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ।" শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪০—৪১॥

## ৬৩। ব্রহ্মের রূপহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্য

(১) **বৃহদারণ্যক**-শ্রুতি বলেন :—

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্। ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন॥ ৩।৮।৮॥—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি! ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন—সেই অক্ষর পুরুষ ( ব্রহ্ম ) হইতেছেন—অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অনেত্র, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজঃ, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর, অবাহ্য। তিনি কাহারও ভোক্তা নহেন, তিনি কাহারও ভোগ্যও নহেন।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে যেন নির্ব্বিশেষই বলা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কেননা, ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—চন্দ্র, সূর্য্য, ভূলোক, দ্যুলোক, নিমেষ-মুহূর্ত্ত-দিবারাত্র-পক্ষ-মাস-ঋতু-সংবৎসরাদি কালাবয়ব, নদ-নদী পর্ব্বতাদি—সমস্তই এই ব্রহ্মের প্রশাসনে—নিয়ন্ত্রণাধীনে—বর্ত্তমান। যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনি কাহারও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না; সুতরাং এ-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যটী এই :—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যাঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥ ৩।৮।৯॥"

সুতরাং বৃহদারণ্যক-শ্রুতি যে ব্রহ্মকে সবিশেষই বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উল্লিখিত দুইটী বাক্যের প্রথম বাক্যে নির্ব্বিশেষত্বের লক্ষণ প্রকাশ করায় কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষই, কোনও আগন্তুক কারণে যে তিনি সবিশেষ হইয়া থাকেন,

তাহাই দ্বিতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান বিচার-সহ নহে; যেহেতু, কোনও আগন্তুক কারণে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াছেন, তাহা উক্ত শ্রুতিবাক্যে বা অন্যত্রও বলা হয় নাই। যাহা শ্রুতিতে নাই, এইরূপ কোনও অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের অবশ্যই কোনও সমাধান আছে। কি সেই সমাধান ? সমাধানের জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে অন্যত্র উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহেরও আলোচনা করিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক হইতে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য দুইটীর প্রথমটীতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অপ্রাণ,** তাঁহার প্রাণ নাই ; কিন্তু পূর্ব্বে ১।১।৬১(৭)-অনুচ্ছেদে ঋগ্‌বেদের ব্রহ্মসূক্ত এবং মৈত্রেয়ী-উপনিষদের প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত প্রাণ আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অমুখ,** অর্থাৎ তাঁহার চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ-আদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই ; কিন্তু পূর্ব্বে ১।১।৬১(৬)-অনুচ্ছেদে শ্রুতিপ্রমাণ হইতে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অমনঃ,** ব্রহ্মের মন নাই ; কিন্তু পূর্ব্বে ১।১।৫৯-অনুচ্ছেদে শ্রুতিবাক্য হইতে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মক মনঃ আছে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অতেজস্ক,** ব্রহ্মের তেজঃ বা জ্যোতি নাই ; কিন্তু পূর্ব্বে ১।১।৫৮(১)খ এবং ১।১।৫৮(১)গ-অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্ম জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরও জ্যোতিঃ, তাঁহার জ্যোতিঃদ্বারাই সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম **অরস, অগন্ধ**—ব্রহ্মের কোনওরূপ রস নাই, গন্ধ নাই ; কিন্তু ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন —ব্রহ্ম সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ॥৩।১৪।৪॥"

এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের **সমাধান** এই। ব্রহ্ম হইতেছেন শুদ্ধ, মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহাতে মায়িক কোনও বস্তু থাকিতে পারে না। প্রাকৃত প্রাণ, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ, তেজঃ, রস, গন্ধাদি তাঁহাতে নাই—ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। কিন্তু অপ্রাকৃত প্রাণ, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ, তেজ, রস, গন্ধাদি তাঁহাতে আছে। এইরূপে প্রাকৃত স্থূলত্বাদিও তাঁহাতে নাই।

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্—মায়িক গুণময় কার্য্য বা কারণরূপ স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব ব্রহ্মে নাই।

অলোহিতম্ অস্নেহম্—প্রাকৃত লৌহিত্য ( অগ্নি-আদি রূপত্ব ) এবং প্রাকৃত স্নেহ ( স্নিগ্ধত্বাদি ) তাঁহাতে নাই।

অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্—প্রাকৃত ছায়াধর্ম্ম, অন্ধকারধর্ম্ম তাঁহাতে নাই ( অথবা অতমঃ—তাঁহাতে মায়িক তমোগুণ—উপলক্ষণে মায়িক কোনও গুণই নাই )। প্রাকৃত বায়ু এবং আকাশের প্রাকৃত শব্দস্পর্শাদি ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই।

অসঙ্গম্—ব্রহ্ম নির্লেপ-স্বভাব।

অমাত্রম্—মাত্রা-শব্দে অংশ—টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ—বুঝায়। তিনি অপরিমিত সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তাঁহার এইরূপ কোনও অংশ থাকিতে পারে না।

অনন্তরম্ অবাহ্যম্—সর্ব্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার ভিতর বাহির বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাই সূচিত হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব—সুতরাং তাঁহার রূপও—নিষিদ্ধ হয় নাই।

অস্থূলমনণু-ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত শ্রুতি অক্ষর-ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষর-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—স্বরূপতঃ এবং স্বভাবতঃই যিনি ক্ষরণরহিত—চ্যুতিরহিত। কোনও প্রাকৃতবস্তুই এইরূপ অক্ষর বা চ্যুতিরহিত হইতে পারে না; যেহেতু, প্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, বিকার আছে। ব্রহ্মে যদি প্রাকৃত কিছু থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে অক্ষর বলা যায় না। এই শ্রুতিবাক্যে অস্থূলম্ অনণু-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—তাঁহাতে প্রাকৃত কিছু নাই। ব্রহ্মের অক্ষরত্বের লক্ষণই এই শ্রুতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যে প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথাই বলিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(২) **মুণ্ডক**-শ্রুতি বলেন—

**ক।** "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২।১।২॥

—সেই পুরুষ দিব্য, অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়দেশবর্ত্তী ( সর্ব্বব্যাপক বলিয়া ), অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র ( বিশুদ্ধ ) এবং অক্ষর ( প্রকৃতি ) হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম অমূর্ত্ত ( তাঁহার কোনও বিগ্রহ নাই ), তিনি অপ্রাণ ( তাঁহার প্রাণ নাই ), তিনি অমনা ( তাঁহার মন নাই )। ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত বিগ্রহ, প্রাণ এবং মন আছে, শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে তৎসমস্তের নিষেধ করিয়া জানান হইল—তাঁহার প্রাকৃত বিগ্রহ নাই, প্রাকৃত প্রাণ নাই, প্রাকৃত মনও নাই।

এইরূপে দেখা গেল—এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের বা বিগ্রহাদির নিষেধ করা হয় নাই।

**খ।** "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥১।১।৬॥

—তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য ( ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন ), অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, কর-চরণহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় এবং ভূতযোনি। ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত এবং অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি স্বরূপতঃ এবং স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া অনিত্য কিছু তাঁহাতে থাকিতে পারে না। অব্যয় ( ব্যয়রহিত বা চ্যুতিরহিত—বা বিকারহীন ) বলিয়া বিকারশীল কোনও বস্তুও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। বিভু এবং সর্ব্বগত—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সীমাবদ্ধ কোনও বস্তুও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই অনিত্য, বিকারশীল এবং দেশ-কালদ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোনও প্রাকৃত বস্তু তাঁহাতে থাকিলে তিনি নিত্য, বিভু,

সর্ব্বগত ও অব্যয় হইতে পারেন না। এই শ্রুতি তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মে প্রাকৃত বস্তু কিছু নাই। কিরূপে তাহা দেখাইলেন, তাহা বলা হইতেছে।

অদৃশ্য—ব্রহ্মকে চক্ষুঃদ্বারা দেখা যায় না। অথচ সঙ্গেসঙ্গেই বলা হইয়াছে—ধীরাঃ পরিপশ্যন্তি—ধীর ( নির্ম্মলচিত্ত, শান্তচিত্ত ) ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখেন। পূর্ব্বে ১।১।৫৮ ( ১ )-অনুচ্ছেদেও মুণ্ডকশ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। ১।১।৬১( ২ )-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মহানারায়ণ-শ্রুতি বলেন—"ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ॥১।১১—ব্রহ্মকে কেহই চক্ষুঃদ্বারা দেখিতে পায় না।" তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—প্রাকৃত চক্ষুতে তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু; তাই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৭৯ ॥" কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণের ( ধীরগণের ) অপ্রাকৃতত্ব-প্রাপ্ত চক্ষুতে তিনি দৃষ্ট হয়েন। যদি প্রাকৃত চক্ষুর বিষয়ীভূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রূপও হইত প্রাকৃত। অদৃশ্য-শব্দে জানান হইল—তাঁহার রূপ ব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্যমান্ বস্তুর ন্যায় প্রাকৃত নহে।

অগ্রাহ্য—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন; সুতরাং তাঁহার রূপও প্রাকৃত নহে।

অবর্ণ—প্রাকৃত বর্ণহীন। ব্রহ্মের যে নানাবিধ অপ্রাকৃত বর্ণ আছে, পূর্ব্বে ১।১।৫৮(৪-৬)-অনুচ্ছেদে তাহা দেখান হইয়াছে।

অচক্ষুঃ, অপাণিপাদ—ব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত চক্ষুঃ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আছে, তাহা পূর্ব্বেই শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—মুণ্ডক-শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত রূপাদি নিষিদ্ধ হয় নাই।

উপরে উদ্ধৃত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যদ্বয় যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপন করিয়াছে, তাহা নহে; যেহেতু, উক্ত শ্রুতিতেই সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। তাহা নিম্নে দেখান হইতেছে।

(অ) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য এষ মহিমা ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ মুণ্ডক ॥ ২।২।৭॥ —যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ব্রহ্মাণ্ডে এবং দিব্যলোকে যাঁহার মহিমা প্রসিদ্ধ, যিনি ব্রহ্মপুরে এবং আকাশে প্রতিষ্ঠিত।"

এ-স্থলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-শব্দে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

(আ) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ॥ মুণ্ডক ॥৩।১।৩॥ —যখন কেহ সেই সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন করেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মকে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর এবং ব্রহ্মযোনি বলাতে তাঁহার সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(ই) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥৩।২।৩॥ —তিনি ( ব্রহ্ম ) যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম স্বীয় তনু দান করেন।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) **শ্বেতাশ্বতর**-উপনিষৎ বলেন

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥ ৬।১৯॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমৃতের শ্রেষ্ঠ সেতুসদৃশ এবং দগ্ধেন্ধন-অনলের তুল্য ( যে অগ্নিতে কাষ্ঠসমূহ সম্যক্‌রূপে দগ্ধীভূত হইয়াছে, সেই অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল )।"

নিষ্কল—অংশহীন। ১।১।৬৩(১)-অনুচ্ছেদে 'অমাত্রম্' দ্রষ্টব্য।

নিষ্ক্রিয়—ক্রিয়াহীন ; যাঁহার কোনও ক্রিয়া নাই। অথচ ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদি ( ৩।১৪।৪ )। তাৎপর্য্য এই যে—প্রাকৃত জীবের কর্ম্মের ন্যায় কোনও কর্ম্ম ব্রহ্মের নাই। প্রাকৃত জীবের মধ্যে কর্ম্মের বাসনা জাগায় তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ; সেই বাসনার প্রেরণায় জীব যে কর্ম্ম করে, তাহাও প্রাকৃত। ব্রহ্মের পূর্ব্বসঞ্চিত কোনও প্রাকৃত কর্ম্ম নাই, তদ্রূপ কোনও কর্ম্মও তাঁহার কর্ম্মের বাসনা জাগায় না, তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাও প্রাকৃত কর্ম্ম নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা হইতে জানা যায়, তাঁহার কর্ম্ম হইতেছে—দিব্য ( মায়াতীত, অপ্রাকৃত ; অথবা—লীলা )—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। গীতা। ৪।৯॥" ব্রহ্মের কোনও কর্ম্মই নাই, তিনি কোনও কর্ম্মই করেন না—ইহা বলা যাইতে পারে না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রই তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" —ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যেও তাঁহার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ম্ম করেন আনন্দের উচ্ছ্বাসবশতঃ, আনন্দের প্রেরণায়। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই বেদান্তসূত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লীলার কথাও এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়। লীলাও কর্ম্মই, অবশ্য দিব্য কর্ম্ম। এ-স্থলে "নিষ্ক্রিয়"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মের কোনও প্রাকৃত কর্ম্ম নাই। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত কর্ম্ম নিষিদ্ধ হয় নাই।

নিরঞ্জন—মায়িক অঞ্জনশূন্য। মায়াতীত। ইহাদ্বারাও বুঝা যায়, ব্রহ্মে প্রাকৃত কিছু নাই, তাঁহার প্রাকৃত কর্ম্মও নাই।

শ্বেতাশ্বতরের এই বাক্যটী যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব খ্যাপন করে নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥৬।১৮॥ —যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার চিত্তে বেদসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ইহা সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(৪) **কঠোপনিষৎ** বলেন—

**ক।** "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥১।৩।১৫॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধবৎ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব ( স্বভাবতঃই স্থির )। ইঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ নাই। তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং অব্যয় বলাতে তিনি যে প্রকৃতির অতীত, তাহাই বলা হইল। যেহেতু, প্রকৃতি হইতে জাত বস্তু কখনও অনাদি, অনন্ত, অব্যয় এবং নিত্য হইতে পারে না। তাঁহাতে প্রাকৃত কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না। রূপ-রস-গন্ধাদি তাঁহাতে নাই বলায় প্রাকৃত রূপ-রসাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপ্রাকৃত রূপ-রসাদি নিষিদ্ধ হয় নাই ; যেহেতু, ছান্দোগ্য-শ্রুতি ব্রহ্মকে "সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধঃ" বলিয়াছেন ; ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের কথা যে বেদে আছে, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

খ। "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ কঠ ॥১।২।২২॥

—ব্রহ্ম অশরীর (শরীরবিহীন) ; তিনি (পরমাত্মারূপে) দেব-মনুষ্যাদির অনিত্য শরীরে অবস্থিত। তিনি মহান্, বিভু, সর্ব্বব্যাপক। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া শোকাতীত হয়েন।"

এস্থলেও ব্রহ্মকে মহান্, বিভু, সর্ব্বব্যাপক বলায় তাঁহার মায়াতীতত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ; সুতরাং মায়িক কোনও বস্তু তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তাঁহার যে প্রাকৃত শরীর নাই, "অশরীরম্"-শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীর নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অপ্রাকৃত শরীরের কথা শ্রুতিও যে বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

কঠোপনিষদের উল্লিখিত বাক্যদ্বয় ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথাই মাত্র বলিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে নিষিদ্ধ হয় নাই ; যেহেতু, এই কঠোপনিষৎই অন্যত্র ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

(অ) "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ কঠ ॥ ১।২।২১॥

—ব্রহ্ম উপবিষ্ট থাকিয়াও দূর দেশে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। তিনি সমদ এবং অমদ—যুগপৎ হর্ষযুক্ত এবং অ-হর্ষযুক্ত—পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। এতাদৃশ ব্রহ্মবস্তুকে আমা-ব্যতীত আর কে জানিতে পারে ?"

এস্থলে ব্রহ্মের গতাগতির কথা, অচিন্ত্য-শক্তির কথা এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের কথা বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণই সবিশেষত্বসূচক।

(আ) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ কঠ ॥১।২।২৩॥

—এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ; তাঁহার নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনুও দান করেন।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

(ই) "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ কঠ ॥২।২।১৩॥

—তিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যেও নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যেও চেতন ( সমস্তের নিত্যতার ও চেতনতার মূল )। ইনি এক হইয়াও বহু সকামব্যক্তির কাম্যবস্তুসকল দান করেন। যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না।"

এ স্থলেও ব্রহ্মকে সকাম ব্যক্তিদের কাম্যফলদাতা বলায় সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

এই সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্ব খ্যাপন শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। প্রাকৃত-বিশেষত্বেরই নিষেধ করা হইয়াছে। যেস্থলেই বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে-স্থলেই তাঁহার মায়াতীতত্ব-বাচক অক্ষর, নিত্য, বিভু, অব্যয়-প্রভৃতি-শব্দদ্বারা তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—মায়িক বিশেষত্ব যে ব্রহ্মে নাই, তাহা প্রকাশ করাই নিষেধবাচক শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়।

## ৬৪। ব্রহ্মের রূপবিষয়ক-শ্রুতিবাক্যালোচনার সারমর্ম্ম

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৫৭-৬৩ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মের রূপসম্বন্ধে কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম এই ঃ—

(ক) ব্রহ্মের রূপ আছে ; ব্রহ্ম রূপহীন নহেন।

(খ) ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, ইন্দ্রিয়াদি আছে, প্রাণ আছে।

(গ) ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-আদি সমস্তই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আনন্দময়।

(ঘ) ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সচ্চিদানন্দ।

(ঙ) যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে রূপহীন বা অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ বা প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই।

(চ) যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

## ৬৫। ব্রহ্ম-বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব

ব্রহ্মের বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা পূর্ব্বেই শ্রুতিপ্রমাণযোগে দেখান হইয়াছে। যুক্তিদ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ ভৃগুবল্লী ॥১॥ —যাঁহা ( যে ব্রহ্ম ) হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়াছে ॥" ইহা হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ॥৬।২।৩॥ —সেই ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্মের সঙ্কল্পাত্মক মন ছিল।

ঐতরেয়-শ্রুতির "স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥১।১॥" —এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্মের চক্ষুঃ এবং মনঃ ছিল।

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ॥ ঐতরেয়-শ্রুতি ॥১।১॥" "একো হি বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ ॥ মহোপনিষৎ ॥১।১॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্ম ছিলেন। তখনও তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত চক্ষুর্মন-আদি ইন্দ্রিয়যুক্তই ছিলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্তই ছিলেন; তখনও তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি, ব্রহ্ম-বল্লী ॥১॥", তখনও তিনি "বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৯।২৮॥", তখনও তিনি মায়ার অঞ্জনরহিত "নিরঞ্জনম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৯॥", তখনও তিনি "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিবশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৭।১॥—পাপশূন্য, জরাশূন্য, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প"—অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও সর্ব্ববেদান্ত-প্রতিপাদ্য উল্লিখিত কল্যাণগুণময় এবং মায়িক হেয়গুণহীন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত ব্রহ্মরূপেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

মায়িকী সৃষ্টির পরেই প্রাকৃত রূপ এবং প্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি সম্ভব। ব্রহ্মের বিগ্রহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যখন সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত বিগ্রহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বলিয়া ব্রহ্মেরই ন্যায় অনাদি এবং সচ্চিদানন্দ।

### (ক) ব্রহ্মের রূপ-সম্বন্ধে এবং রূপের অপ্রাকৃতত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৮৫ পৃষ্ঠায়) পরব্রহ্মের রূপসম্বন্ধে চারিটী ব্রহ্মসূত্র এবং তাহাদের মাধ্বভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

(ক) "অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩।২।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র ॥" এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য—"প্রকৃত্যাদি-প্রবর্ত্তকত্বেন তদুত্তমত্বাৎ নৈব রূপবৎ ব্রহ্ম—হি-শব্দাৎ 'অস্থূলমনণু' (বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৮।৮॥) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

ভৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভ্যোঽসৌ পরো যতঃ।
অরূপবানতঃ প্রোক্তঃ ক্ব তদব্যক্ততঃ পরঃ ॥ ইতি চ মাৎস্যে ॥"

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম প্রকৃতি প্রভৃতির (প্রকৃতির এবং প্রাকৃতবস্তুর) প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রকৃত্যাদি হইতে উত্তম (প্রকৃতির অতীত); অতএব ব্রহ্ম (প্রাকৃত) রূপবিশিষ্ট নহেন। সূত্রস্থ হি-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়। বৃহদারণ্যক যে ব্রহ্মকে অস্থূল, অনণু (ব্রহ্মের যে প্রাকৃত স্থূলত্ব এবং প্রাকৃত অণুত্ব নাই) বলিয়াছেন, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নাই। মৎস্যপুরাণও বলিয়াছেন—"এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল রূপ দেখা যায়, তৎসমস্ত হইতেছে ভৌতিক (প্রাকৃত পঞ্চভূত-নির্ম্মিত); কিন্তু এই ব্রহ্ম প্রাকৃত ভূতসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ (প্রাকৃত ভূতপঞ্চকের অতীত); এজন্য তাঁহাকে 'অরূপবান্—প্রাকৃত রূপহীন' বলা হয়। সেই অব্যক্ত (ব্রহ্ম) হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কোথায় আছে?"

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে 'অরূপবৎ'-সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ আছে।

(খ) "প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থাৎ ॥ ৩।২।১৫॥ ব্রহ্ম সূত্র ॥"

এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং ( মুণ্ডক ॥৩।১।৩॥ )", "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে ( ছান্দোগ্য ॥৮।১৩।১॥ )", "সুবর্ণজ্যোতিঃ ( তৈত্তিরীয় ॥ ৩।১০।৬॥ )" ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বৈয়র্থং বিলক্ষণ-রূপত্বাৎ। যথা চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিদ্যমানেঽপি বৈলক্ষণ্যাৎ অপ্রকাশত্বাদিব্যবহারঃ।"

তাৎপর্য্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ ( যখন কোনও দর্শনকর্ত্তা সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন )', 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যতে [ শ্যাম হইতে শবলকে আশ্রয় করে ১।১।৫৮ (৬) ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ], 'সুবর্ণজ্যোতিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য আছে। চক্ষু-আদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তু সকলের উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতা থাকা সত্ত্বেও চক্ষুরাদি-প্রকাশ্য বস্তু হইতে ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়াই ব্রহ্মরূপের অপ্রকাশত্বাদির ( চক্ষুর্দ্বারা অদর্শনীয়তাদির ) কথা বলা হয়।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে "প্রকাশবচ্চ"-ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রুতিতে ব্রহ্মের রূপবাচক যে সমস্ত বাক্য আছে, সে সমস্ত ব্যর্থ হইতে পারে না। 'ব্রহ্ম অদৃশ্য অস্পৃশ্য' ইত্যাদি যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তৎসমস্তও ব্যর্থ হইতে পারে না। সমাধান এই যে—ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "অদৃশ্য"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যে সমস্ত বস্তুর উপলব্ধি পায়, সে সমস্ত বস্তু হইতেছে প্রাকৃত। এই সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বা ব্রহ্মরূপের বৈলক্ষণ্য আছে—তাহা হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের রূপ অপ্রাকৃত। এজন্য তিনি বা তাঁহার রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

এই সূত্রভাষ্যেও জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপ নাই বটে ; কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ আছে।

(গ) "আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬॥ ব্রহ্মসূত্র ॥"

এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য। "বৈলক্ষণ্যং চ উচ্যতে—রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্বমৈকাত্ম্যপ্রত্যয়সারমিতি। 'আনন্দমাত্রমজরং পুরাণম্ একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ( কঠোপনিষৎ ॥২৫।১২॥, শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১২॥ ) ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।"

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মরূপের যে বৈলক্ষণ্যের কথা বলা হইয়াছে, এই সূত্রেও সেই বৈলক্ষণ্যের কথা বলা হইতেছে : সেই বৈলক্ষণ্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মের রূপ বিজ্ঞানানন্দমাত্র, সুতরাং ঐকাত্ম্যপ্রত্যয়ের সার ( অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দ, তাঁহার রূপও তদ্রূপ )। শ্রুতিও বলিয়াছেন—ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান্ এবং আত্মস্থ। যে সকল ধীর ব্যক্তি এতাদৃশ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ, অপরের নহে।

এই ভাষ্য হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের রূপ আছে এবং সেই রূপ হইতেছে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, প্রাকৃত নহে।

(ঘ) "দর্শয়তি চ অথোঽপি স্মর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥ ব্রহ্মসূত্র ॥"

এই সূত্রের মাধ্বভাষ্য। দর্শয়তি চ আনন্দস্বরূপত্বম্—'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিভাতি ( মুণ্ডক ॥২।২।৭॥ )' ইতি শ্রুতিঃ ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বাসুদেবনিরঞ্জনম্।
চিন্তয়ীত যতির্নান্যং জ্ঞানরূপাদৃতে হরেঃ ॥ ইতি ॥ মাৎস্য ইতি।

তাৎপর্য্য। এই সূত্রে ব্রহ্মের ( বা ব্রহ্মরূপের ) আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—'ব্রহ্ম আনন্দ-রূপ এবং অজর। ধীরগণ বিজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। ( মুণ্ডকশ্রুতি )।' মৎস্যপুরাণও বলেন—'শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ নিরঞ্জন বাসুদেবেরই যতিগণ ধ্যান করিবেন। হরির জ্ঞানরূপব্যতীত অন্য কিছু ধ্যান করিবেন না।'

এ-স্থলেও ব্রহ্মের বা ব্রহ্মরূপের আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানরূপত্বের কথা জানা গেল। ব্রহ্মের রূপ আছে; সেইরূপ প্রাকৃত নহে, পরন্তু, অপ্রাকৃত—আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

## ৬৬। ব্রহ্মবিগ্রহ স্বপ্রকাশ

যাহা নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, অন্য কিছু যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাকে স্বপ্রকাশ বস্তু বলা হয়। যেমন, ব্যবহারিক জগতে সূর্য্য। সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখনই তাহাকে দেখা যায়। প্রদীপাদি অপর কোনও বস্তু দ্বারা উদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যকে দৃশ্যমান্ করা যায় না। এস্থলে সূর্য্য হইল স্বপ্রকাশ বস্তু—নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। কিন্তু সূর্য্যও বাস্তবিক স্বপ্রকাশ নহে; সূর্য্যের স্বপ্রকাশত্ব হইতেছে আপেক্ষিক; যেহেতু, সূর্য্যও অপর এক বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হয়। যাহা দ্বারা সূর্য্যাদি তেজোময় বস্তুও প্রকাশিত হয়, তাহাই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছেন সমস্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীরও জ্যোতিঃ।

**ছান্দোগ্য**-উপনিষৎ বলেন—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ ॥৩।১৩।৭॥—এই স্বর্গলোক হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থানে—স্বর্গলোকের উপরিভাগেও—যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, প্রাকৃত বিশ্বের বহির্দ্দেশেও, সমষ্টিতত্ত্ব এবং ব্যষ্টিতত্ত্বের বহির্দ্দেশেও, উত্তম এবং সর্ব্বোত্তম—সমস্ত দেশেই যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে—তাহাই ব্রহ্ম।"

এস্থলে ব্রহ্মকেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইল এবং এই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত দীপ্যমান, তাহাও বলা হইল। ব্রহ্ম নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ায় এবং ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সমস্ত প্রকাশিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ।

**মুণ্ডকোপনিষৎ** বলেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি ॥২।২।১০॥—সেই ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলা যাইবে। তিনি স্বয়ং প্রভাময়; তাঁহার জ্যোতিতেই এই বিশ্বের সমস্ত বস্তু ( এমন কি চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বিদ্যুতাদিও ) প্রকাশ পাইতেছে।"

এস্থলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

**কঠোপনিষদেও** উক্ত বাক্যটী দৃষ্ট হয় ( ২।২।১৫ )।

**বৃহদারণ্যক**-শ্রুতি বলেন—“তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ৪।৪।১৬॥—দেবগণ তাঁহাকে ( সেই ব্রহ্মকে ) জ্যোতির ও জ্যোতিঃ, আয়ুঃ ও অমৃতস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মকে জ্যোতিরও জ্যোতিঃ—সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও প্রকাশক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মই সকলের প্রকাশক, ব্রহ্মের প্রকাশক কেহ বা কিছু নাই। সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন **স্বপ্রকাশ তত্ত্ব**।

স্বপ্রকাশ তত্ত্ব বলিতে সেই তত্ত্বকে বুঝায়—যে তত্ত্ব নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। কিন্তু কি ভাবে বা কিসের দ্বারা স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন ?

তিনি সাধারণতঃ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষুতে অদৃশ্যমান্। একমাত্র তাঁহার শক্তিতেই তাঁহাকে দেখা সম্ভব ; তাঁহার শক্তিব্যতীত সেই পরমাত্মা অমিত (অপরিচ্ছিন্ন) প্রভুকে কেহই দেখিতে পায় না। “নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন ॥” “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥”—এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের কথা জানা যায়।

তাঁহার নিজের শক্তিদ্বারাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই শক্তিকে তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি বলা যায়। এই স্বপ্রকাশতা-শক্তি হইতেছে তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ ( ১।১।৭—অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের বিবরণ দ্রষ্টব্য )। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বের যে-বৃত্তিতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটী বৃত্তি সমপরিমাণে বিরাজিত, তাহাকে বলে মূর্ত্তি ( ১।১।৭—অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। শুদ্ধসত্ত্বের এই যে বৃত্তি,—যাহার নাম মূর্ত্তি—তাহাদ্বারাই পরব্রহ্ম স্বীয় শ্রীবিগ্রহকে বা নিজেকে প্রকাশ করেন। “অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ ৬৩৫ পৃষ্ঠা ॥” বস্তুতঃ যোগমায়াই ব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা-শক্তি ( ১।১।৭৮খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া এবং তাঁহার গুণৈশ্বর্য্যাদি তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহার গুণৈশ্বর্য্যাদিও স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ কেবল তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তিদ্বারাই প্রকাশ্য।

# পঞ্চম অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব

### ৬৭। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম

পরব্রহ্মের যে অপ্রাকৃত চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাত্মক শ্রীবিগ্রহ আছে, শ্রুতি-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বে ( ১।১।৫৭-৬৫-অনুচ্ছেদে ) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতি যে শ্রীকৃষ্ণকেই এই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

**শ্রুতি-প্রমাণ**

(ক) **কৃষ্ণোপনিষৎ** বলেন—"কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্ ॥ ১২॥—কৃষ্ণ হইতেছেন শাশ্বত ব্রহ্মই।"

(খ) **গোপালোত্তরতাপনী** শ্রুতি বলেন—"যোঽসৌ পরব্রহ্মগোপালঃ ॥ ১৮।১৫॥—গোপাল ( কৃষ্ণ ) পরব্রহ্ম।"

(গ) **গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতি বলেন —

(১) কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১।১॥

—কৃষ্ হইতেছে ভূ-বাচক-শব্দ, আর ণ হইতেছে নির্বৃত্তি-বাচক। এই উভয়ের ঐক্যরূপই ( ভূ—সত্ত্বা এবং ণ —আনন্দ উভয়ের ঐক্য—সৎ ও আনন্দরূপ ) পরব্রহ্ম ; তিনিই কৃষ্ণ-নামে অভিহিত হয়েন।"

(২) "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥ ১।১ ।—কৃষ্ণই পরম দেবতা।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "তমীশ্বরাণং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ॥৬।৭॥"—বাক্যে ব্রহ্মকে "দেবতাদিগের পরমদেবতা" বলিয়াছেন। গোপালতাপনীও "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্"—বাক্যে কৃষ্ণকে "পরম-দেবতা" বলায় কৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম, তাহাই সূচিত হইতেছে।

(৩) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ জ্ঞাপয়তিস্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥ ১।৫॥—যে কৃষ্ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যিনি ব্রহ্মাকে বিদ্যাসমূহ ( বেদ ) জানাইয়াছিলেন, মুমুক্ষুব্যক্তি সেই আত্মবৃত্তিপ্রকাশ ( স্বপ্রকাশ ) দেবের শরণাপন্ন হয়েন।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) "নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ২।১ ॥—বিশ্বের স্থিতির ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্বরূপ গোবিন্দকে ( কৃষ্ণকে ) নমস্কার।"

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু হইতেছেন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া বিশ্বরূপ। সুতরাং এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

(৫) "নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৭॥—নিষ্কল, বিমোহনকারী, শুদ্ধ, অশুদ্ধবৈরী, অদ্বিতীয় মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে; যেহেতু, পরব্রহ্মই নিষ্কল, শুদ্ধ, অদ্বিতীয় এবং মহান্।

(৬) "কৃষ্ণ এষ পরো দেবস্তংধ্যায়েৎ ॥ ২।১৩॥—এই কৃষ্ণই পরদেবতা; তাঁহার ধ্যান করিবে।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(ঘ) **নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ** বলেন—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্ত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যোবিষ্ণুরচ্যুত ইতি ॥
সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওম্ ॥ ৪॥

—দেবকীপুত্ত্র ব্রহ্মণ্যদেব, মধুসূদন ব্রহ্মণ্যদেব, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্যদেব, অচ্যুত বিষ্ণু ব্রহ্মণ্যদেব। সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত কারণপুরুষ, অ-কারণ এক নারায়ণই পরব্রহ্ম।"

এ-স্থলে "দেবকীপুত্ত্র"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, এবং নারায়ণ—এই সমস্তও শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল, নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন।

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রমাণ

(ক) "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৭-১৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই জ্ঞেয়বস্তু, আমিই পবিত্রতাকারক, আমিই ওঙ্কার (প্রণব), ঋক্, সাম ও যজুঃ। আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় কারণ।"

জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, সর্ব্বজীবের শুভাশুভ-কর্ম্মদ্রষ্টা, সমস্তের একমাত্র আশ্রয় এবং সনাতন কারণ হইতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম। আর ওঙ্কারও ব্রহ্মই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম, গীতার এই শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বলা হইয়াছে।

(খ) "প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু ॥৭।৮॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—সকল বেদে আমিই প্রণব—ওঙ্কার।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ; যেহেতু, ওঙ্কারই ব্রহ্ম।

(গ) "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত পুরুষ, দিব্য (স্বয়ং প্রকাশ), আদিদেব, অজ (জন্মরহিত) এবং বিভু।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(ঘ) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেবচাহম্॥ ১৫।১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি (অন্তর্য্যামিরূপে) সমস্ত জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতেই (সকল জীবের) স্মৃতি ও জ্ঞান (জন্মে) এবং (এতদুভয়ের) বিলোপ সাধিত হয়। সমস্ত বেদের আমিই একমাত্র বেদ্য, আমিই বেদান্ত-প্রবর্ত্তক এবং বেদার্থ-বেত্তা।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

**মহাভারত** বলেন—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ উদ্যোগপর্ব্ব।৭১।৪॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত ২।৯।৪)

কৃষ্-হইল সত্তাবাচক শব্দ, আর ণ নির্ব্বৃতি (সুখ)-বাচক। এই উভয়ের ঐক্যে (সত্তা ও আনন্দের ঐক্যে) কৃষ্ণ-শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায়।" (বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদি বিংশোত্তর শতোপনিষদঃ"-নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "গোপালপূর্ব্বতাপনী" শ্রুতির সর্ব্বপ্রথমেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। "শ্লোকমালা"-গ্রন্থেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়)।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাও মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত। গীতাতে যে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। মহাভারতের অন্য স্থলেও যে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

**বিষ্ণুপুরাণ** বলেন—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম ॥৪।১১।২॥

—যে যদুবংশে কৃষ্ণনামক পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

**শ্রীমদ্ভাগবত** বলেন—

"স বা অয়ং **ব্রহ্ম** মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্য-নির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৭।১৫।৭৬॥

—নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—যিনি মহদ্ব্যক্তিদিগের অন্বেষণীয় কৈবল্য-নির্ব্বাণ-সুখানুভূতিস্বরূপ, সেই এই **ব্রহ্ম** তোমাদের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিদায়ক এবং গুরু।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদের মাতুলপুত্র।

"শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ॥ শ্রীভা. ৭।১৫।৭৯॥

—শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, নারদের মুখে ইহা শুনিয়া পার্থ পরম-বিস্মিত হইলেন।"

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে জানা গেল **শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম**।

## ৬৮। পরব্রহ্ম দ্বিভুজ—নরাকৃতি

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে—পরব্রহ্ম মূর্ত্ত, বিগ্রহাত্মক এবং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূর্ত্ত পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম যে দ্বিভুজ, নরাকৃতি, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

### ক। শ্রুতিপ্রমাণ

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে **গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতি বলেন—

"গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
**দ্বিভুজং** জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংস্থতেঃ ॥১।২॥

—(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ) গোপবেশ, মেঘবর্ণ, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত। এ সম্বন্ধে শ্লোকও আছে—যথা। সৎপুণ্ডরীক-নয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর (পীতাম্বর), **দ্বিভুজ**, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালাধারী, ঈশ্বর, গোপগোপাঙ্গনা-পরিবৃত, সুরদ্রুম-তলাশ্রিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, রত্ন-পঙ্কজের মধ্যস্থলে (কর্ণিকারে) অবস্থিত, যমুনার জলতরঙ্গ-স্পর্শী পবনদ্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

এ-স্থলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে **দ্বিভুজ** বলায় তাঁহার নরাকৃতি প্রতিপাদিত হইতেছে।

### খ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে অর্জ্জুন অত্যন্ত ভীত হইলে তাঁহারই প্রার্থনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রথমে স্বকীয় চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইয়া পরে তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্য দ্বিভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন, যাহা দর্শন করিয়া অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্য জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ গীতা ॥১১।৫১॥

—অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত হইলাম এবং সুস্থতা লাভ করিলাম।"

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে "মানুষরূপ" দেখিলেন, তাহা কি ? ইহা যে প্রাকৃত মানুষের প্রাকৃত দেহ নয়, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা ॥৯।১১॥

—মূঢ় লোকগণ আমার পরমতত্ত্ব জানে না বলিয়া সর্ব্বভূত-মহেশ্বর আমাকে মনুষ্যদেহধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অবজানন্তি প্রাকৃতমনুষ্যসমং মন্যন্তে—প্রাকৃত মনুষ্যতুল্য মনে করে। শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত-মনুষ্যতুল্য মনে করাই তাঁহার অবজ্ঞা।" যেহেতু, "মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিকী এব, ন চ ভগবত্তনুঃ তাদৃক্—প্রাকৃত মানুষের দেহ হইতেছে পাঞ্চভৌতিক, প্রাকৃত ; ভগবানের দেহ তদ্রূপ ( পাঞ্চভৌতিক ) নহে। ভগবত্তনু হইতেছে "সচ্চিদানন্দ" ; এই সচ্চিদানন্দ তনু হইতেছে "অনাদি-সিদ্ধ-নিত্য।" ( বলদেব বিদ্যাভূষণ )। নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে অনিত্য পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে করাই হইতেছে অবমাননা।

অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ গীতা ॥৭।২৪॥

—নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় এবং সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠভাব ( স্বরূপ ) জানে না বলিয়া মনে করে— আমি অব্যক্ত ছিলাম, এখন ব্যক্তীভূত হইয়াছি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেন ব্যক্তিং বসুদেবগৃহে জন্মপ্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ঃ মন্যন্তে।—নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত ( অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই ) ছিলাম, এক্ষণে মায়িক আকার গ্রহণ করিয়া বসুদেবের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছি বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছি।" শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—'অব্যক্তং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্বেন অস্পষ্টমপি বাসুদেব-শরীরেণ ব্যক্তিমাপন্নং অস্মদাদিবচ্ছরীরাভিমানিনং মামবুদ্ধয়ো মন্যন্তে।—নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত ( অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্য বলিয়া অস্পষ্ট ) ছিলাম, এক্ষণে বাসুদেবরূপে ব্যক্ত হইয়া প্রাকৃতলোকের ন্যায় দেহাভিমানী হইয়াছি।" শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"অপ্রকাশং শরীরগ্রহণাৎ পূর্ব্বমিতি শেষঃ। ইদানীং লীলাবিগ্রহপরিগ্রহাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। প্রকাশস্য তর্হি কাদাচিৎকত্বং ভগবতি প্রাপ্তং ন ইত্যাহ নিত্যেতি। কথং তর্হি ভগবন্তমাগন্তুকপ্রকাশকং মন্যন্তে ? তত্র অবুদ্ধয় ইত্যুত্তরং তদ্‌বিবৃণোতি পরমিতি।—নির্ব্বোধগণ মনে করে—শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে আমি অপ্রকাশ ছিলাম। এক্ষণে লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহণের অবস্থায় তাহারা তদ্রূপ মনে করে। ভগবানের প্রকাশ কি তাহা হইলে কাদাচিৎক ( ভগবান্ কি সকল সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন না, কোনও কোনও সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন ) ? না, তাহা নহে, ( তাঁহার

প্রকাশ ) নিত্য। তাহা হইলে কেন লোক তাঁহার প্রকাশকে আগন্তুক মনে করে ? তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—অবুদ্ধি লোকগণই এইরূপ মনে করে—যাহারা তাঁহার স্বরূপ জানে না।”

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়—ভগবানের বিগ্রহ প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত শরীর নহে ; ইহা আগন্তুক ( বা সাময়িকও ) নহে, ইহা নিত্য। প্রাকৃত নহে বলিয়া, সচ্চিদানন্দ বলিয়াই, ভগবানের বিগ্রহ নিত্য।

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ **দ্বিভুজ** ( মানুষরূপ। গীতা॥ ১১।৫১ ॥ ) এবং এই বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত—নিত্য।

## গ। পুরাণ-প্রমাণ

**বিষ্ণুপুরাণ** বলেন—

“যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি ॥৪।১১।২॥—যেই যদুবংশে কৃষ্ণনামক **নরাকৃতি** পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

**শ্রীমদ্ভাগবত** বলেন—

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে নারদ বলিতেছেন—

“যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥৭।১৫।৭৫॥

—হে রাজেন্দ্র! নৃলোকে তোমরা অতি ভাগ্যবান্ ; যেহেতু, লোক-পাবন মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করেন এবং অতি রহস্যপূর্ণ মনুষ্যচিহ্নধারী ( দ্বিভুজ ) সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ( শ্রীকৃষ্ণ ) তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।”

বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণেও জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—মনুষ্যলিঙ্গ—নরাকৃতি—দ্বিভুজ ॥”

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণে জানা গেল—পরব্রহ্ম **নরাকৃতি**—**দ্বিভুজ**।

## ৬৯। ব্রহ্মের বিগ্রহ ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রহ হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষত্ব। শক্তি হইতেই বিশেষত্বের উদ্ভব। ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি যেমন ব্রহ্মের স্বরূপভূতা, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্না—সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্না,—এই স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বও—সুতরাং ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রহও হইবে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

পূর্ব্বে ১।১।৫২-অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে, ব্রহ্মের ভগবত্ত্বা ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। ভগবৎ-শব্দবাচ্য ছয়টী গুণের উল্লেখ করিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

“জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥ বি. পু. ৬।৫।৭৯॥”

ভগবান্ ব্রহ্মের জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ আদি ভগবৎ-শব্দবাচ্য বলিয়া ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। জ্ঞান, শক্তি ( মানসিকী শক্তি ), বল ( দৈহিকী শক্তি ), বীর্য্য, তেজঃ—এই সমস্তও বিগ্রহেরই ধর্ম্ম। জ্ঞান-শক্তি-আদি ব্রহ্মের স্বরূপভূত হওয়ায়, ইহাদের ধর্ম্মী বিগ্রহও হইবে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ক। শ্রুতিপ্রমাণ

(১) **বৃহদারণ্যক**-শ্রুতি বলেন—

"স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব, এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ॥৪।৫।১৩॥"

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে "প্রজ্ঞানঘন" বলা হইয়াছে—যেমন সৈন্ধব লবণ রসঘন, তদ্রূপ। একখণ্ড সৈন্ধবে যেমন লবণ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, তদ্রূপ আত্মা ব্রহ্মে "প্রজ্ঞান" ব্যতীত আর কিছুই নাই ; ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন—ঘনীভূত প্রজ্ঞান—ঘনীভূত বিজ্ঞান—চিদ্‌ঘন। প্রজ্ঞান=বিজ্ঞান।

"ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১।৩।১৩॥"—এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "ঘন"-শব্দের একটী অর্থ লিখিয়াছেন—মূর্ত্তি। "ঘনা মূর্ত্তিঃ।" এই অর্থ গ্রহণ করিলে "বিজ্ঞান-ঘন"-শব্দেও "বিজ্ঞানমূর্ত্তি—মূর্ত্ত বিজ্ঞান" বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও একস্থলে "ঘন"-শব্দের অর্থ "শ্রীবিগ্রহ" লিখিয়াছেন। "বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য ( স বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ )। ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৬২৬ পৃষ্ঠা।" কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—"বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম॥ বৃহদারণ্যক॥৩।৯।২৮॥" বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম "মূর্ত্তবিজ্ঞান" হওয়ায় ব্রহ্ম এবং তাঁহার বিগ্রহ যে অভিন্ন, ব্রহ্মের বিগ্রহ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

(২) **গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতি বলেন—

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১।১॥"

এ-স্থলে বেদান্তবেদ্য, বুদ্ধিসাক্ষী, অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে "সচ্চিদানন্দরূপ" বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম কৃষ্ণের রূপই হইতেছে সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। তাঁহার রূপকেও "সচ্চিদানন্দ" বলায় ব্রহ্মের রূপকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—ব্রহ্মের স্বরূপভূতই বলা হইল।

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ গোপালপূর্ব্বতাপনী ॥১।৮॥"

এ-স্থলেও পরব্রহ্ম গোবিন্দকে ( কৃষ্ণকে ) "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" বলাতে তাঁহার বিগ্রহকে তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহারই স্বরূপভূত—বলা হইয়াছে।

"নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥২।২॥"

এ-স্থলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে "বিজ্ঞানরূপ" এবং "পরমানন্দরূপ" বলাতে তাঁহার রূপ বা বিগ্রহই যে—"বিজ্ঞান" এবং "পরমানন্দ", তাহাই বলা হইল। তাৎপর্য্য এই—তাঁহার বিগ্রহ তাঁহারই স্বরূপভূত।

(৩) **গোপালোত্তরতাপনী**-শ্রুতি বলেন—

"ওঁ তদ্ যৎ তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ ॥১৫॥"

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥১৮॥"

এই সকল শ্রুতিবাক্যেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে "বিজ্ঞানঘন", "আনন্দঘন" এবং "নিত্যানন্দৈকরূপ" বলা হইয়াছে—তিনি ঘনীভূত আনন্দ, ঘনীভূত বিজ্ঞান ( চিৎ ), তাঁহার রূপ নিত্যানন্দ। ইহাতেও তাঁহার রূপ যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাহাই বলা হইল।

(৪) **নৃসিংহোত্তরতাপনী**-শ্রুতি বলেন—

"উৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগ্রাসং সর্ব্বপ্রেমাস্পদং সচ্চিদানন্দমাত্রমেকরসম্ ইত্যাদি ॥৫॥"

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দমাত্রম্" বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মবিগ্রহ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপগত —ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—তাহাই সূচিত হইতেছে।

(৫) **কৃষ্ণোপনিষৎ** বলেন—

"শ্রীমহাবিষ্ণুং সচ্চিদানন্দলক্ষণং রামচন্দ্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং মুনয়ো বনবাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ ॥ —সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাবিষ্ণু রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বনবাসী মুনিগণ বিস্মিত হইলেন।"

এ-স্থলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকেও সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ বলা হইয়াছে—তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গও সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ। তাঁহার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দলক্ষণ বলাতে বিগ্রহ যে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন পরব্রহ্মের প্রকাশ-বিশেষ। তাঁহার বিগ্রহই যখন তাঁহার স্বরূপভূত, তখন পরব্রহ্মের বিগ্রহ যে পরব্রহ্মের স্বরূপভূত হইবে, তাহা কৈমুত্য-ন্যায়েই সিদ্ধ হইতেছে।

(৬) **মুক্তিকোপনিষৎ** বলেন—

স্তুতিপূর্ব্বক মারুতি বলিতেছেন,—

"রাম ! ত্বং পরমাত্মাসি সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥১।৪॥"

এ-স্থলে শ্রীরামচন্দ্রকে "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ" বলায় বিগ্রহকে স্বরূপ হইতে অভিন্নই বলা হইল। পরব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহও যখন তাঁহার স্বরূপভূত, তখন পরব্রহ্মের বিগ্রহও যে পরব্রহ্মের স্বরূপভূতই, তাহা কৈমুত্যন্যায়েই সিদ্ধ হইতেছে।

(৭) **বাসুদেবোপনিষৎ** বলেন—

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥ —বাসুদেব

বলিতেছেন—আদিমধ্যান্তবর্জ্জিত, স্বপ্রভ, সচ্চিদানন্দ এবং অব্যয় অদ্বয় ব্রহ্মই আমার রূপ। ভক্তি দ্বারা তাহা জানা যায়।”

সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই যে তাঁহার রূপ বা বিগ্রহ—এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা যায়।

(৮) **শ্রুত্যন্তর-প্রমাণ**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের “সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ”-ইত্যাদি ১০।১৩।৫৪-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উদ্ধৃত একটী শ্রুতিবাক্য হইতেছে এই ঃ—

“আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধাদৃশ্যমানমিতি শ্রুতেঃ ॥”

এই বাক্যেও পরব্রহ্মকে “আনন্দমাত্র” বলা হইয়াছে।

### (খ) ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ

ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ৫।১॥

—শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, অনাদি, সকলের আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।”

এ-স্থলে বলা হইল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার বিগ্রহে কোনও ভেদ নাই। তাঁহার বিগ্রহ তাঁহারই স্বরূপভূত।

### (গ) শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণ

(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার একটী উক্তি এইরূপ ঃ—

“রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥
নাতঃ পরং পরম যদ্‌ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দরশিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥—শ্রীভা. ৩।৯।২-৪॥”

অনুবাদ। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির প্রভাবে তোমা হইতে তমোগুণ (উপলক্ষণে সমস্ত মায়িকগুণ) নিত্যই নিবৃত্ত। উপাসকদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তোমার যে রূপ তুমি প্রকটিত করিলে, তাহা শত শত অবতারের একমাত্র বীজ। তোমার নাভিপদ্মরূপ নিকেতন হইতেই আমার আবির্ভাব। হে পরম! তোমার যে রূপ আমি দর্শন করিতেছি, তাহা **তোমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে**। তোমার এই রূপ তোমার স্বরূপেরই ন্যায় আনন্দমাত্র, ভেদশূন্য, অনাবৃত, বিশ্বের সৃষ্টিকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন, ভূতসকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ। আমি তোমার এই রূপেরই শরণাগত হইলাম। হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই ধ্যানকালে তুমি তোমার এইরূপ দর্শন করাইয়াছ। ইহাই

তোমার সেই স্বরূপগত রূপ। হে ভগবন্! পুনঃ পুনঃ তোমাকে নমস্কার করিতেছি। নরকভাক্ মায়ামুগ্ধ জনগণই তোমার এই রূপের অনাদর করিয়া থাকে ( সচ্চিদানন্দবিগ্রহকেও মায়িক বলিয়া মনে করে )।

শ্রীধরস্বামিপাদ উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের টীকায় লিখিয়াছেন—

“ননু ত্বমপি সম্যঙ্ ন জানাসি যৎ ত্বয়া দৃষ্টম্ এতদপি গুণাত্মকমেব নির্গুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। অববোধরসোদয়েন চিচ্ছক্ত্যাবির্ভাবেন শশ্বৎ সদা নিবৃত্তং তমো যস্মাৎ তস্য তব যদ্ এতদ্রূপং ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সতাম্ উপাসকানাম্ অনুগ্রহায় গৃহীতম্ আবিষ্কৃতম্ অবতারশতস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যদ্ একম্ বীজম্ মূলম্। তৎপ্রদর্শনার্থং গুণাবতারবীজত্বং দর্শয়তি যন্নাভীতি ॥২॥ হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অতঃ অবিকল্পং নির্ভেদং অতএব আনন্দমাত্রম্। এবম্ভূতং যদ্ ভবতঃ স্বরূপম্। তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি। কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপম্ উপাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যর্থঃ। একম্ উপাস্যেষু মুখ্যম্। যতঃ বিশ্বসৃজং বিশ্বং সৃজতীতি, অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাৎ অন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ ॥৩॥ ননু এবমপি সোপাধিকম্ এতদ্ অর্ব্বাচীনম্ এব ইত্যাশঙ্ক্যাহ। তদ্বৈ তদেব ইদম্। হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে ত্বয়া নোঽস্মাকম্ উপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। নহি অব্যক্তবর্ত্ম্যভিনিবেশিতচিত্তানাম্ অস্মাকং ত্বয়া সোপাধিকদর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ যোঽনাদৃত ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ ॥৪॥”

এই টীকার তাৎপর্য্য। ভগবান্ যদি এরূপ বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি সম্যক্ জান না; তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহাও ( মায়িক ) গুণাত্মক; নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। “রূপম্”-ইত্যাদি দুই শ্লোকে ইহার উত্তর দিতেছেন। চিচ্ছক্তির আবির্ভাবে যাহা হইতে তমঃ ( মায়া ) চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাই তোমার এই রূপ। উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃই তুমি স্বাধীনভাবে তোমার এই রূপ আবিষ্কৃত ( আবির্ভাবিত ) করিয়াছ; শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শত-শত অবতারের ইহাই একমাত্র মূল। এই রূপই অবতারসমূহের মূল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই রূপের গুণাবতারবীজত্ব দেখাইতেছেন—যন্নাভীতি-শ্লোকে। হে পরম! তোমার স্বরূপ—অবিদ্ধবর্চ্চঃ—অনাবৃত-প্রকাশ, অতএব অবিকল্প—নির্ভেদ; অতএব—আনন্দমাত্র। এবম্ভূত যে তোমার স্বরূপ, সেই স্বরূপকে এই দৃশ্যমান্ রূপ হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না, কিন্তু এই রূপই তোমার সেই স্বরূপ। এই কারণে তোমার এই রূপের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ইহাই শরণের যোগ্য রূপ। এই রূপই উপাস্যসমূহের মধ্যে মুখ্য; যেহেতু, ইহা বিশ্ব-সৃষ্টিকারী, অতএব ইহা অবিশ্ব—বিশ্ব হইতে ভিন্ন—বিশ্বাতীত। এই রূপ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক—ভূতসমূহের এবং ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ। ( এস্থলে আবার একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে। তাহা এই ) ভগবান্ যদি বলেন—আমার এই রূপ তো উপাধিযুক্ত, অর্ব্বাচীন ( আধুনিক )। এই আশঙ্কার উত্তরেই বলা হইয়াছে—হে ভুবনমঙ্গল! আমাদের ন্যায় উপাসকদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদের ধ্যানকালে তোমার এই রূপের দর্শন দিয়াছ। আমরা অব্যক্তবর্ত্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছি; আমাদের পক্ষে সোপাধিক দর্শন যুক্তিসঙ্গত হয় না। ইহাই ভাবার্থ। অতএব আমরা অনুবৃত্তিদ্বারা তোমাকে নমস্কার

করিতেছি। ( আবার পূর্ব্বপক্ষ। আমি যদি নিরুপাধিকই হই ) তবে কেন কেহ কেহ আমার আদর করে না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠগণই তোমার আদর করে না।

এই টীকা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে ( ৩০৯ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন—"মাং নাদ্রিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মরূপত্বেন স্থাপিতত্বাৎ।—কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিগ্রহরূপ আমার অনাদর করে ( আমার বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করে; ইহাই অনাদর; যেহেতু, বিগ্রহ মায়িক নহে ), বিগ্রহেরই পরব্রহ্মত্ব স্থাপিত হইয়াছে ( শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে )।

শ্রীধরস্বামিপাদের এই টীকায় শ্লোকত্রয়ের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ বা বিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন, তাহা মায়াতীত, নিরুপাধিক এবং তাহা ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। ভগবানের স্বরূপ হইতেছে—আনন্দমাত্র; সুতরাং তাঁহার বিগ্রহও আনন্দমাত্র।

ভগবানের সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যাননিমগ্ন ব্রহ্মা যাহা অনুভব করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার এই অপরোক্ষ অনুভব শ্রুতিসম্মতও; সুতরাং ইহা বিদ্বদনুভবরূপ প্রমাণ।

(২) পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশস্থানীয় ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের বিগ্রহও যে তাঁহাদের স্বরূপভূত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অপর একটী শ্লোক হইতেও জানা যায়।

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৫৪॥"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রকাশিত বৎস-বৎসপালগণের প্রত্যেকেই এবং বৎসপালগণের বেণু-বিষাণাদি প্রত্যেকেও নানালঙ্কারভূষিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দৃষ্ট এই নারায়ণ-স্বরূপসমূহ সম্বন্ধেই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ইঁহারা সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি; শাস্ত্রচক্ষু আত্মজ্ঞগণও ইঁহাদের মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারেন না।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেঽপি বিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্র-বিজাতীয়সম্ভেদরহিতাস্তত্রাপি চৈকরসা সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তো যদ্বা সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষামিতি। অতএব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি হি নিশ্চিতম্ অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ ন স্পৃষ্টং স্পর্শযোগ্যং ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তো ব্যদৃশ্যন্তেতি॥"

স্বামিপাদের টীকায় শ্লোকের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহাংশভূত উল্লিখিত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের বিগ্রহও—সত্য, জ্ঞানরূপ, আনন্দরূপ এবং অনন্ত; অথবা সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরস যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের বিগ্রহ; এই বিগ্রহসমূহে বিজাতীয়—জ্ঞানানন্দ ব্যতীত অপর—কোনও বস্তু নাই।

এইরূপে উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের বিগ্রহও তাঁহাদের এবং পরব্রহ্মেরও স্বরূপভূত।

ইহা ব্রহ্মার অপরোক্ষ অনুভূতি। এই অনুভূতির কথা শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও বিদ্বদনুভব।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব বর্ণন করিয়া শ্রীনারদও পরে বলিয়াছেন—

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥—শ্রীভা. ১০।৩৭।২২॥

—হে ভগবন্! তুমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন, স্বীয় পরমানন্দরূপ-স্বরূপে সম্যক্‌স্থিতিবশতঃ তুমি সর্ব্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছ (তুমি আপ্তকাম); তুমি অমোঘ-বাঞ্ছিত (সত্যসঙ্কল্প); স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়ার গুণ-প্রবাহকে তুমি চিরকালের জন্য নিবৃত্ত করিয়াছ। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বিশুদ্ধবিজ্ঞানমিতি কেবলং জ্ঞানৈকমূর্ত্তিম্—তুমি জ্ঞানৈকবিগ্রহ।"

উল্লিখিত শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (৬২৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য।—পরমতত্ত্বরূপ বিজ্ঞানই যাঁহার শ্রীবিগ্রহ, তিনি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ—বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন—তিনি জ্ঞানঘনবিগ্রহ; জ্ঞান-ব্যতীত অপর কিছু তাঁহার বিগ্রহে নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ব্রহ্ম হইলেন জ্ঞান-স্বরূপ; তাঁহার বিগ্রহও ঘনীভূত জ্ঞানস্বরূপ হওয়াতে তাঁহার বিগ্রহও তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মের বিগ্রহ তাঁহা হইতে অভিন্ন—ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

### ঘ। বেদান্তসূত্র-প্রমাণ

**অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ** ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ৩।২।১৪॥

এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"রূপং বিগ্রহঃ তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবৎ ইতি উচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থম্ এব শব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তস্য রূপস্য এব প্রধানত্বাৎ আত্মত্বাৎ। বিভুত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদি-ধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ। —ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, এজন্য তাঁহাকে অরূপবৎ বলা হয়; তিনিই বিগ্রহ—ইহাই অর্থ। যুক্তি-নিরাসার্থ এব-শব্দের প্রয়োগ। 'তৎপ্রধানত্বাৎ'-শব্দেই ইহার হেতু বলা হইয়াছে। তাঁহার রূপেরই প্রধানত্ব অর্থাৎ আত্মত্ব বলিয়া। সেই রূপেরই বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, প্রত্যক্ত্ব (ব্যাপকত্ব)-আদি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিত্ব বশতঃ।"

গোবিন্দভাষ্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম রূপবৎ (রূপবান্) নহেন, ব্রহ্মই রূপ। তাৎপর্য্য এই। রূপ-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয়যোগে রূপবৎ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্ম-শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ রূপবৎ শব্দ প্রয়োজিত

হইয়াছে। পুংলিঙ্গে রূপবান্ হইবে। অর্থ—রূপবিশিষ্ট। মতুপ্-প্রত্যয়ে ভেদ বুঝায়। একটী উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ধন-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয়যোগে ধনবান্-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহার ধন আছে, তাহাকে ধনবান্ বলা হয়। ধন এক বস্তু, ধনবান্ লোক আর এক বস্তু; এই দুই বস্তু অভিন্ন নহে, দুইটী পৃথক্ বস্তু। তদ্রূপ রূপবৎ ( বা রূপবান্ ) বলিলেও দুইটী পৃথক্ বস্তু সূচিত হয়—একটী রূপ ( বা বিগ্রহ ), অপরটী রূপবান্। এইরূপে মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ "রূপবৎ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্ম রূপবৎ ( বা রূপবান্ ) হইলে ব্রহ্ম হইবেন একটী বস্তু এবং তাঁহার রূপ হইবে আর একটী বস্তু—দুইটী ভিন্ন বস্তু। আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ অর্থেরই নিরসন করিয়া বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম হইতেছেন "অরূপবৎ।" ন রূপবৎ=অরূপবৎ। ব্রহ্ম রূপবৎ নহেন—ব্রহ্ম একবস্তু, তাঁহার রূপ আর একটী বস্তু, ইহা নহে; ব্রহ্মে এবং তাঁহার রূপে কোনওরূপ ভেদ নাই; ব্রহ্মই রূপ বা বিগ্রহ। "অরূপবৎ এব—ব্রহ্ম এবং তাঁহার রূপ অভিন্নই।" "হি"—ইহা নিশ্চিত।

ব্রহ্ম এবং তাঁহার রূপ যে এক এবং অভিন্ন—এইরূপ বলার হেতু বলা হইয়াছে সূত্রের শেষার্দ্ধে—তৎপ্রধানত্বাৎ-শব্দে; তৎপ্রধানত্বহেতু। তৎপ্রধানত্বাৎ—তস্য রূপস্য প্রধানত্বাৎ আত্মত্বাৎ। ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রহই যে ব্রহ্ম—ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; মতুপ্-সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দে ব্রহ্ম ও তাঁহার রূপের ( বা বিগ্রহের ) একত্ব বা অভিন্নত্ব বুঝায় না। এজন্য ব্রহ্মকে রূপবৎ ( রূপবান্ ) বলা যায় না। ব্রহ্ম হইতেছেন অরূপবৎ—অ-রূপবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মই রূপ বা বিগ্রহ।

পরবর্ত্তী "প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যম্ ॥৩।২।১৫॥" এবং "আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬॥" —এই দুইটী ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও উল্লিখিত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।

**প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্** ॥৩।২।১৫॥-সূত্রে বলা হইয়াছে, প্রকাশযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের বিগ্রহ ব্যর্থ হইবার নহে। শঙ্কা-নিরাসের জন্য "চ"-শব্দের প্রয়োগ। সপ্তম্যন্ত প্রকাশ-শব্দের উত্তর "ইব অর্থে বতি"-প্রত্যয় দ্বারা "প্রকাশবৎ"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যে যেমন ধ্যানার্থ বিগ্রহ উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ ধ্যানের নিমিত্ত জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে বিগ্রহ-স্বীকারই সঙ্গত। বিগ্রহ ব্যতীত ধ্যান সম্ভব হয় না; কেননা, বিগ্রহই ধ্যানের বিষয়। "বিরহিণী, কান্তকে ধ্যান করে"-ইত্যাদি স্থলে বিগ্রহবিষয়েই ধ্যান দৃষ্ট হয় ( গোবিন্দভাষ্য )।

ধ্যানের নিমিত্ত যে বিগ্রহ স্বীকৃত হয়, তাহা অলীক কল্পনা নহে; তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী সূত্রে পাওয়া যায়। সূত্রটী এই ঃ—

**আহ চ তন্মাত্রম্** ॥৩।২।১৬॥ এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—"অবধৃতৌ মাত্রশব্দঃ। তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিঃ অতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রূয়তে। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিতি। অত্র পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্মা বিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি বিস্ফুটম্। দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাদ্ ভিন্নঃ দেহী ইতি এবং ভিদা ঈশ্বরবস্তুনি নাস্তি। কিন্তু দেহ এব দেহী ইতি লব্ধম্।"

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই ঃ—শ্রুতিতে ব্রহ্মের বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে; সুতরাং বিগ্রহই হইতেছেন প্রমেয় তত্ত্ব। "সৎপুণ্ডরীক-নয়নম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট বিগ্রহকেই যে

ঈশ্বর ( প্রমেয়তত্ত্ব ) বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। স্মৃতিও বলেন—ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই —যেই দেহ, সেই দেহী—ইহাই স্মৃতি হইতে জানা যায়।

ইহার পরবর্ত্তী **"দর্শয়তি চ অথ অপি স্মর্য্যতে**॥৩।২।১৭"-সূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"বিগ্রহ এব আত্মা, আত্মা এব বিগ্রহ ইতি। —বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ।"

এইরূপে বেদান্তের উল্লিখিত সূত্রচতুষ্টয় হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের বিগ্রহ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

**"অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ**॥১।১।২০॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পরস্যৈব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্য স্বাভাবিকনিরতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি। তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যনিরবদ্যনিরতিশয়ৌজ্জ্বল্যসৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্তগুণনিধিদিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমস্তি। ( ইহার পরে বহু শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে ) ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রাকৃত-হেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহ-সম্বন্ধং তন্মূলকর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান্ কল্যাণরূপঞ্চ বদন্তি। তদিদং স্বাভাবিকমেব। * * * অতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ এবং রূপ-রূপবত্ত্বাদয়মপি তস্যৈব ধর্ম্মঃ।"

**মর্ম্মানুবাদ।** "পরব্রহ্ম নিখিল-হেয়গুণগণবিরোধী অনন্ত-জ্ঞানানন্দস্বরূপ বলিয়া তদিতর-পদার্থনিচয় ( প্রাকৃত বস্তুসমূহ ) হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। তাঁহাতে নিরতিশয় অশেষ-কল্যাণগুণসমূহ বিদ্যমান এবং তাঁহার এই সমস্ত স্বাভাবিক ( স্বরূপভূত )। ঠিক সেইরূপ তাঁহার স্বাভাবিক ( স্বরূপভূত ) দিব্য রূপও আছে। তাঁহার এই দিব্য স্বাভাবিক রূপটী আবার স্বাভিমতানুরূপ ( স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ) এবং একরূপ ( স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে তিনি স্বীয় বহুরূপ প্রকাশ করিলেও এই বহুরূপেও তিনি একরূপ ), এবং দিব্য, অচিন্ত্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবদ্য ( নির্দ্দোষ ) এবং সর্ববাতিশায়ী ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত গুণসমূহের আকর। ( ইহার পরে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে ) এই সকল শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত-হেয়গুণসমূহ, প্রাকৃত-হেয়-দেহসম্বন্ধ এবং ( প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধের ) মূল কারণ কর্ম্মবশ্যতাসম্বন্ধও নিষেধ করিয়া তাঁহার কল্যাণগুণসমূহ এবং স্বাভাবিক কল্যাণ-রূপের কথা বলা হইয়াছে। * * *। অতএব পরব্রহ্মের এতাদৃশ রূপবত্ত্বাদি তাঁহারই ধর্ম্ম।"

উল্লিখিত শ্রীপাদ রামানুজের উক্তি হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের রূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

(ঙ) পূর্ববর্ত্তী আলোচনায় জানা গিয়াছে—পরব্রহ্মের বিগ্রহ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ—আনন্দঘন, চিদ্‌ঘন, সচ্চিদানন্দ। কিন্তু তাঁহার বিগ্রহকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মকও বলা হয়। ব্রহ্মার উক্তিতে তাহা জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণস্তবে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥—শ্রীভা.১০।২।৩৪॥

—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—জগতের পালনের নিমিত্ত আপনি সর্ব্বজীবের মঙ্গলনিকেতন **শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীবিগ্রহ** প্রকাশ ( প্রকটিত ) করিয়া থাকেন ; তাহাতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই চারি আশ্রমের লোকগণ বেদপাঠ, ক্রিয়াযোগ, তপস্যা, সমাধি—এই চারিটী আশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনার পূজা করিতে সমর্থ হয়েন।”

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম ( ১।১।৬৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। তাঁহার বিগ্রহকে ব্রহ্মা শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে স্বরূপ-শক্তি ( ১।১।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষদ্বারাই স্বপ্রকাশ-ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন ( ১।১।৬৬-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। উক্ত শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—“পরমকারণ-ত্বদ্‌বপুষঃ পরমতত্ত্বৈকরূপত্বেঽপি বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তৎপ্রকাশ-শক্তিরূপত্বেন তদভেদবিবক্ষয়া বিশুদ্ধং মায়াতীতং চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষঃ সত্ত্বমেব বপুরিত্যুক্তম্।—চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ মায়াতীত বিশুদ্ধসত্ত্বই হইতেছে বিগ্রহ-প্রকাশিকা শক্তি ; ইহাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বিবক্ষাতেই পরতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলা হইয়াছে।” উক্ত শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে ( ৫১ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন—“সত্ত্বং তেন প্রকাশমানত্বাৎ তদভিন্নতয়া রূপিতং বপু র্ভবান্ শ্রয়তে প্রকটয়তি।—শুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা প্রকাশমানত্ব হেতু তাহা হইতে অভিন্ন-রূপে নিরূপিত বিগ্রহ আপনি প্রকটিত করিয়াছেন।”

উভয় টীকার তাৎপর্য্য একই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বিগ্রহ হইতেছেন আনন্দ-স্বরূপ। এই আনন্দস্বরূপের স্বাভাবিকী—স্বরূপভূতা—শক্তি হইতেছে চিচ্চক্তি বা স্বরূপশক্তি-যাহাকে বিশুদ্ধসত্ত্বও বলা হয় ( ১।১।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই আনন্দস্বরূপ বিগ্রহকে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ-একই অভিন্ন বস্তু।

## চ। ব্রহ্মরূপের ব্রহ্মস্বরূপতা সম্বন্ধে যুক্তি

ব্রহ্মের রূপ যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তত্ত্বটী যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন “শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥”-এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পশ্চাতে যে যুক্তিও আছে, তাহাই দেখান হইতেছে।

ব্রহ্মের যে রূপ আছে, শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণে তাহা দেখান হইয়াছে। এই রূপটী হইবে—হয়তো প্রাকৃত, আর না হয় অপ্রাকৃত—মায়াতীত। ব্রহ্ম যখন মায়াতীত তত্ত্ব, ব্রহ্মকে যখন বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শও করিতে পারে না, তখন ব্রহ্মের বিগ্রহও মায়িক বা প্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত যখন হইতে পারে না, তখন এই বিগ্রহ হইবে—অপ্রাকৃত, মায়াতীত।

মায়াতীত বস্তু মাত্র একটী—ব্রহ্ম, স্বাভাবিকী-পরাশক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম হইতেছেন—শক্তিমান্ আনন্দ। সুতর্‌াং ব্রহ্মের বিগ্রহও হইবে—শক্তিমান্ আনন্দ। ব্রহ্মও আনন্দ, তাঁহার বিগ্রহও আনন্দ। সুতরাং ব্রহ্মে এবং তাঁহার বিগ্রহে কোনও ভেদ থাকিতে পারে না ; ব্রহ্মের বিগ্রহও ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

ব্রহ্ম-বিষয়ে **বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিগ্রহ।** ব্রহ্ম গুণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যেমন উপচারবশতঃ তাঁহাকে গুণী বা সগুণ বলা হয়, ভগাত্মক হওয়া সত্ত্বেও যেমন উপচারবশতঃ তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিগ্রহাত্মক হওয়া সত্ত্বেও কেবল উপচারবশতঃই তাঁহাকে বিগ্রহবান্ বা রূপবান্ বলা হয়।

## ৭০। ব্রহ্মে দেহ-দেহি-ভেদহীনতা

প্রাকৃত জগতে জীবের দেহের মধ্যে দেহী—জীবাত্মা—অবস্থান করে। এই জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন অচেতন দেহটী পড়িয়া থাকে; তখনই বলা হয়—ঐ জীবের মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—প্রাকৃত জীবের দেহটী এক বস্তু, দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে অপর একটী বস্তু। দেহটী জড়—পঞ্চভূতাত্মক, স্বরূপতঃ অচেতন; কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা—চেতন, চিন্ময়, অ-জড়। সুতরাং জীবের দেহ এবং দেহী হইতেছে দুইটী ভিন্ন বস্তু—একটী জড়, আর একটী চিন্ময়।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৬৯-অনুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্মের বিগ্রহও (দেহও) যাহা, ব্রহ্মও তাহা—বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিগ্রহ। যেমন শিলাপুত্র (শিলের নোড়া)। শিলাপুত্রই শিলাপুত্রের শরীর। "শিলা-পুত্রস্য তু শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবৎ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী॥ ৪৬ পৃষ্ঠা॥" যেমন, চিনির পুতুল—সর্ব্বত্রই চিনি, কেবলই চিনি। এই চিনি যদি চেতনবস্তু হইত, তাহা হইলে পৃথক্ কোনও চেতনাময় আত্মার অধিষ্ঠান-ব্যতীতও চিনির পুতুল চলাফিরা করিতে পারিত, কথা বলিতে পারিত। ব্রহ্মের দেহ বা বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া স্বরূপতঃই চেতন, সচ্চিদানন্দ; সুতরাং অপর কোনও চেতনবস্তুর অধিষ্ঠানব্যতীতই ব্রহ্মের বিগ্রহ সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্থ। জীবে যেমন দেহ এবং দেহী—এই দুইটী বস্তু আছে, ব্রহ্মে তাহা নাই। ব্রহ্মে কেবল একটীমাত্র বস্তু—আনন্দ, চেতন আনন্দ। সুতরাং দেহী বা বিগ্রহবান্ ব্রহ্ম এক বস্তু, তাঁহার বিগ্রহ আর এক বস্তু—তত্ত্বতঃ তাহা নয়। তবে যে সাধারণতঃ "ব্রহ্মের বিগ্রহ" বা "শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ"—ইত্যাদি বলা হয়, তাহা কেবল ভাষার ভঙ্গীমাত্র, উপচারবশতঃই এইরূপ বলা হয়। "সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ। ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহদেহিনঃ॥ লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণ॥ ৩৪১॥—শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দসান্দ্রতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার দেহ ও দেহী ভিন্ন নহে; কেবল উপচারবশতঃই 'তাঁহার দেহ' এইরূপ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে দেহ-দেহি-ভেদ-প্রতীতি জন্মান হয়।" এজন্যই কূর্ম্মপুরাণ বলেন—"দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ —ঈশ্বরে কখনও দেহ-দেহি-ভেদ নাই।"

ব্রহ্মে দেহ-দেহিভেদ-হীনতার একটী অপূর্ব্ব প্রভাব এবং জীবদেহ অপেক্ষা একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। জীবের দেহ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-আদি পঞ্চভূতে গঠিত; এই পঞ্চভূতের ধর্ম্মও সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। আবার, জীবদেহের সর্ব্বত্র এই পাঁচটী ভূতের পরিমাণও সমান নহে। চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী; তাই চক্ষু দেখিতে পায়; কিন্তু শুনিতে পায় না। কর্ণে শব্দের (ব্যোমের) ভাগ বেশী; তাই কর্ণ শুনিতে পায়; কিন্তু দেখিতে পায় না। এইরূপে জীবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কিন্তু ব্রহ্ম-বিগ্রহে একটী মাত্র বস্তু—আনন্দ, ঘনীভূত আনন্দ। ব্রহ্মের কর-চরণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই ঘনীভূত

আনন্দমাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও তত্ত্বতঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নহে ; সকল ইন্দ্রিয়ের এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সমান বৃত্তি। একথাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি ॥৫।১২॥—যাঁহার সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বর্ত্তমান।" ব্রহ্ম চক্ষুদ্বারাও শুনিতে পারেন, কর্ণদ্বারাও দেখিতে পারেন, পৃষ্ঠদ্বারাও দর্শন-শ্রবণাদি করিতে পারেন। তাঁহার যে কোনও অঙ্গেরই যে কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তি আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩।১৪॥—সকল দিকে তাঁহার কর-চরণ, সকল দিকে তাঁহার চক্ষুঃ, শিরঃ ও মুখ, সকল দিকে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়। তিনি সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-বিগ্রহ অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মের বিগ্রহ-সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ কথাই বলা যায়—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ" ইত্যাদি। তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ধারণ করে বলিয়া বিগ্রহের সকল স্থানেই কর-চরণ-চক্ষুঃকর্ণাদির ক্রিয়া নিত্য বিরাজিত।

## ৭১। ব্রহ্মরূপের নিত্যত্ব

ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদিসিদ্ধ নিত্য বস্তু। ব্রহ্মের রূপ বা বিগ্রহ যখন ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তখন ব্রহ্মের রূপও হইবে অনাদিসিদ্ধ নিত্যবস্তু।

ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ বস্তু হইতেছে অপ্রাকৃত—নিত্য।

এজন্যই শ্রুতি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নিত্যো নিত্যানাম্—ব্রহ্ম নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যেও নিত্যবস্তু।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন—"সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি।—ব্রহ্মের অবয়ব বা বিগ্রহ আছে স্বীকার করিলে অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।" ইহা যে লৌকিকী এবং শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ যুক্তি, তাহা দেখান হইতেছে।

প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায়—জীবমাত্রেরই দেহের উৎপত্তিও আছে এবং বিনাশও আছে ; সুতরাং জীবের দেহ অনিত্য। ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দেহমাত্রই অনিত্য, তাহা হইলে ইহা হইবে লৌকিকী যুক্তি এবং সীমাবদ্ধ-জ্ঞানমূলক যুক্তি।

এই যুক্তিকে লৌকিকী বলা হইল এই জন্য যে—যে অভিজ্ঞতার উপর এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতা মাত্র। আর ইহাকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান-মূলক বলা হইল এই জন্য যে—লৌকিক জগতের ঊর্দ্ধে এই অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি নাই। এতাদৃশী যুক্তির সহায়তায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যবিষয়ক বিচারে এতাদৃশী যুক্তির স্থান থাকিতে পারে ; কিন্তু যদি সিদ্ধান্তটী শাস্ত্রসম্মত না হয়, তাহা হইলে এই যুক্তি আদরণীয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছেন প্রকৃতির অতীত বস্তু ; সুতরাং প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিগ্রহের বৈলক্ষণ্য আছে। জীবের দেহ প্রাকৃত বস্তু, পঞ্চভূতে নির্ম্মিত ; কিন্তু ব্রহ্মবিগ্রহ প্রাকৃত নহে, পঞ্চভূতে নির্ম্মিত নহে। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ জড়—চিদ্বিরোধী ; ব্রহ্মবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ—জড়বিরোধী। অন্ধকার ও সূর্য্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জড় এবং চিদ্বস্তুর মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। জড় পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎপত্তি-বিনাশ

আছে ; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-বিগ্রহের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। সুতরাং প্রাকৃত দেহের ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মবিগ্রহের ধর্ম্মের তুলনা চলিতে পারে না। এই দুইটী বস্তু হইতেছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট।

অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে যে কেবলমাত্র প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কবিচারের কোনও স্থান নাই, মহাভারতের—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"-এই প্রমাণটী তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যের একাধিক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা বলিয়া গিয়াছেন (অবতরণিকা ৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাপি তিনি ব্রহ্মের বিগ্রহ-সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া কেন যে কেবল প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বীয় উক্তিরই বিরুদ্ধাচরণ করিলেন এবং শ্রুতিবাক্যের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

শ্রুতি যে ব্রহ্মের বিগ্রহের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মবিগ্রহ যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"—এই ন্যায় অনুসারে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের লৌকিকী অভিজ্ঞতার সহিত তাহার কোনওরূপ সঙ্গতি আমরা দেখিতে না পাইলেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে ; কেননা, তাহা হইতেছে বেদবাক্য—সুতরাং অভ্রান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিটী অন্যভাবেও বিচার করা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি।—সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।"

অবয়বের সহিত বর্ত্তমান—সাবয়ব, অবয়ববিশিষ্ট। এস্থলে অবয়ব এক বস্তু এবং অবয়ববিশিষ্ট বস্তু হইতেছে আর একটী বস্তু ; যেমন জীবের প্রাকৃত দেহ এবং জীবস্বরূপ (জীবাত্মা)। কিন্তু ব্রহ্মে দেহদেহিভেদ নাই বলিয়া এই অর্থে ব্রহ্মকে বস্তুতঃ সাবয়ব বলা চলে না ; সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিও ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির আরও একটা দিক্ আছে। সাবয়বত্ব স্বীকার করিলে অবয়বের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ আসিতে পারে, কিন্তু অবয়বীর অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ আসে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীবাত্মা—দেহী—অবয়বী, সাবয়ব। তাহার দেহের বা অবয়বের উৎপত্তি-বিনাশ আছে ; কিন্তু তাহার—জীবাত্মার—উৎপত্তি-বিনাশ নাই ; জীবাত্মা নিত্য। সুতরাং ঔপচারিক ভাবে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং তর্কের অনুরোধে ব্রহ্মবিগ্রহের নিত্যত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাবয়বত্বে ব্রহ্মের অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ আসে না।

এইরূপে দেখা গেল, কোনও দিক্ দিয়াই শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তি বিচারসহ নহে। ব্রহ্মবিগ্রহ অপ্রাকৃত এবং সচ্চিদানন্দ বলিয়া, ব্রহ্মবিগ্রহ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া—ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্যবস্তু।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"আমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে।—বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি ॥ গীতা ॥৪।৫॥" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যদি জন্মই থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বিগ্রহের নিত্যত্ব এবং স্ব-স্বরূপভূতত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি" বলিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা—অজ এবং অব্যয়াত্মা হইয়াও।" তিনি যে অজ এবং অবিনশ্বর, তাহাও বলিয়াছেন। অজ ( জন্মরহিত ) যিনি, তাঁহার আবার "বহু জন্ম" কিরূপ হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরও তিনি নিজে দিয়া গিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ গীতা॥ ৪।৯॥—আমার জন্ম এবং কর্ম্ম উভয়ই দিব্য ( প্রাকৃত জীবের জন্ম-কর্ম্মের মতন নহে )।"

তিনি যে বস্তুতঃ অজ—জন্মরহিত, তাঁহার যে বাস্তবিক কোনও জন্ম নাই, তাহা পরবর্ত্তী ১।১।১৪৩-অনুচ্ছেদে দেখান হইবে।

আবারও প্রশ্ন হইতে পারে—মৌষল-লীলায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তো দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার দেহের নিত্যত্ব এবং স্ব-স্বরূপভূতত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায় ? এই প্রসঙ্গও পরবর্ত্তী ১।১।১৪৪খ-অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে এবং সেই আলোচনায় শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক দেখান হইবে—তাঁহার বিগ্রহ নিত্য।

ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে ( পরবর্ত্তী ১।১।১৪১-৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ); কিন্তু জন্ম-মৃত্যু নাই। ব্রহ্মবিগ্রহ নিত্য।

## ৭২। ব্রহ্ম-বিগ্রহের বিভুত্ব

প্রাকৃত জগতে আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রের দেহই পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ। তাহা হইতে যদি মনে করা হয় যে, ব্রহ্মের বিগ্রহও পরিচ্ছিন্ন, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না ; যেহেতু জীবের দেহ এবং ব্রহ্মের দেহ স্বরূপতঃই ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট।

প্রাকৃত বস্তুমাত্রই জড় এবং সীমাবদ্ধ—দেশে সীমাবদ্ধ ( অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতাদি আছে ) এবং কালেও সীমাবদ্ধ ( অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ আছে বলিয়া অচিরকালস্থায়ী )। এজন্যই শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি—অল্প ( সীমাবদ্ধ ) বস্তুতে সুখ নাই।" যেহেতু, "ভূমৈব সুখম্—সুখ হইতেছে ভূমা ( অসীম ) বস্তু।" সসীম জড়-ব্রহ্মাণ্ডে অসীম বা ভূমা সুখ-বস্তু থাকিতে পারে না।

যে আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাই হইতেছে—সুখ। এই সুখ হইতেছে—চিদানন্দ। চিৎ বলিয়া এই আনন্দ হইতেছে জড়-বিরোধী, অপ্রাকৃত। চিৎ-বিরোধী জড় বস্তু হইতেছে সীমাবদ্ধ, জড়-বিরোধী চিৎ-বস্তু হইবে তাঁহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট—অসীম, ভূমা—সর্ব্ববিষয়ে সীমাহীন—দেশে সীমাহীন এবং কালেও সীমাহীন ( নিত্য ) ;

পূর্ব্বেই শ্রুতিপ্রমাণবলে দেখান হইয়াছে—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছেন এক এবং অভিন্ন—সচ্চিদানন্দ ; সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মবিগ্রহও হইবেন—অসীম—দেশে অসীম ( অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, সর্ব্বব্যাপক ) এবং কালেও অসীম ( অর্থাৎ নিত্য )।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃই অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বব্যাপক ; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপভূত ব্রহ্মবিগ্রহও হইবেন—অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপক ; যেহেতু, স্বরূপের ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ তো পরব্রহ্ম ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে তো পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে হয় ; যেহেতু, প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যশোদামাতার কোলে বসিয়া তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছেন, যশোদামাতা তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছেন ; আবার, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিত্ব করিয়াছেন—অর্জ্জুনের রথোপরি সারথির আসনে উপবেশন করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্বেরই পরিচায়ক, অপরিচ্ছিন্নত্বের পরিচায়ক নহে। সুতরাং ব্রহ্মবিগ্রহকে কিরূপে অপরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে যে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে আরও কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই কথাগুলিরই আলোচনা করা হইতেছে।

### শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ

(ক) একদিন যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক স্নেহপরিপ্লুতচিত্তে স্তন্যপান করাইতেছেন, আর কৃষ্ণের মন্দহাসিযুক্ত পরমসুন্দর মুখখানির লালন করিতেছেন। স্তন্যপান প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভা ত্যাগ করিলেন ( হাই তুলিলেন )। তখন যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যেই আকাশ, স্বর্গ, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, স্থাবর-জঙ্গমাদি সমুদায় ভূত বিরাজমান।

"একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥
পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্ জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥
খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥
শ্রীভা. ১০।৭।৩৪-৩৬॥"

যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণের মুখ-গহ্বরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের মুখখানি তখনও স্তন্যপান-কালের ন্যায় ক্ষুদ্রই ছিল। অথচ তাহারই মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থান হইল। ইহাতে মনে হয়—শিশু-কৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান ক্ষুদ্র মুখখানিতেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিরাজমান।

(খ) আর একবারও যশোদামাতা শিশু-কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—মৃদ্ভক্ষণ-লীলায়। মাতার এবং সঙ্গের গোপশিশুদের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন। শুনিয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য মাতা তাঁহার নিকটে উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মা, আমি মাটী খাই নাই ; যদি খাইয়া থাকি, তাহা হইলে তো আমার মুখের মধ্যেই মাটী থাকিবে। তুমি আমার মুখ দেখ—মাটী আছে

কিনা দেখ।" মাতা বলিলেন—"আচ্ছা, তুই হা কর।" তখন কৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলেন। তখন যশোদামাতা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ছোট মুখখানির মধ্যেই স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ-লোক ; পর্ব্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সহিত ভূর্লোক ; বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র ও তারকাদিসহ স্বর্লোক ; জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্রিয়, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণ প্রভৃতি বস্তুসমন্বিত বিশ্ব ; জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম্ম ও আশয়বশতঃ বিচিত্র-নানাদেহ-সমন্বিত বিশ্ব এবং ব্রজমণ্ডল, সেই ব্রজমণ্ডলে যশোদা নিজে এবং কৃষ্ণও বিরাজিত। তখনও শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং মুখখানাও মৃদ্‌ভক্ষণ-লোলুপ শিশুর দেহের এবং মুখের মতনই ক্ষুদ্র ছিল।

"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥
এতদ্বিচিত্রং সহজীবকাল-স্বভাব-কর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥
শ্রীভা. ১০।৮।৩৭-৩৯ ॥"

এস্থলে শিশু-কৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান মুখেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিরাজমান দেখা যায়।

(গ) দামবন্ধন-লীলাতেও যে-শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা উলূখলের সঙ্গে বাঁধিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥
—শ্রীভা. ১০।৯।১৩-১৪

—যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, অপর নাই, প্রত্যুত যিনি জগতের অন্তরে ও বাহিরে, পূর্ব্বে ও পরে বিরাজিত, এমন কি, জগতই যাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, গোপিকা যশোদা সেই অব্যক্ত অধোক্ষজ, নরাকৃতি পরব্রহ্মকে নিজপুত্রজ্ঞানে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উলূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।"

যশোদামাতা যাঁহাকে উলূখলে বাঁধিয়াছিলেন, তিনি যে সর্ব্বব্যাপক-ব্রহ্ম-তত্ত্ব, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে শ্রীশুকদেব তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপকত্ব দৃশ্যমান্ না হইলেও বন্ধন-সময়ে প্রভাবের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যশোদামাতা তাঁহাকে বন্ধন করার জন্য যতই চেষ্টা করেন, কিছুতেই বাঁধিতে পারেন না। তিনি নূতন নূতন রজ্জু সংযোজিত করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িয়া যায়। গৃহের সমস্ত রজ্জু, প্রতিবেশিনীদের প্রদত্ত রজ্জু সমস্তই সংযোজিত হইল ; কিন্তু কৃষ্ণকে বাঁধিতে পারিলেন না। প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি পরিমিত রজ্জু ন্যূন হয়।

"তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূৎ তেন সন্দধেহন্যচ্চ গোপিকা॥
যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্॥
এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ॥
—শ্রীভা. ১০।৯।১৫-১৭॥"

পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান দেহে অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও যশোদা-মাতা তাঁহার শিশু-কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ তাঁহার কৃপাব্যতীত কে-ই বা তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে? যখন তাঁহার কৃপা হইল, তখনই তিনি বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন। কিরূপে এবং কখন কৃপা হইল?

বাৎসল্যরসাস্বাদন-লোলুপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-প্রেম-ঘনবিগ্রহা যশোদার ভয়ে মাতার মুখের দিকে চাহিতেছেন না; অধোবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন—এক ছড়া ফুলের মালা ভূমিতে পতিত হইল। কৃষ্ণ তাহা চিনিলেন—মায়ের কবরীর মালা। তখন একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—তাঁহাকে বাঁধিবার প্রয়াসে মা অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, কবরী শিথিল হইয়া গিয়াছে, কবরী হইতে ফুলের মালা পড়িয়া গিয়াছে। তখন কৃষ্ণের মনে হইল—"আমাকে বাঁধিবার জন্য মায়ের এত পরিশ্রম!" ইহাই কৃপা। কৃপাই কৃষ্ণের চিত্তে মায়ের দুঃখে দুঃখ জন্মাইয়া দিল। তখনই মা তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমর্থা হইলেন।

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ শ্রীভাঃ ১০।৯।১৮॥"

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ যেই দেহে অর্জ্জুনের সারথিত্ব করিয়াছিলেন, সেই দেহটী ছিল দেখিতে পরিচ্ছিন্নেরই মতন। কিন্তু সেই দেহেই অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল "অনন্ত, সর্ব্বতোমুখ॥ **গীতা**॥ ১১।১১॥", "আদি-মধ্য-অন্তহীন॥ গীতা।১১।১৯॥" এবং "সেই দেহের মধ্যে অনেক প্রকারে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একই সঙ্গে অবস্থিত ছিল॥ গীতা ১১।১৩॥"; সুতরাং সেই দেহটী ছিল অপরিচ্ছিন্ন। সারথির আসনে উপবিষ্ট পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ পূর্ব্ব দেহটী যদি বাস্তবিকই পরিচ্ছিন্ন হইত, তাহা হইলে তাহা কখনই অপরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ পাইতে পারিত না। সুতরাং পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ সারথি-দেহটীও ছিল বাস্তবিক অপরিচ্ছিন্ন।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ দেহেই যে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, তাহার একটী বিবরণ **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের** মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই।

দ্বাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, তখন একদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা তাঁহার চরণ-দর্শনার্থী হইয়া দ্বারকায় গিয়া দ্বারপালের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা কর।" ব্রহ্মার মনে একটা গর্ব্ব ছিল এই যে—তিনিই একমাত্র ব্রহ্মা। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মার গর্ব্ব-খণ্ডনার্থই দ্বারপালের নিকট এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—"প্রভু জানিতে চাহিয়াছেন—তুমি কোন্ ব্রহ্মা।" শুনিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন, "আমি ছাড়া আর কোনও ব্রহ্মা কি আছেন? প্রভু কেন এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?" যাহা হউক, ব্রহ্মা দ্বারপালকে বলিলেন—"প্রভুর চরণে নিবেদন কর, আমি সনকের পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া ব্রহ্মাকে জানাইলেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিলে—আমি কোন্ ব্রহ্মা? আমাব্যতীত কি আর কোনও ব্রহ্মা কোথাও আছেন?" শ্রীকৃষ্ণ মুখে কিছু বলিলেন না, একটু হাসিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের এবং লোকপালদের স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণ এবং লোকপালগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরকে দেখিতেছেন না; কিন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সকলকেই দেখিতেছেন। দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। দেখিলেন—তাঁহার মত ক্ষুদ্র ব্রহ্মা আর নাই। যে সকল ব্রহ্মা আসিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও শত মুখ, কাহারও সহস্র মুখ, ক্যহারও অযুত মুখ, কোটি মুখ ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে ব্রহ্মাদের মুখ। রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি যেসকল লোকপাল সে-স্থানে দৃষ্ট হইলেন, তাঁহাদেরও ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন অনুসারে মুখ এবং চক্ষু-আদি। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

যাহাহউক শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ব্রহ্মাদের নিকটে তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বলিলেন—"প্রভু, সমস্তই কুশল। সম্প্রতি অসুরের অত্যাচারের যে একটু সম্ভাবনা হইয়াছিল, আমার ব্রহ্মাণ্ডে তোমার আগমনে তাহাও দূরীভূত হইয়াছে।" প্রত্যেক ব্রহ্মাই মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। তিনি কিন্তু তখন চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেই প্রকট-লীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ দেহেই যে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত, এই ব্যাপার হইতে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

যে পাদপীঠে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণযুগল রাখিয়াছিলেন, সকল ব্রহ্মা এবং লোকপালগণ যুগপৎ সেই পাদ-পীঠেই মস্তক রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছিলেন। পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান্ সেই পাদপীঠখানাও যে স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, উক্ত লীলায় তাহাও প্রতিপন্ন হইল।

যশোদামাতা যাহা দেখিয়াছেন, অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছেন, কিম্বা ব্রহ্মা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্তই তর্কের অগোচর—অচিন্ত্য, মায়াতীত—ব্যাপার। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" এসমস্ত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় মিথ্যা নহে। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের দিব্য কার্য্যাদিতে মিথ্যার স্থান থাকিতে পারে না। যাঁহারা তত্ত্বাদিবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা তর্কের গোচর প্রাকৃত

জগতের কোনও কোনও ব্যাপারকেও ঐন্দ্রজালিক বলিয়া মনে করিতে পারেন। যেমন বাড়বানল। সমুদ্রের মধ্যে বাড়বানলের আবির্ভাব হয়। যাঁহারা বাড়বানলের তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা ইহাকে অস্বাভাবিক বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা হয়তো মনে করিবেন— "জলের স্পর্শে আগুন নিভিয়াই যায়। সমুদ্রের অনন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্যে আগুনের আবির্ভাব একান্ত অসম্ভব। ইহা এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, মিথ্যা।" * যাহা তর্কের গোচরীভূত বস্তু, তাহার সম্বন্ধেই যখন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তধারণা জন্মিতে পারে, তখন যাহা স্বরূপতঃই তর্কের অগোচর, ভগবানের সেই দিব্যকার্য্যাদি সম্বন্ধে ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে ভ্রান্তি জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তাই, কোনও তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত কার্য্যাদিকেও মিথ্যা বা মায়াময় বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাহা অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্তিমাত্র। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজাল দেখান নাই। অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য। ইহা যে মিথ্যা বা ইন্দ্রজাল, শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥—গীতা॥ ১১।৪৭-৪৮॥

—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া (কৃপাবশতঃ) স্বীয় যোগমায়াসামর্থ্যে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, পরমরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ দর্শন করে নাই। হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ আমার এই রূপ দর্শন করিতে সমর্থ নহে— বেদাধ্যয়নদ্বারাও নহে, যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলনদ্বারাও নহে, দানের দ্বারাও নহে, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্মাদি-দ্বারাও নহে, উগ্রতপস্যা দ্বারাও নহে।"

অর্জ্জুনের দৃষ্ট রূপ যে সত্য, ঐন্দ্রজালিক নহে, শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত বাক্যে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। যাহাহউক, ইহার পরেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥—গীতা॥ ১১।৪৯॥

—আমার ঈদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ব্যথাও না হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয়। তুমি ভয় পরিহারপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে পুনরায় সেই পূর্ব্বরূপ ভালভাবে দর্শন কর।"

---

*শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (১৫১-৫২ পৃষ্ঠায়) একথাই লিখিয়াছেন:—"যদ্দি তর্কগোচরো ভবতি, তত্রৈব কদাচিৎ অসংভবরীতিদর্শনেন সা অভ্যুপগম্যতে। যত্তু স্বত এব তদতীতং তত্র তৎস্বীকৃতিরিতীব মূর্খতা। যথা বাড়বনাম্নো বহ্নে র্জলনিধিমধ্য এব দেদীপ্যমানতায়াম্ ঐন্দ্রজালিকতা-স্বীকরণম্।"

অদ্ভুত বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত বিহ্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার ভয় দূর করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়াছেন। যদি এই রূপ সত্য না হইয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাই হইত, সেই কথা খুলিয়া বলিলেই অর্জ্জুনের ভীতি ও বিহ্বলতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইত, তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের এই ইন্দ্রজাল-কুশলতা দেখিয়া অর্জ্জুন আরও বরং আনন্দিতই হইতেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজালের কথা বলিলেন না।

এই অদ্ভুত রূপের সত্যতা সম্বন্ধে আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতেই পাওয়া যায়। স্বীয় মানুষ-রূপ দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

সুদুর্দর্শনমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥গীতা॥ ১১।৫২-৫৪॥

—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে (বিশ্ব-) রূপ দর্শন করিলে, তাহা অতীব দুর্দ্দর্শনীয় (সহজে দেখা যায় না); দেবগণও এই (বিশ্ব-) রূপ দেখার জন্য সর্ববদা উৎকণ্ঠিত। তুমি আমার যেই রূপ (বিশ্বরূপ) দেখিয়াছ,—বেদাধ্যয়নদ্বারা, কি তপস্যাদ্বারা, কি দানধর্ম্মাদিদ্বারা, কিম্বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিদ্বারা আমার সেই রূপ (বিশ্বরূপ) দর্শন করা যায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই এবংবিধ আমাকে (বিশ্বরূপ-আমাকে) স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইতে, স্বরূপতঃ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে, পারা যায়।"

ইহাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবেই জানা গেল—অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে। ঐন্দ্রজালিক রূপ দর্শনের জন্য দেবতাদের লালসা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ঐন্দ্রজালিকরূপ দর্শনের জন্য অনন্যাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাও হাস্যাস্পদ ব্যাপার এবং ঐন্দ্রজালিক অবাস্তব রূপের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য বা দর্শন লাভের জন্য, ঐন্দ্রজালিক রূপে প্রবেশ করার জন্য, সাধনে আগ্রহও হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করা হইতেছে। কর-চরণবিশিষ্ট বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নই হইবে। ব্রহ্মের কর-চরণবিশিষ্ট বিগ্রহ যে পরিচ্ছিন্ন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার কার্য্যাদিও পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহেরই কার্য্য। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, এই কর-চরণাদিবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের বা বিভুত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত। এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মবিগ্রহের পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব বা বিভুত্ব যুগপৎই বিদ্যমান। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সংভবতি। কর-চরণাদ্যাকার-সন্নিবেশাৎ। তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নত্বং বিভুত্বং চ যুগপদেব॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠা॥"

ব্রহ্মবিগ্রহ স্বরূপতঃ বিভুই; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই বিভু-বিগ্রহেই পরিচ্ছিন্নত্ব বর্ত্তমান্।

যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং বিভুত্ব হইতেছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যাপার। ব্রহ্ম যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট তত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ( ১।১।৩৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ( ১।১।৩৭-অনুচ্ছেদ )। এই অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তির প্রভাবেই পরব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বেও অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্ভব হয়। "বস্তুতস্তু দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেঽপি ব্যাপকোঽসি ইতি ভাবঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৬৮ পৃষ্ঠা॥"

**শ্রুতিপ্রমাণ**

পরব্রহ্মের যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়।

**গোপালতাপনী**-শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং "দ্বিভুজ, বনমালী, বৈদ্যুতাম্বর" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বের কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। আবার এই "দ্বিভুজ" শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥ —গোপালোত্তরতাপনী॥"

এ-স্থলে "সর্ব্বব্যাপী", "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ", "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"—ইত্যাদি শব্দে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভুত্ব বা অপরিচ্ছিন্নত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

**বাসুদেবোপনিষদে** "মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥"—এই বাক্যে পরব্রহ্ম বাসুদেবের রূপের (বা বিগ্রহের) কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—

"তৈলং তিলেষু কাষ্ঠেষু বহ্নিঃ ক্ষীরে ঘৃতং যথা।
গন্ধঃ পুষ্পেষু ভূতেষু তথাত্মাঽবস্থিতোহ্যহম্॥

—বাসুদেব বলিতেছেন—তিলের মধ্যে যেমন তৈল, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বহ্নি, দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত এবং পুষ্পের মধ্যে যেমন গন্ধ অবস্থান করে, তদ্রূপ আমিও ভূতসমূহের মধ্যে আত্মা ( পরমাত্মা )রূপে অবস্থিত।"

যিনি বিগ্রহস্বরূপ—সুতরাং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, তিনিই যে আবার সর্ব্বভূতে অবস্থিত—সুতরাং সর্ব্বব্যাপক, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে ( ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় ) **ছান্দোগ্য**-শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াও ব্রহ্মের যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব দেখাইয়াছেন। এস্থলে তাহার মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।

"তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে। তচ্চ যুক্তম্—অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, সর্ব্বেষাং বিভুত্বাদি-পরমশক্তিনাম্ একাশ্রয়ত্বাচ্চ। যথৈব শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমধিকৃত্যোজ্জগৌ মূলেপি—যথা চ দহরাকাশসংজ্ঞস্য পরমেশ্বরস্য তথাহি 'দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্ অন্তরা আকাশঃ ( ছান্দোগ্য॥ ৮।১।১॥ )' ইত্যুক্ত্বা উচ্যতে 'যাবান্ বা তু অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ ( ছান্দোগ্য॥ ৮।১।৩॥ ) ইতি।"

তাৎপর্য্য। সেই শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার অপরিচ্ছিন্নত্বের কথাও শুনা যায়। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিনিবন্ধন এবং বিভুত্বাদি-পরমশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়বশতঃ তাঁহার পরিচ্ছিন্নত্বেও অপরিচ্ছিন্নত্ব

যুক্তিসঙ্গতই বটে। ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই—"কেচিৎ স্বদেহান্ত র্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ শ্রীভা. ২।২।৮॥—কেহ কেহ স্বীয় দেহের অভ্যন্তরস্থিত হৃদয়ে অবস্থিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুজ পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকটী ভগবদ্‌বিগ্রহ-সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। মানুষের হৃদয় অতি ক্ষুদ্র; এই অতিক্ষুদ্র হৃদয়ে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর চতুর্ভুজ পুরুষ অবস্থিত—ইহাই বলা হইল। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে দহরাকাশসংজ্ঞক পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহা এই। "অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তর-স্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৮।১।১॥—এই ব্রহ্মপুরে ( দেহে ) ক্ষুদ্র পদ্মরূপ ( হৃদয় পদ্মরূপ ) যে গৃহ আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে; সেই ক্ষুদ্র আকাশে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ করা উচিত, তাহা জানা উচিত।" হৃৎপদ্মরূপ গৃহস্থিত ক্ষুদ্র আকাশে যাহা আছে, তাহাকে জানার কথাই উক্তবাক্যে বলা হইল। কিন্তু হৃৎপদ্মরূপ গৃহস্থিত ক্ষুদ্র আকাশে কি আছে? তাহাই ছান্দোগ্যের ৮।১।২ বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। "কিং তদত্র বিদ্যতে যদ্ অন্বেষ্টব্যং যদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৮।১।২॥" এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে —"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্ত র্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৮।১।৩॥—এই বাহিরের আকাশ যত বড়, ভিতরের আকাশও তত বড়। উভয় আকাশেই স্বর্গ-পৃথিবী, অগ্নি-বায়ু, সূর্য্য-চন্দ্র, বিদ্যুৎ-নক্ষত্রাদি সমাহিত। এই সংসারে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু নাই, তৎসমস্তই এই অন্তরাকাশেও সমাহিত আছে।"

এই ছান্দোগ্য-বাক্যে পরব্রহ্মের অনুসন্ধানের কথাই বলা হইয়াছে। যে পরব্রহ্ম চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহনক্ষত্রাদি সমস্তের আশ্রয়, সুতরাং যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন, সেই ব্রহ্মই পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মে অবস্থিত—পরিচ্ছিন্নরূপে। অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্ম সম্বন্ধেই ছান্দোগ্য-শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ ॥৩।১৪।৩॥—ইনি পৃথিবী হইতেও বড়, এই লোকসকল হইতেও বড়।" অর্থাৎ ইনি মহত্তম বা বৃহত্তম তত্ত্ব, অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। অথচ ইনি পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মেও অবস্থিত।

ছান্দোগ্যশ্রুতির বাক্য আলোচনা করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—হৃৎপদ্মে যিনি অবস্থিত, তাঁহার যেই পরিমাণ, সর্ব্বব্যাপকেরও সেই পরিমাণ। অচিন্ত্য-শক্তি ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। "অত্র যাবতা হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্ব্বর্ত্তিত্বম্ তাবতা এব সর্ব্বব্যাপকত্বম্। অচিন্ত্যাং শক্তিং বিনা ন সম্ভবতি।" অচিন্ত্যশক্তির কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—চন্দ্রসূর্য্যাদির আধার যেই আকাশ, তাহার যেই পরিমাণ, ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশের সেই পরিমাণ হইতে পারে না। ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশ হইতেছে বৃহদাকাশের একটী অংশ। হৃদয়-পদ্মে অবস্থিত ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের একটী অংশ, শ্রুতি তাহা বলেন নাই। শ্রুতি বরং বলিয়াছেন—উভয়েরই পরিমাণ সমান।

যদি কেহ বলেন—হৃদয়-পদ্মস্থিত ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ইহাও সম্ভব নয়; কারণ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সামগ্রিক প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। ঘটমধ্যস্থিত জলে কখনও আকাশ সমগ্রভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, আকাশের এক অংশমাত্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। আবার সর্ব্বগত ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিম্বও অসম্ভব; কেননা, প্রতিবিম্বোৎপাদনের জন্য দর্পণ ও বিম্বের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্ব্বগত ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে ব্যবধান অসম্ভব।

এ-সমস্ত কারণে, পরিচ্ছিন্ন হৃদয়-পদ্মে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অবস্থান—অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্না যোগমায়া-নাম্নী স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই যে সম্ভব, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "তস্মাদচিন্ত্যৈব শক্তির্যোগমায়াখ্যা তত্র অভ্যুপগমনীয়া॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। ৮৪ পৃষ্ঠা॥"

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে অন্যত্রও উল্লিখিতরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে—ইত্যাদি॥৫।১৮।১॥—যিনি এই প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন—ইত্যাদি।" এই শ্রুতিবাক্যে "প্রাদেশমাত্র"-পরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই "অপরিচ্ছিন্ন" বলা হইয়াছে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেও প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"প্রাদেশমাত্রে তস্য হ বা এতস্য আত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ। ইত্যাদি॥৫।১৮।২॥—ঐ প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মার সুতেজা হইতেছে শির, বিশ্বরূপ হইতেছে চক্ষু। ইত্যাদি।" এ-স্থলেও প্রাদেশমাত্র-পুরুষে ত্রৈলোক্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাও অচিন্ত্য-শক্তিরই প্রভাব।

উল্লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের আলোচনায় জানা গেল—ব্রহ্মবিগ্রহ স্বরূপতঃ বিভু—অপরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে বিভু—অপরিচ্ছিন্ন—বিগ্রহই পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান্ বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম্ম বিদ্যমান।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ( ব্রহ্মের নাম-স্বরূপাদি, ধাম-পরিকরাদি )

### ৭৩। পরতত্ত্ব ব্রহ্মের বিভিন্ন নাম

বেদাদি শাস্ত্রে পরতত্ত্বকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটী নামের উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) **ব্রহ্ম**—বা পরব্রহ্ম। ইহা পরতত্ত্বের অতি প্রসিদ্ধ নাম।

(খ) **ওম্** বা প্রণব। 'ওম্ ইতি ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥১।৮॥" গীতা ॥১৭।২৩॥

পাতঞ্জল বলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ ॥২৭॥ —প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা নাম।

(গ) **বাসুদেব**। বাসুদেব পরব্রহ্মের একটী নাম ( ১।১।৫১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ॥ —সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন।" —এই শ্রুতিবাক্যেও বাসুদেব-শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

(ঘ) **শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ**। শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্মের একটী নাম, তাহা ১।১।৬৭-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ঙ) **গোপাল**। "যোঽসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ। গোপালোত্তরতাপিনী শ্রুতিঃ ॥১৮।১৫॥"

(চ) **নারায়ণ**। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥ মহোপনিষৎ ॥১।১॥ —সৃষ্টির পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও ছিলেন না।" সৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরব্রহ্মই ছিলেন; সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকেই নারায়ণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়-নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥১০।১৪।১৪॥"—এই শ্লোকেও ব্রহ্মা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নারায়ণ বলিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গ—অংশ" বলিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈব অঙ্গং মূর্ত্তিঃ।"

(ছ) **বিষ্ণু**। বিষ্ণু এবং ব্রহ্ম এই উভয় শব্দই একার্থক—সর্ব্বব্যাপক। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ —সেই বিষ্ণুর পরম পদকে ( বিষ্ণু পরতত্ত্বকে ) জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন।" —এই অতিপ্রসিদ্ধ বেদবাক্যে পরব্রহ্মকেই বিষ্ণু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাধিক স্থলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও বিষ্ণু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা, প্রহ্লাদের উক্তি ঃ—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ॥৭।৫।৩০॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ॥৭।৫।৩১॥"

এ-স্থলে পূর্ব্বে কৃষ্ণের কথা বলিয়া পরে সেই কৃষ্ণকেই বিষ্ণু বলা হইয়াছে।

শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু-নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯॥"

(জ) **আত্মা** এবং **পরমাত্মা**। শ্রুতির বহুস্থানে পরব্রহ্মকে আত্মা এবং পরমাত্মা বলা হইয়াছে।

(ঝ) **ভগবান্**। ১।১।৪৪-৪৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। শ্বেতশ্বতর-শ্রুতি॥৫।৪॥, ৬।৬॥

(ঞ) **স্বয়ং ভগবান্**। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে "স্বয়ং ভগবান্" বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥"

(ট) **অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম, আনন্দ** ইত্যাদি নামও এক বিষ্ণুরই (সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্ব পরব্রহ্মেরই) নাম।

"অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ।
প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিতঃ ॥—ভগবৎসন্দর্ভ ৫০৫-৬ ধৃত-ব্রহ্মপুরাণবচন ॥

—অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম, আনন্দ ইত্যাদি পদের বাচ্য একমাত্র বিষ্ণু; অন্যত্র ইহাদের প্রয়োগ উপচারমাত্র।

(ঠ) **অজ, অব্যয়, অচ্যুত,** প্রভৃতি নামেও পরব্রহ্মকে শাস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন।

(ড) **তৎ সৎ** ।গীতা॥১৭।২৩॥

## ৭৪। ব্রহ্মের নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূত

### (ক) ব্রহ্মের নাম চিৎ-স্বরূপ

**ঋগ্বেদের** বিষ্ণুসূক্তে আছে—

"তমু স্তোতারঃ পূর্ব্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥—১।২২।১৫৬।৩॥"

শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এই ঋক্-মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন ঃ—"হে স্তোতারঃ, তমু তমেব বিষ্ণুং পূর্ব্ব্যং পূর্ব্বার্হমনাদিসিদ্ধম্ ঋতস্য গর্ভং যজ্ঞস্য গর্ভভূতম্। যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্থঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। শতম্ ১।১।২।১৩॥ ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা ঋতস্য উদকস্য গর্ভং গর্ভকারণম্। উদকোৎপাদকমিত্যর্থঃ। অপ এব সসর্জাদৌ। মনু ১।৮। ইতি স্মৃতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং যথা বিদ জানীথ তথা জনুষা জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ বরলাভাদিনা পিপর্ত্তন। স্তোত্রাদিনা প্রীণয়ত। যাবদস্য মাহাত্ম্যং জানীথ তাবদিত্যর্থঃ। বিদের্লটি মধ্যমবহুবচনম্। বিদ

ঋতস্যেত্র সংহিতায়াম্ভ্যক্ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চাস্য মহানুভাবস্য **বিষ্ণোর্নাম চিৎ** সর্বৈর্নমনীয়ম্ অভিধানম্ সার্বাত্ম্য-প্রতিপাদকম্ বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন্। বদত। সঙ্কীর্ত্তয়ত। যদ্বা নাম যজ্ঞাত্মনা নমনং বিষ্ণোরেব সর্বেষাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্ট্যাত্মাত্মনা দ্রব্যদেবতাত্মনা বা পরিণামম্ আ জানন্তো যূয়ং বিবক্তন্। ব্রুত। স্তুত। বচের্লোটি ছান্দসঃ শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যা-ভ্যাসস্যেত্বম্। পূর্ব্ববত্তনাদেশঃ। ইদানীং সাক্ষাৎকৃত্যাহ। হে বিষ্ণো সর্ব্বাত্মকদেব মহো মহতস্তে তব সুমতিং সুষ্টুতিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং বা ভজামহে। সেবামহে বয়ং যজমানাঃ।"

সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ ঃ—"হে স্তবকারিগণ! বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ; তাঁহা হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা—কাহারও বর বা অনুগ্রহাদিলাভের অপেক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া—জন্মদ্বারা আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিদ্বারা নিজের চেষ্টাতেই) সেই বিষ্ণুর প্রীতিবিধান কর—যাহাতে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্ব্বাত্মা মহানুভাব **বিষ্ণুর নাম চিৎ** (অ-জড়, অপ্রাকৃত), সকলেরই নমনীয় (প্রণম্য) এবং সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া তোমরা সম্যক্‌রূপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। অথবা, সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষ্ঠাতা দেবতা—এ-সমস্ত সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তোমরা তাঁহার স্তব কর। হে বিষ্ণো! হে সর্ব্বাত্মক দেব! উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (২৫৩ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রটীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—"হে বিষ্ণো **তব নাম চিৎ-চিৎস্বরূপম্** অতএব মহঃ **স্বপ্রকাশরূপম্**। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষৎ অপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাস-মাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ॥—হে বিষ্ণো! তোমার **নাম চিৎ-চিৎস্বরূপ** (চৈতন্যস্বরূপ) এবং সে জন্য তাহা মহঃ—**স্বপ্রকাশরূপ**; সেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি এবং মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে না জানিয়াও) নামের কেবল অক্ষরমাত্রের উচ্চারণ করিলেই তোমা-বিষয়ক বিদ্যা (পরাবিদ্যা) আমরা লাভ করিতে পারিব।"

এইরূপে ঋগ্‌বেদ হইতে জানা গেল—সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্ম **বিষ্ণুর নাম চিৎস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ**।

একমাত্র ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তুই স্বপ্রকাশ; অপর কোনও বস্তু স্বপ্রকাশ নহে (১।১।৬৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "ব্রহ্মের নাম স্বপ্রকাশ"–ঋগ্‌বেদের এই উক্তি হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।

কিন্তু ব্রহ্মের নাম যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, তাহার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ শ্রুতিতে আছে কিনা, তাহা দেখা যাউক।

### (খ) ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মের স্বরূপভূত

পাতঞ্জল বলেন—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ।২৭॥—প্রণব হইতেছে ব্রহ্মের বাচক বা নাম।" প্রণব হইতেছে—ওঙ্কার। ব্রহ্মের বাচক বা নাম ওঙ্কারকে বা প্রণবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

**তৈত্তিরীয়-শ্রুতি** বলেন—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ববম্॥১।৮॥—ওম্ ( বা প্রণব ) ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তু ওম্।"

এ-স্থলে ব্রহ্মের বাচক প্রণবকেই ব্রহ্ম বলা হইল। ইহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুই প্রণব। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব হইতেছে ব্রহ্মেরই পরিণাম—সুতরাং ব্রহ্মই। তাহাকে প্রণব বলায়—ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মের বাচক প্রণবের অভিন্নতার কথাই বলা হইয়াছে।

**কঠোপনিষৎ** বলেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১।২।১৬॥—এই অক্ষরটীই ( প্রণবই ) ব্রহ্ম, এই অক্ষরটীই শ্রেষ্ঠ। এই অক্ষরটীকেই জানিলে যাহার যাহা অভীষ্ট, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।"

এ-স্থলেও ব্রহ্মের বাচক প্রণবকেই ব্রহ্ম বলা হইল। কার্য্যদ্বারাও তাহা দেখাইয়াছেন। প্রণবকে জানিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। ইহাতেও প্রণব ও ব্রহ্ম—এই দুইয়ের অভিন্নতার কথাই বলা হইয়াছে।

**মাণ্ডুক্য-শ্রুতি** বলেন—

"ওঁ-কার এবেদং সর্ববং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ববম্।
প্রণবো হি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবো যতঃ॥
সর্ববস্য প্রণবোহ্যাদি র্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ববস্য হৃদয়ে স্থিতম্।
সর্ববব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনি র্নেতরো জন ইতি"

—ভগবৎসন্দর্ভের ২৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় ধৃত বচন॥

—ওঙ্কারই এই সমুদয় জগৎ; ওম্-এই অক্ষরই এই সমস্ত জগৎ। প্রণবই পরব্রহ্ম, প্রণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়েন। এই প্রণবের পূর্ব্ব ( পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ) নাই, অন্তর নাই, বাহিরও নাই; প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠও নাই ( 'প্রণবো যতঃ'-স্থলে 'প্রণবোঽব্যয়ঃ'-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।—অর্থ—প্রণব অব্যয়—নির্ব্বিকার-স্বভাব )। প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। এইরূপে প্রণবকে জানিলেই তাহার পরে মোক্ষপ্রাপ্তি

হয়। প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। সকলের হৃদয়েস্থিত সর্ব্বব্যাপী এই ওঙ্কারকে জানিলে ধীরব্যক্তিকে আর কোনওরূপ শোক করিতে হয় না। এই ওঙ্কার অমাত্র, অথচ অনন্তমাত্র, সংসার-নাশক, মঙ্গলময়। যিনি এই ওঙ্কারকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুনি, অপরে নহে।”

( উল্লিখিত প্রমাণ-বচনগুলি মাণ্ডুক্যশ্রুতির অর্থপ্রকাশিকা কারিকাতেই দৃষ্ট হয় ; প্রথম পংক্তিটী শ্রুতিতে আছে )।

উল্লিখিত প্রমাণবাক্যগুলিতে অতি পরিস্ফুটভাবেই প্রণবের ও ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে। প্রণবের ও ব্রহ্মের সমান-ধর্ম্মের কথা বলিয়াও তাহা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। সমানধর্ম্মত্ব এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা—ব্রহ্মের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই ; প্রণবেরও তেমনই আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ যেমন কিছু নাই, প্রণব হইতেও শ্রেষ্ঠ তেমনি কিছু নাই। ব্রহ্ম যেমন সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত ; প্রণবও তেমনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। ব্রহ্মকে জানিলেই যেমন মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তদ্রূপ প্রণবকে জানিলেও মোক্ষ লাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বলিয়া ঈশ্বর, প্রণবও তেমনি ঈশ্বর। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বব্যাপক, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, প্রণবও তেমনি সর্ব্বব্যাপক ও সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। ব্রহ্মের ন্যায় প্রণবও অমাত্র অথচ অনন্ত-মাত্র ( অচিন্ত্যশক্তিতে বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় )। ব্রহ্ম যেমন মঙ্গলময় ( শিব ), প্রণবও তেমনি মঙ্গলময়।

এইরূপে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য-সমূহে ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মবাচক প্রণবের সর্ব্বতোভাবে সমানধর্ম্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বলা যায় না যে—ব্রহ্মের ন্যায় ধর্ম্মবিশিষ্ট অপর একটী বস্তুই প্রণব। কেননা, প্রথমেই বলা হইয়াছে—প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর একটী বস্তু, তাহা বলা হয় নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্মের সমান বা সমধর্ম্মবিশিষ্ট কোনও বস্তুই থাকিতে পারে না ; যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের সমানও কিছু নাই, তাহার অধিকও কিছু নাই। “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি।৬।৮॥” সুতরাং **ব্রহ্ম এবং তাঁহার বাচক ( নাম ) প্রণব যে এক এবং অভিন্ন,** তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন—ব্রহ্মবাচক প্রণব এবং ব্রহ্ম-এতদুভয়ের সমান ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তথাপি যে উক্তবাক্যসমূহে তাঁহাদের সমানধর্ম্মত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা কেবল বাচক-প্রণবের স্তুতিমাত্র। এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই। এইরূপ অনুমান স্বীকার করিতে হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মবাচক নামের অতিস্তুতি করা হইয়াছে। এইরূপ অতিস্তুতিকে অর্থবাদ বলা হয়। কিন্তু নামে অর্থবাদ-কল্পনা অপরাধজনক। “গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।২৮৪-বাক্যধৃত পদ্মপুরাণবচন॥ নারদের প্রতি সনৎকুমারের উক্তি॥—যে লোক গুরুর অবজ্ঞা করে, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা করে, নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, নামবলে যাহার পাপ-প্রবৃত্তি জন্মে, বহুল যমযাতনাভোগেও তাহার শুদ্ধি হয় না।” বেদার্থ-পরিপূরক এবং পঞ্চমবেদস্থানীয় পুরাণ যাহাকে অপরাধজনক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,

শ্রুতি যে তাহার আদর্শ স্থাপন করিবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং নামের ( প্রণবের ) যে মহিমার কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহা অতিস্তুতি নহে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবাচক প্রণব এক এবং অভিন্ন বলিয়াই উভয়ের সমানধর্ম্মত্বের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।

শ্রুতিপ্রোক্ত নাম-নামীর অভিন্নত্বের কথা পদ্মপুরাণও বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ —ভগবৎসন্দর্ভ ২৫৯-পৃষ্ঠাধৃত পাদ্মবচন ॥

—নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীরই ন্যায় নামও সর্ব্বার্থদাতৃত্ববশতঃ চিন্তামণিতুল্য ; কেবল তাহাই নহে ; নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্য-রসবিগ্রহ, তাঁহার নামও তদ্রূপ চৈতন্যরস-বিগ্রহ। নামীর ন্যায় নামও পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত।"

এইরূপে শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মের **নাম পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরব্রহ্মেরই স্বরূপভূত।**

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত আলোচনায় যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমস্তে প্রণবের সহিতই ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের অপর কোনও নামের কথা বলা হয় নাই। এই অবস্থায় ব্রহ্মের অন্যান্য নামও যে ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাই কি মনে করিতে হইবে ?

ইহার উত্তর এই। প্রণব হইতেছে ব্রহ্মের বাচক বা নাম। এই প্রণবের উপলক্ষণে ব্রহ্মের অন্যান্য নামও যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইতেছে। তাহার প্রমাণ এই যে—পূর্ব্বোল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রে বিষ্ণুর নামকে চিৎস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ বলা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-নাম যে অভিন্ন, তাহাই সূচিত হইয়াছে। বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামও প্রণবেরই স্বরূপবিশেষ; যেহেতু, প্রণবের ন্যায় এই সমস্ত নামও ব্রহ্মেরই বাচক। সুতরাং ব্রহ্মের বাচক সমস্ত নামই ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ভগবৎস্বরূপসমূহ যেমন প্রণবাভিন্ন পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ, তদ্রূপ তাঁহাদের নামও ব্রহ্মবাচক প্রণবেরই বিভিন্ন প্রকাশ।

## ৭৫। ব্রহ্মের নাম নিত্য

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম যখন নিত্য বস্তু, তাঁহার স্বরূপভূত নামও হইবে নিত্য বস্তু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের নাম চিৎ-স্বরূপ। যাহা চিৎ, তাহাই নিত্য ; যেহেতু, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই। যাহা অ-চিৎ—জড়—প্রাকৃত—তাহারই উৎপত্তি-বিনাশ আছে, তাহাই অনিত্য। ব্রহ্মের নাম প্রাকৃত বস্তু নহে বলিয়া নিত্যই হইবে। যাহা নিত্য, তাহাই "অপূর্ব্ব—অনাদি, কারণহীন।" পূর্ব্বোদ্ধৃত মাণ্ডুক্য-বাক্যে ব্রহ্মবাচক প্রণবকে অপূর্ব্ব বলা হইয়াছে। "অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো"-ইত্যাদি এবং "সর্ব্বস্য প্রণবোহ্যাদি"-ইত্যাদি বাক্যে প্রণবকে সকলের আদিও বলা হইয়াছে। যাহা সকলের আদি, তাহা অনিত্য হইতে পারে না।

সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই যে ব্রহ্মের নাম বিদ্যমান আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ ইত্যাদি, "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বেও পরব্রহ্ম "বাসুদেব", "নারায়ণ" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। সৃষ্ট বস্তুই অনিত্য; সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত বস্তু অনিত্য হইতে পারে না; তাহা নিত্য। সুতরাং ব্রহ্মের নাম যে নিত্য, তাহা শ্রুতি হইতেই জানা যায়।

## ৭৬। ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মের প্রতীক নহে

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি কঠ-শ্রুতি-( ১।২।১৬ )-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্মাপরম্ এতদ্ধ্যেবাক্ষরঞ্চ পরং তয়োর্হি **প্রতীকম্** এতদ্ অক্ষরম্ এতদ্হি এব অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা উপাস্য ইত্যাদি।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রণবাক্ষরকে ব্রহ্মের **প্রতীক** বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ, মূল শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"এতদ্ হি এব অক্ষরম্ ব্রহ্ম—এই অক্ষরই ( প্রণবই ) ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের বাচক ( বা নাম ) প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব ব্রহ্মের প্রতীক, এ-কথা শ্রুতি বলেন নাই। প্রণব যে ব্রহ্মের নাম, মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ তাহা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। "যোঽসৌ পরাপরো দেবা ওঙ্কারো নাম নামতঃ॥৬।২৩॥—সেই পরাপর দেবের নাম ওঙ্কার॥" অথর্ব্বশিখোপনিষৎও বলিয়াছেন—"এতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম - ওঙ্কার—এই অক্ষরই পরব্রহ্ম।" ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎও এই কথাই বলেন—"ওমিত্যে-কাক্ষরং ব্রহ্ম।" সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোনও বস্তুর বাচক নাম হইতেছে একটা সঙ্কেতবিশেষ। "মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ২২৪ পৃষ্ঠা॥—মনোগ্রাহ্য কোনও বস্তুর ব্যবহারার্থ সাঙ্কেতিক শব্দকেই নাম বলে।" যে বস্তুটীর কথা মনে উদিত হয়, বাহিরে তাহাকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বা তাহার সম্বন্ধে কিছু বলার উদ্দেশ্যে যে সঙ্কেতাত্মক শব্দটী ব্যবহার করা হয়, সেই শব্দটীকেই তাহার "নাম" বলে। ব্রহ্মের নামও একটী সঙ্কেতাত্মক শব্দ; আর, কোনও প্রাকৃত বস্তুর নামও একটী সঙ্কেতাত্মক শব্দ। সাধারণভাবে এই উভয়ই সঙ্কেতাত্মক শব্দ হইলেও বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ব্রহ্মের নাম সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান্; প্রাকৃত বস্তুর নাম হয় সেই বস্তু সৃষ্ট হওয়ার পরে। ব্রহ্মের নাম ব্রহ্মের স্বরূপগত, ব্রহ্মেরই ধর্ম্মবিশিষ্ট; প্রাকৃত বস্তুর নাম তদ্রূপ নহে। যেমন, একজন লোকের নাম—নারায়ণ; ইহা কেবলই সেই লোকের পরিচায়ক চিহ্নমাত্র বা সঙ্কেতমাত্র। নারায়ণের ধর্ম্ম সেই লোকে নাই। একটী মিষ্ট দ্রব্যের নাম মিছ্‌রী, ইহাও সেই মিষ্টদ্রব্যের পরিচায়ক সঙ্কেতমাত্র। সেই মিষ্টদ্রব্যের ধর্ম্ম মিষ্টত্বাদি—"মিছ্‌রী"-শব্দে থাকে না। অনবরত "মিছ্‌রী মিছ্‌রী" উচ্চারণ করিলেও মিষ্টত্বাদির অনুভব হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে—বস্তুমাত্রেরই নাম সেই বস্তুর প্রতীক কিনা।

কিন্তু প্রতীক কাহাকে বলে ? যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করিলে প্রথম বস্তুকে দ্বিতীয় বস্তুর প্রতীক বলে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
—শ্রীভা. ১১।২।৪১॥

—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী ( পৃথিবী ), জ্যোতিঃ, সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর ও সমুদ্রাদি যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তকে শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্য মনে প্রণাম করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে আকাশাদি বাস্তবিকই শ্রীহরির শরীর নহে—শ্যামসুন্দর-বংশীবদন বিগ্রহ নহে। তথাপি, জাতপ্রেম ভক্ত তত্তৎ বস্তুতে শ্রীহরির স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া প্রণাম করেন ; আর অজাতপ্রেম সাধক-ভক্ত সেই-সেই বস্তুতে শ্রীহরির অধিষ্ঠান মনে করিয়া সেই-সেই বস্তুকে প্রণাম করিয়া থাকেন। এ-স্থলে আকাশাদি হইল শ্রীহরির প্রতীক।

প্রাকৃত জগতে কোনও বস্তুর নাম বাস্তবিক সেই বস্তু নহে। "মিছরী"-শব্দটী তন্নামক মিষ্ট দ্রব্য নহে, "মিছরী"-শব্দটী দেখিলে বা শুনিলে তন্নামক মিষ্ট দ্রব্যটীর কথা কাহারও মনে হইতে পারে মাত্র, কিন্তু মিষ্ট দ্রব্যটীর আস্বাদন পাওয়া যাইবে না। এ-স্থলে নাম হইতেছে কেবলই সঙ্কেতমাত্র। ইহাকে ঐ মিষ্ট দ্রব্যটীর প্রতীক বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মের নাম ব্রহ্ম-পরিচায়ক সঙ্কেত হইলেও কেবলই সঙ্কেত নহে ; যেহেতু, ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মেরই ধর্ম্মবিশিষ্ট। প্রতীকে বস্তুর ধর্ম্ম থাকে না। ব্রহ্মের নামে ব্রহ্মের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সুতরাং প্রতীক বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, ব্রহ্মের নাম তদ্রূপ নহে। এজন্য ব্রহ্মের নামকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা সঙ্গত হয় না।

আর একভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। কোনও লোক তাঁহার কোনও স্নেহের পাত্রকে তাঁহার স্নেহের নিদর্শনরূপে কোনও একটী বস্তু যদি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ বস্তুটীকে তাঁহার স্নেহের প্রতীক বলা যায়। কিন্তু এই বস্তুটী তাঁহার স্নেহ নহে, স্নেহের নিদর্শনমাত্র—স্নেহ হইতে ভিন্ন বস্তু ; স্নেহের পাত্রের চিত্তে এই বস্তুটী তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত করিতে পারে মাত্র। এই বস্তুটী স্নেহের পাত্রের সহিত স্নেহোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মের নাম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নহে ; ব্রহ্মের সহিত সমধর্ম্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, ব্রহ্মের নামের নিকট হইতেও তাহা পাওয়া যায়। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ-শ্রুতি ॥১।২।১৬॥ —এই প্রণবকে জানিতে পারিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।" ফলদাতা একমাত্র ব্রহ্মই। "ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮। ব্রহ্মসূত্র ॥"

ব্রহ্মের স্বরূপগত মাধুর্য্যও তাঁহার নামে বিদ্যমান্। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, বলিয়া ব্রহ্ম স্বরূপতঃই পরম-মধুর। তাঁহার নামও পরম-মধুর। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১।২৩৪-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচনে দেখা যায়—

"**মধুরমধুর**মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

—হে ভৃগুবর! ভগবানের নাম **মধুর হইতেও মধুর,** সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগম-(শ্রুতি) লতার সৎ (সুন্দর—উত্তম) ফল এবং চিৎ-স্বরূপ (চৈতন্য—ব্রহ্ম—স্বরূপ)। শ্রদ্ধার সহিত, এমন কি হেলার সহিতও যদি কৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলেও কীর্ত্তনকারী লোককে এই নাম উদ্ধার করিয়া থাকেন।"

এ-স্থলে নামের পরম-মধুরত্বের কথা জানা গেল; এই মধুরত্ব আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মেরও স্বরূপগত ধর্ম্ম। শ্রুতি ব্রহ্মকে মঙ্গলস্বরূপও বলিয়াছেন—"সত্যং শিবং সুন্দরম্॥" শিবম্—মঙ্গলস্বরূপম্॥ উল্লিখিত প্রভাস-খণ্ড-বচনে নামকেও মঙ্গলস্বরূপ বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নামের মাধুর্য্যের কথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং **প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।**
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

—শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তনকারীর আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত (উচ্ছ্বসিত) করিয়া থাকে, ইহার **প্রতি-পদেই পূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন** পাওয়া যায় এবং ইহা দেহ-মনঃ-প্রাণ—সর্ব্বাত্মাকে স্নাপিত—স্নিগ্ধীভূত—করিয়া থাকে। এতাদৃশ কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব-নাটকে কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য কি ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যাইবে।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্।
নো জানে কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ রচিতা কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

—'কৃষ্ণ'—এই বর্ণদ্বয় যে কি অদ্ভুত অমৃত দ্বারা রচিত হইয়াছে, জানি না। এই বর্ণদ্বয় যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন অসংখ্য জিহ্বা পাওয়ার জন্য বাসনা বিস্তার করে; যখন কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার জন্য স্পৃহা জাগায়; আবার যখন চিত্তরূপ প্রাঙ্গণে বিরাজ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-কর্ম্ম-শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের স্বরূপগত মাধুর্য্য তাঁহার নামেও বিদ্যমান্। কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্ম তাহার প্রতীকে—নামে—বিদ্যমান্ নাই। "মিছরী মিছরী" বলিলে মিছ্‌রী-নামক বস্তুর মিষ্টত্ব অনুভব হয় না; "জল জল" বলিলে পিপাসা দূর হয় না।

সুতরাং ব্রহ্মের নামকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মের নামে এবং ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই। প্রাকৃত বস্তু ও তাহার প্রতীকে ভেদ বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বিবেচ্য। তাহা এই।

**ন প্রতীকে ন হি সঃ** ॥৪।১।৪॥—এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—"প্রতীক উপাসনায় উপাস্যকে (উপাস্য প্রতীককে) আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে না; কেননা, প্রতীক বস্তুটী কখনও উপাসকের আত্মা নহে (ন হি সঃ)।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"প্রতীকোপাসনা-স্থলে প্রতীকই প্রধানতঃ উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্ম নয়; সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার বিশেষণভাবে প্রতীত হয়েন মাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা নাই। প্রতীকোপাসনা অর্থ—অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক চিন্তা করা। সে-স্থলে প্রতীক বস্তুটীই উপাস্য; কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটী কখনই উপাসকের আত্মা নহে, পরন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; কাজেই তাহাতে আত্মানুসন্ধান করা উচিত হয় না।"

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই। উভয় ভাষ্যের মর্ম্মই হইতেছে এই যে—প্রতীকের উপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের নাম যদি ব্রহ্মের প্রতীক হয়, তাহা হইলে নামের উপাসনায় ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ১।২।১৬-কঠোপনিষদ্ বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নাম ওঙ্কারকে প্রতীক বলিয়াও বলিয়াছেন—এই নামকে জানিলেই, নামের উপাসনা করিলেই, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পাইতে পারেন, পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অপর ব্রহ্মকে পাইতে পারেন। "অত এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্মাপরমেতদ্ধ্যেবাক্ষরঞ্চ পরং তয়োর্হি প্রতীকমেতদক্ষরমেতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা উপাস্য ব্রহ্মেতি যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা তস্য তদ্ভবতি। পরঞ্চেৎ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চেৎ প্রাপ্তব্যম্।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্॥১।২।১৭॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তন্মধ্যে এই ওঙ্কারাক্ষরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। "যত এবং অত এবৈতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্।"

ওঙ্কার বা ব্রহ্মের বাচক নাম যদি ব্রহ্মের প্রতীকই হয় এবং প্রতীকের উপাসনায় যদি ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে ওঙ্কারের উপাসনায় কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে এবং ওঙ্কারই বা কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন হইতে পারে? শ্রীপাদ শঙ্করের বাক্য কি পরস্পর-বিরোধী নহে?

ইহার উত্তরে হয়তো বলা যাইতে পারে—প্রণব ব্রহ্মের প্রতীকই; কিন্তু প্রতীক হইলেও প্রণবকে যদি ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করা হয়, তখন আর তাহার প্রতীকত্ব থাকে না। প্রণবকে বক্ষ বলিয়া মনে করিলেই তাহা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ট আলম্বন হইতে পারে—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ঃ—প্রথমতঃ, প্রণব যে ব্রহ্মের প্রতীক, ইহা শ্রুতিস্মৃতি কোনও স্থলেই বলেন নাই;

তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং প্রণব বস্তুতঃ প্রতীক হইলেও তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রণব যদি ব্রহ্মের প্রতীকই হয়, তাহা হইলে কেবল প্রণবকেই বা ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলে তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন হইবে কেন ? উপরে উদ্ধৃত "ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪।১।৪॥"—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্ঃ অথাধিদৈবতম্ আকাশো ব্রহ্মেতি ( ছান্দোগ্য ॥৩।১৮ )", "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ ( ছান্দোগ্য ॥৩।১৮ )"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া মনঃ, আকাশ, আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াছেন। মনঃ, আকাশ, আদিত্যাদিকেও যদি ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও যে আর প্রতীকত্ব থাকে না, ভাষ্যে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তখন তাহারাও উপাসনার আলম্বন হইয়া পড়ে—প্রণবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলে যেমন তাহার আর প্রতীকত্ব থাকে না, তাহাও যেমন তখন আলম্বন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ। প্রণব যদি মনঃ, আকাশ, আদিত্যাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীকই হয় এবং তাহাদের যে কোনও একটীকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলেই যদি তাহার আলম্বনত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মন-আকাশাদির আলম্বনত্বের যে স্বরূপ, প্রণবের আলম্বনত্বেরও হইবে সেই স্বরূপই। প্রতীকরূপে মন-আদি হইতে প্রণবের যখন বৈশিষ্ট্যই নাই, আলম্বনরূপেই বা তাহার "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বনরূপ" বৈশিষ্ট্য থাকার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। অথচ প্রণবের আলম্বনরূপে এই বৈশিষ্ট্য শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যের কোনও হেতুর কথাও তিনি বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—"প্রণব ব্রহ্মের প্রতীক"—ইহা হইতেছে তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বাক্য; ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত বাক্য নহে। শ্রুতি প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীক বলেন নাই, ব্রহ্মই বলিয়াছেন। মন-আকাশাদি হইতে প্রণবের ইহাই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। প্রণব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু মন-আকাশাদি প্রাকৃত বিকারভূত বস্তু বলিয়া ব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ তাহাদের অভিন্নতা নাই, তাহারা জড়, সৃষ্ট, অ-চিৎ; আর ব্রহ্ম অনাদি, নিত্য, চিৎ। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে বলিয়াই তাহাদিগকে ব্রহ্মের প্রতীক বলা হয়। কিন্তু প্রণব তাহাদের ন্যায় অ-ব্রহ্ম বস্তু নহে; সুতরাং প্রণব কখনও ব্রহ্মের প্রতীক হইতে পারে না।

## ৭৭। ব্রহ্মবিগ্রহের পরিচ্ছদাদি

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপালপূর্ব্বতাপনী বলিয়াছেন—

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং **বৈদ্যুতাম্বরম্**।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং **বনমালিনমীশ্বরম্** ॥
গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
**দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্** ॥১।২॥"

এই শ্রুতিবাক্যে বৈদ্যুতাম্বরের ( পীতবসনের ) কথা, বনমালার কথা, দিব্য অলঙ্কারের কথা এবং রত্নপঙ্কজ-রূপ আসনের কথাও জানা গেল। বহিরঙ্গা মায়া যখন পরব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন এ-সমস্ত বসন-ভূষণ এবং আসনাদি যে মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ সম্বন্ধেই শ্রুতি এ-সমস্ত কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এ-সমস্ত বসন-ভূষণাদিও যে নিত্য, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

কিন্তু এ-সমস্ত কোথা হইতে আসিল ? নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কোথা হইতে আসার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এ-সমস্ত যখন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে নিত্য বিরাজিত, তখন বুঝিতে হইবে—এ-সমস্ত তাঁহার স্বরূপে নিত্য অবস্থিত স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ, সুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে যেই রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় :—

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিতকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদুর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥
—শ্রীভা. ১০।৩।৯-১০॥

—দেবকী হইতে ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন—সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত ; তাঁহার নয়ন পদ্মের তুল্য ; তিনি চতুর্ভুজ, চারি হস্তে শঙ্খ-গদাদি ( শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ) আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিরাজমান, গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভমান। পরিধানে পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধরের তুল্য সুন্দর ; মহামূল্য বৈদুর্য্যমণি এবং কুণ্ডলের দ্যুতিতে তাঁহার অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান ; অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ এবং কঙ্কণাদি অলঙ্কারে তিনি দীপ্যমান।"

এ-স্থলে দেখা গেল—শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রের সহিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারের সহিতই এবং পরিহিত পীতবসনের সহিতই ভগবান্ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং এ-সমস্ত অস্ত্র এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি আগন্তুক বস্তু নহে, তাঁহারই স্বরূপভূত।

বসুদেব-দেবকী তাঁহার স্তব-স্তুতি করিলেন ; তিনিও স্বীয় স্বরূপের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বসুদেব-দেবকীর অভিপ্রায় অনুসারে নিজেই আবার প্রাকৃত শিশুর আকার প্রকটিত করিলেন—"বভুবঃ প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩।৪৬॥" তাঁহার চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি যদি তাঁহার স্বরূপভূত না হইত, তাহা হইলে যখন তিনি প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রূপ প্রকটিত করিলেন, তখন তাঁহার চক্রাদি ও বসন-ভূষণাদি দৃশ্যমান্‌রূপে সেস্থানে পড়িয়া থাকিত। তিনি তাঁহার চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদিকে অন্তর্হিত করিলেন মাত্র ; এ-সমস্ত তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু বলিয়াই অন্তর্হিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবান্ পরব্রহ্মের চক্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি যে তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত—শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়। এ-স্থলে সেই প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতং স্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ।
পাতু সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ॥
—শ্রীভা. ৬।৮।৩২-৩৩॥"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ঐকাত্ম্যানুভাবানাং কেবল-পরম-স্বরূপদৃষ্টিপরাণাং বিকল্পরহিতঃ। পরমানন্দৈকরস-পরমস্বরূপতয়া স্ফুরন্ অপি যথা যেন প্রকারেণ স্বেষু স্বস্বামিতয়া ভজৎসু যা মায়া কৃপা তয়া হেতুনা স্বয়ং বিচিত্রশক্তিময়েন স্বস্বরূপেণৈব কারণভূতেন ভূষণাস্ত্রাখ্যাঃ শক্তীঃ শক্তিময়াবির্ভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি তেনৈব বিদ্বদনুভবলক্ষণেন সত্যপ্রমাণেন। তদ্ যদি সত্যং স্যাৎ তদা ইত্যর্থঃ। তৈরেব ভূষণাদিলক্ষণৈঃ সর্বৈঃ স্বরূপৈঃ বিচিত্রস্বরূপাবির্ভাবৈঃ নঃ পাতু।"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের উল্লিখিত টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য এইরূপঃ—"যাঁহারা ঐকাত্ম্যের—চিন্ময় সত্ত্বামাত্রের—ধ্যান করেন, তাঁহাদের নিকটে যিনি স্বীয়-ভূষণাদি-রহিত এবং শক্তি-রহিত কেবলমাত্র পরমানন্দৈকরস পরমস্বরূপরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা স্বীয় সেব্য প্রভুরূপে ভজন করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপাবশতঃ যিনি বিচিত্র-শক্তিময়-স্ব-স্বরূপে ভূষণায়ুধাস্ত্রাখ্যা শক্তিসমূহ ( শক্তিময় আবির্ভাবসমূহ ) প্রকটিত করেন, এবং স্বীয় স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত ভূষণায়ুধাদির সহিত যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সত্যভূত এই সকল ভূষণায়ুধাদি-লক্ষণে লক্ষিত সেই ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে "ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যাঃ ধত্তে শক্তীঃ"-বাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে—ভগবানের শক্তিরই নাম ভূষণায়ুধ—তাঁহার ভূষণাদি এবং অস্ত্রাদি তাঁহারই শক্তির—স্বরূপ-শক্তির—বৃত্তি।

উল্লিখিত ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—"অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃতচক্রস্তুতৌ যস্য রূপমনির্দ্দেশ্যমপি যোগিভিরুত্তমৈরিত্যাদ্যনন্তরঞ্চ। ভ্রমতস্তস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীয়তে। ত্রৈলোক্য-মখিলং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূর্ভুবাদিকমিতি।—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরগ্রন্থে বলিরাজকৃত চক্রস্তুতিতে—'উত্তম উত্তম যোগিগণও যাঁহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ'—ইত্যাদি বলার পরে অর্থাৎ চক্রস্তুতির পরে, বলা হইয়াছে—ভ্রমণশীল ( ঘূর্ণায়মান ) চক্রের নাভিমধ্যে দৈত্যরাজ বলি ভূর্ভুবাদি লোক সকল দর্শন করিয়াছিলেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চক্র তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বস্তু বলিয়াই চক্রের ( পরিদৃশ্যমান্ ক্ষুদ্র ) নাভিমধ্যে ভূর্ভুবাদি লোকসকলের অবস্থান সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের নবম-স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় ( ৩—১১ শ্লোক ) হইতে জানা যায়, মহারাজ অম্বরীষ ভগবানের সুদর্শন চক্রের স্তুতি-প্রসঙ্গে চক্রকে বলিয়াছেন—হে চক্র! তুমি অগ্নি, তুমিই সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্রপতি চন্দ্র, তুমিই জল-ভূমি, তুমিই আকাশ, বায়ু, তন্মাত্র, তুমিই পৃথ্বীপতি ; তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, অমৃত, সত্য, যজ্ঞমূর্ত্তি এবং অখিল যজ্ঞভোক্তা, তুমিই ধর্ম্মসেতু ; সৎ, অসৎ, পর, অপর ইত্যাদি তোমারই স্বরূপ ; তোমা হইতেই সূর্য্যাদির প্রকাশ। ইত্যাদি।

ভগবানের আয়ুধ চক্র যে তাঁহারই স্বরূপভূত, উল্লিখিত স্তোত্রে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভগবানের কৌস্তুভমণি সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে ( ৩৪৪ পৃষ্ঠায় ) বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই।

"আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিরিতি॥

—ভগবান্ হরি কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছেন—যে কৌস্তুভমণি হইতেছে জগতের আত্মা, নির্লেপ ( মায়াতীত ), নির্গুণ ( প্রাকৃত গুণহীন ) এবং নির্ম্মল।”

এ-স্থলেও ভগবানের ভূষণবিশেষ কৌস্তুভমণির অপ্রাকৃতত্ব ঘোষিত হইয়াছে এবং তাহাকে জগতের আত্মা বলায় তাহার ভগবৎ-স্বরূপভূতত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

এইরূপে শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণবলে দেখা গেল—পরব্রহ্ম ভগবানের অস্ত্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহার স্বরূপাতিরিক্ত বস্তু নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—অস্ত্রাদি এবং বসন-ভূষণাদি ভগবানের স্বরূপভূত বস্তু হইলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহাদের নিকটে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সকলে এবং সকল সময়ে তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের এবং সমস্ত অলঙ্কারাদির দর্শন পায়েন না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। যাঁহার নিকটে ভগবান্ যে যে অস্ত্র বা যে যে অলঙ্কারাদি প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকটে সেই সেই অস্ত্র বা সেই সেই অলঙ্কারাদিই প্রকটিত করেন। “যৎ ক্বচিদাকস্মিকত্বমিব শ্রূয়তে তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাববৎ জ্ঞেয়ম্॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ৩৪৩ পৃষ্ঠা॥”

# সপ্তম অধ্যায়
## ( আবির্ভাব-তিরোভাব )

### ৭৮। ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব-তিরোভাব

#### ক। আবির্ভাব

ভগবান্ পরব্রহ্ম স্বীয় শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়েন না। যেহেতু, "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৭৯॥" বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তত্ত্ব বলিয়া তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ না করিলে কেহই তাঁহার দর্শনাদি পাইতে পারে না। তিনি নিজের শক্তিতেই নিজেকে প্রকাশ করেন। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজ শক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন ॥—ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত ( অপরিদৃশ্যমান্ ) হইলেও তাঁহার নিজের শক্তিতেই দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার সেই ( স্বপ্রকাশতা ) শক্তি ব্যতীত সেই অমিত ( সর্ব্বব্যাপক ) পরমাত্মা প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে ?"

এইরূপে ভগবান্ পরব্রহ্ম যখন স্বীয় শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাকে লোক দেখিতে পায়। ইহাকেই তাঁহার **আবির্ভাব** বলে।

তিনি ব্যক্তিবিশেষের নিকটেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যেমন, শ্রীনৃসিংহরূপে প্রহ্লাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যেমন শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে কংস-কারাগারে দেবকী-বসুদেবের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার তিনি স্থান-বিশেষের বা ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের সকল লোকের নিকটেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। যেমন, গত ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে, কি গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেলেন।

ব্যক্তিবিশেষের নিকটে তিনি যখন আবির্ভূত হয়েন, তখন দৃশ্যমান্‌ভাবে সাধারণতঃ তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। কিন্তু স্থানবিশেষের বা ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের সকলের দৃশ্যমান্‌রূপে যখন তিনি আবির্ভূত হয়েন, তখন তিনি দৃশ্যমান্‌ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে দীর্ঘকাল প্রকটভাবে ছিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবকে **অবতরণ**ও বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যখন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন বলা হয়—তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বা আত্মপ্রকট করিয়াছেন।

ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবের বা অবতরণের কথা শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা হইতেও জানা যায়। অর্জ্জুনের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।॥৪।৭-৮॥

—হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এইরূপে তিনি যে বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৭।৫॥

—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার—উভয়েরই বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল (জন্মের বা অবতরণের বিষয়) জানি; কিন্তু তুমি জান না।"

বলাবাহুল্য, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বলিতে আবির্ভাবই বুঝায়; ইহা প্রাকৃত জীবের জন্মের ন্যায় জন্ম নহে। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। গীতা ৪।৯॥"—বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "জন্ম দিব্য—অলৌকিক।" তাঁহার এই আলৌকিক জন্ম যে আবির্ভাবমাত্র, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ।৪।৬॥

—আমি অজ (জন্মরহিত), অবিনশ্বর আত্মা এবং ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হই।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে "প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায়",—বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ—প্রকৃতি-শব্দের অর্থ স্বভাব; স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, নিজের স্বরূপেই (আবির্ভূত হই)।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও তাহাই লিখিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় বিশুদ্ধোঽর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি ইত্যর্থঃ—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।" "আত্মমায়য়া"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্য্যায়োঽত্র মায়াশব্দঃ। আত্মমায়য়া আত্মীয়েন জ্ঞানেন আত্মসঙ্কল্পেন ইত্যর্থঃ। —এ-স্থলে মায়া-শব্দের অর্থ জ্ঞান (অভিধানের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে); আত্মমায়া অর্থ—নিজের জ্ঞান, নিজের সঙ্কল্প।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"আত্ম-মায়য়া ভজজ্জীবানুকম্পয়া হেতুনা তদুদ্ধারায়েত্যর্থঃ।—মায়া অর্থ কৃপা। ভজনশীল জীবদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ, তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বস্বরূপাবরণ-প্রকাশন-কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া ইত্যর্থঃ। —চিচ্ছক্তির যে বৃত্তি ভগবানের স্বীয় স্বরূপকে আবৃত এবং প্রকাশিত করে, সেই বৃত্তিদ্বারা—যোগমায়া দ্বারা।" শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞান-বল-বীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। —সম্যক্‌রূপে অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তিদ্বারা বা শক্তির সহায়তায়।"

## খ। যোগমায়াই আত্মপ্রকাশিকা-শক্তি

এইরূপে জানা গেল—শ্রীভগবান্ স্বীয় সঙ্কল্পবশতঃই স্বীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তি যোগমায়ার সহায়তায় অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তির সহিত স্বীয় অনাদিসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বরূপে—শ্রীবিগ্রহেই—অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহা তাঁহার লৌকিক জন্ম নহে—আবির্ভাব মাত্র। তাঁহার যে রূপ বা শ্রীবিগ্রহ অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজমান—কিন্তু লোকনয়নের অগোচরে অবস্থিত থাকে, তাহাকে লোকনয়নের গোচরীভূত করাই তাঁহার আবির্ভাব ; এই আবির্ভাবকেই তাঁহার দিব্য জন্ম বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে ময়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইব আত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।" শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধিষ্ঠানেই শ্রীকৃষ্ণ দেহিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অর্থ শ্রুতিসম্মত নহে ; কেন না, বহিরঙ্গা মায়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না—ইহাই শ্রুতির উক্তি ( ১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে নহে, পরন্তু অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই যে ভগবান্ পরব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটীকা হইতেই তাহা জানা গিয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। "জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যারূপ-দেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ২৬৫ পৃষ্ঠা॥ —অবিদ্যার প্রভাবে জীবের মিথ্যারূপ দেহসম্বন্ধ। আর যোগমায়ার প্রভাবেই ঈশ্বরের চিদ্ঘন-বিগ্রহের আবির্ভাব। ইহাই মহান্ বিশেষ।"

যোগমায়ার সহায়তাতেই যে শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়। উদ্ধব বিদুরের নিকটে বলিয়াছেন—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥
—শ্রীভা. ৩।২।১২॥

—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলীলার ( নরলীলার ) উপযোগী, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং নিজেরও বিস্ময়জনক ভূষণ-সমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট যে রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, ইত্যাদি।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তেবীর্য্যং এতাদৃশসৌভাগ্যস্যাপি প্রকাশিকা ইয়ং ভবতি ইতি এবংবিধং দর্শয়তা আবিষ্কৃতম্॥" এই টীকার তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় চিচ্ছক্তিই হইতেছে যোগমায়া। এই যোগমায়াই তাঁহার সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত রূপের—শ্রীবিগ্রহের—প্রকাশিকা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকটনে যোগমায়ার এতাদৃশী শক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়াই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবির্ভাব-কালে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে গঠন করেন না; পরন্তু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায়—যোগমায়াই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৫॥"

যাহা হউক, **গোপালোত্তর-তাপনী**-শ্রুতি হইতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবের কথা জানা যায়।

"সা হোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বা অস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ ॥৯॥

—সেই গান্ধর্ব্বী বলিলেন—কেন বা কি প্রকারে সেই (পরব্রহ্ম) গোপাল আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন (আবির্ভূত হইলেন)।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই পরব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবের দেদীপ্যমান প্রমাণ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মাণ্ডস্থ কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে অর্জ্জুনের নিকটে গীতা-রহস্য প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

## গ। তিরোভাব

আকাশ-মণ্ডলে সূর্য্য নিত্যই একভাবে বিরাজমান। যখন তিনি কোনও স্থানের লোকগণের নয়নের গোচরীভূত হয়েন, তখন বলা হয়—তাঁহার উদয় (বা আবির্ভাব) হইয়াছে; আবার যখন তিনি লোকনয়নের অগোচরে চলিয়া যায়েন, তখন বলা হয়—সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন বা তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান্ পরব্রহ্মও যখন কৃপা করিয়া কোনও স্থানে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বলা হয়—তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। আবার যখন তিনি আত্মগোপন করেন, তখন বলা হয়—তাঁহার **তিরোভাব** হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—বিদুরের নিকটে উদ্ধব এই ভাবেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

"কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিংনু ন কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥ শ্রীভা. ৩।২।৭॥

—উদ্ধব বিদুরকে বলিলেন—অহে বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের গৃহসকল অজগররূপ শোকান্ধকারে নির্গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশলের কথা আমি আর কি বলিব?"

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"—ইত্যাদি ( গীতা ॥৪।৫ ) বাক্যে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার বহুবার আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বহুবার তিরোভাবের কথাও ধ্বনিত হইতেছে। একবার আবির্ভূত হইয়া তিরোভাব প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় আর একবার আবির্ভাব সম্ভব হয়।

এইরূপে জানা যায়—ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাব শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত।

আপেক্ষিক গতির ফলে যেনন সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত, তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব এবং তিরোভাব। যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে প্রকাশ করেন, তখন আবির্ভাব, আবার যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে আবৃত করেন, তখন তিরোভাব। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না যোগমায়ার এইরূপ প্রভাব আছে। "স্বস্বরূপাবরণ-প্রকাশনকর্ম্ম চ যয়া চিচ্চক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া ॥ গীতা ৪।৬-শ্লোক-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

# অষ্টম অধ্যায়

## ( পরব্রহ্ম একেই বহু )

### ৭৯। পরব্রহ্ম একেই বহু

ভগবান্ পরব্রহ্ম এক হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সেচ্ছানুসারেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়।

**(ক) শ্রুতি-প্রমাণ**

**গোপালপূর্ব্বতাপনী** শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি ॥ ১।৫॥

—এক হইয়াও যিনি বহু রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

**শ্রীভাষ্যধৃত শ্রুতিবাক্য** হইতেও ঐ কথাই জানা যায়।

"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ২।২।৪৪॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ॥

—জন্মরহিত হইয়াও যিনি বহু প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।"

**শঙ্করভাষ্যধৃত একটি শ্রুতিবাক্য** হইতেও ঐরূপ কথা জানা যায়।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৪২॥"—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

"স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি ইত্যাদি ॥

—তিনি ( ব্রহ্ম ) এক প্রকার হয়েন, বহুপ্রকার হয়েন ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোঽনেকধা ভাবস্যাধিগতত্বাৎ।—ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার ( ব্রহ্মের ) বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে।"

**মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা চতুর্ব্বেদশিখা শ্রুতি** হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যটি নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্ ॥—আমি বাসুদেব,

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—আমি শতপ্রকারে, সহস্রপ্রকারে আবির্ভূত হই ; এই সকল রূপের বৃদ্ধি নাই, জন্ম নাই, মরণ নাই ; ইঁহাদের অজ্ঞান-বন্ধন নাই, মুক্তি নাই ; ইঁহারা সকলে পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরমানন্দ-স্বরূপ।—চতুর্বেবদশিখা। প্রভুপাদ শ্রীলপ্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুবাদ।”

এই মাধ্বভাষ্যধৃত-চতুর্বেবদশিখা-বাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহরূপে এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন ; এবং ইহাও জানা গেল—কেবল উল্লিখিত কতিপয়রূপেই নহে, তিনি শতপ্রকারে, সহস্রপ্রকারে—অর্থাৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। তাঁহার এইসকল রূপের প্রত্যেক রূপই নিত্য, পূর্ণ, অজর, অমর এবং মায়াতীত।

(খ) **শ্রীমদ্‌ভাগবতও** বলিয়াছেন—ভগবান্ পরব্রহ্মের অসংখ্য অবতার ( স্বরূপ )

“অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥—শ্রীভা, ১।৩।২৬ ॥

—শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা স্বপ্রকাশিকা শক্তির মূল নিধান ভগবান্ হরির অসংখ্য অবতার ( স্বরূপ )। যেমন উপক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র নির্ঝর নির্গত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকেন।”

## ৮০। ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের পার্থক্যের হেতু

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চতুর্বেবদ-শিখার প্রমাণে জানা যায়, সকল স্বরূপই পূর্ণ, নিত্য, মায়াতীত এবং পরমানন্দ-স্বরূপ। পরব্রহ্মও পূর্ণ, নিত্য, মায়াতীত এবং পরমানন্দ-স্বরূপ। তাহা হইলে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে পার্থক্য বা বিশেষত্ব কোথায় ? পার্থক্য বা বিশেষত্ব না থাকিলে একাধিক স্বরূপই বা হয় কিরূপে ? চতুর্বেবদশিখায় যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের রূপ বা আকৃতিও বিভিন্ন। আকৃতির এই বিভিন্নতারই বা হেতু কি ? এবং আকৃতির বিভিন্নতাদ্বারা কি-ই বা সূচিত হইতেছে ?

এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে ( যেমন চতুর্বেবদশিখাতেও উল্লিখিত হইয়াছে )। তাহার পরে বলা হইয়াছে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥

—যাঁহাদের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা তাঁহার কলা ( বিভূতি )। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্। পৃথিবী দৈত্যগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে ভগবান্ ঐ-সকল রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসকলকে নিরুপদ্রব এবং সুখী করেন।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্। কুমার-নারদাদিষু আধিকারিকেষু যথোপযোগম্ অংশকলাবেশঃ। পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কেচিদংশাঃ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদ্যাঃ। কেচিৎ কলাঃ কুমার-নারদাদয়ঃ আবেশাঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ।"

টীকাসমূহের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়—অবতারসমূহের মধ্যে কোনও কোনও অবতার হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্বরূপের অংশ বা স্বরূপের অংশের অংশ; আর কেহ বা হইতেছেন—আবেশ। যাঁহারা আবেশাবতার, তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন। "জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ লঘু-ভাগবতামৃত। ১।১৮॥—জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-শক্ত্যাদির কলা (অংশ) দ্বারা যে সকল জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই সকল মহত্তম-জীবকে আবেশ বলে।" পরব্রহ্ম যে একেই বহুরূপ প্রকাশ করেন—এই প্রসঙ্গের আলোচনায় জীবতত্ত্ব এস্থলে আমাদের বিবেচ্য নহে, কেবলমাত্র ভগবত্তত্ত্বই বিবেচ্য। মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারগণ তাঁহার নিজের অংশ—স্বাংশ। যাঁহারা অংশের অংশ—তাঁহারাও তাঁহার নিজের অংশই। সুতরাং সকলেই স্বরূপতঃ ভগবত্তত্ত্ব। তাঁহাদের কথাই এ-স্থলে বিবেচ্য। চতুর্ব্বেদশিখা-প্রমাণে জানা গিয়াছে—তাঁহারা পরব্রহ্মেরই প্রকাশ। শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণে জানা গেল, তাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

কিন্তু কিরূপ অংশ? পরব্রহ্ম হইতেছেন—পূর্ণতম বস্তু, পূর্ণতম বস্তু হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক। সর্ব্বব্যাপক বস্তুর টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় কোনও অংশ হইতে পারে না। সুতরাং মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ পরব্রহ্মের টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডবৎ কোনও বিচ্ছিন্ন—সুতরাং পরিচ্ছিন্ন—অংশ হইতে পারেন না। চতুর্ব্বেদশিখাও তাহাই বলিয়াছেন—যেহেতু, চতুর্ব্বেদশিখাতে তাঁহাদিগকে "পূর্ণ-সর্ব্বব্যাপক" বলা হইয়াছে। তবে তাঁহারা পরব্রহ্মের কিরূপ অংশ?

উপরে উদ্ধৃত "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"তত্র মৎস্যাদীনাম্ অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্।—মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাসত্ত্বেও যথাযোগ্যভাবে জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির আবিষ্করণ।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—মৎস্য-কূর্ম্মাদিও স্বরূপতঃ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্, কিন্তু তাঁহারা পরব্রহ্মের স্বাংশ-অবতার (বা স্বাংশ-স্বরূপ) বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞত্বের এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার পূর্ণ বিকাশ নাই; যথাযোগ্য বিকাশ মাত্র আছে—জ্ঞানের, ক্রিয়ার, এবং শক্তির যথাযোগ্য বিকাশ মাত্র আছে। "যথাযোগ্য বিকাশ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—যে উদ্দেশ্যে যে স্বরূপের প্রকাশ, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি-আদির যতটুকু বিকাশ আবশ্যক, সেই স্বরূপে ততটুকু মাত্রই বিকশিত হয়। "মৎস্য-কূর্ম্মাদি সকলেই স্বরূপতঃ সর্ব্বজ্ঞ এবং

সর্ববশক্তিমান্”—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই সর্ববজ্ঞ এবং সর্ববশক্তিমান্ পরব্রহ্ম ; শক্তি-আদি বিকাশের বিশেষত্ব অনুসারেই তাঁহাদের বিশেষত্ব।

সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে ; স্বাংশ-স্বরূপসমূহে ন্যূনশক্তির বিকাশ। “তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥১।১৪॥”

লঘু-ভাগবতামৃত আরও বলিয়াছেন—

“অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা ॥
শক্তিরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যকৃপাতেজোমুখা গুণাঃ।
শক্তির্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ ॥ ১।৩৬০-৬২॥”

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়—অংশ-স্বরূপে সর্ববদা অল্পশক্তির বিকাশ থাকে। আর পূর্ণস্বরূপে স্বেচ্ছাবশতঃই নানা—বহু—শক্তির বিকাশ থাকে। শক্তি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও তেজঃ-প্রমুখগুণসমূহরূপ শক্তির বিকাশের এবং অবিকাশের তারতম্যই স্বরূপ-সমূহের তারতম্যের হেতু।

ব্রহ্মসংহিতাও উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন—

“রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৩৯॥

—যে পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বারা শ্রীরামাদি-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া নানাবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ( ব্রহ্মা ) ভজন করি।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি।—কখনও কখনও তিনি ( শ্রীকৃষ্ণ ) যে নিজের অংশে স্বয়ংই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, রামাদি-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।” ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীরামচন্দ্রাদি বিভিন্নরূপ যে সকল স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; এই সমস্ত অংশ-স্বরূপে তিনি নিজেই অবতীর্ণ হয়েন। “কলানিয়মেন”-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়শক্তি ( কলা ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াই—বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পরিমাণে—শক্তি প্রকাশিত করিয়াই, বিভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলানিয়মনের—অর্থাৎ স্বীয় শক্তির বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশের—ফলেই স্বাংশ-স্বরূপ-সমূহের বিভিন্নতা।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ তত্ত্বতঃ সর্ববজ্ঞ-সর্ববশক্তিমান্ পরব্রহ্ম হইলেও শক্তিবিকাশের ন্যূনতাবশতঃই তাঁহাদিগকে পরব্রহ্মের অংশ—স্বাংশ—বলা হয়। টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশ নহে, শক্তির আংশিক বিকাশবশতঃ অংশ। ন্যূনশক্তির বিকাশে অংশ ; আর পূর্ণ-শক্তির বিকাশে অংশী। সুতরাং স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মৎস্যকূর্ম্মাদি-স্বরূপের অংশী।

## ৮১। ভগবৎ-স্বরূপসমূহের আকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা

এক্ষণে মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের আকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মের বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপভূত। ইহাও বলা হইয়াছে—অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের বিগ্রহও তাঁহাদের স্বরূপভূত এবং পরব্রহ্মেরও স্বরূপভূত। ১।১।৬৯(ক) (৫-৬)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দঘন বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ। শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা তাঁহার বিগ্রহ প্রকাশিত হয় বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহও বলা হয় [ ১।১।৬৯(ঙ)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিই তাঁহার রূপকে প্রকাশ করেন ( ১।১।৬৬-অনুচ্ছেদ ); সুতরাং স্বরূপ-শক্তির বিকাশের বিশেষত্ব অনুসারে ব্রহ্মের রূপের বা আকৃতিরও বিশেষত্ব হইয়া থাকে। যে-স্থানে শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, সে-স্থানে যেরূপ আকৃতি প্রকাশিত হয়, যে-স্থানে শক্তির আংশিকী অভিব্যক্তি, সে-স্থানে সেইরূপ আকৃতি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ নাই বলিয়া তাঁহাদের আকৃতি হইবে—পূর্ণতম-বিকাশময়-শক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্মের আকৃতি হইতে ভিন্ন রকমের। আবার, মৎস্য-কূর্ম্মাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপেও শক্তির আংশিক বিকাশও বিভিন্ন রকমের; সুতরাং তাঁহাদের আকৃতিও হইয়া থাকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন।

আর একভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। স্বরূপ-শক্তির বিকাশেই ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ। শক্তিবিকাশের বৈচিত্রী অনুসারে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিকাশেরও বৈচিত্রী থাকিবে। ব্রহ্মবিগ্রহ হইতেছে—ভাব-বিগ্রহ, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি-বিগ্রহ। সুতরাং শক্তিবিকাশের বৈচিত্রী অনুসারে যেমন ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিকাশেরও বৈচিত্রী—সুতরাং ভাবেরও বৈচিত্রী, তদ্রূপ বিগ্রহেরও বিচিত্রী অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

## ৮২। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এক-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বোদ্ধৃত চতুর্ব্বেদশিখা-প্রমাণ হইতে জানা যায়—মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ সকলেই পূর্ণ, ( সর্ব্বব্যাপক ) এবং মায়াতীত। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে জানা যায়—স্বাংশ-স্বরূপগণ সকলেই তত্ত্বতঃ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। ব্রহ্মসংহিতার "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন"—ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা হইতে জানা যায়—এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই অংশে নানাবিধ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-স্বরূপগণ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা এক পরব্রহ্মই। এক পরব্রহ্মই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। সুতরাং পরব্রহ্ম একেই বহু হয়েন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহও তাহাই বলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

"একই বিগ্রহ, কিন্তু আকারবিভেদ ॥১।২।২০"
"অনন্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥১।২।৮৩॥"
"একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥২।৯।১৪১॥"
"একই বিগ্রহ তাঁর, অনন্ত স্বরূপ ॥২।২০।১৩৭॥"

পরব্রহ্ম এক বিগ্রহেই বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥" —এই বেদান্ত-সূত্র অনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে—যদিও ইহা আমাদের চিন্তার অতীত। তথাপি একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ-সম্বন্ধে একটু ধারণা করার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

মনে করা যাউক, যেন একটী বিরাট বৃক্ষ আছে; তাহার বহু সহস্র শাখা-প্রশাখা, তাহাতে বহু সহস্র ফল, বহু সহস্র ফুল। কোনও কৌশলে যদি দুইটী শাখা ব্যতীত বৃক্ষটীর অন্য সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে এবং সমস্ত ফল-ফুলকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে কেবল ফল-ফুলবর্জ্জিত একটী দ্বিশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহা হইবে মূল বৃক্ষটীরই অংশ এবং মূল বৃক্ষটীরই অন্তর্ভুক্ত। ঐরূপে কোনও কৌশলে যদি ফুল-ফল-বিশিষ্ট বিশটী শাখা ব্যতীত অন্য সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে মাত্র ফল-ফুলে শোভিত বিশটী শাখা বিশিষ্ট একটী বৃক্ষ; ইহাও হইবে মূল বৃক্ষেরই একটী অংশ এবং মূল বৃক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। যদি শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল সমস্তকে অদৃশ্য করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যমান্ হইবে কেবল বৃক্ষের কাণ্ডটী। ইহাও হইবে মূল বৃক্ষেরই অংশ এবং মূল বৃক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে, মূল বৃক্ষটীকে অনেক রূপে প্রকাশ বা দৃশ্যমান্ করা যায়। এ-স্থলে বলা যায়—মূল বৃক্ষটী তাহার এক বিগ্রহেই নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, অথচ মূল বৃক্ষ অবিকৃতই থাকে।

ভগবান্ পরব্রহ্ম অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন। এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি তাঁহা ব্যতীত অপর কাহারও নাই। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ নচান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুরিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ১৪৪-পৃষ্ঠাধৃত মধ্বাচার্য্যোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য ॥" তাঁহার স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান্। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি কোনও কোনও বৈচিত্রীকে প্রকাশও করিতে পারেন, কোনও কোনও বৈচিত্রীকে অপ্রকাশ্যও রাখিতে পারেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন—পরব্রহ্মেরই শক্তিবৈচিত্রীর ফল। সমস্ত বৈচিত্রীই যখন তাঁহারই মধ্যে—তাঁহারই স্বরূপভূত—তখন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপ তাঁহার অনন্ত বৈচিত্রী তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং তাঁহার একরূপেই, এক বিগ্রহেই, তিনি যে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষের দৃষ্টান্তে, তাহার কিছু ধারণা করার চেষ্টা করা যায়।

নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থ একটী বৈদুর্য্যমণির দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

> "মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
> রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥"
>
> —লঘুভাগবতামৃত। ১।৩৫৭-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ।"

বৈদুর্য্যমণিতে নীল-পীত-লোহিতাদি নানাবিধ বর্ণ আছে; কিন্তু তাহাকে বিভাগ করিলে, কিম্বা নানা দিক্ হইতে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নানাবিধ বর্ণ দেখা যায়। কোনও দিক্ হইতে কেবল নীলবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে কেবল পীতবর্ণ, কোনও দিক্ হইতে বা নীল-পীত মিলিত বর্ণ—ইত্যাদি রূপে নানা বর্ণ দেখা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এইরূপ বর্ণভেদ উপলব্ধির হেতু। তদ্রূপ অচ্যুত ভগবান্ পরব্রহ্মও সাধকের ধ্যানভেদে বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করেন ( অর্থাৎ সাধকের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করেন )। সমস্ত রূপই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত—

নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণ যেমন বৈদুর্য্যমণির অন্তর্ভুক্ত। যেই সাধক তাঁহার যে রূপের ধ্যান করেন—অর্থাৎ যেই রূপেতে সাধকের চিত্তবৃত্তি নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত—অচ্যুত ভগবান্ সেই রূপটীকেই সেই সাধকের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করেন।

এই তথ্যটীই শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৪১॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরেতে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৪০॥"

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন একই পরব্রহ্মের অনন্ত প্রকাশ এবং এই সমস্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের একই বিগ্রহে অবস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে মনে করিলে—তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক্—স্বতন্ত্র—তত্ত্ব মনে করিলে অপরাধ হয়। যেহেতু, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্বের অপলাপ করা হয়।

পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন পরিদৃশ্যমান্ বস্তুসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ।৪।৪।১৯॥ —এই বিশ্বে নানা-বিবিধ—পৃথক্ পৃথক্—তত্ত্ব কিছু নাই। নানা বা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব আছে বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি মৃত্যু পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন ( অর্থাৎ তাঁহার অপরাধ হয়, তত্ত্বের অপলাপ করেন বলিয়া )।

জগতে যে বিভিন্ন বস্তু দেখা যায়, তাহারা বিভিন্ন বা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব নহে; সকলে একই তত্ত্ব—একই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥"—এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়, স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিজে অবিকৃত থাকিয়াও ব্রহ্ম এই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎ বা জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নহে। ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মতত্ত্বের অপলাপ করা হয়, তাহাতে অপরাধ হয়।

ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ-সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বিভিন্ন তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বের—ব্রহ্মবিগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত, ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নহেন। তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব মনে করিলে ব্রহ্মতত্ত্বের অপলাপ করা হয়, তাহা অপরাধজনক।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"অনন্ত-প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৪৪॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ করিলেও এই অনন্ত প্রকাশের মূর্ত্তিভেদ—বিগ্রহভেদ নাই; তাঁহাদের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাতিরিক্ত নহে। তাঁহার একই বিগ্রহেই অনন্ত প্রকাশ ( পূর্ব্বোলিখিত বৃক্ষের বা বৈদুর্য্যমণির দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য )।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বোদ্ধৃত "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন"-ইত্যাদি ব্রহ্ম-সংহিতা-প্রমাণ হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় অংশে শ্রীরামচন্দ্রাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন। যখন ব্রহ্মাণ্ডে

অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাদের বিভিন্ন বিগ্রহই লোকনয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের পৃথক্ বিগ্রহ নাই—ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিদ্যমান্। অবশ্য লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে কেহ দেখিতেও পায় না। যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত যে স্বরূপকে কৃপা করিয়া তিনি লোকনয়নের গোচরীভূত করিয়া থাকেন, তখন লোক সেই স্বরূপকে দেখিতে পারে। ইহাই তাঁহার আবির্ভাব বা অবতরণ। যখন যে ভগবৎ-স্বরূপ এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার বিগ্রহ পরব্রহ্ম-বিগ্রহের অন্তর্ভুক্তই, ব্রহ্ম-বিগ্রহাতিরিক্ত নহেন ( পূর্ব্বোল্লিখিত বৃক্ষের দৃষ্টান্তে দ্বিশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় )।

## ৮৩। বহু বিগ্রহেও একত্ব

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম তাঁহার এক বিগ্রহেই বহু রূপ প্রকট করিয়া থাকেন। একথাই "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।"—বাক্যে গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি ( ১৫ ) বলিয়াছেন। আবার এক বিগ্রহেই বহু হওয়ায়, বহু বিগ্রহেও তিনি এক-বিগ্রহ। একথাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—"বহুমূর্ত্ত্যেক-মূর্ত্তিকম্॥ শ্রীভা. ১০।৪০।৭॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে অক্রূর বলিয়াছেন—

"একে ত্বাঽখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ **বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্**॥ শ্রীভা. ১০।৪০।৬-৭॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! যে সকল জ্ঞানী অখিল-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞ-( সমাধি ) দ্বারা তোমার জ্ঞানবিগ্রহের ( চিন্মাত্রাকার ব্রহ্মের বা তোমার চিদ্‌ঘনমূর্ত্তির ) আরাধনা করিয়া থাকেন। অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃতাত্মা ( বৈষ্ণব-শৈবাদি-দীক্ষায় দীক্ষিত ), তোমাকর্ত্তৃক অভিহিত বিধি-বিধানের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহারাও 'বহুমূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি' তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকের টীকায় "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং নারায়ণস্বরূপেণ একমূর্ত্তিকঞ্চ ত্বামেব যজন্তি।" বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন —"বহ্ব্যো বাসুদেবাদয়ো মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ো যস্য একা পরব্যোমাধিপ-মহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্যস্য তঞ্চ তঞ্চ।" শ্রীধরস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি মূর্ত্তিভেদে বহুমূর্ত্তি; কিন্তু নারায়ণস্বরূপে একমূর্ত্তি। স্তবের প্রারম্ভে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকেই "নারায়ণ" বলিয়াছেন। "নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্। ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০।৪০।১॥—সর্ব্ব-কারণ-কারণ আদ্য এবং অব্যয় পুরুষ নারায়ণ তোমার চরণে আমি নত হই।" এজন্যই শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নারায়ণরূপে যিনি এক মূর্ত্তি।" অর্থাৎ মূলনারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে এক মূর্ত্তি—এক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেই বাসুদেবাদির মূর্ত্তি অবস্থিত। বৈষ্ণবতোষণীকারের টীকার তাৎপর্য্য—বাসুদেবাদি এবং মৎস্যাদিও যাঁহার মূর্ত্তি এবং পরব্যোমাধিপতি মহানারায়ণও যাঁহার এক মূর্ত্তি, সেই এক তোমার বিগ্রহেই তৎ-সমস্ত মূর্ত্তির বা বিগ্রহের অবস্থান। উভয় টীকাকারের উক্তির তাৎপর্য্য একই—এক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই বাসুদেবাদির এবং মৎস্যাদির এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও বিগ্রহ অবস্থিত; তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক"। স্তবের শেষাংশে শ্রীভা. ১০।৪০।১৬-২২-শ্লোকে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই বহুবিধ ভগবৎ-স্বরূপের স্তব করিয়াছেন।* ইহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকত্ব অক্রূর প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

## ৮৪। সর্ব্বভগবৎ-স্বরূপের বিভুত্ব

পূর্ব্বোদ্ধৃত চতুর্ব্বেদশিখা-প্রমাণে জানা যায়—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই পূর্ণ। "সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি॥" পূর্ণ বলিতেই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" বুঝায়। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বাংশভূত-ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রত্যেকেই যে "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু", শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা গেল। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"—এই ব্রহ্মসূত্র অনুসারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহও "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" বলিয়া তদন্তর্গত ভগবৎ-স্বরূপগণের বিগ্রহের বিভুত্ব-সম্বন্ধে কোনওরূপ আশঙ্কার হেতু থাকিতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবৎ-স্বরূপগণের সংখ্যা অনন্ত; তাঁহাদের প্রত্যেকেই যদি "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" হয়েন, তাহা হইলে একাধিক বিভু-বস্তুর সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

---

*যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥
নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটবমৃত্যবে॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে॥
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥
নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে॥ শ্রীভা, ১০।৪০।১৬-২২॥

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—এই সমস্ত বিভু ভগবৎ-স্বরূপগণ স্বতন্ত্র নহেন; তাঁহারা হইতেছেন পরব্রহ্মস্বরূপ একই বিভুবস্তুর প্রকাশ-বিশেষ, অনন্ত বৈচিত্রীময় একই বিভুবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্রীমাত্র। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-শক্তি-আদির অনন্ত বৈচিত্রীময় পরব্রহ্মের স্বরূপে সর্ব্বত্রই এই সমস্ত বৈচিত্রীর প্রত্যেক বৈচিত্রী বিরাজিত। তাহাতেই পরব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে পূর্ণত্ব। "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" ব্রহ্মতত্ত্বের সর্ব্বত্রই যখন প্রত্যেক বৈচিত্রী বিরাজিত, তখন প্রত্যেক বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপও সর্ব্বত্রই বিরাজিত থাকিবেন এবং প্রত্যেক স্বরূপই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" হইবেন। পরব্রহ্মের বিভুত্বেই তাঁহাদের বিভুত্ব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্যের বৈদূর্য্যমণির নীলপীতাদি প্রত্যেকটী বর্ণই যেমন মণির সর্ব্বাংশে বিদ্যমান্, তদ্রূপ "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তি" পরব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বহু ভগবৎ-স্বরূপের বহু মূর্ত্তির প্রত্যেক মূর্ত্তিই সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিরাজিত, অর্থাৎ পরব্রহ্মের ন্যায় প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের বিগ্রহই "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"

## ৮৫। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ

**(ক) ভগবান্ ও স্বয়ংভগবান্।** পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অংশে যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে তাঁহার ভগবত্তারও আংশিক বিকাশ আছে বলিয়া **তাঁহারাও ভগবান্।** কিন্তু তাঁহাদের ভগবত্তা অন্যনিরপেক্ষ নহে; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতেই তাঁহাদের ভগবত্তা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার ভগবত্তা অন্যনিরপেক্ষ—স্বয়ংসিদ্ধ। এজন্য **শ্রীকৃষ্ণ** হইতেছেন—**স্বয়ং ভগবান্।** "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥" শ্রুতিও বলেন—"শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্॥ গোপালপূর্ব্বতাপনী। ১।১॥"

শ্রীকৃষ্ণ অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া তাঁহাকে **স্বয়ংরূপও** বলা হয়। "অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃত। ১।১০॥"

**(খ) প্রকাশ ও বিলাস।** শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস॥ ১।১।৩৫॥—দুইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মপ্রকট করেন—প্রকাশরূপে এবং বিলাস-রূপে।" এ-স্থলে "প্রকাশ" এবং "বিলাস"—এই দুইটিই পারিভাষিক শব্দ। নিম্নে এই দুইটী শব্দের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে।

### প্রকাশ

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে অংশরূপেই আত্মপ্রকট করেন, তাহা নহে। স্বয়ংরূপেও তিনি সময় সময় একাধিক রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। রাসলীলায় তিনি এক এক গোপীর নিকটে এক এক রূপে অবস্থিত ছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়। এইরূপে প্রকটিত বহু কৃষ্ণরূপের মধ্যে কোনও রূপ ভেদই ছিল না। আবার দ্বারকাতে মহিষী-বিবাহেও তিনি একই সময়ে ষোলহাজার মহিষীর গৃহে ষোলহাজার রূপে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ষোল হাজার শ্রীকৃষ্ণরূপের মধ্যেও কোনও রূপ পার্থক্য ছিল না। রাসস্থলীতে বা মহিষী-বিবাহে একই বিগ্রহেই তিনি বহুরূপে আত্মপ্রকট

করিয়াছিলেন। "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীয় এক উদাবহৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৬৯।২॥—নারদ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই দেহে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শ-সহস্র গৃহে আবির্ভূত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ষোড়শ-সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

উল্লিখিতরূপে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ, পারিভাষিক ভাবে তাহাকে **প্রকাশ** বলা হয়। "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য চৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥ লঘু-ভাগবতামৃত। ১।২১॥——(আকার, গুণ ও লীলায়) সম্যক্‌রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে।"

## বিলাস

আর, "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় **বিলাস** তার নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১।৩৮॥" লঘুভাগবতামৃতে এই বিলাসের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥ ১।১৫॥—স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্ন আকারে, শক্তিতে প্রায়শঃ মূলস্বরূপের তুল্যরূপে, প্রকটিত হয়েন, তাঁহাকে বিলাস বলে।"

বিলাসরূপের আকৃতি স্বয়ংরূপের আকৃতি হইতে—অঙ্গসন্নিবেশে, বর্ণে, বা ভাবে—ভিন্ন থাকে। আর, শ্লোকস্থ "প্রায়েণ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ংরূপ অপেক্ষা বিলাস-রূপের শক্ত্যাদিও কিছু কম থাকে। বলরাম, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদি হইতেছেন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। "যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১।৩৯॥" ইঁহাদের মধ্যে স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ বলিয়া ইঁহারা সকলেই স্বয়ংরূপের অংশ।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, গোপবেশ, (গোপবেশমভ্রাভম্। গোপালপূর্ব্বতাপনী। ১।২॥), গোপভাব। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়ভাব, কখনও দ্বিভুজ, কখনও বা চতুর্ভুজ। বলরাম—রজতধবল। নারায়ণ চতুর্ভুজ, ঐশ্বর্য্যভাব। ইত্যাদি।

চতুর্ভুজ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন—

> "নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
> নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥—শ্রীভা. ১০।১৪।১৪॥

—তুমি কি নারায়ণ নহ? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ; যেহেতু) তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও (এ-স্থলে নার—জীবসমূহ; অয়ন—আশ্রয়। জীবসমূহ আশ্রয় যাঁহার, অন্তর্যামী আত্মারূপে যিনি জীব-সমূহের মধ্যে অবস্থিত, তিনি নারায়ণ) এবং হে অধীশ! তুমি সকল লোকের সাক্ষী হও অর্থাৎ দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্মসকল নিরীক্ষণ কর (নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ—স্বামী। এ-স্থলেও নার—

জীবসমূহ, অয়ন—দর্শন)। আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাঁহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ) নারায়ণও তোমার অঙ্গ (মূর্ত্তিবিশেষ-অংশ); তাহাও সত্য বস্তু, তোমার মায়া নহে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ—প্রসিদ্ধ যে নারায়ণ, তিনিও তোমার অঙ্গ—মূর্ত্তিবিশেষ।" **নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণেরই এক আবির্ভাব-বিশেষ বা অংশ, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।**

ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অংশ-বৈচিত্রীভেদে ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহেরও অনেক পর্য্যায় আছে। লঘুভাগবতামৃতে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে সে-সমস্তের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। প্রধান-প্রধান কয়েক পর্য্যায়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

## ৮৬। লীলাবতার

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র, কল্কী, বুদ্ধ প্রভৃতি হইতেছেন লীলাবতার।

একতম লীলবতার বুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসূতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ ১।৩।২৪॥

—কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগের সম্মোহনের নিমিত্ত কীকটদেশে (গয়াপ্রদেশে—শ্রীধরস্বামী) অঞ্জনসূত (পাঠান্তরে অজিনসূত) বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইবেন।" ইহা হইতে জানা গেল—অসুর-সম্মোহনের জন্যই বুদ্ধদেবের অবতার।

কলিযুগে লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন না; অন্য তিনযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্য ভগবানের একটী নাম—ত্রিযুগ।

"কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।৯৭॥"

## ৮৭। পুরুষাবতার

কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ (অথবা প্রথম পুরুষ বা মহাবিষ্ণু), গর্ভোদশায়ী নারায়ণ (অথবা দ্বিতীয় পুরুষ) এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ (অথবা তৃতীয় পুরুষ) এই তিন স্বরূপকে পুরুষাবতার বলে।

**কারণার্ণবশায়ী পুরুষ** বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে দৃষ্টিদ্বারা মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করেন; তাহাতেই প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়েন এবং সৃষ্টির সূচনা হয়। সহস্রশীর্ষা বলিয়া বেদে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে, তিনিই কারণার্ণবশায়ী; ইঁহার অপর নাম মহাবিষ্ণু। ইনি প্রকৃতির বা সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা।

**গর্ভোদশায়ী পুরুষ** হইতেছেন কারণার্ণবশায়ীরই অংশ। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত উদক-( জল )-মধ্যে ইনি অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে গর্ভোদক ( বা গর্ভোদ )-শায়ী পুরুষ বলে। ইনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী।

**ক্ষীরোদশায়ী** হইতেছেন গর্ভোদশায়ীর অংশ। ইনি এক স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বা দুগ্ধাব্ধিশায়ী বলা হয়। ইনি জগতের পালনকর্ত্তা। আবার, এক স্বরূপে ইনি পরমাত্মারূপে বা জীবান্তর্যামিরূপে প্রতি জীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করেন। ইঁহার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ইত্যাদি॥ কঠোপনিষৎ॥ ২।১।১২॥—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীবের হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত ; ইনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের ঈশ্বর।" গুণাবতার মধ্যেও ইঁহার গণনা করা হয়।

উল্লিখিত পুরুষত্রয়-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে সাত্বত তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃত।১।৩৩॥

—পুরুষনামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ আছেন। তন্মধ্যে এক রূপ হইতেছেন মহত্তত্ত্বের স্রষ্টিকর্ত্তা ( দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া যিনি প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করেন এবং তন্নিমিত্ত বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে যিনি মহতত্ত্বের সৃষ্টি করেন—তিনি। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ )। দ্বিতীয় রূপ হইতেছেন—ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত ( গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ) এবং তৃতীয় রূপ হইতেছেন সর্ব্বভূতস্থ ( সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষ )।

## ক। পুরুষত্রয়ের সহিত মায়ার সম্বন্ধ

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষের প্রত্যেকের সহিতই বহিরঙ্গা মায়ার কিছু সম্বন্ধ আছে। যেহেতু, তাঁহারা মায়িক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত এবং মায়ার সাহায্যেই মায়িক সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু মায়িক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তামাত্র, স্বরূপে তাঁহারা মায়াতীত।

"কারণাব্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥

এ-সভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥
যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়া পার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।২।৪০–৪৪॥”

মায়ার সংস্রবে থাকা সত্ত্বেও যে এই পুরুষত্রয়ের সহিত মায়ার স্পর্শ হয় না, নিম্নোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে তাহার হেতু পাওয়া যায়।

“এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ শ্রীভা. ১।১১।৩৯॥

—(পরম-ভাগবতদিগের) ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি দেহের মধ্যে থাকিয়াও যেমন দেহের সুখ-দুঃখাদি মায়িকগুণের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াতে অবস্থিত থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বা অচিন্ত্য-শক্তি।”

ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতেই মায়ার মধ্যে থাকিয়াও মায়ার সহিত তাঁহার সংযোগ হয় না। পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণমূলে বলা হইয়াছে—বহিরঙ্গা মায়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না।

## ৮৮। গুণাবতার

ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহার-কর্ত্তা শিব এবং জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু (ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ)—এই তিন স্বরূপকে গুণাবতার বলে। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু গুণাবতারও এবং পুরুষাবতারও।

মায়িক রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, তমোগুণের সহায়তায় শিব (বা রুদ্র) জগতের সংহার করেন এবং সত্ত্বগুণের সহায়তায় বিষ্ণু জগতের পালন করেন। এইরূপে এই তিন স্বরূপের সঙ্গেই মায়িক গুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঁহাদিগকে গুণাবতার বলা হয়।

### ক। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা

সাধারণতঃ ভগবান্‌ই ব্রহ্মারূপে জীব-সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কোনও কল্পে যদি কৃতপুণ্য কোনও মহোত্তম জীব পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মাকে বলে **জীবকোটি ব্রহ্মা**। আর ভগবান্‌ই যখন ব্রহ্মারূপে জীবসৃষ্টি করেন, তখন সেই ব্রহ্মাকে বলা হয়, **ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা**। এ-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

“ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥১।৪৮॥

—কোনও মহাকল্পে উপাসনা-প্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন। কোনও মহাকল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।”

ব্রহ্মসংহিতাতেও জীবকোটি ব্রহ্মা সম্বন্ধে প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

"ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৪৯॥

—সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে নিজের কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটিত করে ( প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করাইয়া থাকে ), তদ্রূপ যিনি ব্রহ্মা হইয়া ( জীববিশেষে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মা করিয়া ) ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দ্বিবিধ—বৈরাজ এবং হিরণ্যগর্ভ। বৈরাজব্রহ্মা—স্থূল বা সমষ্টিশরীর; আর হিরণ্যগর্ভ—সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বময়। "হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ। ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥ লঘুভাগবতামৃত।১।৪৬॥" বৈরাজব্রহ্মাকে দেবতাদি দেখিতে পায়েন, দেবতাদিগকে ইনি বরও দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ দেবতাদির অদৃশ্য।

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র, অষ্টবাহু।

## খ। জীবকোটি শিব এবং ঈশ্বরকোটি শিব

জীবকোটি ব্রহ্মার ন্যায় **জীবকোটি শিবও** হইতে পারেন। "ক্বচিজ্জীববিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব ॥ লঘুভাগবতামৃত।১।৫৫॥"

যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান্ সেই জীবেই সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা শিবের কাজ করাইয়া থাকেন। ইনি জীবকোটি শিব। আর যেই কল্পে এইরূপ জীব পাওয়া যায় না, সেই কল্পে ভগবান্ই রুদ্ররূপে ( শিবরূপে ) জগতের সংহার-কার্য্য সমাধা করেন। ইনি ঈশ্বরকোটি শিব।

শিব প্রায়শঃ পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র ( প্রতিমুখে তিনটী নয়নবিশিষ্ট ) এবং দশভুজ। "প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥ লঘুভাগবতামৃত।১।৫৪॥"

বায়ুপুরাণাদি হইতে জানা যায়—পরব্যোমের শিবলোকেও এক শিব আছেন; তাঁহার নাম **সদাশিব**। তিনি মায়াতীত, সর্ব্বকারণভূত এবং ভগবানের অঙ্গভূত।

"সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ংপ্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা ॥

—লঘুভাগবতামৃত ॥১।৬০॥"

কৈলাসেশ্বর গুণময় শিব এই সদাশিবেরই অংশ।

**গ। গুণাবতার বিষ্ণু সকল কল্পেই ঈশ্বরকোটি।** জীবকোটি বিষ্ণুর কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

জীবকোটি শিব এবং জীবকোটি ব্রহ্মা স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিজাংশ নহেন।

ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সংহার ও সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন—আবেশাবতার, স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব।

### ঘ। ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা, ঈশ্বরকোটি শিব এবং বিষ্ণু—এই তিন গুণাবতারেরই মায়িকগুণের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও ব্রহ্মা এবং শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। স্বরূপতঃ তিনই সচ্চিদানন্দ। রজোগুণের সহায়তায় ব্রহ্মা ব্যষ্টিসৃষ্টি করেন ; রজোগুণের বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি আছে। এজন্য গুণময়ভাবে ( অর্থাৎ রজো-গুণের ভিতর দিয়া ) ব্রহ্মার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ বলিয়াই মনে হইবে। শিব তমোগুণের সহায়তায় সংহার-কার্য্য করেন। তমোগুণের আবরণাত্মিকা শক্তি আছে। এজন্য গুণময় ভাবে ( অর্থাৎ তমোগুণের ভিতর দিয়া শিবের প্রতি দৃষ্টি করিলে ) তাঁহার স্বরূপ দৃষ্ট হইবে না। বিষ্ণু সত্ত্বগুণের সহায়তায় জগতের পালন-কার্য্য করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, উদাসীন—বিক্ষেপও জন্মায় না, আবৃতও করে না। গুণময় ভাবে ( অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং উদাসীন সত্ত্বগুণের ভিতর দিয়া ) বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহার স্বরূপ অবিকৃত ভাবেই উপলব্ধ হইবে, যদিও সেই উপলব্ধি বা দর্শনও হইবে স্বচ্ছ সত্ত্বগুণের দ্বারা আবৃত ; স্বচ্ছ সমতল কাচের ভিতর দিয়া বাহিরের বস্তু যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ। গুণাতীতভাবে দর্শন করিলে তিন স্বরূপেরই সচ্চিদানন্দময়ত্বের অনাবৃত উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

## ৮৯। মন্বন্তরাবতার

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

> "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
> সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
> একাত্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।১।৩।৫-৬"

এইরূপ প্রতি মন্বন্তরে ভগবান্ মন্বন্তরাবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। এক এক মনুর রাজত্বকালকে এক এক মন্বন্তর বলে।

ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে একজনের পরে আর একজন করিয়া চৌদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। এই চৌদ্দজন মনুর নাম যথা—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

এই সমস্ত মনুর রাজত্বকালের মন্বন্তরাবতারদের নাম যথাক্রমে এই :—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহদ্ভানু।

ব্রহ্মার প্রতিদিনেই উল্লিখিত চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার অবতীর্ণ হয়েন। এইরূপ ত্রিশ দিনে ব্রহ্মার একমাস এবং বার মাসে এক বৎসর। এইরূপ এক শত বৎসর হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল—অর্থাৎ এইরূপ একশত

বৎসর পর্য্যন্ত সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। তাহার পরে মহাপ্রলয়। ব্রহ্মার প্রতিদিনেই চৌদ্দজন মন্বন্তরাবতার হইলে একশত বৎসরে বহু বহু মন্বন্তরাবতারই হইবেন।

## ৯০। যুগাবতার

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগের প্রতি যুগেই ভগবান্ যুগাবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

যুগাবতারগণের বর্ণ, তাঁহাদের নামেরই অনুরূপ। সত্যযুগের যুগাবতারের নাম এবং **বর্ণশুক্ল**, ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ **রক্ত**, দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ **শ্যাম** এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ **কৃষ্ণ**।

"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥
—লঘুভাগবতামৃত ॥১।২১৫॥"

হরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ ॥ লঘুভাগবতামৃত-টীকাধৃতবচন।" এই কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার অংশবিশেষ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যামবর্ণ।

"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
—শ্রীভা. ১১।৫।২৫-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাধৃতবচন ॥"

এইরূপে দ্বাপরের যুগাবতার সম্বন্ধে দুইটী উক্তি পাওয়া যায়। লঘুভাগবতামৃত বলেন—শ্যাম এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ (শুক পাখীর পালকের বর্ণের মত)। আপাতঃদৃষ্টিতে এ-স্থলে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। শ্যাম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি রামচন্দ্রের বর্ণ—নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম; নবদুর্ব্বাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বসুন্ধরাকে শস্যশামলা বলি; ধান্যাদি শস্যের (ধানগাছের) বর্ণও প্রায় সবুজ—শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিদ্বর্ণ। হরিদ্বর্ণ অর্থ—সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম), শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণই বুঝায়। সুতরাং "শ্যাম" এবং "শুকপত্রাভ" শব্দদ্বয় একার্থকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ" ইত্যাদি ১১।৫।২৫-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—দ্বাপরে সাধারণ-যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" দীপিকাদীপন-টীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণাবতার-বিরহিত দ্বাপরেতু শুকপত্রবর্ণত্বম্। —যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ শুকপত্রের বর্ণের ন্যায়।" ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামৃতের শ্যাম-শব্দের শুকপত্রাভ অর্থ টীকাকারদিগেরও অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না।

কলির যুগাবতার সম্বন্ধে দুইটী উক্তি দৃষ্ট হয়। লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংশের মতে—কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে—শ্যাম। এ-স্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই ; যেহেতু, শ্যাম-শব্দের সুপ্রসিদ্ধ অর্থ ই—কৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়।

সাক্ষাদ্‌ভাবে মন্বন্তরাবতারগণই যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। "উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥১।২১৬॥ —উপাসনাবিশেষার্থ মন্বন্তবারতারই সত্যাদিযুগে যথাক্রমে সেই রূপে ( যুগাবতাররূপে ) অবতীর্ণ হয়েন।" মন্বন্তরাবতারগণ হইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ। তাঁহাদের অংশ বলিয়া যুগাবতারগণও হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ।

যুগাবতারগণ নিজ-নিজ যুগে অবতীর্ণ হইয়া সেই-সেই যুগের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না ; তিনি তখন স্বয়ংভগবানের মধ্যেই অবস্থান করেন। যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণের সময় উপস্থিত হইলেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ—সুতরাং যুগাবতারগণও—অবস্থিত। কোনও যুগাবতারের অবতরণের সময় হইলে স্বয়ংভগবান্ সেই যুগাবতারকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়া অবতারিত করেন। যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ নিজেই অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণের সময় হইলে যুগাবতারকে লোক-নয়নের গোচরীভূত না করিয়া নিজেকেই লোক-লোচনের গোচরীভূত করেন। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় যুগাবতারও তখন—সকল সময়ে যেমন থাকেন, তেমন তখনও—স্বয়ংভগবানের বিগ্রহের মধ্যেই অবস্থান করেন, অবশ্য লোক-নয়নের অগোচরে। ইহাই হইতেছে—স্বয়ংভগবানের অবতরণের যুগে সেই যুগের যুগাবতারের অবতীর্ণ না হওয়ার তাৎপর্য্য।

লীলাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার এবং যুগাবতার, ইঁহারা সকলেই—জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিব ব্যতীত অপর সকলেই—ভগবৎ-স্বরূপ, সুতরাং নিত্য এবং অনাদি। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের কেবল আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র।

আবেশাবতারগণ তত্ত্বতঃ জীবতত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপ নহেন। এজন্য এইস্থানে তাঁহাদের নামাদি উল্লিখিত হইল না।

## ৯১। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রী বর্ত্তমান্। তাঁহার অনন্ত-প্রকাশের বা অনন্ত-রূপে আত্ম-প্রকাশের কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অনন্ত-প্রকাশ হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রী মাত্র। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির অনন্ত-বিকাশ-বৈচিত্রীর মধ্যে এক বৈচিত্রী আছেন—যাঁহাতে সমস্তশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম-বিকাশময় বৈচিত্র্যই হইতেছেন স্বয়ংরূপ বা স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। আর, এক বৈচিত্রী আছেন, যাঁহাতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ। এই দুই বৈচিত্রী যেন দুই সীমায় অবস্থিত ; দুই সীমার মধ্যে আবার অনন্ত বৈচিত্রী। এই মধ্যবর্ত্তী অনন্ত শক্তিবিকাশ-

বৈচিত্রীতে ভগবত্ত্বা-বিকাশেরও অনন্ত বৈচিত্রী বিদ্যমান্। এই সমস্ত ভগবত্ত্বা-বিকাশময় বৈচিত্র্য-সমূহই বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ—যাঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাসুদেব, নারায়ণ, নৃসিংহাদিতে ভগবত্ত্বার বিকাশ আছে বলিয়া তাঁহারাও ভগবান্। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ বা পূর্ণতম ভগবান্; যেহেতু, তাঁহাতে ভগবত্ত্বার পূর্ণতম বিকাশ।

**(ক) ব্রহ্ম।** যে বৈচিত্রীতে চিচ্ছক্তির ন্যূনতম বিকাশ, তাঁহাতে শক্তির ততটুকুমাত্র বিকাশ, যতটুকু বিকাশ তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য। তদরিক্ত বিকাশ নাই; এজন্য তাঁহাতে পরিদৃশ্যমান্ (অর্থাৎ অনুভবযোগ্য) কোনও বিশেষত্ব নাই। এই স্বরূপকে **নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম** বলা হয়। এই স্বরূপও তত্ত্বতঃ নির্ব্বিশেষ নহেন, অব্যক্তশক্তিকমাত্র; যেহেতু, এই স্বরূপেও চিচ্ছক্তি আছে, তবে চিচ্ছক্তির বিকাশ নাই। চিচ্ছক্তি যখন পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি, তখন তাঁহার সকল বৈচিত্রীতেই, সকল স্বরূপেই, চিচ্ছক্তি থাকিবে। যেহেতু, স্বরূপের ধর্ম্ম কোনও অবস্থাতেই স্বরূপকে ত্যাগ করিতে পারে না। তবে কোনও স্বরূপে এই চিচ্ছক্তি ক্রিয়াহীনরূপে অবস্থান করিতে পারে। অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি ক্রিয়াহীনা।

এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতেছেন—আনন্দসত্ত্বামাত্র, চিৎ-সত্ত্বামাত্র। সত্ত্বাতেই সমস্ত শক্তি এবং শক্তি-বিকাশ-বৈচিত্রী অবস্থিত। যাঁহারা পরব্রহ্মের আনন্দ-সত্ত্বামাত্রের বা চিৎ-সত্ত্বামাত্রের ধ্যান করেন, এই সত্ত্বাতে অবস্থিত শক্তি বা শক্তি-বিকাশ-বৈচিত্রী যাঁহাদের ধ্যানের বিষয় নহে, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় কেবল এই সত্ত্বামাত্রের উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই ভাবের সাধকগণ হইতেছেন—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধক।

ব্রহ্ম-শব্দের ব্যাপক অর্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। তথাপি রূঢ়ি-অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে উল্লিখিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকদের ধ্যেয় স্বরূপকেই—বুঝায়।

"ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ শ্রী. চৈ. চ. ২।২৪।৫৭॥

—ব্রহ্ম এবং আত্মা (পরমাত্মা)—এই দুইটী শব্দে যদিও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দে (নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকদের ধ্যেয়) নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে এবং আত্মা-শব্দে (যোগমার্গের সাধকদের ধ্যেয় জীবান্তর্য্যামী) পরমাত্মাকেই বুঝায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ"—ইত্যাদি (১।২।১১)-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদজীবগোস্বামী এই ব্রহ্মসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে॥ —শক্তিবর্গহীন এবং শক্তিবর্গের ধর্ম্মহীন কেবল জ্ঞানসত্ত্বামাত্র বা চিৎ-সত্ত্বা মাত্র যাহা, তাহাই এ-স্থলে ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য।"

সূর্য্য—তেজোঘন সবিশেষ বস্তু; সূর্য্যের কিরণ বা প্রভাও তেজই, কিন্তু নির্ব্বিশেষ তেজঃ। স্বরূপতঃ সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা একই তেজোবস্তু। পার্থক্য এই যে—সূর্য্য সবিশেষ, আর তাহার প্রভা নির্ব্বিশেষ। তদ্রূপ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও চিদ্ঘন সবিশেষ বস্তু; আর, "শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত ব্রহ্ম" হইতেছেন কেবল চিৎ-সত্ত্বামাত্র, "শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত" বলিয়া নির্ব্বিশেষ।

স্বরূপতঃ উভয়েই একই চিদ্‌বস্তু ; পার্থক্য এই যে—পরব্রহ্ম হইতেছেন সবিশেষ চিদ্‌বস্তু ; আর, উক্তরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন নির্ব্বিশেষ চিৎ। এজন্য, সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রভার সহিত পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের তুলনা দিয়া ব্রহ্মসংহিতা এই ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি বা প্রভাস্থানীয় বলিয়াছেন।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ - ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪০॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত বসুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম—প্রভাবশালী যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

উক্ত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের মর্ম্মই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ—

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম, গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি—তোঁহা মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥ ১।২।১০-১১॥"

পরব্রহ্ম সবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন (সর্ব্বব্যাপক) হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন এবং পরিচ্ছিন্নবৎ ক্রিয়াদিও নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু চিৎ-সত্তামাত্র ব্রহ্ম কখনও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন না। উভয় স্বরূপই সর্ব্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন।

পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিই তাঁহার বিশেষণ ; আর শক্তিমান্-পরব্রহ্ম বিশেষ্যস্থানীয়। বিশেষণ এবং বিশেষ্য মিলিয়াই সম্পূর্ণ বস্তু। যে স্থলে বিশেষণের অনুভব নাই, কেবল বিশেষ্যমাত্রেরই অনুভব, সে-স্থলে অনুভবকে সম্যক্ অনুভব বলা যায় না ; তাহা হইবে অসম্যক্ বা আংশিক অনুভব। কিন্তু এই অনুভবও সত্য, ভ্রান্তিমাত্র নহে ; যেহেতু, বিশেষণ-জ্ঞানশূন্য বিশেষ্যও সত্য বস্তু। বহু-শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফলাদি অদৃশ্য হইয়া থাকিলে কেবলমাত্র বৃক্ষের কাণ্ডটী—মূল অঙ্গটী—যদি দৃশ্য হয়, তবে সেই মূল অঙ্গটীও সত্যই হইবে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র হইবে না। দূর হইতে দুগ্ধের শ্বেতত্বমাত্র যিনি দর্শন করেন, অথচ তাহার তরলত্ব, স্বাদুত্বাদি অনুভব করেন না, তাঁহার অনুভূত শ্বেতত্বও মিথ্যা নহে, ভ্রান্তিমাত্র নহে। যেহেতু, দুগ্ধে শ্বেতত্ব আছে। তবে ইহা দুগ্ধের সম্যক্ জ্ঞান নহে।

চিৎ-সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও পরব্রহ্মেরই এক প্রকাশ ; তবে ইহা পরব্রহ্মের অসম্যক্ প্রকাশ, আংশিক প্রকাশ। "যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ। যত্র স্বরূপভূত-নানাবৈচিত্রী-বিশেষবদাকারেণ, সা সম্পূর্ণা, যথা শ্রীভগবদাকারত্বেনেতি লভ্যতে॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ৪৫৮ পৃষ্ঠা॥—যে-স্থলে বিশেষ (বিশেষণ) ব্যতিরেকে কেবল বস্তুর (বিশেষ্যের) স্ফূর্ত্তি হয়, সেস্থলে দৃষ্টি অসম্পূর্ণা ; যেমন ব্রহ্ম-স্বরূপে। আর যেস্থলে স্বরূপভূত নানা-বৈচিত্রীময় আকারে স্ফূর্ত্তি হয়, সেস্থলে দৃষ্টি সম্পূর্ণা ; যেমন শ্রীভগবদাকার-স্বরূপে।"

### খ। পরমাত্মা

আত্মা বা পরমাত্মা শব্দে ব্যাপক অর্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও রূঢ়িবৃত্তিতে আত্মা বা পরমাত্মা শব্দে যোগমার্গের সাধকদের ধ্যেয় জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই বুঝায়।

"ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২৪।৫৯॥"

পূর্ব্বে পুরুষাবতার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই এক স্বরূপে প্রতি জীবের অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন।

**কঠোপনিষদের** মতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ॥২।১।১২॥

**শ্রীমদ্ভাগবত** বলেন—হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা প্রাদেশ-পরিমিত ( তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে বিস্তৃত করিলে উভয়ের অগ্রভাগদ্বয়ের ব্যবধানকে প্রাদেশ বলে ), চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

"কে চিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥—শ্রীভা. ২।২।৮॥"

তিনি যে দিব্য-বসনভূষণে শোভিত, শ্রীভা. ২।২।৯-১২-শ্লোকে তাহাও বলা হইয়াছে।

প্রাদেশ-পরিমিত পরমাত্মার উল্লেখ শ্রুতিতেও আছে। "যস্ত্বেতমেব প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্ত ইতি শ্রুতেঃ॥ শ্রীভা. 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ'-ইত্যাদি ১০।১৩।৫৪-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাধৃত শ্রুতিবচন।"

**মুণ্ডকশ্রুতিতেও** জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার কথা পাওয়া যায়।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥৩।১।১॥

—( দেহরূপ ) একটী বৃক্ষে ( জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ ) দুইটী পক্ষী সখার ন্যায় একত্রে অবস্থান করেন ; তাঁহাদের মধ্যে ( জীবাত্মারূপ ) একটী পক্ষী স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে ; আর ( পরমাত্মারূপ ) অপর পক্ষীটী ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন।"

জীবাত্মা থাকে হৃদয়ে, পরমাত্মাও থাকেন হৃদয়ে ; এজন্যই বলা হইয়াছে—তাঁহারা যেন সখার ন্যায় একসঙ্গে থাকেন।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে দেব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি অনন্তকোটি জীব বিদ্যমান্। তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই পরমাত্মা অবস্থিত। তাহাতে মনে হইতে পারে—পরমাত্মাও সংখ্যায় বহু, অনন্ত। কিন্তু তাহা নহে। পরমাত্মা এক, বহু নহেন। তিনি সর্ব্বব্যাপক ; তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে এক হইয়াও বহু রূপে বহু জীবের হৃদয়ে বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবত একথাই বলিয়াছেন।

"তমিমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥
—শ্রীভা. ১৯।৪২ ॥

—ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জন্মরহিত এই এক শ্রীকৃষ্ণই (পরমাত্মারূপে) স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন। এক্ষণে আমার ভেদমোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম (উপলব্ধি করিতে পারিলাম)।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যই একটী পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১।২।১৩ ॥"

অনন্ত স্ফটিকে একই সূর্য্য যে অনন্তরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অনন্ত রূপ হইতেছে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব—সুতরাং মিথ্যাভূত! কিন্তু একই পরমাত্মা যে অনন্ত স্বরূপে অনন্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, এই অনন্ত স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে, পরন্তু সত্য বস্তু। যেহেতু, পরমাত্মা হইতেছেন বিভু—সর্ব্বব্যাপক। সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্ব অসম্ভব। বিশেষতঃ, উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে—"তিষ্ঠতি", "বসন্তম্", "পরিষস্বজাতে", "অভিচাকশি" ইত্যাদি শব্দ হইতেই বুঝা যায়—পরমাত্মা নিজস্বরূপেই প্রতিজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, প্রতিবিম্বরূপে নহে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রূপ বিভিন্ন জীবদেহস্থিত পরমাত্মাও একই বস্তু।

"বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্‌জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ॥২।১৪।৩২ ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। তিনিই যখন পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে বাস করেন, তখন পরমাত্মাও যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

"আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।২।১২ ॥"
"পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহে কৃষ্ণের এক অংশ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৩৬॥"

গুণাবতার-প্রসঙ্গে এবং পুরুষাবতার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সংস্রব আছে। তিনিই যখন জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন পরমাত্মার সঙ্গেও যে মায়ার সংস্রব আছে, তাহাও জানা যায়। এজন্যই "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১।২।১১)-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অন্তর্য্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি।—অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্বরূপই পরমাত্মা।"

## ৯২। এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রকাশমান্

একই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব পরব্রহ্ম যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেও তাহা জানা যায়।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শ্রীভা. ১।২।১১॥

—যাঁহা অদ্বয়-জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হয়েন।"

পরব্রহ্মই সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। ব্যাপক অর্থে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মকে বুঝায়; কিন্তু রূঢ়ি-অর্থে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের উপাসক-দের ধ্যেয় স্বরূপকে (নির্বিবশেষ) ব্রহ্ম, যোগমার্গের উপাসকদের ধ্যেয় স্বরূপকে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গের উপাসকদের উপাস্য স্বরূপকে ভগবান্ বলা হয়। উল্লিখিত শ্লোকে এই তিনটী শব্দ কি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, না কি রূঢ়ি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য।

ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী হইবে একই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নামান্তর, বা ভিন্ন ভিন্ন নাম। যদি এই তিনটী নাম একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ঐ তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জল, বারি ও সলিল—এই তিনটী শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়। জল-শব্দের বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা—এই তিনটী শব্দের বাচ্যে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং জল, বারি ও সলিল—একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র। কিন্তু বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পের বাচ্য একই অভিন্ন বস্তু নহে। শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ফটিকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে বরফ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাষ্প। বরফ, জল, বাষ্প—এই তিনটী বস্তুর উপাদান বা সামান্য-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও তাহাদের বিশেষ-লক্ষণে পার্থক্য আছে—বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। এইজন্য এই তিনটী শব্দের বাচ্য একই অভিন্ন বস্তু নহে—পরন্তু বরফ, জল ও বাষ্প হইতেছে একই বস্তুর তিনটী অবস্থার বা তিনটী স্বরূপের নাম; বরফ বলিলেও জল বা বাষ্পকে বুঝায় না, বাষ্প বলিলেও বরফকে বুঝায় না।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে—উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দ—কি জল, বারি ও সলিলের ন্যায় একই অভিন্ন বস্তুকেই বুঝায়? না কি বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পের ন্যায় একই অভিন্ন বস্তুর তিনটী অবস্থাকে বা তিনটী স্বরূপকে বুঝায়?

উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ একই অভিন্ন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকে বুঝায় না; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের তিনটী প্রকাশকে বা স্বরূপকেই বুঝায়। তিনি লিখিয়াছেন—"ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি, হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি, সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে। —অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে

ঔপনিষদ্গণ ( উপনিষদুক্ত পরব্রহ্মের বিশেষণহীন বিশেষ্যমাত্রের সহিত সাযুজ্যকামিগণ ) বলেন ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভগণ ( যোগমার্গের উপাসকগণ ) বলেন পরমাত্মা এবং সাত্বতগণ ( ভক্তিমার্গের উপাসকগণ ) বলেন ভগবান্।" স্বামি-পাদের টীকা হইতে জানা গেল—এই শ্লোকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী শব্দ হইতেছে তিনটী বিভিন্ন মার্গাবলম্বী সাধকদের উপাস্য পরব্রহ্মেরই তিনটী স্বরূপের বাচক মাত্র।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তিরই অনুসরণ এবং বিস্তার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও একই তত্ত্বকে কোথাও বা ব্রহ্ম, কোথাও বা পরমাত্মা এবং কোথাও বা ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তারপর এই তিনটী শব্দের বাচ্যবস্তুর বিশেষ লক্ষণের উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। "তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। —শক্তিবর্গব্যতিরিক্ত এবং শক্তিবর্গের ধর্ম্মব্যতিরিক্ত কেবল জ্ঞানকে ( চিৎসত্তামাত্রকে ; তিনি বলিয়াছেন জ্ঞানং চিদেকরূপম্ ) ব্রহ্ম নামে, অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্বরূপকে পরমাত্মা নামে এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট-স্বরূপকে ভগবান্-নামে অভিহিত করা হয়।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রপ্রমাণও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

টীকার উপসংহারে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্র আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিতি আয়াতম্। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্য-শেষতঃ। ভগবচ্ছবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি ( ৬।৫।৭৯ )॥—আনন্দমাত্র হইতেছে বিশেষ্য। সমস্ত শক্তি হইতেছে তাঁহার বিশেষণ-সমূহ। বিশেষণ-বিশিষ্টই ভগবান্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবান্-শব্দের অর্থ কথিত হইয়াছে। যথা—মায়াজনিত হেয়গুণাদি ব্যতীত, মায়াতীত অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ এই সমস্তই ভগবৎ-শব্দবাচ্য। এই উক্তির ধ্বনি এই—শক্তিবর্গরূপ বিশেষণব্যতীত কেবল বিশেষ্যমাত্র—আনন্দসত্তামাত্রই হইতেছেন নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের উপাসকদের ব্রহ্ম। আর, মায়াতীত অশেষ জ্ঞান-শক্তি-বল-আদি বিশেষণসমূহ-বিশিষ্ট আনন্দই হইতেছেন ভগবান্। ব্রহ্ম যেমন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের এক প্রকাশ—অব্যক্ত-শক্তিক বলিয়া আংশিক প্রকাশমাত্র—তদ্রূপ পরমাত্মাও তাঁহারই এক প্রকাশ, যে প্রকাশ ব্রহ্মের ন্যায় অব্যক্ত-শক্তিকও নহেন, ভগবানের ন্যায় পূর্ণতম-প্রকাশময়-সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্টও নহেন।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে ভগবান্-শব্দে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। যে সমস্ত স্বরূপে ভগবত্তার বিকাশ আছে, সে-সমস্ত স্বরূপই ভগবান্। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব পরব্রহ্মও ভগবান্, তবে তিনি পূর্ণতম ভগবান্ বা স্বয়ংভগবান্; যেহেতু, তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার ভগবত্তা অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ।

যাহা হউক, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গেল—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্ম নানারূপে আত্ম-প্রকাশ করেন ; তাঁহার এক প্রকাশ হইতেছেন অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম, আর এক প্রকাশ জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মা এবং অপর প্রকাশ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ। তিনি নিজে স্বয়ংভগবান্।

অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলিতে রূঢ়ি অর্থে যোগমার্গের সাধকদের উপাস্য জীবান্তর্য্যামীকে বুঝাইলেও কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষকেও বুঝায়। কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রকৃতির অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। আর গর্ভোদকশায়ী হইতেছেন ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী বা নিয়ন্তা। এই তিন স্বরূপও যে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই—প্রকাশবিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।", "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি।", "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" —ইত্যাদি শ্লোকও তাহাই বলিয়াছেন।

## ৯৩। পরব্রহ্ম একেই বহু—এবিষয়ে আলোচনার সার মর্ম্ম

পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনার সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—**পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একই বিগ্রহে অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ** করিয়া আছেন। তাঁহার এই অনন্ত প্রকাশের বা অনন্ত আবির্ভাবের প্রত্যেক আবির্ভাবই নিত্য এবং পূর্ণ (অর্থাৎ সর্ববব্যাপক)। এই সমস্ত আবির্ভাবের মধ্যে কেবল অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মই আকারাদি-বিশেষত্বহীন; অপর সমস্ত স্বরূপই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—সুতরাং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান্ হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহান্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহারা তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভুক্তই থাকেন। একথাই লঘুভাগবতামৃত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"স্যুর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতঃ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ॥
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ।
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥

—লঘুভাগবতামৃতম্॥ কৃষ্ণামৃতম্। ৩৬৮-৭২॥

ইহা হইতে জানা যায়—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, বাসুদেবাদি দ্বারকাচতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ,

পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন এবং ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

এই কথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥"

## ৯৪। উপাধিযুক্ত স্বরূপ

ইহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে তিন পুরুষাবতার (অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ) এবং তিন গুণাবতার (অর্থাৎ ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা, ঈশ্বরকোটি শিব এবং বিষ্ণু) বহিরঙ্গা মায়ার সহায়তায় সৃষ্টিব্যাপার এবং সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বলিয়া মায়ার সহিত তাঁহাদের সংশ্রব আছে। এজন্য তাঁহারা মায়িক উপাধিযুক্ত।

কিন্তু মায়িক উপাধিযুক্ত হইলেও স্বরূপে তাঁহারা সচ্চিদানন্দ ; সচ্চিদানন্দ বলিয়া চিদ্‌বিরোধী জড়মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়ার সান্নিধ্যবশতঃই তাঁহাদের মায়িক উপাধি ; তাঁহারা মায়ার এবং মায়িকগুণের নিয়ন্তামাত্র, তাঁহারা কিন্তু মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নহেন। বিশ্বকার্য্য-নির্ব্বাহার্থই তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছাবশতঃ মায়ার সান্নিধ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিগ্রহ কিন্তু মায়িক নহে ; তাঁহাদের স্বরূপগত বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। যেমন আর্দ্রকাষ্ঠের বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্বের সহায়তায় অগ্নি ধূম উৎপাদন করে, কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠ বা কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব অগ্নির স্বরূপভূত নহে, তদ্রূপ।

বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ, নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-সদাশিবাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সহিতই মায়ার কোনও সংশ্রব নাই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারাও মায়িক উপাধিশূন্য।

# নবম অধ্যায়

## ( পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম )

### ৯৫। পরব্রহ্মের ধাম

ধাম অর্থ আবাস বা বাসস্থান। শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের এতাদৃশ ধাম আছে।

**নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ** বলেন—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো **বৈকুণ্ঠ**ভুবনং গমিষ্যতি ॥৪॥—'ওঁ নমো নারায়ণায়'—এই মন্ত্রে যিনি উপাসনা করেন, তিনি **বৈকুণ্ঠ**লোকে গমন করিবেন।"

এস্থলে একটী ভগবদ্ধামের উল্লেখ পাওয়া যায় ; ইহার ন্যম বৈকুণ্ঠলোক।

**কৃষ্ণোপনিষৎ** বলেন—"বনে **বৃন্দাবনে** ক্রীড়ন্ গোপগোপীসুরৈঃ সহ ॥৭॥" এস্থলে গোপ, গোপী ও সুরগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের **বৃন্দাবন**-নামক ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সেই উপনিষৎ আরও বলেন—"**গোকুলং** বনবৈকুণ্ঠম্ ॥ ৯ ॥"

এ-স্থলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের **গোকুল**-নামক ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

**গোপালোত্তর-তাপনী**-শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-গোপালের পুরী ( ধাম ) মথুরার ( মথুরার ) এবং তাহার আবরণরূপ বৃহদ্‌বন-মধুবনাদি দ্বাদশ বনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ **মথুরা** তস্মাদ্‌গোপালপুরী হি ভবতি। বৃহদ্‌বৃহদ্‌বনং মধোর্মধুবনং তালস্তালবনং কাম্যঃ কামবনং বহুলো বহুলবনং কুমুদঃ কুমদবনং খদিরঃ খদিরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনং শ্রীবনং লোহবনং বৃন্দয়া বৃন্দাবনমেতৈরাবৃতা পুরী ভবতি ॥১২॥

**ঋগ্‌বেদে** একটী মন্ত্র আছে এইরূপ ঃ—

> "তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
> অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥১।১৫৪।৬॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১১৭ অনুচ্ছেদে ) এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"ব্যাখ্যাতঞ্চ—ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে", যথা—

"তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বাস্তূনি লীলাস্থানানি গমধ্যে গন্তুং প্রাপ্তুম্ উশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিং বিশিষ্টানি যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গ্যো গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূমবাক্যে ধর্ম্মিপরেণ ভূমশব্দেন মহিষ্টমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। যূথদৃষ্ট্যৈব বরা ভূরিশৃঙ্গা বহুশৃঙ্গ্যঃ বহুশুভলক্ষণা ইতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অত্র ভূমৌ তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্য স্বয়ংভগবতো বৃষ্ণঃ সর্ব্বকামদুঘচরণারবিন্দস্য পরমং প্রপঞ্চাতীতং পদং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি।"

তাৎপর্য্য। "তোমাদের ( রামকৃষ্ণের ) সেই বাস্তু ( লীলাস্থান )-সকল পাইবার জন্য কামনা করিতেছি।" সেই লীলাস্থানসকল কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—সেই স্থানে ভূরিশৃঙ্গী গো-সকল বাস করিতেছে। এ-স্থলে ভূরিশৃঙ্গী শব্দের অর্থ—মহাশৃঙ্গী। যেমন উপনিষদে ভূম-বাক্যে ধর্ম্মিপর যে ভূম-শব্দ, তদ্দ্বারা "মহিষ্ট ( বৃহৎ )"

অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে, "বহুতর" অর্থ প্রকাশ হয় নাই, এ-স্থলেও তদ্রূপ ভূরি-শব্দের "বহুতর" অর্থ হইবে না, "মহিষ্ঠ" অর্থ হইবে। অথবা, "ভূরি"-শব্দের "বহুতর" অর্থ স্বীকার করিয়াও অন্যরূপ অর্থ করা যায়—গো-যূথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া "বহুতর শৃঙ্গী" অর্থ হইতে পারে। যূথে ( দলে ) বহু গো থাকে, তাহাদের সকলের অনেক শৃঙ্গ। সেই গো-সকল কেমন ? —"অয়াস—শুভলক্ষণযুক্ত।" "অত্র"—এই ভূমিতে, সেই লোকবেদপ্রসিদ্ধ শ্রীগোলোক-নামক—"উরুগায়—স্বয়ংভগবান্" যিনি "বৃষ্ণ"—অর্থাৎ যাঁহার চরণকমল সর্ব্বাভিলাষপূরক ( সর্ব্বাভিলাষ-বর্ষণকারী ), তাঁহার "পরম—প্রপঞ্চাতীত"—"পদ—স্থান" বহু প্রকারে প্রকাশমান আছে।

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের **গোলোক**-নামক এক প্রপঞ্চাতীত ( মায়াতীত ) ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১১৭-অনুচ্ছেদে ) আরও লিখিয়াছেন—

"**যজুঃসু মাধ্যন্দিনীয়াস্তু** যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ ( যাতি ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ ইতি বা পাঠঃ ) বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি পঠন্তি। —যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"সেই ধামকে কামনা করি, যাহা বিষ্ণুর পরম ধাম এবং যাহা বহুপ্রকারে প্রকাশমান।"

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"পাদ্মোত্তরখণ্ডে তু যদ্বিয়ং শ্রুতিঃ পরমব্যোম-প্রস্তাব উদাহৃতা তৎ পরমব্যোমগোলোকয়োরেকতাপত্ত্যপেক্ষয়েতি মন্তব্যম্। গোশব্দস্য সাস্নাদিমত্যেব প্রচুরপ্রয়োগেণ ঝটিত্যর্থ-প্রতীতেঃ। শ্রীগোলোকস্য ব্রহ্মসংহিতা-হরিবংশ-মোক্ষধর্ম্মাদিষু প্রসিদ্ধত্বাচ্চ। —যদিও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই শ্রুতিবাক্যটী ( পূর্ব্বোল্লিখিত যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতিবাক্যটী ) পরমব্যোম-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীগোলোকই ইহার লক্ষ্য ; পরমব্যোম এবং গোলোকের ঐক্য-অপেক্ষাতেই পরম-ব্যোম-প্রস্তাবে উহা উদাহৃত হইয়াছে। কারণ, গো-শব্দের সাস্না ( গলকম্বল )-বিশিষ্ট পশুতে প্রচুর প্রয়োগহেতু তাদৃশ প্রণালীতেই সত্বর অর্থ-প্রতীতি জন্মে। আর, ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে গো-সকলের স্থান বলিয়াই শ্রীগোলোকের প্রসিদ্ধি আছে।"

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে শ্রীজীবের উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ। পূর্ব্বোল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রে যে ধামের কথা বলা হইয়াছে, যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতেও সেই ধামের কথাই—যেই ধামে ভূরিশৃঙ্গা গাভীসকল বিরাজিত, সেই ধামের অর্থাৎ গোলোকের কথাই বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে পরম-ব্যোম-প্রসঙ্গে এই যজুর্ব্বেদীয় শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত হওয়াতে মনে করিতে হইবে না যে, পরব্যোমেও "ভূরিশৃঙ্গা গাভী" বর্ত্তমান। পরব্যোমে "ভূরিশৃঙ্গা গাভীসমূহ" নাই। তথাপি যে পরব্যোম-প্রসঙ্গে "ভূরিশৃঙ্গা গাভীবিশিষ্ট ধামবাচক" যজুর্ব্বেদবাক্যটী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—পরব্যোম ও গোলোকের স্বরূপগত ঐক্য-প্রদর্শন। বিশেষ লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়। গরুর বিশেষ লক্ষণ যেমন সাস্না ( গললম্বি কম্বল ), তদ্রূপ শ্রীগোলোকের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—ভূরিশৃঙ্গা গাভী। তাহার প্রমাণ এই যে—ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে গো-সমূহের স্থানরূপেই শ্রীগোলোকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল, **যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিতেও** পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম **শ্রীগোলোকের** উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও** পরব্রহ্মের ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮।২১॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—যিনি অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই (জীবের) পরমাগতি বলা হয়; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া (জীবগণ পুনর্ব্বার সংসারে) প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহাই আমার পরম **ধাম**।"

এই শ্লোকে ধাম-শব্দের অর্থে—শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"তদ্বাসস্থানং পরং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ।" শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—পরমং ধাম পরমং নিয়মনস্থানম্। অচেতনপ্রকৃতিঃ একং নিয়মনস্থানং তৎসংসৃষ্টরূপা জীবপ্রকৃতিঃ দ্বিতীয়ং নিয়মনস্থানম্। অচিৎসংসর্গবিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং মুক্তস্বরূপং পরমং নিত্যং মমস্থানমিত্যর্থঃ।"

শ্লোকস্থ "পরমং ধাম"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—বিষ্ণুর বাসস্থান; শ্রীপাদ রামানুজও তাহাই বলিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন—এই বাসস্থান হইতেছে জড়মায়াসংশ্রবশূন্য, মুক্তস্বরূপ, নিত্য—অপ্রাকৃত চিন্ময়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্যত্রও ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥১৫।৬॥

—যে স্থানে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম; সেই পরম ধামকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রও না, অগ্নিও না (অর্থাৎ তাহা স্বপ্রকাশ)।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্য হইতে সাধারণভাবে ভগবান্ পরব্রহ্মের ধামের কথা জানা যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে বিশেষ বিশেষ ধামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে—গোকুল, গোলোক, মথুরা, বৃন্দাবনাদি দ্বাদশবন। গোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণী-বসুদেবাদির নামের উল্লেখ হইতে দ্বারকা-ধামেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে দ্বারকা-মথুরার বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বৈকুণ্ঠ-শব্দে বিশেষ ধামকেও বুঝায়, আবার সাধারণভাবে ভগবদ্ধামমাত্রকেও বুঝায়; যেহেতু, বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ হইতেছে—মায়াতীত ধাম; কুণ্ঠা—মায়া; মায়া নাই যাহাতে, তাহা বৈকুণ্ঠ।

## ৯৬। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিভিন্ন ধাম

### (ক) কৃষ্ণলোক

পূর্ব্বে যে সকল ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ধাম বা বৈকুণ্ঠ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরার নাম পাওয়া গিয়াছে,

তাহাদের প্রত্যেক ধামেই যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপে বিরাজিত, তাহাও শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। এজন্য এ-সকল ধামকে সমবেত ভাবে কৃষ্ণলোক বলা হয়।

"—কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৩॥"

কৃষ্ণলোকের তিনটী বৈচিত্রী—গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকা। ইহাদের মধ্যে আবার—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৪॥"

গোকুলে বা ব্রজলোকে বা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিরাজিত। দ্বারকায় এবং মথুরায় তিনি তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বাসুদেবাদিরূপে বিরাজিত।

"মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৯-২০॥"

### (খ) পরব্যোম

চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমে বিরাজিত।

"পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥
—শ্রীচৈ. চ. ১।৫।২২-২৬॥"

পুরাণাদিতে পরব্যোম-ধামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥
—লঘুভাগবতামৃতপূর্ব্বখণ্ড ( ৫।২৪৭-৪৮ )-ধৃতপদ্মপুরাণবচন।

—প্রধান ( প্রকৃতি—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানাম্নী নদী। এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের স্বেদজল হইতে প্রবাহিতা এবং শুভা ( ত্রিলোক-পাবনী )। সেই বিরজার পারে ( এক তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অপর তীরে ) পরব্যোম-নামক পরম ধাম। এই পরব্যোম ত্রিপাদ্বিভূতিভূত ( অর্থাৎ চিন্ময় এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ), সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত।”

ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়—

“গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৪৩॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—নিজধাম গোলোক এবং সেই গোলোকের নিম্নে যথাক্রমে হরিধাম, মহেশধাম এবং দেবীধামে যিনি যথাযোগ্যভাবে স্বীয়প্রভাব সকলকে বিস্তার করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।” এ-স্থলে হরিধাম হইতেছে—শ্রীনারায়ণের ধাম পরব্যোম।

উল্লিখিত পদ্মপুরাণ এবং ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ হইতে পরব্যোমের কথা জানা গেল এবং এই পরব্যোম যে শ্রীহরি নারায়ণের ধাম, তাহাও জানা গেল। এবং ইহাও জানা গেল—এই পরব্যোমের স্থিতি হইতেছে গোলোকের তলদেশে, নিম্নে ( এই স্থিতি কেবল মহিমার বিশেষত্বে )।

“—গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।

*　　*　　*

তার তলে পরব্যোম—বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৩৩, ৩৫ ॥”

পূর্ব্বে নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি যে সকল ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের ধামই পরব্যোমে।

“সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।২ ॥”

ভগবৎ-স্বরূপসমূহের ধাম-সকলের সম্মিলিত নামই পরব্যোম। এই **পরব্যোমকে মহাবৈকুণ্ঠও বলা হয়**। শ্রীনারায়ণ হইতেছেন এই পরব্যোমের অধিপতি। এজন্য তাঁহাকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও বলা হয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ প্রকাশ, চতুর্ভুজ।

### গ। **সিদ্ধলোক**।

অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও একটী নির্ব্বিশেষ ধাম আছে। তাহার নাম **সিদ্ধলোক**।

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ( ১।২।১৩৮ )-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।

—মায়ার বাহিরে সিদ্ধলোক অবস্থিত। সেই সিদ্ধলোকে নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং শ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন।"

"বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ॥
সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।২৮-২৯ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাহাঁ পায় লয় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৩২ ॥"

## ঘ। বিরজা ও কারণার্ণব

পূর্ব্বে উদ্ধৃত "প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-শ্লোকে এক বিরজানাম্নী নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। সেই শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই বিরজা নদীর এক তীরে প্রকৃতি ( প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ) এবং অপর তীরে পরব্যোম।

শ্রীমদ্ভাগবতের "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ"-ইত্যাদি ( ৩।২।২১ )-শ্লোকের অন্তর্গত "ত্র্যধীশ"-শব্দের অর্থ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোলোককে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর, পরব্যোমকে তাঁহার মধ্যমাবাস এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডকে বাহ্যাবাস রূপ বলা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে মধ্যমাবাস পরব্যোমের কথা বলিয়া বলা হইয়াছে—

"তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৩৮॥"

অর্থাৎ পরব্যোমের নীচে এবং বিরজার অপর তীরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড।

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্যত্র বলিয়াছেন—

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৪॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৯॥"

ইহা হইতে জানা গেল—বৈকুণ্ঠের ( পরব্যোমের ) বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে, তাহার বাহিরে

কারণার্ণব এবং কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তি বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড। এ-স্থলে যে জ্যোতির্ম্ময় ধামের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধ লোক। পূর্ব্বোদ্ধৃত "বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥ সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। শ্রীচৈ. চ. ১।৫।২৮-২৯॥"—পয়ার হইতেই তাহা জানা যায়।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত "তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।"—পয়ার হইতে জানা যায়—বিরজার বাহিরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার "মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।"—এই পয়ার হইতে জানা যায়—কারণাব্ধির বা কারণার্ণবের বাহিরেই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কারণার্ণবকেই বিরজা নদী বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত পরারসমূহ হইতেও তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়।

"সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগত-কারণ॥
কারণাব্ধিপারে হয় মায়ার নিত্যস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৩০-৩১॥"

## ঙ। সিদ্ধলোক হইতেছে পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশ

এ-স্থলে আর একটী কথা বিবেচ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥১।৫।৪৩॥"—এই পয়ারে বলা হইয়াছে—বৈকুণ্ঠের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধাম সিদ্ধলোক। সিদ্ধলোকের বাহিরে হইতেছে—কারণার্ণব। আবার "কারণাব্ধি পারে হয় মায়ার নিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১॥"—এই পয়ার হইতে জানা যায়—বিরজার বা কারণার্ণবের পরে হইতেছে পরব্যোম। ইহাতে বুঝা যায়—**সিদ্ধলোকও** পরব্যোমেরই অন্তর্গত, **পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশ**; আর **বৈকুণ্ঠ হইতেছে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ**। পরব্যোমের সবিশেষ অংশেই সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ পার্ষদরূপে অবস্থান করেন।

যাহা হউক, এই কারণার্ণবেই পুরুষাবতারের অন্তর্গত প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অবস্থান করেন। এই কারণার্ণবশায়ীর স্বরূপের পরিচয় পাইতে হইলে চতুর্ব্ব্যূহ-সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এজন্য এ-স্থলে চতুর্ব্ব্যূহ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

## চ। চতুর্ব্ব্যূহ

পরব্রহ্ম দ্বারকাতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। এই চারি রূপকে বলা হয় চতুর্ব্ব্যূহ। শ্রীকৃষ্ণ—

"মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৯-২০॥"

দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহ হইতেই অন্যান্য ধামের চতুর্ব্ব্যূহগণ প্রকাশিত। দ্বারকাধিপতি বাসুদেব দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহেরই অন্তর্গত, তিনিই প্রথম ব্যূহ।

পরব্যোমেও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারিটী ব্যূহ আছেন। পরব্যোমের বাসুদেবাদি যথাক্রমে দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহের বাসুদেবাদিরই অংশরূপ প্রকাশ।

"সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে।
দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৩৩-৩৪॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের "তাসামাবিরভূৎ শৌরী"—ইত্যাদি ১০।৩২।২-শ্লোকের টীকায় "সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নানাচতুর্ব্ব্যূহস্থাঃ প্রদ্যুম্নাস্তেষাং মন্মথঃ।" ইহা হইতে জানা যায়—নানাধামেই চতুর্ব্ব্যূহ আছেন। এই সমস্ত চতুর্ব্ব্যূহের মূল হইতেছেন দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহ। এই দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"আদিচতুর্ব্ব্যূহ—ইঁহার কেহো নাহি সম। অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্যকারণ॥২।২০।১৫৮॥"

দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ হইতেছেন ব্রজের শ্রীবলরামের অংশরূপ-প্রকাশ। পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণের অংশরূপ প্রকাশ। আর কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু হইতেছেন পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণের অংশ।

এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণুই সৃষ্টির অব্যবহিত মূলকারণ। তিনিই দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া মায়ার সাম্যাবস্থাকে বিক্ষুব্ধ করেন; তাহার ফলেই সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং কারণার্ণবশায়ীকেই মহৎ-স্রষ্টা বলা যায়।

"সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥
মহৎ-স্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৭-৪৮॥
সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৩০॥"

উদ্ধৃত প্রথম পয়ারে "সেই সঙ্কর্ষণ" হইতেছেন—পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ; তাঁহারই অংশ হইলেন কারণার্ণবশায়ী।

এইরূপে দেখা গেল—কারণার্ণব হইল কারণার্ণশায়ী পুরুষের ধাম।

### ছ। বিভিন্ন ধামাদির সংস্থান

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ভগবদ্ধাম-সমূহের সংস্থান-সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই—

সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক (গোলোক, দ্বারকা ও মথুরা); তাহার নীচে পরব্যোম (প্রথমে পরব্যোমের সবিশেষ অংশ মহাবৈকুণ্ঠ; এই বৈকুণ্ঠের বাহিরে হইতেছে পরব্যোমের নির্ব্বিশেষ অংশ সিদ্ধলোক)। পর-ব্যোমের (সিদ্ধলোকেরও) বাহিরে চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব বা বিরজা। তাহার বাহিরে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। কেবল মহিমার অভিব্যক্তির দৃষ্টিতেই এইরূপ উপর-নীচ বা ভিতর-বাহির বলা হইয়াছে।

## ৯৭। ভগবদ্ধামের স্বরূপ

### ক। ভগবদ্ধাম চিন্ময় ও বিভু

কোনও বস্তু হইবে হয় মায়িক, আর না হয় মায়াতীত। যাহা মায়াতীত, তাহা হইবে চিৎস্বরূপ, চিন্ময়, তাহাতে মায়ার কোনও স্পর্শ থাকিবে না। আর যাহা মায়িক, চিৎশক্তির সহায়তায় জড়-মায়া হইতে তাহার উদ্ভব; তাহা হইবে চিৎ এবং অচিৎ (জড়)—এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে চিদচিৎ। জড়-মায়ার স্বতঃপরিণামশীলতা নাই; সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা তাহাতে যে চিৎ-শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই চিৎ-শক্তিই জড়-মায়াকে বিশ্বস্থিত বিবিধ বস্তুরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করে এবং বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে বর্ত্তমান থাকে। তাই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ মায়িক বস্তু হইতেছে চিদচিৎ-মিশ্রিত। চিদচিৎ-মিশ্রিত হইলেও মায়িক বস্তুর উৎপত্তি আছে এবং বিনাশও আছে; সুতরাং তাহা অনিত্য—জড়-মায়া মিশ্রিত বলিয়াই অনিত্য। এইরূপে, মায়িক বস্তু যেমন কালে সীমাবদ্ধ, তেমনি আবার দেশেও সীমাবদ্ধ; তাহা পরিচ্ছিন্ন, বিভু নহে। ইহাও জড়েরই ধর্ম্ম।

চিদ্‌বস্তু কিন্তু নিত্য; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। একমাত্র ব্রহ্ম এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিই চিৎ। ব্রহ্ম যেমন নিত্য বস্তু, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও তেমনই নিত্য বস্তু। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বব্যাপক বিভু বস্তু, তাঁহার স্বরূপশক্তিও সর্ব্বব্যাপক বিভু বস্তু। স্বরূপশক্তি সর্ব্বব্যাপিকা না হইলে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম বস্তুর সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্ম-স্বরূপের সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়াই তাহার নাম স্বরূপশক্তি। সুতরাং চিদ্‌বস্তু যেমন নিত্য, তেমনি স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপক—বিভুও হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ভগবদ্ধামসমূহ কি মায়িক বস্তু, না কি চিন্ময় বস্তু। যদি মায়িক হয়, তাহা হইলে ধামসমূহ হইবে—অনিত্য এবং পরিচ্ছিন্ন। আর যদি চিন্ময় হয়, তাহা হইলে হইবে নিত্য এবং বিভু বা অপরিচ্ছিন্ন।

### খ। যুক্তি

যুক্তির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়ঃ—

প্রথমতঃ, ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যেমন নিত্য, তাঁহাদের আবাসস্থানরূপ ধামসমূহও হইবে নিত্যঃ নিত্য বলিয়া ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না, হইবে চিন্ময়।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে জানা গিয়াছে, ভগবৎ-স্বরূপসমূহের প্রত্যেকেই পূর্ণ—অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাঁহার ধামও হইবে অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাহা মায়িক হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, ভগবৎ-স্বরূপ এবং তাঁহাদের ধাম নিত্য বলিয়া মায়িক-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা বর্ত্তমান। সুতরাং ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না ; যেহেতু, মায়িক-সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, পূর্ব্ব আলোচনায় জানা গিয়াছে—কারণার্ণবের এক দিকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, অপর দিকে ভগবদ্ধাম। ভগবদ্ধামে মায়ার গতি নাই, এমন কি চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণবকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদ্ধামে যখন মায়ার গতিই নাই, তখন ভগবদ্ধাম মায়ার বিভূতি হইতে পারে না।

এই সমস্ত যুক্তি হইতে বুঝা যায়—ভগবদ্ধামসমূহ মায়িক হইতে পারে না। তাহারা চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া নিত্য এবং বিভু। কিন্তু এ-সমস্ত হইল যুক্তির কথা। শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কেবল যুক্তি হইতে লব্ধ সিদ্ধান্ত আদরণীয় হইতে পারে না। এ-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি কি বলেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচনীয়।

### গ। শ্রুতি-প্রমাণ

**কৃষ্ণোপনিষৎ** বলেন—"গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্ ॥ ৯ ॥—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুল হইতেছে—বনবৈকুণ্ঠ।" বৈকুণ্ঠ-শব্দে গোকুলের মায়াতীতত্ব—সুতরাং চিন্ময়ত্ব—সূচিত হইতেছে।

**গোপালোত্তরতাপনী**-শ্রুতি বলেন—"সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী ॥ ১১ ॥—পরব্রহ্ম গোপালের পুরী (ধাম) হইতেছে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম।" ইহাদ্বারা ধামের চিন্ময়ত্ব এবং বিভুত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

**নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে** দেখা যায়—

"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি ॥ তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্ ॥ তস্মাত্তড়িতাভমাত্রম্ ॥ ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ॥ ইত্যাদি ॥—যিনি 'ওঁ নমো নারায়ণায়'-এই মন্ত্রের উপাসক, তিনি বৈকুণ্ঠভুবনে গমন করিবেন। এই বৈকুণ্ঠ পদ্মাকার এবং বিজ্ঞানঘন ; সুতরাং বিদ্যুতাভ (জ্যোতির্ম্ময়)। দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্যদেব, মধুসূদন ব্রহ্মণ্যদেব। ইত্যাদি।"

এই শ্রুতিবাক্যে বৈকুণ্ঠকে "বিজ্ঞানঘন" "তড়িতাভমাত্র" বলায় ইহা যে ব্রহ্মস্বরূপ (আনন্দং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম), চিন্ময়, তাহাই খ্যাপিত হইল। দেবকীপুত্র হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম। তাঁহার নামের উল্লেখ থাকায়, এই শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত 'বৈকুণ্ঠভুবন" যে কৃষ্ণোপনিষৎ-প্রোক্ত "গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্", তাহাই বুঝা যাইতেছে।

**ছান্দোগ্য-শ্রুতি** হইতে জানা যায়, নারদ সনৎকুমারকে ভূমা (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ৭।২৪।১ ॥—(নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন) হে ভগবন্! সেই ভূমাপুরুষ পরব্রহ্ম কোথায় অবস্থিত আছেন? (উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—তিনি) স্বীয় মহিমায় (স্বীয় বিভূতিতে বা ঐশ্বর্য্যে তিনি অবস্থিত)। অথবা, স্বীয় মহিমাতে নহে (স্বীয় মহিমায় তিনি অবস্থিত—একথা বলিলে বুঝা যায়,—তিনি এক বস্তু, তাঁহার মহিমা হইতেছে আর একটী বস্তু ; মহিমা যেন তাঁহা হইতে পৃথক্ একটী বস্তু। কিন্তু তাঁহার মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন ; এজন্যই পুনরায় বলা হইয়াছে—তিনি স্বীয় মহিমাতে অবস্থিত নহেন। তাৎপর্য্য—তিনি তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহার মহিমা বা ঐশ্বর্য্য তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়াই একথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থই যে

অভিপ্রেত, ছান্দোগ্যের পরবর্ত্তী বাক্যেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। পরবর্ত্তী ৭।২৪।২-বাক্যে গো-অশ্বাদির দৃষ্টান্ত দিয়া শেষকালে বলা হইয়াছে—অন্যোহন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি—এক বস্তু অপর এক বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত—অবস্থিত—থাকিতে পারে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু যখন কিছু নাই, তখন তাত্ত্বিক-দৃষ্টিতে একথা বলা যায় না যে, ব্রহ্ম অন্য বস্তুতে অবস্থিত। তাৎপর্য্য এই যে—যে মহিমায় ব্রহ্ম অবস্থিত, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন )।

উল্লিখিত ছান্দোগ্যবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম তাঁহার মহিমায় বা বিভূতিতেই অবস্থিত এবং তাঁহার এই মহিমা তাঁহারই স্বরূপভূত, তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং অভিন্ন বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—তাঁহার ধামও—চিন্ময় এবং সর্ব্বব্যাপক।

ঘ। **ঋগ্বেদ** হইতে "তাং বাং বাস্তূন্যশ্মসি"—ইত্যাদি যে ( ১।১৫৪।৬ ) বাক্যটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণধামকে "পরমম্" বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "পরমম্"—শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রপঞ্চাতীতম্—মায়াতীত।" ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণধামের মায়াতীতত্ব, চিন্ময়ত্ব, খ্যাপিত হইয়াছে।

**যজুর্ব্বেদীয়** মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতি হইতে "যা তে ধামন্যুশ্মসি" ইত্যাদি যে বাক্যটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও পরব্রহ্মের ধামকে "পরমং পদম্" বলা হইয়াছে। ইহাতেও ধামের মায়াতীতত্ব—চিন্ময়ত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার** ৮।২১-শ্লোকে "তদ্ধাম পরমং মম"-বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অচিৎসংসর্গ-বিযুক্তং স্বরূপেণাবস্থিতং মুক্তস্বরূপং পরমং নিত্যং মম স্থানমিত্যর্থঃ—অচিৎ ( মায়া )-সংসর্গ-বিযুক্ত, স্বরূপে অবস্থিত, মুক্তস্বরূপ আমার নিত্য স্থান।" শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মমৈব ধাম স্বরূপম্—( শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ) আমারই ধাম বা স্বরূপ। ( তাঁহার ধাম তাঁহার স্বরূপভূত—সুতরাং চিন্ময় এবং সর্ব্বব্যাপক )॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন "পরং ধাম ব্রহ্মৈব মদ্ধাম মত্তেজোরূপম্—আমার ধাম ব্রহ্মেরই ন্যায় আমার তেজোরূপ—( সুতরাং চিন্ময় )।"

এইরূপে গীতাবাক্য হইতেও জানা যায়—ভগবানের ধাম চিন্ময় এবং বিভু।

### চ। পুরাণ-প্রমাণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রমাণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—শ্রীকৃষ্ণের ধাম—

"সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ শ্রীচৈ. চ. ॥১।৫।১৫॥"

শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড বলিয়াছেন—

"গুণাতীতং মহদ্ধাম পূর্ণপ্রেমস্বরূপকম্।
যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রু-বর্ষিতম্ ॥৩৮।৭১॥"

—এই মহদ্ধাম ( বৃন্দাবন ) ত্রিগুণাতীত, পূর্ণপ্রেমস্বরূপ। এই ধামে বৃক্ষাদির গাত্রেও পুলকের উদ্গম হয় এবং বৃক্ষাদিও প্রেমানন্দভরে অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে।"

ইহাদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের চিন্ময়ত্বই সূচিত হইতেছে। ইহা ত্রিগুণাতীত।

ইতঃপূর্ব্বে পরব্যোম-সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ—

"প্রধান-পরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥"

এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—পরব্যোম হইতেছে ত্রিপাদ্ভূত ( ত্রিপাদৈশ্বর্য্যাত্মক ), সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত ( বিভু, সর্ব্বব্যাপক )। ত্রিপাদ্ভূত-শব্দদ্বারা পরব্যোমের চিন্ময়ত্ব এবং ষড়ৈশ্বর্য্যাত্মকত্ব সূচিত হইতেছে।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবদ্ধামসমূহ হইতেছে মায়াতীত, চিন্ময়, বিভু (সর্ব্বব্যাপক)।

ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"প্রকৃতির পার—পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঁই বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম;
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম॥ শ্রীশ্রীচৈ. চ. ১।৫।১১-১৫॥"
"সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব নাহিক গণনে॥" শ্রীচ. চ. ২।২১।২॥"
"সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়। "শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৪॥"
"গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম—'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য' নাম।
মায়িক বিভূতি—'একপাদ' অভিধান॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৪০-৪১॥"

## ৯৮। ধামসমূহ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান

ভগবৎ-স্বরূপসমূহ স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—হইয়াও যেমন অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে

পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, তদ্রূপ ভগবদ্ধামসমূহও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—হইয়াও অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান। এজন্যই একই পরব্যোমের মধ্যে তাহাঁদের যুগপৎ অবস্থিতি সম্ভব।

## ৯৯। ধামসমূহ এক গোলোকেরই বিভিন্ন প্রকাশ

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যেমন একই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, তদ্রূপ ভগবৎ-স্বরূপসমূহের ধামসমূহও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম—গোলোকেরই ( বা ব্রজের বা বৃন্দাবনেরই ) বিভিন্ন প্রকাশ। পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্‌বেদ-মন্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়।

"তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ ১।১৫৪।৬ ॥"

এই ঋক্-মন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র ভূমৌ তল্লোকবেদপ্রসিদ্ধং শ্রীগোলোকাখ্যং উরুগায়স্য স্বয়ংভগবতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বকামদুঘচরণারবিন্দস্য পরমং প্রপঞ্চাতীতং পদং স্থানং **ভূরি বহুধা** অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি—সেই ভূমিতে, সেই লোকবেদপ্রসিদ্ধ **শ্রীগোলোক** নামক—সর্ব্বাভিলাষ-পরিপূরক স্বয়ংভগবানের—প্রপঞ্চাতীত স্থান ( ধাম ) **বহুপ্রকারে প্রকাশমান**।" একই গোলোক বহুপ্রকারে—বহুধামরূপে—প্রকাশমান।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "যা তে ধামন্যুশ্মসীত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভাতিভূরীতি"-ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনীয়-শ্রুতিবাক্যও একই গোলোকধামের বহুরূপে আত্মপ্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন ( একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি ॥ শ্রুতিঃ ), এবং এই কারণে এই সকল ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন তাঁহার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের ধাম গোলোক বা বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া এই সকল বৈকুণ্ঠাদি ধামকেও বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। এজন্যই পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ড বলিয়াছেন—

"নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতম্ ॥
পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥৩৮।৮-৯॥

—পার্ব্বতীর নিকটে মহাদেব বলিতেছেন—বৃন্দাবন নিত্য, ব্রহ্মাণ্ডের উপরেও অবস্থিত ( ইহাদ্বারা বৃন্দাবনের সর্ব্বব্যাপকত্ব ঘোষিত হইয়াছে )। ইহা পূর্ণব্রহ্মসুখৈশ্বর্য্যময়, নিত্য, আনন্দস্বরূপ এবং অব্যয়। বৈকুণ্ঠাদি হইতেছে তাহার অংশাংশ ; বৃন্দাবন হইতেছে স্বয়ং ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংভগবান্, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণ যেমন তাঁহার অংশাংশ ; তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবন হইতেছে স্বয়ংধাম, বৈকুণ্ঠাদি অন্যান্য ধাম হইতেছে বৃন্দাবনের অংশাংশ )।"

ভগবান্ যেমন কোনও ধামে পূর্ণরূপে, কোনও ধামে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ তাঁহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে, কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত। "তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতম্। তচ্চ যথা

শ্রীভগবানেব ক্বচিৎ পূর্ণত্বেন ক্বচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে, তথৈব ইতি বহবস্তস্যাপি ভেদাঃ ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ।৭৬॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায়—যে ভগবৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তদনুরূপই আবির্ভাব। দ্বারকাবিহারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ, দ্বারকাও বৃন্দাবনের প্রকাশরূপ; পর-ব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও বৃন্দাবনের বিলাসরূপ; ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্রকাশিকা শক্তি যোগমায়া যে স্থানে তাঁহাকে যে ভাবে প্রকাশ করেন, তাঁহার ধাম বৃন্দাবনকেও তদনুরূপ বা তদনুকূলভাবেই সে স্থানে প্রকাশ করেন। সুতরাং কোনও ভগবৎ-স্বরূপের ধাম সেই ভগবৎ-স্বরূপের অনুরূপ-মাহাত্ম্যময়ই হইবে। ইহাও বলা যায়—ধামের মহিমাই ভগবৎ-স্বরূপের মহিমা-প্রকাশক। প্রকট-লীলায় স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত বৃন্দাবন হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত মথুরায় এবং দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তথাপি মথুরা-দ্বারকায় তাঁহার পরব্রহ্মের ভাব ছিল না, ছিল বাসুদেবের ভাব। [illegible]রূপভেদ; তদ্রূপ ভাবভেদে ধামভেদও। স্বরূপের ভাবের সহিত তাঁহার ধামের ভাবের সামঞ্জস্য অপরিহার্য্য।

## ১০০। ব্রহ্মাণ্ডে ভগবদ্ধামের প্রকাশ

সকল সময়েই ভগবান্ তাঁহার ধামে অবস্থান করেন। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীগোলোক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৬॥"
"গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩৩০॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্ভেও বলিয়াছেন—

"এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তৎপদস্য আবির্ভাবঃ শ্রূয়তে ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ। ৩৮॥—এই প্রকার, যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়।"

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও শ্রীজীব বলিয়াছেন—'শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছ্রীবিগ্রহবৎ উভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেনাম্নাতত্বাল্লাঘবাচ্চ একবিধত্বমেব মন্তব্যম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬॥—শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু (প্রকটে ও অপ্রকটে—প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রপঞ্চগত অপ্রকট প্রকাশে—এই) উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয় স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক; তাই একই ধাম উভয় স্থানে, ইহা মনে করিতে হয়।"

ভগবদ্ধাম "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" বলিয়া সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বিদ্যমান; তবে তাহা—তাঁহার সর্ব্বব্যাপক বিগ্রহের ন্যায়—লোকনয়নের গোচরীভূত নহে। তাঁহারই ইচ্ছায় যখন তাঁহার ধাম লোকনয়নের গোচরীভূত

হয়, তখনই বলা হয়,—ধাম ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং প্রকট ধাম এবং অপ্রকট ধাম—একই, পৃথক্ নহে।

## ১০১। ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তিরই বৈচিত্রী

মনে করা যাউক, কোনও একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট বহু মৃৎপিণ্ড আছে। মৃত্তিকাই তাহাদের সকলের মূল কারণ। এখন, যে কোনও একটী মৃৎপিণ্ডের উপাদান যদি জানা যায়, তাহা হইলে সকল মৃৎপিণ্ডেরই উপাদান জ্ঞাত হইয়া যায় এবং তাহাদের মূল যে মৃত্তিকা, তাহার উপাদানও জ্ঞাত হইয়া যায়। "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৬।১।৪॥" তদ্রূপ একই গোলোকের ( বা বৃন্দাবনের ) বিভিন্ন প্রকাশরূপ বিভিন্ন ভগবদ্ধামের মধ্যে যে কোনও একটী ধামের স্বরূপলক্ষণ বা উপাদান জানিতে পারিলেই সমস্ত ভগবদ্ধামের এবং গোলোকেরও স্বরূপলক্ষণ বা উপ[illegible]হওয়া যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বচন হইতে জানা গিয়াছে—পরব্যোম হইতেছে—ত্রিপাদ্‌ভূতম্—পরব্রহ্মের ত্রিপাদৈশ্বর্য্যাত্মক। ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য হইতেছে পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তিরই বিকাশ। "ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪৭॥" সুতরাং পরব্যোমের—সুতরাং সমস্ত ভগবদ্ধামের এবং তাহাদের অংশী বা মূল গোলোকেরও—স্বরূপ-লক্ষণ বা উপাদান হইতেছে পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় গোপালোত্তরতাপনীশ্রুতিও বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম গোপালপুরী ॥ ১১॥—পরব্রহ্ম গোপালের পুরী ( ধাম-গোলোক ) সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ( ব্রহ্মেরই শক্তি )।"

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি ॥ ৭।২৪।১॥"—পরব্রহ্ম স্বীয় মহিমাতেই অবস্থান করেন। তাঁহার মহিমা হইতেছে তাঁহার ঐশ্বর্য্য—তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্মের ধাম তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—"বসুদেবং হরেঃ স্থানম্ ॥ ৯।২৪।৩০॥—বসুদেব হইতেছে হরির স্থান"। বসুদেব-শব্দে বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে বুঝায়। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্ ॥ শ্রীভা. ৪।৩।২৩॥" বিশুদ্ধসত্ত্ব—সুতরাং বসুদেবও—হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও জানা গেল—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভগবানের ধাম। বস্তুতঃ, সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে—আধার-শক্তি ( ১।১।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এই ঘনীভূত-আধারশক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভগবানের ধাম ( আধার )। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও বলিয়াছেন—"তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিমবগম্যতে ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪॥—তাঁহার ( পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ) ধামসমূহ তাঁহার নিত্যলীলার স্থান বলিয়াই শ্রুত হয়। সুতরাং ধামসমূহ হইতেছে তাঁহার আধারশক্তি-লক্ষণাত্মিকা স্বরূপবিভূতি।"

একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ১।৪।৫৬॥"

এইরূপে জানা গেল—ভগবদ্ধামসমূহ হইতেছে ভগবানের সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির ( অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরই ) বৃত্তিবিশেষ।

ভগবদ্ধামসমূহ স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া নিত্য; তাহাদের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। ধামসমূহ অনাদিসিদ্ধ বলিয়াই নিত্য।

"নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥—পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড॥ ৪২।২৬॥

—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার মথুরা নিত্য, বন নিত্য, বৃন্দাবন নিত্য, যমুনা নিত্য। গোপকন্যা এবং গোপবালকগণও নিত্য।"

বৃন্দাবনের নিত্যত্বে সমস্ত ভগবদ্ধামের নিত্যত্বই কীর্ত্তিত হইতেছে; যেহেতু, বিভিন্ন ভগবদ্ধাম বৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ।

ভগবদ্ধামে যখন মায়ার গতিই নাই, তখন ধামসমূহ যে মায়িক হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়; আর, মায়িক না হইলে ধামসমূহ চিন্ময়ই হইবে।

## ১০২। ভগবদ্ধামের সবিশেষত্বের বৈচিত্রী

ভগবৎ-স্বরূপসমূহ যখন সবিশেষ, তাঁহাদের ধামসমূহও যে সবিশেষই হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সবিশেষত্বের অনেক রকম বৈচিত্রী আছে।

আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত বস্তু আছে, ভগবদ্ধামেও তৎসমস্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু ভগবদ্ধামের দ্রব্যাদি অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দময়। যেহেতু, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ভগবদ্ধাম চিন্ময়, মায়াতীত, চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবদ্ধামে মায়াও নাই, মায়ার গুণত্রয়ও নাই।

বৈকুণ্ঠ-বর্ণন-প্রসঙ্গে **শ্রীমদ্ভাগবত** বলিয়াছেন—

"প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥—শ্রীভা. ২।৯।১০॥

—যে স্থানে ( যে বৈকুণ্ঠে মায়িক ) রজোগুণ এবং তমোগুণ নাই; এই দুই গুণের মিশ্রণরূপ সত্ত্বগুণও নাই; যে স্থানে কালবিক্রমও নাই ( কালকৃত বিকার বা বিনাশাদি নাই )। এমন কি, মায়াও যে স্থানে নাই, অন্যের ( মায়াজনিত শোক-মোহাদির ) কথা আর কি বলা যাইবে? যে-স্থানে সুরাসুরার্চ্চিত ভগবৎ-পার্ষদগণ বিরাজিত।"

বৈকুণ্ঠে কি কি বস্তু আছে, **শ্রীমদ্ভাগবতের** বৈকুণ্ঠ-বর্ণন হইতে তাহার দিগ্দর্শন পাওয়া যায়।

"যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তু-শ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥

পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক্
দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥৩।১৫।১৬-১৯॥

—যেই ধামে ( বৈকুণ্ঠে ) নৈঃশ্রেয়স-নামক একটী বন আছে ; সেই বনের বৃক্ষসকল বাসনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে ; সেই বনটী সকল সময়ে সকল ঋতুর শোভাসম্পন্ন—যেন মূর্ত্তিমান্ কৈবল্য। সেই বৈকুণ্ঠে সস্ত্রীক-বৈমানিকগণ ভগবানের জগন্মল-বিশোধক-চরিত-সকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (ভগবানের চরিত-কীর্ত্তনে তাঁহাদের এতাদৃশ অনুরাগ যে ) উপবনস্থ সরোবরের জলমধ্যে ( তীরে ) বিকসিত মকরন্দযুক্ত মাধবীফুলের যে সুগন্ধে বুদ্ধিভ্রংশ জন্মে, সেই সুগন্ধবহনকারী পবনকেও তাঁহারা দূরে নিক্ষিপ্ত করেন ( সুগন্ধবহ পবন তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, ভগবচ্চরিত-কীর্ত্তন হইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না )। যে বৈকুণ্ঠে ভৃঙ্গসমূহ গুন্ গুন্ রব করিতে আরম্ভ করিলে, সেই গুন্ গুন্ রবকে হরিকথা মনে করিয়া ( তাহা শুনিবার অভিপ্রায়ে ) তত্রত্য পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক্, দাত্যূহ ( ডাহুক ), হংস, শুক, তিত্তিরী, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের কোলাহলকে বিরমিত করে ( নিঃশব্দ হয় )। যেই বৈকুণ্ঠে মন্দার, কুন্দ, কুরব ( তিলকপুষ্প ), চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পসকল সৌরভযুক্ত হইয়াও—ভগবান্ তুলসীর ( তুলসীপত্রের মাল্যাদি ) আভরণ ধারণ করেন বলিয়া, ভগবান্ তুলসীর সুগন্ধকেই সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন মনে করিয়া—তুলসীর তপস্যাকে বহু-মনন করিয়া থাকে।”

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—বৈকুণ্ঠে বন আছে, বৃক্ষ আছে, বিমান আছে, বৈমানিক আছে, সরোবর আছে, পবন আছে, ভৃঙ্গ আছে, পারাবত-কোকিল-সারস-চক্রবাক্-দাত্যূহ-হংস-শুক-তিত্তিরি-ময়ূরাদি পক্ষী আছে, মাধবী-মন্দার-কুন্দ-কুরব-চম্পক-অর্ণ-পুন্নাগ-নাগকেশর-বকুল-পদ্ম-পারিজাতাদি পুষ্প আছে, তুলসী আছে। এই সমস্তই অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ।

"বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দং গুণাতীতং পদং গতাঃ ॥
তত্র তে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্।
—বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ॥১।৩।৩২-৩৩॥"

**বৃহদ্ভাগবতামৃতের** ২।৪।৫০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, "তেষাং রূপং তত্ত্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ব্রহ্মঘনত্বাৎ। —**ব্রহ্মঘন** বলিয়া তাহাদের তত্ত্ব এবং রূপ কোনও লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।"

শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১০৬-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী **স্বায়ম্ভুবাগম** হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"নিত্যনূতনপুষ্পাদিরঞ্জিতং সুখসঙ্কুলম্।
স্বাত্মানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্ ॥
নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্।
নানারত্নলতাশোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতম্ ॥
চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি ॥
কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ।
বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষবিহঙ্গমৈঃ ॥
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্ ॥

—ধীমান্ সাধক বিলাসৈক-নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবনের সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন। সেই বৃন্দাবন নিত্য নূতন-পুষ্পাদিরঞ্জিত, সুখসমাকুল, স্বরূপানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিক সুখের অভিব্যক্তি-স্বরূপ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চকে পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গমাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্নলতা-শোভিত, মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, জ্যোৎস্নারাশিতে পরিব্যাপ্ত, সকল-ঋতুজাত ফুলফলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে সর্ব্বদিক্ পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দীজল-সংসর্গি-বায়ু মৃদুলহিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে।"

ইহা হইতেও জানা গেল—শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দী ( যমুনা )-নামা নদী আছে, সকল ঋতুর উপযোগী ফল-ফুল আছে, নানাবিধ বৃক্ষ-লতা আছে, ভ্রমর আছে, জ্যোৎস্না আছে, বায়ু আছে, সুকণ্ঠ পক্ষী আছে, নানাবিধ চিন্তামণিতুল্য নানাবিধ রত্ন আছে ; ইত্যাদি।

**ব্রহ্মসংহিতা** হইতে জানা যায়----

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।২৯॥

—শ্রীবৃন্দাবনে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণিসমূহদ্বারা বিরচিত গৃহসকলে যিনি শত সহস্র লক্ষ্মী ( গোপসুন্দরীগণ ) দ্বারা সাদরে সেবিত হইতেছেন এবং যিনি সুরভিগণকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ( ব্রহ্মা ) ভজন করি।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীবৃন্দাবনে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ আছে, চিন্তামণি আছে, চিন্তামণি-নির্ম্মিত গৃহ আছে, গোপী আছেন এবং সুরভি ( গাভী ) আছেন। “চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷৫৷১৭॥”

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭২-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত **নারদপঞ্চরাত্রের** শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদ-বচন হইতে জানা যায়—

“মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলিবৃন্দাবনানি চ।
বৃক্ষাঃ কল্পদ্রুমাশ্চৈব চিন্তামণিময়ীস্থলী॥
ক্রীড়াবিহঙ্গলক্ষঞ্চ সুরভীনামনেকশঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রশ্রীরাসমণ্ডলভূময়ঃ॥
কেলিকুঞ্জনিকুঞ্জানি নানাসৌখ্যস্থলানি চ।
প্রাচীরচ্ছত্ররত্নানি ফণাঃ শেষস্য ভান্ত্যহো॥
যচ্ছিরোরত্নবৃন্দানামতুলদ্যুতিবৈভবঃ।
ব্রহ্মেব রাজতে তত্র রূপং কো বক্তুমর্হতি। ইত্যাদি।

—সে স্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলিবৃন্দাবন বিরাজিত। বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিময়ী। লক্ষ লক্ষ ক্রীড়াবিহঙ্গ, বহু প্রকার সুরভিযূথ, নানা-চিত্র-বিচিত্র-রাসমণ্ডলভূমি, কেলি-কুঞ্জ-নিকুঞ্জসমূহ, নানা-সৌখ্যস্থল সে স্থানে শোভা পাইতেছে। অহো! প্রাচীর-ছত্রের রত্নসমূহ শেষ-নাগের ফণার মত দীপ্তি পাইতেছে। সেই প্রাচীরসমূহের শিরোরত্নসমূহের অতুলনীয় দ্যুতি-বৈভব ব্রহ্মের মত দীপ্তি পাইতেছে। সেই স্থানের শোভা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে?”

এই উক্তি হইতেও জানা গেল—শ্রীবৃন্দাবনে বিহঙ্গ, সুরভি, রাসমণ্ডল, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, বৃক্ষ, প্রাচীর, প্রাচীর-ছত্রাদি বিরাজিত।

বৃন্দাবন সম্বন্ধে **কৃষ্ণোপনিষদে** আছে—“বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপীসুরৈঃ সহ॥৭॥”, “গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে দ্রুমাঃ॥৯॥” এই সমস্ত হইতে জানা যায়, বৃন্দাবনে বা গোকুলে বন আছে, বৃক্ষ আছে। সেই বন “বৈকুণ্ঠ—মায়াতীত”। গোপ-গোপীও আছে।

**গোপালপূর্ব্বতাপনী** হইতে জানা যায়—“হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্॥১৷১॥”, “গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥ কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্। চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ॥১৷২॥”

এই সকল বাক্য হইতে জানা যায়—বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম ( সুরদ্রুম ) আছে, কালিন্দী-যমুনা-নদী আছে, জল আছে, বায়ু আছে, পঙ্কজ আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত **ঋগ্বেদ**-মন্ত্র হইতে জানা গিয়াছে—গোলোক-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ"। ইহা হইতে জানা যায়—গোলোকে গো-সমূহও আছে।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে জানা যায়—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল বস্তু আছে, ভগবদ্ধামেও সেই সকল বস্তু আছে ; তবে ভগবদ্ধামের বস্তুসমূহ চিন্ময়, অপ্রাকৃত। ভগবদ্ধামে প্রাকৃত কিছু নাই।

"বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।৪৫॥"
"চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৭॥"

## ১০৩। ভগবদ্ধামসমূহের উর্দ্ধাধঃ-স্থিতি-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক, তাহার নীচে পরব্যোম, তাহার নীচে ( চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ) সিদ্ধলোক, তাহার নীচে ( চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত ) কারণার্ণব ( বিরজা নদী ) এবং তাহার নীচে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ১।১।৯৬(ছ)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১০৬-অনুচ্ছেদে ) স্কন্দপুরাণের এবং পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলোকের সর্ব্বোপরিস্থিতিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পরে, স্বায়ম্ভুবাগমের ঈশ্বর-দেবী সংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষর-ধ্যান-প্রসঙ্গে ৮৫তম পটল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণলোক সর্ব্বোপরি অবস্থিত। স্বায়ম্ভুবাগমের প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিতেছেন—

"ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্ব্বং ক্রমেণ তু।
নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ।
অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বকারণম্।
প্রকৃতিঃ কারণান্যেব গুণাংশ্চ ক্রমশঃ পৃথক্।
ততস্তু ব্রহ্মাণো লোকং ব্রহ্মচিহ্নং স্মরেৎ সুধীঃ।
উর্দ্ধে তু সীম্নি বিরজাং নিঃসীমাং বরবর্ণিনি।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতাং শুভাম্।
ইমাশ্চ দেবতা ধ্যেয়া বিরজায়াং যথাক্রমম্।
( ইহার পরে ) ততোনির্ব্বাণপদবীং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মরেত্তু পরমব্যোম যত্র দেবাঃ সনাতনাঃ।
ততোঽনিরুদ্ধলোকঞ্চ প্রদ্যুম্নস্য যথাক্রমম্।
সঙ্কর্ষণস্য চ তথা বাসুদেবস্য চ স্মরেৎ।
লোকাধিপান্ স্মরেৎ ( ইত্যাদ্যনন্তরঞ্চ )।
পীযূষলতিকাকীর্ণাং নানাসত্ত্বনিষেবিনাম্।
সর্ব্বর্ত্তুসুখদাং স্বচ্ছাং সর্ব্বজন্তুসুখাবহাম্।

নীলোৎপলদলশ্যামাং বায়ুনা চালিতাং মৃদু।
বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্।
সীম্নি কুঞ্জতটাং যোষিৎক্রীড়ামণ্ডপমধ্যমাম্।
কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমান্ সুবর্ণতটপঙ্কজাম্।
নিত্যনূতনপুষ্পাদিরঞ্জিতাং সুখসঙ্কুলম্।
স্বাত্মানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্।
নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্।
নানারত্নলতাশোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতম্।
চিন্তামণিপরিচ্ছিন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্।
সর্ব্বর্ত্তু ফলপুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি।
কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ।
বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষ-বিহঙ্গমৈঃ।
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্।

—তাহাতে বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এই সকল ধ্যান করিবেন ঃ—নানা-কল্পলতাকীর্ণ সর্ব্বব্যাপী বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করিবেন। তাহার ( বৈকুণ্ঠের ) অধোভাগে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা সর্ব্বকারণ প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির কারণ ও গুণসকলকে পৃথক্‌ভাবে ক্রমশঃ স্মরণ করিবেন। তারপর ব্রহ্মচিহ্ন-সমন্বিত ব্রহ্মলোক ( অর্থাৎ সত্যলোক ) স্মরণ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! প্রকৃতির ঊর্দ্ধভাগে সীমাশূন্যা বিরজানদী, তাহাতে বেদাঙ্গ-স্বেদজনিত সলিল প্রবাহিত হইতেছে। সেই নদী শুভস্বরূপা। তাহাতে যথাক্রমে এই সকল দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ( ইত্যাদি বর্ণনের পরে মহাদেব বলিয়াছেন ) বিরজার উপরিভাগে ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মুক্তিস্থান ( সিদ্ধলোক ) এবং তদূর্দ্ধে সনাতন দেবগণের বিহারস্থান পরব্যোম স্মরণ করিবেন। তাহার ( পরব্যোমের ) উপরিভাগে যথাক্রমে অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের স্থান ( দ্বারকা-মথুরা ) স্মরণ করিবেন এবং লোকপালগণকেও স্মরণ করিবেন। ( ইহার পরেও ) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যমুনাকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন—সেই যমুনা পীযূষ-লতাকীর্ণা, নানা প্রাণিদ্বারা নিষেবিতা, সর্ব্ব-ঋতুর সুখ-প্রদায়িনী, স্বচ্ছসলিলা, সর্ব্বপ্রাণীর সুখাবহা, নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণা, বায়ুভরে ঈষদান্দোলিতা ( অর্থাৎ মৃদুতরঙ্গযুক্তা ), বৃন্দাবনের পরাগসমূহে সুবাসিতা, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া, তাহার তটদেশে কুঞ্জ, মধ্যভাগে ব্রজসুন্দরীদিগের ক্রীড়ামণ্ডপ, তীরে সুবর্ণ ভূমি এবং জলে সুবর্ণকমল শোভা পাইতেছে। অতঃপর ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবনকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন—সেই বৃন্দাবনে নিত্যনূতন পুষ্পাদিরঞ্জিত, সুখ-সমাকুল, স্বরূপানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা হইতেও অধিকতর সুখের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চাত্মকে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্ন-লতাশোভিত, মত্ত-ভ্রমরগুঞ্জনে মণ্ডিত, চিন্তামণি-পরিশোভিত, জ্যোৎস্নারাশিতে পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ,

সর্ব্বদিক্ প্রবালসমূহে পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দীজল-সংসর্গি-বায়ু মৃদুল হিল্লোলে বারংবার প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ বৃক্ষ ও পক্ষী শোভা পাইতেছে।”

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে জানা গেল—সর্ব্বনিম্নে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড, তাহার উপরে বিরজা ( কারণার্ণব ), তাহার উপরে সিদ্ধলোক, তাহার উপরে পরব্যোম, তাহার উপরে চতুর্ব্বূ্যহের স্থান দ্বারকা-মথুরা এবং তাহার উপরে শ্রীযমুনাসমন্বিত শ্রীবৃন্দাবন।

কারণার্ণব, সিদ্ধলোক, পরব্যোমাদি যে সর্ব্বব্যাপক, তাহাও উক্ত আগমবাক্যে বলা হইয়াছে ; তথাপি এই সকল ধামের একটীকে অপরটীর উপরে বা নীচে অবস্থিত বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও এইরূপ প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ভগবদ্ধাম “সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—সর্ব্বব্যাপক” হইলেও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্‌বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরিচ্ছিন্নত্বের মধ্যেও যে বিভুত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ( ১।১।৭২-অনুচ্ছেদ )। তদ্রূপ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ভগবদ্ধামের মধ্যেও বিভুত্বের ধর্ম্ম বিরাজিত। এইরূপ বিভুত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ধামসমূহেরই ঊর্দ্ধাধঃ-স্থিতির কথা উল্লিখিত আগমবচনে বলা হইয়াছে।

ঊর্দ্ধাধঃ-স্থিতি দ্বারা ধামসমূহের মাহাত্ম্যের উৎকর্ষাদিই সূচিত হইয়াছে। যে ধামের মাহাত্ম্য বেশী, তাহারই ঊর্দ্ধে অবস্থিতির কথা এবং যাহার মাহাত্ম্য কম, তাহারই নিম্নে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে—কারণার্ণব অপেক্ষা সিদ্ধলোকের, সিদ্ধলোক অপেক্ষা পরব্যোমের এবং পরব্যোম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলোকের মাহাত্ম্যের উৎকর্ষ। এই সমস্তই মায়াতীত ; ব্রহ্মাণ্ড মায়িক বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের মহিমা মায়াতীত ধাম হইতে ন্যূন। এজন্য সর্ব্বনিম্নে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে।

# দশম অধ্যায়

## ( পরব্রহ্মের পরিকর )

### ১০৪। ভগবান্ পরব্রহ্মের পরিকর

পরিকর-শব্দে পার্ষদ বা সঙ্গী বুঝায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিবিধ স্বরূপগণেরও যে পরিকর আছেন, শ্রুতি-স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-স্থলে কয়েকটী প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে।

#### ক। শ্রুতিপ্রমাণ

কৃষ্ণোপনিষদে নন্দ, যশোদা, দেবকী, বসুদেব, বলরাম, গোপ, গোপী, রোহিণী, সত্যভামা, সুদামা, অক্রূর, উদ্ধব, বৃন্দা, প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়।

"যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী ॥ ৩ ॥"

"দেবকী ব্রহ্মপুত্রা সা যা বেদৈরুপগীয়তে।
নিগমো বসুদেবো যো বেদার্থঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ৬ ॥"

"বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপীসুরৈঃ সহ ॥ ৭ ॥"

"দয়া সা রোহিণী মাতা সত্যভামা ধরেতি বৈ ॥ ১৫ ॥"

"শমো মিত্রঃ সুদামা চ সত্যাক্রূরোদ্ধবো দমঃ ॥ ১৬ ॥"

"বৃন্দা ভক্তিঃ ॥ ২৫ ॥"

গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভ", "গোপীজনমনোহর", "রুক্মিণীকান্ত", "গোপীনাথ", "গো-গোপ-গবাবীত"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

"তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্ মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি স্বাহেদং সংসরতীতি ॥ ১।১ ॥" আরও কয়েকস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভ" বলা হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর ॥২।১১ ॥"

"দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।
গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্ ॥১।২ ॥
( গোপগোপীগবাবীতম্—ইতি চ পাঠান্তরম্ )।"

"কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।২ ॥"

শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় পীঠস্থান-বর্ণন-প্রসঙ্গে আবরণরূপে বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহের ( বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধের ), শ্রীকৃষ্ণের নিজশক্তি-রুক্মিণ্যাদির ( রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী,

লক্ষ্মণা ও সুশীলার ), বসুদেবাদির ( বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলদেব, শ্যামলা, সুভদ্রাদির ), পার্থাদির ( অর্জ্জুন, উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতির ) উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"তানুবাচ ব্রহ্মা যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যমষ্টপলাশমম্বুজম্। তদন্তরালিকা নলাস্রযুগং তদন্তরাষ্ঠার্ণং বিলিখত কৃষ্ণায় নম ইতি বীজাঢ্যং স ব্রাহ্মণমাধয়ানঙ্গমনু গায়ত্রীং যথাবদ্ধয়াসজ্য ভূমণ্ডলং মূলবেষ্টিতং কৃত্বাঽঙ্গবাসুদেবাদি-রুক্মিণ্যাদি-স্বশক্তীন্দ্রাদি-বসুদেবাদি-পার্থাদি-নিধ্যাবীতং যজেৎ ॥১৪॥"

**গোপালোত্তরতাপনী**-শ্রুতিতেও "ব্রজস্ত্রী--গোপী", "গান্ধর্ব্বী—শ্রীরাধা", রুক্মিণী, রোহিণী, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোপী, প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ ॥১॥"

"তাসাং ( ব্রজস্ত্রীণাং ) মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বীত্যুবাচ ॥১॥"

"কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী ॥১৬॥"

"রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥১৬॥"

"যুগানুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তীহ সুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রামং রুক্মিণ্যা সহ তৎপরম্ ॥১৬॥"

"যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষু আবিশ্য ভূতান বিদধাতি স বো ( গোপীনাং ) হি স্বামী ভবতি ॥৮॥"

মথুরাবর্ণন-প্রসঙ্গে গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥১৫॥"

এইরূপে দেখা গেল—শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের বহু পরিকরের উল্লেখ আছে।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারি ভগবৎ-স্বরূপকে চতুর্ব্ব্যূহ বলে। দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহের বাসুদেবই হইতেছেন দ্বারকাবিহারী ; সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহারা হইতেছেন দ্বারকাবিহারী বাসুদেবের পরিকর ; ইঁহাদের কাহারওই পৃথক্ ধাম নাই।

পরব্যোমের চতুর্ব্ব্যূহ—দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহের অংশ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহাদেরও কাহারও পৃথক্ পৃথক্ ধাম নাই। ইঁহারা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই পরিকরস্থানীয়।

**ঋগ্বেদ-পরিশিষ্টেও** শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ( মাধবের ) পরিকররূপে শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

## খ। পুরাণ-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ আদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বহু পরিকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের পার্ষদগণকেও দেখিয়াছিলেন। পার্ষদগণের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবালবৈদুর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ ॥ শ্রীভা. ২।৯।১০-১১॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
—শ্রীভা. ২।৯।১৩॥

—যেই বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়াজাত শোক-মোহাদির কথা আর কি বলিব? তত্রত্য ভগবৎ-পার্ষদগণকে সুরাসুরগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠে যে সকল পারিষদ্গণ আছেন, তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নয়ন পদ্মসদৃশ, তাঁহাদের পরিধানে পীতবসন, আকার অতি কমনীয় এবং সুকুমার। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুর্জ, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশয়-প্রভাশালী মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বর্ণ প্রবাল, বৈদুর্য্য ও মৃণালের তুল্য। সকলেই দীপ্তিশালী কুণ্ডল এবং মস্তকে মালা ধারণ করিয়া আছেন। সেই বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বরূপশক্তি-রূপিণী লক্ষ্মীদেবী নানাবিধ বিভূতিদ্বারা ভগবানের পদদ্বয়ের সেবা করিতেছেন।"

প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই স্বীয় ধামে পরিকর আছেন।

## ১০৫। ভগবৎ-পরিকরগণের স্বরূপ

ভগবৎ-পরিকরগণ ভগবানের সঙ্গে ভগবদ্ধামেই বাস করেন। ভগবদ্ধামে যখন মায়া নাই, মায়িক কোনও বস্তুও নাই এবং থাকিতেও পারে না, তখন ভগবৎ-পরিকরগণের দেহাদি যে মায়িক বা প্রাকৃত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পরিকরগণের দেহাদি হইতেছে—অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ।

### ক। নিত্যসিদ্ধ পরিকর

ভগবৎ-পরিকর দুই শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পরিকর-রূপে ভগবদ্ধামে বিরাজিত, তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ বলে। তাঁহাদের পরিকরত্ব কোনওরূপ সাধনের ফল নহে।

### খ। সাধনসিদ্ধ পরিকর

আর যাঁহারা সাধনের ফলে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ পার্ষদ বলা হয়। যেমন নারদাদি। সাধনে সিদ্ধিলাভের পরেই সাধনসিদ্ধদিগের পার্ষদত্ব, তৎপূর্ব্বে নহে; সুতরাং ইঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলা যায় না। সাধনসিদ্ধ পার্ষদগণ সকলেই জীবতত্ত্ব। জীবই সাধন করিয়া থাকে।

সাধনসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-পার্ষদদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ শ্রীভা. ৩।১৫।১৪॥

—নিষ্কাম-ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া ( সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক ) যাঁহারা সেই স্থানে ( মায়াতীত বৈকুণ্ঠে ) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি।"

এই শ্লোকের "বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ"-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে—যাঁহাদের মূর্ত্তি হরির মূর্ত্তির ন্যায় ( অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ )।" আর শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে—বৈকুণ্ঠের ( অর্থাৎ শ্রীহরির ) মূর্ত্তির ন্যায়ই নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তি যাঁহাদের।" ( ভগবান্ মায়াতীত বলিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় )। ইহা হইতে জানা গেল—সাধনসিদ্ধ পার্ষদগণের দেহ সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বময়। সকল ভগবদ্ধামের পরিকরদের দেহই এইরূপ।

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন।

গ। **নিত্যমুক্ত জীবও** আছেন। তাঁহারা কখনও মায়িকব্রহ্মাণ্ডে আসেন নাই। স্বরূপ-শক্তির কৃপায় তাঁহারা পার্ষদরূপে অনাদিকাল হইতেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেবার অধিকার একমাত্র স্বরূপ-শক্তিরই। স্বরূপ-শক্তি ভগবান্ পরব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী এবং স্বরূপগতা শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ পরব্রহ্মের সেবায় তাঁহারই একমাত্র অধিকার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভগবদ্ধামও এবং ভগবানের বসন-ভূষণাদিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। ধামরূপে ভগবান্‌কে ধারণ করিয়া স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা করিতেছেন ; বসন-ভূষণাদিরূপে এবং আরও নানারূপেও স্বরূপ-শক্তি ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকেও স্বরূপশক্তিই কৃপা করিয়া সেবার অধিকার দিয়া থাকেন। নিত্যমুক্ত জীবগণকেও স্বরূপ-শক্তি কৃপা করিয়া ভগবৎ-সেবা দিয়া পার্ষদত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই নিত্যমুক্ত জীবগণ অনাদিকাল হইতেই পার্ষদরূপে ভগবৎ-সেবা করিলেও তাঁহাদের পার্ষদত্বকে অনাদিসিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ বলা যায় না। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তাঁহাদের পার্ষদত্ব। যেহেতু, জীবের মধ্যে, এমন কি শুদ্ধ জীবেও, স্বরূপ-শক্তি নাই ( জীবতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। ২।৮-অনুচ্ছেদ )।

কিন্তু অনাদিসিদ্ধ পার্ষদগণ এইরূপ নহেন। তাঁহাদের স্বরূপের বিষয় এস্থলে আলোচিত হইতেছে।

## ১০৬। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের স্বরূপ

পূর্ব্বে ( ১।৭৯-ক-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতেছেন দ্বারকাবিহারী বাসুদেবের পরিকর এবং পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরিকর। কিন্তু দ্বারকা-চতুর্ব্ব্যূহের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, চতুর্বেদ-শিখার প্রমাণে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের অংশ

পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহও যে পরব্রহ্ম ভগবানেরই অংশ, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে দেখা গেল—চতুর্ব্ব্যূহরূপ পরিকরগণ পরব্রহ্ম ভগবানেরই অংশ—স্বাংশ। পরব্রহ্মের নিজ অংশ বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপেই অবিচ্ছেদ্যভাবে স্বরূপ-শক্তি নিত্য বিরাজিত। সুতরাং তাঁহাদের সেবা বা পার্ষদত্বও স্বরূপশক্তিসিদ্ধ। তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন। ইহা হইতে জানা গেল—পরিকররূপেও পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন।

অন্যান্য নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণও যে জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু পরব্রহ্মেরই প্রকাশ-বিশেষ, বা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই দেখান হইতেছে।

### ক। শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের স্বরূপ

পূর্ব্বোদ্ধৃত **গোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতিতে** বলা হইয়াছে—"রুক্মিণ্যাদি-স্বশক্তীন্॥ ১।৪॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর লিখিয়াছেন—"রুক্মিণ্যাদিশক্তয়ঃ কৃষ্ণশক্তয়ঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বশক্তয়ঃ কৃষ্ণশক্তয়ো দলেষু।" উভয় টীকাকারই লিখিয়াছেন—রুক্মিণ্যাদি-শব্দে-রুক্মিণী, সত্যভামা জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা ও সুশীলা—দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টপ্রধানা মহিষীকে বুঝায়। তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—**শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী-আদি** হইতেছেন **শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি।**

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়াই **গোপালোত্তরতাপনী**-শ্রুতিতে শ্রীরুক্মিণীদেবীসম্বন্ধে বলা হইয়্যছে—কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরুক্মিণী॥ ১৬॥—রুক্মিণী হইতেছেন কৃষ্ণাত্মিকা এবং মূলপ্রকৃতি।" মূলপ্রকৃতি-শব্দে—মূলশক্তি, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায়; আর, শক্তিও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায়, স্বরূপ-শক্তিরূপা রুক্মিণীদেবীকে কৃষ্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিতে অন্যত্রও শ্রীরুক্মিণীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণেব শক্তি বলা হইয়াছে।

"অত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥১৫॥

—এ-স্থানে বিভু শ্রীকৃষ্ণ—রাম, অনিরুদ্ধ এবং প্রদ্যুম্ন এই তিনের সহিত এবং শক্তি শ্রীরুক্মিণীর সহিত অবস্থিত আছেন।"

পূর্ব্বোল্লিখিত গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিবাক্যের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বর এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "রুক্মিণ্যাদি"-শব্দের অর্থে রুক্মিণী-সত্যভামাদি আটজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই আটজন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরূপ পরিকর। শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার মহিষীর কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৩-অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদের মধ্যে শ্রীরুক্মিণীদেবী প্রসিদ্ধা—প্রধানা—বলিয়াই শ্রুতিতে রুক্মিণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ রুক্মিণীর উপলক্ষণে অন্য সমস্ত মহিষীরই শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাস-খণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের তত্ত্বসম্বন্ধে পার্ব্বতীর নিকটে মহাদেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার মহিষীই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। "* * শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ

প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রীমহিষীণাং তদীয়স্বরূপশক্তিত্বং স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে শ্রীশিব-গৌরীসম্বাদে গোপ্যাদিমাহাত্ম্যে দৃষ্টম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৮৩॥" ( ইহার পরে স্কন্দপুরাণের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না )।

### খ। বসুদেব-দেবকীতত্ত্ব

বসুদেবাদি দ্বারকাপরিকরদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ( বাসুদেবের ) একটী উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বসুদেবের নিকটে বলিতেছেন—

"অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্॥১০।৮৫।২৩॥

—হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমি, আপনারা, আর্য্য—শ্রীবলদেব এবং এই দ্বারকাবাসী সচরাচর সকলেই ব্রহ্মস্বরূপে অন্বেষণীয়।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"এবং বিমৃগ্যা ব্রহ্মত্বেনৈব অন্বেষণীয়াঃ।"

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম; বসুদেবাদি দ্বারকা-পরিকরগণকে "ব্রহ্মস্বরূপে অন্বেষণীয়" বলায়, তাঁহারাও যে শ্রীকৃষ্ণেরই বা তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই সূচিত হইল।

বসুদেব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—

"বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্॥৯।২৪।৩০॥

—হরির স্থান বসুদেবকে আনকদুন্দুভি বলা হয়।"

এই শ্লোকার্দ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৩২-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। ( শ্রীভা. ৪।৩।২৩ )-ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং বসুদেবাখ্যং হরেঃ স্থানমত্রানকদুন্দুভিং বদন্তি মুনয় ইতি॥ —'বিশুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলে। এই বিশুদ্ধসত্ত্বে পরমপুরুষ শ্রীহরি অনাবৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।' —ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসিদ্ধ বসুদেবাখ্য হরির স্থানকেই মুনিগণ আনকদুন্দুভি বলিয়া থাকেন।"

ইহা হইতে দ্বারকা-পরিকর বসুদেবের একটা তত্ত্ব জানা গেল। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব। তাঁহার একটী নাম আনকদুন্দুভি। ভগবান্ পরব্রহ্ম স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই আত্মপ্রকাশ করেন। আনকদুন্দুভিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং আনকদুন্দুভি শুদ্ধসত্ত্বই; নচেৎ তাঁহাতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। শুদ্ধসত্ত্বেরই একটী প্রতিশব্দ বসুদেব বলিয়া মুনিগণ আনকদুন্দুভিকে বসুদেব বলিয়া থাকেন।

দেবকী-দেবী সম্বন্ধেও **শ্রীমদ্ভাগবত** হইতে এইরূপ জানা যায়ঃ—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥—শ্রীভা. ১০।৩।৮॥

—পূর্ব্বদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু ( শ্রীকৃষ্ণ ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৩৩-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"দেবো বসুদেবস্তদ্রূপিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিস্বরূপায়ামেবেতি।—দেব-শব্দে এস্থলে বসুদেবকে বুঝায় ; বসুদেব—শুদ্ধসত্ত্ব। দেবরূপিণী—বসুদেবরূপিণী, শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী ; শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিস্বরূপা। তাঁহাতে—শুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তিবিশেষরূপা দেবকী-দেবীতে সর্ব্বগুহাশয় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

এইরূপে জানা গেল—দেবকী-দেবী হইতেছেন শুদ্ধসত্ত্বের ( স্বরূপশক্তির ) বৃত্তিবিশেষ বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ হইতেও একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকটনের সূচনায় কংস-কারাগারে দেবকী-দেবীতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে দেবগণ দেবকীদেবীর স্তুতি-প্রসঙ্গে দেবকী-দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃতিস্ত্বং পরা সূক্ষ্মা ॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।২।৭॥"

এ-স্থলে দেবগণ দেবকীদেবীকে "সূক্ষ্মা পরা প্রকৃতি" বলিয়াছেন। প্রকৃতি—এ-স্থলে শক্তি। পরা প্রকৃতি—পরা শক্তি ; চিৎ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। অপরা প্রকৃতি হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া ( গীতা ॥৭।৫॥ )। এ-স্থলেও দেবকীকে স্বরূপ-শক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব বলা হইয়াছে।

দেবকী-বসুদেবের তত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

**কৃষ্ণোপনিষৎ** বলিয়াছেন—

"দেবকী ব্রহ্মপুত্রা সা যা বেদৈরুপগীয়তে।
নিগমো বসুদেবো যো বেদার্থঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥৬॥"

এ-স্থলে দেবকীকে "ব্রহ্মপুত্রা" বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেছেন পুত্র যে রমণীর, তিনি ব্রহ্মপুত্রা ( বহুব্রীহি-সমাস )। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাঁহার অনাদি-বাৎসল্য-রসসিদ্ধ পুত্রভাব এবং ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটন-কালেও যাঁহার পুত্ররূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন, নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্মপুত্রা—দেবকী। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্বেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, অন্যত্র নহে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ॥ শ্রীভা. ৪।৩।২৩॥" সুতরাং দেবকীদেবী যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ, এই শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা গেল।

আর, উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে বসুদেবকে "নিগম" বলা হইয়াছে। নিগম—বেদ। বসুদেব নিগমতুল্য, বেদতুল্য। কোন্ বিষয়ে তিনি নিগমতুল্য, তাহা বলা হইতেছে।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥"—এই বেদান্তসূত্রের একরকম অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে,—অথবা, ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার একমাত্র কারণ।" অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রই ব্রহ্ম-তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এইরূপে, ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্র ( বা নিগম ) যেমন ব্রহ্ম-তত্ত্বকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ বসুদেবও ব্রহ্মকে প্রকাশ

করেন বলিয়া, বসুদেবেই ব্রহ্ম প্রকাশ লাভ করেন বলিয়া, বসুদেবকে নিগমতুল্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্বব্যতীত অন্যত্র প্রকাশিত হয়েন না বলিয়া বসুদেব যে শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—বসুদেব-দেবকীর তত্ত্বসম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণ তাহাই পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

### গ। বসুদেব-দেবকীর বা নন্দ-যশোদার কৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব অভিমানজাত, জন্মজাত নহে

এ-স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। দেবকী-বসুদেব এবং নন্দ-যশোদা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকর মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব থাকে। দেবকী-বসুদেবের বা নন্দ-যশোদার মনের ভাব এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা। ইহা তাঁহাদের মনের ভাবমাত্র, দৃঢ়া প্রতীতিমাত্র, অভিমানমাত্র। বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা নহেন, হইতেও পারেন না; যেহেতু, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অজ, নিত্য, অনাদি। তাঁহাদের এইরূপ অভিমান—অনাদি। শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ ভাব; তাঁহারও এইরূপ অভিমান যে, তিনি দেবকী-বসুদেবের বা নন্দ-যশোদার পুত্র। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত। "লক্ষ্মীবিষ্ণোরনাদিত আদিরসসিদ্ধদম্পতিত্ববৎ শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তস্য চ অনাদিতো বৎসলরসসিদ্ধ-পিতৃপুত্রভাবো বিদ্যত এব॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৫০॥—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের অনাদিকাল হইতে আদিরস-সিদ্ধ দাম্পত্যের ন্যায় ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর ( নন্দ-যশোদার ) এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনাদিকাল হইতে বাৎসল্য-রস-সিদ্ধ পিতৃপুত্র-ভাব বিদ্যমান আছে।" শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং শ্রীনারায়ণের দাম্পত্য অনাদিসিদ্ধ, কেবল অভিমান-জাত, অনাদিসিদ্ধ বলিয়া বিবাহানুষ্ঠানজাত নহে; তদ্রূপ নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণেরও নন্দ-যশোদার পুত্রত্ব কেবল অনাদি-অভিমানজাত, জন্মজাত নহে। বসুদেব-দেবকী-সম্বন্ধেও ঐ কথা। গোলোকে বা ব্রজে নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব এবং দ্বারকা-মথুরায় বসুদেব-দেবকীর শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃমাতৃত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বেই নন্দ-যশোদাকে এবং বসুদেব-দেবকীকে আবির্ভাবিত করেন; তাহার পরে তাঁহাদের যোগে তাঁহাদের পুত্ররূপে তিনি নিজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

### ঘ। নন্দ-যশোদার তত্ত্ব

অনাদি-বাৎসল্যরসসিদ্ধ অভিমানবশতঃ নন্দ-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পুত্রভাব। ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটন-কালে আবার এই নন্দ-যশোদাকে দ্বার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং বসুদেব-দেবকীর ন্যায় নন্দ-যশোদাও শুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ।

### ঙ। শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের আধার-শক্তির বা সন্ধিনী-শক্তির মূর্ত্তরূপ

পিতামাতা হইতেছেন সন্তানের আধার, সন্তানের প্রতি বাৎসল্যেরও আধার। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্বের বা স্বরূপ-শক্তির যেই বৃত্তিটী আধার-শক্তি নামে পরিচিত, নন্দ-যশোদা এবং বসুদেব-দেবকী শুদ্ধসত্ত্বের সেই বৃত্তিই বা সেই বৃত্তিরই মূর্ত্তরূপ হইবেন।

পূর্ব্বে ( ১।১।৮-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, সন্ধিনী—প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের নাম আধার-শক্তি। নন্দ-যশোদা এবং বসুদেব-দেবকী যে সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব, বা সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বেরই মূর্ত্ত রূপ, তাহাই জানা গেল। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৬-৫৭॥

এ-স্থলে "শুদ্ধসত্ত্ব"-শব্দে "আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদ্ধসত্ত্বকে" বুঝাইতেছে। ভগবানের "পিতা-মাতা—পিতৃমাতৃত্বাভিমান-বিশিষ্ট পরিকর, নন্দ-যশোদা ও বসুদেব-দেবকী", তাঁহার "স্থান—ধাম", তাঁহার "গৃহ—আবাস-গৃহ, শ্রীমন্দিরাদি", তাঁহার "শয্যা" এবং তাঁহার "আসন—সিংহাসনাদি উপবেশন-স্থান"—এই সমস্তই আধার-শক্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি। ইহাই উল্লিখিত পয়ারদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

## চ। যাদবদিগের তত্ত্ব

বসুদেব-দেবকী ব্যতীত দ্বারকা-মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আরও বহু পরিকর আছেন; তাঁহাদিগকে "যাদব—যদুকুলে আবির্ভূত বলিয়া—যাদব" বলা হয়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১১৭-অনুচ্ছেদে ) যাদবদিগের কৃষ্ণপরিকরত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা—প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন—হে ভামিনি, এই যাদবগণ সকলেই আমার গণ—পরিকর। হে দেবি! ইঁহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।"

এ-স্থলে "মত্তুল্যগুণশালিনঃ"-শব্দে যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ, তাহাই সূচিত হইতেছে; যেহেতু, তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ ব্যতীত অন্য কেহ "তত্তুল্যগুণশালী" হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭২-অনুচ্ছেদে আদিবরাহপুরাণের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। "বসন্তি যে মথুরায়াং বিষ্ণুরূপা হি তে খলু।—যাঁহারা মথুরায় বাস করেন, তাঁহারা ( সেই কৃষ্ণ-পরিকরগণ ) নিশ্চিতই বিষ্ণুরূপ—বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ।" এ-স্থলেও মথুরা-পরিকরদের স্বরূপ-তত্ত্ব জানা গেল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীহরিবংশের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"দেবানাঞ্চ হিতার্থায় বয়ং যাতা মনুষ্যতামিতি॥

—শ্রীহরিবংশে অনিরুদ্ধ-অন্বেষণ-প্রসঙ্গে অক্রূর বলিতেছেন—দেবগণের হিতার্থে আমরা ( যাদবেরা ) মনুষ্যরূপে প্রকট হইয়াছি।"

ইহা হইতেও অক্রূরাদি যাদবদিগের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মপুরাণ-প্রমাণ-অনুসারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন-আবির্ভাবরূপত্ব সূচিত হইতেছে।

## ছ। গোপ-গণের তত্ত্ব

গোলোকের বা ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গোপগণসম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-নির্ম্মাণ-খণ্ড হইতে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১১৭-অনুচ্ছেদে ) নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"গোপালা মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তয় ইতি ॥

—গোপ-সকল মুনি ; তাঁহারা বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তি।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"যতো যো বৈকুণ্ঠঃ শ্রীভগবান্ স ইব আনন্দমূর্ত্তয়স্তে ততস্তৎপরম-ভক্তত্বাদেব মুনয় ইত্যুচ্যতে, ন তু মুন্যবতারত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। —যিনি বৈকুণ্ঠ—ভগবান্—তিনি যেমন আনন্দ-মূর্ত্তি, তাঁহার পরিকর-গোপসকলও তদ্রূপ আনন্দ-মূর্ত্তি। তাঁহার পরম-ভক্ত বলিয়াই গোপগণকে মুনি বলা হইয়াছে ; মুনিগণের অবতার বলিয়া নহে।" ( যেহেতু, মুনিগণের অবতার ভগবানের ন্যায় "আনন্দ-মূর্ত্তি" হইতে পারেন না)। ব্রজের গোপগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় "আনন্দ-মূর্ত্তি—আনন্দঘন-বিগ্রহ" বলাতে সূচিত হইতেছে যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পরিকর-গোপরূপে বিরাজিত।

ব্রজের গোপগণ যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৎস-চারণরত গোপশিশুগণকে এবং বৎসগণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

"নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি ॥ শ্রীভা. ১০।১৩।৩৯ ॥

—এই গোপগণ এবং বৎসগণ দেবতাও নহে, ঋষিও নহে ; ভেদাশ্রয় হইলেও ( তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সত্ত্বেও ) তুমিই তাহাদের রূপে প্রকাশ পাইতেছ।" অর্থাৎ গোপগণ এবং বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"ইত্যাদিকং শ্রীবলদেববাক্যঞ্চ ভগবদাবির্ভাবলক্ষণ-গোপাদীনাম্। —এই বাক্যে গোপাদি যে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ, তাহাই জানা গেল।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ব্রজের গোপাদির তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে এ-স্থলে সে-সমস্ত উল্লিখিত হইল না।

গোলোক-বৃন্দাবনের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড বলিয়াছেন—"স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুঃ তদ্দশাংশসমুদ্ভবঃ ॥৩৮।৬৪ ॥—বৃন্দাবনের স্ত্রীগণ লক্ষ্মী এবং পুরুষগণ বিষ্ণুর ( শ্রীকৃষ্ণের ) দশাংশে উৎপন্ন।" ব্রজের গোপগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং ব্রজনারীগণ যে লক্ষ্মীস্বরূপা—এই প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—দ্বারকা-মথুরার যাদবগণ, ব্রজের গোপগণ এবং বৎসগণও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ; এবং পূর্ব্বে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ।

এক্ষণে ব্রজের গোপীদিগের তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

## জ। গোপীতত্ত্ব

**গোপালোত্তরতাপনী**-শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের "স্বামী" বলা হইয়াছে। "স বো হি স্বামী ভবতি ॥৮॥" ইহা হইতে জানা গেল—ব্রজের গোপীগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কান্তারূপ পরিকর। এ-জন্যই গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনবল্লভঃ" এবং "গোপীজনমনোহরঃ" বলা হইয়াছে।

"কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি—কাহাকে জানিলে সমস্তই জ্ঞাত হয়"—এই প্রশ্নের উত্তরে **গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়—"গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি ॥১।১॥"

ইহার পরে "গোপীজনবল্লভঃ কঃ—গোপীজনবল্লভ কে"—এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালপূর্ব্বতানীতে বলা হইয়াছে—"গোপীজনাবিদ্যাকলা-প্রেরকঃ ॥১।১॥ —গোপীজনবল্লভ হইতেছেন গোপীজনাবিদ্যাকলা-প্রেরক।"

এক্ষণে দেখিতে হইবে—"গোপীজনাবিদ্যাকলা-প্রেরক"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৬-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতি-বাক্যটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়,—গোপীজনাবিদ্যাকলা=গোপীজন+আ+বিদ্যাকলা; তাহার প্রেরক=গোপীজনবিদ্যাকলা-প্রেরক। তিনি অর্থ করিয়াছেন—"যে গোপীজনাঃ তে আ সম্যগ্ যা বিদ্যা পরমপ্রেমরূপা তস্যাঃ কলা বৃত্তিরূপা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। * * তাসাং প্রেরকস্তৎক্রীড়ায়াং প্রবর্ত্তক ইতি বল্লভশব্দেন একার্থমেব। স বো হি স্বামীতি তস্যামেব শ্রুতৌ তাঃ প্রতি দুর্ব্বাসসো বাক্যাৎ।—যাঁহারা গোপীজন, তাঁহারা আ—সম্যক্—পরম-প্রেমরূপা যে বিদ্যা, সেই বিদ্যার কলা—বৃত্তি-রূপা। * *। তাঁহাদের প্রেরক—তাঁহার ক্রীড়ায় প্রবর্ত্তক; প্রেরক-শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থক। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের (গোপীদিগের) বল্লভ, সেই তাপনীশ্রুতিতেই তিনি 'তোমাদের স্বামী হয়েন'—গোপীদের প্রতি দুর্ব্বাসার এই বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।"

এ-স্থলে "বিদ্যা"-শব্দে যে "প্রেমরূপা বিদ্যাকেই" বুঝাইতেছে, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্"-ইত্যাদি (৯।২)-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গীতোক্ত "রাজবিদ্যা"-শব্দে "প্রেমরূপা বিদ্যাকেই" বুঝায়। এইরূপ বলার হেতু এই। গীতার ভাষ্যকারগণ "রাজবিদ্যা"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"বিদ্যানাং রাজা—বিদ্যাসমূহের রাজা, বিদ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা যে বিদ্যা, তাহাই রাজবিদ্যা।" যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই বিদ্যা। যে বিদ্যাদ্বারা এমন একটী বস্তু জানা যায়, যাহা জানিলে অজ্ঞাত আর কিছু থাকে না, তাহাই হইবে—শ্রেষ্ঠা বিদ্যা বা রাজবিদ্যা। ব্রহ্মকে জানিলেই কিছু অজ্ঞাত থাকে না; সুতরাং ব্রহ্মকে যদ্দ্বারা জানা যায়, তাহাই হইবে রাজবিদ্যা। ব্রহ্মকে জানা যায় একমাত্র

"পরা বিদ্যা"-দ্বারা। "অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে॥ মুণ্ডকশ্রুতি ।১।৫॥" তাহা হইলে পরা বিদ্যাই হইতেছে রাজবিদ্যা। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি॥১৮।৫৫॥" এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।১১।১৪।২১॥"; মাঠরশ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥" ইহা হইতে জানা যায়—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। সুতরাং ভক্তিই হইতেছে "পরাবিদ্যা" বা "রাজবিদ্যা।" সাধ্য-ভক্তি এবং প্রেম একই অভিন্ন বস্তু। সুতরাং "প্রেমরূপা বিদ্যাই" যে "রাজবিদ্যা", তাহাই জানা গেল। এজন্যই শ্রীজীব শ্রুতির "বিদ্যা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রেমরূপা বিদ্যা।"

শ্রীজীব "গোপীজনাবিদ্যাকলা"-শব্দকে বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন এই ভাবে—গোপীজন + আ + বিদ্যাকলা। এই শব্দটীর অন্যরূপ বিশ্লেষণও হইতে পারে; যথা, "গোপীজন + অবিদ্যাকলা"। "গোপীজন + অবিদ্যাকলা"—এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হইবে—গোপীগণ হইতেছেন অবিদ্যার (বহিরঙ্গা মায়ার) কলা বা বৃত্তি। এই অর্থ যে শাস্ত্রসঙ্গত নয়, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন। শ্রীজীব বলেন—এইরূপ অর্থ করিলে ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়ার সংশ্লেষ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পরব্রহ্মকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গোপীগণ মায়ার বৃত্তি—এইরূপ অর্থ সমীচীন হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীগণকে মায়ার বৃত্তি বলিলে পরব্রহ্মের সহিত মায়ার সংশ্লেষ কিরূপে হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই। গোপালতাপনী-শ্রুতিই বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের "বল্লভ", "স্বামী।" সুতরাং গোপীগণ যে তাঁহার "কান্তা"-রূপ পরিকর, ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। কান্তার সঙ্গে কান্তের—বল্লভের, স্বামীর—স্পর্শাদিরূপ সংশ্লেষ অপরিহার্য্য। এজন্যই গোপীদিগকে অবিদ্যার বা বহিরঙ্গা মায়ার বৃত্তি বলিলে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়ার সংশ্লেষও স্বীকার করিতে হয়; অথচ ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ।

গোপীগণ যে বহিরঙ্গা মায়ার বৃত্তি নহেন, তাহার প্রমাণ **গোপালপূর্ব্ব-তাপনী** শ্রুতি হইতেই জানা যায়। এই শ্রুতি বলিয়াছেন—গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জানা যায়—"গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি।১।১॥" এবং সেই শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই গোপীজনবল্লভের ধ্যানে, রসনে এবং ভজনে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। "যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি॥১।১॥" "গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ" হইতেছেন—গোপীগণপরিবৃত কৃষ্ণ। তাঁহার ধ্যানাদিতে গোপীগণের ধ্যানাদিও সূচিত হইতেছে। গোপীগণ যদি মায়ার বৃত্তিই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধ্যানে, মায়াতীত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের সঙ্গেও তাঁহাদের ধ্যান করিলে, কেহ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। অবিদ্যার ধ্যানে কেহ অবিদ্যামুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। সুতরাং গোপীগণ যে অবিদ্যার বৃত্তি নহেন, গোপীজনবল্লভের ধ্যানাদিতে অমৃতত্ব-লাভের কথাতে গোপাল-তাপনী শ্রুতিই তাহা জানাইয়াছেন।

গোপীজনবল্লভের ধ্যানাদির উপদেশে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপভূত বস্তু। তাঁহারা "বিদ্যার কলা—প্রেমরূপা বিদ্যা" হইলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বস্তু হইতে পারেন; যেহেতু, প্রেম হইতেছে হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি (গুহ্য বিদ্যা; ১।১।১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

**ব্রহ্মসংহিতা**-বাক্য হইতেও জানা যায়, ব্রজের গোপাগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরূপা শক্তির, বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। "কামকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন ইত্যপি। বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥ ব্রহ্মসংহিতা।৫।২৪॥"-ইত্যাদি মন্ত্রে গোপীদের কথা বলিয়া তাহার পরে ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
—ব্রহ্মসংহিতা॥৫।৩৭॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অখিলাত্মভূত (সকলের পরমপ্রিয়) যে গোবিন্দ—আনন্দ-চিন্ময়রসদ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা এবং স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-হ্লাদিনীরূপা সেই গোপাদিগের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনন্দ-চিন্ময়রসঃ—পরম-প্রেমময় উজ্জ্বলনামা—পরম-প্রেমময়-উজ্জ্বল রসই আনন্দ-চিন্ময়রস (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—আনন্দ-চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥২।৮।১২২)। তাভিঃ—শ্রীগোপীভিঃ মন্ত্রে তচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ১৮৬॥)। কলাভিঃ—শক্তিভিঃ, হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। নিজরূপতয়া—স্বস্বরূপতয়া, স্বদারত্বেনৈব।"

ইহা হইতে জানা গেল—ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্ব-কান্তা, (স বো হি স্বামী ভবতি॥ তাপনীশ্রুতিঃ॥ অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা॥ গৌতমীয়তন্ত্র॥)। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, হ্লাদিনীরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহাদের দেহ আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত। "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত॥শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২৪॥"

ব্রহ্মসংহিতায় অন্যত্রও গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলা হইয়াছে।

"লক্ষ্মীসহস্রশতসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৫।২৯॥—ব্রহ্মা বলিতেছেন—যিনি শতসহস্র গোপসুন্দরীকর্ত্তৃক সাদরে সেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"লক্ষ্ম্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এব—এই শ্লোকে লক্ষ্মী-শব্দে গোপসুন্দরীগণকেই বুঝাইতেছে।" যেহেতু, শ্রুতিবাক্যানুসারে গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের কান্তা; এই কান্তাগণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হয়েন।

লক্ষ্মী যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৮৯ অনুচ্ছেদে, ৬৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়) তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—অথৈবং ভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা তু ইহ ভগবদ্বামাংশবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেব।—অনন্তবৃত্তিবিশিষ্টা যে স্বরূপ-শক্তি, তিনিই ভগবানের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী; অর্থাৎ স্বরূপশক্তিই এক বৃত্তিতে মূর্ত্তিমতী হইয়া লক্ষ্মীরূপে ভগবানের বামপার্শ্বে অবস্থিতা।" এই উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ॥ শ্রীভা. ১২।১১।২০॥—ভগবতী শ্রী (লক্ষ্মী) হইতেছেন শ্রীহরির সাক্ষাৎ অনপায়িনী

শক্তিঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ সাক্ষাদাত্মনঃ স্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাৎ তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ।—শ্রীহরির শক্তি অনপায়িনী ( নিত্যা ); যেহেতু, শ্রীহরির স্বরূপ হইতেছে চিদ্রূপ এবং লক্ষ্মী তাঁহা হইতে অভিন্না।"

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীজীব তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"পরমাত্মা হরির্দেব স্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা॥

—পরমাত্মা হরি যে দেব, তাঁহার শক্তি শ্রী—ইহাই কথিত হয়। শ্রীদেবী হইতেছেন প্রকৃতি এবং কেশব হইতেছেন পুরুষ। বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দেবী ( শ্রী বা লক্ষ্মী ) থাকেন না, লক্ষ্মীকে ছাড়িয়াও বিষ্ণু থাকেন না।"

এই শ্লোকে দুইটী জিনিস পাওয়া গেল—(১) লক্ষ্মী বা শ্রী হইতেছেন ভগবানের শক্তি (প্রকৃতি ) এবং (২) তাঁহারা নিত্য একত্র অবস্থিতি করেন ( এজন্যই লক্ষ্মীকে ভগবানের অনপায়িনী শক্তি বলা হইয়াছে )।

বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥
—বিষ্ণুপুরাণ॥১।৮।১৫॥

—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—বিষ্ণুর শ্রী ( প্রেয়সী বা লক্ষ্মী ) তাঁহার অনপায়িনী ( নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপশক্তিরূপা ) ও নিত্যা; তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা।"

পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী লক্ষ্মীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী।

"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥
—বিষ্ণুপুরাণ॥১।৯।১৪০॥

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বেচ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥
—বিষ্ণুপুরাণ॥১।৯।১৪৩॥"

ইহা দ্বারা লক্ষ্মীর অনপায়িনীত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—লক্ষ্মী বা শ্রী হইতেছেন ভগবানের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি—স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রজগোপীগণকে লক্ষ্মী বলাতে তাঁহাদেরও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণে ইহাও জানা গিয়াছে যে—শ্রী বা লক্ষ্মী হইতেছেন ভগবানের অনপায়িনী শক্তি ; অর্থাৎ তিনি ভগবানের সহিত নিত্য অবস্থিতা। ভগবান্ যে ধামে যে-রূপে বিরাজিত, তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপ-শক্তিরূপা লক্ষ্মী বা শ্রীও সেই ধামে ভগবানের সেই রূপের অনুরূপ ভাবে বিরাজিতা। ব্রজে তিনি দ্বিভুজরূপে—নররূপে বিরাজিত, তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপ-শক্তিও ব্রজে দ্বিভুজা—গোপীরূপে—তাঁহার সঙ্গিনী। পরব্যোমে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত, শ্রীরূপা স্বরূপ-শক্তিও সেই স্থানে চতুর্ভুজা লক্ষ্মীরূপে তাঁহার সঙ্গিনী। পরব্যোমস্থিত রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণরূপ পরিকরও যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাও বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে জানা গেল। দ্বারকার মহিষীরূপ পরিকরগণ যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণেও তাহা জানা গেল।

যাহা হউক, ব্রহ্মসংহিতা অন্য স্থলেও ব্রজগোপীগণকে "শ্রী—লক্ষ্মী" বলিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা গোপীগণ যে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাহাই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ ॥৫।৫৬॥

—( বৃন্দাবনে ) পরম-পুরুষ ( শ্রীকৃষ্ণ ) কান্ত এবং শ্রীগণ ( লক্ষ্মীগণ ) কান্তা ( শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপী )।

## ১০৭। আলোচনার সারমর্ম্ম

ভগবৎ-পরিকরগণের তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহার সারমর্ম্ম এই ঃ—নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, কেহ কেহ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ।

**ব্রজের** বা গোলোকের পরিকর—শ্রীনন্দ-যশোদা সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাব। অপর যে সকল গোপ-গোপীরও শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-ভাব আছে, নন্দ-যশোদার উপলক্ষণে বুঝা যায়, তাঁহারাও সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ।

কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

**দ্বারকামথুরার** পরিকর—বসুদেব-দেবকী এবং তাঁহাদের উপলক্ষণে বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন অন্য পরিকরগণও হইতেছেন সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—বা মূর্ত্তবিগ্রহ। যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ।

**পরব্যোমের** পরিকর—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীদেবী এবং পরব্যোমস্থিত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণ হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বা মূর্ত্তবিগ্রহ। অন্যান্য পরিকরগণ ভগবানেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ ভগবানের বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া জীবতত্ত্ব নহেন।

তাত্ত্বিক-বিচারে তাঁহাদের মধ্যে এবং ভগবানের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। এজন্যই ব্রজের গোপীগণকে এবং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীকেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু "ঈশ্বর" বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ॥
গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৩৯-৪৯॥"

আর, সাধনসিদ্ধ পরিকরগণ সকলেই জীবতত্ত্ব। পরিকররূপে তাঁহাদের দেহও প্রাকৃত নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দ। নিত্যমুক্ত জীবগণও সচ্চিদানন্দদেহে ভগবৎ-পরিকররূপে বিরাজিত।

ভগবদ্ধামে, উল্লিখিত পরিকর ব্যতীত, অপর যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম আছে, তাহারাও প্রাকৃত নহে; তাহারাও সচ্চিদানন্দ। যেহেতু, ভগবদ্ধামে প্রকৃতির বা বহিরঙ্গা মায়ার প্রবেশ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব-বিশেষ-বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ সকলেই নিত্য।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যাঃ মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যগুণশালিনঃ॥
—পদ্মপুরাণপাতাল খণ্ড ॥৫২।৩॥

—নারদের নিকটে সদাশিব বলিতেছেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির দাস, সখা, পিতামাতা এবং প্রেয়সীগণ সকলেই নিত্য এবং সকলেই তাঁহারই ন্যায় গুণশালী।"

# একাদশ অধ্যায়

## ( পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা )

### ১০৮। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসী

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে লীলাবিলাসী, শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়।

বেদান্তদর্শনে এইরূপ একটী সূত্র দৃষ্ট হয় ঃ—

**"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্** ॥২।১।৩৩॥

—লোকের ন্যায় কেবল লীলা।"

পরব্রহ্ম কর্তৃক জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে এই সূত্রটীর অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—কোনও প্রয়োজনবুদ্ধিবশতঃ পরব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করেন নাই; ইহা তাঁহার লীলামাত্র; লৌকিক জগতেও প্রয়োজনবুদ্ধিহীনা লীলা ( ক্রীড়া ) দৃষ্ট হয়।

অভাব হইতেই প্রয়োজন-বুদ্ধির উদ্ভব। যাঁহার অর্থাভাব, অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন তাঁহার হয়। কিন্তু পরব্রহ্ম হইতেছেন পূর্ণতম-স্বরূপ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোনও অভাব নাই—সুতরাং প্রয়োজন-বুদ্ধিও নাই। তিনি তাঁহার কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তাঁহার লীলামাত্র—ক্রীড়ামাত্র। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—যিনি রাজ-রাজেশ্বর, তিনিও কন্দুকাদি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন—কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধিতে নহে, কেবল ক্রীড়ার আমোদ-উপলব্ধির জন্য; ইহা অভাবজনিত প্রয়োজন-বুদ্ধির কার্য্য নহে। ছোট শিশুরা খেলা-প্রসঙ্গে খড়-কুটা দিয়া ঘর প্রস্তুত করে—কোনও প্রয়োজন-বুদ্ধির প্রেরণায় নহে; সেই ঘরে তাহারা বাস করে না। ইহা তাহাদের খেলামাত্র। পরব্রহ্ম কর্তৃক এই জগতের সৃষ্টিও তদ্রূপ তাঁহার খেলামাত্র—লীলামাত্র। লীলা অর্থ ই—ক্রীড়া, খেলা।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই খেলার ইচ্ছা জাগে। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দময়। **"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ** ॥ ১।১।১২ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মে আনন্দের প্রাচুর্য্য নিত্য বিদ্যমান। **"বিকারশব্দান্নেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ** ॥ ১।১।১৩ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥" ব্রহ্ম আনন্দদাতাও। "এষ হি এব আনন্দয়াতি ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৭ ॥" আনন্দ-প্রাচুর্য্যবশতঃ ব্রহ্মে আনন্দের উচ্ছ্বাস; তাহার ফলেই তাঁহার পক্ষে আনন্দ দানের ইচ্ছা। এই আনন্দের উচ্ছ্বাসবশতঃ এবং আনন্দদানের ইচ্ছাবশতঃই তাঁহার লীলা বা খেলা।

ব্রহ্মে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে এবং এই আনন্দোচ্ছ্বাসবশতঃই যে তাঁহার লীলায় প্রবৃত্তি, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্র হইতেই তাহা জানা যায়। আনন্দের উচ্ছ্বাসবশতঃই তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যরূপ লীলাতে প্রবৃত্তি।

## ১০৯। সৃষ্টিলীলাই একমাত্র লীলা নহে

কেহ হয়তো বলিতে প্যারেন—সৃষ্টিকার্য্য-প্রসঙ্গেই যখন "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন মনে হয়—সৃষ্টিকার্য্যই ব্রহ্মের একমাত্র লীলা ; তাঁহার অন্য কোনও লীলা নাই। কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে, তাহার হেতু এই ঃ—

প্রথমতঃ, ব্রহ্মের লীলার কথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত সূত্রের অবতারণা করা হয় নাই। লীলাতে বা খেলাতে যেমন প্রয়োজনবুদ্ধি থাকে না, সৃষ্টিকার্য্যেও ব্রহ্মের কোনওরূপ প্রয়োজনবুদ্ধি নাই—এই তথ্য প্রকাশ করাই এ-স্থলে উক্ত সূত্রের অবতারণার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম যখন আনন্দ-স্বরূপ এবং আনন্দময়, তখন আনন্দের প্রাচুর্য্যবশতঃ এবং আনন্দদানের ইচ্ছাবশতঃ তাঁহাতে যে নিত্য আনন্দোচ্ছ্বাস বিদ্যমান, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই উচ্ছ্বাসকে কেবলমাত্র সৃষ্টিলীলাতে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে তাঁহার ব্রহ্মত্বেরই ক্ষুণ্ণতা সাধিত হয়। আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব—সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার এই ব্রহ্মত্বের বা সর্ব্ববৃহত্ত্বার ব্যাপ্তি—তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসে এই সর্ব্ববৃহত্ত্বার ব্যাপ্তি অস্বীকার করিতে গেলে বৃহত্ত্বা রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসজনিত লীলা যে কেবল সৃষ্টিলীলাতেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

তৃতীয়তঃ, লীলা পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তিরই কার্য্য, স্বরূপ-শক্তির বিভূতি। কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার একপাদ বিভূতিমাত্র অভিব্যক্ত ; তাঁহার তিনপাদ বিভূতির বিকাশ অপ্রাকৃত দিব্যলোকে, ভগবদ্ধামে ( ১।১।৪৭-অনুচ্ছেদের শেষভাগে শ্রুতিপ্রমাণ দ্রষ্টব্য )। তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যরূপ লীলা তাঁহার একপাদ বিভূতিরই অন্তর্ভুক্ত। দিব্যলোকে বা তাঁহার ধামে ত্রিপাদ-বিভূতি হইতে উদ্ভূত লীলা অবশ্যই আছে। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যই যে ব্রহ্মের একমাত্র লীলা, এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে।

পরব্রহ্মের ধাম ও পরিকরের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লীলাসঙ্গীরাই পরিকর ; লীলার স্থানই ধাম। ধাম এবং পরিকর যে নিত্য, অনাদি, প্রাকৃত-সৃষ্টির অতীত, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সৃষ্টিলীলা ব্যতীত অন্য লীলা না থাকিলে ধাম ও পরিকরের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে।

## ১১০। লীলাসম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম"-ইত্যাদি গীতা ( ৪।৯ )-বাক্যে যে "দিব্য কর্ম্মের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাই তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া।

অপ্রাকৃত ধামে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা **কৃষ্ণোপনিষদে** স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। "বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপ-গোপাসুরৈঃ সহ ॥ কৃষ্ণোপনিষৎ। ৭ ॥" ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী-আদির সহিত বৃন্দাবনে ক্রীড়া ( লীলা ) করেন।

**গোপালপূর্ব্বতাপনী**-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ, পূতনাবধ, তৃণাবর্ত্ত-বধাদি লীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥ ২।৮ ॥"

উক্ত গোপালপূর্ব্বতাপনীতেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে "গোপ-গোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্ ॥ ১।২ ॥", "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর ॥২।১১ ॥" এবং "গোপীজনবল্লভঃ ॥১।১ ॥"—ইত্যাদি উক্তিতেও লীলাবিশেষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঋক্‌পরিশিষ্টে যমুনা-হ্রদস্থিত "কালিক-নাম-সর্পের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ।
যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ ॥ ইত্যাদি।"

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কালীয়-দমন-লীলারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋক্-পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যটী "মণ্ডল ৭।অং ৫।৪।২২॥৫৫-সূক্তস্যানন্তরম্।" অর্থাৎ উল্লিখিত সূক্তের পরে উক্ত পরিশিষ্টবাক্যটী সংযোজিত হইবে। সূক্তটীর শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ—

"সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ।
সমন্তু সর্ব্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ
য আস্তে যশ্চ চরতি যশ্চ পশ্যতি নো জনঃ।
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যথেদং হর্ম্ম্যং তথা
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ স্বাপয়ামসি
প্রোষ্ঠেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্যাস্তল্পশীবরীঃ
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধা স্তাঃ সর্ব্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥"

পুরাণাদিতে গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদিলীলার কথা, গোপীদিগের সহিত রাসাদি-লীলার কথা, বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কেবল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নহে, তাঁহার অন্যান্য স্বরূপের লীলার কথাও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের, পরব্যোমে নারায়ণাদির লীলা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপেও লীলা করেন, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও লীলা করিয়া থাকেন।

## ১১১। লীলার নিত্যত্ব

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, তাঁহার ধাম নিত্যবস্তু, তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরবর্গও নিত্যবস্তু। সুতরাং তাঁহার লীলাও হইবে নিত্য বস্তু। লীলা নিত্য না হইলে লীলা-ধামের এবং লীলা-পরিকরের নিত্যত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে। লীলার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয়।

**গর্গসংহিতায়** দেখা যায়—দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—

"বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ
গোপালবেশ **কৃতনিত্যবিহারলীল**।
রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্ম্মধারাম্॥
—গোলোকখণ্ড ॥৩।২২॥"

এ-স্থলে পরিষ্কারভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে "কৃতনিত্যবিহারলীল—নিত্যলীলাবিলাসী" বলা হইয়াছে।

**পদ্মপুরাণ**-পাতালখণ্ড নারদের উক্তিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলেন—

"আনন্দরূপিণী শক্তিস্ত্বমীশ্বরী ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া চ **ক্রীড়তি** কৃষ্ণো নূনং বৃন্দাবনে বনে ॥৪০।৫৭॥"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে নিত্য ক্রীড়া করেন ( ক্রীড়তি-ক্রিয়ার বর্ত্তমান-কালদ্বারা ক্রীড়ার নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে )।

নারদের নিকটে সদাশিবও বলিয়াছেন—

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যগুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্॥——পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৫২।৩-৫॥

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির দাস, সখা, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ—সকলেই নিত্য এবং তাঁহার তুল্য-গুণশালী। পুরাণসমূহ-বর্ণিত প্রকট-লীলায় যেমন, তেমনি নিত্যলীলাতেও ( অপ্রকট-লীলাতেও ) তাঁহারা নিত্য বর্ত্তমান। তিনি নিত্যই বনে এবং গোষ্ঠে গমনাগমন করেন এবং বয়স্য ( সখা )-দিগের সঙ্গে গোচারণ করেন। ( প্রকটলীলার ন্যায় অপ্রকটে কেবল ) অসুর-বিনাশ নাই।"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ যেমন নিত্য, তাঁহার লীলাও তেমনি নিত্য। নিত্যই তিনি বনে এবং গোষ্ঠে গমনা-গমনরূপ লীলা করিয়া থাকেন এবং গোচারণাদিলীলাও করিয়া থাকেন।

**স্কন্দপুরাণ** হইতেও জানা যায়—

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ **সদা ক্রীড়তি** মাধবঃ॥

—পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বর ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১।২২-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকাধৃত স্কান্দবচন।

—মাধব শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বলরামের সহিত ও বৎস এবং বৎসতরীদের সহিত নিত্যই বৃন্দাবনের মধ্যে ক্রীড়া করেন।”

ইহা হইতেও শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিত্যত্ব জানা যায়।

দ্বারকা-সম্বন্ধে **শ্রীমদ্ভাগবতে** দৃষ্ট হয়, শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—

“নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥১১।৩১।২৪॥

—ভগবান্ মধুসূদন নিত্যই দ্বারকায় সন্নিহিত আছে।

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতির কথাই এ-স্থলে বলা হইল। নিত্যস্থিতি দ্বারা তাঁহার দ্বারকা-লীলার নিত্যত্বই সূচিত হইতেছে।

মথুরা-সম্বন্ধেও শুকদেব বলিয়াছেন—

“মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥—শ্রীভা. ১০।১।২৮॥

—মথুরায় ভগবান্ হরি নিত্যসন্নিহিত আছেন।” ইহাদ্বারা মথুরা-লীলারও নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

**শ্রুতিতেও** লীলার নিত্যত্বের কথা দৃষ্ট হর। “একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা”—ইতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা “জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্”—ইত্যাদি ৪।৯-শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত-টীকায় ধৃত পিপ্পলাদি-শাখাভুক্ত-পুরুষবোধিনী-শ্রুতিবাক্য ”

## ১১২। প্রকট ও অপ্রকট লীলা

ভগবানের লীলা দুই রকমের—প্রকট ও অপ্রকট। তিনি কৃপা করিয়া যখন তাঁহার লীলাকে ব্রহ্মাণ্ডে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন, তখন সেই লীলাকে বলে **প্রকট-লীলা**। আর, যাহা লোক-নয়নের অগোচরে থাকে, তাহাকে বলে **অপ্রকট-লীলা**। “শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিবিধা—অপ্রকট-রূপা প্রকটরূপা চ। প্রাপঞ্চিক-লোকাপ্রকটত্বাৎ তৎপ্রকটত্বাচ্চ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥”

## ১১৩। অপ্রকট ও প্রকট লীলার বৈশিষ্ট্য

অপ্রকট ও প্রকট লীলা সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১৫৩-অনুচ্ছেদে ) লিখিয়াছেন—অপ্রকটলীলা “প্রাপঞ্চিক-লোকৈস্তদ্বস্তুভিশ্চামিশ্রা, কালবদাদিমধ্যাবসান-পরিচ্ছেদ-রহিতস্বপ্রবাহা। প্রকটরূপা তু শ্রীবিগ্রহবৎ কালাদিভিরপরিচ্ছেদ্যৈব সতী ভগবদিচ্ছাত্মক-স্বরূপশক্ত্যৈব লব্ধারম্ভ-সমাপনা প্রাপঞ্চিকাপ্রপঞ্চিক-লোকবস্তুসম্বলিতা তদীয়-জন্মাদিলক্ষণা ॥ —প্রাপঞ্চিক লোকের সঙ্গে এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুর সঙ্গে অপ্রকট-লীলার মিশ্রণ নাই ; ইহা কালের ন্যায় আদিমধ্যাবসনরূপ পরিচ্ছেদশূন্যা এবং স্বপ্রবাহরূপা। কিন্তু প্রকট-লীলা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় স্বরূপতঃ কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্না হইলেও ভগবদিচ্ছাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে ইহা আরম্ভ ও অবসান প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক লোকের ও বস্তুর মিশ্রণও আছে ; ভগবানের জন্মাদিও ইহাতে আছে।”

অপ্রকট ও প্রকট লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) **প্রথমতঃ**, অপ্রকট-লীলার সঙ্গে প্রাপঞ্চিক ( মায়িক ) লোকের ( স্থানের ) এবং প্রাপঞ্চিক বস্তুর

মিশ্রণ নাই। অপ্রকট-লীলার স্থান ( ধাম ) এবং বস্তু-আদি সমস্তই প্রপঞ্চাতীত। ইহা মায়াতীত চিন্ময়-ভগবদ্ধামেই অনুষ্ঠিত হয় ; চিন্ময়-ভগবদ্ধামে কোনও মায়িক বস্তু নাই বলিয়া এই লীলাতে কোনও মায়িক বস্তুরও স্থান নাই।

কিন্তু প্রকট-লীলার সঙ্গে মায়িক স্থানের এবং মায়িক বস্তুর মিশ্রণ আছে। ভগবানের লীলা স্বরূপতঃ মায়াতীত হইলেও ইহা যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডস্থ মায়িক স্থানের সহিত এবং মায়িক বস্তুর সহিত ইহার মিশ্রণ হয়। ভগবানের লীলা মায়াতীত ভগবদ্ধামেই অনুষ্ঠিত হয়। লীলা-প্রকটনের সময়ে ভগবদ্ধামের এক প্রকাশই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে ; ব্রহ্মাণ্ডের যে-স্থানে ইহা প্রকটিত হয়, সেই স্থানের সঙ্গে ইহার যোগ হয়। ইহাই প্রপঞ্চাতীত ধামের সঙ্গে প্রাপঞ্চিক-স্থানের মিশ্রণ। কিন্তু এই মিশ্রণেও প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রাপঞ্চিক-ধাম কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টই থাকে—মায়িক বস্তুতে থাকিয়াও ভগবান্ যেমন মায়িক বস্তুকর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট থাকেন, তদ্রূপ। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে স চাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ শ্রীভা. ১।১১।৩৯॥" বরং চিন্ময় ভগবদ্ধামের স্পর্শে এবং এবং প্রভাবে সেই মায়িক স্থানই চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এইরূপে প্রাকৃত বস্তুর সহিতও প্রকট-ধামের মিশ্রণ থাকে।

প্রকট-লীলাতে অসুর-সংহারাদিও আছে ; অসুরগণ প্রাকৃত বস্তু ; তাহাদের সংহার-লীলায় প্রকট-লীলার সঙ্গে প্রাকৃতের মিশ্রণ হইয়া থাকে।

(২) **দ্বিতীয়তঃ**, কালের ( সময়ের ) যেমন আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই, অপ্রকট-লীলারও তেমনি আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই। কাল যেমন প্রবাহরূপে নিরবচ্ছিন্নগতিতে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তও চলিবে, অপ্রকট-লীলাও তেমনি প্রবাহরূপে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। কোনও সময়ে কোনওস্থলে ইহার বিরাম নাই।

প্রবাহরূপা হইলেও অপ্রকট-লীলার অনেক বৈচিত্রী আছে। এক সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহর সময়ের মধ্যে যে লীলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, প্রাতর্ভোজন, গোষ্ঠ-গমন, গোচারণ, বন-ক্রীড়াদি, অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনাদি, নিশাভাগে রাসাদিলীলা, কুঞ্জক্রীড়াদি। প্রতিদিনই নিরবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ বৈচিত্র্যময়ী লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রবাহরূপা লীলা।

প্রকট-লীলাতে কিন্তু লীলার ছেদ আছে—আদিও আছে, অন্তও আছে। ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষে প্রকটিত লীলাটী সমগ্রভাবেই আদি-অবসানময়ী। যখন ব্রহ্মাণ্ডে ইহা প্রকটিত হয়, তখন ইহার আদি বা আরম্ভ ; আবার যখন ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষ হইতে সেই লীলা অন্তর্দ্ধাপিত হয়, তখন ইহার অবসান। সমগ্র প্রকট-লীলার অন্তর্ভুক্ত খণ্ডলীলাগুলিরও ঐরূপ আরম্ভ এবং অবসান আছে। ব্রজে যথোপযুক্ত বয়সে কৃষ্ণের গোচারণাদি লীলার আরম্ভ হয়। যতদিন ব্রজে থাকেন, ততদিন ঐ লীলাদি চলিতে থাকে ; কিন্তু যখন ব্রজ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া যায়েন, তখন ব্রজের গোচারণাদি-লীলারও অবসান হয়। সুতরাং অপ্রকট-লীলার ন্যায় প্রকট-লীলার নিরবচ্ছিন্ন-প্রবাহরূপতা নাই।

(৩) **তৃতীয়তঃ**, অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলা নাই ; যেহেতু, তিনি অজ, অনাদি। জন্ম নাই বলিয়া বাল্য-পৌগণ্ডাদি দেহ-ধর্ম্মও তাঁহার নাই। অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর। "গোপবেশ-মভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্॥ গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি ॥১।২॥"

কিন্তু প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা আছে। অবশ্য প্রাকৃত জীবের মত জন্মাদি তাঁহার নাই। তাঁহার জন্মাদি দিব্য। তাহা তিনি নিজেই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ গীতা। ৪।৯॥" প্রকট-লীলায় তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর নন্দ-যশোদা এবং বসুদেব-দেবকীর যোগে শিশুরূপে নিজেকে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন ( এ-সম্বন্ধে পরে ১।১।১৪৩-অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইবে )। শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ বাল্য, কৌমার ও পৌগণ্ডকে প্রকাশ করিয়া অবশেষে কৈশোরকে প্রকটিত করেন এবং অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত কৈশোরেই অবস্থান করেন। এইরূপে দেখা যায়, প্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৌমার ও পৌগণ্ডও আছে, তাহাদের আদি, মধ্য এবং অবসানও আছে। কিন্তু এই আদি, মধ্য ও অবসান প্রাকৃত-জীবের বাল্য-পৌগণ্ডাদির আদি-মধ্যাবসানের ন্যায় কালকৃত নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির বা লীলা-শক্তিরই ক্রিয়া।

প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই কাল আছে ; কাল না থাকিলে পৌর্ব্বাপর্য্য থাকে না, দিবারাত্রিও থাকে না। কিন্তু লীলার উপরে কালের কোনও প্রভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলায় পৌর্ব্বাপর্য্যাদি সংঘটিত হয় তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার লীলাশক্তির প্রভাবে, কালের প্রভাবে নহে। অপ্রকটের কাল কিন্তু মায়াতীত।

## বাল্য-পৌগণ্ড কৈশোরের ধর্ম্ম

শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার জন্যই লীলাশক্তির এইরূপ প্রভাব-বিস্তার। লীলাশক্তি স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কৈশোরেই বাল্য, কৌমার ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বাল্য-লীলার, কৌমার-লীলার এবং পৌগণ্ড-লীলার রস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। আবার, পৌগণ্ডের মধ্যেও কৈশোর-লীলারস আস্বাদন করাইবার প্রয়োজন হইলে কৈশোর আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ—প্রকটের শারদীয়া রাসলীলাতে দৃষ্ট হয়। যখন শারদীয়া রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পৌগণ্ডে—তাঁহার বয়সের অষ্টম বর্ষের প্রথম ভাগে। সপ্তম বর্ষের কার্ত্তিকী অমাবস্যায় কর্ম্মবাদ উত্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করেন। শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধন যজ্ঞ। অমাবস্যার পরে শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন-ধারণ। তাহার পরের বৎসরে—শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম বর্ষে—রাসলীলা। "ইহ খলু সপ্তমবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্যামাবস্যায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃকৃতঃ। তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্দ্ধনোৎসবঃ। ** তৃতীয়ায়া-মারভ্য নবমীপার্য্যন্তং গোবর্দ্ধন-ধারণম্।**। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরবর্ষে অষ্টবর্ষবয়স্কে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥" চান্দ্র-শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। আশ্বিনী-পূর্ণিমায় রাসলীলা। তখন প্রকট লীলায় তাঁহার বয়স—সাত বৎসর পূর্ণ হইয়া মাত্র দুই তিন মাস। সুতরাং তখনও তাঁহার পৌগণ্ড ( দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড )। যাঁহাদের সঙ্গে তিনি রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই গোপসুন্দরীদের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়স অপেক্ষা অধিক ছিল না—তাঁহারাও

পৌগণ্ডেই অবস্থিত ছিলেন। অথচ শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে রাসলীলার বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—লীলাকালে তাঁহারা সকলেই—শ্রীকৃষ্ণও—ছিলেন পূর্ণ কৈশোরে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"—এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণকে কৈশোর-বয়সোচিত রাসলীলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কৈশোরই তখন শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের পৌগণ্ডকে অপসারিত করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাতে ইহাও প্রতিপাদিত হইতেছে যে—কৈশোরেই তাঁহাদের নিত্যস্থিতি ; বাল্য-পৌগণ্ডাদি হইতেছে কৈশোরের বা নিত্যকিশোর বিগ্রহের ধর্ম্মমাত্র।

"বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম ॥　শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২১৫ ॥
বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥　শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১২ ॥
কিশোর-শেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন।　শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১৩ ॥"

(৪) **চতুর্থতঃ**, প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-পৌগণ্ড আছে বলিয়া বাল্যলীলা এবং পৌগণ্ড-লীলাও আছে। অপ্রকটে বাল্য-পৌগণ্ড নাই বলিয়া বাল্যলীলা এবং পৌগণ্ড-লীলাও নাই।

অপ্রকট-লীলায় বাল্য-পৌগণ্ডের ভাব আছে, কিন্তু তাহাও কৈশোরের আশ্রয়ে। "তত্র যদ্যপি তস্যাপ্রকটলীলায়াং বাল্যাদিকমপি বর্ত্ততে, তথাপি কৈশোরাকারস্যৈব মুখ্যত্বাৎ, তমাশ্রিত্যৈব সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥ ১৭৪ ॥" অপ্রকটে কৈশোরাকারই মুখ্য ; তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বাল্যাদিভাবের বিকাশ—অবশ্য কৈশোরে বাল্যাদিভাবের বিকাশ যতটুকু সম্ভব ততটুকু বিকাশমাত্র। কিন্তু বাল্যরূপাদির বিকাশও আছে মনে করিলে কৈশোরের নিত্যত্ব থাকে না। বাল্যরূপাদির বিকাশ নাই বলিয়া বাল্যরূপাদির অনুকূল লীলা—যেমন মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত থাকিয়া স্তন্যপানাদি—থাকা সম্ভব নয়। মাতাপিতাদির বাৎসল্যের প্রভাবে কোনও কোনও সময়ে কিশোর সন্তানের চিত্তেও বাল্যাদিভাবের উদয় হইতে পারে এবং যথাসম্ভব তদুচিত ব্যবহারও প্রকাশ পাইতে পারে ; কিন্তু বাল্যব্যবহারের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয়।

(৫) **পঞ্চমতঃ**, প্রকট-লীলায় অসুর-সংহার আছে, অপ্রকট-লীলায় তাহা নাই।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তৎতুল্যগুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ **বিনাসুরবিঘাতনম্** ॥
—পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৫২।৩-৫॥

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার ন্যায় অপ্রকটেও বয়স্যদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনে ও গোষ্ঠে গমনাগমন আছে, গোচারণ-লীলাও আছে ; কিন্তু "অসুর-বিঘাতন" নাই।

**(৬) ষষ্ঠতঃ,** অপ্রকট-লীলায় ব্রজে বা গোলোকে, মথুরায় এবং দ্বারকায়-এই তিন ধামেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১১১-অনুচ্ছেদে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং অপ্রকটে ব্রজ হইতে দ্বারকা-মথুরায় গমনাগমন নাই।

কিন্তু প্রকট-লীলায় অসুর-সংহারাদির জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরায়, মথুরা হইতে দ্বারকায় গিয়াছেন এবং দন্তবক্র-বধের পরে দ্বারকা হইতে একবার ব্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে এই গমনাগমন বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থের সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—অপ্রকট-লীলায় "মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি মথুরায়া অপ্রকট-প্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতলীলা-বিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং তত্র প্রকট-লীলায়ামেব স্যাত্যাং গমাগমাবিতি গমো ব্রজভূমেঃ প্রকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনম্ আগমো দ্বারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরমাগমনং প্রকট-লীলায়ামেব স্যাতাং ন তু অপ্রকট-লীলায়াম্।"

**(৭) সপ্তমতঃ,** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের ভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের যে পরকীয়াভাব, ইহা পুরাণাদিতে অতিপ্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে—

"পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ ৫২।৬॥

—( প্রকট-লীলায় ) শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ( ব্রজসুন্দরী ) গণ পরকীয়াভিমানিনী। প্রচ্ছন্ন ভাবের সহিতই তাঁহারা নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।"

কিন্তু অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের স্বকীয়াভাব—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা—এইরূপই তাঁহাদের অভিমান। বস্তুতঃ, তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, তখন শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব ব্যতীত অন্য ভাব সম্ভব নয়। এজন্যই গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিতেও দেখা যায়—দুর্ব্বাসা ঋষি গোপীগণকে বলিয়াছেন—"স বো হি স্বামী ভবতীতি—সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।" উপরে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ডের শ্লোক হইতে জানা যায়—তাঁহাদের এই নিত্য-স্বকীয়াভাবই প্রকট-লীলাতে "পরকীয়াভিমান"-দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। লীলাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবেই প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভিমানের উদয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের প্রাক্‌কালে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্পের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া—

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥১।৪।২৫-২৮ ॥"

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীনাং তাসাং তৎ-পরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ ॥" স্থূলমর্ম্ম এই—অপ্রকট-লীলায় গোপাদিগের স্বদারত্বভাব, প্রকটলীলার ন্যায় পরদারত্ব-ব্যবহার নহে। তাঁহারা পরম-লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া তাঁহাদের পরদারত্ব সম্ভব নহে। প্রকটলীলায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াই স্বীয় প্রভাবে স্বদারত্বময় রসকে অবগুণ্ঠিত ( প্রচ্ছন্ন ) করিয়া পরকীয়াত্বরূপে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন— যেন মিলনের জন্য পরস্পরের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইতে পারে। উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতেই রসাস্বাদনের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত হয়।

প্রকটলীলার এই পরকীয়াভাব সাধারণ পরকীয়াভাব নহে। ইহা হইতেছে স্বকীয়াতে পরকীয়াভাব, পরকীয়াভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত স্বকীয়াভাব। অপ্রকট-লীলাতে যে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৮—৮০ অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক-সম্পাদিত গৌরকৃপা-তরঙ্গিনী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "অপ্রকটব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধেও এই বিষয়টী বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

## ১১৪। প্রকট-লীলার নিত্যত্ব

পূর্ব্বে ১।১।১১৩-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রকটলীলাও স্বরূপতঃ কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্না, সুতরাং নিত্যা। অথচ ভগবানের ইচ্ছাত্মিকা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই ইহার আদি, মধ্য ও অবসান হইয়া থাকে। যে কারণেই হউক, আদি, মধ্য এবং অবসান যাহার হয়, তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

**পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড** হইতেও অপ্রকট-লীলার ন্যায় প্রকট-লীলার নিত্যত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ ৫২।৩-৪ ॥

—নারদের নিকটে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা, এবং প্রেয়সীবর্গ সকলেই নিত্য এবং তাঁহারই তুল্য গুণশালী। পুরাণে বর্ণিত প্রকট-লীলায় যেমন, তেমনি নিত্যলীলাতেও ( অপ্রকট-লীলাতেও ) তাঁহারা বৃন্দাবনে নিত্য বর্ত্তমান ( সন্তি-ক্রিয়ার বর্ত্তমান-কাল নিত্যত্ব সূচিত করিতেছে )।"

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে আরও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"মমাবতারো নিত্যোঽহয়মত্র মা সংশয়ঃ কৃথা ॥৪২।২৭ ॥

—আমার এই অবতার ( প্রকটলীলায় ) নিত্য, ইহাতে সংশয় করিও না।"

প্রকটলীলার আবির্ভাব যেমন আছে, তেমনি তিরোভাবও আছে। আবির্ভাব-তিরোভাব থাকা সত্ত্বেও প্রকট লীলা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

**শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে** এই সমস্যার সমাধান দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্তে প্রকট-লীলার নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ্যোতিশ্চক্রের নিয়মটী এই। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে ; একবার ঘুরিতে যে সময় লাগে, তাহকেই একদিন বা এক অহোরাত্র বলে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য আকাশের একস্থানেই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে, তাহার সঙ্গে পৃথিবীস্থ লোক এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে ; কিন্তু জাহাজে চড়িয়া দ্রুতবেগে নদীর মধ্য দিয়া যাওয়ার সময়, লোক যেমন নিজের গতি ভুলিয়া, নদীতীরস্থ স্থিতিশীল বৃক্ষাদিকেই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করে, পৃথিবীর সঙ্গে ঘূর্ণায়মান লোকসমূহও সেইরূপ নিজেদের গতি ভুলিয়া স্থিতিশীল-সূর্য্যকে তাহাদের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করে। সূর্য্যের এই প্রতীয়মান গতিকে তাহার আপেক্ষিক-গতি বলা যাইতে পারে। এইভাবে, সূর্য্য যখন প্রথম দৃষ্টির মধ্যে আসে, তখন সূর্য্যোদয়, যখন মাথার উপরে আসে, তখন মধ্যাহ্ন, যখন পশ্চিম দিকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে থাকে, তখন সন্ধ্যা ; আর যতক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই রাত্রি। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর ন্যায় গোল বলিয়া, পৃথিবীর সকল লোক একই সময়ে সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তাদি দেখে না। পূর্ব্বদিকের লোক আগে, পশ্চিমদিকের লোক পরে সূর্য্যোদয়াদি দেখে ; যে স্থান যত পশ্চিমে, সেস্থানের লোক তত দেরীতে সূর্য্যোদয় দেখে ; পূর্ব্বাহ্ণ-মধ্যাহ্নাদি-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমদিকে যদি একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে এই দড়িগাছি যত লম্বা হইবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে সূর্য্য নিজ আপেক্ষিক গতিতে, এক অহোরাত্রে বা ৬০ দণ্ডে ততদূর পথ চলিয়া থাকে বলিয়া মনে করা যায়। ঐ দড়িগাছিকে যদি ৬০টী সমান অংশে ভাগ করা যায়, তবে এক এক অংশ অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক এক দণ্ড সময় লাগিবে ; তাহা হইলেই বুঝা গেল, যে স্থান ঐ দড়ির যত অংশ পশ্চিমে থাকিবে, সেস্থানে সূর্য্যোদয়াদিও ততদণ্ড পরে হইবে। এইরূপে, কুমিল্লায় যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতায় তাহার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে, পুরীতে একদণ্ড পরে, মথুরায় সোয়া দুইদণ্ড পরে, কুরুক্ষেত্রে আড়াইদণ্ড পরে, বিলাতে প্রায় দুই প্রহর পরে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। সুতরাং কুমিল্লায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, কলিকাতা, পুরী, মথুরাদি স্থানে তখনও রাত্রি ; উদীয়মান সূর্য্য কুমিল্লায় যখন প্রকট, তখনও কলিকাতা-মথুরাদিতে অপ্রকট। আবার কুমিল্লায় যখন অর্দ্ধদণ্ড বেলা, তখন কলিকাতায় সূর্য্যোদয় ; যখন কুমিল্লায় একদণ্ড ও কলিকাতায় আধদণ্ড বেলা, তখন পুরীতে সূর্য্যোদয় ; যখন কুমিল্লায় সোয়া দুই দণ্ড, কলিকাতায় পৌণে দুই দণ্ড ও পুরীতে সোয়াদণ্ড, তখন মথুরায় সূর্য্যোদয় ; এবং

কুমিল্লায় যখন মধ্যাহ্ন, তখন বিলাতে সূর্য্যোদয়। এইরূপে দেখা যায়, আটপ্রহর দিন মাত্রির মধ্যে সূর্য্যোদয় সর্ব্বদাই আছে, মধ্যাহ্ন সর্ব্বদাই আছে, একপ্রহর বা দেড়প্রহর বেলাও সর্ব্বদাই আছে—অবশ্য একই স্থানে নহে; পৃথিবীর এক স্থানের পর আর এক স্থানে, তারপর আর এক স্থানে ইত্যাদি ক্রমে। এক স্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আর একস্থানে সূর্য্যোদয়; সেস্থানে যখন সূর্য্যোদয় শেষ হইল, তখন আবার আর একস্থানে সূর্য্যোদয় হইল; এইরূপে মধ্যাহ্নাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এইরূপে দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে বা পলে একই স্থানে, সূর্য্যকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রত্যেকটীই এক স্থানের পর আর একস্থানে, ইত্যাদি ক্রমে, সর্ব্বদাই দৃশ্যমান (প্রকট) থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মৌষলান্ত-পর্য্যন্ত লীলাসমূহের প্রত্যেকটীও এইরূপে এক ব্রহ্মাণ্ডের পর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে, তারপর আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বদাই প্রকট থাকে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক খণ্ডলীলার প্রকটত্ব—এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও—লীলার হিসাবে—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে—নিত্য।

কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদুরকে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ। কিন্নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥ শ্রী. ভা. ৩।২।৭॥—অহে বিদুর, শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে আমাদের শ্রীহীন গৃহ সকল (শোকান্ধকার রূপ) অজগরের (মহাসর্পের) দ্বারা গিলিত হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুদিগের কুশল আর কি বলিব?" এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানকে অস্তগমন বলাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব যে জ্যোতিষ্-চক্রের দৃষ্টান্তে বুঝান যায়, তাহা জানা যাইতেছে। সূর্য্য অস্ত-গমন করিলেও লোপ পাইয়া যায় না; একস্থানে অস্তগত হইয়া অন্য স্থানে যাইয়া উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও (সুতরাং তাঁহার লীলাও) একস্থানে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া (লোক-নয়নের বাহিরে যাইয়া) অন্য স্থানে আবির্ভূত (লোক-লোচনের গোচরীভূত) হন; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা সর্ব্বদাই প্রকটিত থাকে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "কৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্য নিম্লোচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ মহাসর্পরূপশোকান্ধকারেণ গীর্ণেষু নিগিলিতেষু গৃহেষু নোঽস্মাকং ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধূনাং কিং কুশলং ব্রূয়াম্। অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্যৈব দ্যুমণেরশ্ব-রথসারথ্যাদি-পরিকরবিশিষ্টস্য যস্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্যেষু বর্ষেষু তদৈবোদয়-পূর্ব্বাহ্ন-মধ্যাহ্নাদয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থস্য সপরিকরস্য তত্তল্লীলাঃ মৃতমজ্জিতজগজ্জনস্যৈব কৃষ্ণস্য যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধানং দৃশ্যতে তদৈব অন্যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎসবাদ্যা লীলা দৃশ্যন্তে জ্যোতিষ্‌চক্রে সূর্য্যস্য উদয়-পূর্ব্বাহ্নাদ্যাঃ প্রতীয়মানত্বাদবাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্য তু জন্মাদ্যাস্তত্র তত্র নিত্যত্বাদ্ বাস্তবা এব ইতি বিশেষঃ সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথমস্কন্ধে দর্শিতং দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণং দর্শয়িষ্যতে চ।" এই টীকার শেষ অংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—জ্যোতিষ্‌চক্রের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার নিত্যত্ব বুঝান হইল বটে; কিন্তু দষ্টান্ত ও দার্ষ্ট্যান্তিকের সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। জ্যোতিষ্‌চক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্নাদি লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হয় মাত্র; বস্তুতঃ উদীয়মান্ সূর্য্য, পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্নের বা অস্তগমনোদ্যত সূর্য্য একরূপই; লোকের নিকটে কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং প্রতীয়মান বিভিন্ন রূপ বাস্তব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি সমস্ত লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তব।

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয় ? ॥

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥
রাত্রিদিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয় ॥

ঐছে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিল বিলাস ॥
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে 'নিত্য লীলা' কহে আগম পুরাণ ॥

গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১৫-৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত—প্রকট-প্রকাশের লীলাসমূহ কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কোনও সময়ে প্রকট হয়, আবার অপ্রকট হয় ; সুতরাং কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ঐ সকল লীলা নিত্য ( অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ) নহে—অনিত্য। কিন্তু স্বরূপতঃ ঐ লীলা অনিত্য ( বা কিছু-কালমাত্র স্থায়ী ) নহে ; যখনই এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অপ্রকট হয়, তখনই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে উহা প্রকট হয় ; সুতরাং কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা সর্ব্বদাই প্রকট থাকে। একজন লোক কুমিল্লা হইতে যদি দিল্লীতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে, কুমিল্লায় তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে ; কিন্তু দিল্লীতে আছে ; তাহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকটত্বও কখনও নষ্ট হয় না। প্রকটলীলা নিত্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, তখন প্রকটনের স্থানাভাববশতঃ লীলার প্রকটনও তো বন্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং লীলার প্রাকট্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য কিরূপ হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই :—মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গেলেও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রতীয়মান বহু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া লীলা-প্রাকট্যের সুযোগ করিয়া দেন ; সুতরাং প্রকটলীলার নিত্যত্ব ধ্বংস হয় না। "মহাপ্রলয়েচ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষ্বিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণত্ন্যমণিনিম্লোচে গীর্ণেম্বজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যস্থোতিতা জ্ঞেয়া। এবং মথুরাদ্বারকয়োরপি প্রকটলীলেতি। —উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগস্থিতি প্রকরণে প্রথম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।"

## ১১৩। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের নিয়ম

### ক। ধামের প্রকটন

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটন করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ধামকে প্রকটিত করেন। ধাম-প্রকটনের হেতু এই।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর এবং লীলা—সমস্তই অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত কোনও স্থানের সহিত তাঁহার বা তাঁহার লীলার সাক্ষাৎ স্পর্শ সম্ভব নয়, সেই স্থানের পক্ষে তাঁহার লীলাদির ধারণ তো দূরের কথা। তিনি সর্ব্বদা লীলা করেন তাঁহার চিন্ময় ধামে—যাহা হইতেছে তাঁহার আধারশক্তিরূপা স্বরূপশক্তির বিভূতি। "তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মানত্বাৎ তদাধারশক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিত্বমেবাবগম্যতে। * * ততস্তত্রৈবাব্যবধানেন তস্য লীলা। অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি ধারণশক্তিস্তু নতরাম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৭৪॥" এজন্যই প্রকটলীলা-সম্পাদনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়।

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু বস্তু, তাঁহার ধামও তদ্রূপ বিভু। "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৫॥" বিভু বলিয়া তাহা ব্রহ্মাণ্ডকেও ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; তবে তাহা লোকনয়নের গোচরীভূত নহে—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডেও তাহা লোকনয়নের গোচরীভূত হইতে পারে। "ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।১৬॥"

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানে ভগবদ্ধামের প্রকাশ হয়, সেই স্থানে ধামের আবেশ—তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি—হয় বলিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে। এমন কি, প্রকটলীলায় ভগবান্ যে-যে-স্থানে গমনাগমন করেন, সে-সে-স্থানেও তাঁহার ধামের আবেশ হয়: "যত্র ক্বচিদ্ বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥"

## খ। পরিকরবর্গের প্রকটন

ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামকে প্রকটিত করিয়া তাঁহার পরিকরবর্গকে প্রকটিত করেন। প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদের সহিতই লীলা করিয়া থাকেন। উভয়-লীলাতেই যে একই পরিকর, তাহা পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥৫২।২-৪॥

—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীবর্গ—ইঁহারা সকলেই নিত্য এবং কৃষ্ণের তুল্য-গুণশালী। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায় ইঁহাদের কথা পুরাণে যেমন বর্ণিত হইয়াছে, অপ্রকটলীলাতেও বৃন্দাবনে ইঁহারা ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত।"

কেবল নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ নহে, সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেও যে প্রকটলীলাকালে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "যে মৎপ্রভোর্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এব ইতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি, অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণো র্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধমেব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্ধানঞ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাঁহারা আমার জন্ম-কর্ম্মাদিকে নিত্য মনে করিয়া (তাঁহাদের ভাবানুরূপ) সেই-সেই লীলাতে সেবাবাসনা পোষণকরতঃ ভজন করিয়া আমাকে সুখী করেন, আমিও—আমি ঈশ্বর বলিয়া এবং যাহা ইচ্ছা করিতে, কিম্বা না করিতে, কিম্বা অন্যথা করিতেও সমর্থ বলিয়া, আমিও—তাঁহাদের জন্ম-কর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাঁহাদিগকে আমার পার্ষদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তর্ধান প্রাপ্ত হই। এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ভজনের ফল প্রেম দিয়া

থাকি।” এস্থলে দেখা গেল, ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের ( অর্থাৎ লীলাপ্রকটনের ) সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকরভুক্ত সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও সঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নিয়াই তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ( ৪৫শ অধ্যায় ) হইতে জানা যায়, দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন। তখন ব্রজে গোপরমণীদিগের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে স্ত্রীপুত্রাদিসহ-নন্দ-উপানন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে এবং ব্রজস্থ পশু-পক্ষি-মৃগাদিকেও অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। নন্দব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়া এক প্রকাশে তিনি দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ( শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥ ১৭৫ ॥ )। এই প্রমাণ হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজপরিকরদিগকে অপ্রকটধামে পাঠাইয়া দিয়া লীলা অপ্রকট করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—অপ্রকট লীলার পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাঁহাদিগকে অপ্রকট-লীলায় লইয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১৭৪ অনুচ্ছেদে ) শ্রীজীবগোস্বামী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। “অথ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহেঽবতীর্য্য চ তদ্বদেব প্রকাশান্তরেণাপ্রকটমপি স্থিত্বৈব স্বয়ং প্রকটীভূতস্য সব্রজশ্রীব্রজরাজস্য গৃহেঽপি তদীয়ামনাদিত এব সিদ্ধাং স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোঽয়ং নন্দয়তি বালোঽয়ং রিঙ্গতি পৌগণ্ডোঽয়ং বিক্রীড়তীত্যাদিস্ববিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ পুনর্নবীকর্ত্তুং সমায়াতি।—শ্রীবসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সেইরূপ বসুদেবের সহিত অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করিয়াই—যিনি ব্রজের সহিত প্রকটীভূত হইয়াছেন, সেই ব্রজরাজের গৃহেও আগমন করেন। ব্রজরাজের ( শ্রীনন্দের ) হৃদয়ে কৃষ্ণবিষয়িনী যে অনাদিসিদ্ধা বাৎসল্য-মাধুরী বর্ত্তমান আছে, —‘এই কৃষ্ণ জন্মিয়া আনন্দ দিতেছে, বালক-কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিতেছে, পৌগণ্ড-কৃষ্ণ বিশেষরূপে ক্রীড়া করিতেছে’-ইত্যাদি বিলাস-বিশেষ-সমূহদ্বারা সেই বাৎসল্য-মাধুরীকে বারংবার নবীভূত করিবার জন্যই ব্রজরাজের গৃহে সমাগত হয়েন।” এ-স্থলে অনাদিসিদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমময় শ্রীনন্দের আবির্ভাবের কথায় এবং ব্রজের সহিত ( ব্রজধাম ও ব্রজপরি-করদের সহিত ) তাঁহার আবির্ভাবের কথায় প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অপ্রকট-লীলার পরিকর শ্রীনন্দাদিই প্রকট-লীলাতেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। “পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৩ ॥—দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥ শ্রী. চৈ. চ. ১।৩।৮ ॥”

ইহাই অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

“স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥
—শ্রীভা. ১১।১২।১৭ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ১৮০ অনুচ্ছেদে ) বলিয়াছেন—“স এষ মল্লক্ষণো জীবো জগতো জীবনহেতুঃ বিশেষতো ব্রজস্য জীবনহেতুর্বা পরমেশ্বরঃ প্রাণেন মৎপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরপ্রসূতি র্বিবরাদপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়ামভিব্যক্তির্যস্য

তথাভূতঃ সন্ পুনর্গুহাং অপ্রকটলীলামেব প্রবিষ্টঃ। কীদৃশঃ সন্ কিং কৃত্বা, মাত্রাঃ মম চক্ষুরাদীনি স্বরো ভাষাগানাদিঃ বর্ণো রূপমিতি ইত্থং স্ববিষ্টঃ স্বপরিজনানাং প্রকট এব সন্ অন্যেষাং সূক্ষ্মমদৃশ্যং বহিরঙ্গভক্তানাঞ্চ মনোময়ং কথঞ্চিন্মনস্যেব গম্যং যদ্রূপং প্রকাশস্তদ্রূপেত্য।"

ইহার সার মর্ম্ম এই—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিতেছেন—"তোমার নিকটে বিদ্যমান এই আমি, শ্রীকৃষ্ণরূপ জীব—জগতের জীবনহেতু, কিম্বা বিশেষতঃ ব্রজবাসীদিগের জীবনহেতুভূত পরমেশ্বর। (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও জীব-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—জীবয়তি ইতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ)। আমার প্রাণতুল্য ঘোষের সহিত—ব্রজের সহিত—বিবর—অপ্রকটলীলা—হইতে, প্রসূতি—প্রকটলীলায় অভিব্যক্তি যাঁহার, তাদৃশরূপে, পুনর্ব্বার গুহায়—অপ্রকট-লীলায়—প্রবিষ্ট হই। কিরূপে কি করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন ? তাহা বলিতেছেন। মাত্রা—আমার চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল, আমার স্বর—ভাষা এবং গান প্রভৃতি, আমার বর্ণ—রূপ, এ সমস্তের সহিত সমন্বিত হইয়া স্ববিষ্ট—নিজ পরিজনগণের নিকটে প্রকটরূপ, অন্য সকলের নিকটে সূক্ষ্মরূপ (অদৃশ্যরূপ), আর বহিরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে মনোময়—কথঞ্চিদ্‌ভাবে মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এমন ভাবে যে রূপের অভিব্যক্তি, সেই রূপে—উক্ত লীলা সম্পাদনকারিরূপে।"

স্থূল তাৎপর্য্য হইতেছে এই—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি বিশেষরূপে ব্রজবাসিগণের জীবনস্বরূপ, আর ব্রজবাসিগণও আমার জীবনস্বরূপ। ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। আমি ব্রজের (ব্রজবাসীদের) সহিত অপ্রকটলীলা হইতে প্রকট-লীলায় আবির্ভূত হই ; তাঁহাদের সহিতই আবার প্রকট-লীলা হইতে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করি। প্রকট-লীলায় আমি যে রূপে বিহার করি, অপ্রকট-লীলাতেও অবিকল সেই রূপেই প্রবেশ করি। তখন আমার অবয়ব, ইন্দ্রিয়, ভাষা এবং রূপের কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। তখন বহিরঙ্গ লোকগণ আমাকে দেখিতে পায় না ; সাধকদের চিত্তে কখনও কখনও ঐ রূপের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয় ; কিন্তু আমার স্বীয় পরিকরগণ তাঁহাদের সাক্ষাতে এবং সঙ্গেই আমাকে দেখিতে পায়েন।"

ইহা হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রকট-লীলার পরিকরবৃন্দের সহিতই প্রকট-লীলায় ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েন এবং তাঁহাদের সহিতই আবার অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন।

## গ। প্রকাশভেদে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় পরিকরগণের বিদ্যমানতা।

প্রশ্ন হইতে পারে—অপ্রকট-লীলার পরিকরবৃন্দের সহিতই যদি শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালে কি অপ্রকট-লীলা বন্ধ থাকে ?

ইহার উত্তর এই ঃ—অপ্রকট-লীলা বন্ধ থাকে না, থাকিতে পারেও না। যেহেতু, অপ্রকট-লীলা যে প্রবাহরূপা, নিত্যা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উভয় লীলাই যুগপৎ চলিতে থাকে। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ। "এবং তত্তল্লীলাভেদেন একস্যাপি তত্তৎস্থানস্য প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবৎ। তদুক্তম্—বৃষ্ণঃ পরমং পদম্ অবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২ ॥—একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলাভেদে বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন, একই ধামেরও তেমনি লীলাভেদে বহু প্রকাশ হইয়া থাকে। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন; যথা, সর্ব্বাভীষ্ট-দাতা শ্রীহরির পরমস্থান বহুরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন (ঋগ্‌বেদসূক্ত)।" অন্যত্রও দেখা যায়—"ততশ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেষামেব প্রকাশভেদঃ। যদা চ প্রকাশভেদো ভবতি তদা তত্তল্লীলারসপোষায় তেষু তত্তল্লীলাশক্তিরেব অভিমানভেদং পরস্পরমননুসন্ধানং চ প্রায়ঃ সম্পাদয়তীতি গম্যতে। ✻✻। পরমেশ্বরত্বেন তৎশ্রীবিগ্রহপরিকরধামলীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধবৈভবপ্রকাশশীলত্বাৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬ ॥—সুতরাং দুই লীলাতেই (প্রকট এবং অপ্রকট লীলাতেই) শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার পরিকরগণেরও প্রকাশভেদ হইয়া থাকে— ইহাই জানা যাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক প্রকাশে প্রকটলীলায় এবং অপর এক প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় বিহার করেন, তাঁহার পরিকর গোপ-গোপীগণও তেমনি এক প্রকাশে প্রকটলীলায় এবং অপর এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় বিহার করেন। যখন প্রকাশভেদ হয়, তখন যে উভয়ধামগত লীলার রসপুষ্টির জন্য লীলাশক্তি সেই পরিকরগণের অভিমান-ভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধানও প্রায়শঃ সম্পাদন করিয়া থাকেন—ইহাও বুঝা যায় (অভিমানভেদ—যেমন, বৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে গোপীদিগের পরকীয়াভিমান; কিন্তু অপ্রকট-প্রকাশে—গোলোকে—স্বকীয়াভিমান। পরস্পরের অননুসন্ধান—যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের স্বকান্ত, অপ্রকট-প্রকাশে তাহা কৃষ্ণও জানেন, গোপীগণও জানেন; কিন্তু প্রকট-প্রকাশে তাহা তাঁহাদের কেহই জানেন না)। ✻✻। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর, লীলাদির একই সময়ে একই স্থানেও অনন্ত প্রকার বৈভব-প্রকাশে তিনি সমর্থ।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখন অপ্রকটধামেও তিনি এক স্বরূপে তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন; পরিকরদের এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-ধামে, আর এক স্বরূপ থাকেন প্রকট-ধামে।

নারদের উক্তিতে বৃহদ্‌ভাগবতামৃতও বলিয়াছেন যে—একই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুস্থানে বহু মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান, তদ্রূপ তাঁহার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্ষদগণও লীলার অনুরূপভাবে বহুস্থানে বহু মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। একই পার্ষদের এইরূপ বহুমূর্ত্তিতেও ঐক্যের হানি হয় না, যেমন একই ভগবানের বহুরূপ প্রকাশেও তাঁহার ঐক্যের হানি হয় না, তদ্রূপ।

"যথা হি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ।
বহুস্থানেষু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্ ॥ ২।৫।৫২॥
সর্ব্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ।
প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তোঽপ্যৈক্যং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ ॥২।৫।৫৪ ॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিভু বস্তু। তাঁহার ধামও বিভু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও তেমনি বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিকরগণও স্বরূপ-শক্তিময় বলিয়া লীলারসপুষ্টির জন্য, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা করিতেছেন। এই অনন্ত প্রকাশের কখনও কখনও কোনও এক

প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুসারে এই সকল পরিকরবর্গের মধ্যে লীলাপুষ্টির অনুকূল ভাবসকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। লঘুভাগবতামৃতেও এইরূপ কথা জানা যায়।

"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥
—লঘুভাগবতামৃতম্। কৃষ্ণামৃতম্॥ ৭১৫-১৬॥"

শাস্ত্রোক্তির আলোচনাপূর্ব্বক শ্রীজীবগোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৫৬ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

—"তত্র নানাক্রিয়াত্বধিষ্ঠানত্বাদেব লীলারসপোষায় তেষু প্রকাশেষু অভিমানভেদং পরস্পরমননুসন্ধানঞ্চ প্রায়ঃ স্বেচ্ছয়োরীকরোতীত্যপি গম্যতে। এবং তচ্ছক্তিময়ত্বাৎ তৎপরিকরেষ্বপি জ্ঞেয়ম্।—প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানত্বহেতু লীলারসপুষ্টির জন্য সেই প্রকাশসমূহে অভিমানভেদ এবং পরস্পরের অননুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছাতে স্বীকার করেন, ইহাও জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপশক্তিময় বলিয়া তাঁহারাও নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকটনে সমর্থ।" ইহার পরে শ্রীজীবগোস্বামী পরিকরগণের—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে বিদ্যমানতার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

প্রকট ও অপ্রকট-এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের—দাস, সখা, পিতামাতা এবং প্রেয়সী—এই সকল নিত্যপরিকরদের যুগপৎ-বিদ্যমানতার কথা পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও বলিয়াছেন।

"দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তুত্তুল্যগুণশালিনঃ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥৫২।৩-৪॥"

## ঘ। পরিকরবর্গের প্রকটনের ক্রম

পরিকরবর্গের প্রকটনের ক্রম হইতেছে এই যে, পরিকরদিগের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রত্বের এবং নিজেদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃত্বের অভিমান বিরাজিত, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই প্রকটিত করা হয়। তাহার পরে তাঁহাদের যোগে জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হয়েন।

"কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
প্রকট-লীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলা ক্রমে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।৩১৩-১৪॥"

প্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লোকবৎ লীলা করিয়া থাকেন। কোনও লোকের জন্মের পূর্ব্বেই যেমন তাহার পিতামাতার জন্ম ও বিবাহাদি হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি আত্ম-প্রকটনের পূর্ব্বেই মাতাপিতাদি গুরুবর্গের প্রকটন করিয়া থাকেন ; নচেৎ লৌকিকী লীলা সিদ্ধ হইতে পারে না।

তাহার পরে লৌকিকী লীলায় বয়সের ক্রম অনুসারে অন্যান্য পরিকরবর্গকেও তিনি আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। লৌকিকী লীলায় বয়সের ক্রম কিরূপে নির্ণীত হয়, তাহা দেখান হইতেছে।

অপ্রকট-লীলার অনাদিসিদ্ধ পরিকরদের বয়সের প্রশ্ন উঠিতে পারে না ; যেহেতু, তাঁহাদের জন্মাদি নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা একই রূপে বিরাজমান। তবে ভিন্ন ভিন্ন পরিকরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের অনুরূপ আকৃতি, প্রকৃতি ও ভাবাদি নিত্য বিদ্যমান। এইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি-ভাবাদির পার্থক্য, যে-বয়সের পার্থক্য সূচিত করে, সেই বয়স অনুসারেই প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের আবির্ভাবেরও পৌর্ব্বাপর্য্য হইয়া থাকে। অপ্রকটে যাঁহার মধ্যে পনর বৎসর বয়সের অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি, প্রকটে তাঁহার আবির্ভাবের পরে হইবে—অপ্রকটে যাঁহাতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতি, তাঁহার আবির্ভাব। প্রকট-লীলায় আবির্ভাব-সময় হইতেই বয়স গণনা করা হয় বলিয়া তাঁহাদের বয়সেরও পার্থক্য হইয়া থাকে।

## ১১৬। প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান

যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আবার সেই লীলাকে অপ্রকটিত—লোকনয়নের অগোচরীভূত—করেন। ইহাকেই বলে প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট-লীলাকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অথ সিদ্ধাসু নিজাপেক্ষিতাসু তত্তল্লীলাসু চ তত্র তত্র নিত্যসিদ্ধ-মপ্রকটত্বমেবোরীকৃত্য তাবপ্রকটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তন্নিজবৃন্দম-প্রত্যহমেবানন্দয়তীতি ॥ ১৭৪ ॥—অনন্তর স্বীয় অপেক্ষিত (অভীষ্ট) লীলাসমূহ সিদ্ধ হইলে, সেই সেই স্থানে (ব্রজ-দ্বারকাদিতে) নিত্যসিদ্ধ অপ্রকটত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক—অপ্রকট-লীলাকে (লীলাবিলাসীদিগকে) এবং অপ্রকট-প্রকাশকে (ধামের অপ্রকট প্রকাশকে) প্রকটলীলার (প্রকট-লীলাবিলাসীদিগের) এবং (ধামের) প্রকট-প্রকাশের সহিত একীভূত করিয়া—তথাবিধ (একীভূততাপ্রাপ্ত) নিজ পরিকরবৃন্দকে নির্ব্বিঘ্নে আনন্দ দান করেন।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান-সময়ে প্রকটধাম অপ্রকট-ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং প্রকট পরিকরগণ অপ্রকট-পরিকরবর্গের সঙ্গে (অর্থাৎ প্রকটলীলার নন্দ-যশোদা অপ্রকট-লীলার নন্দ-যশোদার সঙ্গে, প্রকটলীলার শ্রীরাধা অপ্রকট-লীলার শ্রীরাধার সঙ্গে, প্রকট-লীলার বসুদেব-দেবকী অপ্রকটের বসুদেব-দেবকীর সঙ্গে, ইত্যাদিরূপে) একীভূত হইয়া যায়েন।

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৫-অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন। ব্রজে দুইমাস অবস্থান করিয়া প্রকট

ব্রজলীলাকে অপ্রকট ব্রজলীলার সহিত একীভূত করিয়া তিনি এক প্রকাশে নন্দ-যশোদাদি পরিকরবৃন্দের সহিত অপ্রকট লীলায় গেলেন এবং আর এক প্রকাশে দ্বারকায় গেলেন ; কেন না, দ্বারকার প্রকট-লীলার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই।

নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, প্রকট-লীলাও তদ্রূপ অপ্রকট-লীলার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকট-লীলার পর্য্যবসানকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে নিবিষ্টচিত্ত পরিকরগণ অন্যবিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে দুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই দুই প্রকাশে তাঁহাদের অভিমানে এবং লীলাতে যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাও তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না। উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান তাঁহাদের না থাকাতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবাবিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭৭॥"

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—অপ্রকট-লীলায় ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্বকীয়াভাব ; কিন্তু প্রকট-লীলায় পরকীয়াভাবের অভিমানে সেই স্বকীয়াভাব আচ্ছাদিত। এই অবস্থায়, প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধান-সময়ে গোপীগণের অপ্রকট প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশ যখন একীভূত হইয়া যায়, তখন স্বকীয়াভাবের সহিত পরকীয়াভাবের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শাস্ত্রপ্রমাণের সহায়তায় শ্রীজীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন—গোপীদিগের স্বকীয়াভাবেই প্রকট-লীলার পর্য্যবসান ; তখন পরকীয়াভাবের আবরণ অপসারিত হইয়া যায়, থাকে কেবল স্বকীয়াভাব। সুতরাং এই স্বকীয়াভাব লইয়াই গোপীগণ তাঁহাদের অপ্রকট.প্রকাশের সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। স্বকীয়াভাবের সহিতই স্বকীয়াভাবের ঐক্য হয় ; তাহাতে কোনরূপ বিরোধের আশঙ্কা থাকে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ধামের অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশের, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশের এবং পরিকরবৃন্দের স্ব-স্ব-অপ্রকট-প্রকাশের সহিত স্ব-স্ব-প্রকট-প্রকাশের মিলন বা একীভূততাই অন্তর্দ্ধান।

## ১১৭। প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের পরে পরিকরদের মনোভাব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের সময়ে এবং তাহার পরেও অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে পরিকরদের কোনও অনুসন্ধান বা জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা মনে করেন—বরাবর তাঁহারা এক স্থানেই ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে ? প্রকটলীলার সংস্কারই কি তাঁহাদের চিত্তে বলবান্ থাকে ? শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৮২-অনুচ্ছেদে) এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

অপ্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে নিত্যই ব্রজে, দ্বারকায় এবং মথুরায় তাঁহার পরিকরদের সহিত বিদ্যমান্ থাকেন। সুতরাং অপ্রকটে ব্রজ হইতে দ্বারকা-মথুরাদিতে গমনাগমন নাই। কিন্তু প্রকটে তাহা আছে এবং প্রকটে গমনাগমন আছে বলিয়া মিলনের পরে বিয়োগ এবং বিয়োগের পরে আবার মিলনও আছে ; বিয়োগ-কালে পরিকরদের তীব্র বিরহ-যন্ত্রণাও আছে। আবার বিয়োগের

পরের মিলনে উন্মাদনাময় আনন্দও আছে। বিয়োগান্ত-মিলনে উন্মাদনাময় আনন্দের মধ্যেও পূর্ব্ব-বিরহের কথা মনে জাগে। তাই, প্রকটলীলাগত ভাবই নিত্যমিলনময় অপ্রকট-লীলাগত ভাব অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ বিরহের পরে ( অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন, মথুরা হইতে দ্বারকায় গমন, দ্বারকা হইতে অন্যান্য স্থানে গমনে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে ) দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া ব্রজবাসীদের আনন্দসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই উচ্ছ্বসিত-তরঙ্গ আনন্দসমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত অবস্থাতেই তাঁহারা অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিলেন। তখনও তাঁহাদের মনে প্রকটলীলার সংস্কার বিদ্যমান্। এই সংস্কার লইয়াই তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন। লীলাভূমির এক প্রকাশ হইতে অন্য প্রকাশে আগমনের জ্ঞান যখন তাঁহাদের নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার যে সংস্কার বা মনোগত ভাব লইয়া তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন, অপ্রকট-প্রকাশেও তাঁহাদের চিত্তে সেই ভাবই বর্ত্তমান থাকে। "তত্র প্রকটলীলাগতভাবস্য বিরহসংযোগাদিলীলাবৈচিত্রীভরবাহিত্বেন বলবত্তরত্বাৎ উভয়লীলৈক্যভাবানন্তরমপি তন্ময়স্তেষামভিমানোঽনুবর্ত্তত এব ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৮২॥"

প্রকটলীলার সংস্কারই তাঁহাদের চিত্তে বিদ্যমান থাকে বলিয়া প্রকট-লীলার ব্যাপার-সমূহই তাঁহাদের মনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা, জন্মের পরে পূতনাদি অসুরগণের উৎপাতের কথা, তাঁহাদের উৎপাত হইতে শ্রীকৃষ্ণের অব্যাহতিলাভের কথা, অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের কথা, মথুরা হইতে দ্বারকায় ও অন্যান্য স্থানে গমনের কথা, কুরুক্ষেত্রে একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনের কথা এবং সে-বার শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের আক্ষেপের কথা, তাহার পরে সুদীর্ঘকালব্যাপী বিরহের পরে দন্তবক্র-বধান্তে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনের কথা—এই সমস্তই একে একে তাঁহাদের মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া আর কোথাও যায়েন নাই, তাঁহাদের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছেন—ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজভূমির অন্য এক ( অর্থাৎ প্রকট ) প্রকাশে এই সমস্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মনে জাগে না। তাঁহারা মনে করেন—যে স্থানে তাঁহারা বর্ত্তমান, সেই স্থানেই পূর্ব্বে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

ঐরূপ প্রকটলীলানুগত সংস্কারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃত্বাভিমানী পরিকর নন্দ-যশোদাও মনে করেন —শ্রীকৃষ্ণ—যিনি স্বরূপতঃ অজ, নিত্য, অনাদি এবং সকলের আদি পরব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদেরই আত্মজ সন্তান। এই জ্ঞান তাঁহাদের বাৎসল্য-সমুদ্রকেও নিয়ত উচ্ছ্বসিত—তরঙ্গায়িত—করিতে থাকে।

দ্বারকা-মথুরাদি-লীলার অন্তর্দ্ধানের পরে দ্বারকা-মথুরাদি ধামের পরিকরদের চিত্তেও দ্বারকা-মথুরাদি-ধামের প্রকট-লীলার সংস্কারই দেদীপ্যমান থাকে।

## ১১৮। স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা

অপ্রকট-লীলার দুইটী ভেদ আছে—স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী। "তত্রাপ্রকটা দ্বিবিধা। মন্ত্রোপাসনাময়ী স্বারসিকী চ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৫৩॥"

**ক। স্বারসিকী লীলা।** পূর্ব্বে ১।১।১১৩(২)-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—অপ্রকট-লীলা প্রবাহরূপা, আদিমধ্যাবসানহীনা, নানাবৈচিত্রীময়ী। ইহার মধ্যে বহু লীলা আছে। প্রবাহরূপা অপ্রকট-লীলার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন লীলা একই স্থানে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। এক লীলার পরে আর এক লীলা, তাহার পরে আর এক লীলা—ইত্যাদি ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং অপ্রকট-লীলা সামগ্রিক ভাবে প্রবাহরূপা এবং আদিমধ্যাবসানহীনা হইলেও তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন লীলার আদি, মধ্য এবং অবসান আছে। এই প্রবাহরূপা লীলাই স্বারসিকী লীলা। ইহা স্বেচ্ছাময়ী এবং যথাবসরে অনুষ্ঠিতা। "যথাবসর-বিবিধ-স্বেচ্ছাময়ী স্বারসিকী ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১৫৩॥" শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ-বৈচিত্র্যময় লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার লীলাশক্তিই যথাযথ সময়ে যথাযথলীলা প্রকটিত করেন। ব্রহ্মসংহিতায় এই স্বারসিকী লীলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।২৯॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা মণ্ডিত এবং চিন্তামণিসমূহদ্বারা বিরচিত গৃহসকলে যিনি শত সহস্র লক্ষ্মী ( গোপসুন্দরী )-গণকর্ত্তৃক সাদরে সেব্যমান হইতেছেন এবং যিনি সুরভীগণকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।"

সুরভী—গাভী—দিগকে যখন পালন করেন—অর্থাৎ তাহাদিগকে বনে লইয়া যায়েন, নানাস্থানে তৃণভোজন করান, পুনরায় গৃহে আনয়ন করেন—শ্রীকৃষ্ণ তখন—ঠিক গোচারণাদির সময়েই—গোপীদিগের সেবা গ্রহণ করেন না। গোচরণাদিও করেন, অবসরমতে ভিন্ন স্থানে—চিন্তামণিখচিত গৃহাদিতে—গোপীদিগের সেবা গ্রহণ করেন। এইরূপে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলায় বিলসিত হয়েন।

"কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৫৬॥

—বৃন্দাবনে সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখীরূপা, চিদানন্দই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য এবং চিদানন্দবস্তুও পরম-আস্বাদ্য।

এ-স্থলেও গান, নৃত্য, বংশীধ্বনির সহায়তায় গোপীগণের আকর্ষণাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ-সমস্ত যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয় না, যথাবসরে এবং যথাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই শ্লোকও স্বারসিকী লীলার প্রমাণ।

অহোরাত্রব্যাপী অষ্টপ্রহর সময়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কখনও বা শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্যরস আস্বাদন করিতেছেন, কখনও বা সখাদের সঙ্গে গো-চারণ-লীলা, কখনও বা সখাগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বিবিধ-বৈচিত্রীময়

খেলা-ধূলা, কখনও বা যমুনাতে জলকেলি, কখনও বা বংশীস্বরে গোপসুন্দরীদিগকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানাবিধ লীলা, কখনও বা রাসস্থলীতে রাসলীলা, কখনও বা কুঞ্জক্রীড়াদি—ইত্যাদি ভাবে প্রতিদিন নানাস্থানে নানা সময়ে নানাবিধ লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নানাবিধ বৈচিত্রীময়ী লীলার সমবায়ে এক লীলাপ্রবাহ যেন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে অবিরাম গতিতে চক্রাকার পথে ধাবিত হইতেছে। ইহাই স্বারসিকী লীলা। "তত্র নানালীলারসপ্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥"

শ্রীজীব বলেন---ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরাদিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রকট-ব্রজপরিকরদের উৎকট বিরহ-যন্ত্রণার সময়ে বৃন্দাবনধামের এক প্রচ্ছন্ন প্রকাশে নিত্য সংযোগময়ী প্রবাহরূপা লীলা চলিতে থাকে। পরিকরবৃন্দ তাহাও অনুভব করেন ; কিন্তু প্রকট-তীব্রবিরহের আবেশে তাহাকে স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। উদ্ধবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন, সেই সংবাদের বাহিরের যথাশ্রুত অর্থ অন্যরূপ হইলেও ভিতরের নিগূঢ় অর্থ এই যে—প্রকট-বিরহ-দুঃখময়ী লীলার পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন প্রকাশে সংযোগময়ী স্বারসিকী লীলা চলিতেছে ; সুতরাং ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব বিরহ নাই। উদ্ধব-সংবাদের কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন ( শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ১৫৪-৭১-অনুচ্ছেদে )।

**খ। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা।** বিবিধ উপাসনা-মন্ত্রে এই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার কথা জানা যায়। দু'একটী মন্ত্রের আলোচনা করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গে উপাসকের ধ্যেয় বস্তুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্।
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্।
কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥ ইতি॥

—ব্রহ্মা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ, মেঘাভ, তরুণ ( কিশোর ), কল্পদ্রুমাশ্রিত। সৎপুণ্ডরীক-নয়ন, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৈদ্যুতাম্বর ( পীতাম্বর ), দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালী, ঈশ্বর, গোপ-গোপাঙ্গনা-পরিবৃত, কল্পবৃক্ষ-তলস্থিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, রত্নপঙ্কজ-মধ্যস্থিত, কালিন্দী-জলতরঙ্গ-স্পর্শি-বায়ু দ্বারা সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

এ-স্থলে ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং বেশ-ভূষাদির বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে, তিনি যমুনার তটবর্ত্তী কল্প-বৃক্ষের নিম্নে একটী রত্ন-পঙ্কজের কর্ণিকায় অবস্থিত ; তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোপ-গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। এতাদৃশ লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের উপদেশ করা হইয়াছে। নিত্যবস্তুরই ধ্যান হয় ; অনিত্য

বস্তুর ধ্যানের সার্থকতা এবং পুরুষার্থতা নাই। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত রূপ এবং বেশ-ভূষণাদি নিত্য; যমুনাতীরবর্ত্তী যে কল্পদ্রুমের তলদেশে তিনি অবস্থিত, তাহাও নিত্য; যে রত্নপঙ্কজের কর্ণিকায় তিনি দণ্ডায়মান, তাহাও নিত্য; তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত গোপ-গোপাঙ্গনাগণও নিত্য। এইভাবে তিনি সেই স্থানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে গোপ-গোপাঙ্গনাদিগের সঙ্গে লীলা করিতেছেন। ইহাতে একই স্থানে, একই বেশভূষায়, একই পরিকরবৃন্দের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্না একটী লীলার কথা জানা যাইতেছে। উপাসক নিত্য এই লীলার ধ্যান করিবেন—এইরূপ উপদেশের কথাও জানা যাইতেছে।

বৌধায়ন-কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—"হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে তত ইত্যাত্মনন্তরং গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্ গবাং মধ্যে স্থিতং শুভম্। বর্হাপীড়কসংযুক্তং বেণুবাদনতৎপরম্॥ গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বন্যপুষ্পাবতংসকমিতি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৫৩-অনুচ্ছেদে ধৃত প্রমাণ॥—গোবিন্দের প্রীত্যর্থে পূর্ব্বের ন্যায় হোম করিবে। ( ইহার পরে বলা হইয়াছে ) গোবিন্দকে মনে মনে ধ্যান করিবে। ( এইরূপে ধ্যান করিবে )—তিনি গোগণমধ্যে অবস্থিত, শুভ, ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াসমন্বিত, বেণুবাদন-তৎপর, গোপীজনে পরিবৃত, বনফুলে তাঁহার অবতংস ( শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণ ) রচিত।"

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের একটী রূপের এবং লীলার ধ্যানের কথা পাওয়া গেল। এই রূপ এবং লীলাও নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত গোপালতাপনী-শ্রুতিবিহিত রূপ এবং লীলা হইতে ভিন্ন।

ক্রমদীপিকায় এবং ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থেও উপাসকের ধ্যেয় বিভিন্ন রূপ এবং লীলার কথা পাওয়া যায়। এই সমস্ত লীলার প্রত্যেকটীরই একই স্থানে এবং একই রূপে নিত্য-নিরবচ্ছিন্না অবস্থিতি। এইরূপ লীলাই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা।

উপাসনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিহিত নহে। সর্ব্বদাই উপাসনা করিবে—ইহাই শাস্ত্রের বিধান। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।৫-ধৃত পাদ্মোত্তরবচনম্॥—সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করা কর্ত্তব্য; কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই দুইটী বিধি-নিষেধের অধীন।" বিষ্ণুর স্মরণ বা ধ্যান হইতেছে স্বীয় উপাস্য লীলাবিলাসী ভগবানের স্মরণ বা ধ্যান। ইহাই সাধকের উপাসনা। সকল সময়েই যখন উপাসনার ব্যবস্থা, তখন উপাস্য বা ধ্যেয় লীলারও সকল-সময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতির প্রয়োজন। ইহাতেই বুঝা যায়—উপাসনার মন্ত্রাদিতে যে লীলার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইবে নিত্যা—নিরবচ্ছিন্না। মন্ত্রের উপাসনায় এই জাতীয় লীলার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় লীলাকে বলা হয় মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা।

উপাসনা-মন্ত্রের বিভিন্নতা অনুসারে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও অনেক। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যরস-আস্বাদনী লীলা, গোচারণাদি লীলা, রাসলীলা-কুঞ্জক্রীড়াদি লীলা—সমস্ত রকমের লীলাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসকের ধ্যেয় রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

### গ। স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার পার্থক্য

( ১ ) স্বারসিকী লীলা সামগ্রিক ভাবে বহুস্থানব্যাপিনী; কিন্তু মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা নিত্য-

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মাত্র একটী স্থানব্যাপিনী। "ক্রীড়াশব্দস্ত বিহারার্থত্বাদ্ বিহারস্ত নানাস্থানানুসরণরূপত্বাদ্ একস্থান-নিষ্ঠায়া মন্ত্রোপাসনাময়্যা ভিন্নতে ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৫৩ ॥"

(২) স্বারসিকী লীলাতে যথাক্রমে বহু লীলার সমাবেশ; কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে কেবলমাত্র একটী লীলা। "তত্র নানালীলাপ্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব। একৈকলীলাত্মতয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবহ্রদশ্রেণিরিব জ্ঞেয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৫৩॥—নানা-লীলা-প্রবাহরূপা বলিয়া স্বারসিকী গঙ্গাসদৃশা; আর এক একটী লীলাবিশিষ্টা বলিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা গঙ্গাপ্রবাহ-সম্ভূত হ্রদশ্রেণীর তুল্যা।"

(৩) বিভিন্ন মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে যে সমস্ত লীলা আছে, সামগ্রিকী স্বারসিকী লীলাতেও সেই সমস্ত লীলাই আছে। পার্থক্য এই যে, স্বারসিকী লীলার অন্তর্ভুক্ত তত্তল্লীলার প্রত্যেকটীরই আদি, মধ্য ও অবসান আছে; কিন্তু কোনও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারই আদি, মধ্য ও অবসান নাই; প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাই নিত্য-নিরবচ্ছিন্না।

ইহাতে বুঝা যায়, স্বারসিকী লীলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লীলাও শ্রীবৃন্দাবনের বহু স্থানে বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপে প্রকাশ পাইতেছে; কোনও প্রকাশে নিত্য গোচারণ-লীলা, কোনও প্রকাশে নিত্য রাসলীলা, কোনও প্রকাশে নিত্য কুঞ্জলীলা—ইত্যাদি। নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন কুঞ্জক্রীড়ার কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দৃষ্ট হয়। "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে ॥ ২।৮।১৪৮ ॥"

## ১১৯। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারও স্বারসিকী লীলাতে পর্য্যবসান সম্ভব

নিত্য গতিশীলা বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী স্বারসিকী লীলাকে গতিময়ী গঙ্গার সঙ্গে এবং নিত্য স্থিতিশীলা বলিয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে নিত্যস্থিতিশীল হ্রদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হ্রদ স্বারসিকী লীলারূপা গঙ্গা হইতেই উদ্ভূত। ইহার তাৎপর্য্য এই। এমনও দৃষ্ট হয় যে, কোনও কোনও নদী স্বীয় গতিপথে কোনও স্থানে হ্রদরূপে পরিণত হয় এবং হ্রদরূপে পরিণত হইয়াও আবার স্বীয় গতিপথে অগ্রসর হয়; হ্রদ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। আবার ঐ হ্রদের ভিতর দিয়াই নদীর পরবর্ত্তী স্রোতঃও প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপে হ্রদটী নদী হইতে উদ্ভূত হইয়াও নদীর অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। যেমন যমুনামধ্যস্থিত কালীয় হ্রদ। তদ্রূপ, স্বারসিকী লীলারূপ প্রবাহও স্বীয় গতিপথে নিজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লীলারূপ হ্রদে পরিণত হয় এবং স্বীয় চক্রাকার পথে এই সমস্ত হ্রদের ভিতর দিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়। স্বারসিকী লীলার প্রবাহ হ্রদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, হ্রদ থাকিয়া যায়। এইরূপে হ্রদরূপা লীলাগুলিও প্রবাহরূপা স্বারসিকী হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারই অঙ্গীভূত রূপে অবস্থান করে। কিন্তু প্রবাহরূপা স্বারসিকী লীলা গতিশীলা এবং হ্রদরূপা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতিশীলা। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—স্বারসিকী লীলা অবস্থিত—বৃন্দাবনের এক প্রকাশে এবং প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা অবস্থিত—বৃন্দাবনের আর এক প্রকাশে। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাপরিকরগণ স্বারসিকী লীলাতে যেমন এক প্রকাশে যথা সময়ে যথাযথ ভাবে বর্ত্তমান, প্রতি মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই

মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার পরিকরগণ ভিন্ন এক প্রকাশে তেমনি নিত্য বর্ত্তমান। সময় বিশেষে এই উভয় প্রকাশ ঐক্য প্রাপ্তও হয়। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। যেমন, মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা। এক প্রকাশে ইহা নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাসলীলার পরিকরগণও প্রকাশভেদে বর্ত্তমান। স্বারসিকীর অন্তর্ভুক্ত রাসলীলার সময়ে স্বারসিকী লীলার প্রবাহ এই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হ্রদেই প্রবেশ করিবে। তখন স্বারসিকী রাসলীলা এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা—এই উভয়ই সাময়িক ভাবে ঐক্য প্রাপ্ত হইবে; নদী হ্রদে প্রবিষ্ট হইলে উভয়ের জল যেমন ঐক্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। তারপর স্বারসিকী রাসলীলার যখন অবসান হইবে, তখন স্বারসিকীর প্রবাহ অন্য লীলায় প্রবেশ করিবে; মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলা পৃথক্ ভাবে থাকিয়া যাইবে—অর্থাৎ তখন তাহাদের ঐক্যভাব আর থাকিবে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—সাধকের মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার ধ্যানও স্বারসিকী লীলার ধ্যানে পর্য্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন—যিনি মন্ত্রোপাসনাময়ী রাসলীলার উপাসক, তিনি স্থিতিশীল রাসলীলার—হ্রদরূপা রাসলীলার—ধ্যান করিবেন। স্বারসিকী লীলার প্রবাহ যখন রাসলীলার হ্রদে প্রবেশ করিবে, তখন উভয় লীলা-প্রকাশের ঐক্য সাধিত হইবে এবং স্বারসিকী রাসলীলার অবসান হইলে স্বারসিকীর প্রবাহ যখন স্বীয় গতিপথে অগ্রসর হইবে, তখন সাধকের চিত্তও সেই প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে পারে—হ্রদস্থিত ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন নদীর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া হ্রদ হইতে বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ।

সাধারণতঃ সাধকের উপাসনা আরম্ভ হয় মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে আশ্রয় করিয়া। তাঁহার চিত্তের অবস্থা-বিশেষের আবির্ভাবে তাঁহার উপাসনাও স্বারসিকী লীলার আশ্রয়ে অগ্রসর হইতে পারে।

# দ্বাদশ অধ্যায়

## ( পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্ব )

### ১২০। পরব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপ। আনন্দমীমাংসা।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে আনন্দ বা আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। যে-ই ব্রহ্ম, সে-ই আনন্দ ; যে-ই আনন্দ, সে-ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দে সর্ব্ববৃহত্তমত্ব বুঝায়। আনন্দরূপেও ব্রহ্ম সর্ব্ববৃহত্তম।

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপ কিরূপ, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন।

"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ॥ স একো মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৄণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৄণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ॥ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামনন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ॥ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণঃ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য॥ —তৈত্তিরীয়োপনিষৎ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৮॥"

**মর্ম্মানুবাদ।** "ইহাই আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের স্বরূপ-নির্ণয়সম্বন্ধে বিচার হইতেছে।"

ব্রহ্মের যে আনন্দ, তাহার সম্যক্ স্বরূপ-নির্ণয় সম্ভব নহে। সেই আনন্দের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার বস্তুও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে নাই ; সুতরাং প্রাকৃত জীবের অনুভবগম্য কোনও বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া সেই আনন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টাও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তথাপি, এই ব্রহ্মাণ্ডে লোক যে আনন্দ অনুভব করে, কিম্বা যে আনন্দের জন্য তাহার লোভ জন্মে, সেই আনন্দের কথা বলিয়া তাহা অপেক্ষাও অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময় যে ব্রহ্মানন্দ, তাহাই জানাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই পৃথিবীতে লোককে বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যাদি নানা অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে যৌবনেই সুখভোগের লালসা যেমন বলবতী হয়, সুখভোগের সামর্থ্যও থাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বার্দ্ধক্যাদিতে সুখভোগের লালসা থাকিলেও সামর্থ্য বেশী থাকে না। তাই যৌবনের সুখের কথাই প্রথমে বলা হইয়াছে। যৌবনেও যদি কেহ রুগ্ন বা ক্ষীণশক্তি হয়, তাহা হইলেও সে-ব্যক্তি অভীষ্ট সুখভোগে

সমর্থ হয় না। তাই এতাদৃশ যুবকের সুখকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। আবার রোগহীন এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াও কেহ যদি অসাধু বা অসচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে তাহারও সুখভোগে অনেক বিঘ্ন জন্মিতে পারে; তাই তাহার সুখকেও বিচারের মধ্যে ধরা হয় নাই। সুস্থ, সবল এবং সাধু হইলেও কোনও যুবক যদি শাস্ত্রবেত্তা না হয় এবং শাস্ত্রানুশাসনের অধীন না থাকে, তাহা হইলেও রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে তাহার পক্ষেও নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগ সম্ভব নহে। এজন্য এতাদৃশ যুবকের সুখকেও বিচারের মধ্যে ধরা হয় নাই। যে যুবক দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, সাধু এবং শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রানুশাসনের অধীন বলিয়া যিনি শাস্ত্রোপদেষ্টাও, তাঁহার মধ্যেই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকিতে পারে এবং সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বশতঃ তিনি বিমল পার্থিব আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। এতাদৃশ যুবকের মধ্যেও এই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য সুখভোগের সৌভাগ্য যাঁহার হয়, তাঁহার সুখকেই নিম্নতম স্তরের সুখ মনে করিয়া বিচার আরম্ভ করা হইয়াছে। এইরূপ আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

"যিনি বয়সে যুবক এবং সাধু, শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রোপদেষ্টা, শাস্ত্রীয় আচার-পালন-পরায়ণ, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, ধনপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী যদি তাঁহার আয়ত্তে থাকে, অর্থাৎ তিনি যদি এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েন (ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য পার্থিব সুখ), তাহা হইলে তাঁহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যের পক্ষে একটী পূর্ণ আনন্দ। তাঁহার আনন্দের শতগুণ-পরিমিত যে আনন্দ, তাহাই হইতেছে মনুষ্য-গন্ধর্ব্বগণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

যাঁহারা মনুষ্য হইয়া কর্ম্মের ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব বলা হয়। তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তি আছে। তাঁহারা নিজেদিগকে অদৃশ্যও করিতে পারেন। তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদিও সূক্ষ্ম; সুতরাং কোনও কার্য্যসাধনে তাঁহাদের বাধাবিঘ্নও খুব কম। বিশেষতঃ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্ট। সুখ-সাধনে বাধাবিঘ্নের প্রতিকারে সমর্থ বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত-প্রসাদ এবং চিত্ত-প্রসাদজনিত প্রচুর পরিমাণে সুখভোগও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এজন্য তাঁহাদের আনন্দ মানুষ-আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী—মানুষ-আনন্দের শতগুণ।

অকামহত-শ্রোত্রিয়-শব্দের তাৎপর্য্য। কল্পসূত্রের সহিত, কিম্বা ছয়টী বেদাঙ্গের সহিত যিনি বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যিনি ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত, সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিপ্রকে বলে **শ্রোত্রিয়**। "একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" যাঁহাদের চিত্তে স্থূল-বিষয়ভোগজনিত স্থূল-সুখ-ভোগের বাসনা নাই, তাঁহারা অকামহত। বিষয়ের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুসারে বিষয়োত্থ সুখেরও উৎকর্ষ-অপকর্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং স্থূল-বিষয়োত্থ সুখভোগের বাসনা যতই ক্ষীণ হইবে, সুখের উৎকর্ষও ততই বৃদ্ধি পাইবে। অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের আনন্দ বা সুখও মানুষানন্দের শতগুণ।

"আবার, মনুষ্য-গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দের শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগন্ধর্ব্বদিগের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

যাঁহারা জাতিতেই গন্ধর্ব্ব, তাঁহাদিগকে দেব-গন্ধর্ব্ব বলে।

"আবার, দেব-গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দের শতগুণিত যে আনন্দ, তাহা হইতেছে চিরলোকাধিষ্ঠিত পিতৃগণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

অগ্নিস্বাত্তা-প্রভৃতি পিতৃগণ যে লোকে (স্থানে) থাকেন, তাহা দীর্ঘকাল—কল্পকাল—পর্য্যন্ত স্থায়ী। এজন্য পিতৃগণকে চিরলোক-লোক (দীর্ঘকালস্থায়ী লোকের অধিবাসী) বলা হইয়াছে।

"আবার চিরলোকবাসী পিতৃগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে আজানজ-দেবগণের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়গণের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

আজান-শব্দের অর্থ—দেবলোক বা স্বর্গ। সেই আজানে (স্বর্গে) যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা আজানজ। স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলেই আজানে বা স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম হয়।

"আবার আজানজ-দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে কর্ম্মদেব-দেবগণের—যাঁহারা বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের—এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। এই কর্ম্মদেব-দেবগণের যে আনন্দ, তাঁহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

পূর্ব্বে আজানজ-দেব এবং কর্ম্মদেব-দেবের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে কেবল "দেব" বলা হইতেছে। আজানজ-দেবের এবং কর্ম্মদেব-দেবের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে কেবল "দেব"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বলা হইতেছে। এ-স্থলে "দেব"-শব্দে যজ্ঞীয়-আহুতিভোজী দেবতাগণকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদের সংখ্যা তেত্রিশ—আটজন বসু, এগারজন রুদ্র, বারজন আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। ইন্দ্র হইতেছেন ইঁহাদের অধিপতি বা রাজা; আর বৃহস্পতি হইতেছেন ইঁহাদের আচার্য্য বা গুরু। প্রজাপতি হইতেছেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।

"আবার, যজ্ঞাহুতিভোজী দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। ইন্দ্রের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে দেবগুরু-বৃহস্পতির এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। আবার বৃহস্পতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত হইতেছে প্রজাপতির এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ। আবার প্রজাপতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ-পরিমিত আনন্দ হইতেছে ব্রহ্মের এবং অকামহত-শ্রোত্রিয়ের একটী পূর্ণ আনন্দ।"

উক্ত-শ্রুতিবাক্যে "শত"-শব্দটীর তাৎপর্য্য হইতেছে—"বহু"। শতগুণ—বহুগুণ। সর্ব্বশেষ "শত"-শব্দটী অনন্তবাচী। ব্রহ্মের আনন্দ হইতেছে—প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা শতগুণে—অনন্তগুণে—অধিক। ব্রহ্ম যেমন অনন্ত, তাঁহার আনন্দও তেমনি অনন্ত। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী॥৯॥—ব্রহ্মের আনন্দ এতই নিরতিশয় যে, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর;

বাক্য তাহার ইয়ত্তা পায় না, মনও তাহার ইয়ত্তা পায় না। ব্রহ্মের এতাদৃশ নিরতিশয় আনন্দকে যিনি জানেন, কোথা হইতেও তাঁহার আর ভয় থাকে না।”

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রজাপতির আনন্দই সর্ব্বাতিশায়ী। মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শতগুণিত আনন্দের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করিয়া পর্য্যবসান করা হইয়াছে—প্রজাপতির আনন্দে। প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের কথা লোকের ধারণার অতীত। তাই, দিগ্‌দর্শনরূপে প্রজাপতির আনন্দের উৎকর্ষ দেখাইয়া সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষাও শতগুণে—অনন্তগুণে—অধিক। ইহাই **আনন্দমীমাংসা**।

মানুষানন্দের পর হইতে আনন্দের সকল স্তরেই “অকামহত শ্রোত্রিয়ের” আনন্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—মানুষানন্দের পরবর্ত্তী স্তর হইতে ক্রমশঃ উৎকর্ষময় যতগুলি আনন্দস্তর আছে, সকল স্তরের আনন্দই “অকামহত শ্রোত্রিয়ের” উপভোগ্য। ইহাও বুঝা যায় যে—আনন্দের যেমন ক্রমশঃ উৎকর্ষময় বিভিন্ন স্তর আছে, তেমনি “অকামহতত্বেরও” বিভিন্ন স্তর আছে। স্থূলকামনার বিভিন্ন আবরণ যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যাইতেছে; তাহা যতই অপসারিত হইবে, শ্রোত্রিয়ের পক্ষে ততই অধিকতর উৎকর্ষময় আনন্দ উপভোগের সামর্থ্য জন্মিবে। প্রজাপত্যানন্দের স্তরে আসিলে তাঁহার স্থূলকামনাদি সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইবে, তখন তিনিও প্রজাপত্যানন্দ উপভোগের অধিকারী হইবেন।

কিন্তু মানুষানন্দ হইতে প্রজাপত্যানন্দ পর্য্যন্ত সমস্ত আনন্দই প্রাকৃত; যেহেতু, প্রজাপতিলোক—সত্যলোকও—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যেমন অল্প—সীমাবদ্ধ, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত আনন্দও তেমনি অল্প—সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা আনন্দও নহে; যেহেতু, আনন্দ বস্তুটী হইতেছে ভূমা। “ভূমৈব সুখম্।” অল্প বা সীমাবদ্ধ বস্তুতে—সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে—ভূমাস্বরূপ সুখ বা আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে না। “নাল্পে সুখমস্তি।”

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ নহে, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসুর-ভীতি আছে; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি যিনি লাভ করেন, তাঁহার ভয়ের আর কোনও কারণ থাকে না। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি। আনন্দবল্লী। ৯॥”

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যাহাকে আনন্দ বা সুখ বলা হয়, তাহা হইতেছে স্বরূপতঃ সত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদ; ইহা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিভূত আনন্দ নহে; ইহা হইতেছে সত্ত্বগুণের একটী বৃত্তি। মায়িক-সত্ত্বগুণের এই বৃত্তিকেই হ্লাদকরী বৃত্তি বলে।

“হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।১২।৬৯ ॥

—( হে ভগবন্ ) তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই ত্রিবিধ বৃত্তিময়ী স্বরূপশক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত ( কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে )। আর, হ্লাদকরী ( মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী ), তাপকরী ( মানসিক তাপদায়িনী তামসিকী ) এবং ( সুখজনিত চিত্ত-প্রসন্নতা এবং

দুঃখজনিত তাপ, এই উভয়ে ) মিশ্রা ( বিষয়জন্যা রাজসী )—এই তিনটী শক্তি তোমাতে নাই ; যেহেতু তুমি ( প্রাকৃত )-গুণবর্জ্জিত ; কিন্তু জীবে আছে।” ( শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ )।

এই হ্লাদকরী সাত্ত্বিকীবৃত্তিই হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম প্রাকৃত সুখের হেতু। রজঃ ও তমোগুণ যতই অপসারিত হইবে, সত্ত্ব ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং সত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসাদও ততই অধিকরূপে অভিব্যক্ত হইবে। ইহাই প্রাকৃত সুখের ক্রম-অভিব্যক্তি। প্রজাপত্যানন্দে রজস্তমের সম্যক্ নিরসনবশতঃ সত্ত্বের চরমতম ঔজ্জ্বল্য এবং তজ্জন্য প্রাকৃত সুখেরও চরমতম বিকাশ, অকামহতত্বেরও চরমতম বিকাশ।

এইরূপে দেখা গেল—প্রজাপত্যানন্দও স্বরূপতঃ আনন্দ নহে। ইহা হইতেছে চিত্ত-প্রসাদের চরমতম অভিব্যক্তি। কিন্তু পরব্রহ্মে মায়া—সুতরাং মায়িক সত্ত্বগুণ—নাই বলিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত আনন্দ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মানন্দ হইতেছে হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি—সুতরাং চিন্ময়, জড়বিরোধী। আর, প্রজাপত্যানন্দও প্রাকৃত বলিয়া চিদ্‌বিরোধী—জড়। সুতরাং ব্রহ্মের আনন্দ এবং প্রজাপতির আনন্দ—এই দুইটী বস্তু স্বরূপতঃই পরস্পর বিজাতীয়। ইহা হইতেও প্রজাপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মের আনন্দের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইতেছে। জাতিতেই ব্রহ্মানন্দের পরমতম উৎকর্ষ। আর পরিমাণগত উৎকর্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পরিমাণে এবং জাতিতেও ব্রহ্মের আনন্দ চরমতম-উৎকর্ষময়। পরিমাণগত উৎকর্ষ—অসীমত্ব, পরিমাণহীনতা। আর জাতিগত উৎকর্ষ—জড়বিরোধিত্ব, চিন্ময়ত্ব, পরমতম আস্বাদ্যত্ব। ইহাই আনন্দের মীমাংসা।

ব্রহ্মের আনন্দের সঙ্গেও “অকামহত শ্রোত্রিয়ের” কথা বলা হইয়াছে। এই স্তরে “অকামহতত্বে”-সত্ত্বগুণজাত কামনারও চরম তিরোভাব সূচিত হইতেছে। সম্যক্‌রূপে মায়াতীত হইলেই ব্রহ্মানন্দের অনুভব সম্ভব।

প্রাকৃত বলিয়া প্রজাপতির আনন্দও—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর নাই, সেই আনন্দও প্রাকৃত বলিয়া—পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, অসীম।

এইরূপে শ্রুতি দেখাইলেন—ব্রহ্মের আনন্দ—কি জাতিতে, কি প্রাচুর্য্যে, কি আস্বাদ্যতে—সর্ব্ববিষয়েই অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ। এতাদৃশ যে অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়, অপরিমিত, অপূর্ব্ব-আস্বাদ্যত্বময় এবং প্রাকৃত লোকের বাক্য ও মনের অগোচর আনন্দ, তাহাই হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দ। এতাদৃশ আনন্দই হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপ।

## ১২১। পরব্রহ্মের আনন্দের রসত্ব

পরব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াই শ্রুতি ক্ষান্ত হয়েন নাই ; তাঁহাকে আবার রস-স্বরূপও বলা হইয়াছে। “রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী। ৭॥—সেই ব্রহ্ম রসস্বরূপ। এই রস-স্বরূপ ব্রহ্মকেই লাভ করিলেই জীব আনন্দী—সুখী—হয়।”

রস-শব্দের মুখ্য বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুইটী। রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদন করা যায়, অর্থাৎ যাহা আস্বাদ্য, তাহা রস এবং যিনি আস্বাদন করেন,—যিনি

আস্বাদক—তিনিও রস। এইরূপে রস-শব্দের দুইটী অর্থ পাওয়া গেল—আস্বাদ্য বস্তু এবং রস-আস্বাদক বা রসিক। এই উভয় রকমের রসত্বই ব্রহ্মে বিদ্যমান, উভয় অর্থের বাচ্যই ব্রহ্ম; যেহেতু, কোনও একটী অর্থকে বাদ দিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই ক্ষুণ্ণ হয়। ব্রহ্মের বাচক যে শব্দ, তাহাতে অর্থ-সঙ্কোচের অবকাশ থাকিতে পারে না।

সুতরাং আস্বাদ্য রসও ব্রহ্ম এবং আস্বাদক রস বা রসিকও ব্রহ্ম; অর্থাৎ ব্রহ্ম রসরূপে পরম আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে পরম আস্বাদক। যেহেতু, তিনি ব্রহ্মবস্তু—অসীমবস্তু, তাঁহার আস্বাদ্যত্বও অসীম এবং রসিকত্বও অসীম।

এ-স্থলে রস-শব্দের সাধারণ অর্থই বিবৃত হইল। ব্রহ্মের রসত্বের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিশেষ আলোচনারও প্রয়োজন আছে। তাঁহার স্বরূপগত যে অপূর্ব্ব আনন্দের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, সেই আনন্দও পরম আস্বাদ্য। তথাপি তাঁহাকে যে আবার রসস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়—কেবল আস্বাদ্য আনন্দেই তাঁহার আস্বাদ্যত্বের ইয়ত্তা পর্য্যবসিত নহে; তাঁহার আস্বাদ্যত্বের কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে; তাই তাঁহাকে আবার রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

রস-শব্দের সাধারণ অর্থই হইতেছে—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক। এই অর্থ অনুসারে গুড়ও রস; যেহেতু, গুড়েরও একটা স্বাদ আছে, স্বাদ আছে বলিয়া গুড়ও আস্বাদ্য। আর, পীপিলিকাও রস-আস্বাদক রসিক; যেহেতু, পীপিলিকা গুড় আস্বাদন করে।

কিন্তু রস-শাস্ত্রে যে কোনও আস্বাদ্যবস্তুকেই রস বলা হয় না; সুতরাং যে কোনও স্বাদযুক্ত বস্তুর আস্বাদককেই রসিক বলা হয় না। রস-শাস্ত্রে একটা উৎকর্ষ-জ্ঞাপক বিশেষ অর্থেই রস-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সাধারণ অর্থে নহে। এতাদৃশ রসবস্তুর আস্বাদককেই রস-আস্বাদক বা রসিক বলা হয়।

রস-শাস্ত্র অনুসারে চমৎকারিত্বই হইতেছে রসের সারবস্তু বা প্রাণবস্তু। যাহার চমৎকারিত্ব নাই, সাধারণ-ভাবে আস্বাদ্য হইলেও, রস-শাস্ত্র তাহাকে "রস" বলে না; এইরূপ চমৎকারিত্ব আছে বলিয়াই, চমৎকারিত্বই রসত্ব-সিদ্ধির পক্ষে সারবস্তু—অপরিহার্য্যবস্তু—বলিয়াই "রস" সর্ব্বত্রই অদ্ভুত।

"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ॥ ৬।৫।৭॥"

অদৃষ্টপূর্ব্ব কোনও বস্তুর দর্শনে, অশ্রুতপূর্ব্ব কোনও বস্তুর শ্রবণে, কিম্বা অননুভূতপূর্ব্ব কোনও বস্তুর অনুভবে মনে যে একটা বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, চিত্তের যে একটা স্ফারতা জন্মে, তাহাই হইতেছে চমৎকৃতি। এতাদৃশী চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার—প্রাণ, রসত্বসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু কেবল চমৎকৃতিমাত্র থাকিলেই আস্বাদ্যবস্তুকে রস বলা হয় না; এই চমৎকৃতিও একটা অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইলেই তাহা আস্বাদ্যবস্তুকে রসত্ব-পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে পারে। আস্বাদন-চমৎকারিত্বটুকু এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে আস্বাদন-ব্যাপারে নিবিড় তন্ময়তা জন্মিতে পারে; এমনই তন্ময়তা যে, আস্বাদকের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়—এই উভয়ের ব্যাপারই তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যবিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই

আস্বাদন-চমৎকারিত্বে কেন্দ্রীভূত হইয়া অপর বিষয়ে অনুসন্ধানশূন্য হইয়া পড়ে। আস্বাদ্যবস্তু যখন এ-জাতীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখনই তাহাকে "রস" বলা হয়।

"বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্।
স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥ ৬।৫।৫ ॥

—বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক এবং রসের নিজের কারণের সহিত সম্মিলিত যে চমৎকারি সুখ, তাহাকে রস বলা হয়।"

( আস্বাদ্য বস্তু যখন বিভাব, অনুভাবাদি কয়েকটী বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তখন তাহা রসে পরিণত হয়। এই বিভাব, অনুভাবাদিকে রসের কারণ বলা হয়। এই সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। )

**লৌকিক রসও** আছে। লৌকিক বা প্রাকৃত বস্তুর আস্বাদনেও চমৎকারিতা জন্মিতে পারে, তন্ময়তাও জন্মিতে পারে; কিন্তু এই চমৎকারিত্ব এবং তন্ময়ত্ব হইবে ক্ষণিক। অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব কোনও ব্যাপার ছায়াচিত্রে চিত্রিত হইয়া যদি কোনও সিনেমায় প্রদর্শিত হয়, তাহার দর্শনে অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব জন্মিতে পারে, বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তরও হয়তো রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু পর-পর কয়েকদিন ধরিয়া যদি তাহা দেখা যায়, শেষে আর চমৎকারিত্ব থাকে না। তখন আর তাহাতে রসত্বের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না।

কিন্তু পরব্রহ্ম নিত্যবস্তু; তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ বা সুখও নিত্য বস্তু। তাঁহার রস-স্বরূপত্বও নিত্যবস্তু। তাঁহার রস-স্বরূপত্ব বা রসত্ব নিত্য হইতে হইলে রসের প্রাণবস্তুও—অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিত্বও—নিত্য হইবে। সুতরাং আস্বাদ্য-রসস্বরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব—আস্বাদকের অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিত্ব—যে নিত্য-নবনবায়মান, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। চমৎ-কারিত্ব প্রতিক্ষণে নবনবায়মান না হইলে তাহার নিত্যত্ব সম্ভব নহে।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে **"সর্ব্বরসঃ"** বলা হইয়াছে। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ **সর্ব্বরসঃ** ॥ ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ ।৩।১৪।৪॥" এই "সর্ব্বরস"-শব্দ হইতেই জানা যাইতেছে—ব্রহ্মে অনন্ত-রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান, তিনি অশেষ-রসামৃত-বারিধি।

"সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১০৭॥"

"নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১১১॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ—"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ।১।১।১॥"

পরব্রহ্ম অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বলিয়াই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ ॥ ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ ।১।১।৩॥ —তিনি সমস্ত রসের সারভূত **পরম-রসতম**।"

অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসরূপেও তাঁহার সমানও কেহই নাই, তাঁহার উর্দ্ধেও কেহ নাই।

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ ।৬।৮॥"

উল্লিখিতরূপ অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধক আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসের আবার আস্বাদকও তিনি; তাহাতেই তাঁহার রস-আস্বাদকত্ব বা রসিকত্ব। আস্বাদ্য-রসের যেমন অনন্ত-বৈচিত্রী, অনন্ত-বৈচিত্রীময় রসের আস্বাদকরূপেও রস-আস্বাদকত্বের বা রসিকত্বের অনন্ত-বৈচিত্রী। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিপ্রোক্ত "সর্ব্বরসঃ"-শব্দের অন্তর্গত "রসঃ"-শব্দের—আস্বাদ্যরস ও আস্বাদকরস বা রসিক, এই—উভয় অর্থ ধরিলে বুঝা যায়—পরব্রহ্মে যেমন অনন্ত আস্বাদ্যরস-বৈচিত্রী বিদ্যমান, তেমনি অনন্ত আস্বাদক-বৈচিত্রী বা অনন্ত রসিকত্ব-বৈচিত্রীও বর্ত্তমান।

## ১২২। স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মের রসত্ব

স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতেছে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বা স্বরূপভূতা শক্তি—নিত্যই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতা। এই স্বরূপ-শক্তি হইতেই যেমন ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যাদি অপরাপর বৈশিষ্ট্য, তেমনি ব্রহ্মের রসত্ব—আস্বাদ্যরূপ রসত্ব এবং আস্বাদকরূপ রসত্বও—এই স্বরূপশক্তি হইতেই। এই স্বরূপ-শক্তি চিচ্ছক্তি বলিয়া স্বভাবতঃই চেতনাময়ী; তাই ইহা ব্রহ্মের আনন্দকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে এবং নিজেও বৈশিষ্ট্য ধারণ করিতে পারে। কিরূপে?—তাহা বিবেচিত হইতেছে।

রসত্বের ব্যাপারে এই স্বাভাবিকী স্বরূপ-শক্তির দুইরূপে অভিব্যক্তি (দুই রূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি)। একরূপে ইহা আনন্দকে আস্বাদন-চমৎকারিত্ব দান করে এবং আর একরূপে ইহা সেই আনন্দকেই আস্বাদন করায়। আর, উভয়রূপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনন্ত-বৈচিত্রী সম্পাদন করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, আস্বাদ্যত্ব-জনয়িত্রী অভিব্যক্তির কথা বিবেচনা করা যাউক। মিষ্টত্ব হইল মিষ্টদ্রব্যের বিশেষণ বা শক্তি। মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী—গুড়ের মিষ্টত্ব, চিনির মিষ্টত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বিবিধ ফলমূলাদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এ-সকল মিষ্টদ্রব্যের প্রত্যেকটীই মিষ্ট; কিন্তু সকল বস্তু এক রকম মিষ্ট নহে; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক এক রূপ। ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্রী। আবার, গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণতি। পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এ-সমস্ত বিবিধ উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এ-সমস্ত বিভিন্ন মিষ্টবস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিভিন্ন পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায়। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান-যোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং তদুপলক্ষ্যে নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ, স্বরূপতঃ আস্বাদ্য একই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া আস্বাদ্য-রসরূপে পরিণত হইয়া বিরাজিত। বিভিন্ন আস্বাদন-চমৎকারিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র-রস-বৈচিত্রীর সমবায়েই আস্বাদ্য-রসতত্ত্ব।

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরূপেও এই স্বরূপ-শক্তি চেতন-আনন্দের মধ্যে আস্বাদ্যরসের আস্বাদন-বাসনা জাগাইয়া তাঁহাকে আস্বাদক ( রসিক ) করিয়া থাকে এবং অনন্ত-রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য অনন্ত-বাসনা-বৈচিত্রী জন্মাইয়া সেই আনন্দের—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের—মধ্যে অনন্ত-আস্বাদক-বৈচিত্রীও অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সমস্ত অনন্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীর সমবায়েই অস্বাদক-রসতত্ত্ব।

আস্বাদ্যরস-তত্ত্ব এবং আস্বাদক-রসতত্ত্বের সমবায়েই পূর্ণ রসতত্ত্ব। অনাদিকাল হইতেই এই দুই রসতত্ত্ব ব্রহ্মে বিরাজিত; যেহেতু, ব্রহ্মের রস-স্বরূপত্ব নিত্য, অনাদি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রহ্মের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেদ্যরূপে ব্রহ্মে বিরাজিত; সুতরাং ক্রিয়াশীলতা, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বরূপ অনন্ত-শক্তিবিলাস-বৈচিত্রী এবং শক্তিবিলাস-বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্যরূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মে নিত্য বিরাজিত। তত্ত্বটী বোধ্যগম্য করাইবার নিমিত্তই "অভিব্যক্তি", "বৈচিত্রীর উদ্ভব" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ, অভিব্যক্ত, অনন্ত বৈচিত্র্য ইত্যাদি রূপেই শক্তি ও আনন্দ অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজিত।

এইরূপে দেখা গেল—অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। ব্রহ্মও যাহা, রসও তাহা। রসও যাহা, ব্রহ্মও তাহা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। জনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটী নাম—জন্মদাতা বলিয়া জনক এবং পালনকর্ত্তা বলিয়া পিতা; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন—তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং রসও একই তত্ত্ববস্তুর দুইটী নাম। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম বলিয়া সেই তত্ত্ববস্তুর নাম ব্রহ্ম এবং পরমতম আস্বাদ্য এবং পরমতম আস্বাদক বলিয়া তাঁহার নাম রস। বস্তু কিন্তু এক এবং অভিন্ন।

পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব। রসরূপেও তিনি সর্ব্ববৃহত্তম। নিত্য-নবনবায়মান চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্যরূপে যেমন তাঁহার অধিক অপর কিছু নাই, সমানও অপর কিছু নাই, তেমনি রস-আস্বাদক রসিকরূপেও তাঁহার অধিক কেহ নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই। **তিনি রসিক-শেখর,** রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি।

## ১২৩। পরব্রহ্মের রসাস্বাদন-স্পৃহা

পূর্ব্বে ১।১।১২২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ পরব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপশক্তি রসাস্বাদনের বাসনা জাগাইয়া থাকে। কিন্তু বাসনা জাগে অপূর্ণতা হইতে। পরব্রহ্ম হইতেছেন পূর্ণতম তত্ত্ব; তাঁহাতে অপূর্ণতা কিছু নাই; এজন্য তিনি আপ্তকাম। তাঁহার বাসনা থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥—আপ্তকামের আবার বাসনা কি ? অর্থাৎ আপ্তকামের কোনও বাসনা নাই।" সুতরাং পরব্রহ্মের মধ্যে রস-আস্বাদনের বাসনা কিরূপে জন্মিতে পারে ?

ইহার উত্তর এই। অভাব-বোধ হইতেই যে বাসনা জাগে, তাহা সত্য। লোকের দেহে যখন জলের অভাব হয়, তখন তাহার জল-পানের বাসনা জাগে—জলের অভাব দূর করার জন্য। যখন রক্তের অভাব জন্মে, তখন আহারের বাসনা জাগে—রক্তের অভাব দূর করার জন্য। অভাব-পূরণের জন্যই বাসনা। পূর্ণতম তত্ত্ব পরব্রহ্মের যখন কোনও অভাবই নাই, তখন সহজেই বুঝা যায়—অভাবপূরণার্থ কোনও বাসনাই তাঁহার থাকিতে পারে না। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—এই বাক্যে শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

তথাপি, ব্রহ্মের যে বাসনা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; যেহেতু, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ। আনন্দবল্লী। ৬॥—সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব এবং আমি উৎপন্ন হইব।", "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য। ৬।২ ॥—সেই সৎস্বরূপ দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আমি এই জীবাত্মারূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টি-লীলাসম্বন্ধে পরব্রহ্মের ইচ্ছার কথা পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে একবার বলা হইল, আপ্তকাম বলিয়া পরব্রহ্মের কোনও বাসনা নাই; আবার বলা হইল, সৃষ্টিলীলাবিষয়ে সেই আপ্তকাম পরব্রহ্মেরই বাসনা আছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—এই উক্তিগুলি যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে; ইহার সমাধান এইরূপ।

দুই ভাবে বাসনার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, অভাব-বোধ হইতে, অভাব-পূরণের জন্য বাসনা জাগে। পরব্রহ্মের এ-জাতীয় কোনও বাসনা নাই, থাকিতেও পারে না; যেহেতু, তিনি পূর্ণ, আপ্তকাম বলিয়া তাঁহার কোনও অভাব নাই,—সুতরাং অভাবপূরণের জন্য বাসনাও থাকিতে পারে না। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মের যে অভাব-পূরণাত্মিকা বাসনা নাই, তাহাই বলা হইয়াছে; "আপ্তকাম"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

"স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ॥ শ্রীভা. ৩।২।২১ ॥—স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যৈব প্রাপ্ত-সমস্তভোগঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥—পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তিদ্বারা তিনি সমস্ত কাম্যবস্তু—অভাবপূরক আকাঙ্ক্ষ্য-বস্তু বা ভোগ—প্রাপ্ত হইয়া আছেন ( অনাদিকাল হইতে )।"

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার কোনওরূপ অভাব নাই, তাঁহারও ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। প্রচুর-ধনসম্পত্তিশালী রাজা-মহারাজাদের কোনও অভাব নাই; তথাপি কন্দুক-ক্রীড়াদিতে বা পাশক-ক্রীড়াদিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কোনও অভাব-পূরণের জন্য তাঁহাদের এইরূপ ক্রীড়া-প্রবৃত্তি নহে; ক্রীড়াজনিত সুখ লাভের ইচ্ছাই কেবল এইরূপ ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তির হেতু। তদ্রূপ আপ্তকাম পরব্রহ্মেরও সৃষ্টিলীলাদিতে প্রবৃত্তি কেবল লীলারই ( ক্রীড়ারই ) জন্য, লীলাসুখ আস্বাদনেরই নিমিত্ত, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে, কোনও অভাব-পূরণের উদ্দেশ্যে নহে। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ২।১।৩৩ ॥"—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। লৌকিক জগতে রাজামহারাজা-আদির কন্দুকাদি-ক্রীড়ায় প্রবৃত্তির হেতু যেমন কেবলমাত্র ক্রীড়াই, ক্রীড়াসুখ লাভের বাসনাই, কোনও অভাব-পূরণের বাসনা নহে, তদ্রূপ আপ্তকাম পরব্রহ্মের সৃষ্টিলীলার বাসনাও কেবল লীলার জন্যই, লীলাসুখ আস্বাদনের জন্যই, কোনও অভাব-পূরণের বা প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে।

ইহাই সমাধান। ইহা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম আপ্তকাম বলিয়া কোনও অভাব-পূরণের বা প্রয়োজন-সিদ্ধির বাসনা তাঁহার নাই; কিন্তু লীলাসুখ আস্বাদনের বাসনা তাঁহার আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—লীলা-সুখের জন্য যে বাসনা, তাহাও অভাবই সূচিত করে—লীলাসুখের অভাব। সুতরাং ইহাও পরব্রহ্মের অপূর্ণতার বা আপ্তকামতাহীনতার পরিচায়ক।

উত্তরে বলা যায়—লীলাসুখের জন্য বাসনা পরব্রহ্মের অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে; পরন্তু তাঁহার পূর্ণতার এবং আপ্তকামতারই পরিচায়ক। একথা বলার হেতু এই।

লৌকিক জগতেও দেখা যায়, যাঁহার কোনও অভাব আছে, অভাব-পূরণের জন্যই তাঁহার বাসনা জাগে, ক্রীড়াতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। কোনও কারণে কোনও সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেও ক্রীড়াসুখের সম্যক্ আস্বাদন তাঁহার পক্ষে হইয়া উঠে না, অভাবের স্মৃতি ক্রীড়াসুখের অনুভবকে প্রতিহত করে, ক্রীড়ারও হয়তো অবসান ঘটায়। যাঁহার কোনও অভাব নাই—যেমন রাজামহারাজার—তাঁহারই ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি জন্মে, ক্রীড়াসুখের অপ্রতিহত অনুভবও তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। লৌকিক জগতে বাস্তবিক আপ্তকাম—সম্যক্‌রূপে অভাবমুক্ত—কেহই নাই। কিন্তু পরব্রহ্ম পূর্ণতম তত্ত্ব বলিয়া তিনি সম্যক্‌রূপেই আপ্তকাম—সম্যক্‌রূপে অভাবমুক্ত। কেবলমাত্র তাঁহার পক্ষেই লীলাসুখের জন্য বাসনা জাগ্রত হওয়া এবং সম্যক্‌রূপে লীলাসুখ আস্বাদন করা সম্ভব। সুতরাং লীলাসুখের বাসনা পরব্রহ্মের অপূর্ণতার পরিচায়ক নহে, বরং পূর্ণতারই পরিচায়ক। ইহা পূর্ণতারই একটী উচ্ছ্বাস। দুগ্ধপূর্ণ কটাহের দুগ্ধই অগ্নির উত্তাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, অপূর্ণ কটাহের দুগ্ধ সেইভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া যায় না।

লীলাসুখের জন্য বাসনা পরব্রহ্মের কোনওরূপ অভাব-জনিত বাসনা নহে; ইহা তাঁহার স্বভাব-জনিত বাসনা। স্বভাবে বা স্বরূপে তিনি পূর্ণতম, আপ্তকাম; তাই পূর্ণতার বা আপ্তকামতার স্বভাব বশতঃ—স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ—তাঁহার লীলাসুখের বাসনা। অধিকন্তু, স্বরূপে তিনি রস—আস্বাদক রস বা রসিক। এই রস-স্বরূপত্ব-স্বভাব বশতঃও তাঁহার পক্ষে লীলারস আস্বাদনের বাসনা স্বাভাবিকী।

ক্ষুধা না থাকিলে যেমন ভোজ্যরসের আস্বাদন সম্ভব হয় না, ক্ষুধা যতই বলবতী হইবে, ভোজ্যরসের আস্বাদনও যেমন ততই আনন্দদায়ক হয়, তদ্রূপ রসিক-শেখর পরব্রহ্মের রসাস্বাদন-বাসনা না থাকিলেও তাঁহার পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না—আস্বাদনের অভিনয়মাত্র হইতে পারে; রসাস্বাদনের বাসনা যতই বলবতী হইবে, রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ-চমৎকারিতাও ততই উজ্জ্বলতা ধারণ করিবে। এইরূপে দেখা যায়, রসিক-শেখরত্ব-স্বভাববশতঃই পরব্রহ্মের রসাস্বাদন-বাসনা স্বাভাবিকী এবং তাঁহার স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তিই—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ লীলাশক্তিই—তাঁহার মধ্যে এই রসাস্বাদন-বাসনা স্ফুরিত করিয়া থাকে; নচেৎ, তাঁহার রসিক-স্বরূপত্ব—রস-স্বরূপত্বই—ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম, তদ্রূপ রসাস্বাদন-বাসনাও রস-স্বরূপ—রসিক-স্বরূপ—পরব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্ম। স্বভাবকে বা স্বরূপগতধর্ম্মকে কেহ বাধা দিতে পারে না। "ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে॥ ২।১।৩৩-বেদান্তসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য॥—স্বভাবরূপ কারণ বিদ্যমান থাকিলে তাহার কার্য্যও নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।" রস-স্বরূপত্ব বা রসিক-স্বরূপত্ব যখন পরব্রহ্মের স্বভাব, তখন তাঁহার রসাস্বাদনও অপরিহার্য্য এবং রসাস্বাদনের নিমিত্ত বাসনাও অপরিহার্য্য। এই রসাস্বাদন-বাসনা পরব্রহ্মের স্বভাবজাত—অভাবজাত নহে।

## ১২৪। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের আস্বাদ্য রস

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম রস আস্বাদন করেন। কিন্তু তিনি কি রস আস্বাদন করেন?

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আনন্দই অবস্থাবিশেষে রস-নামে অভিহিত হয়। রসত্বপ্রাপ্ত আনন্দই তিনি আস্বাদন করেন।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—রসত্বপ্রাপ্ত কোন্ আনন্দ তিনি আস্বাদন করেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আরও দু'একটী বিষয় জানা দরকার।

## ক। পরব্রহ্মের আত্মারামতা ও স্বরাট্ত্ব

প্রথমতঃ, তাঁহার **আত্মারামতা**। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতেছেন আত্মারাম, অর্থাৎ, নিজেতেই তিনি নিজে আনন্দ অনুভব করেন। সুতরাং যাহা তাঁহার আত্মভূত বা স্বরূপভূত নহে, তাহা তাঁহার আনন্দের হেতুভূত হইতে পারে না, তাহা তিনি আস্বাদনও করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার **স্বরাট্ত্ব**। শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্"—ইত্যাদি ১।১।১-শ্লোকে পরব্রহ্মকে স্বরাট্ বলা হইয়াছে। "স্বরাট্"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ—যিনি নিজের দ্বারাই নিজে তন্ত্রিত, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ, যিনি স্বতন্ত্র, তিনি স্বরাট্।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—স্বরাড়িত্যনেন জ্ঞানরূপস্যাপি স্বরূপজ্ঞানেনৈব জ্ঞাতৃত্বাঙ্গীকারাচ্চ—তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও স্বরূপজ্ঞানেই তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ন তু অন্যপরতন্ত্র ইত্যাহ স্বেনৈব রাজত ইতি—তিনি অন্যপরতন্ত্র নহেন, পরন্তু স্বতন্ত্র ; নিজের দ্বারাই নিজে তন্ত্রিত, ইহাই স্বরাট্-শব্দের তাৎপর্য্য।" এইরূপে জানা গেল—পরব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। কোনও ব্যাপারেই—সুতরাং রসাস্বাদন ব্যাপারেও—তিনি স্বীয়-স্বরূপাতিরিক্ত অন্য—অর্থাৎ স্বীয়-স্বরূপবহির্ভূত—কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না, এরূপ কোনও বস্তুর সহায়তা-গ্রহণ করার তাঁহার প্রয়োজন হয় না।

তাঁহার স্বরূপ-শক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা বলিয়া, নিত্য অবিচ্ছেদ্যরূপে তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া স্বরূপ-শক্তির সহায়তাগ্রহণে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। স্বশক্ত্যেকসহায় বলিয়াই তিনি স্বরাট্। "স্বেন স্বীয়স্বরূপশক্ত্যা রাজতে ইতি স্বরাট্।" স্বীয় শক্তির সহায়তাগ্রহণে কাহারও স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—বহিরঙ্গা মায়া এবং তটস্থা জীবশক্তিও পরব্রহ্মেরই শক্তি। এই শক্তিদ্বয়ের সহায়তাগ্রহণে কি তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। জীবশক্তি বা মায়াশক্তির সহায়তাগ্রহণে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি না হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মারামতার হানি হইবে ; যেহেতু, আত্মারাম-শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে যে—তিনি স্বীয় স্বরূপভূত বস্তুতেই আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহার আনন্দানুভবের জন্য তাঁহার স্বরূপ-বহির্ভূত কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি, সর্ব্বদা তাঁহার স্বরূপের বহির্দ্দেশে অবস্থিত থাকে ; বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, বহিরঙ্গা মায়া চিদ্বিরোধী জড়রূপা বলিয়া আনন্দও নয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দাস্বাদনের সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্টও থাকিতে পারে না। আর,

জীবশক্তি চিদ্‌রূপা ( গীতা ৭।৫॥ ) হইলেও পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতা নহে, স্বরূপভূতা নহে। সুতরাং জীব-শক্তির সহায়তাতেও তাঁহার আত্মারামতার হানি হয়। বিশেষতঃ, জীব অতি ক্ষুদ্র, চিৎকণ। চিৎকণ জীব চিন্মহাবস্তু ব্রহ্মের আনন্দাস্বাদনের হেতু হইতে পারে না। অবশ্য স্বরূপ-শক্তির কৃপালাভ করিলে জীবও তাঁহার আনন্দাস্বাদনের আনুকূল্য করিতে পারে। তিনি কিন্তু এই আনুকূল্যেরও অপেক্ষা রাখেন না ( এ-সম্বন্ধে পরে জীবতত্ত্বের আলোচনায় আলোচনা করা হইবে )। তিনি অপেক্ষা রাখেন কেবল স্বীয়-স্বরূপভূতা স্বরূপ-শক্তির।

বিভু পরব্রহ্মের স্বরূপের সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া স্বরূপশক্তিও বিভ্বী, সর্ব্বব্যাপিনী। স্বরূপ-শক্তির একটী বৃত্তি হ্লাদিনী ( আনন্দস্বরূপিণী এবং আনন্দদায়িনী ) বলিয়া স্বরূপ-শক্তি আস্বাদ্যও।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম-পরিকরাদি সমস্তই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত ধামে, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ পরিকরদের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। তাহাতেও তাঁহার আত্মারামতার ও স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ; কেন না, তাহাতেও তাঁহার স্বরূপ-বহির্ভূত কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখিতে হয় না।

আবার হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তির আস্বাদনেও তাঁহার আত্মারামতার বা স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না ; যেহেতু, স্বরূপশক্তি তাঁহারই স্বরূপভূতা, তাঁহার বাহিরের বস্তু নহে।

## খ। শক্তির স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য

শক্তির স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যই হইতেছে শক্তিমানের সেবা ; তাহাতেই শক্তির শক্তিত্ব। অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির কার্য্যও হইতেছে তাহার শক্তিমান্ পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গ-সেবা। স্বরূপ-শক্তি নানাভাবে এই কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছে। ধামরূপে আত্মপ্রকট করিয়া পরব্রহ্মের লীলার সহায়তা-রূপ সেবা করিতেছে ; লীলা-পরিকররূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরব্রহ্মের লীলার সহায়তা করিতেছে ; শক্তিরূপে এক বৃত্তিতে লীলা নির্ব্বাহ করিতেছে। আবার স্বীয় মূর্ত্তরূপ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়য়িণী প্রীতিরূপে আত্মপ্রকট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছে। রসিক-শেখর পরব্রহ্মের রস-আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়াও স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা করিতেছে। আবার, হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ-শক্তিরূপে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-আস্বাদনও করাইতেছে। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৩॥" পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরও একটী ব্রত আছে। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধা ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার ভক্তদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই আমি বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকি।" ভক্তদিগকে আনন্দ আস্বাদন করাইয়া তিনি তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"এষ হি এব আনন্দয়াতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মবল্লী ৭॥—তিনিই আনন্দদান করেন।" পরব্রহ্ম তাঁহার ভক্তদিগকে আনন্দ দান করেনও হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা। "হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৩॥ ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২১॥" এইরূপে পরব্রহ্মের ভক্ত-চিত্তবিনোদন-কার্য্যের সহায়তা করিয়াও স্বরূপ-শক্তি তাঁহার সেবা কারতেছে।

জীবস্বরূপও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি ; সুতরাং তাহারও স্বরূপগত কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসেবা। জীব এই সেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে একমাত্র সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিকরত্ব লাভ করিলে। কিন্তু সাধনসিদ্ধ জীব পরিকরত্ব লাভ করিয়া যে পরব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন, তাহাও স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়াই। এই কৃপা দান করিয়াও স্বরূপ-শক্তি সাধনসিদ্ধ জীবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইয়া থাকেন ; ইহাও এক ভাবে স্বরূপ-শক্তিকর্ত্তৃকই শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

বহিরঙ্গা মায়াও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। তাহারও স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের সেবা। কিন্তু নিজে জড়রূপা বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে সেবা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে যে চিদ্রূপা—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা—শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই চিদ্রূপা শক্তির সহায়তাতেই মায়া শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-লীলার সহায়তা করিয়া থাকেন। মায়াকে এই ভাবে সেবার যোগ্যতা দিয়াও স্বরূপ-শক্তি মায়াকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণসেবার—অবশ্য বহিরঙ্গা সেবার—আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা যায়—স্বরূপ-শক্তিই নানাভাবে তাঁহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। স্বরূপ-শক্তি তাঁহার স্বরূপ-বহির্ভূতা নহে বলিয়া স্বরূপ-শক্তির সেবা-গ্রহণে, স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় বিবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদনে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতার এবং স্বরাট্ত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের—স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বের—হানি হয় না।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম আত্মারাম এবং স্বরাট্—স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া তাঁহার স্বরূপভূত বস্তুমাত্রই তাঁহার আস্বাদ্য হইতে পারে ; তাহাও আবার কেবলমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তায়। স্বরূপ-বহির্ভূত কোনও বস্তু তাঁহার আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে না ; সুতরাং কোনও মায়িক-বস্তুই তাঁহার আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে না ; যেহেতু, মায়িক বস্তু, তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় উদ্ভূত হইলেও, তাঁহার স্বরূপ-বহির্ভূতা জড়-মায়া হইতে উদ্ভূত।

গ। তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু হইতেছে—প্রথমতঃ, তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। সুতরাং তাঁহার আস্বাদ্য হইতেছে—তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত আনন্দ। এই দুইটী বস্তু কি কি বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরব্রহ্মের আস্বাদ্য হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

## ১২৫। ব্রহ্মের আস্বাদ্য আনন্দ

পরব্রহ্ম ভগবানের আস্বাদ্য আনন্দ সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬২-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"ভগবদানন্দঃ খলু দ্বিধা। স্বরূপানন্দঃ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দশ্চ। অন্তিমশ্চ দ্বিধা। মানসানন্দঃ ঐশ্বর্য্যানন্দশ্চ।—ভগবানের আনন্দ দুই রকমের—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার দুই রকমের—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ।"

**স্বরূপানন্দ।** পরব্রহ্ম স্বরূপে আনন্দ ; এই আনন্দ অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় বলিয়া পরম আস্বাদ্য রস। স্বীয় স্বরূপ-শক্তির—হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তির—সহায়তায় পরব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত অপূর্ব্ব

আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দের আস্বাদন করেন, এবং তাহা আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই হইতেছে স্বরূপানন্দ। তিনি নিজে আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—হইলেও রসিক-শেখর বলিয়া আনন্দ বা সুখ আস্বাদন করেন। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২১ ॥"

তাঁহার স্বরূপগত আনন্দও আস্বাদ্য-রসস্বরূপ বলিয়া রসের একটী বৈচিত্রী। রসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর আস্বাদনেই তাঁহার রসস্বরূপত্ব—রসিক-শেখরত্ব।

**স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ।** স্বরূপ-শক্তি হইতে জাত যে আনন্দ, তাহাই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ।

হ্লাদিনীই ( অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিই ) হইতেছে আনন্দ-বিষয়িণী শক্তি, আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এই হ্লাদিনী নিজেও আনন্দরূপা, পরম আস্বাদ্যা। এই হ্লাদিনী যেখানে যত বেশী বৈচিত্রী ধারণ করে, সেখানে তাঁহার আস্বাদন-চমৎকারিত্বও তত বেশী। কিন্তু এই হ্লাদিনী যতক্ষণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তত বেশী আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে না। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য পরিকর-ভক্ত-হৃদয়ের বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত মিলিত হইলেই ইহা অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে।

কিন্তু হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই অবস্থিত; ভক্তহৃদয়স্থিত সেবোৎকণ্ঠার সহিত হ্লাদিনীর মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সম্ভাবনা হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহার হ্লাদিনীকে ভক্ত-হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। বাস্তবিক রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিয়া থাকেন। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত পরম-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই হ্লাদিনী-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিবিশেষকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫ ॥"

ভগবানের স্বরূপে অবস্থিতা হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়স্থিতা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ। মুখ-গহ্বরস্থ বায়ু নানা ভঙ্গীতে মুখ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে; এ-সমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে। কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় শব্দের উদ্ভব হয় যে, তদ্দ্বারা শ্রোতা এবং বংশীবাদক নিজেও মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী, ভক্তহৃদয়ের সেবোৎকণ্ঠার সহিত মিলিত হইয়া, অনেক বেশী-আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপে অপেক্ষা, ভক্তের কৃষ্ণসেবা-বাসনা-বশতঃ এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাদিবশতঃ, ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনীর বৈচিত্রী-বিকাশের সুযোগ এবং অবকাশ বেশী। ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনী সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং এই সকল বৈচিত্রীর আস্বাদনেই রসিক-শেখর ভগবানের সমধিক কৌতুহল।

বিভিন্ন ভক্তের ভাবও বিভিন্ন। এই ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের হৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীও অনন্ত-ভাগবতী প্রীতিবৈচিত্রীরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। পরিকর-ভক্তের সহিত ভগবানের লীলার ব্যপদেশে ভক্তহৃদয়ের এই প্রীতিরস-বৈচিত্রী উৎসারিত হইয়া ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। এই আস্বাদনে পরব্রহ্ম ভগবান্ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই তাঁহার আস্বাদ্য স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ ; যেহেতু, এই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী হইতে জাত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ দুই রকমের, ঐশ্বর্য্যানন্দ ও মানসানন্দ। কোন্ অবস্থায় স্বরূপ-শক্ত্যানন্দকে ঐশ্বর্য্যানন্দ বলে এবং কোন্ অবস্থায় তাহাকে মানসানন্দ বলে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

**ঐশ্বর্য্যানন্দ**। পরব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য—উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান ; উভয়েই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ, রস-স্বরূপ বলিয়া শ্রুতি তাঁহার মাধুর্য্যেরই ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু পরিকর-ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহাদের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য এবং তৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষও বিভিন্নরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

সকল পরিকরের ভাব একরূপ নহে ; একরূপ হইলে ব্রহ্মের আস্বাদ্য স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে না। পরিকরগণের মধ্যে কাঁহারও কাঁহারও মধ্যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে ; এই ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্যের জ্ঞানেরও অনেক স্তর আছে। আবার, কাঁহারও কাঁহারও মধ্যে মাধুর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে ; এই মাধুর্য্য-প্রাধান্য-জ্ঞানেরও স্তরভেদ আছে। আবার, এমন পরিকরও আছেন, যাঁহাদের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান মোটেই স্থান পায় না, কেবল মাধুর্য্যের জ্ঞানেই তাঁহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ।

যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেরই প্রাধান্য, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়াও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রীতিকে যেন সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। মিষ্ট-অম্বলের চিনি অম্লকে একটু মাধুর্য্য দান করিয়া যেমন তাহার আস্বাদনের একটু চমৎকারিতা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু স্বয়ং প্রাধান্য লাভ করে না, প্রাধান্য থাকে অম্লেরই, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান ভক্তহৃদয়ের প্রীতিও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে কিছু মাধুর্য্য দান করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মায় বটে ; কিন্তু—রস-বৈচিত্রীসম্পাদনার্থ লীলাশক্তির প্রভাবেই—প্রীতি সেস্থানে নিজের প্রাধান্য প্রকটিত করে না। সুতরাং প্রাধান্য থাকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই। তথাপি, মাধুর্য্যময়ী প্রীতির প্রভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মাধুর্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাও রসিক-শেখর ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। ইহা হইল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি। ইহার আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দ। এই আনন্দও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি বলিয়া এই ঐশ্বর্য্যানন্দও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

**মানসানন্দ**। যে স্থলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়েই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত, কিন্তু ভগবান্ আনন্দস্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়া ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য থাকে এবং এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকে সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত করিয়া, মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া, পরম আস্বাদ্য

করিয়া তোলে এবং নিজের ( মাধুর্য্যের ) অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে,—সেস্থলে পরিকর-ভক্তদের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফুরিত হইতে পারে না, স্ফুরিত হওয়ার অবকাশও পায় না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়া অবাধরূপে অনন্তবৈচিত্রী ধারণ করিতে সমর্থ হয় ; যেহেতু, বৈচিত্রী-বিকাশের ব্যাপারে সেস্থলে প্রীতিকে কোনওরূপ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রীতির বিকাশকে যেমন প্রতিহত করে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতি কোনও কিছুদ্বারাই তদ্রূপ প্রতিহত হয় না। তাই ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত বৈচিত্রী এবং অনন্ত আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত এই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়ী প্রীতির আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহারই নাম মানসানন্দ। স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

সকল রকমের আনন্দই মনে অনুভূত হয় ; সুতরাং সকল রকমের আনন্দকেই সাধারণভাবে মানসানন্দ বলা যায়। কিন্তু যে আনন্দের অনুভবে আনন্দাস্বাদন-জনিত মনঃ-প্রসাদের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই মানসানন্দেরও চরম-পর্য্যবসান। এজন্যই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের হৃদয়স্থিত শুদ্ধ-প্রীতিরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দকেই বিশেষরূপে মানসানন্দ বলা হয়। যেহেতু, স্বরূপানন্দ হইতে ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদনে আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য এবং তদপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদনে আনন্দের আধিক্য।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ; কারণ, পরব্যোম হইতেছে ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম ; এখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য নাই। তাই **পরব্যোমেই ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন**।

দ্বারকা-মথুরাতে পরব্যোম অপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যের বিকাশ ; তথাপি পরিকরদের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও মিশ্রিত থাকে। এজন্য দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের প্রীতিরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দকেও ঐশ্বর্য্যানন্দ বা মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যানন্দ বলা যায়।

কিন্তু গোলোকের বা ব্রজের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, ব্রজে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যেকে পূর্ণতমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও প্রাধান্য মাধুর্য্যের ; ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে কবলিত। তাই **ব্রজেই মানসানন্দের আস্বাদন**।

আর, স্বরূপানন্দের আস্বাদন সর্ব্বত্রই ; যেহেতু, সকল ধামেই পরব্রহ্ম বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে নিত্য বিরাজিত।

## ১২৬। ভক্ত্যানন্দের প্রাধান্য

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভক্ত-হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎ-প্রীতিরূপে পরিণত হয়। এই প্রীতিকেই ভক্তি বলে—সাধ্য-ভক্তি। প্রীতি হইতে উদ্ভূত যে আনন্দ, তাহাই ভক্ত্যানন্দ—ভক্তি হইতে উদ্ভূত আনন্দ। ভক্তিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ( ৫।৪৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য আনন্দের মধ্যে ভক্ত্যানন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্বরূপানন্দ এবং ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতেও যে ভক্ত্যানন্দের পরমোৎকর্ষ, শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। প্রীতিসন্দর্ভের ৬৩-৬৪-অনুচ্ছেদের আনুগত্যে এ-স্থলে সেই শ্লোক দুইটীর আলোচনা করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

একটী শ্লোকে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু দুর্ব্বাসা-ঋষির নিকটে বলিয়াছেন—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৪॥

—হে ব্রহ্মন্! আমি যাঁহাদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত নিজেকে এবং নিজের আত্যন্তিকী সম্পৎকেও আমি অভিলাষ করিনা।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবান্ সাধুভক্তদিগকেই অভিলাষ করেন। সাধুভক্তদের চিত্তে ভগবদ্বিষয়িণী যে ভক্তি আছে, ইহা তাহারই মহিমা। এই ভক্তির মহিমার কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ৬৫-অনুচ্ছেদে ধৃত মাঠর-শ্রুতিবাক্য॥—ভক্তিই ইঁহাকে (ভক্তকে) (ভগবানের নিকটে) নিয়া থাকেন; (ভগবানের নিকটে নিয়া) ভক্তিই ইঁহাকে (ভক্তকে) ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত; ভক্তিই ভূয়সী।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তির (অর্থাৎ ভক্তের) বশীভূত হয়েন। রসিক-শেখরের ভক্তিরস-আস্বাদন-লোলুপতাই তাঁহার ভক্তবশ্যতার হেতু। এই রস-লোলুপতাবশতঃই ভক্তকেই তিনি সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। ভক্তই অতিপ্রিয়; যেহেতু, তাঁহার পরম-লোভনীয় ভক্তিরস বা প্রীতিরস ভক্তহৃদয়েই অবস্থিত।

দুর্ব্বাসার নিকটে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—সাধুভক্ত তাঁহার যত প্রিয়, তিনি নিজেও—তাঁহার নিজের স্বরূপও—তাঁহার নিকটে তত প্রিয় নহেন; অর্থাৎ ভক্তচিত্তের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া তিনি যত আনন্দ অনুভব করেন, নিজের স্বরূপকে—স্বরূপানন্দকে—আস্বাদন করিয়াও তত আনন্দ অনুভব করেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—সাধুভক্ত ব্যতীত, তাঁহার নিজের স্বরূপকেও তিনি অভিলায করেন না। ইহা হইতে জানা গেল—স্বরূপানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দেরই উৎকর্ষ অনেক অধিক।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আরও বলিয়াছেন—তাঁহার আত্যন্তিকী শ্রীকেও—সম্পৎকেও—তাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যকেও তিনি অভিলাষ করেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের আস্বাদনে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন, অথবা তাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান যাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতির আস্বাদনে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাও তিনি অভিলাষ করেন না; তিনি অভিলাষ করেন—সাধুভক্তকে। ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের অপর শ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥—শ্রীভা. ১১।১৪।১৫॥

—হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, আত্মযোনি (ব্রহ্মা) (আমার পুত্র হইলেও—ভগবানের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম বলিয়া ব্রহ্মাকে পুত্র বলা হইয়াছে) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন। শঙ্করও (আমার গুণাবতার হইলেও) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন। সঙ্কর্ষণ (শ্রীবলরাম, আমার ভ্রাতা হইলেও) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন। লক্ষ্মীদেবী (আমার কান্তা হইলেও) সেইরূপ প্রিয়তমা নহেন। এমন কি, আমি নিজেও (পরমানন্দঘনবিগ্রহ হইলেও) আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহি।"

এই শ্লোকে বলা হইল—ভগবান্ নিজের স্বরূপকেও উদ্ধবের মত প্রিয় মনে করেন না; ইহাদ্বারা স্বরূপানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে। আর, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ ও লক্ষ্মী হইতেছেন তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপ—তাঁহার ঈশ্বরত্বের বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ভাবও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়। তাঁহাদের উল্লেখে ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতেও ভক্ত্যানন্দের উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য আনন্দের মধ্যে ভক্ত্যানন্দই সর্ব্বাধিক উৎকর্ষময়।

## ১২৭। রসস্বরূপ ব্রহ্মের ভক্তবশ্যতা

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥ —প্রীতিসন্দর্ভধৃত-মাঠরশ্রুতিবাক্য, ৬৫-অনুচ্ছেদ॥ —ভগবান্ ভক্তির বশীভূত; ভক্তিই ভূয়সী।"

ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপ-শক্তি হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি—সুতরাং তাঁহার অনুগতা সেবিকা। অনুগতা সেবিকা কিরূপে তাঁহার সেব্য প্রভুকে বশীভূত করিতে পারে? বশীভূত করিতে হইলেই সেব্য-প্রভুর উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে হয়। অনুগতা সেবিকা কিরূপে সেব্য-প্রভু পরব্রহ্ম ভগবানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? সেব্য-প্রভু হইতে অনুগতা সেবিকার ন্যূনত্বই স্বাভাবিক; ভগবান্ হইতে ন্যূনা হইয়া স্বরূপ-শক্তি কিরূপে ভগবানের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে?

শ্রুতিই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"ভক্তিরেব ভূয়সীতি"-বাক্যে। ভূমাবস্তু পরব্রহ্মের স্বরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া স্বরূপ-শক্তিও ভূমাবস্তু—সুতরাং ব্যাপকত্বে ব্রহ্মেরই তুল্যবস্তু। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি প্রভাবে যেন ভগবান্ বহ্ম হইতেও গরীয়সী। একথার তাৎপর্য্য এই।

ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ ভগবানের সেবাই হইতেছে স্বরূপ-শক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য। সেবার তাৎপর্য্য হইতেছে—সেব্যের প্রীতিবিধান। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেনৈবামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্॥ গোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতিঃ।১৩॥" এই সেবার ব্যাপারে সেবকের নিজের ইহকালের বা পরকালের সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধানই থাকিবে না, নিজের সুখ-দুঃখের বা নিজের মঙ্গলামঙ্গলের কোনও চিন্তাই সেবকের মনে স্থান পাইবে না। স্থান পাইবে একমাত্র সেব্যের প্রীতিবাসনা। ভক্তি হইতেছে স্বসুখ-বাসনাশূন্যা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা বা সেবার বাসনা।

সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য বা প্রীতিবিধানের আনুকূল্য-সম্পাদনের জন্য যদি স্বরূপ-শক্তিকে বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে তাঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা দূষণীয় হইবে না, বরং শ্লাঘনীয়ই হইবে।

কথিত আছে, এক সময়ে কোনও এক বিপ্র শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের সেবাপ্রার্থী হইয়া আচার্য্যপাদের নিকটে বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রামানুজ বিপ্রকে বলিলেন—"যদি একান্তই আমার কোনওরূপ সেবা করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমিও তোমাকে একটী সেবা দিতেছি। তুমি প্রত্যহ আমাকে তোমার চরণোদক দিবে—ইহাই তোমার সেবা।" বিপ্র কোনওরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া আচার্য্যপাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিত্য তাঁহাকে নিজের চরণোদক দিতেন। "আচার্য্যপাদ আমার পূজনীয় ব্যক্তি, আমি তাঁহার কৃপাভিখারী ; তাঁহাকে আমার চরণোদক দিলে আমার প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা"—এইরূপ ভাবিয়া বিপ্র আচার্য্যকে চরণোদক দিতে যদি অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত—আচার্য্যের প্রীতিবিধান অপেক্ষা নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যই তাঁহার ভাবনা ছিল বেশী। ইহা হইত নিজেরই সেবা বা প্রীতিবিধান, সেব্য আচার্য্যের সেবা হইত না। আচার্য্যপাদের সেবার জন্য বিপ্র আচার্য্যপাদের গুরুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। সেবার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা বিপ্রের পক্ষে দূষণীয় হয় নাই, বরং শ্লাঘনীয়ই হইয়াছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গসেবক গোবিন্দও উপায়ান্তর না দেখিয়া এক সময়ে মহাপ্রভুর বক্ষঃ-স্থলের উপর দিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন—প্রভুর পাদসম্বাহনাদির জন্য। ইহাই হইতেছে সেবার বাস্তবিক তাৎপর্য্য।

পরব্রহ্ম ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য বা তাঁহার প্রীতিবিধানের আনুকূল্যসাধনের জন্যই তাঁহার সেবিকা স্বরূপশক্তি বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি তাঁহার উপরেও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে-স্থলে সেব্যের উপরে প্রভাব বিস্তার না করিলে সেবা হয় না, প্রভাব বিস্তার করিলেই সেবা হইতে পারে, সে-স্থলে সেবক বা সেবিকার পক্ষে স্বীয় সেব্য-প্রভুর উপরে প্রভাব-বিস্তার শ্লাঘনীয়ই হয়। পরব্রহ্মের পক্ষে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির বশ্যতা স্বীকারে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যেরও হানি হয় না ; যেহেতু, ভক্তি বা স্বরূপ-শক্তি তাঁহার নিজেরই স্বরূপভূতা শক্তি। নিজের শক্তির বশ্যতাস্বীকারে কাহারও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ পরব্রহ্মের কোন্ সেবার জন্য ভক্তিকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর এই।

রস-স্বরূপ বলিয়া পরব্রহ্ম হইতেছেন রস-আস্বাদক—রসিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ভক্ত্যানন্দের বা ভক্ত-হৃদয়স্থিত প্রীতিরসের—আস্বাদনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ। ভক্তের প্রীতিরস-নির্য্যাসের আস্বাদনের জন্য তাঁহার অত্যধিক লোলুপতাও আছে। কিন্তু ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদন করিতে হইলে রসের পাত্র ভক্তের—অর্থাৎ ভক্তের চিত্তস্থিত ভক্তির—বশ্যতা-স্বীকার অপরিহার্য্য। এইরূপ বশ্যতা স্বীকার না করিলে রসের আস্বাদন হইতে পারে না, আস্বাদনের অভিনয়মাত্র হইতে পারে। শৈশবে—যে সময়ে মা-ছাড়া শিশুর চলে না, ক্ষুধা

পাইলেও তাহা কাহাকেও জানাইতে পারে না, মশা-মাছিও তাড়াইতে পারে না, মল-মূত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও নিজে একটু অন্যত্র সরিয়া থাকিতে পারে না, সেই শৈশবে—শিশুকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। তখন শিশুর পক্ষে মায়ের নিকটে সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা। তখন মায়ের বাৎসল্য যেমনভাবে আস্বাদিত হইতে পারে, যৌবনে তেমন হয় না। যৌবনে—শৈশবের ন্যায়—মাতৃবশ্যতা বা মাতৃনির্ভরতা থাকে না। তখন মা-ছাড়াও অন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গের জন্য লোক লালায়িত হয়। তখন যদি কখনও মা আদর করিয়া কোনও উদ্দেশ্যে তাহাকে কতক্ষণ নিজের কাছে রাখিতে চাহেন, মায়ের মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া সেই লোক তখন মায়ের নিকটে হয়তো থাকিবে; কিন্তু তাহার মন হয়তো অন্য বন্ধু-বান্ধবের নিকটেই ছুটিয়া যাইবে। এই অবস্থায় তাহার মাতৃবাৎসল্যের আস্বাদন হইবে না, আস্বাদনের অভিনয়মাত্র হইবে। এজন্যই কোনও রসের আস্বাদন লাভ করিতে হইলে রসের আশ্রয় যিনি, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। রস-আস্বাদনের জন্য যাঁহার বলবতী লালসা, রসের পাত্রের বশ্যতা-স্বীকারে তাঁহার আগ্রহ এবং আনন্দও অত্যধিক।

ভক্তের প্রীতিরস-লোলুপ রসিক-শেখর পরব্রহ্মেরও প্রীতিরসের আশ্রয় ভক্তের বশ্যতা-স্বীকারের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ—বলবতী ইচ্ছা। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি তাঁহাকে এই বশ্যতা দান করিয়া এবং তদ্দ্বারা ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদনে তাঁহার আনুকূল্য সম্পাদন করিয়াই তাঁহার প্রীতিবিধানরূপ সেবা করিয়া থাকেন। ভক্তের বশীভূততা হইতেছে ভক্তচিত্তস্থা ভক্তির বা প্রীতিরই বশীভূততা। যাঁহার চিত্তে ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতি নাই, তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে রসিক-শেখরের কোনওরূপ আগ্রহ থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম রস-স্বরূপ বলিয়াই, ভক্তের প্রীতিরস-নির্য্যাসের আস্বাদনের জন্য তাঁহার বলবতী লালসা আছে বলিয়াই, তিনি ভক্তির বা ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও ভগবানের ভক্তবশ্যতা বা ভক্তিবশ্যতার কথা জানা যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯৷২৯॥

—সর্ব্বভূতেই আমি সমান, (সুতরাং) আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।"

তিনি পরমাত্মারূপে সকলের মধ্যেই আছেন; এ-বিষয়ে ইতর-বিশেষ কিছু নাই; সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তিনি—পরমাত্মারূপে তো আছেনই—স্বীয়রূপেও অবস্থান করেন। ভক্তের ভক্তির বশীভূত হইয়াই তিনি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই; কোনও ভক্তের হৃদয়ে যদি তিনি না থাকেন, আবার কোনও ভক্তের হৃদয়ে যদি থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইত। তিনি সকল ভক্তের হৃদয়েই অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন—

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ শ্রীভা. ২।৯।৩৪॥

—(ক্ষিত্যপ্-তেজ-আদি) মহাভূত সকল যেমন সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের (নতেষু) ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই।"

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিও বলেন—"ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥ ১৬॥—ভক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়।"

গোপালোত্তর-তাপনী আরও বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥ ১৮॥—সেই বিজ্ঞানঘন এবং আনন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অবস্থান করেন।" ইহা দ্বারাও ভগবানের ভক্তিবশ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

## ক। অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণেরও ভক্তবশ্যতা

পরব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া, যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া আছেন, তাঁহাদের সকলেও আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ। রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহারাও রস-আস্বাদক; সুতরাং তাঁহাদেরও ভক্তিবশ্যতা বা ভক্তবশ্যতা আছে।

ভগবান্ স্বতন্ত্র; তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে, ভক্তের বা ভক্তির বশীভূত বলিয়া ভক্তের নিকটে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা যেন নাই। তিনি যে ভক্তপরাধীন, একথা দুর্ব্বাসার নিকটে তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন।

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬৩॥

—হে দ্বিজ! (আমি স্বতন্ত্র বটি; কিন্তু) ভক্তজন-প্রিয় আমি অস্বতন্ত্রের মতই ভক্ত-পরাধীন; সাধুভক্তগণকর্ত্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়।"

প্রীতিসন্দর্ভের ৬৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিবৃতি-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যথা হি অস্বতন্ত্রঃ জীবঃ পরাধীনো ভবতি, তথৈবাহং স্বতন্ত্রোঽপি ভক্তপরাধীন ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ, ভক্তাখ্যৈঃ সাধুভিঃ মুমুক্ষাপর্য্যন্ত-কৈতবরহিতৈঃ গ্রস্তং ভক্ত্যা পরমবশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ, ভক্তজনেষু প্রিয়ঃ তৎপ্রীতিলাভেন অতিপ্রীতিমান্।—অস্বতন্ত্র জীব যেমন পরাধীন হয়, আমি স্বতন্ত্র হইয়াও তদ্রূপ ভক্ত-পরাধীন (সম্যক্‌রূপে ভক্তের অধীন)। ইহার হেতু এই যে, মুক্তিবাসনাপর্য্যন্ত যাবতীয় কৈতবরহিত (ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা তো দূরে, মোক্ষবাসনাকেও যাঁহারা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা বলিয়া মনে করেন, সুতরাং মোক্ষ-বাসনাও যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই) ভক্ত-নামে প্রসিদ্ধ সাধুগণকর্ত্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত—তাঁহাদের ভক্তিদ্বারা আমার হৃদয় অত্যন্ত বশীভূত (এজন্য আমি তাঁহাদের পরাধীন)। ইহার (এই ভাবে গ্রস্তহৃদয় হওয়ায়) হেতু এই যে—আমি ভক্তজন-সকলে প্রিয়, তাঁহাদের প্রীতি লাভ করিতে পারিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হই।"

সাধুভক্তগণের প্রীতি অনুভব করিয়া ভগবান্ নিজে যেমন অত্যন্ত প্রীত হয়েন—সুখী হয়েন, তেমনি তিনি আবার সেই সাধুভক্তগণের প্রতিও অতিশয় প্রীতি অনুভব করেন। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৬৫॥—সেই হ্লাদিনীরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎ-প্রীতি-নামে ভক্তচিত্তে বিরাজ করে। তারপর, সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি পোষণ করেন।"

সাধুভক্তগণও ভগবানের প্রতি পরম-প্রীতিমান্, আবার, ভগবান্ও তাঁহাদের প্রতি পরম-প্রীতিমান্। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই উভয়ের প্রীতি হয় পারস্পরিকী। এই প্রীতিসুখে তাঁহারা যে পরস্পরের প্রতি পরমাবিষ্টতা লাভ করেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক হইতে জানা যায়।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥

—শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে বলিতেছেন—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। সাধুগণ আমাব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, আমিও সাধুগণব্যতীত অন্য কিছু জানি না।"

প্রীতিসন্দর্ভের ৬৬-অনুচ্ছেদে এই শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"হৃদয়েন স্বস্য সামানাধিকরণ্যে বীজমাহ, মদন্যদিতি। অত্যন্তাবেশেনৈকতাপত্ত্যা জ্বলল্লোহাদাবগ্নি-ব্যপদেশবদত্রাপি অভেদ-নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ।—সাধুহৃদয়ের সহিত শ্রীভগবানের সামানাধিকরণ্যের (একত্রস্থিতির) কারণ বলিতেছেন—তাঁহারা আমাব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, আমিও সাধুগণব্যতীত অন্য কিছু জানি না। পরস্পরে অত্যন্ত আবেশ দ্বারা একতাপ্রাপ্তি হেতু, জ্বলন্ত-লৌহাদিকে যেমন অগ্নিরূপে বর্ণন করা হয়, তদ্রূপ এ-স্থলেও অভেদ-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" তাৎপর্য্য এই—অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—জ্বলন্ত-লৌহের সর্ব্বত্রই, প্রতি অণুতে পরমাণুতেই, যেমন আগুন বা আগুনের ধর্ম্ম বিদ্যমান, তদ্রূপ ভগবৎ-প্রীতির আবেশে ভক্তহৃদয়ের সর্ব্বত্রই যেন ভগবান্ বিদ্যমান, সেই হৃদয়ে ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুর স্থান নাই; তাই ভক্ত ভগবান্‌কে ছাড়া আর কিছু জানেন না এবং ভক্তের প্রতি প্রীতির আবেশে ভগবানের হৃদয়ের সর্ব্বত্রই যেন ভক্ত বিদ্যমান, সেই হৃদয়ে ভক্তব্যতীত অন্য কিছুর স্থান নাই; তাই ভগবান্ও ভক্তব্যতীত অন্য কিছু জানেন না। এই জন্যই বলা হইয়াছে—সাধুগণ ভগবানের হৃদয় এবং ভগবান্ও সাধুগণের হৃদয়। ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে—সাধুগণ বাস্তবিকই ভগবানের হৃদয় হইয়া যায়েন এবং ভগবান্ও সাধুগণের হৃদয় হইয়া যায়েন। জ্বলন্ত লৌহের উদাহরণের তাৎপর্য্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। জ্বলন্ত লৌহের সর্ব্বত্র অগ্নি-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও লৌহ লৌহই থাকে—লৌহ অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয় না এবং অগ্নিও লৌহত্ব প্রাপ্ত হয় না; তাহাদের কাহারও স্বরূপের হানি হয় না; স্বরূপগত পার্থক্য বর্ত্তমানই থাকে। এ-স্থলেও তদ্রূপ। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েই প্রীতি-সহকারে উভয়ের চিন্তা করেন বলিয়া পরস্পরের হৃদয় ব্যাপিয়া পরস্পর অবস্থান করেন; তাহার ফলে অন্য বস্তুর স্মৃতি তো দূরে, স্মৃতিস্থান হৃদয়েরও অনুসন্ধান থাকে না, থাকে কেবল পরস্পরের তন্ময়তা। এই পরম-আবেশজনিত

তন্ময়তাবশতঃই পরস্পরকে পরস্পরের হৃদয় বলা হইয়াছে—অগ্নিময় লৌহকেও যেমন কখনও কখনও কেহ কেহ অগ্নি বলিয়া থাকে, তদ্রূপ।

উল্লিখিত শ্লোকে ভক্ত ও ভগবান্—উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতিতে উভয়ের পরম-আবেশ দ্বারা উভয়ের নিকটে উভয়ের বশ্যতাই সূচিত হইতেছে। ভগবানের ভক্তবশ্যতা এত নিবিড় যে, তিনি ভক্তব্যতীত আর কিছুই জানেন না, ভক্তকেই তাঁহার স্বীয় হৃদয় বলিয়া মনে করেন।

ভগবান্ সঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর বাক্য হইতেও ভক্ত-ভগবানের পরস্পর-বশ্যতার কথা জানা যায়।

"অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেহপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥ শ্রীভা. ৬।১৬।৩৪॥

—চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে বলিতেছেন—হে অজিত! (অজিত হইলেও) সর্ব্বত্র-সমবুদ্ধি এবং জিতাত্মা সাধুগণকর্ত্তৃক আপনি জিত হইয়াছেন (তাঁহারা আপনাকে বশীভূত করিয়াছেন)। আর, আপনাকর্ত্তৃক সেই সাধুভক্তগণও পরাজিত হইয়া থাকেন; কেননা, তাঁহারা আপনাকে নিষ্কাম ভাবে ভজন করিলেও (তাঁহারা আপনার নিকটে আপনার সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই যদিও কামনা করেন না, তথাপি) আপনি পরম করুণ বলিয়া তাঁহাদের নিকটে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন।"

হরিভক্তি-সুধোদয়েও ভগবানের ভক্তিবশ্যতার কথা জানা যায়। ভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—

"সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ।
নৈষঃ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥

সদা মুক্তোহপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোহপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোহপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ॥ হরিভক্তিসুধোদয়।১৪।২৭-৩০॥

—হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ তোমার ভয় ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; তাহা (সেই গৌরব-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত ভয় ও সম্ভ্রম) পরিত্যাগ কর। ভক্তগণের এইরূপ সগৌরব-ব্যবহার আমার প্রিয় নহে (তাহাতে আমি প্রীতি অনুভব করি না)। তুমি স্বাধীন (নিঃসঙ্কোচ) ভাবে আমার প্রতি প্রণয় (প্রীতি) প্রকাশ কর। ভক্ত যদি নিঃশঙ্ক-প্রণয়সহকারে আমাকে দর্শন করেন এবং আমার সহিত কথা বলেন, তাহা হইলে আমি পূর্ণকাম হইলেও তাহা আমার নিকটে নূতন হইতেও নূতনরূপে প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আমি নিত্যমুক্ত হইলেও ভক্তের নিকটে স্নেহরজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকি। আমি অজিত হইলেও ভক্তের নিকটে জিত (পরাজিত) হই, অপরের অবশ্য (অবশীভূত) হইলেও ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

যিনি তাঁহার বন্ধুজনের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই রতি ( প্রীতি ) পোষণ করেন, আমি একমাত্র তাঁহারই, তিনিও আমারই ; আমাদের উভয়ের ( পরস্পর আমরা ব্যতীত ) অন্য সুহৃৎ ( বান্ধব ) নাই।”

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবানের প্রতি ভক্তের গৌরব-বুদ্ধিহীন এবং নিঃসঙ্কোচ প্রীতি ( বা ভক্তি ) থাকিলে সেই ভক্তির প্রভাবে পরম-স্বতন্ত্র এবং নিত্যমুক্ত ভগবান্‌ও ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন এবং ভক্তের প্রতি প্রীতিমান্‌ও হইয়া পড়েন।

হরিভক্তিসুধোদয়ের শ্লোকসমূহের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬৬-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—“তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং, ভগবৎ-প্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি। কিন্তুর্হি স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরূপা যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপি ইতি। যথাচ শ্রীমতী গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি॥—সুতরাং ভগবৎ-প্রীতিরূপা বৃত্তি যে মায়াদিময়ী ( বহিরঙ্গা মায়ার বৃত্তি ) নহে—এইরূপ যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই। তাহা হইলে ভগবৎ-প্রীতিটী কি বস্তু ? তাহা হইতেছে স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরূপা ( স্বরূপশক্তি হইতে জাত আনন্দ ), শ্রীভগবান্‌ও যে আনন্দের পরাধীন হইয়া থাকেন, সেই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিও একথা বলিয়াছেন—বিজ্ঞানমূর্ত্তি, আনন্দমূর্ত্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরস-স্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত আছেন।” স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি বা ভগবৎ-প্রীতি হইতেছে সচ্চিদানন্দরস-স্বরূপা ; এজন্য সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম একমাত্র ভক্তিযোগেই অধিষ্ঠিত, ভক্তিরই বশীভূত। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠর-শ্রুতিঃ।” বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, বশীভূত করিবে কিরূপে ? এজন্যই বলা হইয়াছে—ভগবৎ-প্রীতি মায়াদিময়ী নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—রসস্বরূপ ভগবানের—ভক্তহৃদয়ের প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য লোলুপতা আছে ; এই রস-লোলুপতাবশতঃই, যে ভক্ত স্বীয় হৃদয়স্থিত ভগবৎ-প্রীতিরস তাঁহার আস্বাদনের জন্য উপস্থাপিত করিতে পারেন, ভগবান্‌ও তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতিও প্রীতি পোষণ করেন।

## ১২৮। ভগবদ্‌বশীকরণী প্রীতির স্বরূপ

পূর্ব্বে উদ্ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়ের প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে—গৌরব-বুদ্ধিপ্রসূতা এবং গৌরব-বুদ্ধিপ্রসূতা বলিয়া ভীতিমিশ্রিত-সম্ভ্রমময়ী প্রীতিতে ভগবান্ প্রীতি অনুভব করেন না। একথাই শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—“সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্‌গৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষঃ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব।”

ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিলেই তাঁহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি জন্মে এবং এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি হইতেই চিত্তে সঙ্কোচ ও ত্রাস জন্মে ; তাহাতে প্রীতি শিথিল হইয়া যায়। এইরূপ প্রীতিতে ভগবান্ প্রীতি অনুভব করেন না। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—

“ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১।৩।১৪॥

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥১।৪।১৭॥

—তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর হইলেও ভক্তের চিত্তে যদি তাঁহার ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে ভক্তের প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ভগবান্ এতাদৃশী প্রীতির বশীভূতও হয়েন না, তাদৃশ ভক্তের অধীনও হয়েন না; কেননা, তিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত।"

জানা গেল—ভগবান্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতির বা ভক্তির বশীভূত হয়েন না। কিরূপ প্রীতির বশীভূত হয়েন? তাহাও পূর্ব্বে উদ্ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়ের প্রমাণ হইতে জানা যায়। ভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—"স্বাধীনপ্রণয়ী ভব। —তোমার প্রণয়—মদ্‌বিষয়িণী প্রীতি—যেন গৌরব-বুদ্ধির বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অধীন না হয়। তোমার প্রীতি যেন স্বাধীনা হয়; স্বাধীনা হইলে সেই প্রীতির প্রেরণায় যখন যে ভাবে তুমি আমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিবে, নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাই করিতে পারিবে; তখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে, কিম্বা আমার সঙ্গে কথা বলিতে, তোমার কোনওরূপ শঙ্কা বা সঙ্কোচ জন্মিবে না। প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে, আমার সহিত কথা বলিতে পারিবে। এইরূপ সঙ্কোচহীন এবং উচ্ছ্বাসময় প্রেমই আমার নিকটে নিত্য-নবনবায়মান আনন্দের উৎসরূপে প্রতীয়মান হয়। আমি পূর্ণকাম হইলেও আমি এতাদৃশ প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য লালায়িত। আমি নিত্যমুক্ত হইলেও ভক্তের এতাদৃশ-প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া আমি ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকি।"

"— ————স্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্‌ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে ॥
সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহংতৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ ॥"

ভগবদ্‌বিষয়ে এতাদৃশ প্রেম যাঁহার আছে, ব্যবহারিক জগতের স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার আর স্নেহ-মমতা থাকে না; তাঁহার স্নেহ-মমতা, তাঁহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি, সম্যক্‌রূপে কেন্দ্রীভূত হয় ভগবানে। ভগবান্‌ই হয়েন তখন তাঁহার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র প্রীতির পাত্র; এবং তাঁহার এতাদৃশ প্রেমের প্রভাবে ভগবান্‌ও একান্তভাবে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার একমাত্র বন্ধু এবং প্রীতির পাত্র বলিয়া মনে করেন।

"ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ ॥"

যে-স্থলে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান এবং তজ্জনিত গৌরব-বুদ্ধি, সে-স্থলে তদীয়তাময় ভাব—আমি তাঁহার, তিনি আমার অনুগ্রাহক, আর আমি তাঁহার অনুগ্রাহ্য, এইরূপ ভাব—জন্মিতে পারে; কিন্তু কখনও মদীয়তাময় ভাব—তিনি আমার, একান্তভাবে আমারই, এইরূপ ভাব—জন্মিতে পারে না; সুতরাং মমত্ব-বুদ্ধিও জন্মিতে পারে না।

যে-স্থলে মমত্ব-বুদ্ধি নাই, সে-স্থলে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধিও গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। যিনি আমার আপন-জন, তাঁহাকেই আমার প্রিয় বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক, তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্যই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাসনার উদ্ভব হয়। এতাদৃশী মমত্ববুদ্ধিময়ী যে প্রীতি, তাহাই প্রিয় ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে আপন করিতে, নিজের বশীভূত করিতে সমর্থা। ভগবান্‌ও এতাদৃশী মমত্ব-বুদ্ধিময়ী প্রীতিরই বশ্যতা স্বীকার করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

বলাবাহুল্য, এতাদৃশী মমত্ববুদ্ধিময়ী ভগবৎ-প্রীতি ব্রহ্মাণ্ডস্থ কোনও সাধক ভক্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না; যেহেতু, "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।১৪॥" তবে এতাদৃশী ভগবৎ-প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত উপায়ে সাধন করিলে সাধক-ভক্ত সিদ্ধাবস্থায় ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিলে তাহা পাইতে পারেন। ভগবানের পরিকর-ভক্তবিশেষের মধ্যেই এতাদৃশী মমত্ববুদ্ধিময়ী প্রীতি বা শুদ্ধাভক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত। এই প্রীতি গাঢ়তা লাভ করিয়া স্তরবিশেষে উন্নীত হইলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে স্বরূপগত যে পার্থক্য, ভক্তের চিত্ত হইতে, প্রীতিরই প্রভাবে, সেই পার্থক্যের জ্ঞানও দূরীভূত হইয়া যায়। তখন সেই ভক্ত ভগবান্‌কেও নিজের সমান মনে করেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সখাগণ। ইহা আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া এমন এক স্তরেও উন্নীত হইতে পারে, যাহাতে ভক্ত নিজেকেই ভগবানের লালক, পালক এবং অনুগ্রাহক মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের লাল্য, পাল্য এবং অনুগ্রাহ্য মনে করেন—নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন, প্রীতির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণকে আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করেন; যেমন, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন পরিকর নন্দ-যশোদা। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ পরিকর-ভক্তেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে ভক্ত,

"আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥১।৪।২৫॥

—গাঢ়-মমত্ববুদ্ধিময়ী প্রীতিবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে ছোট মনে করেন, আমিও তাঁহার প্রীতির বশীভূত হইয়া তাঁহাকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করি, নিজেকে ছোট মনে করি। আমা অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করিতে না পারিলেও, যিনি আমাকে তাঁহার সমান মনে করেন, তাঁহার প্রীতির বশীভূত হইয়া আমিও নিজেকে তাঁহার সমান মনে করি।" ইহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার উক্তির অনুরূপ কথাই।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥৪।১১॥"

"আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৮॥"

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবদ্‌বশীকরণী প্রীতির স্বরূপ হইতেছে এই যে—এই প্রীতি হইবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-শূন্যা, সুতরাং মমত্ববুদ্ধিময়ী।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা প্রীতিতে ভগবান্ যে মোটেই বশ্যতা স্বীকার করেন না, তাহা বলাও সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, তাঁহার আস্বাদনীয় আনন্দের মধ্যে একটী আনন্দ হইতেছে ঐশ্বার্য্যানন্দ; এই ঐশ্বর্য্যানন্দও স্বরূপ-

শক্ত্যানন্দেরই একটী বৈচিত্রী। এই ঐশ্বর্য্যানন্দও তিনি যখন আস্বাদন করেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে-সমস্ত পরিকরের সহিত লীলা-প্রসঙ্গে এই ঐশ্বর্য্যানন্দ উৎসারিত হইয়া তাঁহার আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতিরও তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন ; তাহা না হইলে আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না।

অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা প্রীতির নিকটে বশ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা প্রীতির নিকটে বশ্যতা সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। তিনি বশীভূত হয়েন প্রীতির, ঐশ্বর্য্যের বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের বশীভূত হয়েন না ; সুতরাং যে-স্থলে প্রীতির যতটুকু বিকাশ, সে-স্থলে তাঁহার বশ্যতাও ততটুকু। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা প্রীতিতে প্রীতির আংশিক বিকাশ ; সুতরাং সেই প্রীতির নিকটে তাঁহার বশ্যতাও আংশিকী। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা প্রীতিতে প্রীতির অবাধ পূর্ণবিকাশ ; সুতরাং এই প্রীতির নিকটে তাঁহার বশ্যতাও পরিপূর্ণা। প্রীতির গাঢ়তার তারতম্যানুসারেই বশ্যতার তারতম্য। যে প্রীতি সান্দ্রতমা, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না ; তাই তাহা হয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা ; তাহার নিকটে ভগবানের বশ্যতাও পূর্ণতমা। যে প্রীতি তত সান্দ্র নহে, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি প্রবেশ করিতে পারে। প্রীতির সান্দ্রতার বৈচিত্রী অনুসারে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের পরিমাণাদিও নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করে এবং তদনুসারে ভগবানের বশ্যতাও নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে।

## ক। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধীন ; প্রেম তাঁহার অধীন নহে

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা প্রীতির নিকটে রসিক-শেখর পরব্রহ্মের বশ্যতা যে কিরূপ গাঢ়, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর একটী উক্তি হইতে তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।"—ইত্যাদি ১০।১৩।২৫-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণোহি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব, প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব শ্রীস্বামিচরণৈরপি উক্তম্। এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবারমিতি স চ প্রেমা বাৎসল্যাদিরূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্য্যম্ অননুসন্দধানোঽধীনীভূত এব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। ন চ মহামহেশ্বরস্য তস্য এবং পারতন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যং প্রত্যুত ভূষণমেব যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথা এব ঈশ্বরস্যানন্দরসময়স্যাপি প্রেমপারতন্ত্র্যং প্রতিক্ষণ-বর্দ্ধমান-নিরতিশয়ানন্দার্থকমেব ইতি মহানুভাবৈরনুভূতম্।"

**মর্ম্মানুবাদ।** শ্রীকৃষ্ণ মহামহেশ্বর বলিয়া ব্রহ্মাদিকে, এমন কি, তাঁহার স্বাংশ-ভগবৎস্বরূপগণকে পর্য্যন্ত তিনি নিজের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন ; এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বতোভাবে প্রেমের অধীনই ; প্রেম কিন্তু তাঁহার অধীন নহে। এজন্য, প্রেমের উপরে তাঁহার কোনওরূপ প্রভুত্ব নাই বলিয়া তিনি প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ। অতএব শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন। এইরূপ বৈষম্য ( যিনি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে পর্য্যন্ত নিজের অধীন করিতে সমর্থ, তিনি স্বয়ং প্রেমের অধীন—এইরূপ বৈষম্য ) কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্নিবার। এই প্রেম বাৎসল্যাদিরূপে

তাঁহার মাতৃ-আদিতে বিরাজিত। মহারাজচক্রবর্ত্তীর নিকটে মণ্ডলেশ্বরের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাতৃ-আদির সমীপে স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের অধীনীভূত হইয়াই সর্ব্বদা বিরাজ করেন। মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এইরূপ পারতন্ত্র্য দূষণীয় নহে, প্রত্যুত ভূষণস্বরূপই। যেহেতু, তাঁহার এইরূপ পারতন্ত্র্য—পরাধীনত্ব—দুঃখের হেতু হয় না। জীবের মায়াধীনত্ব হয় দুঃখের হেতু; কিন্তু আনন্দরসময় হইয়াও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের বা প্রেমিক ভক্তের অধীন হয়েন, তাঁহার এই পারতন্ত্র্য—পরবশীভূতত্ব—কিন্তু প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল নিরতিশয় আনন্দের হেতুই হইয়া থাকে। এজন্য এই পারতন্ত্র্য ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রুতিপ্রোক্ত "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"—বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্যই চক্রবর্ত্তিপাদের উল্লিখিত উক্তিতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রেমভক্তির বশীভূত। প্রেমভক্তির বশীকরণী শক্তির প্রভাব তাঁহার নিজের প্রভাব ( নিজের মহামহেশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্য ) অপেক্ষাও গরীয়ান্। প্রেমভক্তির উপর তিনি কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। "ভক্তিরেব ভূয়সী।"

## ১২৯। ধামভেদে ভগবানের আস্বাদ্য-প্রীতির ভেদ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন এবং এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেরই স্ব-স্বধাম আছে, পরিকরাদিও আছেন এবং পরিকরদের সহিত লীলাও আছে।

পরব্রহ্ম রসস্বরূপ বলিয়া রসত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত। সুতরাং, তাঁহারই বিভিন্ন-প্রকাশরূপ ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহেও এই রসত্ব থাকিবে; যেহেতু, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপেও তিনি একরূপ ( ১।১।৭৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপকে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই বলা যায়। প্রত্যেক স্বরূপই রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক। প্রত্যেক স্বরূপই স্ব-স্ব-স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন।

যে ভগবৎ-স্বরূপে রসের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্ত, সেই স্বরূপের পরিকরগণের মধ্যেও সেই রসবৈচিত্রীর অনুরূপ ভগবৎ-প্রীতি অভিব্যক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে লীলায় সেই প্রীতিরসই উৎসারিত হয় এবং এইরূপে উৎসারিত প্রীতিরসই তিনি আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের আস্বাদন। তিনি স্বীয় স্বরূপানন্দও আস্বাদন করিয়া থাকেন; যেহেতু, উভয়রূপ আনন্দের আস্বাদনই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বভাব বলিয়া প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরও স্বভাব।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসত্বাদির অভিব্যক্তিতে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিরও বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য থাকিবে; নচেৎ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ বৈচিত্রীহীন হইয়া পড়িবে। যেই ভগবৎ-স্বরূপে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির—রসত্বের—যেরূপ বিকাশ, বিকশিত মাধুর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের যেরূপ মিশ্রণ, সেই স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিও তদনুরূপ বৈচিত্রীই ধারণ করিবে; তাহা না হইলে, সেই স্বরূপের আস্বাদ্য স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরস বা প্রীতিরসও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেখা যায়, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরদের ভগবৎ-প্রীতিও বিভিন্ন রকমের,

অর্থাৎ বিভিন্ন বৈচিত্রীময়ী। ভগদ্ধাম-সমূহও ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহে অভিব্যক্ত রসত্বের—ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির এবং তাঁহাদের পরিকরাদির ভাবের—অনুরূপই। তাহা না হইলে যথাযথ ভাবে রসপুষ্টি এবং রসের উৎসারণ সম্ভব হয় না। লীলা, লীলারস এবং লীলারসের উৎসারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ধামই পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য বিধান করে।

এইরূপে দেখা যায়—বিভিন্ন ভগবদ্ধামে ভগবানের আস্বাদ্য প্রীতিরসও বিভিন্ন-বৈচিত্রীময়।

## ক। পরব্যোমের কৃষ্ণপ্রীতি

পরব্যোম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম। পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যেরই বিশেষরূপে প্রকাশ, মাধুর্য্যের প্রকাশ তদপেক্ষা কম। এই ধামের ভগবৎ-পরিকরদের চিত্তেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা। এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা প্রাতি রসরূপে পরিণত হইয়া লীলাব্যপদেশে যখন উৎসারিত হয়, তাঁহাদের সহিত লীলাবিলাসী ভগবৎ-স্বরূপ তাহা আস্বাদন করেন। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তদের প্রীতিকে **শান্তরতি** বলে। আর শান্তরতিযুক্ত ভক্তকে শান্তভক্ত বলে। শান্তরতির বিশেষ লক্ষণ হইল—"স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭৩॥" এবং "কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭৪॥ "কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭৫॥" কিন্তু ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে (পরব্যোমস্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশ-বিশেষে) মমত্ববুদ্ধি—মদীয়তাময় ভাব—শান্তভক্তের চিত্তে জন্মিতে পারে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন। পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ শ্রীচৈ.চ. ২।১৯।১৭৭॥ কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে॥ শ্রীচৈ.চ. ২।১৯।১৭৮॥"

## খ। দ্বারকা-মথুরার কৃষ্ণপ্রীতি

দ্বারকা-মথুরায় পরব্যোম অপেক্ষা মাধুর্য্যের অনেক অধিক বিকাশ; ঐশ্বর্য্যের বিকাশও বেশী। দ্বারকা-মথুরাবিহারী ভগবৎ-স্বরূপে—বাসুদেবে—ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যের বিকাশ। পরিকরগণের চিত্তেও ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়ী প্রীতি (রতি)। সময় সময় আবার ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তখন মাধুর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

দ্বারকা-মথুরায় চারি ভাবের চারি রকমের পরিকর আছেন। চারি রকমের কৃষ্ণরতির নাম—দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং কান্তারতি। দাস্যরতির পরিকর—শ্রীকৃষ্ণসারথি-দারুকাদি; সখ্যভাবের পরিকর—অর্জ্জুনাদি; বাৎসল্যভাবের পরিকর—বসুদেব-দেবকী-আদি এবং কান্তাভাবের পরিকর—রুক্মিণী-আদি মহিষীবৃন্দ।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা। সমান-সমান ভাব। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের সখ্যপ্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল; পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে নিজের ধৃষ্টতা মনে করিয়া, অর্জ্জুন করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭০॥"

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহার-শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥ ১১।৪১-৪২॥"

—বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদবশতঃ, অথবা প্রণয়বশতঃ তোমাকে আমার সখা মনে করিয়া, 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে'—এই ভাবে হঠাৎ যে সকল সম্বোধন-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন-গ্রহণ এবং ভোজনাদির সময়ে পরিহাসচ্ছলে অন্যের অসমক্ষে এবং বন্ধুজনের সমক্ষেও তোমার প্রতি যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, অচিন্ত্যপ্রভাব-সম্পন্ন তুমি আমার ঐ-সকল ক্ষমা কর—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

এ-স্থলে দেখা গেল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে বাৎসল্য-ভাবও সঙ্কুচিত হয়, তাহা এক্ষণে দেখান হইতেছে।

কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন কংস-কারাগারে যাইয়া দেবকী-বসুদেবের বন্ধন-মোচন করিয়া দিলেন এবং পিতৃমাতৃ-জ্ঞানে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন, তখন দেবকী-বসুদেব সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে পড়িল—"এই শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রতি কৃপাবশতঃ কংস-কারাগারে তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাহা শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং নিজমুখেই জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ভগবান্। তাঁহাদেরই প্রার্থনায় তিনি তাঁহার চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করিয়া প্রাকৃত-শিশুবৎ দ্বিভুজ হইয়াছিলেন। বসুদেবই এই দ্বিভুজ শিশুকে গোকুলে নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সেই শিশুই একাদশবর্ষ বয়সে কংসকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের বন্ধন-মোচন করিয়াছেন। তিনি তো স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিতেছেন!" এইরূপ ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করায়—যে সদ্যোজাত শিশুকে কংস-ভয়ে বন্ধুগৃহে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এগার বৎসর পরে সেই শিশুই আসিয়া তাঁহাদের কারামুক্তি দান করিলেন; কিন্তু দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে নিজেদের সম্মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপনীত শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যের আবেশে দেবকী-বসুদেব ছুটিয়া গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিলেন না। ভগবান্ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইলেন। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের উদয়ে বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

"বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হইল॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৬৯॥"

"দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ শ্রী. ১০।৪৪।৫১॥

—(কংস-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যখন কংস-কারাগারে গিয়া দেবকী-বসুদেবকে নমস্কার করিলেন,

তখন ) দেবকী ও বসুদেব তাঁহাদের এই পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা ( কৃষ্ণবলরাম তাঁহাদের—দেবকী-বসুদেবের ) চরণ বন্দনা করিলেও শঙ্কাবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদিগকে ( তাঁহাদের পুত্রদ্বয়কে ) আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।”

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যে কান্তাপ্রীতিও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাহার একটী প্রমাণ এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

“কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস।
‘কৃষ্ণ ছাড়িবেন’ জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥ শ্রীচৈ. চ ২।১৯।১৭১॥”

এক সময়ে শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—“সুন্দরি! তুমি রাজকন্যা; সুতরাং কোনও রাজপুত্রকেই তোমার বিবাহ করা উচিত ছিল। আমি রাজাদিগের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে ( দ্বারকায় ) বাস করিতেছি; নিজেও রাজা নহি; আমাকে বিবাহ করা তোমার ভাল হয় নাই। আরও দেখ—আমি দেহে ও গেহে উদাসীন, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে আকাঙ্ক্ষাশূন্য এবং আত্মসুখে সুখী ( আত্মারাম ); সুতরাং আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছ। অতএব তোমার উপযুক্ত কোনও রাজাকে তুমি আবার বিবাহ কর, ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০।৬০।১০-২০॥”

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি শুনিয়া রুক্মিণীদেবী মনে করিলেন—”শ্রীকৃষ্ণ তো সত্য কথাই বলিলেন। তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বলিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার কোনওরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকার সম্ভাবনা বাস্তবিকই তো তাঁহার নাই। তিনি তো আত্মারাম—স্ত্রীপুত্রাদিতে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? সুতরাং আমাদের প্রতি তাঁহার বাস্তবিক কোনও আসক্তিই নাই যখন, তখন তিনি যে কোনও মুহূর্ত্তেই তো আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন।”

শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক রুক্মিণীর সঙ্গে পরিহাসই করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রুক্মিণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি পরিহাস-বাক্যকেও পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না—সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তাই তাঁহার মধুরা কান্তারতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আর সম্যক্‌রূপে প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। রুক্মিণী মনে করিলেন—“আমি সামান্যা নারী, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর; তিনি কিরূপে আমার প্রাণবল্লভ হইতে পারেন? শিশুপালাদি তাঁহাকে হিংসা করিত, তাহারা আমাকে নিতে চাহিয়াছিল; তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য, তাহাদিগকে অপদস্ত করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া আসিয়াছেন—আমার প্রতি বিশেষ প্রীতিবশতঃ তিনি আমাকে আনেন নাই। শিশুপালাদি অপদস্ত হইয়াছে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। আমাতে তো তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই; সুতরাং যে কোনও মুহূর্ত্তেই তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।” এইরূপ ভাবনার ফলে রুক্মিণীর কি অবস্থা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

“তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্ রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥—শ্রীভা. ১০।৬০।২৪॥

—অত্যন্ত দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্তের বলয় শিথিল হইয়া গেল এবং তাঁহার সেই হস্ত হইতে ব্যজন ( বা চামর ) ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাঁহার হতজ্ঞান দেহও মোহপ্রাপ্ত হইয়া আলুলায়িত কেশে বাতাহত-কদলীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া গেল।”

এ-স্থলে দেখা গেল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রীতিও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বারকা-পরিকরদের কৃষ্ণরতি পরব্যোম-পরিকরদের কৃষ্ণরতি হইতে গাঢ় হইলেও এমন গাঢ় নয়, যাহাতে তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির সহিত সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান মিশ্রিত থাকিলেও, তাহা সকল সময় প্রাধান্য লাভ করে না; সময় সময় প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিরই আধিক্য। পরব্যোমে কিন্তু সকল সময়েই প্রীতি অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের আধিক্য থাকে। ইহাই এই দুই ধামের কৃষ্ণরতির পার্থক্য।

দ্বারকা-মথুরায় সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিরই আধিক্য থাকে বলিয়া মমত্ববুদ্ধিও কিছু বিকশিত হয়; এজন্য দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা “পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ” নহে। এজন্য দ্বারকা-মথুরায় শান্তরতি নাই। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান যখন প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, তখন অবশ্য ”পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ” হয়; কিন্তু এই ভাবটী ক্ষণস্থায়ী।

পরব্যোমে “পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ” বলিয়া কোনও পরিকরই তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ নারায়ণাদিকে নিজের সমানও মনে করিতে পারেন না, নিজের পুত্র বা পুত্র-স্থানীয়ও মনে করিতে পারেন না। এজন্য সখ্য-বাৎসল্য-রতির স্থান পরব্যোমে নাই। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবশ্য শ্রীনারায়ণের প্রতি কান্তাভাব আছে; কিন্তু তাহাতেও রুক্মিণী-আদি দ্বারকা-মহিষীগণের কান্তাভাব অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান অনেক অধিক।

## গ। ব্রজের কৃষ্ণপ্রীতি

ব্রজেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ( কান্তারতি )—এই চারিভাবের পরিকর আছেন। রক্তক-পত্রকাদি দাস্যভাবের, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্য-ভাবের এবং শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ মধুরভাবের বা কান্তারতির পরিকর। কিন্তু ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি ভাব দ্বারকা-মথুরার দাস্য-সখ্যাদি হইতে এক অপূর্ব্ববৈশিষ্ট্যময়।

ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্মত্বের এবং ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ; সুতরাং ব্রজে পরব্রহ্মের সমস্ত স্বরূপগত-শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ। তথাপি কিন্তু মাধুর্য্যেরই পূর্ণতম প্রাধান্য, ঐশ্বর্য্য এ-স্থলে মাধুর্য্যের অনুগত। ব্রজের মাধুর্য্য পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্য্যকেও কবলিত করিয়া রাখে। ঐশ্বর্য্যও সাধারণতঃ মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করে—তাহাও কেবল মাধুর্য্যের সেবার উদ্দেশ্যে, লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত। ঐশ্বর্য্য সাধারণতঃ ভীতি ও সঙ্কোচ জন্মায়; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্য তাহা করে না, বা করিতে পারে না।

একটী বোল্‌তাকে যদি গাঢ় চিনির রসে কতক্ষণ ডুবাইয়া ধরিয়া রাখা যায়, তাহার পরে তাহাকে তুলিয়া আনিলে যদি সে জীবিত থাকে, তাহাহইলেও দেখা যায়, বোল্‌তা হুল ফুটাইতে পারে না ; তাহার হুল গাঢ় চিনির রসে জড়াইয়া যায়। তদ্রূপ, ব্রজের পূর্ণবিকাশময় ঐশ্বর্য্যও গাঢ় মাধুর্য্যরসে পরিনিষিক্ত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া হুল ফুটাইবার—অর্থাৎ ত্রাস ও সঙ্কোচ জন্মাইবার—শক্তি যেন হারাইয়া ফেলে। আবার, গাঢ় চিনির রসে বিমণ্ডিত বোল্‌তাটীকে কৌতুহলবশতঃ কোনও শিশু জিহ্বাদ্বারা লেহন করিলে মিষ্টত্বের অনুভবই পাইবে; তদ্রূপ, ব্রজের গাঢ় মাধুর্য্য-রসে বিমণ্ডিত ঐশ্বর্য্যও পরম-মধুর। এইরূপই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের ধর্ম্ম। ইহাই অন্যান্য ধাম অপেক্ষা ব্রজের ঐশ্বর্য্যের বিশেষত্ব।

ব্রজপরিকরদের কৃষ্ণরতিও অত্যন্ত গাঢ়, এমন গাঢ় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের ন্যায়, তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধি জ্ঞানও যেন অতিসান্দ্র-প্রীতিরসের অগাধ-সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম—এই জ্ঞান সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন থাকে, তাঁহার পরিকরদের চিত্তেও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণও তাঁহাদের স্বরূপের কথা—তাঁহারা যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই, অথবা তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই প্রকাশ-বিশেষ, এই কথা—তাঁহারা যেন ভুলিয়া থাকেন। লীলারস-পুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তিই তাঁহাদের চিত্তে নিজেদের সম্বন্ধে জীববুদ্ধি জাগ্রত করিয়া রাখে। শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহারা তদনুরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দযশোদা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাগণ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রাণবল্লভ, কান্ত। ব্রজপরিকরদের এতাদৃশী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-লেশহীনা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে কেবলা রতি বা শুদ্ধ-প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না, শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াও মনে করেন না ; তখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানই তাঁহাদের সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে।

"কেবলার শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭২॥"

মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে যশোদা-মাতা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং সমস্ত তত্ত্বাদি এবং ব্রজমণ্ডলসহ কৃষ্ণকে এবং নিজেকেও দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বের কথাও যেন তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎই যশোদার বাৎসল্যময়ী-প্রীতি তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল এবং বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া দৃঢ়রূপে স্বীয় বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"ত্রয্যা চোপনিষদ্‌ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ শ্রীভা. ১০।৮।৪৫॥

—বেদত্রয়ে ( বেদত্রয়ের সংহিতাংশে বা কর্ম্মকাণ্ডে ইন্দ্রাদি-দেবতারূপে ), উপনিষদে ( বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে ), সেশ্বর-সাংখ্যে ( পুরুষরূপে ), যোগশাস্ত্রে ( পরমাত্মারূপে ) এবং ( নারদপঞ্চরাত্রাদি ) সাত্বত-শাস্ত্রে

( ভগবান্‌রূপে ) যাঁহার মহিমা গীত হইয়া থাকে, যশোদা সেই হরিকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।”

আবার, দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান দেহেই বিভুত্ব-ধর্ম্ম প্রকটিত হইয়া বন্ধনের বাধা জন্মাইতে লাগিল। যশোদা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, তাঁহাকে বাঁধিতেই লাগিলেন—প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত-রমণী তাঁহার প্রাকৃত-শিশুকে যেমন ভাবে বাঁধিতে থাকেন, ঠিক তদ্রূপ ভাবে।

“তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ শ্রীভা. ১০।৯।১৪॥

—গোপিকা যশোদা অব্যক্ত, মনুষ্যলিঙ্গ ও অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করিয়া প্রাকৃত বালকের মতন রজ্জুদ্বারা উলূখলে বাঁধিয়াছিলেন।”

গোবর্দ্ধন-ধারণাদি-লীলায় নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়াছেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, নিজেদের সন্তান বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

কংস-বধের এগার বৎসর পূর্ব্বে কংস-কারাগারে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, দেবকী-বসুদেব দ্বিভুজরূপে কৃষ্ণকে তাঁহাদের চরণ-বন্দনা করিতে দেখিয়াও তাহা ভুলিতে পারেন নাই; তাই তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও নন্দ-যশোদা তাঁহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি না করিয়া নিজেদের সন্তান বলিয়াই মনে করিলেন। মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় যশোদা সাময়িকভাবে যে ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, স্বীয় প্রগাঢ়-বাৎসল্যের প্রভাবে ক্ষণকাল পরেই তাহাকে যেন স্বপ্নবৎ মনে করিলেন, পরে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। ইহা হইতেই দ্বারকা-মথুরার এবং ব্রজের বাৎসল্যের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের পরিকর সুবল-শ্রীদাম-মধুমঙ্গলাদিও অঘাসুর-বকাসুরাদি-বধে শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন; তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, গাঢ়-প্রীতির বশে তাঁহাদের সখা বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত খেলায় শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলে, পূর্ব্ব-পণ-অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিজেদের পদদ্বয় ঝুলাইয়া দিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না।

“উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥ শ্রীভা. ১০।১৮।২৪॥

—খেলায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে, প্রলম্ব বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন।”

কান্তাভাবের পরিকর ব্রজসুন্দরীগণও শ্রীকৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু প্রগাঢ়-প্রীতির প্রভাবে তাঁহারাও তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে না করিয়া নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও অর্জ্জুনের ন্যায় ব্রজসখাদের সখ্যপ্রীতি, কিম্বা মহিষীদিগের ন্যায় ব্রজ-গোপীদের কান্তাপ্রীতি কখনও সঙ্কুচিত হয় না।

ব্রজের দাস্যভাবেও পরব্যোম-পরিকরদের শান্তভাবের গুণ কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা আছে। ব্রজপরিকরগণও কৃষ্ণব্যতীত অপর কিছু জানেন না, কৃষ্ণসেবাব্যতীত অপর কিছু কামনাও করেন না ; কিন্তু তাঁহাদের এই কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধিবশতঃ নয়, পরন্তু প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি এবং মমত্ব-বুদ্ধিবশতঃ। শান্তের গুণ কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতাব্যতীতও ব্রজের দাস্যের আর একটী গুণ আছে—মমত্ব-বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবন—প্রেমসেবা। এই প্রেমসেবা পরব্যোমে নাই ; যেহেতু, প্রেমসেবার ভিত্তিস্বরূপ মমত্ববুদ্ধি সেই ধামে নাই। ব্রজের দাস্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে প্রভু-বুদ্ধি—সেব্য-মনিব-বুদ্ধি—আছে এবং তজ্জনিত গৌরব-বুদ্ধি আছে। এই গৌরব-বুদ্ধি সেবা-বিষয়ে একটু সঙ্কোচ জন্মায়।

ব্রজের সখ্যে, দাস্য অপেক্ষাও প্রীতির এবং মমত্ব-বুদ্ধির গাঢ়তা ; এত গাঢ় যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গৌরব-বুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। প্রীতির এবং মমতার গাঢ়তাবশতঃ ব্রজের সখ্যভাবের পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সমান-সমান মনে করেন,—শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও আরোহণ করেন, তাঁহার মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফল দিতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। নিজের মুখে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল দিতে যেমন কাহারও সঙ্কোচ হয় না, ঠিক তদ্রূপ।

সখ্যে আছে—দাস্যের কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা, প্রেমসেবা, অধিকন্তু গৌরব-বুদ্ধিহীনতা।

ব্রজের বাৎসল্যে, সখ্যের উল্লিখিত তিনটী গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে—প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির অধিকতর গাঢ়ত্ববশতঃ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লাল্য-জ্ঞান, পাল্য-জ্ঞান, অনুগ্রাহ্য-জ্ঞান এবং নিজেদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লালক-পালক-অনুগ্রাহক-জ্ঞান। এজন্য বাৎসল্যের পরিকর যশোদামাতা প্রয়োজন মনে করিলে পুত্রবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে শাসনও করেন, তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও করেন। সখারা তাহা পারেন না ; নিজের কোনও অন্যায়-কর্ম্মের জন্য কেহ যেমন নিজেকে তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করে না, তদ্রূপ।

ব্রজের মধুরভাবে বা কান্তারতিতে শান্তের কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের গৌরব-বুদ্ধিহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালনাদি তো আছেই, তদতিরিক্ত আছে, প্রীতির এবং মমত্ববুদ্ধির সর্ব্বাতিশায়ী গাঢ়ত্ববশতঃ, সর্ব্বতোভাবে—এমন কি বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম এবং স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বকও—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ বাসনার পূরণ।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই চারিভাবের কৃষ্ণরতিতে, উত্তরোত্তর গুণাধিক্য—সুতরাং স্বাদাধিক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতারও আধিক্য—বর্ত্তমান।

এইরূপে দেখা গেল, ধামভেদে পরিকর-ভক্তদিগের কৃষ্ণপ্রীতির বৈচিত্রী-ভেদ আছে এবং প্রীতি-বৈচিত্রীরস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ-চমৎকারিত্ব অনুভব করেন, তাহারও বৈচিত্রীভেদ বিদ্যমান্।

## ১৩০। রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দ-দায়কত্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১২৭-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, রস-স্বরূপ ভগবান্ পরব্রহ্ম তাঁহার ভক্তের

প্রতি প্রীতিমান্। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মই হইতেছে—প্রীতির পাত্রের বা প্রীতির বিষয়ের প্রীতি-বিধান করা, চিত্ত-বিনোদন করা। এজন্য ভক্ত যেমন সর্ব্বদাই লালায়িত থাকেন ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য, ভগবান্ও সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন তাঁহার ভক্তের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণবচন ॥

—আমি যে বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্যই হইতেছে, আমার ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন।"

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিও বলেন—

"এষ হি এব আনন্দয়াতি ॥ আনন্দবল্লী। ৭ ॥—এই পরব্রহ্মই আনন্দ দান করেন।"

তিনি সকলকেই আনন্দ দান করেন, অপর কেহ কাহাকেও আনন্দ দান করিতে পারে না; কেননা, অপর কেহ আনন্দ নয়, আনন্দস্বরূপ নয়, আনন্দময় নয়। একমাত্র পরব্রহ্মই আনন্দ (আনন্দো ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী। ৬ ॥), আনন্দ তাঁহারই (আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী। ৪ ॥), তিনিই আনন্দময় (আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র। ১।১।১২ ॥)।

কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি লাভ করেন, লাভ করিয়া যিনি তাঁহার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনিই আনন্দের পরিপূর্ণতায় মহীয়ান্ হইতে পারেন, আনন্দী হইতে পারেন।

"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয়। আনন্দবল্লী। ৭ ॥

—সেই রস-স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।"

তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না, আনন্দীও হইতে পারে না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥—
—কঠোপনিষৎ ॥১।২।২৩॥ মুণ্ডক-শ্রুতি॥৩।২।৩॥

—প্রবচনের (কেবল শাস্ত্রাধ্যয়নের বা শাস্ত্রব্যাখ্যার) দ্বারা, কেবল মেধাদ্বারা (ধারণা-শক্তিদ্বারা), কিম্বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও এই আত্মাকে (পরব্রহ্মকে) পাওয়া যায় না। পরন্তু, ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারই নিকটে এই আত্মা (পরব্রহ্ম) স্বীয় তনুকে (শ্রীবিগ্রহকে) প্রকটিত করেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম কৃপা করিয়া আনন্দ দান করেন বলিয়াই তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণ আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দী হইতে পারেন। তিনিই যে আনন্দদাতা—ইহাই জানা গেল।

### ক। ভগবান্ ভক্তগণকে প্রীতিরস আস্বাদন করান

তাঁহার সহিত লীলায় পরিকর-ভক্তগণের চিত্তে যে প্রেমরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা তিনিও আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তগণকেও তিনি তাহা আস্বাদন করান।

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন :
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২১॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৩॥"

এই সকল উক্তি হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তদিগকে আনন্দ দান করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু"—ইত্যাদি-( ৯।২৯ )-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"মণি-সুবর্ণন্যায়েন ভগবতোহপি ভক্তেষু ভক্তিরস্তি। 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'—ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যাদিভিঃ প্রেম্ণা মিথো বর্ত্তমানবিশেষো দর্শিতঃ। অন্যথা তু অবিশেষাপত্তিঃ। তস্য প্রতিজ্ঞা তু ঈদৃশী এব অবগম্যতে—'যে যথা মাম্'—ইত্যাদিনা।—মণি-সুবর্ণ-ন্যায়ে ভগবানেরও ভক্তগণে ভক্তি আছে। শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন—'ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্'—( অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত ; ভক্ত যেমন সর্ব্বদা ভগবানের প্রীতি-বিধানের জন্য উৎসুক, ভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তের প্রীতিবিধানের জন্য উৎসুক )। এই শুক-বাক্য হইতে জানা যায়, ভক্ত ও ভগবান্ এতদুভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রীতিবশতঃই ভক্তসম্বন্ধে এই বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যথা বিশেষত্বের প্রশ্ন উঠে না। 'যে যথা মাম্'-ইত্যাদি শ্রীভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়—ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এইরূপ—( যিনি আমাকে যে ভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করি—ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা ; সুতরাং যে-ভক্ত তাঁহার প্রতি প্রীতিবিধান করেন, ভগবানও সেই ভক্তের প্রতি প্রীতিবিধান করেন, সেই ভক্তকে সুখী করেন, তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করেন )।"

**খ**। ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন হইতেছে ভগবানের একটী ব্রত। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন—"আমি যাহা কিছু করি, তৎসমস্তই আমার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" তিনি তাঁহার এই ব্রত উদ্যাপন করেন—ভক্তচিত্ত বিনোদন করেন—দুই রকমে। প্রথমতঃ, ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ, ভক্তকে আনন্দ-রস আস্বাদন করাইয়া।

ভগবান্ পরব্রহ্ম—রসস্বরূপ ; রসরূপে অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্বময় আস্বাদ্য বস্তু এবং রসিকরূপে ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদক। প্রীতিরসের ( স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের ) আস্বাদক বলিয়া তিনি প্রীতিরসের আস্বাদনের নিমিত্ত লোলুপ। এই প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই ভক্ত তাঁহার সেবার জন্য সমুৎসুক, সেবার ব্যপদেশে প্রীতিরস পরিবেশনের জন্য উৎকণ্ঠিত। তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া রসিক-শেখর ভগবান্ ভক্তকে কৃতার্থ করেন, ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করেন। তিনি রসিক-শেখর বলিয়াই এই ভাবে ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন সম্ভব হয়।

আনন্দরস আস্বাদন করাইয়াও দুই ভাবে ভগবান্ ভক্তচিত্ত বিনোদন করেন। প্রথমতঃ, স্বীয় স্বরূপানন্দের, স্বীয় মাধুর্য্যাদির আস্বাদন করাইয়া ; দ্বিতীয়তঃ, প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া। স্বরূপে তিনি হইতেছেন অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ। ভক্তের প্রীতির বশীভূত হইয়া তিনি যখন তাঁহার চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখন তাঁহার নিবিড় সান্নিধ্যবশতঃ ভক্ত তাঁহার সেই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দের আস্বাদন

পাইয়া থাকেন—অগ্নির সান্নিধ্যে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয়, তদ্রূপ। এ-স্থলে ভগবান্ ভক্তচিত্তে অবস্থান করেন বলিয়াই ভক্তের পক্ষে তাঁহার স্বরূপানন্দ-রসের আস্বাদন সম্ভব হয়; সুতরাং এ-স্থলেও আনন্দদাতা তিনিই। আবার, প্রেমিক ভক্তের সাক্ষাতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াও ভগবান্ তাঁহার অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যের আস্বাদন দান করিয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন।

আবার, প্রীতিসন্দর্ভের ৬৫-অনুচ্ছেদের প্রমাণবলে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিবিশেষ সর্ব্বদা ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন; তাহাই ভক্তচিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হয়।

হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া এই প্রীতি নিজেই পরম আস্বাদ্য। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥২।১।৪॥" সুতরাং চিত্তে এই আনন্দরূপা কৃষ্ণপ্রীতির অবস্থিতিই ভক্তের চিত্ত-বিনোদ-জনিকা। ইহার হেতুও শ্রীভগবান্ই; তিনি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন বলিয়াই ভক্তের পক্ষে এই প্রীতিরূপ আনন্দের আস্বাদন সম্ভব হয়। আবার লীলার ব্যপদেশে এই প্রীতি যখন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসে পরিণত হয়, তখন তাহা শ্রীভগবান্ও আস্বাদন করেন এবং ভক্তকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ভক্তকর্ত্তৃক পরিবেশিত প্রীতিরসের আস্বাদন-কালে রসিক-শেখর ভগবান্ এই ভাবে তাঁহার ভক্তকেও প্রীতিরস আস্বাদন করাইয়া ভক্তের চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন।

রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪২॥

—(শারদীয় রাসে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ার পরে বনের মধ্যে নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে না পাওয়ায় গোপসুন্দরীগণ যমুনা-পুলিনে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে যখন তাঁহার জন্য আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন) তাঁহাদের বিলাপ এবং আর্ত্তিবাক্য শুনিয়া যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও সহাস্যবদনে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিহার করিলেন।"

তিনি আত্মারাম; সুতরাং নিজের আনন্দলাভের নিমিত্ত বাহিরের কোনও উপকরণের তিনি অপেক্ষা রাখেন না। তথাপি তিনি গোপসুন্দরীদিগের সহিত বিহার করিলেন। পরম-প্রেমবতী গোপসুন্দরীদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্তই আত্মারাম-শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী লীলা। "তস্য স্বাত্মতোঽপি ভক্তানামানন্দপ্রদত্বাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপীনাং সর্ব্বভক্ত-শিরোমণিত্বাদাত্মারামস্যাপি তস্যানন্দাধিক্যার্থমেব এতাভীরমণমিতিজ্ঞেয়ম্॥—টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥"

অন্যত্রও শ্রীশুকদেব এইরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ। শ্রীভা, ১০।৩০।৩৪॥

—আত্মরত (স্বতস্তুষ্ট) হইয়াও এবং আত্মারাম (স্বক্রীড়) হইয়াও এবং অখণ্ডিত (স্ত্রীবিভ্রমৈরনা-

কৃষ্টঃ ॥ শ্রীধরস্বামী )—স্ত্রীলোকের হাবভাব-কটাক্ষাদিতে অনাকৃষ্ট হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ( যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি রাসস্থলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই গোপীর ) সহিত বিহার করিয়াছিলেন।”

“রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।১৯॥—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও লীলারসাবেশে তাঁহাদের ( গোপীদের ) সহিত বিহার করিয়াছিলেন।”

এই সমস্ত উক্তি হইতেও রসিক-শেখর পরব্রহ্মের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতা—ভক্তদের আনন্দ-বিধানের জন্য ঔৎসুক্য—প্রতিপাদিত হইতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম রস-স্বরূপ বলিয়াই তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের আকাঙ্ক্ষা এবং রসস্বরূপ বলিয়াই স্বীয় স্বরূপভূত মাধুর্য্যাদি এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করাইয়া তিনি ভক্তচিত্ত-বিনোদন করেন।

## ১৩১। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং পরিকররূপে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসাস্বাদন

পূর্ব্বে ১।১।১২৯-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপেও রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন। পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহরূপে তিনি আস্বাদন করেন—ঐশ্বর্য্যানন্দ, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান স্বরূপ শক্ত্যানন্দ এবং তদনুরূপ স্বরূপানন্দ। দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবরূপে তিনি আস্বাদন করেন ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রিত স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তদনুরূপ স্বরূপানন্দ। একমাত্র ব্রজেই তিনি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ এবং তদনুরূপ স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন।

তাঁহার অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণও যে তাঁহারই বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই প্রকাশ, তাহাও পূর্ব্বে ১।১।১০৫-৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং সেই সকল পরিকর যে স্বরূপতঃ তিনিই, তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। এই সমস্ত পরিকরও যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৩০-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং অনাদিসিদ্ধ নিত্য-পরিকরদের রসাস্বাদনকেও রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রসাস্বাদনই বলা যায়।

এইরূপে দেখা যায়—রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপেও রসাস্বাদন করেন এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপেও রসাস্বাদন করেন।

কিন্তু পরিকররূপের রসাস্বাদন তাত্ত্বিক বিচারে পরব্রহ্মেরই রসাস্বাদনে পর্য্যবসিত হইলেও ভগবৎ-স্বরূপ-রূপের বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপের রসাস্বাদন নহে। পরিকরগণ যে জাতীয় রসের আস্বাদন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে লীলাবিলাসী ভগবান্ সেই জাতীয় রসের আস্বাদন পায়েন না। ইহা লীলার এবং লীলারস-আস্বাদনের এক বৈচিত্রী। এইরূপ না হইলে আস্বাদ্যরসেরও বৈচিত্রী সাধিত হয় না, আস্বাদনেরও বৈচিত্রী সাধিত হয় না।

পরিকরবৃন্দ প্রীতিরস আস্বাদন করেন—প্রীতির আশ্রয়রূপে। আর শ্রীকৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করেন—প্রীতির বিষয়রূপে। ইহাই পার্থক্যের হেতু। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে।

## ১৩২। বিষয়-রূপে এবং আশ্রয়-রূপে পরব্রহ্মের রসাস্বাদন

আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণপ্রীতি রসত্ব প্রাপ্ত হইলেই পরম-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। "রতি-রানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥ ভক্তিসামৃতসিন্ধু ॥২।১।৪॥"

এই প্রীতি যাঁহার মধ্যে অবস্থান করে, তাঁহাকে বলে প্রীতির **আশ্রয়**। আর, যাঁহার প্রতি এই প্রীতি প্রয়োজিত হয়, প্রীতির সহিত যাঁহার সেবা করা হয়, তাঁহাকে বলে প্রীতির **বিষয়** বা প্রীতির পাত্র।

যে পাত্রে অগ্নি অবস্থান করে, সেই পাত্রও যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম উত্তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয়, যিনি অগ্নি সেবন করেন, তিনিও সেই অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম উত্তাপদ্বারা উত্তপ্ত হয়েন। অবশ্য অগ্নির ভাণ্ড যত বেশী উত্তপ্ত হয়, অগ্নিসেবী লোক তত বেশী উত্তপ্ত হয়েন না। তদ্রূপ, যিনি প্রীতির আশ্রয়, আনন্দ-স্বরূপা প্রীতির স্বরূপগত আনন্দ স্বতঃই তাঁহারও আস্বাদ্য হয় এবং যিনি প্রীতির বিষয়, তাঁহারও আস্বাদ্য হয়। এইরূপে একই প্রীতিরস —বিষয় এবং আশ্রয়—এতদুভয়ের পক্ষেই আস্বাদনীয় হয়, উভয়েই আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। অবশ্য অগ্নিসেবী লোক এবং অগ্নি-ভাণ্ডের ন্যায়, প্রীতির বিষয়ের উপভুক্ত আনন্দ অপেক্ষা প্রীতির আশ্রয়ের উপভুক্ত আনন্দের আস্বাদন-চমৎকারিতার অনুভব অনেক বেশী।

যিনি প্রেমের বিষয়, তাঁহারই কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১।৪।১১৫॥"

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-ভক্তগণ হইতেছেন কৃষ্ণপ্রীতির আশ্রয়; আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে হইতেছেন সেই প্রীতির বিষয়। সুতরাং প্রীতিরসের আস্বাদন—তিনি করেন বিষয়-রূপে এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তগণ করেন আশ্রয়রূপে। বিষয়ের আনন্দ অপেক্ষা আশ্রয়ের আনন্দ কোটিগুণে অধিক বলিয়া প্রীতিরসের আস্বাদনে বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহার পরিকরবর্গ আশ্রয়রূপে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কোটিগুণে অধিক চমৎকারিত্বময়।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥২।৮।১১১॥"

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় হইতেছেন ভক্তই। সেই প্রীতির প্রভাবে ভগবান্‌ও ভক্তের প্রতি প্রীতিমান্ হয়েন বলিয়া তিনি ভক্তবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় হইয়া থাকেন এবং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"—এই গীতাবাক্য অনুসারে তাঁহার এই ভক্তপ্রীতিও সেই ভক্তের কৃষ্ণপ্রীতির অনুরূপ-ভাবময়ীই হইবে। এই ভাবে, ভগবান্‌কেও বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়ী প্রীতির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয়ই বলা যায়। ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অন্যত্র শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমসম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করিয়াছেন—

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম-আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥১।৪।১১৪॥"

ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেমেরও গাঢ়ত্ব অনুসারে অনেক স্তর আছে এবং বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন নামও আছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি। সর্ব্বোচ্চ স্তরের নাম মাদন; এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই।

"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উজ্জ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব।১৫৫॥

—হ্লাদিনীর সারভূত, পরাৎপর এবং সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সর্ব্বদা বিরাজিত।"

এই মাদনের একমাত্র আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা; শ্রীকৃষ্ণেও এই মাদন নাই; শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের বিষয়মাত্র। ইহাই উপরে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারে বলা হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা যায়, উপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে দুইটী পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের সমন্বয়মূলক সিদ্ধান্ত হইবে এইরূপ ঃ—শ্রীরাধার মধ্যে অবস্থিত মাদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য স্তরের মুখ্য আশ্রয় বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন পরিকরবর্গ হইলেও এবং তাঁহাদের বিভিন্ন প্রেমবৈচিত্রীর বিষয় শ্রীকৃষ্ণ হইলেও, তিনি সেই সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর আশ্রয়ও; এইরূপে, তিনি সে-সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীর বিষয় এবং আশ্রয়—উভয়ই। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম মাদনের শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র বিষয়; তিনি মাদনের আশ্রয় নহেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"—ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাবাক্যের ব্যর্থতা—শ্রীরাধার প্রেমের ব্যাপারে। একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ বচনে ॥ ১।৪।১৫১-৫২ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শারদীয়-রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই গোপসুন্দরীদের নিকটে তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণের কথা—সুতরাং স্বীয় প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতার কথা—প্রকাশ করিয়াছেন।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—হে গোপীগণ! দুশ্ছেদ্য গেহ-শৃঙ্খল সকল সম্যক্রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ, তোমাদের সেই মিলন নিরবদ্য; যেহেতু, এই ভাবে মিলিত হইয়া তোমরা আমার ভজনই—প্রীতিবিধানই—করিয়াছ (ইহাতে তোমাদের নিজের কোনও স্বার্থানুসন্ধান ছিল না)। এই ভাবে আমার প্রীতিবিধান করিয়া আমার প্রতি তোমরা যে সাধুকৃত্য করিয়াছ, ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত

হইলেও তাহার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য আমার হইবে না। তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক ( আমি তোমাদের নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়াই রহিলাম ।)

এ-স্থলে শ্রীরাধার সঙ্গিনী গোপীদিগের উপলক্ষণে শ্রীরাধার নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের বিষয়মাত্র বলিয়া সেই প্রেমের আস্বাদনে বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পায়েন, আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ পাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১।৪।১০৯ ॥"

( নিজপ্রেমাস্বাদে—শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিষয়ক রাধাপ্রেমের আস্বাদনে। রাধাপ্রেমাস্বাদ—রাধার অর্থাৎ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রেমাস্বাদ ; আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক রাধাপ্রেমের আস্বাদন )।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ প্রেমবৈচিত্রীরই বিষয় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ত্ব হইতেছে সর্ব্ব-প্রেমস্তর-ব্যাপক। কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনি সর্ব্বস্তর-ব্যাপক নহেন ; শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমব্যতীত অন্য সকল স্তরের ব্যাপক। সুতরাং প্রেমের বিষয়রূপে তাঁহার ব্যাপকত্ব যত বেশী, আশ্রয়রূপে তাঁহার ব্যাপকত্ব তত বেশী নহে। এজন্য **ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের বিষয়-প্রধান-বিগ্রহ** বলা যায়। এ-স্থলে প্রধান-শব্দের ধ্বনি এই যে—শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য, আশ্রয়ত্বের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রাধান্য নাই।

**ক**। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই হইতেছে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়।

"প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪৪ ॥"

এই প্রেম যাঁহার মধ্যে যতটুকু বিকশিত, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও তিনি ততটুকু মাত্র আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২৫ ॥"

শ্রীরাধার মধ্যে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন পাইতে পারেন এবং তজ্জনিত পূর্ণতম আনন্দও লাভ করিতে পারেন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের একটী স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত—অপর সকল তো লালায়িত হয়েনই—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত লুব্ধ হয়েন।

"কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২৮-২৯ ॥"

মাধুর্য্যের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের জন্য রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও লোভ জন্মে ; কিন্তু তাহা ব্রজলীলায় তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় ; যেহেতু, যে-প্রেমের সহায়তায় তাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব, শ্রীরাধার সেই মাদন-প্রেমের তিনি আশ্রয় নহেন।

"স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অনন্ত অদ্ভুত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১১৯-২১
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২৬-২৭ ॥"

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ "রাধিকাস্বরূপ হইতে—অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে" ইচ্ছা করেন।

স্বীয় মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যেমন মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে ইচ্ছা করেন, আবার শ্রীরাধিকার ন্যায় সেই প্রেমের আস্বাদন-লাভের জন্য লুব্ধ হইয়াও সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে ইচ্ছা করেন।

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি·হই কেবল 'বিষয়।'
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১১৪-১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥"

ইহা হইতেছে বস্তুতঃ শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা আস্বাদনেরই বাসনা। শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় না হইলে তাহার মহিমার আস্বাদন সম্ভব হয় না।

কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনাগুলি সর্ব্বদা অপূর্ণই থাকে। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজলীলায় তিনি মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন এবং ব্রজলীলারসের নিত্যত্ব রক্ষার জন্য তাহা তিনি হইতেও

পারেন না। কিন্তু এই দুইটী রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন না করিলে তাঁহার রসিক-শেখরত্বও পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না।

অপর এক স্বরূপে, অপর এক ধামে, তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয়রূপে অনাদিকাল হইতেই স্বীয় মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিতেছেন এবং শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্যও আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার এই স্বরূপটী পীতবর্ণ। এই স্বরূপের কথা পরে আলোচিত হইবে।

## ১৩৩। রসস্বরূপ পরব্রহ্মাই একমাত্র প্রিয় বস্তু

পরব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ১।৪।৮ ॥—সেই এই আত্মা বা পরব্রহ্ম পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়; অন্য সমস্ত বস্তু হইতেও প্রিয়; যেহেতু, এই আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর বা অতি সন্নিহিত।"

প্রিয় বস্তুর জন্য জগতে সকলেরই একটা আকর্ষণ দেখা যায়। পুত্রকে লোক অত্যন্ত প্রিয় মনে করে; তাই পুত্রের প্রতি লোকের একটা আকর্ষণ আছে, পুত্রের প্রীতি-বিধানের জন্য চেষ্টা আছে। নিজের এবং পুত্রাদির প্রীতি-সাধনের আনুকূল্য বিধান করে বলিয়া বিত্তাদির প্রতিও লোকের আকর্ষণ আছে, বিত্তাদিকেও প্রিয় বলিয়া লোকে মনে করে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—"হে জীব! পুত্র তোমার প্রাণতুল্য প্রিয় বলিয়া তুমি পুত্রের উপাসনা (প্রীতিবিধান) করিতেছ; পুত্রাদির প্রীতি-বিধানের সহায়ক বলিয়া বিত্তাদিকে, বা অন্য অনেক বস্তুকেও তুমি তোমার প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু তোমার পুত্র অপেক্ষাও এবং বিত্তাদি বা অন্য সমস্ত অপেক্ষাও তোমার প্রিয় বস্তু একটী আছে; সেই প্রিয় বস্তু হইতেছেন—আত্মা বা পরব্রহ্ম।"

ইহার পরেই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—"জীব! প্রিয় বুদ্ধিতে তুমি পুত্র-বিত্তাদি যে সমস্ত বস্তুর উপাসনা করিতেছ, সে সমস্ত অনিত্য—ধ্বংসশীল। ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যে আত্মা বা পরব্রহ্ম, তিনি ধ্বংসশীল নহেন, তিনি নিত্য; তাঁহার প্রিয়ত্বও নিত্য। অতএব আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। এই আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিলে বুঝিতে পারিবে—এই আত্মরূপ প্রিয় বস্তু বিনশ্বর নহেন।"

"স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ। আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ১।৪।৮ ॥—যে লোক এই আত্মা হইতে ভিন্ন অপর বস্তুকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোনও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি—আত্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া যিনি আত্মার তত্ত্ব বলিতে সমর্থ, যদি তিনি—বলেন যে, 'তুমি যাহাকে প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা বিনাশশীল', তাহা হইলে ঠিক কথাই বলা হইবে। সুতরাং আত্মাকেই—পরব্রহ্মকেই—প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু কখনও বিনাশ-প্রাপ্ত হন না।"

পূর্ব্বোল্লিখিত "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—পুত্র-বিত্তাদিও প্রিয়, কিন্তু আত্মা পুত্র-বিত্তাদি হইতেও প্রিয়—ইহাই যেন শ্রুতির অভিপ্রায়। কিন্তু তাহা নয়। "আত্মানমেব প্রিয়ং উপাসীত"—বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—একমাত্র আত্মাই প্রিয়।

পুত্র-বিত্তাদি যে প্রিয় নয়, একমাত্র আত্মাই যে প্রিয়, আত্মা প্রিয় বলিয়াই যে লোক ভ্রান্তিবশতঃ পুত্র-বিত্তাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, পরবর্ত্তী একটী বাক্যে বৃহদারণ্যকই তাহা স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে সেই বাক্যটী উদ্ধৃত হইতেছে।

"স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। না বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। না বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে .ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ ২।৪।৫ ॥"

**তাৎপর্য্যার্থ।** "যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—হে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির জন্য পতি কখনও ভার্য্যার প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হয়। পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনও পতির প্রিয়া হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হয়। পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্র কখনও পিতার প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রাতির জন্যই পুত্র পিতার প্রিয় হয়। বিত্তের প্রীতির জন্য বিত্ত কখনও লোকের প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই বিত্ত লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ কখনও লোকের প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয় কখনও লোকের প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। লোকসমূহের (স্বর্গাদি লোকসমূহের) প্রীতির জন্য স্বর্গাদি-লোকসমূহ কখনও লোকের (সাধারণের) প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই স্বর্গাদি-লোকসমূহ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। দেবগণের প্রীতির জন্য দেবগণ কাহারও প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণের প্রীতির জন্য প্রাণিগণ প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই প্রাণিগণ প্রিয় হইয়া থাকে। সকলের প্রীতির জন্য সকল প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই সকল প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই মন্তব্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য (অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকারই কর্ত্তব্য, আত্মার কথাই শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকটে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, আত্মার বিষয়ই স্মরণ-মনন করা কর্ত্তব্য এবং আত্মারই নিরন্তর ধ্যান করা কর্ত্তব্য)। হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে এবং বিজ্ঞানেই এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—যেই আত্মার প্রীতির জন্য পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয়

হয়, সেই আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং সেই আত্মার জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই আত্মা যে পরব্রহ্ম, অপর কিছু নহে, তাহাই জানা গেল; যেহেতু, শ্রুতি সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন—পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না।

তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মের প্রীতির জন্যই পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয় হয়, পতি-পত্নী-পুত্র-বিত্তাদির প্রীতির জন্য পতি-পত্নী-পুত্রাদি প্রিয় নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পতি-পত্নী-পুত্রাদি বাস্তবিক কাহারও প্রিয় নহে; পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই যদি লোকের একমাত্র প্রিয় হইয়া থাকেন, পতি-পত্নী-পুত্রাদি যদি প্রিয় না-ই হয়, তাহা হইলে পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে হয় কেন? পরব্রহ্মই যে লোকের একমাত্র প্রিয়, ইহা লোক বুঝিতে পারে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। পরব্রহ্মই যে একমাত্র প্রিয়, ইহা বুঝিতে না পারার হেতু হইতেছে এই যে—প্রাকৃত জগতের লোক পরব্রহ্মকে জানে না, অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে। তাহার প্রমাণ এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।—সেই ব্রহ্মকে জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়; জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়ার পক্ষে অন্য কোনও উপায় নাই।" ইহা হইতেই বুঝা যায়—পরব্রহ্মকে না-জানাই হইতেছে জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হওয়ার একমাত্র হেতু। প্রাকৃত জগতের লোক—যাহারা পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহারা সকলেই—জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬॥

—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকের অধিবাসীরাই পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে (সকলেরই জন্ম-মৃত্যু আছে)। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল, জন্ম-মৃত্যুর অধীন প্রাকৃত জগতের লোকসকল কোনও সময়েই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই, কোনও সময়েই তাঁহাকে জানে নাই। অনাদিকাল হইতেই তাহারা ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞ।

ব্রহ্মকেই যাহারা জানে না, কখনও জানেও নাই, ব্রহ্মই যে একমাত্র প্রিয়, তাহা তাহারা কিরূপে জানিবে? যে কখনও অমৃতের আস্বাদন পায় নাই, অমৃত দেখেও নাই, অমৃত যে পরম-আস্বাদ্য—সুতরাং অতি লোভনীয়—তাহা সে কিরূপে বুঝিবে?

প্রাকৃত জীব পরব্রহ্মকে জানে না, পরব্রহ্মই যে একমাত্র প্রিয়, তাহাও জানে না। পরব্রহ্মের সহিত তাহার যে একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতেই নিত্যসিদ্ধ ভাবে বর্ত্তমান, তাহাও জীব জানে না। কিন্তু এই নিত্য অবিচ্ছেদ্য নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধের কথা জীব জানেনা বলিয়াই যে সেই সম্বন্ধটী লোপ পাইয়া যাইবে, তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই এবং তদবধি পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি

পর্য্যন্তও যে পিতা দূরদেশে অবস্থিত, সেই পিতা তাহার পুত্রকে না চিনিলেও এবং পুত্রও স্বীয় পিতাকে না চিনিলেও তাহাদের পিতৃ-পুত্র-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায় না।

পরব্রহ্মের সহিত জীবের এই অনাদি-সিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ সম্বন্ধের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং পরব্রহ্মই স্বরূপতঃ একমাত্র প্রিয় বলিয়া এই আকর্ষণটীও প্রিয়ত্বের আকর্ষণই। এই প্রিয়ত্বের আকর্ষণেই জীব প্রিয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কোন্ প্রিয়ের আকর্ষণ, তাহা জানে না বলিয়া যাহাকে সাক্ষাতে দেখে এবং যাহার মধ্যে প্রিয়ত্বের একটু ক্ষীণ আভাস দেখিতে পায়, তাহাকেই প্রিয় বলিয়া মনে করে। এই কারণেই একমাত্র প্রিয় পরব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি-অজ্ঞতাবশতঃ জীব পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করে।

জীবের মঙ্গলের নিমিত্তই শ্রুতি জানাইয়া দিতেছেন——"হে জীব! পতি-পত্নী-পুত্রাদি তোমার প্রিয় নহে; ভ্রান্তিবশতঃ তুমি পতি-পত্নী-পুত্রাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করিতেছ, প্রিয়বুদ্ধিতে তাহাদের উপাসনা—প্রীতিবিধানের চেষ্টা—করিতেছ। তোমার একমাত্র প্রিয় হইতেছেন—পরব্রহ্ম। প্রিয়বুদ্ধিতে তাঁহারই উপাসনা কর; তাহা হইলেই নিত্য শাশ্বত অবিনশ্বর প্রিয়কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।"

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয়।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রুত হয়। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে ব্রহ্মমোহন-লীলা-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস-বৎসপালগণ অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই সমস্ত বৎস-বৎসপালরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং নরমানে এক বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বৎস-বৎসপালের সহিত লীলা করিয়াছিলেন। গাভীগণ এই নব-প্রকটিত বৎসগণকেই নিজেদের পূর্ব্ব-সন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিগণও নবপ্রকটিত বৎস-পালগণকেই নিজেদের পূর্ব্ব-সন্তান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছিলেন—নিজ নিজ সন্তানদের প্রতি গাভী ও ব্রজবাসীদের পূর্ব্বে যেরূপ স্নেহ ছিল, নবপ্রকটিত বৎস-বৎসপালদের প্রতি তদপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহ উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"ব্রহ্মন্! পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪৯॥

—হে ব্রহ্মন্! ব্রজবাসিগণের এবং গাভীগণের স্ব-স্ব-সন্তানের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহন-লীলার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, ব্রহ্মমোহনের পরে তাঁহাদের তাদৃশ প্রেম পরোদ্ভব কৃষ্ণে কিরূপে হইল? তাহা বর্ণন করুন।" তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নন্দ-যশোদার সন্তান, সুতরাং ব্রজবাসীদের বা গাভীদের পক্ষে—পরের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-বৎসপালরূপে তাঁহাদের নিকটে বিরাজিত, তখন এই বৎস-বৎসপালগণও ব্রজবাসীদের এবং গাভীদের পক্ষে বাস্তবিক পরের সন্তানই। অথচ এই সমস্ত পর-সন্তানের প্রতি তাঁহাদের স্ব-স্ব-সন্তান অপেক্ষাও অত্যধিক স্নেহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"লৌকিক জগতে দেখা যায়, পুত্র-বিত্তাদি লোকের প্রিয় হয় বটে ; কিন্তু পুত্র-বিত্তাদি অপেক্ষাও নিজের আত্মা হইতেছে অধিকতর প্রিয়। নিজের আত্মা (জীবাত্মা) প্রিয় বলিয়াই পুত্র-বিত্তাদি প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আত্মার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধবশতঃ নিজের দেহে যেরূপ প্রীতি, পুত্রের প্রতিও সেরূপ প্রীতি দেখা যায় না। আবার পুত্রের প্রতি যেরূপ প্রীতি, বিত্তাদির প্রতি সেরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয় না। লোক প্রয়োজন বোধ করিলে পুত্রের জন্য বিত্তাদিও ত্যাগ করিতে পারে ; আবার দেহের জন্য পুত্রাদিকেও ত্যাগ করিতে পারে। দেহাত্মবুদ্ধি ভ্রান্ত লোক দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে বলিয়াই বিত্ত-পুত্রাদি হইতেও দেহ তাহার সমধিক প্রিয়। কিঞ্চিৎ বিবেকের উদয় হইলে যখন লোক বুঝিতে পারে যে, 'দেহ আমি নহি', তখন দেহ অপেক্ষাও নিজের আত্মাকে অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং তখন বুঝিতে পারে যে, আত্মার প্রিয়-সাধন বলিয়াই দেহ-পুত্র-বিত্তাদিকে প্রিয় বলিয়া মনে করা হইয়াছে। দেহ-পুত্রাদির বাস্তবিক প্রিয়ত্ব নাই, প্রিয় আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃই তাহারা প্রিয় বলিয়া মনে হয়। আবার, এই আত্মারও আত্মা হইতেছেন পরমাত্মা ; পরমাত্মা হইতেছেন আত্মা—জীবাত্মা—হইতেও প্রিয় ; পরমাত্মার সহিত নিকটতম সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আত্মা বা জীবাত্মা লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হইতেছেন একমাত্র প্রেমাস্পদ। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন এই পরমাত্মা। এজন্য বৎস-বৎসপালরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের বা গাভীদিগের যে প্রীতি, তাহা স্ব-স্ব-পুত্রাদির প্রতি প্রীতি অপেক্ষাও সমধিক।"

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥
তদ্‌রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্ব-স্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৫০-৫৫॥"

এইরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—একমাত্র প্রিয় বস্তু ; তাঁহার প্রিয়ত্বেই তাঁহার সহিত—সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরম্পরাক্রমে—সম্বন্ধযুক্ত অপর বস্তুর প্রিয়ত্ব।

আবার, স্নেহময়ী জননীর স্নেহের পাত্র একমাত্র সন্তানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত বস্তুই—সন্তানের

বসন-ভূষণাদি, তাহার উপবেশন-স্থানাদি, ক্রীড়াসামগ্রী-আদি, তাহার সঙ্গী-আদি, সমস্তই—যেমন জননীর প্রিয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুই—ব্রহ্মের ধাম-পরিকরাদি, ব্রহ্মের প্রিয় এবং নিত্যদাস জীবাদি সমস্তই—জীবের প্রিয়। কিন্তু এ-সমস্তের প্রিয়ত্ব হইতেছে আপেক্ষিক; নিরপেক্ষ এবং স্বাভাবিক প্রিয় হইতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তথাপি এ-সমস্তও প্রিয় বলিয়া এ-সমস্তের অপেক্ষায় ব্রহ্ম হইতেছেন প্রিয়তম, সর্ব্বাধিক প্রিয়। তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" শাস্ত্রে যে পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে কোনও কোনও স্থলে "প্রিয়তম" বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য।

কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি সংসারী জীব অপর জীবকে সাধারণতঃ প্রিয় বলিয়া মনে করিতে পারে না। যাহারা তাহার ইন্দ্রিয়-সুখের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে, তাহারাই তাহার প্রিয়। কোনও ভাগ্যে যদি পরব্রহ্ম ভগবানে তাহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের প্রিয় এবং নিত্যদাস জীবেও তাহার প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইবে। জীবের প্রতি তাহার তৎকালীন প্রিয়ত্বই হইবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাস্তব প্রিয়ত্ব।

১৩৪। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ। তিনি **সুখস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়াই তাঁহার প্রিয়ত্ব।**

জীবমাত্রের মধ্যেই একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে। এই সুখবাসনার প্রেরণাতেই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যও লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে; কিন্তু দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার চিরন্তনত্ব নাই। চিরন্তনী সুখবাসনা হইতেই তাহার উদ্ভব। জীব সুখ চায় বলিয়াই সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখ চাহে না। দুঃখ যখন অসহ্য হইয়া উঠে, অথচ সুখও যখন পাওয়া যায় না, তখন "সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল"—এই নীতি অনুসারে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য লোক চেষ্টা করিয়া থাকে। দুঃখ দূর হইয়া গেলে সাময়িক ভাবে একটু স্বস্তি অনুভবও করে। কিন্তু সুখবাসনা অন্তর্হিত হয় না। তখনও আবার সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সুখ লাভের চেষ্টা কখনও কখনও ফলবতীও হয়; প্রাপ্ত সুখ লোক ভোগও করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না। নবলব্ধ সুখের ভোগজনিত উন্মাদনা তিরোহিত হইয়া গেলে আবার সুখবাসনা জাগিয়া উঠে—সেই জাতীয় আরও প্রচুর পরিমাণের সুখ, অথবা অন্যজাতীয় সুখ লাভের জন্য বাসনা জন্মে। এই অভীষ্ট সুখও যদি পাওয়া যায়, তাহাতেও তৃপ্তি হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, সংসারে জীবের সুখবাসনা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাহার হেতু হইতেছে এই যে—বস্তুতঃ যে সুখের জন্য লালসা জাগে, সেই সুখের স্বরূপ জীব জানে না; তাই তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করিতে পারে না—সুতরাং তাহা পায়ও না।

কিন্তু যে সুখের জন্য জীবের এই চিরন্তনী বাসনা, তাহা কি রকম সুখ? তাহার স্বরূপ কি?

জীব দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্গের সুখের জন্যই লালায়িত এবং এই জাতীয় সুখ-সাধন বস্তু সংগ্রহের জন্যই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে যে তাহার সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়ের সুখের বাসনাই বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে।

তবে কোন্ সুখের বাসনা জীবের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে—এই সুখবাসনাটী কাহার ? ইহা কি দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের সুখ-বাসনা ? না কি অপর কোনও বস্তুর সুখবাসনা ?

দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয় হইতেছে—জড় বস্তু, অচেতন। অচেতন জড় বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। চেতন বস্তুরই বাসনা থাকিতে পারে। সুতরাং জীবের চিরন্তনী সুখবাসনাটী দেহের বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের বাসনা হইতে পারে না।

সমস্ত জীবের মধ্যেই একটী চেতন বস্তু আছে—জীবাত্মা বা জীবস্বরূপ। এই চেতন বস্তুর সংশ্রববশতঃই দেহাদি—জড় অচেতন বস্তু হইলেও—সাময়িকভাবে একটু চেতনত্ব লাভ করে। এই চেতন বস্তু জীবাত্মারই এই চিরন্তনী সুখবাসনা।

জীবাত্মার সঙ্গে সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহার প্রতি জীবের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বাভাবিক বলার হেতু এই যে—পরব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু, অবশ্য বিভু চিৎ; আর জীবাত্মাও চিদ্‌বস্তু, অবশ্য অণুচিৎ। উভয়েই চিদ্‌বস্তু বলিয়া সজাতীয়। নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট দুইটী সজাতীয় বস্তুর প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ স্বাভাবিকই হইবে। সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি জীবাত্মার এই স্বাভাবিক আকর্ষণই হইতেছে জীবাত্মার সুখবাসনা—সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাওয়ার বাসনা।

কিন্তু সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্মকে ভুলিয়া আছে বলিয়া,—কোন্ সুখের জন্য বাস্তবিক বাসনা—জীব তাহা জানে না, জানিতে পারে না। সংসারী জীবের জীবাত্মা মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া এবং সংসারী জীব দেহাত্মবুদ্ধি বলিয়া, জীবাত্মার চিরন্তনী সুখবাসনা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই বিকশিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াই বিকশিত হয়—রক্তবর্ণ কাচের আবরণের ভিতর দিয়া বিকশিত সাদা আলোকও যেমন রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তদ্রূপ। ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া এই সুখবাসনাও ইন্দ্রিয়ের সুখের বাসনারূপেই প্রতিভাত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সুখসাধন বস্তু লাভের প্রয়াসকেই প্রবর্ত্তিত করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কল্পিত লক্ষ্যের দিকে এই বাসনার গতি হয় বলিয়া মূল লক্ষ্য বস্তুটীকে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ যেই সুখের জন্য জীবস্বরূপের চিরন্তনী বাসনা, তাহা হইতেছে সুখস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু—সুতরাং ভূমা—সর্ব্ববিষয়ে অসীম। "ভূমৈব সুখম্।" প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সসীম বস্তুতে—দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ বস্তুতে—তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি।" তাই সসীম ব্রহ্মাণ্ডে চিরন্তনী সুখবাসনার লক্ষ্য সুখের জন্য জীবের ছুটাছুটীর অবসান হয় না।

সুখলাভের জন্য দৌড়াদৌড়ী-ছুটাছুটীর অবসান কিসে হইতে পারে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—রসস্বরূপ—সুখস্বরূপ—পরব্রহ্মকে পাওয়া গেলেই জীব (আনন্দলাভ করিয়া) আনন্দী হইতে পারে (তখন আর সুখলাভের জন্য অন্য কোনওরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন থাকে না)।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা যায়—জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা হইতেছে—বাস্তবিক সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের জন্য বাসনা।

ইহাও জানা গেল—রসস্বরূপ—সুখস্বরূপ—পরব্রহ্মই সকলের একমাত্র অভীষ্ট বলিয়া তিনিই সকলের একমাত্র প্রিয় বস্তু। আবার, আনন্দদাতা যিনি, তিনিও সকলেরই প্রিয়। আনন্দদাতাও একমাত্র রসস্বরূপ পরব্রহ্মই ( ১।১।১৩০ অনুচ্ছেদ )। সুতরাং তিনিই সর্ব্বতোভাবে সকলের একমাত্র প্রিয়। এজন্যই শ্রুতিতে প্রিয়রূপে তাঁহার উপসনার উপদেশ দৃষ্ট হয়।

## ১৩৫। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেম-দাতৃত্ব

প্রীতি-সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভের একটী বাক্য পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে এই ঃ—

"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে ॥ প্রীতিসন্দর্ভ ।৬৫॥—সেই হ্লাদিনীর ( হ্লাদিনী-প্রাধানা স্বরূপ-শক্তির ) কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে ( ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ) নিত্যই ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত করেন ; তাহাই প্রীতি ( বা প্রেম ) নামে অভিহিত হইয়া ভক্তচিত্তে বর্ত্তমান থাকে।"

ইহা হইতে জানা গেল—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধপ্রেম বা ব্রজপ্রেম—দান করিয়া থাকেন।

প্রিয়ের ধর্ম্মই হইতেছে প্রিয়ত্ব—প্রেম। যিনি প্রিয়, তাঁহার স্বভাবই হইতেছে প্রীতি-বিতরণ করা। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায়, যিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয় বস্তু। তিনি ব্যতীত প্রিয় আর কেহ নাই। ( ১।১।১৩৩-৩৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। প্রিয়ত্বের পূর্ণতম বিকাশ তাঁহারই মধ্যে। সুতরাং তিনিই পূর্ণতম বিকাশময় প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ব্রজপ্রেম—দিতে সমর্থ। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে এতাদৃশ প্রিয়ত্বের বিকাশ নাই বলিয়া অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই এই বিশুদ্ধ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন।

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥—লঘুভাগবতামৃত। পূর্ব্বখণ্ড। ৫।৩৭॥

—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার ( স্বরূপ ) থাকুন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেম দান করিয়া থাকেন ?"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার বা স্বরূপ আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার বা ভগবৎ-স্বরূপ সর্ব্বোতোভাবে জীবের মঙ্গলদান করিতেও পারেন সত্য ; কিন্তু যাহা পরমতম মঙ্গল—যাহা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত, "সত্যং শিবং সুন্দরম্"-বাক্যে শ্রুতি যাঁহাকে শিবস্বরূপ বা মঙ্গলস্বরূপ বলিয়াছেন, সেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত সর্ব্বোতোভাবে বশীভূত করিতে পারে, সেই পরম-মঙ্গলস্বরূপ বিশুদ্ধপ্রেম—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকে প্রেম দান করেন, তাহা নহে ; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি লতাকে পর্য্যন্ত—স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলকেই প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও

থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। । শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল। "ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্-গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৪০॥"

প্রশ্ন হইতে পারে, রামায়ণ হইতে জানা যায়—শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম জন্মিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্র বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন; নতুবা বৃক্ষাদি তাঁহার জন্য রোদন করিবে কেন? সুতরাং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদি যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সময়ে, তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া; সর্ব্বদা—বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির ঐরূপ আচরণ দেখা যায় না, পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রেম-বিকার দৃষ্ট হয়। উপরে উদ্ধৃত লঘুভাগবতামৃত-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এ-কথাই লিখিয়াছেন। "যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তম্। তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব। ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ইত্যাদি বাক্যাদবগতম্ ॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-লেশহীন শুদ্ধ ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না—এই উক্তির পশ্চাতে যুক্তিও আছে।

যাঁহার আয়ত্ত্বে যে বস্তুটী থাকে, তিনিই সেই বস্তুটী অপরকে দিতে পারেন; তাঁহার আয়ত্ত্বে না থাকিলে তিনি তাহা দিতে পারেন না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের আয়ত্ত্বে নাই। যেহেতু, পরব্যোম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম; সেই ধামে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই প্রাধান্য; পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের আয়ত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভাবই আছে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভাব তাঁহাদের আয়ত্ত্বে নাই। দ্বারকা-মথুরাতেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা প্রীতি; এই প্রীতিই দ্বারকা-মথুরাবিহারী বাসুদেবের আয়ত্ত্বে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধা প্রীতি তাঁহার আয়ত্ত্বে নাই। একমাত্র ব্রজই হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমের বা কেবলা প্রীতির ধাম। ব্রজবিহারী রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের আয়ত্ত্বেই তাহা অবস্থিত; সুতরাং একমাত্র তিনিই এই কেবলা প্রীতি বা ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা ও ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি

### ১৩৬। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরলীল

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৬৮-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নরাকৃতি।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—এই দ্বিভুজ নরাকৃতিরূপই নরলীলার উপযোগী, "মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকম্॥ শ্রীভা. ৩।২।১২॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানা গেল—নরলীলাই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং তাঁহার নরাকৃতিরূপই নরলীলার উপযোগী।

শ্রুতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃত্বাভিমানী পরিকরও আছেন—নন্দ-যশোদাদি। মানুষেরই পিতা-মাতা থাকেন, ভগবানের পিতামাতা থাকিতে পারেন না; যেহেতু, ভগবান্ অজ, অনাদি। এতাদৃশ ভাবসম্পন্ন পরিকরের উল্লেখেই শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণের নরলীলত্বের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যেমন দাস, সখাদি-বন্ধুবান্ধব, পিতামাতা এবং তদনুরূপ আত্মীয়-স্বজন এবং কান্তাদিকে লইয়া সংসার-সুখ ভোগ করে, রসস্বরূপ পরব্রহ্মও তদ্রূপ দাস, সখা, পিতামাতাদি এবং কান্তাগণকে লইয়া লীলাসুখ উপভোগ করেন। দাস্য-সখ্যাদি সকল ভাবের পরিকর তাঁহার থাকিলেও বাৎসল্য-ভাবের পরিকর পিতা-মাতাই তাঁহার নরলীলত্বের মুখ্য পরিচায়ক।

নরলীলা বলিতে নর-অভিমানে যে লীলার অনুষ্ঠান তিনি করিয়া থাকেন, তাহাকেই বুঝায়। তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর—পরব্রহ্ম—হইলেও তাঁহার অভিমান—দৃঢ় বিশ্বাস—এই যে—তিনি নর, ঈশ্বর নহেন। ইহাই নর-অভিমান। স্বরূপতঃ তিনি অজ, নিত্য, অনাদি; সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহার কোনও পিতামাতা নাই। নন্দ-যশোদা বাস্তবিক তাঁহার পিতামাতা নহেন; পরন্তু তাঁহার পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অভিমান বিদ্যমান—তিনিও মনে করেন—তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। এইরূপ অভিমান না থাকিলে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্য-রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না।

নর-অভিমান ব্যতীত প্রীতিরসের সম্যক্ আস্বাদন যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহার হেতুও আছে। হেতুটী এই।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১২৭-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রস-আস্বাদন করিতে হইলে প্রীতিরসের আশ্রয় ভক্তের বশ্যতা স্বীকার অপরিহার্য্য। ভক্তবশ্যতার পরিপূর্ণতাতেই প্রীতিরসেরও পূর্ণতম আস্বাদন। কিন্তু রস-আস্বাদক ভগবানের চিত্তে যদি স্বীয় ঐশ্বর্য্যের বা ভগবত্তার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ভক্তবশ্যতা সম্ভব হয় না।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আবার কাহার বশীভূত হইবেন ? সুতরাং সম্যক্‌রূপে প্রীতিরসের আস্বাদনের নিমিত্ত আস্বাদক-ভগবানের পক্ষে স্বীয় ভগবত্তার বা ঈশ্বরত্বের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হওয়ার প্রয়োজন। ভগবত্তার জ্ঞান তিরোহিত হইলে দ্বিভুজ বা নরাকৃতি পরব্রহ্মের পক্ষে একমাত্র নর-অভিমান পোষণই সম্ভব।

সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিতে হইলে আস্বাদ্য প্রীতিরসটীরও সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন হওয়া আবশ্যক, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১২৯-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। পরব্যোমস্থিত পরিকর-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা; দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিতা। কেবলমাত্র ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। এই প্রীতিরসই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়।

এইরূপে দেখা গেল—প্রীতিরসের আস্বাদনে পূর্ণতম আনন্দ-চমৎকারিত্ব-সিদ্ধির জন্য দুইটী জিনিস প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, রস-আস্বাদক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্যক্‌রূপে নিজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা বা নর-অভিমান। দ্বিতীয়তঃ, প্রীতিরস-পাত্র পরিকর-ভক্তগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা। ইহা একমাত্র ব্রজেই সম্ভব। এজন্যই ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নর-লীল। ব্রজলীলায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন পরিকর ভক্তদের সঙ্গে তাঁহার নর-অভিমানাত্মিকা লীলায় যে বিশুদ্ধ প্রীতিরস উৎসারিত হয়, তাহার আস্বাদনেই রস-আস্বাদনের পূর্ণতম চমৎকারিত্ব।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর,নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৩॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের মূল হেতু হইতেছে তাঁহার পূর্ণতম প্রেমমুগ্ধত্ব। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ ( ১।১।১২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় নিজের ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান না থাকিলেও ঐশ্বর্য্য তাঁহার আছে; যেহেতু তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর। এই ঐশ্বর্য্যের বিকাশও আছে; কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়—তাঁহার নরলীলার অবিরোধী ভাবে। পরবর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

## ১৩৭। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা ও ঐশ্বর্য্য

নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান সত্ত্বেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য থাকিবেই; যেহেতু, তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বর বলিয়া ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। আবার, তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; সুতরাং তাঁহার সেবা করা, তাঁহার লীলার আনুকূল্য করাও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের স্বরূপানুবন্ধি কার্য্য। এই স্বরূপানুবন্ধি ক্যর্য্য হইতে ঐশ্বর্য্য কখনও বিরত থাকিতে পারে না। লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান সাধারণতঃ ক্ষুণ্ণ না হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, কয়েকটী লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

## ক। অসুর-সংহার-লীলা এবং দুষ্টদমন-লীলা

**পূতনাবধ-লীলা।** জন্মের অল্প কয়েক দিন পরে শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাত্রিতে যশোদামাতার গৃহে শয্যায় শয়ান আছেন। যশোদামাতা এবং রোহিণীমাতাও সেই স্থানে আছেন। কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা তাহার রাক্ষসী মায়ায় এক দিব্য রমণীর বেশ ধারণ করিয়া, স্বীয় স্তনদ্বয়ে তীব্র কালকূট লেপন করিয়া, স্তন্যপান করাইবার ছলে কালকূট পান করাইয়া শিশু-কৃষ্ণের প্রাণ বিনাশের উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ সেই গৃহে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই শিশুরূপী কৃষ্ণ তাহার স্বরূপ অবগত হইলেন—এ-যে দিব্য নারী নহে, পরন্তু বালঘাতিনী রাক্ষসী, তাহা জানিতে পারিলেন ; যেহেতু, স্বরূপতঃ তিনি চরাচরাত্মা।

বিবুধ্য তাং বালমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৬।৮ ॥

তিনি নেত্র নিমীলিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। পূতনা তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিল। যশোদা ও রোহিণী হঠাৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিশুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও—নরশিশুরই ন্যায়—দুই হাতে পূতনার স্তন ধরিয়া স্তন্য পান করিতে লাগিলেন এবং রুষ্ট হইয়া স্তন্যের সহিত পূতনার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করিলেন। ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পূতনা—"ছাড়্ ছাড়্" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ; বালক ছাড়েন না। যন্ত্রণায় পূতনার দুই নয়ন বিস্ফারিত হইল, পূতনা ছট্ ফট্ করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, তাহার গাত্রে ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখব্যাদন করিয়া, হস্ত-পদ-কেশ প্রসারিত করিয়া পূতনা ভূতলশায়িনী হইল ; তাহার দেহে প্রাণ নাই। মৃত্যুসময়ে কপট রূপ পরিত্যাগ করিয়া পূতনা স্বীয় ভীষণ রূপ প্রকাশ করিল। গোপ-গোপীগণ পূতনার ভীষণ-চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া শিশুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন—বালক পূতনার বিশাল বক্ষে নির্ভয়ে খেলা করিতেছেন। গোপীগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন।

"বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৬।১৮ ॥"

এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের দুইটী লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব। পূতনাকে দেখিয়াই তিনি তাহার স্বরূপ চিনিয়াছেন ; অথচ বর্ষীয়সী যশোদা এবং রোহিণী তাহা জানিতে পারেন নাই। আবার, পূতনা বালঘাতিনী বলিয়া তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ রুষ্টও হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অসুর-সংহারিণী শক্তির বিকাশ। এই শক্তিদ্বারা তিনি পূতনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য-বিকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার নরশিশুবৎ আচরণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পূতনাকে চিনিতে পারিয়াও তিনি নরশিশুর মতনই চক্ষু নিমীলিত করিয়া শুইয়া ছিলেন, পূতনার ক্রোড়েও স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন—স্তন্যদায়িনীর কোলে শিশু যেমন থাকে, তদ্রূপ ; দুই হাতে পূতনার স্তন জড়াইয়া ধরিয়া স্তন্য পান করিয়াছেন। স্তন্যের আকর্ষণে পূতনার প্রাণবায়ুপর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া থাকিলেও শিশুর মুখে সবল

আকর্ষণের অনুরূপ কোনও রূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় নাই। তাহার পরে মৃত পূতনার বক্ষঃস্থলে শিশুর মতনই অকুতোভয়ে খেলা করিয়াছেন। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—তাঁহার নরবৎ-লীলা অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু তাঁহার দৃশ্যমান্ আচরণ নরশিশুবৎ হইলেই যে তাঁহার নরলীলা বাস্তবিক অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা বলা যায় না। বাহিরের আচরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোভাবও যদি নরবৎ থাকিয়া থাকে, যদি তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেই ইহাকে বাস্তবিক নরলীলা বলা সঙ্গত হইবে। নর-অভিমান যদি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইবে নরলীলার ছদ্ম আবরণে আচ্ছাদিত ঈশ্বর-লীলা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাকার লিখিয়াছেন—"রোষসমন্বিতত্বঞ্চ তৎস্তন্যপ্রাণপানার্থমেবোক্তম্। ততশ্চ রোষরূপং তত্তেজ এব তান্ দুষ্টভাবময়ান্ অপবিত্রানপিবৎ অশোষয়দিত্যর্থঃ। কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ স্বয়ন্তু তদনুকরণমাত্রং কৃতবানিত্যর্থঃ। ফলন্তু তদনুকরণমাত্রাদপি স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈব ইত্থং ব্যাখ্যেয়ম্। * *। কিঞ্চেদং বাল্যলীলাবেশেঽপি তাদৃশশক্তৌ হেতুঃ তদাবেশেঽপি সর্ব্বাসাং শক্তীনাং স্বসময়প্রতীক্ষত্বাল্লীলানুরূপা প্রবৃত্তিঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"দুষ্টসংহারিকা শক্তিরেব অপবিত্রান্ প্রাণান্ স্তনঞ্চ অপিবৎ অশোষয়ৎ, ন তু স ইতি কুঠারসমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ।"

এ-স্থলে উদ্ধৃত টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বাল্যলীলায় আবিষ্ট; সুতরাং অন্য কোনও বিষয়ে, পূতনাবধ-বিষয়েও, তাঁহার কোনও অনুসন্ধান ছিল না। তাঁহার ঐশ্বর্য্যই, দুষ্ট-সংহারিণী শক্তিই, পূতনাকে বধ করিয়াছে। তাঁহার বাল্যলীলায় আবেশের সময়েও, যেন তাহাদের সেবার সময়ের অপেক্ষা করিয়াই তাঁহার সমস্ত শক্তিই তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে। যখন সেবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি চেতনাময়ী বলিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক প্রয়োজিত না হইয়াও স্বতঃই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তা মাত্র তাঁহার অসুর-সংহারিণী শক্তি গ্রহণ করিয়াছে; বৃক্ষচ্ছেদনকারী যেমন কুঠারের সহায়তা গ্রহণ করে, তদ্রূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পূতনা-সংহার-কার্য্যের অনুকরণমাত্র করিয়াছেন, বাস্তব কার্য্য সমাধা করিয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তি।

এইরূপে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিও বাল্যলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানব্যতীতই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আত্মপ্রকাশ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে—তাহার সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তির আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য জানিতে পারিয়াছেন—দিব্যবেশা রমণী বালঘাতিনী রাক্ষসী; কিন্তু কিরূপে তাহা তিনি জানিলেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার অনুসন্ধান ছিল না। এ-স্থলেও সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের মনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার একটী আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য হইতেছে অসুর-সংহার। সুযোগ এবং সময় উপস্থিত হইলে এই অসুর-সংহার-কার্য্য করিয়াই তাঁহার ঐশ্চর্য্য-শক্তি বা অসুর-সংহারিণী শক্তি তাঁহার সেবা করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অসুর-সংহার-কার্য্যের রহস্য প্রকাশ প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভার-হরণ-কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্বূ্যহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥ শ্রী চৈ. চ ১।৪।৭-১২॥"

অসুর-সংহারাদিপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ হইতেছে অব্যবহিতভাবে জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর কার্য্য। ইহা স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে। অসুর-সংহারার্থ বিষ্ণুর অবতরণের সময়েই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তখন, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে অবস্থিত থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্ত্তা অসুর-সংহারক বিষ্ণুও তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করেন এবং এই বিষ্ণুই স্বীয় অসুর-সংহারিণী শক্তি প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহায়তাতেই, অসুর-সংহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ হইতেছেন বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর সমস্ত শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির অংশ। বিষ্ণুর মধ্যে যে অসুর-সংহারিণী শক্তি বিরাজিত, তাহাও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। এই শক্তিই অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকে; এই বিষয়ে বিশুদ্ধ প্রেমরসের আস্বাদিকা লীলায় আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনুসন্ধান থাকে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, পূতনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐশ্বর্য্যশক্তির বিকাশ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় আবিষ্টতা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল?

ইহা সম্ভব হইয়াছিল যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের বশীকরণে সমর্থ হইলেও তিনি নিজে কিন্তু প্রেমের প্রভাবের অধীন, প্রেমের উপরে তিনি কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তাই এতাদৃশ বিশুদ্ধ প্রেমের আশ্রয় যশোদাদির সাক্ষাতে, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে অনুসন্ধানহীন হইয়া থাকেন (১।১।১২৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পূতনার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণ

যশোদামাতার সান্নিধ্যে ছিলেন; শিশুরূপে তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমরসই আস্বাদন করিতেছিলেন। যখন পূতনা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিল, তখনও যশোদামাতা সেই স্থানে; তখন তাঁহার বাৎসল্যপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া বরং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আশঙ্কা এবং উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের যশোদা-প্রেমমুগ্ধতা বরং আরও নিবিড়ত্ব লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান, কিম্বা ঐশ্বর্য্য-শক্তির আবির্ভাবের অনুভব তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তখনও তাঁহার বাল্যভাব পূর্ণতম রূপেই বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই বৈষ্ণব-তোষণ্যাদিকার বলিয়াছেন, তিনি বাল্য-লীলায় আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া ঐশ্বর্য্যের উদ্‌গমেও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান তাঁহার ছিল না।

এইরূপে দেখা গেল—বাল্যলীলায় আবেশ বশতঃ, ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাবেও ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান বা অনুভব তাঁহার না থাকায়, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই ছিল। ঐশ্বর্য্য তাঁহার নর-অভিমানকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, নরলীলাকেও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নরলীলার অবিরোধী ভাবেই ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে।

কেবলমাত্র নরলীলার অবিরোধীভাবেই যে ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নহে। মনে হয় যেন, এই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া বাল্যভাবাবিষ্ট রসিক-শেখরের বাল্যলীলাকে অধিকতররূপে রসপুষ্টও করিয়াছে। পূতনার বিকট চীৎকার শুনিয়া, তাহার হস্তপদ-বিক্ষেপ দেখিয়া, শিশু-কৃষ্ণের জন্য যশোদামাতার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরে গতপ্রাণা পূতনার বক্ষঃস্থলে শিশু-কৃষ্ণকে খেলা করিতে দেখিয়া যশোদাদি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উৎকণ্ঠা তখনও প্রশমিত হয় নাই। পূতনারূপ কালগ্রহের স্পর্শে শিশুর ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত শিশুরূপী কৃষ্ণকে গোমূত্রদ্বারা স্নান করাইয়া গোরজে লিপ্ত করিলেন এবং তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে রক্ষাবন্ধন করিলেন।

"গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্।
রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৬।২০ ॥"

এই সমস্তই তাঁহাদের বাৎসল্য-বারিধির উচ্ছ্বাসের পরিচায়ক। বাৎসল্যরস-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ এই উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। এই বাৎসল্যরসোচ্ছ্বাসের আনুষঙ্গিক হেতু হইল ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব। তাই বলা যায়—ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বকার্য্য যেমন সাধিত করিয়াছে, আনুষঙ্গিক ভাবে বাৎসল্যরসেরও পুষ্টিবিধান করিয়াছে, মাধুর্য্যেরও সেবা করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্"—ইত্যাদি ১০।৭।৩৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও একথাই লিখিয়াছেন—"পূতনাদিবধৈশ্বর্য্যং ন প্রেম সমকুচয়ৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্টপ্রতিশঙ্কয়া ॥—পূতনাবধ-লীলায় অভিব্যক্ত ঐশ্বর্য্য প্রেমকে সঙ্কুচিত করে নাই; প্রত্যুত, অরিষ্ট হইতে আশঙ্কা জন্মাইয়া প্রেমকে সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে।"

পূতনাবধ-ব্যাপারের ন্যায়—শকটাসুর, তৃণাবর্ত্তাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, বৎসাসুর, অরিষ্টাসুর, কেশী প্রভৃতি অসুর-বধ-ব্যাপারেও লীলারসাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের অবিরোধী ভাবেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে লীলারসের পুষ্টি সাধন করিয়াছে।

**কালীয়দমন**-লীলাতেও ঐশ্বর্য্য-বিকাশ-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অব্যাহত ছিল ; কিন্তু এই লীলার শেষ ভাগে দেখা যায়, তাঁহার ক্রোধোপশমনের নিমিত্ত কালীয়-পত্নীগণ তাঁহার স্তব করিয়াছে, স্তবে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বেরও উল্লেখ করিয়াছে ( শ্রীভা. ১০।১৬।৩৩-৫৩ )। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে পরিত্যাগ করিলেন। মুক্ত হইয়া কালীয়ও তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিল ( শ্রীভা. ১০।১৬।৫৪-৫৯ )। কালীয়ের স্তব শুনিয়া যমুনা-হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগর্ভস্থ রমণকদ্বীপে গিয়া বাস করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে আদেশ করিলেন এবং সে-স্থানে গরুড় হইতে তাহার আর কোনও ভয় থাকিবেনা বলিয়াও তাহাকে আশ্বাস দিলেন ( শ্রীভা. ১০।১৬।৬০-৬৩ )। তাহার পরে সস্ত্রীক কালীয় বিবিধ উপচারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিল ( শ্রীভা. ১০।১৬।৬৪-৬৬ ) এবং পুত্র-কলত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিক্রমা করিয়া রমণক-দ্বীপে চলিয়া গেল।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয়—কালীয়-পত্নীগণের এবং কালীয়-নাগের স্তব-স্তুতি ও পূজাকালে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বা-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং সেই সময়ে তাঁহার নর-অভিমান অপসারিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অপসারিত হইয়াছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

কদম্ববৃক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়হ্রদে লাফ দিয়া পড়িলেন, তখন কালীয় রুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মস্থলে দংশন করিল এবং তাঁহার সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণও সর্পবেষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সখাগণ এবং নিকটবর্ত্তী গোপগণ অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এমন সময় আবার ব্রজমধ্যে ভূকম্পাদি বিবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই সমবয়স্ক গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। ভূমিকম্পাদি উৎপাতের মধ্যে তাঁহাদের কি অবস্থা হইল—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত নন্দাদি গোপগণ এবং যশোদাদি গোপীগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ধাবিত হইলেন। বলরাম সেই দিন গোচারণে গিয়াছিলেন না। তিনিও ধাবিত হইলেন। নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা কালীয়হ্রদের তীরে আসিয়া দেখিলেন—গোপালগণ চিত্রপুত্তলিকাবৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে গাভীগণ রোদন করিতেছে ; আর তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সর্পবেষ্টিত হইয়া হ্রদমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্ণের নিমিত্ত উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহারা অত্যন্ত আর্ত্ত ও বিষণ্ণ হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। নন্দাদি গোপগণ হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ আর্ত্তি দেখিয়া স্বজন-দুঃখকাতর শ্রীকৃষ্ণ সর্পদেহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন এবং অতিরুষ্ট কালীয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন ; কালীয়ও তাঁহাকে দংশনের প্রতীক্ষায় ঘুরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভ্রমণ-শ্রমে কালীয় হীনবল হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহস্রফণাযুক্ত উন্নত মস্তক অবনত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া ফণায় ফণায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন ; পদাঘাতে কালীয়ের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। কালীয় রুধির বমন করিতে লাগিল। কালীয়ের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল।

এই বিবরণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা বরাবরই নরবৎ ছিল। কালীয়দেহে বেষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা, পরে হাতের সহায়তায় কালীয়কর্ত্তৃক বেষ্টনের অপসারণ-চেষ্টা, কালীয়কে শ্রান্ত-ক্লান্ত করিয়া হীনবল করার উদ্দেশ্যে তাহার চারিদিকে ভ্রমণ, কালীয় হীনবল হইলে তাহার মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি আরোহণ ও নর্ত্তন—এই সমস্তই নর-চেষ্টা। ইহা হইতে জানা যায়—কালীয়-দমনের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ আচরণ অক্ষুণ্ণই ছিল।

এখন দেখিতে হইবে, তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল কিনা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যশোদাদির সাক্ষাতে তিনি যখন থাকেন, তখন তাঁহাদের পরম-প্রভাবময় প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান থাকে না। নন্দ-যশোদাদির আগমনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের যে সখাগণ তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের গাঢ় প্রেমের সান্নিধ্যেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। তারপর, নন্দ-যশোদাদি আসিয়া কৃষ্ণের অবস্থা দেখিলে তাঁহাদের বাৎসল্য-সমুদ্রে যে প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেও স্পর্শ করিয়াছে; তাহার ফলেই তিনি কালীয়দেহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। এতাদৃশ বাৎসল্য-প্রেমের প্রবল প্লাবনে আপ্লাবিত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান স্ফুরিত হওয়ার—সুতরাং তাঁহার নর-অভিমান অপসারিত হওয়ার—কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার নর-অভিমান যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"—শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা কিছু থাকে না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পূতনাবধের ন্যায়, দুষ্ট-কালীয়দমন-ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তিই তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহায়তায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে। প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের এ-সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধানই ছিল না। ঐশ্বর্য্যশক্তি কালীয়কে দমিত করার আনুষঙ্গিক ভাবে সখ্য-বাৎসল্যাদি-রসের পুষ্টিসাধন-রূপ সেবা এবং কালীয়কে নরলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল ব্রজভূমি হইতে বহু দূরে অপসারিত করিয়া লীলার আনুকূল্য-বিধানরূপ সেবাও করিয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—অসুর-সংহার-লীলায় এবং দুষ্ট-দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের এবং নরলীলার অবিরোধী ভাবেই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করে এবং অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকে, আনুষঙ্গিক ভাবে নরলীলারসেরও পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

## খ। শিশু-কৃষ্ণের মুখে যশোদা-মাতার বিশ্বদর্শন

এক দিন যশোদা-মাতা শিশু-কৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তন্য পান করাইতেছিলেন। শিশুর স্তন্য-পান প্রায় শেষ হইয়াছে, মাতা তাঁহার লালন করিতেছেন, এমন সময়ে শিশু জৃম্ভা ত্যাগ করিলে তাঁহার মনোহর হাসিযুক্ত মুখে যশোদা-মাতা দেখিলেন—আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদ-নদী, অরণ্য এবং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণী বিরাজিত। পুত্রের মুখে বিশ্ব দর্শন করিয়া যশোদামাতা কম্পিত-গাত্রা ও বিস্মিতা হইলেন (শ্রীভা. ১০।৭।৩৪-৩৭॥)।

এ-স্থলেও যশোদামাতার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হয় নাই। পুত্রের মুখে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, অথবা কোনও উৎপাতের আশঙ্কা করিয়াই, বাৎসল্যময়ী যশোদা কম্পিত-গাত্রা হইয়াছেন। "সংজাতবেপথুঃ পরমাদ্ভুতত্বেন উৎপাতাশঙ্কয়া বা॥ বৈষ্ণবতোষণী-টীকা।" আবার—"আমার শিশু-পুত্রের আজ এ-সব আবার কি ?" —এইরূপ মনে করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। "বিস্মিতা এব আসীৎ মৎপুত্রস্য ইদম্ অদ্য কিম্ ? —শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" যশোদার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয় হয় নাই। "নতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। চক্রবর্ত্তী।"

পূতনাদির ন্যায় কোনও অসুরের উপস্থিতি এই স্থানে নাই। অসুর-সংহাররূপ কোনও হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করে নাই ; আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিশু-দেহেরও বিভুত্ব —সর্ব্ববিশ্বাশ্রয়ত্ব—দেখাইয়া দিল। "ততো নির্হেতুরেবেয়মৈশ্বরী শক্তিরাগতা। বিভুত্বদর্শিকা কৃষ্ণদেহস্য স্ফুটমেব হি ॥ চক্রবর্ত্তিপাদ-টীকা-ধৃত-বচন।"

যশোদামাতার কম্প এবং বিস্ময় তাঁহার প্রগাঢ়-প্রেমসমুদ্রেরই তরঙ্গবিশেষ। "তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্ম্মিময়মেব। চক্রবর্ত্তী।"

ঐশ্বর্য্যের এইরূপ নির্হেতুক আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ? চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"প্রেমদেব্যা পরীক্ষার্থমাগচ্ছন্ত্যরান্তরা। শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেৎ ॥—প্রেমদেবীর পরীক্ষার্থই শ্রীহরির এই ঐশ্বরী শক্তি মধ্যে মধ্যে আগমন করে ; কিন্তু আসিয়া সেই প্রেমদেবীরই দাসী হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রেমের সেবাতে—প্রেমের পুষ্টিসাধনে—আত্মনিয়োগ করে।" উৎপাতের আশঙ্কায় যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। এইরূপ উচ্ছ্বাস-জননই ঐশ্বর্য্য-শক্তিকর্ত্তৃক বাৎসল্য-প্রেমের সেবা।

বৈষ্ণব-তোষণীকারও নারদ-পঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাই বলিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দলক্ষ্ম্যা এব দাসীয়মানা কাচিদিয়মপি শক্তিস্তস্যাং বর্ত্তত ইতি লক্ষ্যতে নেত্রনিমীলনাৎ অনাদৃত্যৈব সেতি তর্ক্যতে। তদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে। হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা শ্চেটিকাবদনুব্রতা ইতি। তথাপি তদানীমদ্ভুতত্বাত্তাদৃশ-লীলোদয়াবসরে স্বদাস্যমেব সফলয়ন্তী বিস্ময়দ্বারা তামাত্মেশ্বরীম্ উল্লাসয়িতুমেবমনুবর্ত্তত ইতি চ গম্যতে।"

ঐশ্বর্য্য এ-স্থলে দেখাইলেন—ব্রজপরিকরদের প্রেম কিরূপ মহীয়ান্, কিরূপ সান্দ্রতম। ইহার মধ্যে প্রবেশ করা তো দূরে, ইহাকে সঙ্কুচিত করাও ঐশ্বর্য্যের সামর্থ্যাতীত ; ঐশ্বর্য্য কেবল এই প্রেমের সেবা করিয়া, প্রেমকে উদ্ভাসিত করিয়াই, নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

এই লীলার আলোচনায় দেখা গেল—অন্য কোনও হেতু না থাকিলেও কেবল প্রেমের—মাধুর্য্যের—সেবার নিমিত্তও ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তখনও নরলীল শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ থাকে।

### গ। দাবানল-পান-লীলা

শ্রীকৃষ্ণ দুইবার দাবানল পান করিয়াছেন। একবার, কালীয়-হ্রদের তীরে ; আর একবার, ভাণ্ডীরবনের নিকটে।

যে দিন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-দমন করেন, সেই দিন শ্রান্তি, ক্লান্তি এবং অসময়ের কথা বিবেচনা করিয়া গোকুলবাসিগণ আর গৃহ-গমনের চেষ্টা করিলেন না ; সকলে হ্রদের তীরেই নিশা যাপন করিলেন। নিশীথকালে দৈবাৎ দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ব্রজবাসীদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। অগ্নিস্পর্শে তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন এবং সন্ত্রস্ত হইয়া—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম"—ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিলেন। তৎপূর্ব্বে নানা ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অনেক প্রভাব তাঁহারা দেখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় প্রেমবশতঃ এই প্রভাবকে অবশ্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন নাই ; কোনও লৌকিক অসাধারণ প্রভাব বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাই দাবানল দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন—রাম-কৃষ্ণ এই বিপদ হইতেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্রজবাসীদের আহ্বান শুনিয়া এবং তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই তীব্র দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

"ইত্থং স্বজন-বৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ শ্রীভা. ১০।১৭।২৫॥"

তীব্র এবং চতুর্দ্দিকে ব্যাপক দাবানলকে পান করিয়া ফেলা—এক বিরাট্ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাকার লিখিয়াছেন—"ইত্থং স্বপ্রেমৈকমূলকানেককাকূক্ত্যাদিপ্রকারকং নিরীক্ষ্য অনুভূয় তং তাদৃশম্ অতস্তীব্রং দুঃসহং তথাভূতমপি অপিবৎ। কারুণ্যময়প্রেমাবেশেনৈবেতি-ভাবঃ। ননু ভবতু তদাবেশস্তেন কথং তৎপানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য গূঢ়মপি তদৈশ্বর্য্যং স্বয়মেব ব্যক্তীভবতীতি অভিপ্রেত্য সিদ্ধান্তয়তি জগতামীশ্বরঃ সর্ব্বেষু তত্তচ্ছক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ।" মর্ম্মার্থঃ—ব্রজবাসিগণ তাঁহার "স্বজন—আপন জন" ; তাঁহারা তাঁহাতে গাঢ়প্রেমবান্, তিনিও তাঁহাদের প্রতি গাঢ়প্রীতিমান্। তাঁহাদের "বৈক্লব্য—আর্ত্তিমূলক কাকূক্তি আদি" শুনিয়া এবং তাঁহাদের বিপদ অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি গাঢ় প্রীতিবশতঃ তাঁহাদের রক্ষার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। এইরূপ কারুণ্যময়-প্রেমাবেশেই তিনি অতি তীব্র দুঃসহ দাবানল পান করিলেন। কিন্তু কারুণ্যময়-প্রেমাবেশে কিরূপে দাবানল পান করা সম্ভব হইতে পারে ? শ্লোকস্থ "জগদীশ্বর"-শব্দেই ইহার উত্তর নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ; তিনি নর-লীলার আবেশে আছেন বলিয়া ঐশ্বর্য্য গূঢ় ভাবে তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। এক্ষণে স্বজন-রক্ষার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া গূঢ় ঐশ্বর্য্য নিজেই নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখের সহায়তায়, দাবানল পান করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা দূর করিয়াছে। কেবল দাবানল পান করা নহে, ঐশ্বর্য্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান শিশুদেহেই তাঁহার বিভুত্ব-ধর্ম্মও প্রকটিত করিয়াছে ; তাই একস্থানে অবস্থিত থাকিয়াও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত দাবানলকে পান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

জৃম্ভাত্যাগ-কালে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যশোদার বিশ্ব-দর্শন-ব্যাপারেও ঐশ্বর্য্য আপনা হইতেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে ; কালীয়হ্রদ-তীরে দাবানল-পানের ব্যাপারেও স্বয়ংই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তথাপি এই দুইস্থলে আত্মপ্রকাশের মধ্যে কিছু যেন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান্ আছে। দাবানল-পানের ব্যাপারে স্বজন-রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের

ব্যাকুলতাকে হেতু করিয়াই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকট করিয়াছে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান করেন নাই। কিন্তু বিশ্ব-প্রদর্শন-ব্যাপারে তদ্রূপ কোনও হেতু দেখা যায় না। বিশ্ব-প্রদর্শন-ব্যাপারে কেবলমাত্র প্রেমের বা মাধুর্য্যের উল্লাস-সাধনের জন্যই ঐশ্বর্য্যের আত্ম-প্রকটন, কেবলমাত্র স্ব-ইচ্ছাতে, নির্হেতুক ভাবে ; কিন্তু দাবানল-পানের ব্যাপারে—কৃষ্ণের স্বজন-রক্ষার্থ ব্যাকুলতা দূরীকরণরূপ একটা হেতু দৃষ্ট হয়।

আর একদিন ভাণ্ডীরবন হইতে কিঞ্চিদূরবর্ত্তী ঈষিকাটবীতে গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণের সখা ও গাভীগণ হঠাৎ দাবানলদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে সখাদের আর্ত্তিবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আদেশ করিলেন—"তোমরা চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাক।" তাঁহারা তাহাই করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন—"চক্ষু উন্মীলিত কর।" উন্মীলিত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন—কেবল যে দাবানলই অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে ; তাঁহারাও ভাণ্ডীরবনে আনীত হইয়াছেন।

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের সখাদের প্রতি কারুণ্যময় প্রেমাবেশজনিত ব্যাকুলতাই তাঁহার গূঢ় ঐশ্বর্য্যশক্তির আবির্ভাবের হেতু। উভয় দাবানলের ব্যাপারেই শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল।

ঘ। **গোবর্দ্ধন-ধারণ, বরুণালয় হইতে শ্রীনন্দের আনয়ন, অজাগরের গ্রাস হইতে শ্রীনন্দের মোক্ষণাদি** লীলাতেও ভক্তজন-প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তজন-রক্ষার্থ কারুণ্যের উদ্রেককে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তি আপনা হইতেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে পরিকর-ভক্তদের প্রেমসমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে। এ-সকল স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ঙ। **দামবন্ধন-লীলা**

মহাবাৎসল্যের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত শাসন করার উদ্দেশ্যে যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে একটা উলূখলের সঙ্গে বাঁধিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতার শাসনের ভয়ে ভীত। তাঁহার ইচ্ছা নয়—তিনি বাঁধা পড়েন। রজ্জুর পর রজ্জু সংযোজিত করিয়াও মাতা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না ; প্রত্যেক রজ্জু সংযোজনের পরেই দেখা যায়, রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ন্যূন।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তি বিভুতা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিভু বস্তু—যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, "ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্॥ শ্রীভা. ১০।৯।১৩॥", সেই বিভু বস্তুকে কে-ই বা বাঁধিতে পারে? "আমি যেন বাঁধা না পড়ি"—শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার বিভুত্ব স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; তাহাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে।

"মম বন্ধনং মা ভবত্বিতি তদিচ্ছায়াং জাতায়াং মৎপ্রভুং কা বধ্নীয়াদিতি তদীয়-সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতা বিভুতাশক্তিঃ সহসৈব তদ্দেহে প্রাদুরভূৎ। শ্রীভা. ১০।৯।১৫-শ্লোকটীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

যশোদামাতারও যেন জেদ বাড়িয়া গেল। "আমার শিশুকে আমি বাঁধিতে পারিব না? যে প্রকারেই হউক, বাঁধিবই।" তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। হঠাৎ দেখেন—এক ছড়া ফুলের মালা মাটীতে পড়িয়া গেল ; তিনি চিনিলেন—ইহা মায়ের কবরীর মালা। তিনি তখন মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন—দেখেন, মা শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত ; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে

তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। দেখিয়া মায়ের জন্য মাতৃবাৎসল্যমুগ্ধ কৃষ্ণের মনে কষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ মা তাঁহাকে বাঁধিতে সমর্থ হইলেন। করুণার আবির্ভাবে বিভুত্ব আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ শ্রীভা. ১০।৯।১৮॥"

টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"মাতুঃ শ্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবানেব স্বহঠং ত্যত্যাজেত্যাহ স্বমাতুরিতি। কৃপয়েতি সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী পরমভাস্বতী কৃপাশক্তিরের ভগবচ্চিত্তং নবনীতমিব বিদ্রুতীকৃত্য তত্র স্বয়ং প্রাদুর্ভূয় পূর্ব্বোদ্ধতে সত্যসঙ্কল্পতাবিভুতাশক্তী তত্র সহসৈব অন্তর্দ্ধাপয়ামাস ইত্যর্থঃ। —মাতার পরিশ্রম দেখিয়া মাতৃবৎসল ভগবান্ নিজের হঠ ( আমি যেন বাঁধা না পড়ি, এইরূপ ইচ্ছা ) পরিত্যাগ করিলেন। তখন সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী পরম-জ্যোতির্ম্ময়ী কৃপাশক্তি আবির্ভূত হইয়া ভগবানের চিত্তকে নবনীত-কোমল করিয়া দিল এবং পূর্ব্বাবির্ভূতা সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি এবং বিভুতাশক্তিকে সহসা অন্তর্দ্ধাপিত করিয়া দিল।"

এ-স্থলে দেখা গেল—'আমি যেন বাঁধা না পড়ি' শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিভুতা-শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে।

দামবন্ধন-লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার বিভুতা-শক্তি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া বন্ধনে বাধা জন্মাইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে। যখন তাঁহার এই বিভুতা-শক্তি প্রকটিত, তখনও তিনি যশোদামাতার ভয়ে নরশিশুবৎ অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন।

চ। **শারদীয় মহারাস-লীলায়** অসংখ্য গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করিয়াছেন। দুই-দুই গোপীর মধ্যে তিনি এক এক রূপে বিরাজিত ছিলেন।

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩॥"

ইহাও ঐশ্বর্য্যের এক বিরাট প্রকাশ। এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি যোগমায়া এক এক গোপীর পার্শ্বে তাঁহার এক এক রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপক বিভুতত্ত্ব পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আছেন; তবে লোক-নয়নের অগোচরীভূত—অব্যক্ত ভাবে। তাঁহার স্বপ্রকাশিকা শক্তি যোগমায়া তাঁহাকে প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবাসনার উৎকণ্ঠায় প্রত্যেক গোপীই তাঁহাকে স্বনিকটে পাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। পরম-প্রেমবতী গোপীদের এই ইচ্ছার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও তদনুরূপ বাসনা জন্মিল। তাঁহার এই বাসনাকে পূর্ণ করার জন্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহার বহু রূপ প্রকটিত করিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ "যোগেশ্বরেণ"-শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যোগা যোগমায়া দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়সী মহাশক্তিস্তস্যা ঈশ্বরেণ। যুগপৎ সর্ব্বগোপানাম্ আশ্লেষৌৎসুক্যং তস্য অভিজ্ঞায় সৈব তাবতঃ প্রকাশাংস্তস্য প্রকটয্য সমাদধৌ।" বৈষ্ণব-তোষণীকারও এইরূপই লিখিয়াছেন। "অত চৈকস্যৈব তথা প্রবেশাদিকং সমাদধদাহ যোগো যোগমায়াঽচিন্ত্যাদ্ভুত-শক্তিবিশেষস্তস্যেশ্বরেণেতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তিত্বেনৈব প্রেরণাং বিনাপি ইচ্ছামাত্রেণ তত্তদুদয় ইতি ব্যঞ্জিতম্।" বৈষ্ণবতোষণী এ-স্থলে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের

স্বাভাবিকী অদ্ভুত অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া তাঁহার প্রেরণাব্যতীতই কেবল তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য রূপ প্রকটিত করিয়াছেন।”

এক এক গোপীর নিকটে এক এক কৃষ্ণ থাকিলেও প্রত্যেক গোপীই মনে করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহার নিকটেই তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বিরাজিত। “প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। যং মন্যেরন্। শ্রীভা. ১৩৩৩।” বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—“তাভিঃ প্রিয়স্য স্বস্বনিকট এব স্থিতিং মন্যমানাভি স্তস্য স্বপার্শ্বদ্বয়েঽপি বর্ত্তমানতাতুলানন্দগ্রস্তবুদ্ধিত্বেন বিবেক্তুং ন শক্তেতি গম্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্বত্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেয়ম্।” আনন্দজনিত মোহ, অতুলানন্দগ্রস্তা বুদ্ধিই ইহার কারণ। প্রিয়তম কৃষ্ণকে স্ব-নিকটে পাইয়া তাঁহার সেবায় এবং সেবাজনিত আনন্দে প্রত্যেক গোপীই এমন তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন যে, অন্যদিকে অনুসন্ধানের কোনও শক্তিই তাঁহার আর ছিল না; তাঁহার পার্শ্বদ্বয়েই যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই; তাই তিনি মনে করিয়াছেন—কৃষ্ণ কেবল তাঁহারই নিকটে। তাঁহাদের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ অবস্থা। প্রত্যেক গোপীর চিত্তবিনোদনে নিবিড় তন্ময়তাবশতঃ তিনিও অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানহীন; তিনিও মনে করিয়াছেন—তিনি কেবল সেই গোপীর নিকটেই। এইরূপে দেখা গেল—ঐশ্বর্য্যের এক বিরাট আবির্ভাবসত্ত্বেও কৃষ্ণও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, গোপীরাও অনুভব করিতে পারেন নাই। প্রেমমুগ্ধত্ব এবং আনন্দতন্ময়তাবশতঃ তাঁহাদের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রেমের বা মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়াছেন।

**ছ।** ব্রজবাসীদিগকে **বৈকুণ্ঠ (গোলোক) প্রদর্শন** ব্যাপারেও ভক্তপ্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-স্পৃহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐশ্বর্য্য-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণরূপ সেবা করিয়াছে।

### জ। ব্রহ্মমোহন-লীলা

বাল্যলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণসখাদের বৎসগণকে অপসারিত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদের পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া বৎসগণের অনুসন্ধানে গেলেন। কোথাও বৎসগণকে না পাইয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার সখারাও নাই। তখন আবার তিনি বৎস ও বৎসপালদিগের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে পাইলেন না। এই পর্য্যন্তও তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ; নচেৎ তিনি বৎস-বৎসপালগণের অনুসন্ধান করিতেন না; তাহারা কোথায় আছে, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন। নরলীলার আবেশেই, গোপশিশুদের প্রতি তাঁহার পরম গাঢ় স্নেহের আবরণেই, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। “অদর্শনমাত্রেণৈব স্নেহভরাক্রান্ত্যা পূর্ণজ্ঞানাত্মানো জ্ঞানঘনমূর্ত্তেরপি বিচারতিরোধনাদেবমুক্তম্। বৈষ্ণবতোষণী।” তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বৎসগণই বা কোথায় গেল, বৎসপালগণই বা কোথায় গেল?

বৎস-বৎসপালগণের স্নেহমুগ্ধ কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ দূরীকরণার্থ তৎক্ষণাৎ তাঁহার

সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন—এ-সমস্ত ব্রহ্মারই কার্য্য। "সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ শ্রীভা. ১০।১৩।১৭ ॥" এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—"এতাবন্তং কালং হি তস্য বহিরন্বেষণলীলাভিনিবেশং দৃষ্ট্বৈব জ্ঞানশক্তিস্তটস্থাসীৎ। সম্প্রতি তু মনস্যেব তদনুসন্ধিৎসায়াস্তু জাতায়াং স্বস্যৈবাবসরে সমুপস্থিতেতি ভাবঃ। ঈশিতুরিচ্ছাশক্তিপরাধীনত্বাৎ সর্ব্বশক্তেঃ।—এ-পর্য্যন্ত তিনি বৎস-বৎসপালদিগকে বাহিরে অনুসন্ধান করা রূপ লীলায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন বলিয়া (প্রেমমুগ্ধ ছিলেন বলিয়া) তাঁহার জ্ঞান-শক্তি (সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি) তটস্থা ছিল। এক্ষণে তাহাদের অনুসন্ধানেচ্ছা তাঁহার মনে জাগ্রত হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি বুঝিল, তাহার সেবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে; তৎক্ষণাৎই সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিল। ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির পরাধীন।"

যাহা হউক, বৎস ও বৎসপাল-গোপশিশুদের মাতৃগণের, এবং ব্রহ্মারও, আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বৎস ও বৎসপাল এই দুইরূপে প্রকাশ করিলেন।

"ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ শ্রীভা. ১০।১৩।১৮॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত গোপশিশু আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ও নিজের যত বৎস ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তত গোপশিশু এবং তত বৎসরূপেই আত্ম-প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত বৎস-বৎসপালদের সহিত এই সমস্ত বৎস-বৎসপালের আকৃতি-প্রকৃতি-বেশভূষাদিতে কোনওরূপ পার্থক্যই ছিলনা।

এ-স্থলে বিবেচ্য বিষয় এই। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজেকে বৎস ও বৎসপালরূপে প্রকাশ করিলেন, ইহা তাঁহার স্ব-স্বরূপের জ্ঞানে—নিজের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে—করিয়াছেন কিনা? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি আত্মপ্রকাশ করায় তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্রহ্মাই বৎস-বৎসপালদিগকে হরণ করিয়াছেন। দেখা যায়, সেই সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি ব্রহ্মার কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াই অপস্থত হয় নাই। বৎস-বৎসপালগণের জননীগণের এবং ব্রহ্মার আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের কথাও এই সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিই তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; তাহাতেই তিনি নিজেকে বৎস-বৎসপালরূপে প্রকাশ করিলেন। কি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ? "তন্মাতৃণাং সর্ব্বদা স্বং পুত্রীয়ন্তীনাং মুদং কর্ত্তুম্॥ বৈষ্ণবতোষণী॥ পরমবৎসলানাং গোগোপীনাং স্বস্মিন্ পুত্রভাবম্ অভিলষন্তীনাং মনোরথং পূরয়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুন র্মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তুম্ একস্মিন্নেব স্বাভীষ্টদেবে শ্রীভাগবতোপদেষ্টরি বাসুদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃসহস্রান্ বাসুদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বৎসবালাদ্যাকারো বভুব ইত্যাহ তত ইতি। কস্য ব্রহ্মণঃ। আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বৎসত্বং বালকত্বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বৎসবালরূপিণমিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তিপাদ।" তাৎপর্য্য এই:—ব্রজের গোপীগণ (অপহৃত শিশুদের জননীগণ) এবং গাভীগণ (অপহৃত বৎসদের জননীগণ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্যবতী; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পুত্রভাব তাঁহারা সর্ব্বদা কামনা করেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সন্তানরূপে পাইলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। সুতরাং তাঁহাদের সন্তানরূপে—বৎস ও বৎসপালরূপে—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে উপস্থিত করিতে পারিলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। আর ব্রহ্মার অভিপ্রায় ছিল—শ্রীকৃষ্ণের

মঞ্জুমহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের উপাসক। ব্রহ্মার অনির্ব্বচনীয়-বিস্ময়জনক কোনও বৈভব দেখাইয়া তাঁহার বাসনা পূরণ করিতে পারিলে তাঁহারও আনন্দ হইবে। এইভাবে ব্রজের গো-গোপীদিগকে এবং ব্রহ্মাকে আনন্দ দান করার ইচ্ছাতেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে বৎস ও গোপশিশুরূপে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি—ঐশ্বর্য্য—গো-গোপীদের এবং ব্রহ্মার অভিলষিত আনন্দের কথা কৃষ্ণকে জানাইয়াছে এবং নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলাশক্তির সহায়তাতেই তিনি নিজেকে বৎস-বৎসপালরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায়—তখন নিজের ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান তাঁহার ছিল। বৈষ্ণবতোষণী হইতেও তাহাই জানা যায়। "শীঘ্রতত্তদবতারসামর্থ্যং দ্যোতয়তি বিশ্বকৃতাং মহাপুরুষাদীনামপীশ্বরঃ স্বয়মবতারীতি ॥—মূল শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণকে 'বিশ্বকৃদীশ্বরঃ' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—তিনি বিশ্বস্থষ্টিকারী, মহাপুরুষাদিরও (কারণার্ণবশায়ী-আদিরও) ঈশ্বর—সুতরাং স্বয়ং অবতারী; এজন্য অতিশীঘ্র—ইচ্ছামাত্রেই—তিনি বৎস-বৎসপালরূপে নিজেকে প্রকট করিতে সমর্থ।" চক্রবর্ত্তিপাদও তাহাই লিখিয়াছেন—"বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রা-দীনামপীশ্বর ইতি তত্র সামর্থ্যং দ্যোতিতম্।"

কিন্তু বাল্যলীলাবিষ্ট কৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান কিরূপে জাগ্রত হইল ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরদের বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন, প্রেম তাঁহার বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধীন নহে। এজন্যই বিশুদ্ধ-প্রেমের আশ্রয় নন্দযশোদাদির—সখাদেরও—সমীপে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে অনুসন্ধান থাকে না; সেবার অবসর বুঝিয়া ঐশ্বর্য্য নিজেই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার বাসনাপূরণরূপ সেবা করিয়া থাকে। এ-স্থলে তাঁহার সখাদি কেহ তাঁহার নিকটে নাই; তাঁহারা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত। এই অবসরে কি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান জাগ্রত হইতে পারে ? অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে ? তাহা মনে হয় না। তাহার কারণ এই।

শুদ্ধপ্রেমবান্ ভক্তের সান্নিধ্যে যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকেনা, তাহার হেতু এই—প্রথমতঃ, ভক্তের শুদ্ধপ্রেমের প্রভাব; দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রেমের প্রভাবে তাঁহার স্বীয় চিত্তে উদ্বুদ্ধ তদনুরূপ ভক্তপ্রীতি। উভয়ই এত সান্দ্র যে, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না, দূরে থাকিয়া অবসর মতে তাহার সেবা করিতে পারে। এ-স্থলে তাদৃশ কোনও প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে না থাকিলেও তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রীতি তাঁহার চিত্তে বিরাজিত। এই গাঢ় ভক্তপ্রীতি হইতেই গো-গোপীদের অভিলষিত আনন্দ দান করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহার স্পৃহা; ব্রহ্মার চিত্ত-বিনোদন ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, এ-স্থলে তাহার প্রাধান্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি—যে ঐশ্বর্য্যশক্তির এক অংশ মাত্র লাভ করিয়া বিশ্বস্রষ্টা মহাবিষ্ণু-আদি বিশ্বের স্থষ্টি করিতে সমর্থ, সেই ঐশ্বর্য্যশক্তি—বৎস-বৎসপালদিগকে প্রকটিত করিয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—শুদ্ধপ্রেমমুগ্ধ নরলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নরলীলাবেশের আনুগত্যেই, তাঁহার নর-অভিমানকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই, ঐশ্বর্য্য স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীন। তাঁহাতে পরমবৎসল গো-গোপীদের চিত্তবিনোদনের ইচ্ছার আনুগত্যেই

ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকটিত করিয়াছে। সুতরাং তখনও তাঁহার চিত্তে স্বীয় ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের আলোচনায় ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা প্রকাশিত বৎস-বৎসপালদিগকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বৎসপালদের মাতা গোপীগণ এবং বৎসদের মাতা গাভীগণ মনে করিলেন—তাঁহাদের যে সন্তানগণ কৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণে গিয়াছিল, তাহারাই ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এক অদ্‌ভুত ব্যাপারও দৃষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্বে নিজেদের সন্তানের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ স্নেহ ছিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক স্নেহ ছিল যশোদা-তনয়ের প্রতি। এক্ষণ হইতে তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং কৃষ্ণের প্রতি স্নেহও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়া গেল। লালন-পালনাদির ব্যপদেশে এই স্নেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইয়া যেন অসীম হইয়া উঠিল।

"ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ। শ্রীভা. ১০।১৩।২৬"

গো-গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের সন্তানরূপে লালন-পালন করিতেছেন, লীলাশক্তির প্রভাবে তাহাও তাঁহারা জানেন না এবং সন্তানদের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। এইরূপেই তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পাঁচ ছয় দিন বাকী থাকিতে হঠাৎ শ্রীবলদেব এক দিন লক্ষ্য করিলেন—এই সকল সন্তানের প্রতি গোপ-গোপীদের স্নেহ অত্যধিক বেশী; এমন কি, গাভীদেরও তাঁহাদের এই সকল বৎসের প্রতি স্নেহ অত্যধিক বেশী; ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গোবৎস-হরণের পরে যে সকল বৎস জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকেও উপেক্ষা করিয়া গাভীগণ এই সকল—বয়োঽধিক বৎসদিগকে স্তন্য পান করাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত। বলদেব বিস্মিত হইলেন।

"কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে। শ্রীভা. ১০।১৩।৩৬॥

—পূর্ব্বে বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণে যদ্রূপ বৃদ্ধিশীল প্রেম ছিল, এক্ষণে আপন-আপন বালকদের প্রতি ব্রজবাসীদের তদ্রূপই বৃদ্ধিশীল প্রেম দেখিতেছি। আমার (বলদেবের) এবং ব্রজবাসীদের এই সকলের প্রতি এতাদৃশী প্রীতির হেতু কি?"

বলদেব অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রভাব। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন। তখন লীলাশক্তির প্রভাবে বলদেব বুঝিতে পারিলেন—এই সকল বৎস ও বালক শ্রীকৃষ্ণই, অপর কিছু নহে। বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

এ-স্থলেও শ্রীবলদেবের বিস্ময়জনিত উৎকণ্ঠার নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বলদেবকে সমস্ত—ব্রহ্মাকর্তৃক বৎস-বৎসপালগণের অপহরণ হইতে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে এই সকল বৎস-বৎসপালগণের আবির্ভাবাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ—অবগত করাইয়াছে।

এইরূপে নরমানে এক বৎসর অতীত হইল। কিন্তু ব্রহ্মার আত্মপরিমাণে ইহা পলক মাত্র। তখন ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন—তাঁহাকর্তৃক অপহৃত বৎস-বৎসপালগণকে তিনি যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানেই আছেন; অথচ কৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁহারা আছেন। ব্রহ্মা বিস্মিত হইলেন। মনে মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়াও ইহার কোনওরূপ সমাধান করিতে পারিলেন না।

এই সময় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। হঠাৎ ব্রহ্মা দেখিলেন—কৃষ্ণের সঙ্গে যে সকল বৎস ও গোপশিশু আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের বেণু-বিষাণাদির প্রত্যেকেও ঘনশ্যামতনু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতবসন চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত; প্রত্যেক চতুর্ভুজরূপই নানাবিধ অপূর্ব্ব এবং দিব্য বসন-ভূষণে ভূষিত, আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচরগণকর্তৃক নানা ভাবে অর্চ্চিত হইতেছেন; প্রত্যেকেরই অনন্ত দিব্য বিভূতি; প্রত্যেকেই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি। তাঁহাদের অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিতে সকল দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। এই অদ্ভুত তেজে ব্রহ্মার দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়বর্গ অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে চতুর্ম্মুখ কনক-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল। তিনি যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন; তখন নিজের সহিত সমস্ত জগৎকে দেখিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—এই বৃন্দাবন; তাহাতে স্বভাব-দুর্ব্বৈর-নরমৃগ-সিংহাদি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্ররূপে বিচরণ করিতেছে। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে গোপশিশুরূপে বিহার করিতেছেন।

ব্রহ্মা তখন তাড়াতাড়ি স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে আসিলেন এবং চারিটী মস্তকদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিলেন, অশ্রুধারায় শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে অভিষিক্ত করিলেন। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের যে মহিমা দর্শন করিলেন এবং পূর্ব্বেও যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া বারম্বার উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। অবশেষে উত্থানপূর্ব্বক নতস্কন্ধে এবং যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

এ-স্থলে দেখা যায়—ব্রহ্মার সাক্ষাতে অনন্ত চতুর্ভুজরূপ-প্রকটনে শ্রীকৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?

ব্রহ্মস্তবের "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে"—ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৪।১৮-শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আপনার বৎস-বৎসপালগণকে স্থানান্তরিত করার পরে আমি আপনাকে প্রথমতঃ একাকীই দেখিলাম; তাহার পরে আপনাকে অনন্ত গোপবালকরূপে এবং গোবৎসরূপে দেখিলাম; তাহার পরে সকলকেই আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল বস্তু ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ কর্তৃক সংস্তুত অনন্ত চতুর্ভুজরূপে দেখিলাম এবং যত চতুর্ভুজমূর্ত্তি, ততগুলি ব্রহ্মাণ্ডও দেখিলাম। তাহার পরে আবার আপনাকে অদ্বয়

অপরিচ্ছিন্ন নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে দেখিতেছি।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

“প্রথমমেকস্ত্বমসি। ততঃ স্বরূপ-শক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালা বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ। ততো যোগমায়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমেবাভূঃ। কীদৃশাঃ ? অখিলৈরাত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূঃ। ততস্ততো যোগমায়ৈব ত্বদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতম্ অপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপমং বা ব্রহ্ম পূর্ণম্ অদ্বয়মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মদ্‌ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।”

এই টীকা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বৎস-বৎসপালরূপে প্রকাশ করিয়াছিল। পরে যোগমায়া সেই বৎস-বৎসপালগণকে আচ্ছাদিত করিয়া চতুর্ভুজ রূপসকল প্রকাশিত করিয়াছে। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে যোগমায়াই আবার সেই সমস্তকে আচ্ছাদিত করিয়া অনুপম এবং অপরিমিত সৌন্দর্য্যযুক্ত অদ্বয় নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই—স্বীয় মঞ্জুমহিমা প্রদর্শন করাইয়া ব্রহ্মার চিত্তবিনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায়, সেই ইচ্ছার আনুগত্যেই—তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি এই সমস্ত প্রকাশ করিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তির স্ফুরণেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার ভক্ত ব্রহ্মার চিত্ত-বিনোদনের ইচ্ছা। কিরূপে এই ইচ্ছার স্ফুরণ হইল, নরলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুসন্ধান নাই। তথাপি এইরূপ ইচ্ছার স্ফুরণেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীনা ঐশ্বর্য্যশক্তি ব্রহ্মার-চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছে। এ-স্থলেও বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমানের অবিরোধী ভাবেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যাহা হইক, ব্রহ্মা নিজের ইচ্ছামত শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না; হয়তো বা চতুর্ম্মুখ এক মূর্ত্তিকে এইরূপ করিতে দেখিয়া রসিক-শেখর কৌতুকই অনুভব করিয়াছিলেন।

চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মস্তুতৌ প্রবৃত্তায়াং কুতস্ত্যোঽয়ং চতুর্ম্মুখঃ কিং চেষ্টতে কিং বা মুহুর্ব্রূতে ইতি স্ববৎসান্বেষণব্যাগ্রোঽহং গোপশিশুর্ন বুদ্ধ্যে ইতি।—ব্রহ্মস্তুতি আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—কোথা হইতে এই চতুর্ম্মুখ আসিল, কি করিতেছে, পুনঃ পুনঃ কি-ই বা বলিতেছে; আমি আমার বৎস-গণের অন্বেষণে ব্যগ্র গোপশিশু, আমি এ-সমস্ত কিছু বুঝিতেছি না।”

যাহা হউক, স্তবের উপসংহারে ব্রহ্মা বলিলেন ঃ—

“অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্ ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৯ ॥

—হে কৃষ্ণ ! আমাকে অনুজ্ঞা ( অনুমতি ) করুন, আমি প্রস্থান করি। আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা, আপনি সকলই জানেন। আপনিই সমস্ত জগতের নাথ। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আপনাতেই অধিষ্ঠিত।”

এইরূপে স্তব করিয়া, তিনবার পরিক্রমা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা নিজ লোকে চলিয়া গেলেন।

"ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪১ ॥"

তখনও শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলেন নাই ; কোনও মৌখিক কথায় ব্রহ্মার প্রার্থিত অনুজ্ঞাও দেন নাই।

ইহার পরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ববসখং স্বকম্ ॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪২ ॥

—অনন্তর শ্রীভগবান্ স্বীয় নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাকে ( মৌনসম্মতিতে ) স্বস্থানে গমনের অনুমতি করিয়া বৎস-বৎসপালগণকে—তাঁহারা পূর্ব্বে, ব্রহ্মাকর্তৃক অপহৃত হওয়ার সময়ে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই, বৎসগণ তৃণভক্ষণরত অবস্থায় এবং গোপশিশুগণ করতলে ভোজ্যবস্তু-ধৃত অবস্থায় অবস্থিতভাবেই—যমুনা-পুলিনে লইয়া আসিলেন।"

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বভুবং ব্রহ্মাণম্ অনুজ্ঞাপ্য আজ্ঞাপ্য ইতি মৌনেনৈব। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণেত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ।" ইহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় মৌন হইয়াই ছিলেন। ব্রহ্মা স্বস্থানে গমনের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেও তিনি একটী কথাও বলেন নাই। ব্রহ্মা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন আপত্তি করিতেছেন না, তখন মৌনদ্বারাই তিনি আমাকে স্বধামে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। এ-পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বুঝা যায়।

ব্রহ্মা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকর্তৃক লুক্কায়িত বৎস-বৎসপালগণকে যমুনা-পুলিনে লইয়া আসিলেন। এ-স্থলেও তাঁহাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাদর্শনে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি আবির্ভূত হইয়া বৎস-বৎসপালদিগের স্থিতি-স্থানের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। বৈষ্ণব-তোষণীকারও লিখিয়াছেন—"এতৎসর্ব্বসমাধানঞ্চ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাসম্বলিতমায়াবৈভবমেব তথা মাত্রাদিভির্ব্যবহারৌপয়িকং হৃস্তনাদিতত্তদ্বালকাদি-চরিতং স্মৃতমপি প্রাচীনেষু স্মারয়িতুং নেষ্টব্যমিত্যপি বোধ্যম্।"

—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাসম্বলিত যোগমায়াবৈভব মনে করিয়াই সমস্তের সমাধান করিতে হইবে।

### ঝ। যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা

দামবন্ধন-লীলার দিনই যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব ধনদুর্ম্মদান্ধতাবশতঃ অসদাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে অভিশম্পাৎ দিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েন ; কিন্তু নারদ কৃপা করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্মৃতি নষ্ট হইবে না এবং দিব্য শত বৎসর পরে বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহারা ভক্তি লাভ করিয়া পুনরায় নিজ লোকে আসিতে পারিবেন। তদবধি তাঁহারা যমজ-অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে, নন্দমহারাজের অঙ্গনের নিকটে, অবস্থান করিতে থাকেন।

যশোদা-মাতা উলূখলের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গিয়াছেন। কতিপয় গোপশিশু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আছেন। যমলার্জ্জুন বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি আস্তে আস্তে উলূখল টানিয়া যমলার্জ্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তিনি মনে করিলেন—"দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম। এই কুবের-তনয়দ্বয়সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা সিদ্ধ করিব।

দেবর্ষি মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা॥ শ্রীভা. ১০।১০।২৫॥"

এ-স্থলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি যশোদামাতার বন্ধনে—যেন তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমরজ্জুর বন্ধনেই—আবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গে আবার রহিয়াছেন—তাঁহার সখা গোপশিশুগণ; তাঁহাদের সখ্যপ্রীতিরসও তিনি আস্বাদন করিতেছেন। সুতরাং তখনও তাঁহার নরলীলার আবেশ। এই আবেশকে ক্ষুণ্ণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার স্বর্ব্বজ্ঞতারূপ ঐশ্বর্য্যের থাকিতে পারে না। অথচ সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি যে জাগ্রত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহার নরলীলাকে এবং নর-অভিমানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই যে সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। "দেবর্ষি মে প্রিয়তমঃ" বাক্য হইতে বুঝা যায়, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই সর্ব্বপ্রথমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যখন কৌতুহলবশতঃ যমলার্জ্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন, পরম ভাগবত নারদের বাক্যকে সার্থক করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া, তখনই ভক্তবাৎসল্য তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য, ভক্তবাৎসল্যের আনুগত্যেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তিও তখনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

যমলার্জ্জুনের মূল ছিল একটীই; তাহা হইতে দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ উলূখল টানিতে টানিতে এই শাখা দুইটীর মধ্যস্থল দিয়া অপর দিকে যাইতে চেষ্টা করিলেন; মধ্যস্থলে প্রবেশ করা মাত্রই উলূখলটী বক্রভাবে পড়িয়া গেল; সুতরাং যমলার্জ্জুনের শাখা দুইটীর এক পার্শ্বে উলূখলটী আট্‌কা পড়িয়া গেল। উলূখলকে অপর পার্শ্বে নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উলূখলটীকে অপর পার্শ্বে নিতে পারিলেন না, বরং উলূখলের আকর্ষণের ফলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি কম্পিত হইতে লাগিল এবং প্রচণ্ড শব্দ সহকারে যমলার্জ্জুন ভূমিতে পতিত হইল। এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার আবেশ তিরোহিত হয় নাই; উলূখলের আকর্ষণে তাঁহার নরশিশু-সুলভ প্রয়াসই দৃষ্ট হইতেছে। উলূখলের বক্রভাবে পতন-সম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—লীলাশক্তিই সমস্ত সমাধান করিয়াছে। "তস্য লীলাশক্তেঃ স্বয়ংসম্পাদকত্বেন।" লীলাশক্তি নিজেই এ-সমস্ত করিয়াছে। যমলার্জ্জুনের পতন-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"উৎকলিতেত্যাদিনা চৈশ্বর্য্যং সূচিতমেব পূর্ব্ববন্মধুরং ভগবত্তাপ্রকটনম্ উহ্যম্। —যমলার্জ্জুনের পতনে ঐশ্বর্য্য সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ মধুর ভগবত্তাপ্রকটন উহ্য আছে।"

ইহা হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যের আনুগত্যেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি, লীলাশক্তি প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-শক্তি প্রকটিত হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়াছে। তাঁহার নরলীলা এবং নর-অভিমান অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

যমলার্জ্জুনবৃক্ষ পতিত হইলে দুই শাখা হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপে নলকুবর ও মণিগ্রীব বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবেতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বও প্রকাশ করিলেন। স্তবের পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে—তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের প্রতি করুণাময় নারদের অভিশম্পাতের কথা পূর্ব্বেই আমি জানিয়াছি। নারদের কৃপায় আমাতে তোমাদের পরমপ্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে; নারদের কৃপায় তোমাদের আর সংসার-বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

পূর্ব্বোল্লিখিত লীলাসমূহে বরুণ, ব্রহ্মা-আদিকৃত স্তব-স্তুতির পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং তত্তৎ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল মনে করা যায়। কিন্তু নলকুবর এবং মণিগ্রীবের স্তবের পরে তিনি হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা বলিয়াছেন, তাঁহাতে তাঁহাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের সংসার-বন্ধনের আশঙ্কা নাই—একথাও বলিয়াছেন; এবং স্বগৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশও করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—তাঁহাদের স্তবের সময়ে এবং স্তবের পরে শ্রীকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার আর নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল না।

কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী-টীকাকারের অভিমত অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়। "কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিল-লোকনাথম্" ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১০।২৮-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"ননু দামোদরত্বেনাত্যন্ত-বাল্যলীলাপরং বালকং কথং প্রণতবন্তৌ তত্রাহ অখিলেতি।—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলাপর বালক; যেহেতু, তখনও তিনি দামোদর—যশোদাকৃত বন্ধনের রজ্জু তখনও তাঁহার উদর বেষ্টন করিয়া আছে; তাঁহাকে কেন নলকুবর-মণিগ্রীব প্রণাম করিলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—তিনি অখিল-লোকনাথ ইত্যাদি।" ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তখনও বাল্যলীলায় অবিষ্ট; তবে স্বরূপতঃ তিনি অখিল-লোকনাথ বলিয়া কুবের-পুত্রদ্বয় তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্বের জ্ঞান কুবের-পুত্রদ্বয়ের চিত্তেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বাল্যলীলাবিষ্ট বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। আবার "ইত্থং সঙ্কীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ। দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ॥"—এই শ্রীভা. ১০।১০।৩৯-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"প্রহাসে হেতুঃ স্বয়ংভগবান্ তাভ্যামপীত্থং ভগবত্ত্বেনৈব কীর্ত্তিতঃ দাম্না চ উলূখলে বদ্ধ ইতি। প্রথমতস্তাবদ্ বদ্ধস্তত্রাপি দাম্না তত্রাপ্যুলূখলে ইত্যর্থঃ। অতো ভয়েনৈব এতৌ ন সহত ইত্যভিপ্রেত্য স্বয়মেব হসতি স্মেতি ভাবঃ। গোকুলেশ্বরো গোকুলেশনশীলত্বাদ্ গোকুলেশ্বরনামায়মাস্মাকং ভগবানেবং প্রিয়জন-প্রেমবশ্যতয়া গোকুলে নিত্যকৌতুকশীল ইতি গোকুলস্কেদং পরমবিলক্ষণং জানিহীতি চ ব্যঞ্জয়তি।" এই টীকা হইতেও বুঝা যায়—যিনি রজ্জুদ্বারা উলূখলের সহিত আবদ্ধ, তাঁহাকে এই দুই ব্যক্তি—কুবের-পুত্রদ্বয়—ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন ভাবিয়াই যেন বাল্যলীলাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়াছিলেন। কুবের-পুত্রদ্বয় মনে করিয়াছিলেন—ইনি প্রিয়জনের প্রেমের বশীভূত হইয়া গোকুলে বাল্যলীলার কৌতুক-রস আস্বাদন করিলেও আমাদের ভগবান্ই।

এ-সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়—নলকুবর-মণিগ্রীব-কৃত স্তবস্তুতি-কালেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আবেশ

ছিল। পরে তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার- ভক্ত-বাৎসল্যই যেন তাঁহার মুখ দিয়া তাহা প্রকাশ করাইয়াছে।

### ঞ। ইন্দ্রকৃত স্তব

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকৃত উৎপাত হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের কথা ভাবিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য উৎসুক হইলেন। বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীবৈশম্পায়নের উক্তি হইতে জানা যায়—ইন্দ্র দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী গোবর্দ্ধন-শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার স্তব শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"হে মহেন্দ্র! দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তুমি অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়িয়াছ। তোমার গর্ব্ব ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি। আমি দণ্ডপাণি। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ব্যক্তিগণ আমাকে দেখিতে পায় না। যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ হইতে আমি তাহাকে ভ্রষ্ট করি। এক্ষণে তুমি যাও। তোমার মঙ্গল হউক; আমার আদেশ পালন করিও; স্বর্গে গিয়া নিরহঙ্কার ও অপ্রমত্ত হইয়া স্বীয় অধিকারে অবস্থিত থাক।

এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥
ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্॥
মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ॥ শ্রীভা. ১০।২৭।১৪-১৭॥"

এ-স্থলে যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তখন একাকী ছিলেন। যাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমে তিনি সম্যক্রূপে বশীভূত, এইরূপ কোনও পরিকর ভক্ত—তাঁহার সখা বা পিতামাতা আদি—তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন না; সুতরাং ইন্দ্র যখন তাঁহার স্বয়ংভগবত্তাদির উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব-করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির উন্মেষের বাধা জন্মাইতে পারে, এমন কিছু সেস্থানে ছিল না। সুতরাং তখন ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এ-স্থলে তাঁহার নর-অভিমান যেন অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইহা অবশ্য নরলীলার আবেশে অনুষ্ঠিত রসাস্বাদনী লীলাও নহে।

অথবা, অন্য ভাবেও এই প্রসঙ্গের সমাধান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন একাকী গোবর্দ্ধন-শিলাতলে উপবিষ্ট ছিলেন, তখনও যে তাঁহার নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও মনে করা যায়; কেননা, তখনও তিনি

ব্রজে। ব্রজ হইতেছে তাঁহার নর-অভিমানের অনুকূল পরিবেশময় ধাম। ইন্দ্রের উপস্থিতির পূর্ব্বে সেই অভিমান অপসারিত বা প্রচ্ছন্ন হওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না। ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইন্দ্র রুষ্ট হইয়া ব্রজবাসীদের উপরে অনেক উৎপাত করিয়াছেন ; ভবিষ্যতে আবার যখন গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, তখনও হয়তো ইন্দ্র এইরূপ উৎপাতের সৃষ্টি করিতে পারেন ; কিরূপে চিরকালের জন্য এতাদৃশ উৎপাতের মুলোৎপাটন করা যায়, ব্রজবাসি-বৎসল, ব্রজবাসীদের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মনে এইরূপ ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। ইন্দ্রকৃত উৎপাত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার এই ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি ইন্দ্রের প্রতি উপদেশ দিয়াছে এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছে। এইরূপ মনে করিলে, তখনও যে শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাও মনে করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ব্রজের সমস্ত লীলাতেই ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য তাঁহার নর-অভিমানের ক্ষুণ্ণতা সাধন করিতে পারে নাই ; বরং মাধুর্য্যকে পরিপুষ্টই করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদনী লীলার সেবাই করিয়াছে। ইন্দ্রস্তবে ( এবং তজ্জাতীয় অপর কোনও লীলাতে ) শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতসারেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছে মনে করিলেও তাহার পর্য্যবসানও নরলীলার মাধুর্য্যেই। কেননা, ইন্দ্রস্তব-কালে তাঁহার জ্ঞাতসারে ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইয়াছিল মনে করিলেও তদ্দ্বারা ব্রজবাসীদিগের উপরে ইন্দ্রের উৎপাতের সম্ভাবনা চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে।

## ১৩৮। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য বলিতে কি বুঝায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( ১।১।৪১-৫৫-অনুচ্ছেদ )। মাধুর্য্য বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহাই বিবেচ্য। যাহা কিছু আস্বাদ্য, মনোরম, চিত্তাকর্ষক, লোভনীয়, তাহাই মধুর, তাহাই মাধুর্য্যময়। পরব্রহ্ম স্বরূপে আনন্দ, আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বা রস ; সুতরাং পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বরূপেই পরম-মধুর, পরম-মাধুর্য্যময়। ভগবদ্বিষয়ক প্রেমও হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম-মধুর। বস্তুতঃ এই হ্লাদিনী বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিই পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সমস্ত মাধুর্য্যের মূল। চেষ্টার মাধুর্য্য, রূপের মাধুর্য্য, লীলার মাধুর্য্য, গুণের মাধুর্য্য, নামের মাধুর্য্য—ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় মাধুর্য্যের অনেক বৈচিত্রী।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, অবশ্য দুইটী বিভিন্ন বৃত্তি। একই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি হইলেও তাহাদের প্রভাবের বৈশিষ্ট্য আছে। কাহার প্রভাব বেশী, তাহাই বিবেচ্য।

### ক। মাধুর্য্যের উপরে ঐশ্বর্য্যের প্রভাব নাই

স্বীয় ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণকে—এমন কি তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপগণকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া রাখেন। এতাদৃশ অতুলনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় প্রভাব যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নিজেই প্রেমের—প্রেমভক্তির—বশীভূত। একথা শ্রুতিই বলিয়াছেন। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মাঠরশ্রুতি।” শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তির মধ্যে এই প্রেমভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। “ভক্তিরেব ভূয়সীতি। মাঠর-শ্রুতি।” ঐশ্বর্য্য-শক্তির উপরেও এই প্রেমভক্তির প্রভাব ; শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববশীকরণী

ঐশ্বর্য্যশক্তিও এই প্রেম ভক্তির অধীনা। সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাহার অধীন, সমস্ত শক্তিও তাহারই অধীন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অধীন, প্রেম তাঁহার অধীন নহে। এজন্য প্রেমের আধার ভক্তদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন থাকেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান পর্য্যন্ত থাকে না। "কৃষ্ণোহি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনী-কৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব, প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্। এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবারমিতি। স চ প্রেমা বাৎসল্যাদিরূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্য্যমননুসন্দধানোঽধীনীভূত এব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্ নাসীৎ স্নেহার্দ্ধিকাং বিনা। ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১৩।২৫-শ্লোক-টীকায় চক্রবর্ত্তী।" প্রেমের উপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও কোনও প্রভুত্ব নাই ; এজন্য প্রেমকে সঙ্কুচিত করার সামর্থ্য তাঁহার বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের নাই।

তিনি প্রেমের অধীন ; আবার তাঁহার সমস্ত শক্তি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অধীন। "ঈশিতুরিচ্ছাশক্তি-পরাধীনত্বাৎ সর্ব্বশক্তেঃ। শ্রীভা. ১৯।১৩।১৭-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা।"

এইরূপে জানা গেল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তিও মাধুর্য্যস্বরূপ এবং মাধুর্য্যের নিদানীভূত প্রেমের অধীন। ইহাই "ভক্তিবশঃ-পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি॥"—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী ; ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ; কিন্তু মাধুর্য্যের উপরে ঐশ্বর্য্য কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৩৭-অনুচ্ছেদে "নরলীলা ও ঐশ্বর্য্য" সম্বন্ধীয় আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্রজের কোনও লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রেমকে বা মাধুর্য্যকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই ; বরং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি—নর-অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের কোনও ইচ্ছার উদ্গম হইলে, স্বীয় সেবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, ঐ ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়া—মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনরূপ সেবা করিয়াই যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে।

## খ। মাধুর্য্যই ঐশ্বর্য্যকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়

অন্যান্য ধামের ব্যাপারের কথা চিন্তা করিলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, সে-সকল ধামে ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে মাধুর্য্য খর্ব্ব হইয়া যায় ; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে—তাহা নহে। সে-সকল স্থানে ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে মাধুর্য্য খর্ব্ব বা সঙ্কুচিত হয় না ; লীলাসৌকর্য্যার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার পূরণার্থ ই সে-সকল স্থলে মাধুর্য্য নিজেই অন্তরালে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের বা পরব্যোমের এবং দ্বারকার কয়েকটী লীলার আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

**(১) পরব্যোমে** পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে ঐশ্বর্য্যানন্দ উপভোগ করেন। এই ধামে ঐশ্বর্য্যই সমধিকরূপে বিকশিত ; ঐশ্বর্য্যাত্মিকা-লীলার সৌকর্য্যার্থ মাধুর্য্য এ-স্থলে সম্যক্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করে না ; মাধুর্য্যের যতটুকু প্রকাশ লাভ করে, ততটুকু সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। ভগবানের আস্বাদ্য এই মাধুর্য্য হইতেছে—স্বীয় রূপ-গুণাদির মাধুর্য্য এবং পরিকর-ভক্তদের চিত্তস্থিত ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম। সমধিক বিকাশশীল ঐশ্বর্য্য এই মাধুর্য্যকে—ভক্তচিত্তস্থিত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধান প্রেমকে—সঙ্কুচিত করে না, করিতেও

পারে না; যেহেতু, "ভক্তিরেব ভূয়সীতি"। শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যানন্দ উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে মাধুর্য্যও অধিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে না।

**দ্বারকা-মথুরায়ও** ঐশ্বর্য্যের সমধিক বিকাশ; মাধুর্য্যের বিকাশও পরব্যোম অপেক্ষা অনেক বেশী। মাধুর্য্যের যতটুকু বিকাশ হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যরস আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, এ-স্থলে মাধুর্য্যের ততটুকই বিকাশ। দ্বারকা-মথুরার পরিকর-ভক্তদের চিত্তস্থিত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রপ্রেম কখনও ঐশ্বর্য্যদ্বারা সঙ্কুচিত হয় না।

(৩) **বিশ্বরূপ-দর্শনে** অর্জ্জুনের সখ্যভাবময় মাধুর্য্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা ঐশ্বর্য্যকৃত সঙ্কোচন নহে; বিশেষ উদ্দেশ্যে সখ্যভাবময় মাধুর্য্যই এ-স্থলে একটু অন্তরালে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিয়াছে। গীতাবাক্যের আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া, বিশেষতঃ বিভূতিযোগে-কথনে শ্রীকৃষ্ণ-কথিত পরমগুহ্য অধ্যাত্ম-সংজ্ঞক বাক্য শুনিয়া, অর্জ্জুনের মোহ—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিতে হইবে, এইরূপ একটা যে মোহ অর্জ্জুনের চিত্তে স্থান লাভ করিয়াছিল, সেই মোহ—অপসারিত হইয়াছে।

"মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥
—গীতা ১১।১।-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি।"

তথাপি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর-রূপ দর্শন করার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। এই কৌতূহলের হেতু হইতেছে—বিভূতিযোগ-কথনের সর্ব্বশেষ বাক্য, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশদ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে অর্জ্জুনের মনে কোনওরূপ অবিশ্বাসের ভাব জাগে নাই; তথাপি কৌতূহলবশতঃই, তাঁহার যে রূপের এক অংশমাত্র সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া বিদ্যমান, সেই জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তি-বীর্য্যাদি-সমন্বিত রূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনের ইচ্ছা জন্মিল। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ইত্যেবং কথয়সি হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপি অবিশ্বাসো মম নাস্তি, তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি॥ ১১।৩-গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী।" শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—যাঁহারা মধুর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যেমন কখনও কখনও কটু রস সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তদ্রূপ নিয়ত ভগবানের মাধুর্য্যানুভবকারী অর্জ্জুনের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ দর্শনের কৌতূহল জাগিয়াছিল। "মধুর-রস-রসায়নঃ কটুক-রস-জিঘৃক্ষাবত্ত্বন্মাধুর্য্যানুভবিনো মে ত্বদৈশ্বর্য্যানুবুষাভ্যুদেতীতি ভাবঃ॥ ১১।৩-গীতা-শ্লোকের টীকা॥"

প্রিয়-ভক্ত অর্জ্জুনের এইরূপ কৌতূহলজনিত বাসনা পূরণের জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু পূর্ব্ববৎ মাধুর্য্য বিদ্যমান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ না করিলেও ঐশ্বর্য্যাত্মক বিশ্বরূপের প্রকটন সম্ভব হইতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যেই মাধুর্য্য নিজেকে একটু অন্তরালে নিয়া ঐশ্বর্য্যকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়াছিল। তাহাতেই বিশ্বরূপ প্রকটিত হইল।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ প্রকটিত হইলেই যে অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পাইবেন, তাহা নহে। এই রূপের দর্শনোপযোগী "দিব্যচক্ষু" তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। কি সেই দিব্য চক্ষু ? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। ১১।৮-গীতাশ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—অর্জ্জুন হইতেছেন ভগবানের একজন মুখ্য পার্ষদ, সখ্যভাবান্বিত পার্ষদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া অর্জ্জুনেরও নর-অভিমান ; নর-অভিমান হইলেও অর্জ্জুন প্রাকৃত নর নহেন, জীবতত্ত্ব নহেন ; সুতরাং তাঁহার চক্ষুও প্রাকৃত জীবের চক্ষুর ন্যায় চর্ম্মচক্ষু নহে। "যতোহি অর্জ্জুনো ভগবৎপার্ষদমুখ্যত্বাৎ নরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃত নর ইব ন চর্ম্মচক্ষুষ্কঃ।" কিন্তু প্রাকৃত নরের ন্যায় অর্জ্জুনের চক্ষু যদি চর্ম্মচক্ষুই না হয়, তাঁহার চক্ষু যদি অপ্রাকৃতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে আবার "দিব্যচক্ষু" দেওয়ার কি প্রয়োজন হইয়াছিল ? ইহার উত্তর এই। অর্জ্জুনের চক্ষু অপ্রাকৃত হইলেও নরলীলার মাধুর্য্য-দর্শনের উপযোগীই ছিল, দেবলীলা দর্শনের উপযোগী ছিল না। অনন্য-ভক্তের অপ্রাকৃত চক্ষু ভগবানের নরলীলার মাধুর্য্যাদিই দর্শন করিতে পারে, দেবলীলার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে পারে না। দেবলীলার ঐশ্বর্য্য দর্শনের উপযোগী চক্ষুই "দিব্যচক্ষু"। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এইরূপ দিব্যচক্ষুই দিয়াছিলেন। "কিঞ্চ সাক্ষাদ্‌ভগবন্মাধুর্য্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি, সোঽর্জ্জুনো ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশক্নুবন্ দিব্যং চক্ষুর্গৃহ্ণীয়াদিতি কঃ খলু ন্যায়ঃ। একেত্বেবমাচক্ষতে ভগবতো নরলীলত্ব-মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি সর্ব্বোৎকৃষ্টং যদ্ ভবতি তচ্চক্ষুরনন্যভক্ত ইব ভগবতো দেবলীলত্ব-সম্পদং নৈব গৃহ্ণাতি। ন হি সিতোপলারসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং তস্মাদর্জ্জুনায় তৎপ্রার্থিতং চমৎকারবিশেষং দাতুং দেবলীলত্বময়ৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহয়িষু র্ভগবান্ প্রেমরসানুকূলং দিব্যম্ অমানুষম্ এব চক্ষু র্দদাবিতি ॥ গীতা. ১১।৮-শ্লোক-টীকায় চক্রবর্ত্তী ॥"

যোগমায়ার প্রভাবেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই "দিব্যচক্ষু" দিয়াছিলেন এবং যোগমায়ার প্রভাবেই যে তিনি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছেন।

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। গীতা ১১।৪৭॥" এ-স্থলে "আত্মযোগাৎ"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—যোগমায়াসামর্থ্যাৎ", শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা।"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দিব্যচক্ষু-প্রাপ্তির সময়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের সখ্যভাব—সখ্যভাবাত্মক প্রেম—নিজেকে অন্তরালে অপসারিত করিয়াছে ; তাহাতেই তাঁহার সখ্যপ্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত চক্ষুর স্থলে দেবলীলার ঐশ্বর্য্য দর্শনের উপযোগী চক্ষুর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং তখন হইতেই অর্জ্জুনের ভাব

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান হইয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ দর্শন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যদর্শনে তাঁহার ভয় জন্মিয়াছে; ইহা স্বাভাবিক; ঐশ্বর্য্যেরই ধর্ম্ম।

ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনের কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তাহার দর্শন তিনি পাইলেন; পাইয়া ভীত হইলেন, স্তবস্তুতি করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের সখ্যপ্রেম নিজেকে একটু অন্তরালে অপসারিত করিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সখ্যপ্রেমের আর অন্তরালে থাকার প্রয়োজন নাই। তাই তখন আবার সখ্যভাব স্বস্থানে আসিল, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগাইল। সখ্যপ্রেমকে স্বস্থানে আগমন করিতে দেখিয়াই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পলায়ন করিল। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে "ভক্তিরেব ভূয়সীতি" শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না।

এ-স্থলেও দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনের কৌতূহল জন্মিয়াছে বলিয়া ভক্তবৎসল ভগবানেরও ইচ্ছা হইয়াছিল—অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যেই মাধুর্য্য একটু অন্তরালে যাইয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়াছে।

**দ্বারকা-পরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র প্রেম** গাঢ়তম নয় বলিয়াই ঐশ্বর্য্যাত্মক রূপ দর্শনের কৌতূহল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

দ্বারকা-পরিকরদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান যুগপৎ বিদ্যমান; তথাপি মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য; তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাব বিরাজিত। মাধুর্য্য সুযোগ দিলেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

(৪) দ্বারকার **বাৎসল্য-প্রেমও** সময় সময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকে। তাহার একটী দৃষ্টান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কংস-বধের পরে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা দেবকী-বসুদেবের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিলেন এবং মস্তকদ্বারা তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। কংসকারাগারে সদ্যোজাত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব নিয়া নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। এগার বৎসর পরে সেই শিশু আসিয়া চরণে পতিত হইয়াছে। বলরামের জন্মই হইয়াছে নন্দালয়ে, বসুদেব-পত্নী রোহিণীর গর্ভে; বলরামের সঙ্গে দেবকী-বসুদেবের পূর্ব্বে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অবস্থায় পুত্রদ্বয় আসিয়া যখন তাঁহাদের চরণে পতিত হইলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেবকী-বসুদেব পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। ইঁহারা যে তাঁহাদের পুত্র—এই বুদ্ধিই তখন তাঁহাদের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল; তাঁহারা মনে করিলেন—কৃষ্ণ-বলরাম জগদীশ্বর। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছেন—ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসা স্পৃশ্য পাদয়োঃ।
দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।৫০-৫১॥"

কৃষ্ণ-বলরাম যখন কংস-রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে দেবকী-বসুদেবের ঈশ্বর-জ্ঞান ছিল না; তখনও তাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে নিজেদের সন্তানমাত্রই মনে করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া মথুরা-নাগরীগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বদা এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা গোপীদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাও বলিয়াছেন। আবার, কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি হিংসাপরায়ণ প্রবল পরাক্রান্ত কংসের সান্নিধ্যে এবং কংস-সহচর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ অসুরদিগের সান্নিধ্যে এই সুকোমলতনু কিশোর বালকদ্বয় উপনীত হইয়াছেন ভাবিয়া কৃষ্ণ-বলরামের বিপদ আশঙ্কা করিয়া মথুরা-নাগরীগণ ভীতাও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাক্যাদিতেও তাঁহাদের এই সমস্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাদের উক্তি শুনিয়া দেবকী-বসুদেব কৃষ্ণ-বলরামের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কংস-কর্ত্তৃক তাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া পুত্রস্নেহাতুর দেবকী-বসুদেব অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্নেহাতুরতাবশতঃ কৃষ্ণ-বলরামের শৌর্যবীর্য্যের জ্ঞান তখন তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় নাই।

"সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।১৮॥"

কংসের এবং কংসানুচরদের হাতে যাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া দেবকী-বসুদেব ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কংস-কংসানুচরদের নিহত করিয়া বিপন্মুক্ত হইয়া সেই পুত্রদ্বয় তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বন্ধনমুক্ত করিয়া পিতামাতা-জ্ঞানে তাঁহাদের চরণে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া দেবকী-বসুদেব যে তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুতে পুত্রদ্বয়কে পরিস্নাত করাইয়া দিবেন—ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহারা তাহা পারিলেন না। কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি তাঁহাদের সন্তানবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, ঈশ্বর-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে।

ইহার হেতু কি? কৃষ্ণ-বলরাম-সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানই কি তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমকে অপসারিত করিয়া দিয়াছে? না, তাহা নয়; তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান অপেক্ষাও বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব বেশী। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কখনও বাৎসল্য-প্রেমকে অপসারিত করিতে সমর্থ নয়। এ-স্থলে স্বীকার করিতে হইবে—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে বাৎসল্য-প্রেমই নিজেকে একটু অন্তরালে রাখিয়া ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়াছে।

কিন্তু কি সেই বিশেষ উদ্দেশ্য? বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"বিশেষতো জ্ঞাত্বেতি সাম্প্রতাদ্ভুতকর্ম্মদর্শনাদিনা স্মৃত-তজ্জন্মবৃত্তান্তত্বেন পুনরৈশ্বর্য্যজ্ঞানোদ্বোধাৎ কৃতসভক্তিবন্ধনাবপি পুত্রাবপি জগদীশবুদ্ধ্যা ভীতৌ সন্তৌ।" চক্রবর্ত্তিপাদ্‌ও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। টীকাকারদের উক্তির তাৎপর্য্য এই :—কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাই তাঁহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজরূপে কংস-কারাগারে দেবকী-বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর-বুদ্ধিতে দেবকী-বসুদেব তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন। স্তব-প্রসঙ্গে তাঁহারা কংস হইতে তাঁহাদের এবং জগতের ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে কংসের এবং তদীয় অনুচরগণের সংহার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বসুদেব বলিয়াছিলেন—

"ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরিক্ষিষু র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসি চমূঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩।২১ ॥

—হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি এই বিবিধ-দুঃখজালজড়িত জগতের পালন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার আপনি রাজবেশধারী অসুরবৃন্দ-পরিচালিত অসুর-সৈন্য নির্মূল করিবেন।"

আর, দেবকী দেবী বলিয়াছিলেন—

"স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি ॥ শ্রীভা. ১০।৩।২৮ ॥

—তুমি সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা এবং শরণাগত জনের বিবিধ ভয়হারী; অতএব আমাদের কংসভয় নিবারণ কর।"

এক্ষণে কংসকে নিহত করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ দেবকী-বসুদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। দেবকী-বসুদেবের চিত্তে ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্য-গুণের অনুভব জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন। সন্তান-বুদ্ধিতে ভক্তবাৎসল্য-গুণের অনুভব হইতে পারে না; এবং যতক্ষণ পুত্রবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ ঈশ্বর-বুদ্ধিও জাগ্রত হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাদের চিত্তের বাৎসল্য-প্রেম একটু অন্তরালে সরিয়া গিয়া ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়াছে।

(৫) প্রয়োজন হইলে **দ্বারকার কান্তা-প্রেমও** ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিকে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মিণী-পরিহাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৬০ম অধ্যায়ে রুক্মিণী-পরিহাস-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। শুভ্র নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ বাতায়ন-পথে সুসজ্জিত এবং সুশোভিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য মণিরত্ন-খচিত পালঙ্কের উপরিস্থিত দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে যেন গলিত রজত-ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই শয্যার উপরে সুখাসীন। পালঙ্ক-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রুক্মিণীদেবী অত্যন্ত প্রীতিভরে স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছেন। এই প্রীতিময়ী সেবার উপলক্ষ্যে রুক্মিণীদেবীর চিত্তস্থিত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গে—বিশেষতঃ বদন-কমলে—এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। তাহা দর্শন করিয়া প্রেমবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। তথাপি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর-চমৎকারিত্বময় এক মাধুর্য্যবৈচিত্র্য রুক্মিণীর বদনকমলে অভিব্যক্ত করাইয়া তাহার উপভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কৌতূহল জন্মিল। অনির্ব্বচনীয় রূপ-যৌবন-সম্পন্না প্রণয়িনী কুপিতা হইলে তাহার ভ্রূকুটী-আদিদ্বারা মুখের যে এক অপূর্ব্ব শোভা বিকশিত হয়, রুক্মিণী দেবীর বদন-কমলে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জন্মিল। তখন

রুক্মিণী দেবীর কোপের উদ্রেক করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে তাঁহার প্রতি পরিহাস-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"রুক্মিণী, রাজপুত্রী হইলেও তোমার বুদ্ধি কিন্তু রাজপুত্রীর মত নয়। যদি রাজপুত্রীর অনুরূপ বুদ্ধিই তোমার থাকিত, তাহা হইলে শিশুপাল-আদি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে কোনও একজনকেই তুমি পতিরূপে বরণ করিতে। তোমার পিতা এবং ভ্রাতাও তদ্রূপ কোনও রাজার হস্তেই তোমাকে অর্পণ করার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সেই সমস্ত রাজন্যবর্গের প্রত্যেকেও তোমার পাণিগ্রহণের জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বরণ করিলে আমাকে। আমি রাজা নহি; সে-সমস্ত রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রগর্ভে—দ্বারকায়—আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। নিষ্কিঞ্চন দরিদ্রেরাই আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে; ঐশ্বর্য্যবান্, ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিগণ আমার সহিত কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন না। বিবাহাদি-সম্বন্ধ সমান-অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যেই সুখের হেতু হইতে পারে। তুমি রাজপুত্রী হইয়াও এতাদৃশ আমাকে বরণ করিয়াছ—রাজপুত্রীর অনুরূপ বুদ্ধি যে তোমার নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। সেই সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং তোমার ভ্রাতাও আমার প্রতি অত্যন্ত দ্বেষপরায়ণ। তাঁহাদিগকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমি তোমাকে আনয়ন করিয়াছি এবং বিবাহ করিয়াছি। আমার কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য কোনও লোভ নাই; যেহেতু, আমি দেহ-গেহাদিতে উদাসীন; আত্মসুখেই আমি সুখী। যাহা হউক, ভুল করিয়া যাহা করিয়াছ, তাহা তো করিয়াছই; তবে এখনও তাহার প্রতিকারের সময় আছে। তোমার অনুরূপ কোনও ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠকে তুমি বরণ কর; তাহাতেই সুখী হইতে পারিবে।"

রুক্মিণী দেবী অতি দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে অধোবদনে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতেছিলেন, আর অরুণিম-নখশোভিত সুকোমল চরণদ্বারা ভূমিতে যেন রেখা টানিতে ছিলেন। অবশেষে ভয়ে, দুঃখে এবং শোকে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে বলয়-কঙ্কণ খসিয়া পড়িল, ব্যজনও ভূমিতে পতিত হইল। তাঁহার কেশপাশ বিকীর্ণ হইল, বাতাহত কদলীর ন্যায় তিনি ভূমিতে পতিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগর্ভ নর্ম্মবাক্যকে রুক্মিণী সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন, পরিহাস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই পরমাত্মা, আত্মারাম, স্ত্রীপুত্রাদিতে বাস্তবিকই তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই; সুতরাং তিনি তাঁহাকে যে কোনও সময়েই ত্যাগ করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া ভয়ে রুক্মিণী দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রুক্মিণীর এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া সময়োচিত পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহাকে স্থির করিলেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। তখন রুক্মিণী দেবী বুঝিতে পারিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই পরিহাস করিতেছিলেন। ইহার পরে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া যে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যবৈচিত্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

এই প্রসঙ্গে এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে—শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্যকে রুক্মিণীদেবী পরিহাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না কেন? কান্তাপ্রেমবতী রুক্মিণীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈশ্বর-বুদ্ধি কেন জাগ্রত হইল?

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীভা. ১০।৬০।১ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"রুক্মিণ্যাঃ প্রেমরসভঞ্জনে তস্য কেবলং বিনোদ এব হেতুঃ, বস্তুতস্তু নান্য ইতি।···। স্বপ্রিয়জন-প্রেমমর্য্যাদায়া স্তোটনং ন তস্য অভীপ্সিতং কিন্তু তেন তদ্দৃঢ়ীকরণমেব ইতি ভাবঃ।—রুক্মিণীর প্রেমরস-ভঙ্গের ব্যাপারে কেবল আনন্দই ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে; প্রিয়জনের প্রেমমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু তাহাকে আরও দৃঢ় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।"

কিরূপ আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের ছিল এবং কিরূপেই বা তিনি রুক্মিণীর প্রেমমর্য্যাদাকে দৃঢ়ীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী-সান্ত্বনা-কালে নিজ মুখেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্।
ত্বদ্‌বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর-ভ্রূকুটীতটম্॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্ম্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥ শ্রীভাঃ ১০।৬০।২৯।৩১॥

—হে বৈদর্ভি! আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না। তুমি যে মৎপরায়ণা, তাহা আমি বিলক্ষণ-রূপেই জানি। আমার কথা শুনিয়া তুমি আমাকে কি বলিবে, তাহা শুনিবার নিমিত্তই পরিহাসচ্ছলে আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। (কেবল তোমার কথা শুনিবার জন্যই নহে, অন্য উদ্দেশ্যও আমার ছিল; কি সেই উদ্দেশ্য তাহাও বলিতেছি শুন) প্রণয়-কোপে কম্পিতাধরবিশিষ্ট, কটাক্ষ-বিক্ষেপে অরুণ বর্ণ অপাঙ্গযুক্ত এবং সুন্দর ভ্রূকুটীময় তোমার মুখ খানি নিরীক্ষণ করার জন্যও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই এইরূপ আচরণ করিয়াছি। হে ভীরু, হে ভামিনি, প্রেয়সীর সহিত নর্ম্মব্যবহারে গৃহীদিগের কাল-যাপন—ইহাই তাহাদের একটী পরম লাভ।"

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ তো ভগবান্, সত্যকাম; রুক্মিণীকে কোপিতা করিয়া তাঁহার সকোপ-কুটিল ভ্রূকুটী আদি দর্শনের জন্যই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই রুক্মিণী কোপিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত আচরণ প্রকাশ করিলেন না কেন?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ইচ্ছাশক্তি ভগবানের অধীন বটে; প্রেম কিন্তু ভগবান্‌কেও নিজের অধীন করিয়া রাখে। আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌কেও আনন্দাতিশয় উপভোগ করাইবার নিমিত্ত প্রেম কখনও কখনও তাঁহার ইচ্ছাকেও অন্যরূপ করিয়া থাকে। ইহাই এস্থলে তত্ত্ব। "সুন্দরং কুটিলং ভ্রূকুটীতটং যস্মিন্ তচ্চ-তচ্চ তৎ মুখম্ ঈক্ষিতুঞ্চ ননু যদি সত্যকামস্য ভগবতস্তথাভূতৈবেচ্ছা আসীৎ তদা তদানীমেব রুক্মিণী সকোপ-কুটিল-কটাক্ষা কথং নাভূদিতিচেৎ। ইচ্ছাশক্তির্হি ভগবত এব অধীনা। প্রেমা তু তং ভগবন্তমপি অধীনীকরোতি ইতি প্রেমাগ্রে ন তস্যাঃ কাপি প্রভবিষ্ণুতা প্রেমাহি আনন্দরূপমপি ভগবন্তম্ অতিশয়েন আনন্দয়িতুং তদিচ্ছামপি কদাচিৎ অন্যথা করোতি। ইদমত্র তত্ত্বম্। শ্রীভা, ১০।৬০।৩০-শ্লোকের টীকা॥"

ইহা হইতে বুঝা যায়—রুক্মিণীর সকোপ-কুটিল-কটাক্ষাদি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ জন্মিত, তাহা অপেক্ষা—শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যাদি শুনার পরে রুক্মিণী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কেবল পরিহাসই করিয়াছেন, তখন তাঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসিত কান্তাপ্রেমের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহা বহুগুণে অধিক। এই আনন্দাতিশয় শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যেই রুক্মিণী-চিত্তস্থিত প্রেম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাসত্ত্বেও রুক্মিণীকে কোপিতা হওয়ায় সুযোগ না দিয়া, নিজে যেন একটু অন্তরালে থাকিয়া, ঐশ্বর্য্যকে সুযোগ দিয়াছে—রুক্মিণীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্ফুরিত করাইবার নিমিত্ত।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মাধুর্য্যের বা প্রেমের উপরে ঐশ্বর্য্য কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পরব্যোমে সমধিক বিকাশময় ঐশ্বর্য্যও অল্প-বিকাশময় মাধুর্য্যকে খর্ব্ব করিতে পারে না। দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের বিকাশ বেশী; এ-স্থলে, কোনও বিশেষ-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য মাধুর্য্য বা প্রেম নিজেই কখনও কখনও অন্তরালে থাকিয়া বা তটস্থ থাকিয়া ঐশ্বর্য্যকে বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিয়া থাকে; তখন ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার আনুকূল্য করে, মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধনের আনুকূল্য করিয়া মাধুর্য্যের সেবাও করিয়া থাকে।

ব্রজের ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপেই মাধুর্য্যদ্বারা কবলিত। ব্রজেও মাধুর্য্যদ্বারা প্রেরিত হইয়াই ঐশ্বর্য্য আত্মপ্রকট করে এবং অধিকাংশ-স্থলে মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া, ক্বচিৎ কখনও বা প্রকাশ্যভাবেই, মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। কোনও ধামেই মাধুর্য্যকে কখনও ঐশ্বর্য্যের সেবা করিতে বা ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য করিতে দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা যায়, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—এই উভয়ের মধ্যে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য, ব্রজের পূর্ণতম বিকাশময় ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্যের প্রাধান্য।

স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ ঐশ্বর্য্য বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পরিকর-ভক্তের চিত্তে সঙ্কোচ বা ত্রাস উৎপাদন করে, ইহা সত্য; কিন্তু মাধুর্য্যের বা প্রেমের অনুমোদন ব্যতীত তাহা করিতে পারে না। পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান পরিকর-ভক্তদের চিত্তে প্রায় নিত্যই এইরূপ সঙ্কোচ বিদ্যমান। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যানন্দ উপভোগের সুযোগ দেওয়ার নিমিত্তই ভক্ত-চিত্তস্থিত প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে এইরূপ সঙ্কোচ উৎপাদনের সুযোগ দিয়া থাকে। দ্বারকা-মথুরাতেও মাধুর্য্য বা প্রেম অন্তরালে থাকিয়া বা তটস্থ অবস্থায় থাকিয়া, বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ঐশ্বর্য্যকে সাময়িকভাবে সঙ্কোচ উৎপাদনের সুযোগ দিয়া থাকে। মাধুর্য্য বা প্রেম যখন তটস্থ থাকে না, যখন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ভক্তচিত্তে বিদ্যমান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও সঙ্কোচ উৎপাদন করিতে পারে না। ব্রজে কিন্তু মাধুর্য্যকর্তৃক প্রেরিত ঐশ্বর্য্যও সাধারণতঃ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে সঙ্কোচ উৎপাদন করিতে পারে না; ঐরূপে বিকশিত ঐশ্বর্য্যকে পরিকর-ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়াই মনে করেন না।

ঐশ্বর্য্য কোনও সময়েই প্রেমকে বা মাধুর্য্যকে স্বীয় প্রভাবে অপসারিত বা স্তিমিত করিতে পারে না। মাধুর্য্য নিজেই সময় সময় নিজেকে অন্তরালে বা তটস্থ অবস্থায় রাখিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দিয়া থাকে। এতাদৃশ অবস্থাপন্ন প্রেমকেই "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম" বলা হয়; এই অবস্থায়, ঐশ্বর্য্যকে সুযোগ দেওয়ার নিমিত্ত প্রেম নিজেই নিজেকে শিথিল করিয়া রাখে।

## ১৩৯। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, বলিয়া তিনি মাধুর্য্যস্বরূপই। তিনি আনন্দঘন, রসঘন, বলিয়া মাধুর্য্যঘনও বটেন। তাঁহার এই স্বরূপগত মাধুর্য্য তাঁহার সমন্ধি সমস্ত বস্তুকেই স্বীয় মাধুর্য্যরসে আপ্লাবিত ও পরিষিঞ্চিত, পরিনিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যময় করিয়া তোলে। তাই তাঁহার মাধুর্য্যেরও অনেক বৈচিত্রী—রূপ-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, গুণমাধুর্য্য ইত্যাদি।

পরব্রহ্মের মাধুর্য্য তাঁহার স্বরূপগত বলিয়া তাঁহার সকল প্রকাশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে মাধুর্য্য বিদ্যমান। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপে আংশিকরূপে যে সকল মাধুর্য্য-বৈচিত্রী-বিরাজিত, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের সমস্তেরই পূর্ণতম বিকাশ এবং কোনও কোনও বৈচিত্রী অত্যদ্ভুতরূপেও বিকশিত।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কথন-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ বলিয়াছেন—

> "অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
> অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
> অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
> আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥ ২।১।১৬॥"

তাৎপর্য্যার্থ। এক্ষণে পাঁচটী গুণের কথা বলা হইতেছে। এই পাঁচটী গুণ লক্ষ্মীশাদিতেও (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদিতেও) বিদ্যমান আছে। এই পাঁচটী গুণ হইতেছে এই ঃ—(১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব; (২) কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপিবিগ্রহত্ব; (৩) অবতারাবলীবীজত্ব; (৪) হতারিগতি-দায়কত্ব; এবং (৫) আত্মারামগণাকর্ষিত্ব।

এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতেও আছে বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিকশিত। যেমন—**অবতারাবলীবীজত্ব**—শ্রীনারায়ণাদিতে এই গুণের যথাসম্ভব বিকাশ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু নারায়ণেরও মূল। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব**—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ কোটিব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক তো বটেনই, পরন্তু বৈকুণ্ঠাদিরও ব্যাপক। **হতারিগতিদায়কত্ব**—ভগবানে শত্রুভাবাপন্ন অসুর-স্বভাব লোকগণ যদি ভগবানের হস্তে নিহত হয়, ভগবান্ তাহাদিগকে স্বর্গাদি-লোকে গতি দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহাদিগকে মোক্ষ-ভক্তি পর্য্যন্ত দিতে পারেন; ইহাই তাঁহার অদ্ভুতত্ব; তিনি পূতনাকে প্রেমভক্তি দিয়া ধাত্রীগতিও দিয়াছেন। শ্রীনারায়ণাদি ইহা দিতে পারেন না। **আত্মারামগণাকর্ষিত্ব**—শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারামগণ পর্য্যন্ত অহৈতুকী ভক্তির সহিত তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০॥"

শ্রীকৃষ্ণে উল্লিখিত পাঁচটী গুণের অত্যদ্ভুত বিকাশের কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

> "সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
> অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥
লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ২।১।১৭-১৮॥

তাৎপর্য্যার্থ ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারিত্বময় লীলাকল্লোলের সমুদ্রতুল্য, অতুলনীয়-মধুর-প্রেমমণ্ডিত-প্রিয়-পরিকরবৃন্দ-মণ্ডিত, তাঁহার মুরলীর মধুর কল-কূজনে ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার অসমোর্দ্ধ-রূপশ্রীদ্বারা চরাচর বিস্মাপিত হয়। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীগোবিন্দের (১) লীলামাধুর্য্য, (২) লীলাপরিকরদের প্রেমমাধুর্য্য, (৩) বেণুমাধুর্য্য এবং (৪) রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী হইতেছে তাঁহার অসাধারণ গুণ ; এইরূপ লীলা-প্রেম-বেণু-রূপ-মাধুর্য্য অপর কাহারও নাই, এমন কি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও নাই। তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ অভিন্ন হইলেও রসের বা মাধুর্য্যের বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু। ১।২।৩২॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটি অসাধারণ মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। বলাবাহুল্য, ব্যবহারিক জগতের মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর স্বরূপ-প্রকাশকও কোনও শব্দ নাই। গুড়, চিনি, মিছরি, নানাবিধ ফল—সমস্তই মিষ্ট ; কিন্তু সকলের মিষ্টত্ব এক রকম নহে। তাহাদের বিভিন্নরূপ মিষ্টত্বের বাচক কোনও শব্দ নাই ; তাহা কেবল আস্বাদনের দ্বারাই বুঝিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর স্বরূপ ব্যক্ত করার উপযোগিনী কোনও ভাষা যে নাই, তাহা কৈমুত্য-ন্যায়েই বুঝা যায়। এই মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর প্রভাব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াই তাহার স্বরূপের দিগ্‌দর্শন দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

**ক। লীলামাধুর্য্য।** পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিভিন্ন ধামে লীলা করিয়া থাকেন। পরব্যোমের নারায়ণাদি-স্বরূপের লীলা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানাত্মিকা ; সে-স্থলে ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রেমবশ্যতাও অত্যন্ত কম। পরিকর-ভক্তদের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া তাঁহাদের ভাবও সঙ্কোচময়। সুতরাং তাঁহাদের সহিত লীলাতে যে মাধুর্য্য উৎসারিত হয়, তাহার আস্বাদ্যত্ব উৎকর্ষময় নহে। দ্বারকা-মথুরাতে পরব্যোম অপেক্ষা মাধুর্য্যের বিকাশ অনেক বেশী হইলেও তাহার সহিত ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া, তাহা পরব্যোমের মাধুর্য্য অপেক্ষা উৎকর্ষময় হইলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দ্বারা কিঞ্চিৎ স্তিমিত ; সুতরাং তাহা আস্বাদ্য হইলেও পরম আস্বাদ্য নয়।

কিন্তু ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের একান্ত অভাব ; ব্রজবিহারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও নিজের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন, তাঁহার পরিকরগণের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানের অভাব। তাই ব্রজের ভাব সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নরলীলায় যে মাধুর্য্য উৎসারিত হয়, তাহা সর্ব্বাতিশায়িরূপে চমৎকারিত্বময়। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমুগ্ধত্ব এবং প্রেমবশ্যত্বও সর্ব্বাতিশায়ী। এ-সমস্ত কারণে ব্রজবিহারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলা অন্য সকল ধামের লীলা অপেক্ষা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলালার মাধুর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবতাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণও লালায়িত। "রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্। দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥ ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্দর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্ যশোঽমলম্॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩-৪॥"

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যাও করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥"

ব্রজলীলাসমূহের মধ্যে আবার রাসলীলার মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ২।১।১১১ ধৃত বৃহদ্বামন-পুরাণবচন॥

—যদিও আমার মনোহরা প্রচুর লীলা আছে, তথাপি রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মন যে কিরূপ হয়, তাহা বলিতে পারি না।"

রাসলীলার মাধুর্য্য আস্বাদনের কথা দূরে, সেই লীলার কথা মনে হইলেই শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্যাকুল হইয়া পড়েন; এতই রাসলীলার মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য।

রাসলীলা পরম-রসকদম্বময়ী। পাঁচটী মুখ্য রস এবং সাতটী গৌণ রস—এই বারটী রসই রাসলীলায় যুগপৎ উৎসারিত হইয়া থাকে। রাসলীলা হইতেছে সর্ব্বরসময়ী। এজন্যই ইহার এত উৎকর্ষ। অন্য কোনও লীলায় সমস্ত রসের যুগপৎ আবির্ভাব হয় না। অন্য কোনও ধামেই রাসলীলা সম্ভব নয়; যেহেতু, সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী, সর্ব্বরসোদ্গারী প্রেম অন্য কোনও ধামে নাই। এজন্যই রাসলীলা হইতেছে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি।

লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃতের ৮১০-অনুচ্ছেদে পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই অদ্ভুত। তাহাদের মধ্যে আবার তাঁহার গোপাল-লীলা (ব্রজলীলা) সর্ব্বাপেক্ষা অতি মনোহরা। "চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাল-লীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা।" সর্ব্বাপেক্ষা মনোহারিণী গোপাল-লীলার মধ্যে আবার পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলা হইতেছে মাধুর্য্যে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি।

### খ। প্রেমমাধুর্য্য

এ-স্থলে প্রেমমাধুর্য্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের প্রেমের মাধুর্য্যই লক্ষিত হইয়াছে। "অতুল্য-মধুরপ্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলত্বকে" শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ চারিটী গুণের মধ্যে একটী গুণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতুলনীয় মাধুর্য্যময় প্রেমের দ্বারা মণ্ডিত প্রিয়-মণ্ডল—প্রিয় পরিকরবর্গ—যাঁহার, তিনি

অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডল। "প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যম্"—বাক্যেও তাহাই সূচিত হইতেছে। প্রেমের প্রভাবে অন্যান্য ধামের পরিকরগণ অপেক্ষা ব্রজপরিকরগণের আধিক্যই একটী অসাধারণত্ব।

পরব্যোমের, এমন কি দ্বারকা-মথুরার, পরিকরগণ অপেক্ষা ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের প্রেমের পরমোৎকর্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মাধুর্য্যের উৎকর্ষেই প্রেমের উৎকর্ষ সূচিত হয়। ব্রজপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বলিয়া এবং অন্যান্য ধামের প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত বলিয়াই ব্রজপ্রেমের মাধুর্য্যের উৎকর্ষ।

পূর্ব্বে যে লীলামাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতুও প্রেম-মাধুর্য্য। প্রেমমাধুর্য্যই লীলাকে মাধুর্য্যময়ী করিয়া থাকে। ব্রজলীলার মাধুর্য্য যে অন্যান্য ধামের লীলামাধুর্য্য অপেক্ষা সর্ব্বাতিশয়িরূপে উৎকর্ষময়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ব্রজের প্রেমমাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়িত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদির নিমিত্ত ব্রজপরিকরদের উৎকণ্ঠাকে ব্রজপ্রেম কি ভাবে বর্দ্ধিত করে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"অটতি যদ্‌ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাম্॥ শ্রীভা. ১০।৩১।১৫॥

—রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ বলিতেছেন—হে প্রিয়! দিবাভাগে যখন তুমি (গোচারণাদির জন্য) বনে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ত্রুটিপরিমিত সময়কেও এক যুগ বলিয়া মনে হয়। (দিনান্তে বন হইতে তুমি প্রত্যাগত হইলে) তোমার কুটিলকুন্তল-শোভিত পরম-সুন্দর বদন অবলোকন করার সময়ে নিমেষের ব্যবধানও অসহ্য হইয়া উঠে; তখন ধৈর্য্যাভাববশতঃ চক্ষুর পক্ষনির্ম্মাতা ব্রহ্মাকে রসজ্ঞানহীন এবং রসহীন জড় বলিয়া মনে হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে ব্রজসুন্দরীদিগের কল্পকালকেও ক্ষণকাল বলিয়া মনে হয় এবং বিরহ-সময়ে ক্ষণকালকেও কল্পকাল বলিয়া মনে হয়। উৎকণ্ঠার আধিক্যবশতঃ এইরূপ ক্ষণকল্পতা এবং কল্পক্ষণতা অন্য কোনও ধামের পরিকরদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

গাঢ় বাৎসল্য-প্রেমের আবেশে যশোদামাতা অজ অনাদি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও স্বীয় গর্ভজাত সন্তান বলিয়া মনে করেন এবং তদনুরূপ আচরণ—তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও—করিয়া থাকেন, এমন কি রজ্জুদ্বারা উলূখলের সঙ্গে বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাৎসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসন—বন্ধনপর্য্যন্ত, অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ অত্যদ্ভুত-প্রভাবময় বাৎসল্যপ্রেম দ্বারকা-মথুরায় দৃষ্ট হয় না।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণ গাঢ় সখ্যপ্রেমের প্রেরণায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, প্রাকৃত বালকের ন্যায় তাঁহার সহিত নানাবিধ খেলা খেলেন, তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেও, এমন কি তাঁহার মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট ফলাদি দিতেও, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত তদনুরূপ আচরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এমন গাঢ় সখ্যপ্রেমও দ্বারকা-মথুরায় দৃষ্ট হয় না।

ব্রজপ্রেমের অদ্ভুত প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। শ্রীচৈ. চ. ৩।১৮।১৭ ॥"

প্রেম সর্ব্বপরিচালক শ্রীকৃষ্ণকেও পরিচালিত করে। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সীতি ॥ শ্রুতি ॥" সমুদ্রের তরঙ্গে একখণ্ড তৃণ পতিত হইলে তাহা যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া যায়, তরঙ্গ তাহাকে যে দিকে নিয়া যায়, সেই দিকে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত তৃণখণ্ডের যেমন অন্য কোনও দিকে যাওয়ার শক্তি থাকে না, প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রেমের তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে যে দিকে লইয়া যাইবে, তাঁহাকেও সেই দিকেই যাইতে হইবে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও অন্যদিকে যাওয়ার আর তখন তাঁহার শক্তি থাকে না। সর্ব্বনিয়ন্তা হইলেও তিনি প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারেন না। এমনি অদ্ভুত প্রেমের শক্তি। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই পরব্রহ্ম বিভু-বস্তু হইয়াও তাঁহাকে ব্রজেশ্বরী যশোদামাতার হাতে বন্ধন স্বীকার করিতে হইয়াছে, সর্ব্বারাধ্য হইয়াও ব্রজরাজ নন্দবাবার পাদুকা মস্তকে বহন করিতে হইয়াছে, সুবলাদি রাখালগণকে নিজের স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির প্রভাবেই পূর্ণকাম হইয়াও, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও, তাঁহাকে যজ্ঞপত্নীদের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মাশিবাদি কত চেষ্টা করিয়াও যাঁহার চরণসেবা পায়েন না, প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া অতি দীন ভাবে করযোড়ে আভীর-বালিকার পদপ্রান্তে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এত সব করিয়াছেন, তাহা অনিচ্ছা বা বিরক্তির সহিত নহে, পরন্তু বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিতই এ-সমস্ত কাজ করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শিষ্যকে গুরু যে ভাবে পরিচালিত করে, শ্রীরাধার প্রেমও শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অতি গৌরবের সহিত নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১০৮ ॥" শ্রীরাধিকার প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে সদা করয়ে বিহ্বল ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১০৬-৭ ॥"

আর, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরবর্গও স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়, আপনা ভুলিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যায়েন। প্রেমের অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহাদেরও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। প্রেমের এই মহীয়সী শক্তিতে ব্রজসুন্দরীগণ—বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদি তো ত্যাগ করিয়াছিলেনই, অধিকন্তু যাহার রক্ষার জন্য কুলবতী রমণীগণ অম্লানবদনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন,—সেই আর্য্যপথ পর্য্যন্ত তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে যখন তাঁহাদের প্রেম-সমুদ্রে বান ডাকিল, তখন ঐ বানের মুখে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিষয়ক সাজসজ্জার পারিপাট্য-জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাসিয়া গেল। তাই তাঁহারা নয়নের কাজল দিলেন চরণে, চরণের আল্‌তা দিলেন নয়নে; গলার হার পরিলেন কোমরে, আর কোমরের ঘুন্টি পরিলেন গলায়। এই ভাবেই প্রেম তাঁহাদিগকে নাচাইয়াছিল।

অন্য কোনও ধামেই প্রেমের এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব দৃষ্ট হয় না। এতাদৃশ প্রেমবান্ পরিকর ভক্তদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে লীলা করেন। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্য" ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

ইহাদ্বারা ব্রজপ্রেমের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যও সূচিত হইয়াছে। প্রেম উল্লিখিতরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরবর্গকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া স্বীয় অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিত্বময় অমৃতরসই আস্বাদন করাইয়া থাকে।

## গ। ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য এবং রূপমাধুর্য্য—ব্রজের এই চারিটী অসাধারণ মাধুর্য্যের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু লঘুভাগবতামৃত "প্রেমমাধুর্য্যের" স্থলে "ঐশ্বর্যমাধুর্য্য" বসাইয়া—লীলামাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য এবং রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী অসাধারণ মাধুর্য্যের কথা বলিয়াছেন।

"চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে।
ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণো স্তথা তদ্বিগ্রহস্য চ॥ কৃষ্ণামৃত। ৮০৬"

বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থের উক্তির মধ্যে বিরোধ কিছু নাই। "ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য"-শব্দে "প্রেমমাধুর্য্যই" খ্যাপিত হইয়াছে। কেননা, ঐশ্বর্য্য স্বরূপতঃ মধুর নহে; তাহা বরং ত্রাসজনক, সঙ্কোচ-বিধায়ক। সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্যের এইরূপ স্বভাব। কেবল ব্রজের ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যময়; যেহেতু, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যরসে পরিনিষিক্ত, পরিষিঞ্চিত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত। এই মাধুর্য্যরস—প্রেমেরই মাধুর্য্যরস। সুতরাং ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য বলিতে প্রেমমাধুর্য্যের প্রভাবই সূচিত হইয়া থাকে।

লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—যাহার কথা অন্যত্র কোথাও শুনা যায় না, এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব মধুরৈশ্বর্য্যরাশি দ্বারা সেব্যমান হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়া থাকেন।

"কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥ কৃষ্ণামৃত। ৮০৭॥"

মধুরৈশ্বর্য্যদ্বারা সেব্যমান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলারসে এমনি তন্ময়তা লাভ করেন যে, ব্রহ্মারুদ্রাদি সভয়ে তাঁহার স্তবস্তুতি-আদি করিলেও তিনি নয়ন-কোণেও একবার তাঁহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পায়েন না।

"যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ।
দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ॥ কৃষ্ণামৃত। ৮০৮॥"

শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবের দ্বারা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অভিমানি-দেবতাগণের অভিমানও চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নামই ঐশ্বর্য্য; "ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবোহি ঐশ্বর্য্যম্—বলদেববিদ্যাভূষণ"। আর, সমস্ত অবস্থায় চেষ্টাসমূহের যে চারুতা বা মনোহারিত্ব, তাঁহার নাম মাধুর্য্য। "মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা—উজ্জ্বল-নীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ॥৬৪॥" ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লীলাতেও তাঁহার কার্য্যের, ভঙ্গীর এবং রূপের মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা

পূতনার প্রাণ বিনাশ করিলেন ; কিন্তু কোনওরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলেন না ; দুগ্ধপোষ্যশিশু মায়ের কোলে বসিয়া যে ভাবে স্তন পান করে, শ্রীকৃষ্ণও ঠিক সেই ভাবেই পূতনার কোলে বসিয়া স্তনপান করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার মুখের ভঙ্গীদ্বারাও এমন কিছু বুঝা যায় নাই যে, তিনি পূতনার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তনযুগলে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন ( ইহা চেষ্টার চারুতারূপ মাধুর্য্য ) ; তখনও তাঁহার মুখখানা মনঃপ্রাণাকর্ষি অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-কালেও শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা ও রূপের অপূর্ব্ব চারুতা—ঐশ্বর্য্যরূপ মাধুর্য্যের ইহা একটী দৃষ্টান্ত। পূতনার জীবনলীলা সাঙ্গ হইল, তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল ; বিরাট ও বিকট মূর্ত্তিতে পূতনা ধরাশায়িনী হইল ; কিন্তু তাহা দেখিয়াও শিশু-কৃষ্ণের ভয় নাই ; তাঁহার শিশুদেহ-সুলভ লাবণ্য, চপলতা, অকুতোভয়তা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল ; তিনি নির্ভয়ে পূতনার বিশাল রক্ষঃস্থলে খেলা করিতে লাগিলেন, যেন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যেন তিনি যশোদামাতার অঙ্গনেই খেলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ের চেষ্টা বড়ই মধুর ; আর তাঁহার এই মধুর চেষ্টা ও রূপ দেখিয়া এবং আসন্নবিপদ হইতে ভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন দেখিয়া পিতামাতা এবং গুরুবর্গের মধুর বাৎসল্য-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই যে পূতনারাক্ষসী বিনষ্ট হইল, এই ভাব কাহারও মনেই জাগ্রত হয় নাই এবং তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কাহারও প্রীতিও সঙ্কুচিত হয় নাই। বরং যশোদামাতা নরশিশুর ন্যায় তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিতে লাগিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্য—কি ব্রজেন্দ্রনন্দন, কি তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরবর্গ—সকলকেই মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া থাকে এবং তাঁহার নরলীলাকে অতিক্রম না করিয়াই ইহা প্রকটিত হয় ; নারদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ ! তুমি দ্বারকানাথরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্য বিনাশ করিতে পার নাই, তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলায় নিহত করিয়াছ। হে হরে ! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার কর, তাহা হইলে আকাশস্থ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইতে থাকেন—"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ নব্যয়া বাল্যলীলয়া॥ সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা॥ ল, ভা, কৃ, ৫২৯-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।" শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, কালীয়দমন, অঘাসুর-বকাসুর-বধ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্রজলীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে ; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-প্রকটন-কালেও তিনি ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক কোনও অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ বা ভাব অঙ্গীকার করেন নাই ; তাঁহার সহজ ভাবে, সহজ নরলীলা রক্ষা করিয়া, তিনি ঐ সকল লীলা করিয়াছেন ; তাঁহার পূর্ণ-মাধুর্য্যের অন্তরালে থাকিয়া, মাধুর্য্যদ্বারা যেন আত্মগোপন করিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য্যশক্তি ক্রিয়া করিয়াছে ; ইহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য ; ইহা একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি।

পরব্যোমের বা দ্বারকার ঐশ্বর্য্য মধুর বা আস্বাদ্য নহে। কিন্তু ব্রজে ইহার বিপরীত ; ব্রজে পূর্ণতমমাত্রায় ঐশ্বর্য্য আছে, ঐশ্বর্য্যের বিকাশ অন্যধাম অপেক্ষা ব্রজে অনেক বেশী ; কিন্তু ব্রজের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ভীতি, গৌরব-বুদ্ধি বা রূঢ়তাদি মিশ্রিত নাই ; এজন্য ব্রজের ঐশ্বর্য্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না ; বরং প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া, ভাবের পুষ্টিই সাধিত করে, তাতে আস্বাদনযোগ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। অঘাসুর-

বকাসুর-বধ, দাবানলভক্ষণাদি লীলায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাদের সখ্যভাব বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই ; তাঁহারা স্কন্ধারোহণাদি-ধৃষ্টতা-জনিত অপরাধ-খণ্ডনের জন্য এক দিনও শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়ার লোভও তাঁহারা বিসর্জ্জন দেন নাই—এমন কি, ঐ সব যে তাঁহাদের সখা—নন্দ-মহারাজের ছেলে গোপালের শক্তিতে হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই ; তাঁহারা ভাবিয়াছেন—শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহেই, অথবা অন্য কোনও অচিন্ত্য ও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ও তাঁহাদের প্রাণ-কানাই নানাবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। শঙ্খচূড়বধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাব সঙ্কুচিত হয় নাই—অসুর-সংহারাদি লীলাদর্শন করিয়াও কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্‌ভাব স্ফুরিত হয় নাই ; বরং ঐ সব লীলায় শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব ভাব-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র। এইরূপে ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের মধ্যে কাহারও মনেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান উন্মেষিত হয় নাই ; সুতরাং কাহারও ভাব এবং প্রীতি সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং পরিপুষ্টি লাভই করিয়াছে। ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের বিশেষত্ব, ইহাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্য। ব্রজের ঐশ্বর্য্যের প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যমণ্ডিত, প্রত্যেক অণু-পরমাণু মাধুর্য্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। অম্ল স্বতঃ আস্বাদ্য নহে ; কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট যোগ করিলে যেমন অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্বাদুতা লাভ করে, ব্রজের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ।

### ঘ। বেণুমাধুর্য্য

বেণুমাধুর্য্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুর স্বরমাধুর্য্যকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—

"যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি ॥
চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনিতে মোহনে ॥ কৃষ্ণামৃত।৮১২-১৩॥

—নিখিল-লোকে যত রকম শব্দমাধুরী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক পরমাণুতেই তৎসমস্ত নিমজ্জিত হয়, অর্থাৎ বংশীধ্বনির এক কণিকার মাধুর্য্যও নিখিল-জগতের যাবতীয় শব্দমাধুর্য্যের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বংশী যখন ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই সান্দ্র-পরমানন্দে নিমগ্ন হয় এবং তাহাদের ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ সান্দ্র-পরমানন্দজনিত সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে স্থাবরে জঙ্গমের ধর্ম্ম এবং জঙ্গমে স্থাবরের ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়—স্থাবর পর্ব্বতও জঙ্গমের ন্যায় পুলকিত এবং কম্পিত হইয়া উঠে এবং জঙ্গম নরনারী জাড্যবশতঃ স্থাবরের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়ে।"

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণীরই যে প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার উদিত হয়, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥—শ্রীভা. ১০।২১।৯॥

—( কোনও কোনও গোপী অন্যগোপীগণকে বলিতেছেন ), হে গোপীগণ, এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের যে অধর-সুধা কেবলমাত্র গোপীদিগেরই উপভোগ্য, এই বেণু স্বয়ং তাহা পান করিতেছে। যেসকল হ্রদিনীর ( নদীর ) জলে এই বেণু পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বেণুর পানাবশিষ্ট রস পান করিয়া অঙ্গে পুলক ধারণ করিতেছে এবং তাহাদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণও—যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বৃক্ষগণও—বেণুর ভুক্তাবশিষ্ট-রসমিশ্রিত হ্রদিনীজল পান করিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে।"

বেণুধ্বনি শুনিয়া হ্রদ এবং বৃক্ষগণ যে সাত্ত্বিকভাব ধারণ করে, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা গেল।

"বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥—শ্রীভা. ১০।৩৫।৬-৭॥

—( কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে বলিতেছেন ) ময়ূরপুচ্ছের স্তবক, গৈরিকরাগ এবং তরুপল্লবদ্বারা সজ্জিত মল্লবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অন্য গোপশিশুগণের সঙ্গে কোনও সময়ে যদি বেণুধ্বনি করিয়া গাভী-সকলকে আহ্বান করেন, তখন সেই ধ্বনি শুনিয়া নদীসকলের গতি ভঙ্গ হয়; তাহারা যেন গতি ভঙ্গ করিয়া বায়ুদ্বারা চালিত মুকুন্দের পাদপদ্মের ধূলিকণা লাভের জন্যই অভিলাষবতী; কিন্তু সেই পদরেণুলাভের উপযোগী কোনও বহুপুণ্য আমাদের যেমন নাই, এই নদীসকলেরও নাই; তাই তাহারা মুকুন্দের পদরেণু পাইতেছে না। প্রেমভরে তাহারা তাহাদের তরঙ্গভুজ কম্পিত করিয়া নিশ্চল হইয়া আছে।"

বেণুধ্বনি-শ্রবণে নদীসকলেরও যে গতিভঙ্গ হয়, জল নিশ্চল হইয়া যায়, উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহা জানা গেল।

"অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদাহি ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারা প্রেমহৃষ্টতনবো বরৃষুঃ স্ম ॥—শ্রীভা. ১০।৩৫।৮-৯॥

—( কোনও গোপী তাঁহার সখীগণের নিকটে বলিতেছেন ) আদিপুরুষের ন্যায় অচলশ্রী মুকুন্দ যখন বনে বিচরণ করিতে থাকেন, তাঁহার অনুচর গোপবৃন্দ যখন সম্যক্‌রূপে তাঁহার বীর্য্যাদি কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন যে সকল গাভী গিরিতটে বিচরণ করিতে থাকে, তাহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্য যখন তিনি বেণুধ্বনি করিতে থাকেন, তখন সেই বেণুধ্বনি শুনিয়া পুষ্প-ফলাঢ্য বনলতা ও তরুগণ প্রেমভরে পুলকিত হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকে; তাঁহাদের মধ্যে যে বিষ্ণু আছেন—ইহাই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে।"

বংশীধ্বনি শুনিয়া বৃক্ষলতাগণেরও যে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়, এই প্রমাণে তাহা জানা গেল।

"বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥—শ্রীভা. ১০।২১।১০॥

—(কোনও গোপী তাঁহার সখীদিগকে বলিতেছেন) হে সখি! বৃন্দাবনই পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে—পৃথিবীর কীর্ত্তি যে স্বর্গের কীর্ত্তি হইতেও বৈশিষ্ট্যময়ী, তাহা বৃন্দাবনই প্রকাশ করিতেছে; যেহেতু, দেবকীনন্দনের পদাম্বুজ হইতে এই বৃন্দাবন অপূর্ব্ব সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। এই বৃন্দাবনে গোবিন্দের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে; সেই নৃত্য দেখিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে অন্য যে সমস্ত প্রাণী আছে, মুকুন্দদর্শন ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্রিয়া হইতে তাহারা উপরত হইয়াছে।"

বংশীধ্বনি-শ্রবণে ময়ূরগণ যে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, এই শ্লোক হইতে তাহা জানা গেল।

শ্রীমদ্ভাগবতের "সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস" ইত্যাদি ১০।৩৫।১১-শ্লোকে এবং "প্রায়ো বতাম্ব বিহগা"-ইত্যাদি ১০।২১।১৪-শ্লোকে সারস-হংসাদি পক্ষিগণের, "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি"-ইত্যাদি ১০।২১।১১-শ্লোকে এবং "বৃন্দশো ব্রজবৃষা" ইত্যাদি ১০।২১৫-শ্লোকে এবং "ক্বণিতবেণুরব"-ইত্যাদি ১০।২১।১৯-শ্লোকে গো-বৎস-বৃষ-মৃগাদির, "ব্যোমযানবনিতা"-ইত্যাদি ১০।২১।৩-শ্লোকে সিদ্ধাঙ্গনাদিগের, "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য"-ইত্যাদি ১০।২১।২২-শ্লোকে বিমানচারিণীদিগের "সবনশস্তদুপধার্য্যসুরেশাঃ"-ইত্যাদি ১০।৩৫।১৫-শ্লোকে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি সুরেশ্বরগণেরও বেণুনাদ-শ্রবণে সাত্ত্বিক-ভাবোদয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"হে প্রিয়! ত্রিলোকীতে এমন কোন্ রমণী আছেন, তোমার বেণুর দীর্ঘ মূর্চ্ছিত স্বরালাপভেদ-যুক্ত মধুর ধ্বনিতে সম্মোহিত হইয়া যিনি আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন?

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্॥—শ্রীভা. ১০।২৯।৪০॥"

এ-সমস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা জানা যায়।

## ৬। রূপমাধুর্য্য বা বিগ্রহ-মাধুর্য্য

লঘুভাগবতামৃত বলেন—

"অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ॥ কৃষ্ণামৃত।৮১৮॥

—গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যতরঙ্গামৃতের সমুদ্রতুল্য; তাঁহার রূপ স্থাবর-জঙ্গমেরও উল্লাসদায়ক।"

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের রূপসম্বন্ধে নিম্নলিখিত তন্ত্রবাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে॥ কৃষ্ণামৃত। ৮১৯॥

—যাঁহার পাদনখাঞ্চলের শোভাও কোটি-অর্ব্বুদ কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা অধিক, যাঁহার রমণীয়-কান্তির ন্যায় কান্তি কোথাও দেখা যায় না, যে রম্যকান্তির ন্যায় কান্তির কথা কোথাও শুনাও যায় না, তাদৃশ শোভাসম্পন্ন এবং রম্যকান্তিযুক্ত নন্দসুতের ধ্যানের কথা বলিতেছি।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, শ্রীকৃষ্ণরূপ—

"পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন ॥ ২।৮।১১০ ॥"
"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ২।২১।৮৪
কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ
তাসভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥২।২১।৮৮ ॥"

কারণার্ণব-মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের একটী ধাম আছে, তাহার নাম মহাকালপুর। এই মহাকালপুরেও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এক স্বরূপে (মহাকালরূপে) অবস্থান করেন। ["ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮৯।৫২-শ্লোকের টীকায় "মহাকাল"-সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মহাকালঃ পরব্যোমস্থো মহাবৈকুণ্ঠনাথস্তস্যৈব কারণার্ণব-জলান্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরম্।—মহাকাল হইতেছেন পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠনাথ (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ); কারণার্ণবমধ্যস্থ তাঁহারই ধামের নাম হইতেছে মহাকালপুর।"] শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই মহাকালপুরেশ্বর শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্য দর্শনের জন্য লুব্ধ হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রীনারায়ণ দ্বারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্ত্রগণকে জন্মমাত্র হরণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ মনে করিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব; দ্বিজপুত্ত্রদিগকে নেওয়ার জন্য তিনি নিশ্চয়ই মহাকালপুরে আসিবেন; তখন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।" যা হউক, ব্রাহ্মণের নবম সন্তানটীও যখন ঐ ভাবে অদর্শন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে মহাকালপুরে উপনীত হইলেন। তখন মহাকালপুরস্থ শ্রীনারায়ণ বলিয়াছিলেন—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতাঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৮ ॥—তোমাদের দুইজনকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে দ্বিজপুত্ত্রগণকে আমি এ-স্থানে আনিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের চিত্তকেও আকর্ষণ করে, ইহাই তাহার প্রমাণ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই যখন এই অবস্থা, তখন পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের কথা আর কি বলা যায়?

শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্য নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও কঠোর ব্রতাচরণপূর্ব্বক বহুকাল যাবৎ

উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥" পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের কথা আর কি বক্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তত্রত্য মথুরা-নাগরীগণ তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শনে একান্ত লুব্ধ হইয়া, যাঁহারা সর্ব্বদা এই রূপমাধুর্য্য পান করিতেছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ —শ্রীভা. ১০।৪৪।১৪॥

—ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) রূপ লাবণ্যের সারভূত, অসমোর্দ্ধ, অনন্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ), প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান, অপরের পক্ষে দুর্ল্লভ; এই রূপ যশের, শ্রীর (সৌন্দর্য্যের বা লক্ষ্মীর) এবং ঐশ্বর্য্যের একান্ত ধাম। ব্রজের গোপীগণ কোন্ তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা নয়নের দ্বারা সর্ব্বদা এই রূপসুধা পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন?"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥
—শ্রীভা. ৯।২৪।৬৫॥

—মকর-কুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত কর্ণদ্বয়দ্বারা দীপ্তিমান্ গণ্ডদ্বয় যাহাঁর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে, (হর্ষৌৎসুক্য-চাপল্যাদি)-বিলাসময় হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং যাহা (সর্ব্বসন্তাপহারক এবং নিত্য আনন্দদায়ক বলিয়া) নিত্যই উৎসবময়, শ্রীকৃষ্ণের সেই বদন (বদনমাধুর্য্য) নেত্রদ্বারা পান করিয়া নারীগণ এবং নরগণ আনন্দিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; (যেহেতু, নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের বিঘ্নকারী নয়নের নিমেষকেও সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমিষ-নির্ম্মাতা) নিমির (ব্রহ্মার) প্রতি কুপিত হইয়াছেন।"

"লাবণ্যকেলিসদন,　　জননেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে,　　সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিবে পানে।
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ,　　পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥
না দিলেক লক্ষ কোটি,　　সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন,　　রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন,　　তারে করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে,　　কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥—শ্রীচৈ. চ. ২।২১।১১০-১৩॥”

শ্রীকৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য সম্বন্ধে শ্রীলবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে লিখিয়াছেন—

“মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥৯২॥

—এই বিভু-শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি মধুর, মধুর; বদনখানি মধুর, মধুর, মধুর; ইঁহার মধুগন্ধি মন্দহাসি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর।”

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

“কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর　　মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর,　　তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর,　　তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে,　　ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর ॥ ২।২১।১১৬-১৭॥”

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যসম্বন্ধে শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত বলিতেছেন—

“সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ॥৮।৩॥

—( শ্রীরাধা তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন ) হে সখি! যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে সংপ্লাবিত করেন, যাঁহার রম্যবচন পরিহাসময় এবং কর্ণ-সুখদ, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যিনি স্বীয় সৌরভ্যামৃতদ্বারা সমস্ত জগৎকে সংপ্লাবিত করেন, এবং যাঁহার অধর অমৃত হইতেও রমণীয়, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন বলপূর্ব্বক আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন।”

“নবাম্বুদলসদ্দ্যুতি র্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ সুচিত্রমুরলীস্ফুরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্।—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ॥৮।৪॥

—( শ্রীরাধা তাঁহার কোনও সখীর নিকটে বলিতেছেন ) নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর যাঁহার দেহকান্তি,

নববিদ্যুৎ অপেক্ষাও মনোহর যাঁহার বসন, যাঁহার সুন্দর-দর্শন-মুরলী-শোভিত শ্রীবদন অকলঙ্ক-শারদ-শশীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার কেশকলাপ ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত এবং তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি, হে সখি, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আপন সৌন্দর্য্যদ্বারা আমার নয়নের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন।"

"নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্র মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল॥—শ্রীচৈ. চ. ৩।১৫।৫৬-৬০॥"

বহু গ্রন্থের বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক উক্তি দৃষ্ট হয়। এই রূপের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, অন্যের কথা তো দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত নিজের রূপ দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার আস্বাদনের জন্য প্রলুব্ধ হয়েন।

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে সাধ হয় মনে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৬॥"

"কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২৮॥"

নিজের রূপ-মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিবার জন্য কেহ ইচ্ছা করে না; তাহা বরং প্রিয় ব্যক্তিকেই আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে—নিজের মাধুর্য্য-

দর্শনে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চঞ্চল হইয়া পড়েন। তাঁহার রূপ—"আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর।"

শ্রীকৃষ্ণের নিজের রূপ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময়-উৎপাদক, শ্রীমদ্‌ভাগবতও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভা. ৩।২।১২॥

—( উদ্ধব বিদুরের নিকট বলিয়াছেন ) স্বীয় যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী যে রূপটী প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে—সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, ভূষণসমূহেরও ভূষণস্বরূপ অঙ্গবিশিষ্ট এবং ( সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ) নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদক।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও প্রেমিক ভক্তের সান্নিধ্যে প্রেমিক ভক্তের প্রেমের প্রভাবেই তাঁহার মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যে ভক্তের মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যও ততটুকুই বিকশিত হয়। শ্রীরাধার মধ্যেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ এবং এই সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকাশময় মাধুর্য্যের সান্নিধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেমও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—

"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥"

বিভুবস্তু পরস্পর-বিরুদ্ধময়। তাই, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এবং রাধাপ্রেম—উভয়ে বিভু হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হয়। একথাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,

"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥
রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ ১।৪।১১০-১১॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে॥ ১।৪।১২২-২৩॥"

শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তাহা দেখিয়া সর্ব্বচিত্ত-মোহন মদনও মোহিত হইয়া যায়; তখনই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন রূপের বিকাশ।

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। —শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত ॥৮।৩২॥"

এই মদন-মোহনরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ।

## ১৪০। মাধুর্য্য ভগবত্ত্বাসার

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃই ভগবান্। ভগবত্ত্বার পূর্ণতম বিকাশেই পরব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং ভগবত্ত্বার যাহা সার, তাহা হইবে পরব্রহ্মত্বেরও সার।

পরব্রহ্মে মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য এই দুইই বর্ত্তমান। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভগবত্তার সার? মাধুর্য্য? না কি ঐশ্বর্য্য? না কি উভয়ই?

এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই বিচার করিতে হইবে—সার বলিতে কি বুঝায়?

সার বলিতে বুঝায়—প্রাণবস্তু, অপরিহার্য্য বস্তু। যাহা কোনও বস্তুর স্বরূপগত এবং যে স্বরূপগত বস্তুটীর অভাবে সেই বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সার, সেই বস্তুর পক্ষে অপরিহার্য্য।

এইক্ষণে দেখিতে হইবে, পরব্রহ্ম ভগবানের পক্ষে এতাদৃশ স্বরূপগত অপরিহার্য্য বস্তু কি।

পরব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ বলিয়াই ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। মূলতঃ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপই, আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ। আনন্দও আস্বাদ্য, মধুর। রস আরও আস্বাদ্য, আরও মধুর। তাহা হইলে দেখা গেল—স্বরূপ-লক্ষণে পরব্রহ্ম হইলেন মধুর, মাধুর্য্য। মাধুর্য্যসূচক শব্দদ্বারাই শ্রুতি পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।

অবশ্য শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তাও বলা হইয়াছে। "তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ।৬।৭॥"—ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য হইতেছে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কার্য্য, সুতরাং তটস্থ-লক্ষণ, স্বরূপ-লক্ষণ নহে। স্বরূপ-লক্ষণ নিত্যই বস্তুতে বিদ্যমান থাকে; তটস্থ-লক্ষণ বস্তুতে বিদ্যমান্ থাকিলেও সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশ করে না। তটস্থ-লক্ষণ হয় স্বরূপ-লক্ষণের অনুগত। সুতরাং স্বরূপ-লক্ষণেরই প্রাধান্য।

তাহা হইলে বুঝা গেল, মাধুর্য্য পরব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্য তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ বলিয়া ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৩৮-অনুচ্ছেদের আলোচনাতেও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য দেখা গিয়াছে।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রাধান্য হইলেও কেবলমাত্র মাধুর্য্যকেই ভগবত্তার সার—ভগবত্তার বা পরব্রহ্মত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু বলা সঙ্গত হইবে না। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য উভয়ও অপরিহার্য্য হইতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্য যে অপরিহার্য্য নয়, তাহাই দেখান হইতেছে।

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ যেমন পরব্রহ্মের প্রকাশ, পরমাত্মাও তেমনি তাঁহার এক প্রকাশ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মও তাঁহার এক প্রকাশ। প্রত্যেক প্রকাশই আনন্দস্বরূপ; যেহেতু, প্রত্যেকেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রকাশ। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ—আস্বাদ্য, সুতরাং মধুর। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত—জীবগণও ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও মাধুর্য্য আছে; কিন্তু শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া তাঁহাতে ঐশ্বর্য্য নাই।

এইরূপে দেখা গেল, পরব্রহ্মের সকল প্রকাশেই মাধুর্য্য আছে; কিন্তু সকল প্রকাশে ঐশ্বর্য্য নাই। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিলেও, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য নাই। এইরূপে দেখা গেল, পরব্রহ্মের পক্ষে ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য নহে; কিন্তু মাধুর্য্য অপরিহার্য্য; তাঁহার কোনও প্রকাশই মাধুর্য্যবর্জ্জিত নহে।

সুতরাং পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুইয়ের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য, ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য নহে। অপরিহার্য্য বলিয়া মাধুর্য্যই হইল পরব্রহ্মত্বের সার বস্তু।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ঐশ্বর্য্যই ভগবত্ত্বা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্য নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে ভগবান্ বলা যায় না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভগবত্ত্বা নাই। সুতরাং মাধুর্য্যকে পরব্রহ্মত্বের সার বলিলেও ভগবত্ত্বার সার বলা যায় কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। বশীকরণত্বই হইতেছে ভগবত্ত্বার তাৎপর্য্য। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্যের বা ভগবত্ত্বার প্রভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণ হইতে অনন্ত-ভগবৎস্বরূপগণ পর্য্যন্ত সকলকেই বশীভূত করিয়া রাখেন। কিন্তু মাধুর্য্যের বশীকরণ-শক্তির ব্যাপ্তি ঐশ্বর্য্যের বশীকরণ-শক্তি অপেক্ষাও অনেক বেশী। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায়, রাজসরকার যাহাদিগকে রাজদ্রোহী মনে করেন, স্বীয় ক্ষমতায়—রাজার ঐশ্বর্য্যে—তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে তাহাদের শরীরকে মাত্র আবদ্ধ করা হয়, মনকে বশীভূত করিতে পারা যায় না। মনকে বশীভূত করা যায়—একমাত্র মধুর ব্যবহারের বা মাধুর্য্যের দ্বারা। যাহার মন অপরের বশীভূত হয়, তাহার দেহও তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং বশীকরণ-শক্তির ব্যাপ্তি ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই বেশী। এই মনঃ-প্রাণ-বশীকরণ-শক্তি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের মাধুর্য্যেরও আছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাজুয্যপ্রাপ্ত জীব তাঁহার মাধুর্য্যের—ব্রহ্মানন্দের—আস্বাদনে এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, নিজের অস্তিত্বের কথাই ভুলিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবত্ত্বা না থাকিলেও ভগবত্ত্বার প্রাণবস্তু বশীকরণত্ব বিদ্যমান্। সুতরাং মাধুর্য্যকে ভগবত্ত্বার সার বলিলে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

অবশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা পরমাত্মায়, পরমাত্মা অপেক্ষা অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপে এবং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের ক্রমশঃ অধিকতর বিকাশ বলিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই মাধুর্য্যের—সুতরাং সর্ব্ব-বশীকরণী শক্তির—সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ।

"মাধুর্য্য ভগবত্ত্বাসার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
ভাগবতের স্থানে স্থানে, করিয়াছেন ব্যাখ্যানে,
যাহা শুনি জুড়ায় ভক্ত-কাণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২।৭২॥"

মাধুর্য্য ভগবত্ত্বার সার বলিয়াই ঐশ্বর্য্যের উপরেও মাধুর্য্যের প্রভাব, ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের আনুগত্য করিয়া থাকে।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

## শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব

### ১৪১। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব

পরব্রহ্মের আবির্ভাব-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ( ১।১।৭৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা-প্রকটন এবং লীলা-প্রকটনের প্রকার সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ( ১।১।১১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপেও ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং লীলাবতার-যুগাবতারাদিরূপেও আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

ভগবানের আবির্ভাব দুই রকমের—সদ্বারক এবং অদ্বারক। নরলীল ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়েন, তখন তাঁহার নিত্যপরিকর পিতামাতাকে আগে আবির্ভাবিত করাইয়া পরে তাঁহাদের যোগে তিনি আবির্ভূত হয়েন। পিতামাতার দ্বারে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া এইরূপ আবির্ভাবকে বলে সদ্বারক আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের **আবির্ভাব সদ্বারক**।

আর, যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ নরলীল নহেন, পিতামাতারূপ কোনও পরিকরও তাঁহাদের নাই। সুতরাং পিতামাতার যোগে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাঁহারা আপনা-আপনিই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আবির্ভাবকে **অদ্বারক আবির্ভাব** বলে। যেমন মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহাদির আবির্ভাব।

### ১৪২। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রুদ্রাদি-দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ীর নিকটে পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিয়া সমাধিস্থ হইলে আকাশবাণীতে তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবগৃহে অবতরণের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানেরই কার্য্য হইত, তাহা হইলে প্রতি যুগেই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত। কিন্তু প্রতিযুগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না ; তিনি অবতীর্ণ হয়েন ব্রহ্মার এক দিনে মাত্র একবার। তাঁহার অংশ ভগবৎ-স্বরূপই যে পৃথিবীর ভার-হরণ করেন, শ্রীমদ্ভাগবত পরিষ্কার ভাবেই তাহা বলিয়াছেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮ ॥

—ইঁহারা পুরুষের অংশকলা ; ইঁহারাই যুগে যুগে অসুরগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত জগতের ( অসুর-সংহারাদি করিয়া ) আনন্দ বিধান করেন। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্।"

এ-স্থলে "মৃড়য়ন্তি"-হইতেছে বহুবচনান্ত-ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়ার কর্ত্তাও হইবে বহুবচনান্ত। এই শ্লোকে "অংশকলাঃ"-ই একমাত্র বহুবচনান্ত শব্দ। "কৃষ্ণঃ" এক বচনান্ত। সুতরাং "অংশকলাঃ"ই হইতেছে "মৃড়য়ন্তি"-ক্রিয়ার কর্ত্তা। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে—স্বয়ং-ভগবানের অংশকলা-স্বরূপ ভগবৎ-স্বরূপগণই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-সংহারাদিদ্বারা জগতের কল্যাণ-বিধান করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ, অসুর-সংহারাদি হইতেছে জগৎ-পালনের অন্তর্ভুক্ত কার্য্য। জগতের পালন-কর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরই তাহা কার্য্য।

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তো তিনি অসুর-সংহারাদি করিয়াছেন। সুতরাং অসুর-সংহার যে তাঁহার কার্য্য নহে, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ?

ইহার উত্তর এই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণও—স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুও—তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অসুর-সংহারাদি বাস্তবিক স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুরই কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা তিনিই সেই কাজ করিয়া থাকেন।

"অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২॥"

ইহা বস্তুতঃ বিষ্ণু-শক্তিরই কার্য্য। সেই শক্তি প্রকটিত হইয়া কৃষ্ণের দ্বারা অসুর-সংহার করাইয়া থাকে বলিয়া ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণের আনুষঙ্গিক কার্য্য, মুখ্য কার্য্য নহে।

"আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৩॥"

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"-ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্য হইতে জানা যায়—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল হেতু তিনি। সুতরাং বিশ্বের স্থিতি-রক্ষার্থ অসুর-সংহারাদিও বস্তুতঃ তাঁহারই কার্য্য। তথাপি তিনি স্বয়ংরূপে এ-সমস্ত কার্য্য করেন না। তিনি গুণাবতার ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি কার্য্য, শিবের দ্বারা সংহার-কার্য্য এবং বিষ্ণুদ্বারা স্থিতি-কার্য্য করাইয়া থাকেন। শ্রুতিও তাহাই বলেন। "স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি॥ ভগবৎ-সন্দর্ভধৃতপ্রমাণ ( ১৪১ পৃষ্ঠা )।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ শ্রীভা. ২।৬।৩২॥ —তাঁহাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টিকার্য্য করি, তাঁহার বশীভূত হইয়া হর ( শিব ) সংহার-কার্য্য করেন এবং সেই ত্রিশক্তিধৃক্—(ক্ষীরোদশায়ী) পুরুষরূপে বিশ্বের পালন করিয়া থাকেন।"

এইরূপে দেখা গেল—অসুর-সংহারাদিদ্বারা পৃথিবীর ভার-হরণপূর্ব্বক জগৎ-পালনরূপ কার্য্য বাস্তবিক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হইলেও বিষ্ণুদ্বারাই তিনি তাহা করাইয়া থাকেন এবং প্রতিযুগে বিষ্ণুই অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যে যুগে স্বয়ংভগবান্ নিজে অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগে বিষ্ণু পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া, যে-শক্তির সহায়তায় তিনি বিষ্ণুদ্বারা অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন, সেই শক্তি প্রকটিত করিয়া তিনিই অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন। "বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহার"-বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। এইভাবে কংসাদি-অসুরের সংহার তাঁহারই কার্য্য; এজন্যই তাঁহাকে "কংসারি" বলা হয় এবং এজন্যই পুরাণাদিতে বলা হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন।" তথাপি কিন্তু ইহা তাঁহার মুখ্য কার্য্য নহে। সাক্ষাদ্-ভাবে ইহা বিষ্ণুরই কার্য্য। যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই তিনি অসুর-সংহারাদি করিয়া থাকেন। এজন্যই বলা হইয়াছে—"আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।"

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্‌কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলন, তখন রুদ্রাদি-দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা কংস-কারাগারে উপস্থিত হইয়া দেবকী-হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করার সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা "ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণম্"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।২।৩৯-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিতেছেন, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া পৃথিবীর দৈত্যকৃত উৎপীড়নের কথা জানাইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ক্ষীরোদশায়ীর যোগে তোমার চরণে আমরা প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাই আমরা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার ফলেই তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে। "অস্মদ্বিজ্ঞাপিতোঽস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোঽসি ইত্যস্মাকমভিমান এব।"

যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, অসুর-সংহারাদি শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; ইহাকে আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য মাত্র বলা যায়। কিন্তু অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তীদেবীর উক্তি, ব্রহ্মার নিজের উক্তি, ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্রূরের উক্তির আলোচনা আবশ্যক।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারাকায় যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকুন্তীদেবী স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, যদিও তোমার স্বরূপাদি সমস্তই দুর্জ্ঞেয়, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিন্যহীন জীবন্মুক্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি আমি কিরূপে অনুভব করিব?

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ। শ্রীভা. ১।৮।২০॥"

কুন্তীদেবী এস্থলে বলিলেন—**ভক্তিযোগবিধানার্থই** শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভূভার-হরণের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন—একথা কুন্তীদেবী বলিলেন না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কি রকম ভক্তিযোগ-বিধানের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন? যে ভক্তি দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি পাওয়া যায়, সেই ভক্তিযোগ? উত্তরে বলা যায়—না, তাহা নয়। কারণ,

সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে ; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল মুক্তি দিতে পারেন। "স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ। শ্রীচৈ. চ ১।৫।২৩॥ সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৫।২৬॥" প্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে ধর্ম্ম স্থাপন করেন, তাহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্য কোনও স্বরূপের দ্বারা সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের জন্যই স্বয়ংভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।২০॥" যে পর্য্যন্ত ভক্তিমুক্তিবাসনা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত যে-প্রেম তিনি কাহাকেও দেন না, সেই পরম দুর্ল্লভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতাদৃশী প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল সাধন হইতেছে—রাগমার্গের ভক্তি। সুতরাং রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহাই কুন্তীদেবীর উক্তির তাৎপর্য্য। রাগমার্গের ভজনে স্বসুখবাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম পাওয়া যাইতে পাবে, যদ্দারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ, যাহা "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৮॥" এবং যে মাধুর্য্যবিস্তারি "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৮৬॥"—সেই আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ পর্য্যন্ত যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে, তদনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু এরূপ অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাময় পরম দুর্ল্লভ বস্তুটী—যাহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, সেই জগতের জীবের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা কেন? তাঁর করুণাই ইহার একমাত্র হেতু। তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—এই করুণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাঁহার সুন্দরত্ব। এই করুণাবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।—শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫॥" এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাঁহার অবতার।

শ্রীকুন্তীদেবীর স্তবে আরও একটী কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটী যে কুন্তীদেবীর অত্যন্ত হার্দ্দ, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, তোমার নরলীলার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অনুকরণ কর, তাহাই বা কে বুঝিবে?" ইহার পরেই বলিলেন—"স্বয়ং ভয়ও ভীত হইয়া যাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করে এবং যাঁহার নাম-স্মরণেই সমস্ত অপরাধ দূরীভূত হয়, সেই তুমি গোপী যশোদার দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত

হইয়াছ। সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুব্যাপ্ত-নয়নে তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, তোমার তখনকার সেই অবস্থার কথা মনে পড়িলে আমি যেন বিমোহিত হইয়া পড়ি।

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্‌যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥ শ্রীভা, ১৮।৩১॥”

এস্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশ্যতার ইঙ্গিত দিলেন। সমস্ত ভয়ও যাঁকে ভয় করে, তিনি যশোদার ভয়ে ভীত। সকলের অতি দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্জুবন্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-ভগবত্তা, বিভুতা, তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি—সমস্তই যেন যশোদার অনাবিল প্রেমসিন্ধুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়া তাঁহাকে যশোদার বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়াছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলা—ইহাই শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসিকশেখর বলিয়াই এইরূপ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা।

কংসপ্রেরিত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানা কথাই তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল ; তাঁহার একটী কথা এই যে,—আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য করার উদ্দেশ্যেই জগৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি নরলীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

“সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম্।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ম্॥ বি, পু, ৫।১৭।১২॥”

কিন্তু তাঁহার এই আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য কি ? আত্মহৃদিস্থিত কার্য্য বলিতে—যে বাসনা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং যে বাসনা তাঁহার স্বরূপভূতা, তাহার পরিপূরণমূলক কার্য্যকেই বুঝায়। তিনি রসিকশেখর বলিয়া রসাস্বাদন-বাসনা এবং পরমকরুণ বলিয়া তাঁহার লীলাপরিকরগণকে এবং অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। এই বাসনার পরিপূরণার্থেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—অক্রূরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি এবং শ্রীঅক্রূরের উক্তির সূচনা একই।

কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন—( জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা বলিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে ) আপনার জন্মাদি কিছুই নাই। হে ভগবন্, বিনোদ ( লীলা বা ক্রীড়া ) ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

“ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা।
বিনোদং বত তর্কয়ামহে॥ শ্রীভা. ১০।২।৩৯॥”

টীকাকার আচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—বিনোদ অর্থ ক্রীড়া বা লীলা। লীলার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলার সঙ্কল্প, সূচনা, অনুষ্ঠানাদি সমস্তই আনন্দের প্রেরণায় উদ্ভূত; সুতরাং সমস্তই আনন্দময়; যাঁহারা একসঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দময়। (ইহাদ্বারা অসুরসংহারাদি-লীলা অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল; কারণ, অসুর-সংহার অন্ততঃ অসুরদের পক্ষে আনন্দময় নহে)। লীলায় পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় প্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ-বিধানও তিনি করিয়া থাকেন। আবার প্রকট-লীলায় তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাঁহার পরিকর-বহির্ভূত মায়াবদ্ধ জীবও তাঁহার চরণ-সেবায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সেরূপভাবেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬॥"

সুতরাং তাঁহার লীলা-বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহির্ম্মুখ-জীবদিগকে স্বীয় লীলারস ও মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা—অর্থাৎ রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের বাসনাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুন্তীদেবীর ও ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তির তাৎপর্য্য একই।

ব্রহ্মমোহনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"প্রভো, আপনি প্রপঞ্চের অতীত, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সম্ভার বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৭॥"

এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরণাগত বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদিগকে এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করান; তিনিও তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের উপস্থাপিত বা পরিবেশিত প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আর, ব্রহ্মাণ্ডস্থ রসিক-ভক্তগণও তাঁহাকে তাঁহাদের প্রীতিরস আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যাকুল; তাঁহাদের এই প্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় মাধুর্য্যের অনুভব জন্মাইয়া, এমন কি স্বীয় আনন্দঘন-বিগ্রহে তাঁহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থলবিশেষে সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শনাদি দিয়াও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ প্রপন্ন-শব্দে ভাবী প্রপন্ন ভক্তদিগকে, যাঁহারা অনাদি-বহির্ম্মুখ বলিয়া মায়ারই শরণাগত,—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগত নহেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পূর্ব্বোদ্ধৃত "অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি" শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তির সার্থকতা থাকে না। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, যাহাতে তাঁহারা তাঁহারই শরণাগত হইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও তিনি করিয়া থাকেন—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা দ্বারা রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের কথাই সূচিত হইতেছে। এইরূপে বুঝা গেল, ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে

এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপই ব্রহ্মার উক্তিরও অভিপ্রায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও একথাই বলিয়াছেন। রসিক-শেখর পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন—

"প্রেমরস-নির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪॥"

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন—প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবগণের মধ্যে রাগভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ব্রহ্মার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে।

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥"

তিনি যত কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তের মূলে রহিয়াছে তাঁহার ভক্তদের আনন্দ-বর্দ্ধনের স্পৃহা। এই স্পৃহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পৃহাবশতঃই "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।" কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৫॥" তাঁহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, না পরমকরুণত্বই বড় গুণ—বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণত্বই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো তিনি ভক্তবশ। তাঁহার ভক্তবশ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; দামবন্ধন-লীলায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভক্তবশ্যতা যখন করুণা হইতেই উদ্ভূত, তখন করুণাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা যায়—অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। একভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহার রসিকশেখরত্বকে তাঁহার পরমকরুণত্বেরই অঙ্গ বলা চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিনি রসিক না হইলে তাঁহার করুণা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুষ্পে শাখাপ্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাঁহার প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাঁহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া, কৃতার্থতা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ বলিয়া ভক্তের এই প্রীতিরসকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন—কেবল ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য। সুতরাং ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেই প্রীতিরস আস্বাদন এবং প্রীতিরসের আস্বাদনেই তাঁহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা—যাহার মূল হইল করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গৌণ। করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়, তাঁহার রসিকশেখরত্ব হইল করুণাময়ত্বেরই অঙ্গ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাঁহার রসাস্বাদন-স্পৃহা এবং

এই স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা—এইরূপও তো হইতে পারে ? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে রসিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ। এই উক্তি বিচারসহ নহে। রসাস্বাদনস্পৃহার পরিপূরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয় ; সর্ব্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তুতে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। ঐরূপ মনে করিলে কৃষ্ণ-কৃপার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অহৈতুকীত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

আর এক দিক্ দিয়াও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতি ভগবানেরও তেমনি প্রীতি। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রীভা. ৯।৪।৬৮॥" এইরূপই ভগবদুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি ; স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী—বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রীতিবিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৬৯॥" ভক্ত যেমন চাহেন, একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবান্‌ও চাহেন একমাত্র ভক্তের সুখ, নিজসুখবাসনার গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগপ্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদী-নামানুকূল্যান্নিষেবয়া" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এজন্যই লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যত্বেন পারস্পরিকাৎ।" এই পারস্পরিকী সুখবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, স্বতঃস্ফূর্ত্তা, নিরুপাধিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ হয়। রস-আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহা হইলে ভগবানের ভক্তপ্রীতি স্বসুখবাসনাপ্রসূত হইত, নিরুপাধিকী হইত না। একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তপ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন-বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য ; ভগবানের পক্ষে ভক্তপ্রেমরসমাধুর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—ভক্তের আনন্দসম্ভার-বর্দ্ধনের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। অপ্রকটলীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকটলীলাতেও। অপ্রকটলীলাতে যে আনন্দবৈচিত্রীর প্রকটন সম্ভব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরিকর-ভক্তগণকে তাহা আস্বাদন করান। অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং বহির্ম্মুখ জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত আনন্দদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত লীলার প্রবর্ত্তকই হইল ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনেচ্ছা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ।" ইহাতেই তাঁহার পরমকরুণত্ব, ইহাতেই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয় ইত্যাদ্যুক্তদিশা সত্যপি আনুষঙ্গিকে ভূভারহরণাদিকে কার্য্যে, স্বেষাম্ আনন্দ-চমৎকারপোষায়ৈব লোকেঽস্মিন্ তদ্রীতি-সহযোগ-চমৎকৃত-নিজজন্মবাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাত্মকলৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিত-শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহে তদ্বিধযদুবৃন্দসংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি।—'আমরা স্ত্রীজাতি, কিরূপে তোমার তত্ত্ব বুঝিব'—এইরূপ কুন্তী-বাক্যানুসারে জানা যায়, ভূভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য্য থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দচমৎকারিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব নিজ

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর সম্বন্ধীয় লৌকিক-লীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবসুদেবকে প্রকটিত করিয়া তত্তুল্য-যদুবৃন্দসম্বলিত সেই বসুদেবের গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৭৪॥” শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূভারহরণ শ্রীকৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কারণমাত্র; মুখ্য কারণ হইল—স্বেষাম্ আনন্দচমৎকারপোষায়ৈব—স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমৎকারিতাবর্দ্ধন, তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে তাঁহাদের রসাস্বাদন-চমৎকারিতা সম্পাদন।

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দুইটী উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

“রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৫॥”

এই দুইটী ইচ্ছা অপর কেহ তাঁহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তাঁহার দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ হইতেই এই ইচ্ছা দুইটীর উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব এবং তাঁহার পরম-করুণত্বই এই দুইটী স্বরূপানুবন্ধি গুণ। তিনি রসিক-শেখর বলিয়া উৎকৃষ্ট রসের আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার স্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা। অপরের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখ দূর করার এবং তাহার সুখ-বিধানের ইচ্ছাতেই করুণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ-জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের এই সংসার-দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীয় চরণসেবার অন্তরঙ্গতম অধিকার দিয়া পরমসুখের অধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে **পরম-করুণ** শ্রীকৃষ্ণ রাগানুগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধিভক্তি দ্বারা ব্রজের ভাব পাওয়া যায় না ( শ্রীচৈ. চ. ১।৩।১৩ )—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবাও পাওয়া যায় না এবং আত্যন্তিকী স্থিতিও লাভ করা যায় না ( শ্রীচৈ. চ. ১।৩।১২ )। একমাত্র রাগানুগাভক্তি দ্বারাই ব্রজভাব, অন্তরঙ্গ-সেবা এবং আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্তু এই রাগানুগাভক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না; তাই শ্রীকৃষ্ণ এই রাগানুগাভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। তিনি পরমকরুণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উদ্গম। জীবের প্রতি তাঁহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করুণা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—“লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫॥”

এই দুইটী ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য হেতু হইলেও এই দুইটী ইচ্ছার উভয়টীই তুল্যরূপে প্রধান বলিয়া মনে হয় না। রসাস্বাদন-স্পৃহাটী রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধী হেতু; আর, রাগমার্গের ভক্তি প্রচার তাঁহার স্বরূপভূত-গুণানুবন্ধী হেতু। শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ—রসিক; তাই তাঁহার রসাস্বাদন-স্পৃহা। রসাস্বাদন তাঁহার নিত্য কার্য্য, নিজের নিমিত্ত। “রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৯০ ॥” আর, কারুণ্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত গুণ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি জীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৫ ॥” এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি জীব-

নিস্তারের উদ্দেশ্যে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের জন্য ইচ্ছা করিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্য। রসাস্বাদন-স্পৃহা পরিপূরণের আনুষঙ্গিক ভাবেই মুখ্যতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়াছেন—

"এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব্ব-ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।২৯-৩০॥"

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তা-আদি পরিকরবর্গের সহিত যে সমস্ত রসাস্বাদিনী লীলা প্রকটিত করিবেন, সেই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরবর্গের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেমের কথা শুনিয়া, ঐ প্রেমের কৃষ্ণবশীকরণী শক্তির কথা শুনিয়া এবং পরিকরদের ঐ-প্রেম-সেবালব্ধ অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া—সমস্ত সংসার-সুখের, এমন কি স্বর্গাদি-সুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই গীতাবাক্যানুসারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগীয় ভজনে প্রলুব্ধ হইবে। এইরূপেই, শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন-স্পৃহার পরিপূরণমূলক রসাস্বাদিনী লীলার আনুষঙ্গিক ভাবে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার সম্ভব হইতে পারে।

ইহাতে বুঝা যায়, রসাস্বাদিনী লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কারণ। আর, এই রসনির্য্যাস আস্বাদনের আনুষঙ্গিক ভাবেই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার আনুষঙ্গিক-অন্তরঙ্গ-কারণ বলিয়াই মনে হয়। তথাপি উভয় কারণকেই অন্তরঙ্গ বলিবার হেতু এই যে, উভয় কার্য্যই তাঁহার; কেননা, তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন-কার্য্যও যেমন এই অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই নিষ্পন্ন হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাঁহার অন্তরঙ্গা-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ এবং অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই ইহারও প্রচার হয়। উভয় কার্য্যই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গ কারণ।

## ১৪৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়া পিতামাতার যোগেই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পিতামাতার যোগে যে আবির্ভাব, তাহাই তাঁহার জন্মলীলা।

কিন্তু পিতামাতার যোগে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত জীব যে ভাবে পিতামাতার যোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে আবির্ভূত হয়েন না। নিজেই তিনি অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্॥ গীতা ॥৪।৯॥"

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মের দিব্যত্ব-সম্বন্ধে উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় দিব্য-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন—"কর্ম্মমূল-হেয়-ত্রিগুণ-প্রকৃতিসংসর্গরূপজন্মরহিতস্য সর্বেবশ্বরত্ব-সর্ববজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-সমস্ত-কল্যাণগুণোপেতস্য সাধুপরিত্রাণায় মৎসমাশ্রয়নৈকপ্রয়োজনং দিব্যমপ্রাকৃতং মদসাধারণং মম জন্ম চেষ্টিতঞ্চ।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকম্।" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"জন্ম নিত্যসিদ্ধস্য এব মম সচ্চিদানন্দঘনস্য লীলয়া তথানুকরণং কর্ম্ম চ ধর্ম্মসংস্থাপনেন জগৎ-পরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য দিব্যমপ্রাকৃতম্।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—"দিব্যমপ্রাকৃতম্ ঐশ্বরম্।"

তাঁহার জন্ম—দিব্য, অলৌকিক, অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে লোকের যে জন্ম, তাহা হইতেছে লৌকিক, প্রাকৃত। কিন্তু ভগবানের জন্ম তদ্রূপ নহে। লৌকিক প্রাকৃত জন্ম কি, তাহা জানিলেই অলৌকিক অপ্রাকৃত জন্মের একটা ধারণা করা যাইতে পারে। দেহী বা জীবস্বরূপ নিত্য এবং অপ্রাকৃত হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের ভোগায়তন দেহ অনিত্য, প্রাকৃত। স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগের জন্য মায়াবদ্ধ জীব শস্যের যোগে পিতৃশরীরে প্রবেশ করিয়া পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হয় এবং পরে মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করে। পিতা-মাতার শুক্র-শোণিতের যোগে কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী ভোগায়তন-দেহ লাভ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই জীবের লৌকিক জন্ম। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বশীভূত হইয়া প্রকৃতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব যে প্রাকৃত কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার ফলভোগের জন্যই প্রাকৃত দেহ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া তাহার জন্মও প্রাকৃত।

কিন্তু ভগবানের জন্ম এইরূপ প্রাকৃতও নহে, লৌকিকও নহে। যেহেতু তিনি মায়াতীত, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সুতরাং তিনি মায়ার বশীভূত নহেন; মায়াদ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি কোন কর্ম্ম করেন না। এতাদৃশ কোনও কর্ম্ম তাঁহার নাই বলিয়া মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কোনও কর্ম্মফল ভোগের জন্য তাঁহাকে প্রাকৃত-ভোগায়তন দেহ লাভের উদ্দেশ্যে শস্যাদির যোগে পিতৃশুক্রের সহিত মিলিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না এবং পিতামাতার শুক্র-শোণিতজাত প্রাকৃত দেহ লাভ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইতে হয় না। সুতরাং তাঁহার জন্ম প্রাকৃতও নহে, লৌকিকও নহে।

জীবস্বরূপ অপ্রাকৃত ও নিত্য বটে; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের দেহ অনিত্য, প্রাকৃত। তাই জীবের দেহ এবং দেহী একই অভিন্ন বস্তু নহে। কিন্তু ভগবানে দেহ ও দেহী একই অভিন্ন বস্তু—যেই দেহ, সেই দেহী; যেই দেহী, সেই দেহ। তাঁহার বিগ্রহই তিনি, তিনিই বিগ্রহ (১।১।৭০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া তিনি বা তাঁহার বিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ; নিত্যসিদ্ধ বলিয়া পিতামাতার যোগে জন্মদ্বারা তাঁহাকে দেহ লাভ করিতে হয় না।

তবে তাঁহার আবার জন্ম কেন? উপরে উদ্ধৃত শ্রীপাদ মধুসূদন-সরস্বতীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়—"জন্ম নিত্যসিদ্ধস্য এব মম সচ্চিদানন্দঘনস্য লীলয়া তথানুকরণম্"—তিনি নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া তাঁহার বাস্তবিক কোনও জন্ম থাকিতে পারে না; লীলাবশতঃ তিনি জন্মের অনুকরণ করেন মাত্র।

শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম"—তাঁহার এই জন্ম ( বা জন্মের অনুকরণ) স্বেচ্ছাকৃত—কর্ম্মফলও নহে, পিতামাতার শুক্র-শোণিত হইতে প্রাপ্তও নহে। স্বীয় ইচ্ছায় তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহকে জন্মের অনুকরণে প্রকটিত করেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাই লিখিয়াছেন—"কর্ম্মমূলঃ-হেয়-ত্রিগুণ-প্রকৃতিসংসর্গরূপ-জন্মরহিতস্য * * দিব্যমপ্রাকৃতম্ অসাধারণম্ মম জন্ম।"

তিনি যে নিজের ইচ্ছাতেই আত্মপ্রকট করেন, অর্জ্জুনের নিকটে তাহা শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ॥৪।৬ ॥

—অজ এবং অব্যয়াত্মা হইয়াও এবং ভূতসমূহের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আমি আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই।"

এই শ্লোকের দুইটী শব্দসম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন—প্রকৃতি এবং আত্মমায়া। প্রকৃতি-শব্দের অর্থে—শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ—স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, অর্থাৎ স্বীয় রূপেই।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্হর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে ( স্বরূপ-শক্তিকে ) অঙ্গীকার করিয়া—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপে।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"অত্র স্বরূপস্বভাবপর্য্যায়ঃ প্রকৃতিশব্দঃ স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি—এস্থলে প্রকৃতি-শব্দের অর্থ স্বরূপ-স্বভাব। নিজের স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হই।" চক্রবর্ত্তিপাদও এইরূপই লিখিয়াছেন।

প্রকৃতি-শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে জানা গেল—ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় স্বীয় অনাদিসিদ্ধ রূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

আর, "আত্মমায়া"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"আত্মমায়য়া আত্মীয়য়া মায়য়া মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্য্যায়োঽত্র মায়াশব্দঃ—এস্থলে মায়াশব্দের অর্থ জ্ঞান। তিনি নিজের জ্ঞানে—নিজের ইচ্ছায়—আবির্ভূত হয়েন।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বেচ্ছয়া অবতরামি—নিজের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হই।" শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"আত্মমায়য়েতি। ভজজ্জীবানুকম্পয়া হেতুনা তদুদ্ধারায়েত্যর্থঃ। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বঃ। আত্মমায়য়া স্বসার্ব্বজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পেনেতি কেচিৎ। মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চেতি নির্ঘণ্টকোষাৎ।—ভজনপরায়ণ জীবদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য ( বিশ্বকোষ-মতে মায়া-শব্দের একটী অর্থ—কৃপা )। কেহ কেহ বলেন—স্বীয় সঙ্কল্প বশতঃই তিনি অবতীর্ণ হয়েন ( নির্ঘণ্টকোষ-মতে মায়া-শব্দের একটী অর্থ—জ্ঞান )।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই লিখিয়াছেন—"আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন।"

মায়া-শব্দে সাধারণতঃ বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিকে বুঝাইলেও মায়া-শব্দ যে স্বরূপ-শক্তিকেও বুঝায়, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ একটী শ্রুতিবাক্য

উদ্ধৃত করিয়াছেন। "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ। (২২৯ পৃষ্ঠা)।—মায়ানাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া সনাতন-বিষ্ণুকে পণ্ডিতগণ মায়াময় বলিয়া থাকেন।—শ্রুতি॥" স্বরূপে নিত্য অবস্থিত থাকে বলিয়া স্বরূপভূতা-শব্দে স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায়।

আত্মমায়া-শব্দ যে একটী বিশেষ-অর্থে ব্যবহৃত হয়, মহাসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাহাও দেখাইয়াছেন। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতাতঃ (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ২২৯ পৃষ্ঠা)। —মহাসংহিতা অনুসারে ভগবানের আত্মমায়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছাকে বুঝায়।"

শব্দমহোদধির মতে মায়া-শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, জ্ঞান এবং বিষ্ণুশক্তি (পরা বা স্বরূপ-শক্তি)—এই তিনটী বস্তুকেই বুঝায়। "ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশব্দেন ভণ্যতে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধেঃ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ২২৯ পৃষ্ঠা ধৃত প্রমাণ।" এস্থলে "বিষ্ণুশক্তি"-শব্দে "পরাশক্তি" বা "স্বরূপ-শক্তি"কেই বুঝায়। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭।৬১॥"

মায়াতীত ভগবানের স্বরূপ-সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রযুক্ত মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা-মায়াকে বুঝাইতে পারে না, স্বরূপশক্তিই সে-স্থলে অভিপ্রেত।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—"অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, তিনি "আত্মমায়ায়—নিজের ইচ্ছাতেই (তাঁহার ইচ্ছাও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি) ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন এবং স্বীয় অনাদিসিদ্ধ রূপে বা বিগ্রহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। প্রাকৃত জীবের ন্যায় জন্মদ্বারা তিনি কোনও রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেন না; কেন না, তাঁহার জন্মই নাই, তিনি "অজ—অজোঽপি সন্।"

শ্লোকস্থ "অজ" ও "অব্যয়াত্মা"-শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"অজত্বাব্যয়ত্বসর্ব্বেশ্বরত্বাদিসর্ব্বপারমৈশ্বর্য্যপ্রকারমজহন্নেব—অজত্ব, অব্যয়ত্ব (অবিনাশিত্ব বা অপরিণামশীলত্বাদি), সর্ব্বেশ্বরত্ব এবং পারমৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগ না করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হয়েন।" শ্রীধরস্বামিপাদাদির অভিপ্রায়ও তদ্রূপই। ইহাতে জানা যায়—ভগবান্ তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতভাবেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং অবতীর্ণ হইলেও তিনি অব্যয়—বিকারহীনই থাকেন।

"ঈশ্বরোঽপি"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি—যদিও জীবের ন্যায় কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, তথাপি।" অর্থাৎ কর্ম্মপরতন্ত্রতাবশতঃই জীবের জন্ম হয়; তিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন বলিয়া তাঁহার জন্ম জীবের জন্মের মতন নহে।

"ভূতানামীশ্বরোঽপি"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"স্বেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্—তাঁহা হইতে ভিন্ন জীবসমূহের নিয়ন্তা হইয়াই।" জীবজগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে যেমন তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, আবির্ভূত হওয়ার পরেও তিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তাই থাকেন। তাঁহার নিয়ন্তা অপর কেহ নাই বা হয় না। শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—"ভূতনামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েন।"

এই সকল অর্থের তাৎপর্য্য হইতে জানা গেল—স্বীয় ইচ্ছায়, স্বীয় স্বরূপে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্মের কোনওরূপ ব্যত্যয় হয় না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্বও সূচিত হইতেছে।

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিব্যত্ব—অলৌকিকত্ব এবং অপ্রাকৃতত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক জন্ম নহে, জন্মের অনুকরণ মাত্র। তিনি ইহাকে জন্মের অনুকরণ কেন বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবদাদি-শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এ-স্থলে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

## ক। কংসকারাগারে আবির্ভাব

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর বাৎসল্যভাবময় মাতৃপিতৃত্বাভিমানী দেবকী-বসুদেবের যোগে কংস-কারাগারে তিনি কিরূপে আবির্ভূত হইলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ॥ শ্রীভা. ১০।২।১৬-১৭॥

—ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ-স্বরূপে আনকদুন্দুভির ( বসুদেবের ) মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিকে ( বা তেজকে ) ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন সর্ব্বভূতের পক্ষে দুরাসদ ( নিকট-গমনে অশক্য, অথবা চক্ষুরাদিদ্বারা অগ্রাহ্য ) এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"মন আবিবেশ মনসি আবির্বভুব জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।—ভগবান্ বসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। জীবের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ছিল না, অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম হয় নাই।" আবার "পৌরুষং ধাম"—ইহার অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"ধাম শ্রীমূর্ত্তিঃ—বসুদেব ভগবানের শ্রীবিগ্রহকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন।" বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"পৌরুষং ধাম শ্রীভগবত্তেজঃ মনসি শ্রীভগবদাবেশেন তত্তজোঽভিব্যক্তঃ—ভগবানের তেজ ; মনে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহার তেজ অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া।" অর্থাৎ বসুদেবের হৃদয়ে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া ভগবানের তেজে বসুদেবও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া পড়িলেন। তখন এত অধিক তেজঃ বসুদেবের দেহ হইতে বিকশিত হইতেছিল যে, তাহার প্রভাবে কেহ তাঁহার দিকে চাহিতেও পারিত না, তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিত না।

ইহা হইতে জানা গেল—জন্মের পূর্ব্বে জীব যেমন পিতার দেহে প্রবেশ করে, ভগবান্ও তদ্রূপ বসুদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে—জীব অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে, তারপরে পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হয় ; কিন্তু ভগবান্ নিজেই বসুদেবের মধ্যে প্রবেশ

করিলেন, বসুদেবের আহার্য্য অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া নহে। আর, জীব অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া পিতার উদরে প্রবেশ করে ; কিন্তু ভগবান্ প্রবেশ করিলেন বসুদেবের মনে, উদরে নহে। তিনি বসুদেবের শুক্রের সহিত মিলিত হয়েন নাই। এইরূপে জানা গেল—ভগবান্ও জীবের ন্যায় পিতৃদেহে প্রবেশ করিলেন বটে ; কিন্তু জীব যে ভাবে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে থাকে, ভগবান্ সেই ভাবেও প্রবেশ করেন নাই, সেই স্থানেও থাকেন নাই। ইহাই পিতৃদেহে প্রবেশের অনুকরণ।

এইরূপে বসুদেবের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের পরে কি ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥
সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥
তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥—শ্রীভা. ১০।২।১৮-২০॥

— তদনন্তর, পূর্ব্বদিক্ যেমন আনন্দদায়ক কিরণবর্ষী চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ, দেবকী-দেবীও শূরসুত-বসুদেবকর্ত্তৃক সমাহিত সেই জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশপূর্ণ সর্ব্বাত্মক আত্মভূত ভগবান্কে মনের মধ্যে ধারণ করিলেন। ঘটাদিতে অবরুদ্ধা অগ্নিশিখা, কিম্বা জ্ঞান-খল ব্যক্তিতে অবরুদ্ধা স্বরস্বতী, যেমন অপরের উপকারিণী হয় না বলিয়া সকলের আহ্লাদ-জনকত্বরূপে শোভাশালিনী হয় না, তদ্রূপ কংসকারাগারে অবরুদ্ধা দেবকী-দেবীও সর্ব্বজগন্নিবাসভূত ভগবানের নিবাসভূতা হইয়াও সর্ব্বজনানন্দদায়িনীরূপে বিশেষ শোভা লাভ করিতে পারিলেন না। ( আনন্দস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেবল নিজেই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কারাগারে তাঁহারই সান্নিধ্যে অবস্থিত কেবল বসুদেবেরই আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন )। অজিত-ভগবান্কে হৃদয়ে ধারণ করায় তাঁহার প্রভায় দেবকীদেবী শুচিস্মিতা ( অকপট শুদ্ধনির্ম্মল মৃদু-হাস্যময়ী ) হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গপ্রভাতেও কারাগৃহ দীপ্তিময় হইয়া পড়িয়াছিল। এতাদৃশী দেবকীদেবীকে দর্শন করিয়া কংস বলিয়াছিলেন—"আমার প্রাণহরণকারী হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন ( তাহাতেই দেবকীর এইরূপ অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে ) ; যেহেতু, পূর্ব্বে তো ( ইহার পূর্ব্বে দেবকী হইতে একে একে ছয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; তাহাদের কোনওটীর জন্মের পূর্ব্বে অন্তঃসত্ত্বা-অবস্থায় তো ) দেবকী এইরূপ দীপ্তিশালিনী হয়েন নাই।"

টীকায় "আত্মভূতং" শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"আত্মভূতং আত্মনি প্রাদুর্ভূতং পুত্ররূপতয়া দধার—দেবকীদেবী নিজের মধ্যে প্রাদুর্ভূত ভগবান্কে পুত্ররূপে ধারণ করিলেন।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"আত্মভূতং আত্মনৈব ভূতং স্বয়মাবির্ভূতং ন তু যোগিবদ্ যত্নেন ধারণয়ামনসি আনীতং মনস্তো মনসা দধার—ভগবান্ নিজেই দেবকী-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন ; যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক ধারণা দ্বারা

যে ভাবে তাঁহাকে মনে আনিয়া থাকেন, সেই ভাবে নহে। স্বয়ং আবির্ভূত ভগবান্‌কে দেবকীদেবী মনের দ্বারা ধারণ করিলেন।”

“শূরসুতেন সমাহিতং”-বাক্যের অর্থে বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—“সমাহিতং সাক্ষাদর্পিতবৎ প্রকাশিতম্। ＊＊। ন চ যোগিনামিব যত্ন ইত্যাহ। আত্মনা ভূতং সমাহিতঃ সন্ যঃ স্বয়মেবাবির্ভূতস্তমিত্যর্থঃ।—সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্পিত হইলে যেরূপ হয়, সেইভাবে প্রকাশিত। ＊＊। ইহা যে যোগীদের যত্নকৃত আবির্ভাব নহে, তাহা জানাইবার জন্য বলা হইয়াছে—“আত্মনাভূতম্ ইত্যাদি”—ভগবান্ নিজেই আবির্ভূত হইয়াছেন।” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“সমাহিতং সম্যক্‌ভূতমেব আহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতম্—বেদদীক্ষাদ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্পিত।”

ইহা হইতে বুঝা গেল—বসুদেবের হৃদয় হইতে ভগবান্ নিজেই দেবকীর হৃদয়ে গিয়া আবির্ভূত হইলেন, মনে হয় যেন বসুদেবই সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবান্‌কে নিজের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। বাস্তবিক বসুদেব অর্পণ করেন নাই, ভগবান্ নিজেই দেবকীর হৃদয়ে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। দেবকীদেবী যে যত্নকৃত ধ্যান-ধারণাদ্বারা ভগবান্‌কে নিজের হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহাও নহে; তিনি নিজেই গিয়াছেন। তাহার পরে দেবকী-দেবী তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। চন্দ্রের দৃষ্টান্তের সহায়তায় এই বিষয়টী পরিস্ফুট করা হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ কোনওরূপ চেষ্টা দ্বারা চন্দ্রকে স্বীয় ক্রোড়ে আনয়ন করে না। চন্দ্র নিজেই পূর্ব্বদিকে উদিত বা আবির্ভূত হয়, তখন পূর্ব্বদিক্ তাহাকে ধারণ করে। তদ্রূপ, ভগবান্‌ও নিজেই দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন; তখন দেবকী-দেবী তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অর্থাৎ ভগবান্ দেবকীর হৃদয়েই রহিয়া গেলেন।

দেবকীর পক্ষে ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করার সামর্থ্যের হেতু শ্লোকস্থ “দেবী”-শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। “দেবী”-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“দেবী দ্যোতমানা শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ—দেবকী দেবী শুদ্ধসত্ত্বা, সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপা।” ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন—“সা শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপত্বেন প্রসিদ্ধা।” বিশুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের অধিষ্ঠান হয়। দেবকী-দেবী বিশুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিরূপা বলিয়াই ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং দেবকীও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন। দেবকী যে ( এবং বসুদেবও যে ) জীবতত্ত্ব নহেন, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

জন্মের পূর্ব্বে জীব পিতার শরীর হইতে মাতার শরীরে যায়। ভগবান্‌ও পিতা-বসুদেবের শরীর হইতে মাতা-দেবকীর শরীরে গেলেন, উল্লিখিত শ্লোকে তাহাই দেখান হইল। কিন্তু পার্থক্য এই—জীব পিতার শুক্রের সহিত মিলিত হইয়া এবং কর্ম্মফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মাতার গর্ভে যায়। ভগবান্ কিন্তু—কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া নহে,—নিজেই গিয়াছেন, বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে—দেবকীর গর্ভে নহে।, ইহাও জীবের ন্যায়, পিতার দেহ হইতে মাতার দেহে প্রবেশরূপ কার্য্যের অনুকরণের তুল্য।

জীব মাতৃগর্ভে যায়—ভোগায়তন-দেহ লাভ করিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্য। ভগবান্ কিন্তু তদ্রূপ কোনও উদ্দেশ্যে দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন নাই। কি জন্য তিনি ইহা করিয়াছেন, শ্লোকস্থ “জগন্মঙ্গল”—শব্দে তাহা

সূচিত হইয়াছে—জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত। বিষ্ণুপুরাণও তাহাই বলিয়াছেন—"লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥ ৫।২।২ ॥"

যিনি দেকবীদেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন, তিনি যে সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ, সর্বৈবশ্বর্য্যশালী—শ্লোকস্থ "অচ্যুতাংশম্"-শব্দে তাহা সূচিত হইয়াছে। এই শব্দের অর্থে বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"ন চ্যুত একাংশোঽপি যস্য তম্। সর্ব্বাংশপরিপূর্ণং ভগবন্তমিত্যর্থঃ।" আর শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অচ্যুতাংশং চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য তম্।"

"সর্ব্বাত্মকম্"-শব্দের ব্যঞ্জনাও তাহাই। এই শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য আত্মানম্—সকলের আত্মা যিনি।" স্বয়ং ভগবান্ই সকলের আত্মা। বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বমূলস্বরূপম্—সকলের মূলস্বরূপ।" ইহাও স্বয়ংভগবানেরই লক্ষণ।

"সর্ব্বজগন্নিবাস"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইতেছে। এই শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"গচ্ছতীতি জগৎ ইতি নিরুক্ত্যা সর্ব্বমাত্রবাচকেনাপি তচ্ছব্দেনাত্র অনিত্য এব সর্ব্ব উচ্যতে। সর্ব্বশব্দস্য পৃথক্ পাঠাৎ ততঃ সর্ব্বশব্দেন তদতীতং সর্ব্বমিতি। ততশ্চ নিত্যস্য সর্ব্বস্য অনিত্যস্য চ সর্ব্বস্য নিবাস আশ্রয়ঃ। যস্য ভাসা-ইত্যাদি শ্রুতের্যদাশ্রয়ত্বেনৈব তত্তৎ সর্ব্বং ভাসতে স শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই—যিনি অনিত্য এবং (জগদাতীত) নিত্য বস্তুসমূহের নিবাস বা আশ্রয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সর্ব্বজগন্নিবাসঃ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের আশ্রয়।"

"সর্ব্বজগন্নিবাস"-শব্দের তাৎপর্য্য বিষ্ণুপুরাণে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যখন দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দেবগণ তাঁহার অনেক রকমে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন—

"এতা বিভূতয়ো দেবি তথান্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তথাসংখ্যা জগদ্ধাত্রি সাম্প্রতং জঠরে তব ॥
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা।
গ্রাম-খর্ব্বট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ॥
সমস্তবহ্নয়োঽম্ভাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ।
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥
অবকাশমশেষস্য যদ্দদাতি নভশ্চ তৎ।
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথমহজ্জনঃ ॥
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে।
তদন্তর্যে স্থিতা দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ পশবশ্চান্যে যে চ জীবা যশস্বিনি ॥
তৈরন্তঃস্থৈরনন্তোঽসৌ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ।

রূপকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিল-প্রমাণানি স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব ॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরম্।
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥
প্রসীদ দেবি সর্ব্বস্য জগতঃ শং শুভে কুরু।
প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৫।২।১২-২০ ॥

—হে দেবি জগদ্ধাত্রি! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি, সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে। হে শুভে! সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ, বন ও গৃহ—এ-সমস্ত দ্বারা বিভূষিত এবং গ্রাম-খর্ব্বট ( পর্ব্বত-প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম )-খেট ( কৃষকদের গ্রাম )-যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ব্বপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত সমীরণ, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাচিত্রিত, বিমানশত-সঙ্কুল এবং সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্বর্ত্তী দেবদৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে—হে যশস্বিনি!—অন্তঃস্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্ব্বেশ, সর্ব্বভাবন এবং প্রমাণনিচয় যাঁহার তত্ত্ব, লীলা ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই —ভগবান্ বিষ্ণু ( সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্ব ) তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি জ্যোতিঃ এবং তুমি অম্বর-স্বরূপিণী। লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর। যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ করিতেছ।” ( এস্থলে লৌকিক-দৃষ্টিতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর জঠরস্থ বা গর্ভস্থ বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তিনি ছিলেন দেবকীর হৃদয়ে )।

দেবকীর হৃদয়স্থিত অবস্থাতেও যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজগৎকে এবং জগদতিরিক্ত সমস্তকেও নিজের অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজিত, বিষ্ণুপুরাণ হইতে তাহাই জানা গেল। দেবকী-দেহে প্রবেশের পূর্ব্বেও যেমন তিনি সর্ব্বাশ্রয়, দেহ-প্রবিষ্টাবস্থাতেও তিনি সর্ব্বাশ্রয়। ইহাদ্বারা তাঁহার রূপের নিত্যত্বই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাকে “বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপকও” বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপক না হইলে সর্ব্বাশ্রয়ও হইতে পারেন না। তথাপি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই—স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও, পরিচ্ছিন্নবৎ-রূপে—দেবকীর দেহে অবস্থিত।

যিনি এই বিভু-তত্ত্বকে স্বীয় দেহে ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবকী দেবীও যে স্বরূপতঃ বিভ্বী—সর্ব্ব-ব্যাপিকা, “ত্বম্ অম্বরম্—তুমি আকাশস্বরূপিণী”-শব্দে তাহাও বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে। তিনি যে জীবতত্ত্ব নহেন, “ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা”-ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহেও—“সূক্ষ্মা (চিদ্রূপা) পরা প্রকৃতি, বেদগর্ভা, যজ্ঞদা, সকলের বীজভূতা, ইজ্যা, বহ্নিগর্ভা, জ্যোৎস্না, বাসরগর্ভা, বোধগর্ভা, ধৈর্য্যগর্ভা”-ইত্যাদি শব্দে দেবকীকে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাতেও সূচিত হইয়াছে যে, তিনি জীবতত্ত্ব নহেন। “সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে”-বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদাদি দেবকীকে যে শুদ্ধসত্ত্বরূপা—সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষরূপা—বলিয়া-

ছেন, বিষ্ণুপুরাণের উক্তিও তাহারই সমর্থন করিতেছে। তিনি যে বাৎসল্য-প্রীতির প্রভাবেই সর্ব্বাত্মক-ভগবান্‌কে ধারণ করিতেছেন, বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন—"প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥"

এক্ষণে ভগবানের দেবকী-হৃদয়ে প্রবেশের পরের বিবরণ বিবেচিত হইতেছে। দেবকীকে দেখিয়া, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য—ইহা ভাবিতে ভাবিতে কংস বলিয়াছিলেন—"স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ শ্রীভা. ১০।২।২১ ॥—এই দেবকী স্ত্রীলোক, আমার ভগিনী, তাহাতে আবার গুরুমতী ( গর্ভবতী ) ; ইহাকে বধ করিলে আমার যশঃ, শ্রী এবং পরমায়ুঃ বিনষ্ট হইবে।" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ না করিয়া থাকিলেও, তাঁহার দেহে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় গর্ভবতীর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্তই এইরূপ হইয়াছিল।

এই অবস্থায় নারদাদি মুনিগণ এবং রুদ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কংস-কারাগারে আসিয়া দেবকী-হৃদয়স্থিত ভগবানের স্তব-স্তুতি করিলেন। এই স্তবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব,—তিনি যে বিশুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ, তিনি যে মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণেরও অবতারী, ইত্যাদি অনেক কথা—প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পরে, শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে নিশিথ-সময়ে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে ভগবান্ দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন।

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩।৮ ॥

—পূর্ব্ব-দিকে যেমন পূর্ণ চন্দ্র প্রকাশ পায়, তদ্রূপ দেবরূপিণী ( সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহা ) দেবকীতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু ( সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ ) আবির্ভূত হইলেন।"

এ-স্থলে "জন্মগ্রহণ করিলেন" না বলিয়া "আবিরাসীৎ—আবির্ভূত হইলেন" বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণও তাহাই বলিয়াছেন—"ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা। দেবকী-পূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা ॥৫।৩।২ ॥—তৎপরে, অখিল-জগদ্রূপ পদ্মের বিকাশের জন্য, দেবকীরূপ-পূর্ব্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা অচ্যুত-সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন।" উভয় গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—"দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন" ; দেবকী-গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন—এ কথা বলা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—অজ ভগবানের জন্ম নাই ; আবির্ভাব-মাত্র আছে। যিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিলেন না, তিনি যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়েন, তখনই বলা হয়, তাঁহার আবির্ভাব হইল। এইরূপেই ভগবান্ দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন। এইরূপ আবির্ভাবকেই সাধারণ লোক জন্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই সাধারণ-লোক-প্রতীতি অনুসারেই শ্রীহরিবংশ বলিয়াছেন—"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ইতি ॥ উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকাধৃত-প্রমাণ।—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অষ্টম-মাসে দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করিলেন।" নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত, বিশেষতঃ বাৎসল্যের আবেশে, দেবকী-বসুদেবও তদ্রূপ মনে করিয়াছিলেন। নচেৎ, ঐভাবে আবির্ভূত ভগবান্‌কে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবানের দুইবার আবির্ভাবের কথা পাওয়া যায়। একবার, বসুদেবের এবং দেবকীর হৃদয়ে ; আর একবার দেবকীতে। এই দুই আবির্ভাবের তাৎপর্য্য এই ঃ—প্রথমে যখন বসুদেবের এবং দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, তখন ভগবান্ তাঁহাদের নয়নের গোচরীভূত হয়েন নাই ; কেবল পরমানন্দরূপেই তাঁহারা তাঁহার অস্তিত্বের অনুভব লাভ করিয়াছেন ; আর, জ্যোতীরূপে কংসাদি অন্যান্য সকলেও তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বার—দেবকীতে আবির্ভাবে ভগবান্ স্বীয় বিগ্রহেই দেবকী-বসুদেবের নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন এবং পরে অপরাপর সকলেরও নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই অদ্ভুত বালককে দেখিয়া প্রথমে বসুদেব এবং তাহার পরে দেবকীও, নানা ভাবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাৎসল্য ছিল ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত ; তাই তাঁহারা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রভাবে, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তিনিও তাঁহাদের নিকটে স্বীয় ঐশ্বরিক রূপ প্রকট করিতে পারিলেন। তাঁহাদের স্তবে তাঁহারা তাঁহার ভগবত্তার কথাও বলিয়াছেন। আবার, বাৎসল্যের উদয়ে সন্তান-জ্ঞানে কংস হইতে তাঁহার নিরাপত্তার আশঙ্কা করিয়া ভীতও হইয়াছেন।

তাঁহাদের স্তবের পরে—কেন তিনি চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলেন—ভগবান্‌ও তাহা তাঁহাদের নিকটে প্রকাশ করিলেন।

ভগবান্ দেবকী-বসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—পূর্ব্বে সায়ম্ভুব-মন্বন্তরে দেবকী ছিলেন পৃশ্নি, আর বসুদেব ছিলেন সুতপা। ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্তির কামনা করিয়া তাঁহারা উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ এই চতুর্ভুজরূপেই তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের সদৃশ পুত্র চাহিলেন। নিজের সদৃশ কাহাকেও কোথাও না পাইয়া তিনিই পৃশ্নিগর্ভ-নামে তাঁহাদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েন। তাহার পরে আবার দেবকী অদিতিরূপে এবং বসুদেব কশ্যপরূপে আবির্ভূত হইলে ভগবান্‌ও উপেন্দ্র বা বামন নামে তাঁহাদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইবার তিনি নিজে স্বীয়রূপেই তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। অবশেষে ভগবান্ বলিলেন—"পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্ম স্মরণ করাইবার জন্যই এই (চতুর্ভুজ) রূপ দেখাইলাম। তাহা না হইলে, আমার নররূপে দর্শন দিলে, তোমাদের মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারিত না।

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্‌ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ শ্রীভা. ১০।৩।৪৪॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রাক্ প্রথমং তাবদেতদ্রূপং মে জন্ম ইতি স্মরণায় জ্ঞানায় দর্শিতং মদ্‌ভবং মদ্‌বিষয়কং অনন্তরং ত্বদিচ্ছয়া বালোঽপি ভবিষ্যামীতিভাবঃ।—আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান জন্মাইবার জন্যই এই রূপ দেখাইলাম। ইহার পরে তোমাদের ইচ্ছানুসারে আমি বালকও হইব (বসুদেব এবং দেবকী উভয়েই তাঁহাদের স্তবে তাঁহার এই ঐশ্বরিক রূপ সম্বরণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন)।"

ভগবানের উল্লিখিতরূপ উক্তি হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—দেবকী-বসুদেব তপস্যার ফলেই ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। তপস্যার প্রভাবে কেহই ভগবানের পিতা বা মাতা

হইতে পারেন না। ভগবানের উক্তির তাৎপর্য্য এই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—দেবকী এবং বসুদেব ভগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর; তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন, উভয়েই শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিত্যপুত্র। পৃশ্নি এবং অদিতি ছিলেন দেবকীর অংশ। আর, সুতপা এবং কশ্যপও ছিলেন বসুদেবের অংশ। পৃশ্নিগর্ভ এবং উপেন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশাবতার। পৃশ্নিগর্ভ এবং উপেন্দ্রকে সদ্বারক অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হইলে পিতা-মাতার প্রয়োজন। দেবকী-বসুদেব ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার পিতা-মাতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই পৃশ্নিগর্ভ এবং উপেন্দ্র—এই দুই অংশ-স্বরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া দেবকীর অংশ পৃশ্নি এবং অদিতিকে অবতারিত করাইয়াছেন এবং বসুদেবের অংশ সুতপা এবং কশ্যপকেও অবতারিত করাইয়াছেন। তাঁহাদের যোগে তিনি অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইবার তিনি স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া স্বয়ং দেবকীকে এবং স্বয়ং বসুদেবকে অবতারিত করাইয়া তাঁহাদের যোগে নিজে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অংশী দেবকী-বসুদেব অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের অংশও অংশীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; অর্থাৎ পৃশ্নি ও অদিতি দেবকীর মধ্যে এবং সুতপা ও কশ্যপ বসুদেবের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন।

যাহাহউক, ভগবান্ নিজের চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ বলিয়া, দেবকী-বসুদেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার এই ঐশ্বরিক রূপকে অন্তর্ধাপিত করিলেন এবং দ্বিভুজ নরশিশুরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। কংসের ভয়ে বসুদেব এই দ্বিভুজ শিশুকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাত কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেব আপনা-আপনি বন্ধনমুক্তও হইয়াছিলেন, কারারক্ষিগণও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কারাদ্বারও উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কন্যাটীকে লইয়া বসুদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার, কারারক্ষীদের এবং কারাগারের অবস্থাও আবার পূর্ব্ববৎ হইয়া পড়িল।

এই গেল—কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাবের বিবরণ। এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, ভগবানের বাস্তবিক জন্ম হয় নাই; তিনি দেবকী-বসুদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন মাত্র। পূর্ব্বে তাঁহার যে রূপ ছিল, সেই রূপেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রূপের নিত্যত্বও সূচিত হইতেছে।

এই রূপই ভগবানের দিব্য—অলৌকিক—জন্ম। ইহা বাস্তবিক জন্ম না হইলেও লৌকিক ভাবে ইহাকে জন্ম বলা হয় এবং দেবকীর গর্ভ হইতে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ভগবান্ জন্মগ্রহণ না করিলেও লৌকিকভাবে বলা হয় যে, দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন।

### খ। গোকুলে নন্দালয়ে আবির্ভাব

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, কংস-কারাগারে দেবকী যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন, ঠিক সেই সময়ে গোকুলে যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেন; উভয়েরই গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসব হইয়াছিল। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥ শ্রীভা ১০।৩।৯ শ্লোকের

বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্রীহরিবংশবচন।" একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুই স্থানে দুই রূপে জন্মলীলা প্রকটিত করিলেন ; কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে এবং গোকুলে দ্বিভুজরূপে অর্থাৎ স্বয়ংরূপে।

দেবকী-বসুদেব অদ্ভুত-চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণও তখন স্বীয় চতুর্ভুজরূপ সম্বরণ করিলেন এবং নরশিশুর ন্যায় দ্বিভুজরূপে তৎস্থলে প্রকটিত হইলেন ( শ্রীভা, ১০।৩।৪৬ ) ; আর বসুদেবকে বলিলেন—"যদি কংস হইতে তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই গোকুলে নিয়া রাখিয়া আস ; সেস্থানে যশোদাগর্ভজাতা আমার মায়াকে দেখিতে পাইবে। তাহার স্থানে আমাকে রাখিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আইস।" বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই নন্দগৃহে যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত হইলেন।

"ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াঽজনি নন্দজায়য়া॥ শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৭॥"

বসুদেব গোকুলে গিয়া দেখিলেন, সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ; যশোদার গৃহে গিয়া দেখিলেন—যশোদাও গাঢ়নিদ্রায় অচেতনপ্রায়া, তাঁহার বিছানায় একটী নবজাতা কন্যা পড়িয়া রহিয়াছে। বসুদেব তখন যশোদার বিছানায় নিজপুত্রকে রাখিয়া যশোদার কন্যাটীকে লইয়া পুনরায় কংস-কারাগারে চলিয়া আসিলেন।

হরিবংশের বচন হইতে জানা যায়, দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন—এই প্রসব হইয়াছিল অষ্টমীতিথিতে। আবার শ্রীভা. ৩।১০।৪৮ শ্লোক হইতে জানা যায়—বসুদেব যখন স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কারাগার হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখনই যশোদার গর্ভ হইতে যোগমায়া আবির্ভূত হয়েন। হরিবংশ বলেন—নবমী তিথিতেই এই যোগমায়ার জন্ম হইয়াছিল ; "নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত হরিবংশবচন।" যশোদা-গর্ভ হইতে নবমীতে মায়ার আবির্ভাবের কথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেও জানা যায়। ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিলেন—"বর্ষাকালের কৃষ্ণাষ্টমীতে আমি জন্মগ্রহণ করিব, তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে"। "প্রাবৃট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি। উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।১।৭৬॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, সেই রাত্রিতে যশোদা দুইবার প্রসব করিয়াছিলেন—দেবকী যখন প্রসব করেন, তখন একবার এবং তাহার পরে বসুদেব স্বীয় পুত্রকে লইয়া গোকুলে যাওয়ার প্রাক্কালে আর একবার। আরও, শ্রী. ভা. ১০।৪।৯ শ্লোকে যশোদাগর্ভজাতা যোগমায়াকে "শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—কনিষ্ঠা ভগিনী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবারে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রসব করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বারে যোগমায়াকে ; নচেৎ যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলার সার্থকতা থাকে না। যশোদা প্রথমবারে যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে চতুর্ভুজত্বাদির কোনওরূপ উল্লেখ না থাকায় স্বরূপতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া দ্বিভুজ-নরাকৃতিরূপেই যে তিনি জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। "যশোদাপ্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তের্নরাকৃতি-পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যত ইতি। শ্রী. ভা. ১০।৩।৪৮ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।"

প্রশ্ন হইতে পারে, যশোদা যদি দুইটি সন্তানকেই প্রসব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বসুদেব গোকুলে আসিয়া যশোদার বিছানায় কেবল একটী সন্তান—একটী কন্যা মাত্র—দেখিলেন কেন ? প্রথমজাত পুত্রটী কোথায় গেল ? আর বসুদেব স্বীয় পুত্রটীকে রাখিয়া কন্যাটীকে লইয়া যাওয়ার পরে যশোদা জাগিয়া যখন কেবল একটী পুত্রসন্তান মাত্র দেখিলেন, কন্যাটীকে দেখিলেন না, তখন তিনিও এসম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিলেন না কেন ?

বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—"যোগনিদ্রার প্রভাবে গোকুলস্থ সমস্ত লোক যখন মোহিত অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত এবং স্বয়ং যশোদাও যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখনই তিনি মায়ারূপিণী কন্যাটীকে প্রসব করিয়াছিলেন। তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া। তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে॥ বিষ্ণুপুরাণ। ৫।৩।২০॥" মায়ার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যশোদা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ; এইরূপ নিদ্রিতাবস্থাতেই মায়ার জন্ম ; সুতরাং মায়ার জন্মাদি সম্বন্ধে যশোদার কোন জ্ঞানই ছিল না ; একটী কন্যা যে জন্মিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ স্বীয় গর্ভ হইতে কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই ক্লান্তা ও পরিশ্রান্তা হইয়া যশোদা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যোগনিদ্রা তাঁহার এই নিদ্রায় গাঢ়তা ঢালিয়া দিয়া লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের জন্মের কথা হয়তো জানিতেন ; কিন্তু তৎপর কন্যার জন্মের কথা জানিতেন না ; সুতরাং শেষকালে কন্যাটী তাঁহার বিছানায় না থাকাতেও তাঁহার কোনওরূপ সংশয়ের উদয় হয় নাই।

কিন্তু যশোদা দুইটী পুত্রসন্তান দেখিলেন না কেন ? একটী নিজের এবং একটী বসুদেবের ? বসুদেবই বা কেন যশোদার শয্যায় যশোদাগর্ভজাত পুত্রটীকে দেখিলেন না ?

ইহার সমাধান এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সহিতই যশোদার শয্যায় ছিলেন ; বসুদেব নিজের পুত্রকে লইয়া যখন যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন যশোদানন্দন স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির বলে, অথবা যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন ; বসুদেব স্বীয় পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যখন মায়াকে গ্রহণ করিলেন, তখনই বসুদেব-তনয় যশোদানন্দনের সহিত মিশিয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইলেন, বসুদেব-তনয়কে আত্মসাৎ করিয়া যশোদানন্দনই শয্যায় শুইয়া রহিলেন ; বসুদেব মনে করিলেন—তাঁহারই পুত্র শুইয়া আছে। এইরূপে উভয়ে মিশিয়া যাওয়ায় যশোদাও দুইটি শিশু দেখেন নাই এবং বসুদেবের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যশোদানন্দকেও বসুদেব দেখেন নাই। "শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্ত্তেন বিন্যস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্তঃ—শ্রী. ভা. ১০।৫।১ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী।" অথবা, বসুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশের উপক্রমেই, যশোদার শয্যার প্রতি বসুদেবের দৃষ্টি পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার অলক্ষিতভাবে যশোদানন্দন বসুদেবনন্দনকে আত্মসাৎ করিয়া—বসুদেব-নন্দনকে নিজের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত করাইয়া—বসুদেবের ক্রোড়ে অবস্থান করিলেন ; তাঁহাকেই বসুদেব যশোদার শয্যায় রাখিয়া মায়াকে লইয়া গেলেন। অথবা, কংসকারাগারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বসুদেবনন্দন যখন অন্তর্হিত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নন্দালয়ে যশোদানন্দনও অন্তর্হিত হইলেন এবং নন্দালয়ে অন্তর্হিত হইয়া কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইলেন

এবং বসুদেবনন্দনের স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে আবির্ভূত দ্বিভুজ যশোদা-তনয়কেই দেবকী-বসুদেব তাঁহাদের পুত্র বলিয়া মনে করিলেন।

যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টরূপে কোনও বর্ণনা না থাকিলেও ১০।৪।৯ শ্লোকে মায়াকে শ্রীকৃষ্ণের "অনুজা" বলায়, ১০।৫।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "নন্দাত্মজ" বলায়, ১০।৮।১৪ শ্লোকে তাঁহাকে নন্দমহারাজের "আত্মজ" বলায় এবং ১০।১৪।১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ—গোপরাজ-নন্দের "অঙ্গজ" বলায় নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহিণী যশোদার গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বীকার করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, কংস-কারাগারে যেমন প্রথমে পিতার হৃদয়ে, তাহার পরে পিতার হৃদয় হইতে মাতার হৃদয়ে যাইয়া যথাসময়ে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, গোকুলে নন্দালয়েও ঠিক তদ্রূপ ভাবেই তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাৎসল্যমুগ্ধত্ববশতঃ উভয় স্থানেই পিতা-মাতাও মনে করিলেন এবং অপর-সাধারণও মনে করিলেন—মাতৃগর্ভ হইতেই তাঁহার জন্ম হইয়াছে, মাতাই তাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য, অনাদি। তাঁহার বাস্তবিক কোনও জন্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং জীবের ন্যায় জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতাও থাকিতে পারে না। তথাপি বসুদেব-দেবকী এবং নন্দ-যশোদা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পিতামাতা। তাঁহাদের পিতৃমাতৃত্ব কিন্তু জন্মদাতৃত্বাদিবশতঃ নয়। তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ পিতৃমাতৃত্ব কেবল প্রগাঢ়বাৎসল্যবশতঃ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। তাঁহাদের অভিমান এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান, ইহা তাঁহাদের দৃঢ়া প্রতীতি। তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ প্রতীতি—তিনি তাঁহাদের সন্তান। প্রকটলীলায় জন্মের অনুকরণে সেই প্রতীতিকেই যেন বাস্তবতা দেওয়া হয়। প্রকটলীলায় তাঁহার যে জন্ম, তাহা কেবল তাঁহার নিজেকে, নিজেরই ইচ্ছায়, লোক-নয়নের গোচরীভূত করা মাত্র।

## ১৪৪। ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন দুই স্থানে, তিরোভাবও তেমনি দুই স্থান হইতে—ব্রজ হইতে এবং দ্বারকা হইতে। কিন্তু আবির্ভাব যেমন একই সময়ে দুই স্থানে হইয়াছিল, তিরোভাব তেমনি দুই স্থান হইতে একই সময়ে হয় নাই। আগে ব্রজলীলার তিরোভাব, তাহার পরে দ্বারকালীলার তিরোভাব।

### ক। ব্রজলীলার তিরোভাব

পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে একবার ব্রজে আসিয়া দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৪-অনুচ্ছেদে পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"ততশ্চ রাজসূয়সমাপ্ত্যনন্তরং শাল্বদন্তবক্রবধান্তে ঝটিতি স্বয়ং গোকুলমেব জগাম। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে

গন্তপন্থানি। অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন যোদ্ধুম্ মথুরামাজগাম। কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন যোদ্ধুং মথুরায়ামাযযৌ তয়োর্দন্তবক্রবাসুদেবয়োরহোরাত্রং মথুরাদ্বারে সংগ্রামঃ সমবর্ত্তত। কৃষ্ণস্তু গদয়া তং জঘান। স তু চূর্ণিতসর্ব্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহীধর ইব গতাসুরবনীতলে পপাত। * * * কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃন্দান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে। গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ॥ রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হেতি॥”

**মর্ম্মানুবাদ**। রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপ্তির পরে এবং শাল্ব-দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্বর গোকুলে আসিয়াছিলেন। এরূপ মর্ম্মের গন্তপন্থময় বাক্য পাদ্মোত্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে—“শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দন্তবক্র মথুরায় আসিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রথারোহণে মথুরায় আসিলেন। মথুরার দ্বারদেশে উভয়ের মধ্যে অহোরাত্রব্যাপী যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে দন্তবক্রের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইয়া যায়; দন্তবক্র প্রাণত্যাগ করেন। * *। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণও যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে গমন করেন এবং তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত পিতা-মাতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁহারাও অশ্রু-প্লাবিত-কণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল-গোপবৃন্দকে যথাযোগ্যভাবে প্রণাম করেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বহুবস্ত্রাভরণাদিদ্বারা ব্রজবাসিগণকে পরিতৃপ্ত করেন। আর, পুণ্যবৃক্ষসমন্বিত রম্য কালিন্দীপুলিনে গোপনারীদিগের সহিত দিবানিশি বিহার করেন। গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ রম্যকেলিসুখে এবং প্রেমরসে দুইমাস বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।”

রাজসূয়যজ্ঞ সমাপ্তির পরে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সৌভ ও শাল্ব দ্বারকাপুরী আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন এবং মথুরায় দন্তবক্রের উপদ্রবের কথা শুনিয়া দ্বারকা হইতে মথুরায় আসিয়া দন্তবক্রকে নিহত করেন এবং মথুরা হইতেই নন্দব্রজে আগমন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিয়া দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইহার পরে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৫-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি তান্ আত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতান্ অবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভারহরণাদিপ্রয়োজন-রূপেণ নিজপ্রিয়জন-সঙ্গমান্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গেণাপরেণ জনেন দুর্ব্বেদতয়া তদন্তরায়সম্ভাবনালেশ-রহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকটলীলয়ৈকীকৃত্য পূর্ব্বোক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষং, তেভ্যঃ, কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানমিত্যুক্তদিশা, স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবির্ভাবয়ামাস। একেন প্রকাশেন চ দ্বারাবতীঞ্চ জগামেতি। তথা পাদ্মোত্তরখণ্ড এব তদনন্তরং গন্তম্।—এইরূপে বৃন্দাবনে দুইমাস প্রকট-ক্রীড়া করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—ব্রজবাসিগণ তাঁহার

বিরহার্ত্তিভয়ে পীড়িত ( শ্রীকৃষ্ণ আবার কখন দ্বারকায় চলিয়া যাইবেন—এই ভয়ে পীড়িত )। তাই, পুনরায় যাহাতে তাঁহাদের সহিত এইরূপ বিচ্ছেদ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের নিকটে শ্রীগোকুল-নামক নিজধাম ( শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ ) আবির্ভাবিত করাইলেন। তাহার কারণ এই যে—প্রকটলীলাতে ভূ-ভার-হরণাদির প্রয়োজনে তাঁহাকে প্রায়শঃ অন্যত্র যাইতে হয় ; তাহাতে প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা মিলিত থাকা সম্ভব হয় না ; তাহাতে প্রিয়জনদের দুঃখ হয়। আর, অপ্রকট-লীলার বিষয় বহিরঙ্গ অপর জনের পক্ষে জানা অসম্ভব বলিয়া তাহাতে সেই রকম মিলনের অন্তরায়ের সম্ভাবনা নাই। এজন্য তিনি প্রকটলীলাকে স্বীয়-নিত্য-অপ্রকট-লীলার সহিত একীভূত করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত অপ্রকট-লীলার অবকাশ ( স্থিতিস্থান )-রূপ শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ-বিশেষ গোকুল-নামক সেই নিজস্থান তাঁহাদের ( গোকুলবাসিগণের ) নিকটে প্রকাশ করিলেন। ( এস্থলে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥১০।২৮।১৭-শ্লোকটী তাঁহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন )। তারপর শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ব্রজবাসীদিগের সহিত অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অন্য এক প্রকাশরূপে তিনি দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। পাদ্মোত্তর-খণ্ডের যে প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরেই উক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত উক্তি দৃষ্ট হয়।"

পদ্মপুরাণের পরবর্ত্তী বাক্য এইরূপঃ—"অথ তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরম-বৈকুণ্ঠলোকমাপুরিতি। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং পরমং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারাবতীং বিবেশেতি চ।—অনন্তর সেই স্থানস্থিত নন্দাদি সর্ব্বজন পুত্রদার-সহিত এবং পশু-পক্ষি-মৃগাদিও, বাসুদেব-প্রসাদে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিমানারূঢ় হইয়া পরম-বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন। নন্দাদি ব্রজবাসী সকলকে পরম-নিরাময় নিজস্থান দান করিয়া স্বর্গে দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।"

এই পদ্মপুরাণোক্তির "নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতাঃ"-এই বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"পুত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ, দারাঃ শ্রীযশোদাদয়ঃ।" নন্দাদি সকলেই যখন পুত্র-দারা সহিত বিমানারূঢ় হইয়া গেলেন, তখন ইহাই বুঝা যায়, নন্দও স্বীয় পুত্র এবং দারার সহিত গিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের একমাত্র পুত্র হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং একমাত্র দারা ( পত্নী ) হইতেছেন—শ্রীযশোদা। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁহাদের সহিত অপ্রকট প্রকাশে গিয়াছিলেন। আবার যখন বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ "দ্বারাবতীং বিবেশ চ—দ্বারকাতেও গিয়াছিলেন", তখন ইহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে অপ্রকট ধামে গিয়াছেন এবং অন্য এক প্রকাশরূপেই দ্বারকায় গিয়াছেন। "বাসুদেব-প্রসাদেন দিব্যরূপধরাঃ"-বাক্য সম্বন্ধে শ্রীজীব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ আগমনই হইতেছে ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁহার প্রসাদ। তাঁহার দর্শনে নন্দাদি-ব্রজবাসীদের পরমানন্দোৎফুল্লতাই এবং তজ্জনিত পূর্ব্বাপেক্ষাও পরমাশ্চর্য্য-রূপের স্ফূর্ত্তিই হইতেছে তাঁহাদের দিব্যরূপ। পূর্ব্বে তাঁহাদের যেই রূপ ছিল, অপ্রকটে প্রবেশের সময়েও সেই রূপই ছিল—তবে পরমানন্দোৎ-ফুল্লতাবশতঃ তাহা অত্যধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন—এস্থলে "পরম-বৈকুণ্ঠলোক"-শব্দে, বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশ গোলোককেই বুঝাইতেছে ; কেননা, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ গোলোক ব্রজবাসীদিগকে দেখাইয়াছিলেন ( শ্রীভা. ১০।২৮ অধ্যায় )।

এইরূপে জানা গেল---ব্রজলীলার, ব্রজপরিকরবর্গের এবং নিজেরও ব্রজবিহারিস্বরূপের অন্তর্দ্ধান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় এক প্রকাশ-স্বরূপে দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তখনও দ্বারকা-লীলার কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়াই তাঁহাকে এক প্রকাশরূপে দ্বারকায় যাইতে হইয়াছিল। ইহাও জানা গেল যে, ব্রজবাসিগণ নিজ নিজ রূপেই অপ্রকট গোলোকে গিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় স্বরূপেই গিয়াছিলেন। স্বীয়. স্বরূপে তিনি যেমন ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনি স্বীয় স্বরূপেই অন্তর্হিতও হইলেন। ইহাতে তাঁহার রূপের নিত্যত্বও সূচিত হইতেছে।

এই হইল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অন্তর্দ্ধানের বিবরণ। এক্ষণে দ্বারকা-লীলার অন্তর্দ্ধানের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

## খ। দ্বারকালীলার তিরোভাব

মৌষল-লীলার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারকা-লীলাকে, দ্বারকা-পরিকরদিগকে এবং নিজেকেও অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছিলেন। মৌষল-লীলাসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে কোনও কোনও বিষয়ে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিভিন্ন উক্তির কোনও সমাধান আছে কিনা, এ-স্থলে আলোচনাদ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

**মৌষল-লীলা**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১ম ও ৩০শ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৭ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে মৌষল-লীলার বর্ণনা আছে। তাহা এই---শ্রীকৃষ্ণেব আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিশ্বামিত্র, কণ্ব, অসিত প্রভৃতি মুনিগণও যজ্ঞস্থলে গিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে যদুকুলের দুর্বিনীত বালকগণ জাম্ববতী-তনয় সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেশে সাজাইয়া মুনিদিগের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়া---তাঁহার গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিবে—জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ বালকগণের ধৃষ্টতায় কুপিত হইয়া বলিলেন—ইনি যদুকুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন। বালকগণ সাম্বের উদরবেষ্টিত বস্ত্ররাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন---বস্ত্রাভ্যন্তরে সত্যই একটী মুষল রহিয়াছে। তাঁহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকটে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে কিছু না জানাইয়াই মুষলটীকে চূর্ণ করিলেন এবং অবশেষ যাহা রহিল, তাহা চূর্ণের সহিত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ.করিলেন। নিক্ষেপ মাত্র একটী মৎস্য আসিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ড গিলিয়া ফেলিল এবং চূর্ণসকল তরঙ্গাঘাতে তীরদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইল—তাহা হইতে এরকাতৃণ উৎপন্ন হইল। আবার কৈবর্ত্তদের জালে মৎস্যটী ধরা পড়িলে তাহার উদর হইতে লৌহখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল; জরা-নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড নিয়া তদ্দ্বারা শরের অগ্রভাগ প্রস্তুত করিল।

কিছুকাল পরে সমস্ত দ্বারকা-পরিকরদের সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে গেলেন; সে স্থানে মৈরেয়-মধু পান করিয়া যাদবগণ মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা নিজেদের নানাবিধ অস্ত্রাদিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ( মুষল-চূর্ণ হইতে উৎপন্ন ) এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত

হইলেন। ( শ্রী. ভা. ১১।১৫।২৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসাম্। অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রও অবশিষ্ট ছিলেন )। যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে বলরাম সমুদ্রকূলে যাইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যলোক ত্যাগ করিলেন। বলরামের নির্য্যান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতলে শয়ান হইলেন। দৈবাৎ পূর্ব্বোক্ত জরাব্যাধ মৃগের অন্বেষণে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে মৃগের মুখ মনে করিয়া মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত শরদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; পরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্যাধ! তুমি ভীত হইও না; এ সমস্ত আমার মায়াকৃত; তোমার কোনও দোষ নাই; আমার আদেশে তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর।" ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণার বলে লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই সশরীরে স্বীয় ধামে গমন করিলেন ( শ্রী.ভা. ১১।৩১।৫ )।

তারপর বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৮।১ শ্লোকে এবং মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে ৭।৩১ শ্লোকে লিখিত আছে যে—বলরাম ও কৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহকে অগ্নি-সৎকার করা হইয়াছিল। যাদবগণের দেহ-সৎকারের কথাও লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যাদবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার যথাশ্রুত অর্থই সংক্ষেপে উপরে লিখিত হইল। তাহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের এবং যাদবগণের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের দেহও অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্‌ই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুই বা হইল কেন এবং তাঁহার মৃত দেহের অগ্নি-সৎকারই বা কিরূপে সম্ভবে ? আর, যাদবগণ যদি তাঁহার পার্ষদই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই বা মৃত্যু এবং অগ্নি-সৎকার কিরূপে সম্ভবে ?

ক্রমশঃ এ-সকল প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

**শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান**-সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—জরানামক ব্যাধ "দূর হইতে যোগাসনে শয়ান কেশবকে অবলোকন পূর্ব্বক মৃগ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহাদ্বারা হৃষীকেশের পদতল বিদ্ধ হইল। তখন সেই ব্যাধ মৃগগ্রহণ-বাসনায় সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক অনেক-বাহুসম্পন্ন পীতাম্বরধারী যোগাসনে শয়ান পুরুষ তাহার শরে বিদ্ধ হইয়াছেন। লুব্ধক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত মনে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন মহাত্মা মধুসূদন তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অচিরাৎ আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ঐ সময় ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং রুদ্র, আদিত্য, বসু, বিশ্বদেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইলেন; তখন ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। —মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব, চতুর্থ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।"

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার দেহ ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না ; বরং ইহাই জানা যায় যে, তিনি আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সশরীরেই "স্বীয় অপ্রমেয় স্থানে" গমন করিলেন। ইন্দ্রাদির অভ্যর্থনা এবং সৎকারাদির উল্লেখে স্পষ্টই বুঝা যায়—দেহহীন জ্যোতিঃ বা আত্মারূপে তিনি সেই স্থানে গমন করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৬॥—যাহাতে ধারণাদ্বারা লোক সকল ধ্যানমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপে আগ্নেয়ী যোগধারণায় লোকাভিরাম স্বীয় তনু দগ্ধ না করিয়াই কেবল যোগধারণায় ( সশরীরে ) স্বীয় ধামে ( অপ্রকট প্রকাশে ) প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভেই শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতন্বৈব সমাবিশৎ॥—শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় স্বীয় তনুর সহিতই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা স্বীয় তনু দগ্ধ করিয়াই লোকান্তরে গমন করেন ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয়ী যোগধারণা দেখাইয়াছেন বটে ; কিন্তু স্বীয় দেহকে দগ্ধ না করিয়াই—সশরীরেই—তিনি স্বীয় ধামে প্রবেশ করিয়াছেন। "যোগিনো হি স্বচ্ছন্দমৃত্যবঃ স্বতনুমাগ্নেয্যা যোগধারণয়া দগ্ধ্বা লোকান্তরং প্রবিশন্তি ভগবাংস্তু ন তথা কিন্তু অদগ্ধ্বৈব স্বতনুসহিত এব স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠাখ্যং আবিশৎ॥ শ্রীধরস্বামী॥" তবে তিনি আগ্নেয়ী যোগধারণাই বা অবলম্বন করিলেন কেন ? তাহা করিলেন কেবল—যোগীদিগের দেহত্যাগ-রীতি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। যোগিনাং দেহত্যাগশিক্ষণার্থমেব ধারণামনু তদন্তর্ধাপনমিত্যেব জ্ঞেয়ম্॥—ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে কোনও দেহ রাখিয়া যান নাই ; তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে ( অপ্রকট প্রকাশে ) প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী উক্তি হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। পরবর্ত্তী বর্ণনা এইরূপ। মৌষল-লীলার কথা শ্রবণ করিয়া দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব কৃষ্ণবলরামের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। যদুস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। বলদেবের পত্নীগণ তাঁহার দেহকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেব-পত্নীগণ বসুদেবের গাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূগণ প্রদ্যুম্নাদির গাত্র আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণ করিলেন—একথা বলা হয় নাই ; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও দেহ রাখিয়া যায়েন নাই। তিনি সশরীরেই স্বীয় ধামে—অপ্রকট প্রকাশে—প্রবেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যে ভূতলে একটী দেহ রাখিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধান-বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাভারত একথা বলেন নাই ; কিন্তু পরে মৌষল-পর্ব্বের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—অর্জ্জুন "অন্বেষণদ্বারা বলদেব ও বাসুদেবের শরীরদ্বয় আহরণপূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।" বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের যে দেহকে অর্জ্জুন চিতানলে ভস্মীভূত করিলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল ?

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানাদি-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জরানামক ব্যাধ বৈকুণ্ঠে গমন করিলে পর "ভগবান্ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন। বাসুদেবাত্মক ভগবৎ-স্বরূপ—জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিলস্বরূপ।" পঞ্চাননতর্করত্ন কৃত অনুবাদ।

"গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে॥
অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ বি. পু. ৫।৩৭।৬৮-৬৯॥"

আরও বলা হইয়াছে—অর্জ্জুনও কৃষ্ণ ও রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য যাদবদের দেহসকল অন্বেষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন।

"অর্জ্জুনোঽপি তদন্বিষ্য কৃষ্ণরাম-কলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ বি. পু. ৫।৩৮।১॥"

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথাও জানা যায় এবং দেহ-সৎকারের কথাও জানা যায়। কিন্তু দেহত্যাগের কথা যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহা যথাশ্রুত অর্থমাত্র। উদ্ধৃত অনুবাদে শ্লোকের "সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি"-অংশের অনুবাদে বলা হইয়াছে—"বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া।" এস্থলে দুইটী "আত্মা"-শব্দের একই অর্থ হইতে পারে না; একই অর্থ মনে করিলে "স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্য হইতে কোনও অর্থোপলব্ধি হয় না। "আত্মাতে আত্মার যোগ"—ইহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ শ্রী. ভা. ১১।৩১।৫॥" ইহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিত হইয়াছে—"আত্মনি স্ব-স্বরূপে এব আত্মানং মনঃ সংযোজ্য।" এস্থলে "আত্মনি—আত্মাতে"-শব্দের অর্থ স্ব-স্বরূপে; নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে। আর "আত্মানং"-শব্দের অর্থ মন। দুইটী "আত্মা"-শব্দের মধ্যে সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—স্বীয় স্বরূপ; আর দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত "আত্মা"-শব্দের অর্থ—মন। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে "বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিয়া। "বাসুদেবময় স্বরূপ"-এর অর্থ—বাসুদেবই যাঁহার স্বরূপ; এই স্বরূপে এবং যিনি "মানুষ-দেহ পরিত্যাগ করিলেন," তাঁহাতে কোনওরূপ ভেদই নাই। তিনি আত্মারাম—নিজেতেই নিজে রমণ করেন। "বাসুদেবময় স্বীয় স্বরূপে মনঃসংযোগ করিলেন"—এই বাক্যে তাঁহার আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে। এই স্বরূপ যে "অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, ব্রহ্মভূত, জন্ম-জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং অখিল-স্বরূপ"—বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ স্বরূপে যিনি মনঃসংযোগ করিলেন, তিনি যে "ভগবান্" একথাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাতে দেহ-দেহী-ভেদ থাকিতে পারে না। "দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ স্মৃতিবাক্য॥"

তিনি আনন্দঘন, চিদ্ঘন, রসঘন, সচ্চিদানন্দ। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। মায়াবদ্ধ জীবেরই জন্ম-মৃত্যু। জড়দেহেরই জন্ম; এই জড় দেহে দেহী জীবাত্মার আশ্রয়; জীবাত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়াকেই বলে মৃত্যু। দেহধারী জীবের দেহ জড়, দেহী জীবাত্মা চিদ্বস্তু; সুতরাং জীবে দেহ এবং দেহী হইল দুইটী বস্তু; তাই জীবের পক্ষেই তাহার দেহ গ্রহণ যেমন সম্ভব, দেহ ত্যাগ করাও তেমনি সম্ভব। কিন্তু ভগবানের দেহও যাহা, ভগবান্ও তাহাই—একই আনন্দময় বস্তু; দেহ বলিয়া তাঁহার পৃথক্ কিছু নাই। তাই তাঁহার পক্ষে বাস্তব জন্ম যেমন নাই, মৃত্যু বা দেহত্যাগও নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। তিনি যখন তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করেন, নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত তখন তিনি জন্মলীলার অনুকরণ মাত্র করেন; মানুষের মত শুক্র-শোণিতে তাঁহার জন্ম নয়। যাহা নিত্যবস্তু—অথচ লোক-নয়নের গোচরীভূত ছিল না—তাহাকে জন্মলীলার আবরণে লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন মাত্র। সুতরং তাঁহার জন্ম নাই। "অজন্মনি"-শব্দে বিষ্ণুপুরাণ তাহা স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

"বাসুদেবময়"-শব্দের তাৎপর্য্যও বিবেচ্য। "বসুদেব"-শব্দের অর্থ "শুদ্ধ-সত্ত্ব"। শ্রীমদ্ভাগবত "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"-বাক্যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "বাসুদেব"-শব্দের অর্থ—বসুদেব ( শুদ্ধসত্ত্ব )-ঘটিত এবং "বাসুদেবময়"-শব্দের অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বময়, সচ্চিদানন্দ। বাসুদেবময় বা সচ্চিদানন্দময় যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নয়। সশরীরে যেমন তিনি আবির্ভূত হন, তেমনি সশরীরেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্তও হন।

প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি যদি সশরীরেই তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—"তত্যাজ মানুষং দেহম্—মানুষ দেহ ত্যাগ করিলেন ?" উত্তরে বলা যায় এস্থলে "মানুষ দেহ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? যদি যথাশ্রুত অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে "মানুষ দেহ"-শব্দের অর্থ হইবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ একটী দেহ। শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইলে দ্বিভুজ দেহই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার দ্বিভুজ-দেহ ছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলেন না। বিষ্ণুপুরাণও বলেন—জরাব্যাধ যাইয়া দেখিলেন—একজন "চতুর্ভুজ নর"। "গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্॥ বি. পু. ৫।৩৭।৬৪॥" ইহা "মানুষ দেহ" নয়; সুতরাং "মানুষদেহ ত্যাগ করিলেন"—এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ বিচার-সহ নয়। তবে প্রকৃত অর্থ কি হইবে ? "মানুষ দেহ"-অর্থ "মনুষ্যলোকে প্রকটিত দেহ বা শ্রীবিগ্রহ"; "সেই দেহ ত্যাগ করিলেন" অর্থ—প্রকটিত দেহ ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ দেহের প্রকটত্ব ত্যাগ করিলেন, প্রকটিত দেহকে ( সুতরাং লীলাকেও ) অপ্রকট করিলেন; যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা আবার লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। এইরূপ অর্থ না করিলে বিষ্ণুপুরাণের বাক্যগুলির পরস্পরের সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপ অর্থের পশ্চাতে যুক্তি এবং ন্যায়ের বিধানও বিদ্যমান। একজন পথিক জলপূর্ণ একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত কলস লইয়া পথ চলিতে চলিতে ক্লান্তিবশতঃ ভার বহনে অসমর্থ হইয়া "সজল স্বর্ণ-কলস পরিত্যাগ করিল"—একথা বলিলে জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া স্বর্ণ-কলসটিকে রাখাই বুঝায়। "সজল-কনক-কলসং-পান্থস্ত্যজতীত্যুক্তে ভারবহনশ্রমাৎ নির্জ্জলীকৃতস্য কলসস্য গ্রহণং প্রতীয়তে।" (শ্রীভা. ১১।৩০।১-শ্লোকের টীকায়

চক্রবর্ত্তী।" এস্থলে "সজল-কনক-কলস"-শব্দে "কনক-কলস"-শব্দটী হইতেছে বিশেষ্য; "সজল—জলপূর্ণ"-শব্দটী হইতেছে তাহার বিশেষণ। ভারবহনে অসমর্থ পথিক বিশেষ্য কনক-কলসটীই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; জল ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইয়া কনক-কলসটি লইয়া যাইবেন—ইহাই সম্ভব; সুতরাং "ত্যজতি—ত্যাগ করে" এই ক্রিয়া-পদের সঙ্গে বিশেষ্য "কনক-কলস"-এর সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; বিশেষণ "সজল"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ, অর্থাৎ পথিক কলসের "সজলত্বই—জলই" ত্যাগ করেন। তদ্রূপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোকের "তত্যাজ মানুষং দেহম্"-বাক্যে "দেহম্" হইতেছে বিশেষ্য, আর "মানুষম্" হইতেছে তাহার বিশেষণ। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাহার ত্যাগ সম্ভব নয়, সুতরাং তাহার সহিত "তত্যাজ" ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমীচীন হয় না; কাজেই এই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ হইবে বিশেষণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটিত"—শব্দের সঙ্গে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "মানুষম্—মনুষ্যলোকে প্রকটত্ব" ত্যাগ করিলেন—দেহটী রক্ষা করিয়া—সশরীরে অপ্রকট প্রকাশে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ অর্থের সমর্থক ন্যায় হইতেছে—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপ-সংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে (শ্রীভা. ১১।৩০।১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিধৃত ন্যায়-বচন)—বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে যদি বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরে সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" এস্থলে বিশেষ্যপদ যে "দেহ", তাহার সহিত "তত্যাজ"—এই ক্রিয়াপদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষণ "মানুষ"-এর সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি তিনি সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ কেন বলিলেন—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ করিয়া সৎকার করিয়াছেন? মহাভারতও তো তাহাই বলেন? শ্রীকৃষ্ণ যদি সশরীরেই স্বধামে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৎকারের জন্য দেহ আসিল কোথা হইতে?

দুইভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারত, এতদুভয়ের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে দুইটী উক্তির মধ্যে একটি অপরটীর বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় মহাভারত হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার ইহাও জানা যায় যে, তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছে। যিনি সশরীরে অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার আবার পরিত্যক্ত দেহ থাকা সম্ভব নহে। এই পরস্পর-বিরোধী দুইটী বাক্যের একটীই সত্য হইতে পারে, উভয়টী সত্য হইতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে—কোন্‌টী সত্য। যে বাক্যটী সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই সর্ববসম্মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে সশরীরে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সকল গ্রন্থ হইতেই তাহা জানা যায়; এ-সম্বন্ধে মতভেদ নাই; সুতরাং ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহ যে পড়িয়া ছিল, তাহার যে অগ্নি-সৎকার করা হইয়াছে—একথা পুরাণ-শিরোমণি এবং প্রমাণ শিরোমণি

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন না; সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকার-সম্বন্ধে মতভেদ আছে; ইহা সর্ব্বসম্মত নহে বলিয়া—বিশেষতঃ, যে দুইটি গ্রন্থে পরিত্যক্ত-দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারের উল্লেখ আছে, সেই দুইটী গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্তির পূর্ব্বোক্তি আছে বলিয়া—ইহাকে (পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি-সূচক বাক্যকে) সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। হয়তো অনবধানতাবশতঃই এই দুই গ্রন্থে পরিত্যক্ত দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোনও কোনও ঋষির এ-জাতীয় অনবধানতার কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত॥ শ্রীভা. ১০।৭৭।৩০॥—হে রাজর্ষে! (শাল্ব মায়া-রচিত বসুদেবকে হত্যা করিলে শ্রীকৃষ্ণ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন,) কোনও কোনও ঋষি একথা বলিয়া থাকেন। তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া কথা বলেন না, স্বীয় বাক্যের পরস্পর-বিরুদ্ধতা তাঁহারা স্মরণ করেন না।" বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতে মায়ামলিন-চিত্ত সাধারণ লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই লিখিত হইয়াছে। আলোচনার শেষাংশ (৪৩৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন—বলদেবের এবং পরস্পর-কর্ত্তৃক নিহত যাদবদের পরিত্যক্ত দেহও তো পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও তো সৎকার করা হইয়াছে। বলরাম হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; সুতরাং তাঁহার দেহও প্রাকৃত নহে, তাঁহারও জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে; তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। আর, যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ; সুতরাং তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায় তাঁহাদেরও আবির্ভাব-তিরোভাব। তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তথাপি, তাঁহারাও যে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত দেহেরও যে সৎকার করা হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতও তাহা বলেন; এ-সম্বন্ধে তো মতভেদ নাই; সুতরাং ইহাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যক্ত দেহের অবস্থিতি এবং সৎকারই বা স্বীকৃত হইতে আপত্তি কিরূপে উঠিতে পারে?

উত্তর—বলদেব এবং যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহাদের যে জন্ম-মৃত্যু নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র আছে, এ-কথা সত্য। আবার, ইহা যেমন সত্য, তাঁহাদের দেহের অবস্থিতির এবং সৎকারের কথাও তেমনই সত্য। কিন্তু যে দেহগুলির সৎকার করা হইয়াছিল, সেগুলি সত্যই তাঁহাদেরই দেহ ছিল না। এই দেহগুলি ছিল মায়াকল্পিত। এইরূপ মায়াকল্পিত দেহের কথা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্ম্মপুরাণ হইতে জানা যায়, রাবণ যে-সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত সীতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন অগ্নিদেবের কল্পিত ছায়া-সীতা বা মায়া-সীতা।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৯-পরিচ্ছেদে ধৃত কূর্ম্মপুরাণবচন।

—সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নিদেব এক মায়া-সীতার সৃষ্টি করিলেন। এই মায়া-সীতাকেই দশানন রাবণ হরণ করিয়াছিলেন ; আর সত্য সীতা অগ্নিদেবের পুরীতে গমন করিলেন। রাবণবধের পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষাসময়ে সেই মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন ; আর অগ্নিদেব নিজপুরী হইতে সত্য সীতাকে আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে দান করেন।"

মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব হইতেও জানা যায়, যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুনাদির সহিত একই সঙ্গে বাস করার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তাঁহাদের নিকটে নেওয়া হইয়াছিল ; তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহারা নরকে বাস করিতেছেন। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইলে তাঁহার বিস্ময় দূর করার জন্য ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—যুধিষ্ঠির! অর্জ্জুনাদি তোমার ভ্রাতৃবর্গ বাস্তবিক নরকে অবস্থিত নহেন। তুমি যে নরক দর্শন করিতেছ, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক কল্পিত মায়ামাত্র। "ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকস্থা বিশাম্পতে। মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রয়োজিতা॥"

কেবল যে যাদবদিগের পরিত্যক্তরূপে প্রতীয়মান দেহগুলিই মায়াকল্পিত ছিল, তাহা নহে ; সমগ্র মৌষল-লীলাটীই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মায়া ; তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সারথি-দারুকের নিকটে বলিয়াছেন।

"ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ শ্রী. ভা. ১১।৩০।৪৯॥

—মৌষল-লীলার অন্তে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন—তুমিও আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এ-সকল আমার মায়ারচিত জানিয়া শান্তিলাভ কর।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা বলেন—অথ দারুকসান্ত্বনায় মৌষলাদ্যর্জ্জুনপরাভবপর্য্যন্তায়া লীলায়া ঐন্দ্রজালবদ্‌রচিতত্বমুপদিশতি ত্বন্ত্বিতি। * * অধুনা প্রকাশিতাং সর্ব্বামেব মৌষলাদিলীলাং মম মায়য়া এব ইন্দ্রজালবদ্‌রচিতাং বিজ্ঞায়-ইত্যাদি॥—অধুনা প্রকাশিত মৌষল-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন-পরাভব পর্য্যন্ত সমস্ত লীলাকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার মায়ারচিত বলিয়া জানিবে।

প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়াই যে যাদবগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ শ্রীভা. ১১।৩০।১৩॥"

আর শ্রীকৃষ্ণ যে নিজে অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় দ্বারকা-পরিকর যাদবদিগকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং যাদবদের নিজেদের মধ্যে একটা কলহের সৃষ্টি করিয়া তদুপলক্ষ্যেই তাঁহাদিগকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মশাপের অবতারণা করাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

"ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে॥

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণুস্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম॥
এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ॥ শ্রীভা. ১১।১।৩-৫॥

—অপ্রমেয় শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে পরিরক্ষিত যাদবগণদ্বারা পৃথিবীর ভার-স্বরূপ রাজসেনাগণকে বধ করিয়া পরিশেষে চিন্তা করিলেন—অহো, লোকপ্রতীতিতে পৃথিবীব ভার গত হইয়াছে বটে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা গত হয় নাই; যেহেতু, অবিসহ্য যাদবকুল * অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই যদুকুল আমার আশ্রিত বলিয়া অন্যের দ্বারা ইহাদের পরাভব সম্ভব হইবে না। যদি ইহাদিগকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে ইহারা নিত্য-বৃদ্ধিশীল বৈভব-দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হইবে। অতএব আমি এইরূপ করি—বেণুসমূহের অন্তরে অগ্নি উৎপাদনের ন্যায় যদুকুলের মধ্যে কলহরূপ অগ্নি উৎপাদন করিয়া শান্তিস্থাপন পূর্ব্বক আমি স্বীয় ধামে গমন করি।”

এ-সমস্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় রচিত ইন্দ্রজাল মাত্র, শ্রীশুকদেবও পরীক্ষিতের নিকটে তাহা বলিয়াছেন। “রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য॥ শ্রীভা. ১১।৩১।১১॥—হে রাজন্! যাদব-

---

* রাজসেনাগণের ন্যায় অধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া যে যাদবকুলকে পৃথিবীর ভার-স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা নয়। কেননা, যাদবগণ অসাধু ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন ব্রহ্মণ্য, বদান্য, নিত্য-বৃদ্ধোপসেবী এবং কৃষ্ণগতচিত্ত। একথা মহারাজ পরীক্ষিৎই শ্রীশুকদেবের নিকটে বলিয়াছেন। “ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্‌বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্॥ শ্রীভা. ১১।১।৮॥” শ্রীকৃষ্ণেই যে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা অর্পিত থাকিত এবং তজ্জন্য শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি বিষয়েও যে তাঁহাদের আত্মানুসন্ধান থাকিত না, সুতরাং তাঁহারা যে পরম-সাধুস্বভাবই ছিলেন, একথা স্বয়ং শ্রীশুকদেব গোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন। “শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদি-কর্ম্মসু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয় কৃষ্ণচেতসঃ॥ শ্রীভা. ১০।৯০।৪৬॥” তথাপি যে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে যাদবগণকে পৃথিবীর ভারস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার হেতু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—“ভূভারেত্যাদি যাদবানাঞ্চ নিত্যপরিকরত্বাৎ তত্ত্যাগেন স্বয়ংভগবতঃ এব অন্তর্ধানে তৈরিতি ক্ষোভেনোন্মত্তচেষ্টৈরুপমর্দ্দিতা পৃথিব্যেব নশ্যেদিতি প্রথমং তেষামন্তর্দ্ধাপনম্। * * * অত্র তেষামধার্ম্মিকতয়া তু পৃথিবীভারত্বং ন মন্তব্যম্। ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতাসামিত্যাদৌ শয্যাসনাটনালাপেত্যাদৌ চ পরমসাধুত্বপ্রসিদ্ধেঃ। পৃথ্ব্যা ভারশ্চ ব্যক্তিবাহুল্যমাত্রেণেষ্যতে। পর্ব্বতসমুদ্রাদীনামনন্তানাং বিদ্যমানত্বাৎ।” ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়াছিলেন, যাদবগণ তাঁহার নিত্যপরিকর; তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তিনি নিজে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার অসহ্যবিরহক্ষোভে তাঁহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া যে সকল আচরণ করিবেন, তাহাতে পৃথিবী উপমর্দ্দিত হইবে এবং বিনষ্ট হইবে। এজন্য তাঁহার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগকে অন্তর্ধাপিত করার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের অধার্ম্মিকতাই যে তাঁহাদের পৃথিবীভারত্ব, তাহা নহে। তাঁহারা ধার্ম্মিক এবং পরম সাধু ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যই পৃথিবীর পক্ষে ভার-স্বরূপ—ইহাই অভিপ্রায়।

দিগের এবং তাঁহার নিজেরও আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনমাত্র॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী এক ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। কোনও এক ঐন্দ্রজালিক নট কোনও রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় চাতুর্য্য-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহার একটীমাত্র দেহ হইতেই সহসা বহু সহস্র রাজা ও রাজপুত্র, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যাদি আবিষ্কার করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহারে সকলকে কাল-কবলিত করাইল। পরে নিজে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হওয়ার ভাণ করিল। তখন তাহার দেহ হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার দেহকে ভস্মীভূত করিল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রাদিও শোকবিহ্বল হইয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে রাজা একখানি পত্র পাইলেন; তাহাতে সেই ঐন্দ্রজালিক নট তাঁহাকে জানাইয়াছে—রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ঐ নটের ইন্দ্রজালবিদ্যার কলা-কৌশল; সমস্তই মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি লীলাও তদ্রূপ তাঁহার মায়ারই কলাকৌশল মাত্র—অবাস্তব।

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইয়া, লীলা-প্রকটনের সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলের অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদির দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মায়াকল্পিত দেহ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রদ্যুম্নাদিরূপেই সকলের নিকটে প্রতিভাত করাইলেন। পরে অন্যান্য দ্বারকাবাসীদের সহিত তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি প্রভাসতীর্থে যাইয়া তাঁহাদের দ্বারা দান-ধ্যানাদি করাইলেন। এই মায়াকল্পিত দেহধারী দ্বারকাবাসীরাই মৈরেয়-মধু পান করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন এবং পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নাদির মায়াকল্পিত দেহ হইতেই তিনি কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদি আধিকারিক ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব স্থানে—স্বর্গাদিতে—পাঠাইলেন। যে সমস্ত দেহ পড়িয়া ছিল এবং যে সমস্ত দেহের সৎকার করা হইয়াছিল, সে সমস্তই ছিল মায়াকল্পিত। “স্বীয়লীলাপরিকরৈর্যদুভিঃ সহ দ্বারাবত্যামেব যথাস্থিতমেব বিরাজিষ্যে, কিন্তু প্রাপঞ্চিকসর্ব্বলোকচক্ষুর্ভ্যস্তিরোভূয়ৈব তথা প্রদ্যুম্নশাম্বাদিষু মন্নিত্যপরিকরেষু তত্তদ্‌বিভূতয়ো যে দেবা কন্দর্পকার্ত্তিকেয়াদয়ঃ প্রবেশিতা বর্ত্তন্তে তানেব যোগবলেন তত্তদ্দেহতোঽলক্ষিতমেব নিষ্কাশ্য প্রদ্যুম্নাদিত্বেন এব অভিমন্যমানান্ সর্ব্বলোকলোচনেষ্বপি তথৈব ভাতান্ কৃত্বা তৈরন্যৈশ্চ দ্বারকাবাসিভিঃ সার্দ্ধং প্রভাসং গত্বা দানধ্যানমধুপানাদিকং কারয়িত্বা তানাধিকারিকভক্তান্ স্বস্বাধিকারেষু স্বর্গ এব প্রস্থাপ্য তদন্যৈর্দ্বারকাবাসিজনৈঃ সহ দাসরথিস্বরূপ ইব বৈকুণ্ঠে প্রস্থাস্যে, কিন্তু লোকলোচনেষু মায়াদোষং প্রবেশ্যৈব যেন লোকা এবং মংস্যন্তে দ্বারাবত্যাঃ সকাশান্নিক্রম্য সর্ব্বে যদুবংশ্যাঃ প্রভাসং গত্বা ব্রহ্মশাপগ্রস্তা মধু পীত্বা মত্তাঃ পরস্পর-প্রহৃতা দেহাংস্তত্যজুঃ পরমেশ্বরোঽপি স রামস্ত্যক্তমানুষদেহ এব স্বধামারুরোহ তস্মান্মানুষ-শরীরমিদমনিত্যং মায়িকমেকে বদিষ্যন্তি।—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ‘এতে ঘোরা মহোৎপাতা’-ইত্যাদি ১১।৩০।৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।”

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও মায়াকল্পিত দেহ ছিল না; অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার কোনও পরিত্যক্ত দেহও ছিল না। যিনি স্বীয় গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে যমপুরী হইতে তাঁহার মর্ত্ত্যদেহেই ফিরাইয়া

আনিয়াছিলেন, যিনি মাতৃগর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক শঙ্করকেও বাণযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, জরানামক ব্যাধকেও যিনি সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি কি আত্ম-স্বংরক্ষণে অপারগ ? তিনি কি সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করিতে অসমর্থ ?

"মর্ত্তোন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥ শ্রী. ভা. ১১৷৩১৷১২ ॥"

এইরূপে দেখা গেল, মৌষল-লীলা ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই মায়াময়, অবাস্তব।

শ্রীকৃষ্ণের মৌষলাদি-লীলা যে মায়াকল্পিত, তাহা কিন্তু মায়ামলিন-চিত্ত প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না। যাহাদের চক্ষু পিত্তাদি-দোষযুক্ত, তাহারা যেমন ধবল এবং উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে, তদ্রূপ যাহারা মায়াবদ্ধ, তাহারা তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী নির্য্যান-লীলাকেও প্রাকৃত বলিয়া মনে করে—মনে করে, তিনি যেন দ্বারকাবাসীদের সহিত প্রাকৃত লোকের মতনই দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার মহিষীবর্গও বহ্নিপ্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই যে এইরূপ মনে করে, তাহাও নয়; শ্রীকৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অর্জ্জুনাদিও এবং পরাশরাদি মুনিগণ (বিষ্ণুপুরাণে) এবং বৈশম্পায়নও (মহাভারতে) ঐরূপ সাধারণ-লোক-প্রতীতির অনুরূপ কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। "যথা ধবলোজ্জ্বলমপি শঙ্খং পিত্তাদিদোষো-পহতচক্ষুষো মলিনপীতমেব পশ্যন্তি, তথৈব সচ্চিদানন্দময়ীমপি মন্নির্য্যানলীলাং মায়াদোষোপহতচিত্তচক্ষুষঃ প্রদ্যুম্নাদিসর্ব্বপরিকরসহিতমদ্দেহত্যাগ-রুক্মিণ্যাদিমহিষীবহ্নিপ্রবেশাদিতুরবস্থাময়ীং প্রাকৃতীমেব দ্রক্ষ্যন্তি নিশ্চেষ্টন্তিচ। ন কেবলং প্রাকৃতা, কিন্তু মদংশার্জ্জুনাদয়োঽপি তথৈব বৈশম্পায়ন-পরাশরাদয়ো মুনয়োঽপি স্বস্বসংহিতাসু বর্ণয়েয়ুরপি।—এতে ঘোরা মহোৎপাতা-ইত্যাদি শ্রীভা. ১১৷৩০৷৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" অর্জ্জুন যে সমস্ত দেহের সৎকারাদি করিয়াছেন, সে সমস্ত মায়াকল্পিত, শ্রীকৃষ্ণমায়ায় তাহা অর্জ্জুনও বুঝিতে পারেন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক মনে করিয়াছে, সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই লোক-প্রতীতির অনুসরণ করিয়াই বৈশম্পায়ন মহাভারতের এবং পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা দিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যেই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই স্বরূপেই তিনি নিজেকে অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার রূপের নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর মহিষীদিগের সম্বন্ধেও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের উক্তি দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে তৎসম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা হইতেছে।

**মহিষী-হরণ**—মহিষীহরণ-সম্বন্ধে মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায় হইতে জানা যায়, বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের সৎকারাদির পরে অর্জ্জুন যখন "সপ্তম দিবসে রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন বৃষ্ণিবংশীয় কামিনীগণ শোকার্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্রসমাযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্য, অশ্বারোহী ও রথিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমুদায় অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে বৃদ্ধ, বালক ও কামিনীগণকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজারোহিগণ পর্ব্বতাকার গজ-সমুদয়ে আরোহণপূর্ব্বক ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়

বালকগণ বাসুদেবের ষোড়শ সহস্র পত্নী ও বজ্রকে অগ্রসর করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের যে কত অনাথা কামিনী পার্থের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সেই যদুবংশীয় অসংখ্য লোক-সমভিব্যাহারে দ্বারকানগর হইতে বহির্গত হইলেন। * * * কিয়দ্দিন পরে তিনি অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পঞ্চনদ-দেশে সমুপস্থিত হইয়া পশু ও ধান্যপরিপূর্ণ প্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। ঐ স্থানে দস্যুগণ, ধনঞ্জয় একাকী সেই অনাথা যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অর্থলোভে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাসনা করিয়া পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিল যে, ধনঞ্জয় একাকী কতকগুলি বৃদ্ধ, বালক ও বনিতা সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে। উহার অনুগামী যোধগণেরও তাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব, চল আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের ধনরত্ন সমুদায় অপহরণ করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই দস্যুগণ লগুড়হস্তে সিংহনাদ-শব্দে দ্বারকাবাসী লোকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় * * কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সমক্ষেই অবলাদিগকে হরণ করিতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। * * পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখ হইতে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। * * * অনন্তর তিনি হতাবশিষ্ট কামিনীগণ ও রত্নরাশি সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া হার্দ্দিক্যতনয় ও ভোজকুলকামিনীগণকে মার্ত্তিকাবত নগরে, অবশিষ্ট বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং সাত্যকীপুত্রকে সরস্বতী নগরীতে সন্নিবেশিত করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের প্রতি সমর্পিত হইল। ঐ সময়ে অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যত হইলে, বজ্র বারংবার তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও দেবী জাম্ববতী ইঁহারা সকলে হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ তপস্যা করিবার মানসে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপগ্রামে উপস্থিত হইলেন।—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

আবার স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে—বাসুদেবের “ষোড়শ সহস্র বনিতাও কালক্রমে সরস্বতীর জলে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্সরোবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন।—কালী-প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।”

উল্লিখিত মহাভারতের উক্তি হইতে জানা যায়— সত্যভামা-আদি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বনে গমন করিলেন এবং রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থেই হুতাশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপ্রধানা মহিষী যে অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পঞ্চনদে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই, তাহাই মহাভারত হইতে জানা গেল। বাকী ষোল হাজার মহিষীও যে ইন্দ্রপ্রস্থে আসার পরে কালক্রমে সরস্বতী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন—সুতরাং তাঁহারাও যে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই—তাহাও মহাভারত হইতে জানা গেল। এইরূপে মহাভারত হইতে জানা গেল যে—কোনও শ্রীকৃষ্ণমহিষীই দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন নাই; দস্যুগণ অপর কোনও কোনও রমণীকেই অপহরণ করিয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ৩৮শ-অধ্যায় হইতে জানা যায়—'অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ। উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।২॥—রুক্মিণীপ্রমুখা অষ্টপ্রধানা মহিষী হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।" সুতরাং এই অষ্টপ্রধানা মহিষীর অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাওয়ার এবং দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে আরও জানা যায়—দ্বারকাবাসী-দিগকে লইয়া অর্জ্জুন যখন পঞ্চনদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুনের সম্মুখভাগ হইতে আভীর দস্যুগণ সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া দুঃখপ্রকাশ-পূর্ব্বক জানাইলেন—আভীর দস্যুগণ লগুড়দ্বারা তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক আনীত কৃষ্ণ-পরিবারবর্গকে এবং সহস্র সহস্র স্ত্রীগণকে অপহরণ করিয়াছে। "স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে। যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ॥ আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্। হৃতং যষ্ঠিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম॥ বি, পু, ৫।৩৮।৫১-৫২॥" এইরূপে বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা গেল—অষ্ট-প্রধানা মহিষী ব্যতীত অপর মহিষীগণই দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়—রুক্মিণী-আদি কৃষ্ণপত্নীগণ মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সন্নিবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। "কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ॥ শ্রীভা. ১১।৩১।২০॥" আবার প্রথম স্কন্ধ হইতে জানা যায়—মৌষল-লীলার পরে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিতেছেন, অসংগোপ (আভীর)-গণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছেন. "সোঽহং নৃপেন্দ্র রহিতঃ পুরুষোত্তমেন সখ্যা প্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ। অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্ গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি॥ শ্রীভা. ১।১৫।২০॥ উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শসাহস্র-স্ত্রীলক্ষণম্। শ্রীধরস্বামীর টীকা।" এইরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—রুক্মিণ্যাদি অষ্টপ্রধানা মহিষী মৌষল-লীলার অব্যবহিত পরেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র মহিষী দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। এবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতভেদ নাই।

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। মহাভারতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণের অপহরণের কথা না থাকিলেও অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে যথাকালে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রব্রজ্যা গ্রহণেব কথা, কাহারও কাহারও অগ্নি-প্রবেশের কথা এবং কাহারও কাহারও সরস্বতী-নদীর জলে দেহ-বিসর্জ্জনের কথা দৃষ্ট হয়। ইহাকে সত্য বলিয়া (অর্থাৎ প্রকৃত মহিষীগণই ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনের পরে নানা ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—একথাকে সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও বহু কাল মহিষীগণ প্রকট ছিলেন এবং শেষকালে তাঁহারা বিভিন্ন উপায়ে দেহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—অষ্ট পট্টমহিষী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট মহিষীগণ দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। ইহাকেও সত্য বলিয়া (অর্থৎ প্রকৃত

মহিষীগণই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন—ইহা সত্য বলিয়া ) গ্রহণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরেও যে তাঁহাদের অবস্থিতি ছিল এবং তাঁহারাও যে প্রাকৃত জীবের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং দস্যুহস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহাও স্বীকার করিতে হয়। মহিষীগণের তত্ত্ব বিচার করিলে কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না।

প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারাও শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহা, সচ্চিদানন্দময়ী; সুতরাং তাঁহাদেরও জন্ম-মৃত্যু থাকিতে পারে না, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র হইতে পারে। এ সমস্ত কারণে ভূতলে দেহ রাখিয়া তাঁহাদের পক্ষে পরলোকে গমনও সম্ভব হইতে পারে না; কিম্বা দস্যুগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহরণও সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্বে মৌষল-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্রের কান্তা শ্রীসীতাদেবীকে রাক্ষস রাবণ স্পর্শও করিতে পারেন নাই; রাবণ সীতার মায়াকল্পিত রূপটীকেই হরণ করিয়া নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের স্পর্শ করার সামর্থ্যও কোনও প্রাকৃত দস্যুর থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উক্তি সমূহের সমাধান কি ?

সমাধান এই যে—সমস্ত ব্যাপারই মৌষল-লীলার ন্যায় মায়াময়। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রদ্যুম্নাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইলেন, তখন তাঁহার মহিষীদিগকেও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় মহিষীদিগেরও এবং প্রদ্যুম্নাদির পত্নীগণেরও মায়াকল্পিত দেহ প্রকটিত হইল। তাঁহাদের এই সকল মায়াকল্পিত দেহেরই কেহ কেহ অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন এবং কেহ কেহ দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হন। যে সকল কৃষ্ণ-মহিষীর দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও একটি বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহা হইতেই দস্যুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অপহৃত হওয়ার রহস্য অবগত হওয়া যায়। তথ্যটী এই ।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—পঞ্চনদে আভীর দস্যুগণ কর্ত্তৃক মহিষীগণ অপহৃত হইলে অর্জ্জুন ব্যাসদেবের নিকটে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—“দস্যুগণ স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছেন বলিয়া যে তুমি শোক করিতেছ, আমি তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে অষ্টবক্র-নামক ঋষি সনাতন ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জলে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবগণ অনেক অসুরকে পরাজিত করেন এবং তদুপলক্ষ্যে সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের এক মহোৎসব হয়। অনেক দেবনারীও এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মহোৎসবে যাওয়ার সময় রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি শত-সহস্র বরাঙ্গনা পথিমধ্যে আকণ্ঠ-জলনিমগ্ন এক ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন—তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন—“আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের অপ্রাপ্য আর কি রহিল ? কোনও বর চাইনা।” কিন্তু অপর দেবাঙ্গনাগণ বলিলেন—“হে বিপেন্দ্র ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে—পুরুষোত্তমকে যেন আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি। ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি। তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপেন্দ্র পুরুষোত্তমম্ ॥ বি. পু. ৫।৩৮।৭৮ ॥”

মুনিবরও তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। মুনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলনিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার মুখব্যতীত অপর কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেন নাই। বর-দানের পরেই মুনি যখন জল হইতে উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অঙ্গের অষ্টবক্রতা দেখিয়া বরাঙ্গনাগণ হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে রুষ্ট হইয়া মুনিবর তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন; 'মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্। মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ॥ বি. পু. ৫।৩০।৮২॥—আমার বরে তোমরা পুরুষোত্তমকে পতিরূপে পাইবে বটে; কিন্তু আমার শাপে তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে।' অভিশপ্ত বরাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক পুনরায় স্তুত হইয়া মুনি বলিলেন---পুনরায় তোমরা সুরেন্দ্রলোকে গমন করিবে। 'পুনঃ সুরেন্দ্র-লোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮৩॥' অষ্টবক্রমুনির বরে বরাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম বাসুদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন; আবার তাঁহারই অভিসম্পাতে তাঁহারা দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছেন। পাণ্ডব! তুমি দুঃখ করিও না। সেই অখিলনাথ বাসুদেব নিজেই সমস্তের উপসংহার করিয়াছেন।

তত্ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোহল্পো হি পাণ্ডব।
তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্। বি. পু. ৫।৩৮।৮৫॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—অষ্টবক্রমুনির বরে দেবাঙ্গনাগণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই শাপে পরে দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক একটী বাক্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর উৎপীড়িত হওয়ার কথা ভগবানের নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইয়া ব্রহ্মা যখন ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তখন এক আকাশবাণীতে তিনি শুনিলেন যে, পৃথিবীর দুঃখের কথা স্বয়ংভগবান্ পূর্ব্বেই জানিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন; তাঁহার প্রিয়ার্থ অমর-স্ত্রীগণ উৎপন্ন হউক।

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥ শ্রীভা. ১০।১।২৩॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—উপেন্দ্রাদি যে সকল মন্বন্তরাবতারগণ সুরলোকে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পত্নীগণকেই এস্থলে সুরস্ত্রী বলা হইয়াছে। "সুরস্ত্রিয়ঃ—তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদি-মন্বন্তরাবতারস্ত্রিয়ঃ।" ইঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে—নন্দ-যশোদার অংশ দ্রোণ-ধরা যেমন তাঁহাদের অংশী নন্দ-যশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ—কৃষ্ণকান্তাগণের অংশভূতা এই সকল সুরস্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষীর (যাঁহারা সুরস্ত্রীগণের অংশিনী তাঁহাদের) সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরকে উপলক্ষ্য করিয়া যেমন নন্দ-যশোদার সঙ্গে ধরা-দ্রোণের মিলন, তদ্রূপ অষ্টবক্রমুনির বরকে উপলক্ষ্য করিয়াই এ সকল সুরস্ত্রী-গণেরও মহিষীগণের সহিত মিলন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা অন্তর্দ্ধান করার সঙ্কল্প করিলেন, তখন নিত্যপরিকর অনিরুদ্ধাদিকে অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে কন্দর্প-কার্ত্তিকেয়াদিকে রক্ষা করিয়া এই সকল মায়াকল্পিত দেহদ্বারা যেমন

মৌষল-লীলা সম্পাদিত করাইলেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যপরিকর মহিষীগণকেও অন্তর্দ্ধাপিত করাইয়া তাঁহাদের মায়াকল্পিত দেহে এই সকল দেবাঙ্গনাগণকে রক্ষা করিলেন এবং পরে অষ্টবক্র মুনির শাপবাক্যকে সার্থক করার জন্য দস্যুগণদ্বারা তাঁহাদিগকে অপহরণ করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আভীর-দস্যুর রূপ ধারণ করিয়া ইঁহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন। একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা যায়। "তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্॥ বি. পু. ৫।৩৮।৮৫॥—অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ কৃষ্ণস্তেন তৎসর্ব্বং তৎপ্রিয়াবৃন্দম্। উপ নিকট এব সম্যক্প্রকারেণ হৃতং অর্জ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখেয়ম্। শ্রীভা. ১।১৫।২০-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" তাঁহাদের অংশিনী মহিষীদিগের দেহে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন, অপর দস্যুগণের পক্ষে তাঁহাদের স্পর্শও সম্ভব নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আভীর (গোপ)-বেশী দস্যুরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মায়ার প্রভাবে অর্জ্জুনের মত বীরও তৎকালে হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অপহরণের ব্যপদেশেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব-লোকে প্রবেশ করাইলেন। এইরূপে দেখা যায়, মৌষল-লীলার ন্যায় মহিষী-হরণও মায়াময়।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে স্বীয় পুত্রবধূ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগকে দ্বারকা হইতে ব্রজে লইয়া আসার নিমিত্ত শ্রীমন্নন্দমহারাজ ব্রজবাসী গোপগণকে দ্বারকায় পাঠাইলেন; পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা মহিষীগণকে লইয়া আসেন। এই সমাধান বিচারসহ নহে। কারণ, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীমন্নন্দ-মহারাজাদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন; তখন দুইমাস ব্রজে প্রকট বিহার করিয়া সমস্ত ব্রজপরিকরের সহিত নিজে অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করিলেন এবং এক প্রকাশে দ্বারকায় গিয়া লীলা করিতে লাগিলেন (১।১।১৪৪ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দ্বারকার এই প্রকাশেরই জরাব্যাধের শরাঘাত-ব্যপদেশে অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং অর্জ্জুন যখন মহিষীদিগকে লইয়া হস্তিনায় যাইতেছিলেন, তখন নন্দ-মহারাজ বা তদীয় অনুচর গোপগণের কেহই প্রকট ছিলেন না,—তাই তাঁহাদের দ্বারা মহিষীগণের অপহরণও অসম্ভব।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## ( শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের তত্ত্ব )

### ১৪৫। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-তত্ত্ব

পরব্রহ্ম রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—মুখ্যতঃ এই পঞ্চবিধ রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি যখন স্বরাট্—স্বশক্ত্যেকসহায়, তখন নিজের এবং নিজের স্বরূপ-শক্তির সহায়তাব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর সহায়তাই তিনি গ্রহণ করেন না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, উল্লিখিত পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়ভূত পরিকর-রূপে অনাদিকাল হইতেই তিনি বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তি আত্মপ্রকট করিয়া বিদ্যমান। এই সমস্ত পরিকরদের সহিত লীলাতে তাঁহার আস্বাদ্য রস উৎসারিত হয় ; তিনি তাহা নিজেও আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পরিকরবর্গকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

তিনি অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সকল ভগবৎ-স্বরূপরূপেও তিনি বিভিন্নধামে বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। সকল স্বরূপে তিনি সকল রস আস্বাদন করেন না ; কিন্তু মধুর-রসের আস্বাদন সকলস্বরূপেরই আছে। মধুর-রস হইতেছে কান্তাভাবময়-রস ; তাঁহার কান্তাস্থানীয় পরিকরগণই এই রসের আশ্রয়। মধুর-রসের আশ্রয় পরিকরগণকেই কৃষ্ণপ্রেয়সী বলা হয়। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই প্রেয়সীরূপ পরিকর আছেন। ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ ( পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপ পরিকরগণ ) হইতেছেন বিভিন্ন ধামের শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন ধামে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিভিন্ন কান্তাভাব-বৈচিত্রীময়ীরূপ প্রেয়সীদের সহিত লীলাতে বিভিন্ন কান্তারস-বৈচিত্রী বা মধুর-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের তত্ত্ব এ-স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৩-৮৯ অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীদের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ সেই আলোচনারই অনুসরণ করা হইতেছে।

### ১৪৬। শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব

#### ক। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১০৬-জ-অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে গোপীতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সে-স্থলে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ব্রজগোপীগণ হইতেছেন পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। "অথ বৃন্দাবনে তদীয়-স্বরূপশক্তি-প্রাদুর্ভাবাশ্চ শ্রীব্রজদেব্যঃ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির প্রাদুর্ভাব বা মূর্ত্তবিগ্রহ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ॥১৮৬॥" ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকাতেও শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজগোপীদিগকে "হ্লাদিনীশক্তির

বৃত্তি” বলিয়াছেন। তাঁহারা যে নিত্যসিদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ তাহাও বলিয়াছেন—“তাস্তু নিত্যসিদ্ধা এব ॥১৮৬॥”

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১০৬-জ-অনুচ্ছেদে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনপায়িনী শক্তি এবং গোপাল-তাপনী-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাও দেখান হইয়াছে যে—তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা।

শ্রীরাধাও ব্রজগোপীদের মধ্যে একজন। সুতরাং শ্রীরাধাও হইতেছেন হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের অনপায়িনী শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকান্তা।

### খ। ব্রজগোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতি হইতে জানা যায়—এক সময়ে ব্রজস্ত্রীগণ যমুনার তীরবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত দুর্ব্বাসা ঋষিকে মিষ্টদ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া তাঁহার নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিণী হইলে “তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী হোবাচ সহৈবৈতাভিরেবং বিচার্য্য- ইত্যাদি।—সেই ব্রজস্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বী তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া ( দুর্ব্বাসাকে ) এইরূপ বলিয়াছিলেন—ইত্যাদি।”

শ্রীরাধারই অপর একটী নাম গান্ধর্ব্বী বা গান্ধর্ব্বিকা। “গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্‌গান্ধর্ব্বেতিবিশ্রুতা। রাধেত্যৃক্‌পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥ উজ্জ্বলনীলমণি। রাধা-প্রকরণ। ৩॥—গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে যাঁহাকে গান্ধর্ব্বী ( গান্ধর্ব্বা ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই শ্রীরাধা। ঋক্‌পরিশিষ্টে মাধবের সহিত শ্রীরাধারও প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।” তিনি যে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

শ্রীরাধার এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

### গ। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে হ্লাদিনীর ( হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির ) বৃত্তিবিশেষ। হ্লাদিনীর সারভূত-অবস্থার নামই প্রেম। এই প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। এই সমস্ত হইতেছে প্রেমের গাঢ়ত্বের বিভিন্ন স্তর; এই স্তরগুলি ক্রমশঃ উৎকর্ষময়।

মহাভাব-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—এই মহাভাব হইতেছে “বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ॥ স্থায়িভাব। ১১২॥ —স্বর্গের অমৃতের পক্ষেও বরণীয় এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হইতেছে এই মহাভাবের স্বরূপগত সম্পৎ এবং যাঁহার মধ্যে এই মহাভাব বিরাজিত, তাঁহার মন এবং মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত ইন্দ্রিয়ও মহাভাবের স্বরূপত্ব—অপূর্ব্ব মাধুর্য্য—প্রাপ্ত হয়।”

এই মহাভাব আবার “মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ॥ উজ্জ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব। ১১১॥—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও অতি দুর্ল্লভ।”

এই মহাভাবের আবার চারিটী স্তর আছে—রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন এবং মাদন। ইহারা গাঢ়ত্বে ক্রমশঃ

উৎকর্ষময়। মাদনই হইতেছে প্রেমের ঘনীভূত-তম স্তর। এই মাদনাখ্য-মহাভাবকে "স্বয়ংপ্রেমও" বলা হয়। স্বয়ংভগবানের মধ্যে যেমন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, মাদনাখ্য-মহাভাবেও প্রেমের সমস্ত বৈচিত্রী বিরাজিত। মাদন হইতেছে "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী"। ইহা শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোনও গোপসুন্দরীতেই নাই। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়।

"সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥
---উজ্জ্বলনীলমণি। স্থায়িভাব। ১৫৫॥"

ইহা হইতে জানা গেল—**প্রেমোৎকর্ষে** শ্রীরাধা হইতেছেন গোপীগণের মধ্যে **সর্ব্বশ্রেষ্ঠা**।

শ্রীরাধাব্যতীত অন্য গোপীগণের মধ্যে মাদন না থাকিলেও মহাভাব আছে; তাঁহারা সকলেই মহাভাববতী। কিন্তু মহিষীগণের পক্ষে এই মহাভাব যখন "অতি দুর্ল্লভ", তখন সহজেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার কথা তো দূরে, কৃষ্ণকান্তা অন্য গোপীগণও প্রেমোৎকর্ষে মহিষীগণ অপেক্ষা এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা।

শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমঘন-বিগ্রহা; তাঁহার বিগ্রহের স্বরূপ হইতেছে ঘনীভূত প্রেম। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা।

"হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৫৯-৬০॥"

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে বলা হইয়াছে—সমস্ত কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রেষ্ঠা; এতদুভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধা হইতেছেন সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা—চন্দ্রাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠা; যেহেতু, শ্রীরাধা হইতেছেন "মহাভাব-স্বরূপা" এবং "গুণে অতি বরীয়সী।"

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥
—উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ।২। ধৃত বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রবচন॥"

আরও বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৬১॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২৪॥"

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার দেহ ঘনীভূত-প্রেমদ্বারাই গঠিত। আবার, তাঁহার মধ্যে যে মহাভাবের চরমতম—গাঢ়তম—বিকাশ মাদন অবস্থিত, সেই মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা তাঁহার দেহ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভাবিত—বিশেষরূপে ভাবিত, পরিষিঞ্চিত। কবিরাজেরা পানের রস বা ঘৃতকমলের রসে বটীকার ভাবনা দিয়া থাকেন। যখন পানের বা ঘৃতকমলের রস বটীকার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, প্রতি অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করে, তখনই বলা হয়—ঐ রসে বটীকা ভাবিত হইয়াছে। শ্রীরাধার দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই মাদনাখ্য-মহাভাবের রসে ঐভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়া আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মহাভাবের ধর্ম্ম হইতেছে এই যে, ইহা "স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ—মন এবং মনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের স্বরূপতা প্রাপ্ত করায়।" মহাভাবের চরমতম বিকাশ মাদনে মহাভাবের এই

স্বরূপগত ধর্ম্মটীরও চরমতম বিকাশ। এই মাদন শ্রীরাধার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়কে মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া শ্রীরাধাকেও মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপতা দান করিয়াছে। তাই শ্রীরাধা হইতেছেন—**মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা**। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের মুখ্য হেতু।

## ঘ। শ্রীরাধা গুণৈরতিবরীয়সী

প্রেমবান্ বা প্রেমবতীদিগের প্রধান বা একমাত্র গুণই হইতেছে প্রেম। এই প্রেমই নানা বৈচিত্রী ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকে। প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রীই হইতেছে গুণেরও বিবিধ বৈচিত্রী—বিবিধ গুণ। যাঁহার মধ্যে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, প্রেমোদ্ভূত গুণেরও তাঁহার মধ্যেই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ থাকিবে, তিনিই গুণে হইবেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার মধ্যে যখন প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন—স্বয়ংপ্রেম মাদন বিরাজিত, তখন তিনি যে গুণে সর্ব্বাপেক্ষা বরীয়সী বা শ্রেষ্ঠা হইবেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।"

কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের একমাত্র লক্ষ্যই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান, তাঁহার সেবা, কৃষ্ণবাঞ্ছা-পরিপূরণ। শ্রীরাধাতেই এই সেবা-বাসনার—যাহার অপর নামই হইতেছে প্রেম, সেই সেবাবাসনার—চরমতম বিকাশ।

"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭৫॥"

এই প্রেম হইতেই তাঁহার বিবিধ গুণের বিকাশ। এই মাদনাখ্য-প্রেমের প্রভাবেই

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥ শ্রীচৈ. চ ১।৪।৭১॥"

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রও বলিয়াছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র-শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে ঃ—

"দেবী কহি—দ্যোতমানা পরম সুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে॥ অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥

কিম্বা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। 'সর্ব্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭২-৮২ ॥"

শ্রীরাধা যে "সর্ব্বপালিকা", পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডও তাহা বলিয়াছেন।

"বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভুত্যৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ ॥
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৫০।৫১-২ ॥

—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা বিভূতিরূপা চিদাদি-শক্তিদ্বারাও জগতের গোপন (রক্ষণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী ( রক্ষাকরিণী—পালনকর্ত্রী ) বলা হয়।

শ্রীরাধা যে জগতের মাতা, শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রও তাহা বলেন।

"শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণা মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥ ২।৬।৭ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা। পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া এবং শ্রেষ্ঠা।"

নারদ-পঞ্চরাত্র আরও বলেন—

"সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ॥ ২।৬।২৫ ॥

—শ্রীরাধাই মূল-প্রকৃতি এবং ঈশ্বরী এবং জগতের সৃষ্টি-সময়ে যেই মহাবিষ্ণু হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি বিরাট্ এবং মহান্—শ্রীরাধা তাঁহার মাতা।"

মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উদ্ভব এবং শ্রীরাধা হইতে আবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্ত্বতঃ জগন্মাতা বলা যায়।

শ্রীরাধাকে "মূলপ্রকৃতি" বলার হেতু এই। এ-স্থলে "প্রকৃতি"-শব্দের অর্থ—শক্তি। শ্রীরাধাই "মূল শক্তি"। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের "ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি" বলার হেতু এই যে—"ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৪৭॥" ভগবানের ঐশ্বর্য্য-সমূহ তাঁহার বিভূতি এবং তাঁহার স্বরূপগত বিভূতিসমূহ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়। "এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্ ॥ ভগবৎসন্দর্ভ। ৫২ ॥"

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়—

"রাধা-বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ ॥ ২।৩।৬০ ॥

—শ্রীমহাদেব নারদকে বলিতেছেন, যে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূতা, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধার অংশ।" সুতরাং শ্রীরাধাই হইলেন সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

### ঙ। শ্রীরাধা পূর্ণা শক্তি

"স্মরতি চ ॥ ২।৩।৪৫॥"-এই বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থের ২।২২-অনুচ্ছেদে অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী-শ্রুতির একটী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই—"রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ।" ইহার টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"রাধাদ্যা ইতি আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা—আদ্য-শব্দে চন্দ্রাবলীকে বুঝায়।" বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।

—শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা।" সুতরাং উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য অনুসারে শ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্ব্।"—ইত্যাদি ঋক্-পরিশিষ্ট-বাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ ॥ ১।৪।৮৩ ॥"

### চ। শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি এবং সর্ব্বশক্তির অংশিনী

শ্রীরাধা যে মূল-কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি এইরূপঃ—

"রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব নারদ ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূতা। মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে। সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥ ২।৩।৬০-৬৫ ॥

—যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী, তিনি শ্রীরাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূতা সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মী—যিনি ক্ষীরোদশায়ীর পত্নী, তিনি—মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলক্ষ্মী-নামে পরিচিতা (উপেন্দ্রাদির কান্তাশক্তি), তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর অংশভূতা। স্বয়ং মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরের পত্নী (কান্তাশক্তি)। তিনি নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে

সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রী রূপে সরস্বতী। নারদপঞ্চরাত্র। ২।৩।৫৫ ॥) পুরাকালে (অনাদিকালে) হরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—সরস্বতী ও ভারতী। ভারতী ব্রহ্মার পত্নী হয়েন এবং সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হয়েন। স্বয়ংরূপে পরা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) দেবী স্বয়ং রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিত।"

অথর্ব্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়—লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২-অনুচ্ছেদ-ধৃত-বচন।"

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে নারদের প্রতি শ্রীশিবের উক্তিতেও জানা যায়—ত্রিগুণাত্মিকা দুর্গা-প্রভৃতি শক্তিগণ শ্রীরাধারই কলার কোটি কোটি অংশের এক অংশ। "তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥ ৫০।৫৪ ॥" এই সমস্ত উক্তি যে শ্রুতিসম্মত, তাহাও উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে জানা গেল।

শ্রুতিসমর্থিত উল্লিখিত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ হইতে জানা গেল—বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের কান্তাশক্তি, ক্ষীরোদশায়ীর কান্তাশক্তি, উপেন্দ্রাদি-ভগবৎস্বরূপগণের কান্তাশক্তি, ব্রহ্মার কান্তাশক্তি—এই সমস্ত লক্ষ্মীগণ সকলেই শ্রীরাধার অংশভূতা। স্বয়ং শ্রীরাধা পরিপূর্ণতমা শক্তি; তিনিই বৃন্দাবনে রাসেশ্বরী এবং রাসাধিষ্ঠাত্রী। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে—সমস্ত লক্ষ্মীগণ অর্থাৎ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তিগণ, শ্রীমহাদেবের কান্তাশক্তি শ্রীদুর্গাদেবীও, শ্রীরাধারই অংশ; সুতরাং শ্রীরাধাই মূলকান্তাশক্তি এবং সমস্ত কান্তাশক্তির অংশিনী। শ্রীরাধাই মূল-লক্ষ্মী।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ ভগবানের **অনপায়িনী মহাশক্তিরূপা**, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভও তাহাই বলিয়াছেন। "শ্রীভগবতো নিত্যানপায়ি-মহাশক্তিরূপাসু তৎপ্রেয়সীষু"—ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥"

গোবিন্দভাষ্যানুসারে বেদান্তসূত্রও তাহাই বলেন। "কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৪০ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥—শ্রীভগবৎ-প্রেয়সীরূপা পরাশক্তি প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কামাদি (অভিলাষিত-লীলাদি) বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হয়েন।"

বিষ্ণুপুরাণেও এই কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ॥

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমা ॥ ১।৮।১৫ ॥

—পরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন—বিষ্ণুর শ্রী (প্রেয়সী) তাঁহার অনপায়িনী (নিত্যসন্নিহিতা স্বরূপ শক্তিরূপা) ও নিত্যা। তিনি জগন্মাতা। বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা।"

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১।৯।১৪৩॥

—শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে ইনি দেবী, মানুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি মানুষী।"

বিষ্ণুপুরাণ আরও বলিয়াছেন—

"এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥ ১।৯।১৪০ ॥
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১।৯।১৪২ ॥

—দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমন রূপে তাঁহার সহায়কারিণী হয়েন। রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণরূপত্বে রুক্মিণী ; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী।"

শ্রীরাধা মূল-কান্তাশক্তি বলিয়া তিনি মূল-ভগবৎস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-বিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই রুক্মিণী-আদি মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে বিহার (দেবলীলা) করেন, শ্রীরাধা তখন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে (দেবীরূপে) তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হয়েন।

পদ্মপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশিব পার্ব্বতীর নিকটে বলিয়াছেন—শ্রীরাধা

"শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥

*　　*　　*　　*

চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যনিবাসিনী ॥ বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে।
বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা ॥ কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।
—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ॥ ৪৬।৩৬-৯ ॥

—এই শ্রীরাধিকাই শিবকুণ্ডে শিবানন্দা, দেহিকাতটে নন্দিনী, দ্বারকায় রুক্মিণী, এই বৃন্দাবনে রাধা ; * * চন্দ্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী এবং পুরুষোত্তমে বিমলা-নামে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া এই দেবী শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন।"

পদ্মপুরাণের অনুরূপ উক্তি যে স্কন্দপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণেও আছে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী তাহাও বলিয়াছেন। "এবং স্কান্দে—বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিণী দ্বারবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি। তথা মাৎস্যেঽপি ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৮৯-অনুচ্ছেদধৃত প্রমাণ।"

এই সমস্ত প্রমাণ অনুসারেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ-সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ—বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ ॥
আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ১।৪।৬৩-৬৮ ॥"

বৈকুণ্ঠের ভগবৎ-স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-বিলাসরূপ অংশ। তাঁহাদের কান্তাশক্তি-লক্ষ্মীগণও শ্রীরাধার বৈভব-বিলাসরূপা। দ্বারকার বাসুদেব ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ; তাঁহার কান্তাশক্তি মহিষীগণও শ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপা। আর ব্রজের গোপীগণ ও শ্রীরাধারই কায়ব্যূহরূপা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে-ধামে যে-রূপে লীলা করেন, মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধাও তদনুরূপ প্রকাশে সেই ধামে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন।

ভগবৎ-প্রেয়সীগণ সকলেই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীরাধা তাঁহাদের অংশিনী হওয়াতে স্বরূপশক্তির সমস্ত মূর্ত্তবিগ্রহের অংশিনী হইলেন শ্রীরাধা। তিনিই স্বরূপ-শক্তির মূল মূর্ত্তবিগ্রহ।

আবার, **বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অংশিনীও শ্রীরাধা**। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

পদ্মপুরাণ বলেন—

"বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ ॥ অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূত্যৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ।
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ —পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥ ৫০।৫১-৫২ ॥

—মহাদেব নারদকে বলিতেছেন—কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকা নিজের বহিরঙ্গ-অংশরূপা মায়াদিশক্তিদ্বারা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বিভূতিরূপা চিদাদিশক্তিদ্বারাও জগৎ-প্রপঞ্চের গোপন ( রক্ষণ ) করেন বলিয়া তাঁহাকে গোপী ( রক্ষাকারিণী ) বলা হয়।"

এ-স্থলে মায়া-শক্তিকে শ্রীরাধার বহিরঙ্গ অংশ বলা হইল। মায়া শ্রীরাধার কিরূপ বহিরঙ্গ অংশ, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহা জানা যায়।

শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্প কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শুষ্ক চর্ম্ম ( সাপের খোলস ) সর্পের যেরূপ অংশ ( বহিরঙ্গ অংশ ), জড় মায়াও স্বরূপ-শক্তির সেইরূপ বহিরঙ্গ-অংশ বা বিভূতি।

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই ( ১০।৮৭।৩৮ )-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থা তদ্বিভূতিরেব যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়েখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।—ইতি সা অংশভূতা তয়া স্বস্বরূপত্বেন অনভিমন্যমানা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ত্যক্তা ভবতি সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অহিরিব ত্বচম্। অহির্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যং স্বস্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাসি যত আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ।—

**মর্ম্মার্থ**। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—মায়াশক্তি হইতেছে তোমার স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতে উদ্ভূতা—সুতরাং স্বরূপশক্তিরই বিভূতি। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদেও কথিত হইয়াছে যে—'যদ্দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত এবং জগতিস্থ জীবসকল সকলেই দেহাভিমানী, সেই অখিলেশ্বরী মহামায়া ( বহিরঙ্গা মায়া )

হইতেছে ইহার ( স্বরূপ-শক্তির ) আবরিকা শক্তি।' এই প্রমাণ অনুসারে, সেই বহিরঙ্গা মায়া স্বরূপশক্তিরই অংশভূতা ; কিন্তু স্বরূপশক্তি তাহাকে নিজের স্বরূপভূত বলিয়া অঙ্গীকার করে না ; স্বরূপশক্তি নিজেই তাহাকে পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে ; এজন্য তাহাকে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগণ দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করিয়াছেন ( মূল শ্লোকে )'—অহিরিব ত্বচম্।' অহি বা সর্প যেমন কঞ্চুক-নামক স্বীয় শুষ্ক ত্বক্‌কে নিজেই পৃথক্ করিয়া পরিত্যাগ করে, এবং এই পরিত্যক্ত ত্বক্‌কে আর নিজের স্বরূপভূত ( অঙ্গীভূত ) বলিয়া স্বীকার করে না, তদ্রূপ তুমিও ( শ্রীকৃষ্ণও ) নিত্য-প্রাপ্তৈশ্বর্য্য বলিয়া স্বরূপ-শক্তি কর্তৃক পরিত্যক্তা সেই বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকে তোমার স্বরূপভূত বলিয়া অঙ্গীকার কর না।"

এই টীকায় প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা গেল—বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই বহিরঙ্গ অংশ, সুতরাং বহিরঙ্গা মায়ার অংশিনী হইলেন স্বরূপ-শক্তি। শ্রীরাধা স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ এবং স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া শ্রীরাধাও হইতেছেন—বহিরঙ্গা মায়ার অংশিনী। মায়া তাঁহার বহিরঙ্গ অংশ, সর্পকর্তৃক পরিত্যক্ত কঞ্চুক বা শুষ্ক খোলস যেমন সর্পের বহিরঙ্গ অংশ, তদ্রূপ। কঞ্চুকের সহিত যেমন সর্পের স্পর্শ হয় না, তদ্রূপ বহিরঙ্গা মায়ার সহিতও শ্রীরাধার স্পর্শ হইতে পারে না।

শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তির অংশিনী, পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে পরিষ্কার ভাবেই তাহা জানা যায়।

"তত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বাসু শক্তির্বিদ্যাত্মিকাপরা। পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং পরম্॥
কলয়াশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্দ্রানাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কর্হিচিৎ॥
ইচ্ছাশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রামিত্যেবং মনীষা মে প্রবর্ত্ততে॥
মায়াবিভূতয়োঽচিন্ত্যাস্তন্মায়ার্ভকমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণোস্তাঃ সর্ব্বাস্তে কলাঃ কলাঃ॥৪০।৫৩-৫৬॥

—শ্রীরাধার প্রতি নারদের উক্তিঃ—বিশুদ্ধসত্ত্বসমূহের মধ্যে তুমিই তত্ত্ব ( হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদ্‌রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বের মূল—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী ), তুমি পরাশক্তিরূপা, পরাবিদ্যাত্মিকা। তুমিই বিষ্ণুসম্বন্ধী পরমানন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবগণ-দুর্গমে! তোমার বিভব প্রত্যেক অংশেই আশ্চর্য্য। তুমি কখনও যোগীন্দ্রগণের ধ্যানপথ স্পর্শও কর না। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি তোমারই অংশ মাত্র। তুমিই সর্ব্বশক্তির ঈশ্বরী ( তবেশিতুঃ )। অর্ভকমায়াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি শ্রীযশোদার অর্ভক—বালক—রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ) ভগবান্ মহাবিষ্ণুর ( পরব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর স্বয়ংভগবানের ) যে সকল মায়াবিভূতি আছে, সে সকল তোমারই অংশ-স্বরূপ।"

শ্রীরাধা যে সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী—অংশিনী, মায়াবিভূতিরও অংশিনী, তাহাই এই নারদ-বাক্য হইতে জানা গেল।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়াছেন। "পরমানন্দরূপে তস্মিন্ গুণাদিসম্পল্লক্ষণানন্তশক্তিবৃত্তিকা স্বরূপ-শক্তি দ্বিধা বিরাজতে। তদন্তরেঽনভিব্যক্তনিজমূর্ত্তিত্বেন তদ্বহিরপ্যভিব্যক্তলক্ষ্ম্যাখ্যমূর্ত্তিত্বেন। ইয়ং চ মূর্ত্তিমতী সতী সর্ব্ব-গুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী ভবতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১২০॥ —যে স্বরূপ-শক্তির গুণাদি-সম্পদ্‌রূপা অনন্ত-শক্তিবৃত্তি আছে,

সেই শক্তি পরমান্দরূপ শ্রীভগবানে দুইরূপে বিরাজিত—তাঁহার মধ্যে স্বীয় অনভিব্যক্তমূর্ত্তিতে ( অর্থাৎ অমূর্ত্ত শক্তিরূপে )। আর বাহিরে, লক্ষ্মীনাম্নী মূর্ত্তি অভিব্যক্ত করিয়া। এই স্বরূপ-শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বসম্পাদের অধিষ্ঠাত্রী হয়েন।"

এইরূপে জানা গেল—শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, স্বরূপশক্তির এবং স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহের ও সম্পৎ-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী, মূল-কান্তাশক্তি এবং সর্ব্বশক্তির অংশিনী। সুতরাং তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা—পরাঠাকুরাণী।

## ছ। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী, সমস্ত-ভগবদ্ধামেশ্বরী

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড শ্রীরাধাকে "বৃন্দাবনেশ্বরী" বলিয়াছেন। "বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা ॥৩৯।১০॥ বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ॥৪৬।১৭॥" শ্রীরাধার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দান করিয়াছেন। "বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রসীদতা ॥ কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪৬।৩৮-৩৯ ॥"

বেদ-পুরাণের প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বে ( ১।১।৯৯-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে যে, বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধাম বৃন্দাবনেরই প্রকাশ বা অংশ। সুতরাং বৃন্দাবনই সমস্ত ভগবদ্ধামের অংশী। যিনি অংশীর ঈশ্বরী, তিনি সমস্ত অংশেরও ঈশ্বরী। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া তিনি যে সমস্ত ভগবদ্ধামেরও মূল-ঈশ্বরী, তাহাই সূচিত হইতেছে। এই কারণেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

## জ। শ্রীরাধা রাসেশ্বরী, রাসাধিষ্ঠাত্রী

পূর্ব্বোদ্ধৃত ( ১।১।১৪৬-চ-অনুচ্ছেদে ) নারদপঞ্চরাত্র-শ্লোকে শ্রীরাধাকে "রাসেশ্বরী" এবং "রাসাধিষ্ঠাত্রী" বলা হইয়াছে।

"রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥২।৩।৬৫॥"

পূর্ব্বে ( ১।১।১৩৯-ক—অনুচ্ছেদে ) ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাসলীলা হইতেছে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি। রাস হইতেছে পরম-রসকদম্বময়, ইহাতে শান্ত-দাস্যাদি পাঁচটী মুখ্যরসের এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সাতটী গৌণরসের—এই সমগ্র দ্বাদশটী রসের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনব্যতীত প্রেমের অপর কোনও পর্য্যায়ই সমগ্র রসকে যুগপৎ অভিব্যক্ত করিতে পারে না। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়, শ্রীরাধাই মাদন-ঘন-বিগ্রহা। তাই রাসস্থলীতে শ্রীরাধার উপস্থিতি ব্যতীত রাসলীলা সম্ভব হইতে পারে না।

শ্রীরাধাব্যতীত অন্য শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিলেও রাসলীলা সম্ভব হয় না—রাস-নৃত্য সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু রাসলীলার প্রাণবস্তু পরম-রস-কদম্ব উৎসারিত হইতে পারে না। এজন্য রাসস্থলীতে শতকোটি গোপীর উপস্থিতি-সত্ত্বেও একমাত্র শ্রীরাধার অনুপস্থিতি হইলে রাসলীলার বাসনা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এজন্য কবি জয়দেব বলিয়াছেন—শ্রীরাধা হইতেছেন, রাসলীলার বাসনাকে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে শৃঙ্খল-স্বরূপা।

"কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ গীতগোবিন্দ ॥৩।১।২ ॥"

বসন্ত-রাসকালে কোনও এক কারণে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা হঠাৎ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিলেন। শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা হইতেছিল। শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্নসূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল। রাসরসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছে না। কেন এমন হইল? অনুসন্ধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—শ্রীরাধা রাসমণ্ডলীতে নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। "রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥২।৮।৮৫-৬ ॥"

ইহাতেই জানা যায়—রাসলীলাতে শ্রীরাধিকা অপরিহার্য্যা। এজন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী এবং রাসাধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাসেশ্বর বা রাসাধিষ্ঠাতা নহেন, তিনি রাসবিলাসী মাত্র। শ্রীরাধা যে রাসরসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া সন্তরণ করিতে পারেন। কিন্তু শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে অন্য গোপীদের সঙ্গে তিনি রাসলীলা করিতে পারেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। ইহাতেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

অবশ্য অন্য গোপীগণ ব্যতীত একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসলীলা করিতে পারেন না; কেননা, বহুকান্তার মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের নামই রাসনৃত্য। রাসনৃত্যের ব্যপদেশে রাসরস উৎসারিত হয়। রাসনৃত্যাদি লীলার জন্য শ্রীরাধাই বহু গোপীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। সুতরাং যাঁহাদের সহায়তাব্যতীত রাসনৃত্য সম্ভব হইতে পারে না, সেই গোপীগণও তত্ত্বতঃ শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন। বহুকান্তার সহিত মণ্ডলীবন্ধনে যে নৃত্য, তাহা রাসনৃত্য মাত্র; কিন্তু এরূপ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যমাত্রকেই রাসলীলা বলে না। এরূপ রাসনৃত্যেতে যদি পরম-রসকদম্বময় রাসরস উৎসারিত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে রাসলীলা বলা হয়। এই রাসলীলা শ্রীরাধাব্যতীত হইতে পারে না, তাহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

### ঝ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিয়াছেন—

"দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী ॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥
সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণো প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম ॥ ৫০।৫৩-৫৫॥

—দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীস্বরূপা ; তিনি কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী ; এজন্য মনীষিগণ তাঁহাকে "হ্লাদিনী" ( আনন্দদায়িনী ) বলেন। ( কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১২০॥)। ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ তাঁহারই কলার কোটি-কোটি অংশের এক অংশ। তিনি (শ্রীরাধা) কিন্তু মহালক্ষ্মী, আর শ্রীকৃষ্ণ—সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। হে মুনিসত্তম! ইঁহাদের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই।"

উক্ত পুরাণে অন্যত্রও দেখা যায়—শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—

"অহঞ্চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥
অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥
অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥

—পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ॥৪৪।৪৪-৪৬॥

—শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা-দেবী। নিত্য কাম-কলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ ; আমি সনাতনী রমণী। আমিই ললিতাদেবী এবং আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! সত্য সত্য বলিতেছি—আমাতে এবং শ্রীকৃষ্ণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তাঁহারা একাত্মা, তত্ত্বতঃ একই স্বরূপ। তাঁহাদের এক-স্বরূপত্বের কথা শ্রীশিবও নারদের নিকটে নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বহুনা কিং মুনিশ্রেষ্ঠ বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন। চিদচিল্লক্ষণং সর্ব্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ॥
ইত্থং সর্ব্বং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ। ন শক্যতে ময়া বক্তুং বর্ষকোটিশতৈরপি॥

—পদ্মপুরাণ-পাতাল-খণ্ড ॥ ৫০।৫৭-৫৮ ॥

—হে মুনিবর! অধিক আর কি বলিব? তাঁহারা (রাধাকৃষ্ণ) ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। এই চিদচিল্লক্ষণ (চিজ্জড়মিশ্রিত) সমস্ত জগৎই রাধাকৃষ্ণময়। হে নারদ! এই প্রকারে, সমস্তকেই তাঁহাদেরই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি শতকোটি বৎসরেও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নই।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৮৯-অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এক-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥ প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽহং ব্রহ্ম চিৎপরঃ॥ ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে। তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায়

দেবতাক্রুহামিত্যাদি। সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততোঽপি পরত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ।---তদ্রূপ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—'আমি নিশ্চয়ই সত্ত্ব, তত্ত্ব, পরত্ব এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ। আমার বল্লভা সেই রাধিকাও ত্রিতত্ত্বরূপিণী। আমি প্রকৃতির অতীত ( মায়াতীত ), আমার শক্তিরূপিণী শ্রীরাধাও প্রকৃতির অতীত। সাত্ত্বিকরূপে ( বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকরূপে ) অবস্থিত আমি চিৎপর পূর্ণব্রহ্ম। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সম্যক্ প্রার্থিত হইয়া দেবশত্রু অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত তোমার সহিত এবং শ্রীরাধার সহিত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি। ইত্যাদি।' এ-স্থলে সত্ত্ব—কার্য্যত্ব, তত্ত্ব—কারণত্ব, তদুভয় হইতেও পরত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব, এই যে তিনটী তত্ত্ব, তাহা আমিই—ইহাই অর্থ ( ইহা হইতেছে—'সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল"—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ। কার্য্যও তিনি, কারণও তিনি এবং কার্য্য-কারণের অতীত যে পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব, তাহাও তিনি)।"

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধাও তত্ত্বত্রয়াত্মিকা, সুতরাং তাঁহারা যে অভিন্ন, একস্বরূপ—তাহাই এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতে জানা গেল।

এক স্বরূপ হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই দুই রূপে বিরাজিত, নারদপঞ্চরাত্র হইতে তাহা জানা যায়।

"দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ ॥২।৩।২১॥
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥
২।৩।২৪-২৫ ॥

—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে ( অনাদিকালে ) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক ভাগ স্ত্রী হইল, ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং বিভু পুরুষরূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ ( অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট ) এবং নির্গুণ ( প্রাকৃত-গুণহীন )। তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিতে উদ্যত হইলেন।"

নারদপঞ্চরাত্রে আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত।

"যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা সা নির্লিপ্তা প্রকৃতে পরা ॥২।৩।৫১॥"

একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—

"রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥১।৪।৮৩-৮৫॥"

এ-স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তাত্ত্বিক একাত্মতার হেতুর কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—

শ্রীরাধা হইতেছেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—স্বরূপশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি। মৃগমদের গন্ধ যেমন তাহার স্বাভাবিকী শক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি এবং স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া মৃগমদের গন্ধকে যেমন মৃগমদ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং অগ্নির দাহিকাশক্তিকেও যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি শ্রীরাধাকেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পরব্রহ্ম হইতেছেন—একটী বস্তু ; সেই বস্তুটী হইতেছে শক্তিমৎ আনন্দ। শক্তি ও শক্তিমান্—এই উভয়ে মিলিয়াই যখন একটী বস্তু, তখন তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলা যায় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণও তদ্রূপ একই বস্তু, একই অভিন্ন তত্ত্ব। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের "চিদচিল্লক্ষণং সর্ব্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ। ইত্থং সর্ব্বং তয়োরেব বিভূতিং বিদ্ধি নারদ ॥"—বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

তথাপি রসস্বরূপ পরব্রহ্ম লীলারস আস্বাদন করেন বলিয়া এবং একাকী লীলা হয় না বলিয়া অনাদিকাল হইতেই একেই বহু হইয়া বিরাজিত। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ইত্যাদি শ্রুতি ॥"

এই বহুর মূল আবার দুই—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীরাধা। উভয়ে এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিরাজিত। এই দুইই আবার বহু হইয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রূপে এবং শ্রীরাধা বিরাজিত—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত কান্তাশক্তিরূপে। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

### ঞ। শ্রীরাধার স্বরূপ-তত্ত্ব

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা কি কেবলই শক্তি ? এবং শ্রীকৃষ্ণও কি কেবলই শক্তিমান্ ? অর্থাৎ শ্রীরাধাতে শক্তিব্যতীত কি শক্তিমান্ আনন্দ মোটেই নাই ? এবং শ্রীকৃষ্ণে কি শক্তিমান্ আনন্দব্যতীত শক্তি মোটেই নাই ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তো দেখা যায়—শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিচ্ছিন্না নহে—সুতরাং ব্রহ্ম যে শক্তিমৎ-আনন্দরূপ একটী মাত্র বস্তু, তাহাও বলা যায় না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবলই আনন্দ, তাঁহাতে যে শক্তি মোটেই নাই, তাহা নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তিনি সৃষ্টি-আদিলীলা, রাসাদি-লীলা, কিরূপে নির্ব্বাহ করেন ? তাঁহাতেও শক্তি আছে ; তবে তাহা হইতেছে অমূর্ত্ত-শক্তি।

আর, শ্রীরাধা যে কেবলই শক্তি, তাঁহাতে যে শক্তিমৎ-আনন্দ মোটেই নাই, তাহাও নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে নারদপঞ্চরাত্র তাঁহাকে "ব্রহ্মস্বরূপা" বলিতেন না এবং তিনি নিজেও নারদের নিকটে বলিতেন না—তিনিই "পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।" কেননা, "ব্রহ্মস্বরূপা" হইতে হইলেও "আনন্দস্বরূপা" হইতে হয়, যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন "আনন্দস্বরূপ" এবং "কৃষ্ণবিগ্রহা" হইতে হইলেও "আনন্দস্বরূপা" হইতে হয় ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।" ইহা হইতে জানা যায়—পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেও শক্তি আছে এবং পূর্ণশক্তি শ্রীরাধিকাতেও শক্তিমৎ-আনন্দ আছে। শক্তি যেমন একটী তত্ত্ব, শক্তিমান্‌ও তেমনি একটী তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ ॥"—ইত্যাদি ১১।২২।৭-শ্লোকে

তত্ত্বসমূহের পরস্পরে অনুপ্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ অনুপ্রবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত প্রমাণবলে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। "প্রথমং তাবৎ সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৪॥" এস্থলে যদিও পরমাত্মা ও জীবশক্তির পরস্পরে অনুপ্রবেশের কথাই বলা হইয়াছে এবং এইরূপ পরস্পরানুপ্রবেশ-বিবক্ষাতেই যে কোনও কোনও স্থলে জীবব্রহ্মের ঐক্যের কথা বলা হয়, তাহাই বলা হইয়াছে, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরে অনুপ্রবেশ যে একটা সাধারণ ব্যাপার, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়; শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যত্বের হেতুও ইহাই। এইরূপে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অনুপ্রবেশবশতঃই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেও শক্তি থাকে এবং মূর্ত্তশক্তি শ্রীরাধাতেও শক্তিমৎ-আনন্দ থাকে। এবং এই কারণেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের একস্বরূপত্ব অক্ষুণ্ণ থাকাও সম্ভব হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধিকাকে পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তিমান্ বলার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধিকাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা এবং শ্রীকৃষ্ণে শক্তিমত্ত্বাবিকাশের পূর্ণতা। মূর্ত্তশক্তি শ্রীরাধিকাতেও অমূর্ত্তশক্তি বিরাজিত, এই অমূর্ত্ত-স্বরূপশক্তিই শ্রীরাধিকাতে প্রেমাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও অমূর্ত্ত-শক্তি পূর্ণতমরূপে অবস্থিত; কিন্তু এই অমূর্ত্ত-স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকাতে প্রেমরূপে মাদনাখ্যমহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণে তাহা করে নাই। শ্রীরাধিকাতে শক্তিবিকাশের পূর্ণতা—একথা বলার ইহাও একটী হেতু।

## ট। প্রেমে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব

পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীরাধা সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী, মূল-লক্ষ্মী, নিখিল-ভগবৎকান্তাশক্তির অংশিনী এয়ং কৃষ্ণাভিন্ন-স্বরূপা। ইহাদ্বারা শ্রীরাধার তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।

কেবল তাত্ত্বিক বিচারে নহে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেও শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর মাদনের একমাত্র অধিকারিণীরূপে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়্যছে।

প্রেমবিষয়ে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটী প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়সীর সহিত লীলা করিতেছেন। তথাপি পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড বলিতেছেন—"গোপ্যৈকয়া বৃতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা॥৪৬।৪৬॥—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একজন মাত্র গোপীর ( শ্রীরাধার ) সঙ্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।" এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধাপ্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সূচিত হইতেছে; তাঁহার প্রেমোৎকর্ষের প্রভাবে একমাত্র শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই যে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাতিশয্য, লীলারস-আস্বাদনের পরমতম প্রাচুর্য্য, তাহাই সূচিত হইতেছে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অসংখ্য গোপীর সঙ্গে ক্রীড়াও একা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়াই; যেহেতু, শ্রীরাধাই অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদির সাফল্যেই যেমন পরতত্ত্ব-বস্তুর লীলার সাফল্য, যেহেতু অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ

স্বয়ংরূপেরই অংশ ; তদ্রূপ, অনন্ত গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফল্য ; যেহেতু, গোপীগণ শ্রীরাধারই অংশ। তথাপি কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত কেবল গোপীগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদিনী লীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। বসন্তরাসের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই তাহা দেখান হইয়াছে। মুখ্যা লীলা হইতেছে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ; গোপীগণ তাহার সহায়কারিণী মাত্র। তাঁহারা রসের উপকরণ মাত্র।

"রাধাসহ ক্রীড়ারসবৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭৭-৭৮॥"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, ১৮৯-অনুচ্ছেদে, যামল হইতেও একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রেমবিষয়ে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন।

"ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥"

ইহাও পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-শ্লোকের অনুরূপই।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১০৯-অনুচ্ছেদেও আদিপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরাধার প্রেমাধিক্য দেখাইয়াছেন।

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুনঃ।
তত্রাপি গোপিকা পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥ আদিপুরাণ ॥

—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে পার্থ! ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা ; পৃথিবীর মধ্যে আবার বৃন্দাবন ধন্য ; বৃন্দাবনেও গোপীগণ ধন্যা ; গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধা ধন্যা।"

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্য হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া।

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

—শ্রীরাধা বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও (শ্রীরাধাকুণ্ডও) তাঁহার সেই রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া।"

ইহার পরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতএব তস্যা এব প্রেমাধিক্যং বর্ণিতমাগ্নেয়ে। বাসনাভাষ্যোদ্ধৃত-বচনম্—গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবম্। হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা ॥ রাধা তদ্ভাব-সংলীনা বাসনায়া বিরামিতা ॥ ইতি। নবমাবস্থাপ্রাপ্তত্বেন প্রশ্নাদি-বাসনায়া বিরামিতা তস্যামসমর্থেত্যর্থঃ। —অগ্নিপুরাণে শ্রীরাধিকারই প্রেমাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। বাসনাভাষ্যোদ্ধৃত অগ্নিপুরাণ-বচন এই—'সে স্থানে একমাত্র শ্রীরাধা ভিন্ন সমস্ত গোপী ঊষাকালে কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে হরির লীলা-বিহার-সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাবে সংলীন হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরাধা বাসনা হইতে বিরতা হইয়াছিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা নবমীদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশ্নাদি-করার বাসনা হইতে বিরতা হইয়াছিলেন—তিনি প্রশ্নাদি করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন।"

ব্রজবাসীদের সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিন্না ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যান্য গোপীগণ তাঁহার নিকটে মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিহারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পক্ষে তদ্রূপ প্রশ্নাদি করা তো দূরে, প্রশ্নের সঙ্কল্প করার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। যেহেতু, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে নবমীদশা (মূর্চ্ছিতাবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য গোপীগণ নবমীদশা প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রশ্ন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিহ্বলতা শ্রীরাধারই ছিল সর্ব্বাতিশায়িনী। ইহাতেই শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষময় প্রেম সূচিত হইতেছে।

শারদীয়-রাসলীলাতে অন্য গোপীগণকে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেও জানা যায়—শ্রীরাধিকাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির আধিক্য এবং এই প্রীতির আধিক্যের হেতুও হইতেছে শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্য; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ শ্রুতিঃ॥" শ্রীরাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা সর্ব্বাতিশায়িনী বলিয়া তিনি শ্রীরাধাকে নিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, সমগ্র শক্তির, সমগ্র ঐশ্বর্য্যের, সমগ্র মাধুর্য্যের আধার। তিনি পূর্ণতম তত্ত্ব; তথাপি শ্রীরাধার প্রেম তাঁহাকে যেন ক্রীড়নকের মত নৃত্য করাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

> "পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
> না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
> রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানানৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১।৪।১০৬-৮॥"

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে তরঙ্গায়িত এবং উল্লসিত করিতে পারে একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশী। শ্রীরাধা যখন তাঁহার নিকটে থাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এতই বিকশিত হয় যে, তখন তাঁহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়।

> "রাধাসঙ্গে যথা ভাতি তদা মদনমোহনঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ৮।৩২॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহনরূপই শ্রীরাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়িত্বের একটী উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

> "কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
> কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা॥ গোবিন্দলীলামৃত॥ ১১।১২২॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি-স্থান কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রেয়সী কে? একা শ্রীরাধিকা, অন্য কেহ নহে।"

ইহাতেও শ্রীরাধিকার প্রেমাতিশয্য সূচিত হইতেছে।

শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর। অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পায় পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ২৷৮৷১৪২-৪৫ ॥"

## ১৪৭। গোপীতত্ত্ব

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই মহাভাববতী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহারা শ্রীরাধারই প্রকাশ। দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ বটে ; কিন্তু ব্রজগোপীগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা মহাভাববতী, মহিষীগণে বা লক্ষ্মীগণে মহাভাব নাই। মহাভাব-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—ইহা মুকুন্দমহিষীবৃন্দের পক্ষে অতিদুর্ল্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ ॥" লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণই কান্তারসের পাত্র। কান্তারসের অনন্ত-বৈচিত্রী। কান্তারসের অনন্ত-বৈচিত্রীর আস্বাদনেই কান্তারসাস্বাদনের পূর্ণতা। ব্রজের অসংখ্য কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ অসংখ্য-কান্তারস-বৈচিত্রীরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীরাধাই মূল-কান্তাশক্তি। বহু কান্তাব্যতীত কান্তারস-বৈচিত্রীর পরম উল্লাস সম্ভব হয় না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে, শ্রীরাধাই অনাদিকাল হইতে অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা।

"আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তার রসের কারণ ॥
বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ শ্রীচৈ. চ. ১৷৪৷৬৮-৭০॥"

রূপে, গুণে, স্বভাবে, প্রেমে—প্রেম-বৈচিত্রীতে—কোনও দুইজন গোপীই সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহেন। বিভিন্ন গোপীতে রূপ-গুণাদির বিভিন্ন বৈচিত্রী বিকশিত। তাই তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-বিহারাদির বিস্তার-সাধনে সমর্থা। এজন্য তাঁহাদিগকে সখীও বলা হয়।

"প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিণী সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ॥ উজ্জ্বলনীলমণি ॥ সখীপ্রকরণ। ১ ॥

—প্রেম-লীলাবিহারাদির সম্যগ্‌বিস্তারকারিণীকে সখী বলে। সখী হইতেছেন বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটিকাস্বরূপ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একান্ত-বিশ্বাসপাত্রী।"

গোপীগণ নিরুপাধিপ্রেমপরায়ণা, তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখে-দুঃখে তুল্য-সুখদুঃখ-ভাগিনী, বয়স্য-ভাববশতঃ পরস্পরের হৃদয়ও তাঁহারা জানেন, এজন্যও তাঁহাদিগকে সখী বলা হয়। "নিরুপাধি-প্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ। বয়স্যভাবাদন্যোহন্যং হৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥ অলঙ্কার-কৌস্তুভ ॥ ৫৷৬৩ ॥"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কান্তারসাস্বাদিনী লীলাতে সেবার অধিকার—সখীরূপা ব্রজগোপী ব্যতীত—অন্য কোনও ভাবের পরিকরদের নাই।

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৬২-৬৫॥"

তাহার হেতু এই যে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলা হইতেছে মহাভাবাত্মিকা লীলা। একমাত্র ব্রজগোপীদের মধ্যেই মহাভাব আছে, অন্য কাহারও মধ্যে তাহা নাই।

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত করাইয়া এবং তাঁহাদের মধুর-রসাস্বাদিনী লীলার সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াই সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের মিলনের নিমিত্ত তাঁহারা কখনও লালসাবতী নহেন।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটিসুখ পায়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৬৭-৬৮॥"

তাহার হেতু হইতেছে এই যে—শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতাতুল্যা; আর তাঁহার কায়ব্যূহরূপা বলিয়া সখীগণ হইতেছেন সেই কল্পলতার শাখা-প্রশাখা-পত্রপুষ্পসদৃশা। কল্পলতার মূলে রস সিঞ্চিত হইলে তদ্দ্বারা শাখা-প্রশাখাদিও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে।

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥ শ্রীচৈ.চ.২।৮।১৬৯-৭০॥"

শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতও একথাই বলিয়াছেন—

"সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধো র্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ১০।১৬॥

—ব্রজগোপীগণরূপ কুমুদিনীগণের পক্ষে চন্দ্রের তুল্য শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-নাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ-লতিকা-সদৃশী হইতেছেন শ্রীরাধা। আর তাঁহার সখীগণ হইতেছেন সেই প্রেম-লতিকার কিশলয়-পত্র-পুষ্পাদিতুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা সিক্তা এবং উল্লসিতা হইলে তাঁহাদেরও যে নিজ-সেকজনিত সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?"

সখীগণকে শ্রীরাধার স্বতুল্যা বলার হেতু এই—শ্রীরাধা যেমন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ-শক্তি, তাঁহার কায়ব্যূহরূপ অংশ বলিয়া সখীগণও হইতেছেন তেমনি স্বরূপতঃ হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপ-

শক্তি। আবার, শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য যেমন সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও যেমন শ্রীরাধার মধ্যে নাই, তদ্রূপ ব্রজগোপীগণেরও একমাত্র কাম্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও তাঁহাদের নাই। শ্রীরাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ অনুভব করেন; তাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনেই তাঁহাদের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণও যে শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য লালসাবান্, তাহার হেতুও শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনা নহে—শ্রীরাধিকাদির চিত্তবিনোদনই তাঁহার একমাত্র কাম্য। তিনি নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।—আমি বিবিধকার্য্য যাহা কিছু করিয়া থাকি, তৎসমস্তই কেবল আমার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য।" ব্রজে স্বসুখ-বাসনা জিনিসটীরই ঐকান্তিক অভাব। এস্থলে ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি হইতেছে—পারস্পরিকী।

## ১৪৮। সখী ও মঞ্জরী—নিত্যসিদ্ধা গোপী

শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা যে ব্রজগোপীদের কথা বলা হইল, তাঁহারা অনাদিসিদ্ধা। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম কোনওরূপ সাধনাজাত নহে; ইহা তাঁহাদের স্বরূপগত। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা-বিস্তারকারিণী বলিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদের সকলকেই সখী বলা হইলেও সেবার প্রকারভেদে তাঁহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে—সখী ও মঞ্জরী।

যাঁহাদের সেবা শ্রীরাধিকার ন্যায় স্বাতন্ত্র্যময়ী, তাঁহাদিগকে সখী বলা হয়। যেমন, ললিতা, বিশাখা আদি।

আর, যাঁহাদের সেবা আনুগত্যময়ী—ললিতা-বিশাখাদির আনুগত্যময়ী—তাঁহাদিগকে মঞ্জরী বা কিঙ্করী বলা হয়। যেমন শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিষয়ে শ্রীললিতাদির আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্—অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া তাঁহার লীলাতে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহায়তা ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির সহায়তার অপেক্ষা তিনি রাখেন না। লীলাতে মুখ্যভাবে সেবার যেমন প্রয়োজন, সেই সেবার আনুকূল্য-বিধানেরও তেমনি প্রয়োজন। উভয়রূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুরূপ পরিকররূপে তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই মূর্ত্তরূপে বিরাজিত।

## ১৪৯। সাধনসিদ্ধা গোপী

আর এক শ্রেণীর গোপী আছেন, যাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধা গোপী বলা হয়। শাস্ত্রবিহিত সাধনের ফলে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মহাভাব লাভ করিয়া তাঁহারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জরী বা শ্রীরাধার কিঙ্করী।

সাধনসিদ্ধা গোপীদের মধ্যে শ্রুতিচরী এবং ঋষিচরী—এই দুই রকমের মঞ্জরীও আছেন।

**শ্রুতিচরী।** শ্রীমদ্‌ভাগবত, বৃহদ্‌বামনপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডাদি হইতে জানা যায়, শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লুব্ধা হইয়া যথাবিহিত উপায়ে সাধন করিয়া এক প্রকাশে, ব্রজে গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "নিভৃতমরুন্মনোক্ষ"- ইত্যাদি ১০।৮৭।২৩-শ্লোকে তাঁহাদের সাধনার কথা এবং মঞ্জরীদেহ-প্রাপ্তির কথা জানা যায় (পরবর্ত্তী ১।১।১৮৪ ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণও শ্রীরাধারই অংশ এবং স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবারও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রধান-স্বরূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের কান্তাশক্তিরূপে শ্রীনারায়ণের সেবা করেন এবং শ্রুতিগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি-প্রচাররূপ সেবা করেন। এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত সেবা। তথাপি রসিক-শেখর গোপীজনবল্লভের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির প্রবল আকর্ষণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা গোপীভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন করিয়াছিলেন। যেই ভাবে সাধন করিলে গোপীভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায়, শ্রুতিগণ সেই ভাবেই সাধন করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্ট সেবা পাইয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী কিন্তু সেইভাবে সাধন করেন নাই; তাই তিনি তাঁহার অভীষ্ট সেবা লাভ করিতে পারেন নাই। সাধন করিয়াও লক্ষ্মীদেবী যে গোপীজনবল্লভের সেবা পায়েন নাই, শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ।

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।৬০॥

—রাসোৎসব-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হইয়া (তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায়) ব্রজ-সুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসাদ—দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ লোকসমূহের শিরোমণিতুল্য বৈকুণ্ঠে ভূ-লীলা প্রভৃতি পরম-প্রেমবতী এবং পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি বিশিষ্টা যে সকল ভগবৎ-কান্তা আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও পরম-প্রেমযুক্তা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা)—লক্ষ্মীদেবীও লাভ করিতে পারেন নাই।"

শ্রুতিগণ যে তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত ভগবৎ-তত্ত্বকথা-প্রচাররূপ সেবা পরিত্যাগ করিয়া গোপীদেহে গোপী-জনবল্লভের সেবা করিতেছেন, তাহা নহে। নির্দ্ধারিত সেবা ত্যাগ সম্ভব নহে। এক এক স্বরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত সেবা করিতেছেন এবং অপর এক এক স্বরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রজে গোপীজন-বল্লভের সেবা করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদি তাঁহার অভীষ্ট সেবা পাইতেন, তাহা হইলে তিনিও লক্ষ্মীরূপে পূর্ব্ববৎই শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেন এবং অপর এক স্বরূপে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিতেন। ভগবদ্‌বিগ্রহের ন্যায় স্বরূপ-শক্তিরও একাধিক প্রকাশ সম্ভব।

**ঋষিচরী।** পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ড হইতে এবং কৃষ্ণোপনিষদ্‌ হইতেও জানা যায়, ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ কান্তাভাবে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ঋষিচরী গোপী বলে। ঋষিচরী গোপীগণ জীবতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ।

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের ন্যায় প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর লোকও যথাবিহিত উপায়ে ভজন করিয়া ব্রজে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করিতে পারেন। এইরূপ গোপীদেহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদিগকেও সাধনসিদ্ধা গোপী বলা হয়। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ জীবতত্ত্ব।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণও মহাভাববতী। মহাভাব লাভ না করিলে কেহই গোপীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ কান্তাভাবে সেবার অধিকারিণী গোপীগণের গোপীত্বের হেতুই হইল মহাভাব। গুপ্-ধাতু হইতে গোপীশব্দ-নিষ্পন্ন। গুপ্-ধাতুর অর্থ—রক্ষণে। যে রমণী রক্ষা করিতে পারেন, তিনি গোপী। কি রক্ষা করেন ? যাঁহাকে রক্ষা করিলে অরক্ষিত কিছু থাকে না, তাঁহাকে রক্ষা করিতে—সম্যক্‌রূপে স্বীয় বশে রাখিতে—পারিলেই রক্ষণের চরমতম সার্থকতা। পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভকে রক্ষা করিতে—স্ববশে রাখিতে—পারিলে সমস্তই স্ববশে রক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম আবার রসস্বরূপ বলিয়া প্রেমের বা প্রেমভক্তিরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥" মহাভাব হইতেছে—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সান্দ্রতম পর্য্যায়। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের আশ্রয় গোপীদেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভাগবত-শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ (১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। শ্রীচৈ. চ. ২।৮।৬৯॥" মহাভাববতী গোপীদিগের পক্ষেই যখন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ সর্ব্বতোভাবে প্রেমবশীভূত করিয়া রাখা সম্ভব, তখন মহাভাবকেই গোপীত্বের হেতু বলা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলায় কেবল তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অপেক্ষাই রাখেন, জীবশক্তির অপেক্ষা রাখেন না ; জীবশক্তি না হইলেও তাঁহার রসাস্বাদিনী লীলা কোনওরূপে ব্যাহত হয় না। তথাপি জীবশক্তির অংশ সাধনসিদ্ধ ভাগ্যবান্‌দিগকেও যে তিনি স্বীয় পরিকরত্ব দিয়া কৃতার্থ করেন, ইহা কেবল তাঁহার কৃপা।

ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হইতেছে—স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশ হীন এবং সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন, কেবলাপ্রীতি। সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও এতাদৃশ।

## ১৫০। মহিষীদিগের তত্ত্ব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণও স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ (১।১।১০৫-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং তাঁহারাও শ্রীরাধারই অংশ—শ্রীরাধারই প্রকাশ (১।১।১৪৬-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন।

মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিতা ; ইহা ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণপ্রীতির ন্যায় কেবলা-প্রীতি নহে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিতা হইলেও প্রীতিরই—মাধুর্য্যেরই—প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, মহিষীগণ তাহা জানেন ; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি এমনভাবে গাঢ় নহে, যাহাতে তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পায় না। কিন্তু ব্রজগোপীদের কেবলা-প্রীতি এতই গাঢ় যে, তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

মহিষীদিগের কান্তাপ্রীতি সময় সময় আবার স্বসুখ-বাসনার ভঙ্গীও গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কিন্তু কখনও এইরূপ ভঙ্গী গ্রহণ করে না।

ব্রজের মহাভাব মহিষীদিগের পক্ষে "অতি দুর্ল্লভ"—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ব্রজের কান্তাপ্রেম এবং মহিষীদের কান্তাপ্রেম স্বরূপতঃই ভিন্ন রকমের।

## ১৫১। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের তত্ত্ব

বৈকুণ্ঠের অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত কান্তাশক্তিকে সাধারণভাবে লক্ষ্মী বলা হয়। তাঁহাদের তত্ত্বের কথা পূর্ব্বেই ( ১।১।১৪৬-চ-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ এবং পরমা-লক্ষ্মী-স্বরূপা শ্রীরাধারই অংশভূতা। লক্ষ্মীগণের মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্যোমে ( মহাবৈকুণ্ঠে ) বিহার করেন, এই সকল লক্ষ্মীগণও—লক্ষ্মী, সীতা প্রভৃতি তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপের কান্তারূপে—যেমন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের এবং শ্রীসীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের, ইত্যাদি রূপে—সে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন।

পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণ ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান। তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের প্রীতিও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা। দ্বারকায় যেমন প্রীতিরই আধিক্য এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ন্যূনতা, পরব্যোমে তেমনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য এবং প্রীতির বা মাধুর্য্যের ন্যূনতা।

দ্বারকা-মথুরাতেও ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা কেবলা প্রীতির অভাব; পরব্যোমের কথা আর কি বলা যাইবে।

## ১৫২। শ্রীদুর্গাদি-শক্তির তত্ত্ব।

শ্রীদুর্গাদি-কান্তাশক্তিগণও যে শ্রীরাধারই অংশভূতা, তাহা পূর্ব্বেই ( ১।১।১৪৬-চ অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাদেবীর একাধিক স্বরূপের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সকল স্বরূপই মূলকান্তাশক্তির এবং স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধার অংশ।

বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাদের মধ্যে, চতুর্থ আবরণে, এক দুর্গাদেবীর নাম দৃষ্ট হয়। ইনি শুদ্ধা-চিচ্ছক্তি এবং মায়াতীতা। যেহেতু, বৈকুণ্ঠে মায়ার প্রবেশ নাই। এই গুণাতীতা দুর্গাদেবী অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্‌ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূত-শক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৫॥" শ্রুতি-তন্ত্রাদিতে তাঁহার মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃত্বের কথা জানা যায়।

মায়াতীত পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে গুণাতীত শ্রীসদাশিব আছেন। তাঁহার কান্তাশক্তি শ্রীদুর্গাদেবীও শুদ্ধা চিচ্ছক্তি, মায়াতীতা।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদেও এক দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
অস্যা আবরিকা শক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎসর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥"

( "বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।১।২৫-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত-টীকায় ধৃত-নারদপঞ্চরাত্র প্রমাণ। )

এই নারদপঞ্চরাত্র-বচনে যে দুর্গাদেবীর কথা জানা গেল, তিনি হইতেছেন ভগবানের পরমাশক্তি, মহা বিষ্ণুস্বরূপিণী, ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি। ইঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাৎপর দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তি সুলভ হয়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা এবং গোকুলেশ্বরী—গোকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহার আবরিকা শক্তির নাম মহামায়া, যে মহামায়ার প্রভাবে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং সমস্ত জীব দেহাভিমানী হইয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায়—গোকুলেশ্বরী এবং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা এই দুর্গাদেবী হইতেছেন ভগবানের স্বরূপশক্তি, বিশুদ্ধা চিচ্ছক্তি এবং তাঁহার আবরিকা শক্তি হইতেছে—বহিরঙ্গা জড় মায়া। বুঝা যায়, এ-স্থলে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ারই একটি নাম দুর্গা। তাঁহার অংশ হইতেছেন বহিরঙ্গা মায়া।

বায়ুপুরাণের মতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পৃথিব্যাদি সাতটী আবরণের বহির্ভাগেও (প্রকৃতিরূপ অষ্টম আবরণেও ) একটি শিবলোক আছে। এই শিবলোকও মায়াতীত, নিত্য, সুখময়, সত্য। মহাদেব এই শিবলোকেও সপরিকরে বিরাজ করিতেছেন।

"অথ বায়ুপুরাণস্য মতমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্। শ্রীমহাদেবলোকস্তু সপ্তাবরণতো বহিঃ ॥
নিত্যঃ সুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎসেবকোত্তমৈঃ। সমানমহিমশ্রীমৎ-পরিবারগণাবৃতঃ ॥
—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ॥ ১।২।৯৬-৯৭॥"

এই শিবলোকের শ্রীমহাদেবের কান্তাশক্তি শ্রীদুর্গাদেবীও মায়াতীতা।

বৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আরও একটি শিবলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিবলোকের নাম কৈলাস। কুবেরের আরাধনায় বশীভূত হইয়া ঈশান-কোণের দিক্‌পালরূপে পরিকরবর্গের সহিত উমাপতি এই স্থানে বিরাজিত। এই স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত বৈভব সম্যক্‌রূপে প্রকটিত না হইলেও তদপেক্ষা স্বল্পবৈভব প্রকটিত আছে।

"কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্য কৈলাসেঽধিকৃতে গিরৌ ॥
তদ্‌বিদিক্‌পালরূপেণ তদ্‌যোগ্যপরিবারকঃ। বসত্যাবিকৃতস্বল্পবৈভবঃ সন্নুমাপতিঃ ॥
—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ॥ ১।২।৯৩-৯৪ ॥"

এই কৈলাসেশ্বর উমাপতির কান্তাশক্তিও শ্রীদুর্গাদেবীর এক স্বরূপ।

ব্রহ্মসংহিতাতেও এক দুর্গাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি, শ্রীগোবিন্দের ছায়ায় তুল্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই ইনি স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
—ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪৪॥ ব্রহ্মার উক্তি॥"

ইনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি; সুতরাং ইনি গুণময়ী। যেহেতু, মায়িক গুণের সহায়তাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়। ইনি আবরণ-দেবতা মন্ত্রধিষ্ঠাত্রী দুর্গা নহেন; যেহেতু, আবরণ দেবতা দুর্গা হইতেছেন গুণাতীতা। কিন্তু ইনি হইতেছেন—গুণময়ী মায়াশক্তির অংশরূপা। ইনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত্ররক্ষণ-সেবার নিমিত্ত বিরাজিতা এবং চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীরূপা।

ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৫-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—ভগবৎ-পীঠাবরণ-পূজায় গণেশ-দুর্গাদি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্বকসেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক। সে সকল গণেশ-দুর্গাদি মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদি নহেন। কেননা, বৈকুণ্ঠবর্ণন-প্রসঙ্গে, "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত (২।৯।১০)-শ্লোকে বলা হইয়াছে "বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণও নাই।" সুতরাং মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদিও বৈকুণ্ঠে থাকিতে পারেন না। অতএব বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতা গণেশ-দুর্গাদি হইতেছেন মায়াতীত, ভগবানের স্বরূপশক্তিরই প্রকাশবিশেষ। শ্রুতি-তন্ত্রাদিতেও দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রসমূহেও ভগবদ্‌ভক্ত্যাত্মক স্বরূপভূত-শক্তির বৃত্তিবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম দুর্গা। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে কথিত আছে,

"ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা॥

—ভজন (সেবা)-সর্ব্বস্বা ভক্তি হইতেছেন (ভগবানের) প্রকৃতি (শক্তি); তিনি স্বীয় প্রিয়কে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করিতেছেন। পরমাত্মা-শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা সেই ভক্তিকে অত্যন্ত দুঃখেই জানা যায় (অর্থাৎ সহজে জানা যায় না)। এজন্যই অখণ্ডরসবল্লভা সেই ভক্তিকে সাধু-মহাপুরুষগণ 'দুর্গা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।"

(দুর্গা অর্থাৎ দুর্ল্লভা ভক্তি ভগবানের শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিবক্ষায়) গৌতমীয়কল্পেও ভগবানের সহিত দুর্গার অভেদের কথা বলা হইয়াছে। যথা,

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ॥

—যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা; যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ।"

অন্যত্রও দুর্গা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা—হে পরমেশানি! তুমিই ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

বিরাট্‌পুরুষ এবং মহাপুরুষকে যেমন কোনও কোনও স্থলে অভেদরূপে উল্লেখ ও উপাসনা করা হয়, তদ্রূপ অভেদ-বিবক্ষাতেই এ-স্থলে দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের অভেদের কথা বলা হইয়াছে।

যিনি মায়াংশরূপা দুর্গা, তিনি কিন্তু ভগবৎসেবার অধিষ্ঠাত্রী নহেন ; তাঁহার অধীনস্থ এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তিনি মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া চিচ্ছক্ত্যাত্মিকা দুর্গার দাসীর ন্যায় কার্য্য করেন। "সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।" কোনও কোনও গ্রন্থে "ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী"-স্থলে "ন তু সৈবাধিষ্ঠাত্রী"-পাঠ দৃষ্ট হয়। এই পাঠান্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মায়াংশভূতা দুর্গা মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী নহেন ; মন্ত্ররক্ষারূপ সেবাই হইতেছে তাঁহার কার্য্য।

মায়াতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-কথন-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে কথিত হইয়াছে,

"সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গাবিষ্বক্‌সেন-গজাননাঃ। শঙ্খ-পদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥
ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈঋর্তং বারুণং তথা। বায়ব্যাং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ॥

—সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্‌সেন, গণেশ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি—এই সকল লোক হইতেছেন চতুর্থ আবরণ। সপ্তম আবরণে—পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋতে নিঋতি, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে সোম এবং ঈশানকোণে ঈশান—অবস্থিত। পরব্যোম-বৈকুণ্ঠের সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্য যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিত্য, অপ্রাকৃত। এই প্রাকৃত স্বর্গে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই নিত্য নহেন। কেননা, শ্রুতিই বলিয়াছেন—'তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি।' ব্রহ্মার একদিনেই, দৈনন্দিন প্রলয়েই, তাঁহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েন।"

আবরণদেবতারূপে যাঁহারা ভগবদ্ধামে আছেন, তাঁহারা ভগবানের অংশরূপই—সুতরাং নিত্য। ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতাগণের নামভেদকথন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,

"সর্ব্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরঃ হরিঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

—এই দেবদেব গোপবেশধারী শ্রীহরি সর্ব্বত্রই ( নানারূপে ) বিরাজমান। কেবল রূপভেদেই নামভেদ কথিত হয়।"

ভক্তিসন্দর্ভের এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গা, বৈকুণ্ঠের আবরণদেবতা দুর্গা, হইতেছেন স্বরূপশক্ত্যাত্মিকা ; আর, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী, তিনি হইতেছেন মায়াংশভূতা। উভয়ে এক নহেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—স্বীয় আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে মায়াকে নন্দগোকুলে যাইয়া যশোদা হইতে আবির্ভূত হওয়ার আদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
কুমদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥
শ্রীভা. ১০।২।১০-১২ ॥

—মনুষ্যগণ ধূপ, উপহার এবং বলি ( পূজোপকরণ ) দ্বারা সর্ব্বকাম-বরেশ্বরী এবং সর্ব্বকাম-বরপ্রদা তোমার অর্চ্চনা করিবে। নরগণ পৃথিবীতে তোমার—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা-ইত্যাদি নামও রাখিবে এবং তোমার স্থানও ( অধিষ্ঠান-স্থানও ) করিবে।"

এ-স্থলেও এক দুর্গাদেবীর নাম পাওয়া গেল এবং ভদ্রকালী-বিজয়া-আদি তাঁহার আরও কয়েকটী নামের কথাও জানা গেল।

অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগের বৈবশ্বত-মন্বন্তরীয় দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ইনিই যশোদা হইতে কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যশোদার শয্যা হইতে বসুদেব ইঁহাকেই লইয়া গিয়া কংস-কারাগারে দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন। কংস দেবকীর ক্রোড় হইতে নিয়া ইঁহাকেই প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন ইনি আকাশে উত্থিত হইয়া অষ্টভুজধারিণীরূপে কংসকে বলিয়াছিলেন—"কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৪।১৫ ॥—হে মন্দবুদ্ধি! আমি নিহত হইলে তোমার কি লাভ হইবে ? তোমার বিনাশকারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং বহুস্থানে বহুনামে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ শ্রীভা. ১০।৪।১৩ ॥

ইনি কে ? ইঁহার স্বরূপ কি ? এই শ্লোকে পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে—তিনি ছিলেন—ভগবতী মায়াদেবী। কংস ছিলেন ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, ভগবদ্‌বিদ্বেষী। বহির্ম্মুখ ভগবদ্‌বিদ্বেষীদের মোহন বহিরঙ্গা মায়ারই কার্য্য, ইহা অন্তরঙ্গা যোগমায়ার কার্য্য নহে। লীলাসৌকর্য্যার্থ অন্তর্ম্মুখ ভক্তদের মুগ্ধতা সম্পাদন হইতেছে যোগমায়ার কার্য্য। বহিরঙ্গা মায়া গুণময়ী ; তাঁহার উপাসনায় গুণময় কাম্যবস্তু পাওয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকসমূহে এই ভগবতী মায়াদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বকামবরেশ্বরী" এবং "সর্ব্বকামবরপ্রদা" বলিয়া এবং সকাম লোকগণ নানা নামে তাঁহার উপাসনা করিবে বলিয়াও এই মায়াদেবীর গুণময়ত্বের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই দেবীর কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, চণ্ডীতে দেখা যায়—দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"অষ্টাবিংশতিমে যুগে বৈবশ্বত-মন্বন্তরে" তিনি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইবেন।

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভ-সম্ভবা। ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ১১।৪১-৪২ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন এই দেবীর কয়েকটী নাম উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, ভদ্রকালী, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, ভীমাদেবী, ভ্রামরী, চণ্ডিকা, চণ্ডমুণ্ডিকা, মহাকালী, নরায়ণী, শিবা, মহাদেবী, গৌরী, মহামায়া, ঈশ্বরী, কাত্যায়নী প্রভৃতি নাম এবং বহু রূপও উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এই দেবী বরাভয়দায়িনী, অসুর-সংহারিণী এবং ভোগৈশ্বর্য্যদায়িনী।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে—"তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাছ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥ ৫০।৫৪ ॥" এই বাক্যে দুর্গাছ্যা ত্রিগুণাত্মিকাশক্তিকে শ্রীরাধার কলার কোটি-কোটি অংশের এক অংশ বলা হইয়াছে। শ্রীদুর্গাদি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—শ্রীদুর্গাদেবীর অনেক স্বরূপ আছেন। কতকগুলি স্বরূপ নির্গুণ, মায়াতীত। ইঁহারা শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ অংশ, চিৎস্বরূপা। আর কতকগুলি স্বরূপ আছেন, যাঁহারা ত্রিগুণাত্মিকা, গুণময়ী, মায়িকগুণে গুণময়ী। ইঁহারাও শ্রীরাধার বহিরঙ্গ অংশ ; মায়াতীতা নহেন।

শ্রীদুর্গাদেবীর গুণময় স্বরূপসমূহ গুণময় হইলেও মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় মায়িকগুণের বশীভূত নহেন ; পরন্তু মায়িক গুণের নিয়ন্ত্রী। আর, যাঁহাকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়া, ভগবানের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।

ভগবান্ সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল গুণময় স্বরূপে ( অর্থাৎ গুণের নিয়ন্তারূপে ) ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত, তাঁহাদের কান্তাশক্তিগণই গুণময়ী। সুতরাং তাঁহারাও তত্ত্বতঃ ভগবানের কান্তাশক্তি এবং কান্তাশক্তি বলিয়া মূল-কান্তাশক্তি শ্রীরাধারই অংশভূতা। এজন্যই পুরুষবোধিনী শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকাশক্তিঃ।" যাঁহারা গুণাতীতা, তাঁহাদিগকেই সাধারণ ভাবে লক্ষ্মী বলা হয়।

# ষোড়শ-পরিচ্ছেদ

## ( গোপীভাব )

১৫৩। গোপীভাব

গোপীভাব বলিতে গোপী-প্রেমই বুঝায়। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ না জানিলে গোপীদের তত্ত্বও সম্যক্ বুঝা যাইবে না। তাই এ-স্থলে গোপীপ্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কাম-শব্দের তাৎপর্য্যও জানা দরকার।

**কাম ও প্রেম।** কাম এবং প্রেম এই দুইটী শব্দের অর্থই বাসনা—সুখের বাসনা। কিন্তু সুখবাসনার গতি দুই দিকে হইতে পারে—নিজের দিকে এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে। যখন সুখবাসনার গতি হয় নিজের দিকে, তখন তাহাকে বলে কাম এবং যখন ইহার গতি হয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তখন তাহাকে বলে প্রেম। অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য যে বাসনা, তাহার নাম কাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য যে বাসনা, তাহার নাম প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪১॥

লৌহ এবং স্বর্ণ যেমন দুইটী বিভিন্ন বস্তু, এই দুইটী বস্তুর লক্ষণও যেমন বিভিন্ন, তদ্রূপ কাম এবং প্রেমও হইতেছে স্বরূপতঃ দুইটী বিভিন্ন বস্তু।

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪০॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪২॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪৭॥

প্রশ্ন হইতে পারে—বাসনার উৎপত্তি হয় চিত্তে। চিত্তে যে সুখবাসনার উৎপত্তি হয়, দুই দিকে তাহার গতি কিরূপে হইতে পারে? যাহার চিত্তে সুখবাসনার উদয় হয়, তাহার নিজের সুখই হইবে সেই বাসনার তাৎপর্য্য—ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণসুখের জন্য সেই বাসনার গতি কিরূপে হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই। যে শক্তিদ্বারা সুখবাসনা পরিচালিত হয়, তাহার পার্থক্যবশতঃই সুখবাসনার গতিরও পার্থক্য হইয়া থাকে। সুখবাসনা যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় আত্মসুখ-বাসনা বা কাম। আর যখন সুখবাসনা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় কৃষ্ণসুখের বাসনা বা প্রেম। ইহার হেতু এই।

সুখস্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধবশতঃ জীবস্বরূপমাত্রেরই সেই সুখস্বরূপের জন্য একটা চিরন্তনী বাসনা আছে। এই সুখবাসনার চরমতমা পরিতৃপ্তি হইতে পারে—একমাত্র সেই সুখস্বরূপ রসস্বরূপকে পাইলেই। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ শ্রুতিঃ॥" কিন্তু সেই সুখস্বরূপ হইতে অনাদিবহির্ম্মুখ

জীব সেই সুখকে জানেনা বলিয়া মনে করে, প্রাকৃত রূপ-রসাদির আস্বাদনেই তাহার সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইতে পারে। তাই অনাদিকালেই প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর অধিশ্বরী বহিরঙ্গা মায়ার শরণাগত হইয়াছে। ইহা যে সুখ নয়, পরন্তু সুখ-বিরোধী দুঃখময় বস্তু, যেহেতু ইহা চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু, আর সুখ হইতেছে চিদ্‌বস্তু, ভূমা বস্তু, "ভূমৈব সুখম্"—ভোগ করাইয়া তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে মায়া দেবী অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকে অঙ্গীকার করিয়া, স্বীয়প্রভাবে তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া, প্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগ করাইবার জন্য তাহার চিত্তবৃত্তিকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই পরিচালিত করেন। এই মায়াদেবীর পরিচালনাধীনে বহির্ম্মুখ জীব যেন অবশের মতনই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ গীতা। ৩।৫॥" মায়ার বশীভূত হইয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়ার প্রভাবে যেন যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা।১৮।৬১॥

এইরূপে জানা গেল—বহিরঙ্গা মায়াই হইতেছে অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধজীবের চিত্তবৃত্তির পরিচালিকা। বহির্ম্মুখ জীবকে প্রাকৃত তথাকথিত সুখ ভোগ করাইবার জন্যই মায়াদেবী তাহার চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহার সুখবাসনাকে মায়াদেবী তাহার অর্থাৎ জীবের নিজের দিকেই পরিচালিত করেন। তাই তাহার সেই সুখবাসনার তাৎপর্য্য হয় আত্মসুখে। ইহাই কাম। বহিরঙ্গা মায়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করেন—সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে বাহিরের দিকে।

আর, চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তাহার স্বাভাবিকী গতিই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে; শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা—প্রীতিবিধানই—হইতেছে তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। আবার, এই স্বরূপ-শক্তিই মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে পারে (১।১।২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভজন-সাধনের ফলে এই স্বরূপ-শক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে থাকে। মায়া এবং মায়ার প্রভাব যখন সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয়, তখন সাধকের চিত্ত স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া স্বরূপ-শক্তির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়—অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। তখন সাধকের চিত্তবৃত্তির পরিচালিকা হয়—স্বরূপ-শক্তি; মায়া-শক্তি তখন তাঁহার চিত্তে থাকে না। সাধকের চিত্তবৃত্তিকে এবং বুদ্ধিকেও তখন স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের দিকেই চালিত করিয়া থাকে। তখন সাধকের চিত্তে যে সুখবাসনার উদয় হয়, স্বরূপ-শক্তি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের দিকেই চালিত করিয়া থাকে, তখন তাহা পর্য্যবসিত হয়—কৃষ্ণসুখের বাসনায়। এই কৃষ্ণসুখের বাসনার নামই প্রেম। মায়াশক্তির প্রভাব থাকে না বলিয়া সাধকের চিত্তে তখন আর আত্মসুখ-বাসনা জন্মিতে পারে না। একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন।

"ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ শ্রীভা. ১০।২২।২৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাঁহাদের বুদ্ধি আমাতে আবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বাসনা আত্মসুখের জন্য

হয় না। যে ধানকে অধিকরূপে ভাজা হয়, কিম্বা যে ধানকে অধিকরূপে সিদ্ধ করা হয়, তাহার অঙ্কুরোদ্গ-সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া, তাহা যেমন বীজ-ধানরূপে রক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।”

স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই সাধকের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে আবেশ প্রাপ্ত হয়। এই স্বরূপ-শক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে এমন ভাবে ভাজিয়া দেয় বা সিদ্ধ করিয়া দেয় যে, মায়া বা মায়ার প্রভাব আর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না ; স্বরূপশক্তি মায়াকে সম্যক্রূপে অপসারিত করিয়া দেয়।

বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে যেমন নিজের সুখের জন্য বাসনা জাগে, তেমনি আবার সুখের বিপরীত যে দুঃখ, সেই দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাও জাগে। তাই মায়াবদ্ধ জীব যেমন ইহকালের সুখ-সম্পদ্, লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠাদি কামনা করে, তেমনি আবার পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ-লাভের জন্যও যত্নবান্ হয়। আবার, সুখবিরোধী দুঃখ চাহেনা বলিয়া—যাহাতে ইহকালে লোক-সমাজে নিন্দা-গ্লানি-আদি জন্মিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য হইতে যেমন বিরত থাকিতে চায়, তেমনি আবার, যাহাতে পরকালে নরক-যন্ত্রণাদি ঘটিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য হইতেও বিরত হয়। মোট কথা জীব যে লোকধর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, তাহার মূলও হইতেছে মায়াজনিত-স্বসুখ-বাসনা এবং স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি একমাত্র স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই পরিচালিত হয়, তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণ-প্রীতির বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনারই স্থান নাই। নিজের সম্বন্ধে কোনও ভাবনাই তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে না—এমন কি সালোক্যাদি-মুক্তিবাসনাও নয়। যেহেতু, মুক্তিবাসনার তাৎপর্য্যও হইতেছে—নিজের আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাতে। ইহাও নিজের জন্য—কৃষ্ণসুখের জন্য নয়। তাই ভক্তি-সাধককে শ্রীকৃষ্ণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একপ্রকার মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত-সাধক তাহা গ্রহণ করেন না, তিনি প্রার্থনা করেন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যমূলা সেবা। একথা শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা. ৩।২৯।১৩॥

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রিয়বস্তু ( ১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সকলেই প্রিয় ব্যক্তির প্রীতিবিধানের জন্য উৎসুক। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রিয় বস্তু বলিয়াই শ্রুতি প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার ( প্রীতিবিধানের ) কথা উপদেশ করিয়াছেন। “আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥ ১।৪।৮॥” এজন্যই ভক্ত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমূলা সেবাব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না।

১৫৪। গোপীপ্রেম।

স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত জীবও যখন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা ব্যতীত অপর কিছুমাত্র কামনা করেন না, তখন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ গোপসুন্দরীদের কথা আর কি বলা যাইবে ? স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপ-শক্ত্যাত্মক ; সুতরাং তাঁহাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিরও স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইবে —শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। তাঁহাদের চিত্তস্থিত প্রেমও যখন স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—

কৃষ্ণাভিমুখিনী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—তখন এই প্রেমের গতিও হইবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের দিকে।

ব্রজগোপীদের মধ্যে বহিরঙ্গা মায়ার সম্বন্ধতো নাই-ই, মায়ার সম্বন্ধের গন্ধলেশও নাই বলিয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির গতি স্ব-সুখের দিকে হইতে পারে না। স্বসুখ-বাসনার, কিম্বা স্বীয় দুঃখনিবৃত্তি-বাসনার, এমন কি ইহকালে লোকনিন্দাদির আশঙ্কা, কিম্বা পরকালে নরক-ভোগাদির আশঙ্কাও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না ; যেহেতু, এইরূপ বাসনা বা আশঙ্কা বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব হইতেই উদ্ভূত হয়। ব্রজগোপীদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপ-শক্তিদ্বারা গঠিত বলিয়া, তাঁহাদের চিত্ত হইতে উত্থিত সমস্ত ভাবও স্বরূপ-শক্ত্যাত্মক এবং সে-সমস্ত-ভাবের বা মনোবৃত্তির পরিচালিকাও স্বরূপ-শক্তি বলিয়া এবং স্বরূপশক্তির একমাত্র গতিও শ্রীকৃষ্ণের দিকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনার ছায়াও তাঁহাদের চিত্তে থাকিতে পারে না এবং তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমূলক কার্য্যব্যতীত অন্য কোনওরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। এইরূপই ব্রজগোপীদের প্রেমের স্বরূপ।

ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমসম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ় ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৩৯॥

মহাভাবের একটী স্তরের নামই "অধিরূঢ় ভাব।" যে বস্তু স্বরূপতঃ যে জাতীয়, তাহা হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তুই হইতেছে সেই বস্তুর পক্ষে মলিনতা ; যেমন ধূলা-বালি-আদি হইতেছে জলের পক্ষে মলিনতা। ধূলা-বালি-আদি জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকিলেই জলকে মলিন এবং অশুদ্ধ বলা হয়। প্রেম হইল কৃষ্ণসুখ-বাসনা। আর কাম হইল স্বসুখ-বাসনা—সুতরাং প্রেমের ভিন্ন জাতীয় বস্তু। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও নাই বলিয়াই তাহাকে "বিশুদ্ধ" এবং "নির্ম্মল" বলা হইয়াছে। "অধিরূঢ় ভাব"-শব্দে তাঁহাদের প্রেমের নিবিড় সান্দ্রতাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এত গাঢ়, এত সান্দ্র যে, তাহার মধ্যে নিজের সম্বন্ধীয় কোনও বাসনাই—এমন কি, ইহকালের এবং পরকালের ভাবনাও—প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তাই ব্রজসুন্দরীগণ—

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥ শ্রীচৈ.চ. ১।৪।১৪৩-৪৬।
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।
আত্মসুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪৮-৫০॥

যদি বলা যায়—গোপীগণ তো নিজেদের দেহের মার্জ্জনাদি করেন, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা দেহকে বিভূষিতও করেন। ইহাতে কি তাঁহাদের নিজদেহে প্রীতি আছে বলিয়া বুঝা যায় না ?

তাঁহাদের নিজদেহে প্রীতিবশতঃ যে তাঁহারা দেহের মার্জ্জন-ভূষণাদি করেন না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই যে তাহা করিয়া থাকেন, কবিরাজগোস্বামী তাহাও বলিয়াছেন।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত। সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন—তাঁর ইহা সম্ভোগ-সাধন ॥
এ-দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।' এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন-ভূষণ ॥
শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৫৩-৫৫ ॥

এই উক্তির সমর্থনে কবিরাজগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতধৃত একটী আদিপুরাণ-বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যঃ মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥
—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে পার্থ! যে গোপীগণ স্ব-স্ব-দেহকেও আমার ( আমাতে অর্পিত আমার সুখসাধন ) বস্তু মনে করিয়া ( মার্জ্জন-ভূষণাদি দ্বারা ) যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদের চিত্তে তো অপরিসীম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ইহাতেই তো তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা বুঝা যায়। স্বসুখ-বাসনা না থাকিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত আনন্দ উপভোগ করেন কিরূপে ? কবিরাজগোস্বামী এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥
তাঁসভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ। তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥
এ-বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ—কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাঢ়ে—যার নাহিক সমতা ॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।' এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥
এই মত পরস্পর করে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ-গুণে। তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে ॥
শ্রীচৈ.চ. ১।৪।১৫৬-৬৬ ॥

তাপ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ না করিয়াও যদি আগুনের নিকটে যাওয়া যায়, তাপ আপনা-আপনিই অনুভূত

হয়। ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুন তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেই। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দ আস্বাদনের ইচ্ছা না থাকিলেও আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে গেলেই আপনা-আপনিই আনন্দ অনুভূত হইবে। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত আনন্দ স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেই। গোপীগণ মহাপ্রেমবতী; প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মই হইতেছে—আনন্দস্বরূপের আনন্দ আস্বাদন করানো। আবার, প্রেমও হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বরূপতঃই পরম আস্বাদ্য, পরম-আনন্দ-জনক। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীদিগের চিত্তস্থিত প্রেম যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহার আনন্দ-লহরীও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দও আপনা-আপনিই গোপীদিগের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। যে পাত্রে আগুন থাকে, পাত্রের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যেমন আগুন স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই সেই পাত্রে তাপ সঞ্চারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ। সুতরাং সুখবাসনা না থাকিলেও আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের প্রভাবে এবং গোপীদিগের চিত্তস্থিত প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপাদের অপরিসীম আনন্দ জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—আনন্দের এবং প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপাদিগের আনন্দ-আস্বাদনের বাসনা না থাকিলেও তাঁহাদের আনন্দ জন্মিতে পারে—ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাঁহারা সেই আনন্দকে তো প্রত্যাখ্যান করেন না, তাহারাও তো তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন না। তাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেই আনন্দ উপভোগই করিয়া থাকেন এবং প্রেমসেবাদ্বারা সেই আনন্দকে আরও বর্দ্ধিতই করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা হয়তো ছিলনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যখন আনন্দের উদয় হয় এবং সেই আনন্দকে যখন তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন না, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—তখন তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা জাগিয়া উঠে।

ইহার উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দকে যে গোপীগণ অঙ্গীকার কবেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন—নিজেদের সুখাস্বাদন-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসুখের পুষ্টিবিধানের নিমিত্ত। শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে তাঁহাদের দেহে এবং মুখে যে প্রফুল্লতা জন্মে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন, তাঁহার মাধুর্য্যও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দের অঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণসুখেরই পুষ্টি সাধিত হয়। গোপীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিজনিত আনন্দের অঙ্গীকারের পর্য্যবসানও শ্রীকৃষ্ণসুখে। ইহাতে তাঁহাদের স্বসুখ-বাসনা সূচিত হয় না, বরং কৃষ্ণসুখের জন্য উৎকণ্ঠাই সূচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত বা শ্রীকৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দ যে গোপীগণ স্বসুখ-বাসনা-তৃপ্তির জন্য অঙ্গীকার করেন না, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে—এই আনন্দের উন্মাদনায় যদি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মে, তাহা হইলে সেই আনন্দের প্রতিও তাঁহাদের ক্রোধ জন্মে।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭১॥

ব্রজসুন্দরীদের কথা তো দূরে, যাঁহাদের প্রেম ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম অপেক্ষা অনেক তরল, তাঁহারাও কৃষ্ণসেবার বিঘ্নজনক প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পরিকর দারুক।

দারুক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সারথি। তিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল। তাহার ফলে দারুকের দেহে স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইল, তাঁহার হস্তাদিতে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে চামর-বীজনের বিঘ্ন জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণসেবার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া দারুক স্বীয় প্রেমানন্দকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন।

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ॥ ২।২।২৪-ধৃত-প্রমাণ॥

গোপীগণ প্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের বিষয়। প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সুখেই প্রীতির আশ্রয় গোপীদিগের সুখ। তাঁহাদের নিজের সুখের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাও নাই।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ—তাহাঁ এই রীতি। প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৬৭-৭০॥

শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্তু তাঁহাদের কেহই গোপীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—গোপীগণ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম।

ভক্তাঃ সমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মতঃ॥

—লঘুভাগবতামৃত। ভক্তামৃত।৩৬ ধৃত-আদিপুরাণ-বচন॥

ইহার হেতু এই যে, তাঁহাদের প্রেম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় এবং সর্ব্ববিধ অপেক্ষারহিত। যে উপায়েই হউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত হইতে পারিয়াছেন—তাঁহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, প্রেয়সী বলুন, শিষ্যা বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন—যে কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকের নিকট হইতে যে কোনও রূপ প্রীতি এবং সেবা পাওয়া যায়, তৎসমস্ত প্রীতি এবং সেবাই গোপীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ, মান, অপমান, সম্পর্ক প্রভৃতির কোনও অপেক্ষা নাই বলিয়াই যে কোনও ভাবেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন। বর্ষাকালের পার্ব্বত্য নদীর প্রবল স্রোতোবেগে গতির বাধা উৎপাদনকারী বিরাট-বৃক্ষাদিও যেমন তৃণের মত ভাসিয়া চলিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য গোপীদিগের স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠাময়ী বলবতী বাসনার গতিবেগে লোকধর্ম্ম-বেদধার্ম্মদির সমগ্র বাধাবিঘ্নও তেমনি বহুদূরে অপসারিত হইয়া ভাসিয়া যায়।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা দাসী॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭৩-৭৪॥

এই উক্তির সমর্থনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীপ্রেমামৃত হইতে অর্জ্জুনের নিকটে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত বাক্যটীও উদ্ধৃত হইয়াছে।

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কি মে ভবন্তি ন॥

সেব্যের আদেশ-পালনমাত্রেই সেবা সার্থকতা লাভ করে না। অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্যেই সেবার পরিপাটী। কোন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মনের অভিপ্রায় কিরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত না করিলেও প্রেমবলে গোপীগণ তাহা জানিতে পারেন। প্রেমসেবার পরিপাটীও তাঁহারা জানেন এবং কিরূপ শারীরিক ব্যবহারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন, তাহাও তাঁহারা জানেন।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট-সমাহিত॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৭৫॥

আদিপুরাণ হইতে জানা যায়—অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥
---লঘুভাগবতামৃত-ভক্তামৃত।৩৯-ধৃত আদিপুরাণ-প্রমাণ॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহণীয় বিষয়, আমার মনোগত ভাব, গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্॥
—ল, ভা,। ভক্তামৃত। ৩৭-ধৃত-আদিপুরাণ-বচন॥

—হে পরন্তপ! গোপীগন ( তাঁহাদের প্রেমবলে ) আমাকে যেমন জানেন, মুনিগণ, যোগিগণ, এমন কি রুদ্রাদি দেবগণও আমাকে তেমন জানেন না॥"

এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মী র্ন চাত্মা চ যথা গোপী জনো মম॥
—ল. ভা. ভক্তামৃত।৩৫-ধৃত আদিপুরাণ-বচন॥

—হে পার্থিব! গোপীগণ আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মাও তেমন নহেন, রুদ্রও তেমন নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার তেমন প্রিয়তম নহি।"

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবে যে তিনি তাঁহাদের বশীভূত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

"ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈ র্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥
—ল. ভা.। ভক্তামৃত। ৩৮-ধৃত আদিপুরাণ-বচন ॥"

—তপস্যা দ্বারা, বা বেদাধ্যয়নের দ্বারা, বা আচারের দ্বারা, কি বিদ্যাদ্বারা আমি বশীভূত হইনা। আমি কেবল প্রেমেরই বশীভূত। তাহার প্রমাণ—গোপীগণ।"

গোপীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্যই গোপীগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল পাইলেও এবং সেই আয়ুষ্কালের প্রতি পল, প্রতি বিপল তাঁহাদের সেবার প্রতিদানের চেষ্টায় নিয়োজিত হইলেও যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেবার প্রতিদান দিতে পারিবেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিদান তো দূরে, প্রতিদানের চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু, গীতায় তিনি বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।—যিনি আমাকে যে ভাবে ভজন করেন, আমিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করি, অর্থাৎ তাঁহার অভীষ্ট দান করিয়া থাকি।" গোপীগণ চাহেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ; তাহা দিতে গেলে গোপীগণ নিজেদের জন্য কিছু পাইবেন না, পাইবেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে—তাঁহার নিজের সুখ। সুতরাং প্রতিদানের চেষ্টায় তাঁহার ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। তাই প্রতিদানের চেষ্টাও সম্ভব নয়। তাই তিনি গোপীদিগকে বলিয়াছেন – আমার প্রতি তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক; আমি তোমাদের নিকটে চিরঋণী হইয়াই রহিলাম।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ শ্রীভা. ১০।৩২।২২ ॥

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম যে কামগন্ধহীন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে স্বসুখ-বাসনা, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা নাই। বশ্যতা তো দূরে, ভক্তের স্বসুখ-বাসনা ভক্তবৎসল ভগবানের চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। তাহার প্রমাণ দ্বারকা-মহিষীগণ।

দ্বারকা-মহিষীদের প্রেম ব্রজগোপীদের প্রেম অপেক্ষা ভিন্ন জাতীয় বলিয়া সময় সময়, শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাসনার আনুগত্যেই, স্বসুখ-বাসনার ভঙ্গী গ্রহণ করে। যখন এই অবস্থা হয়, তখন ষোড়শ সহস্র মহিষীর সমবেত চেষ্টাতেও—তাঁহাদের আয়ত বাহু-নেত্র, মন্দহাসিযুক্ত কটাক্ষ, তাঁহাদের মনোরম নর্ম্মবাক্য, তাঁহাদের ভ্রূভঙ্গী-আদিতেও—শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না; তাঁহাদের হাব-ভাব-কটাক্ষাদি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ সাড়া জাগাইতে পারে না।

"চার্ব্বব্জকোশবদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিত-সৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ শ্রীভা. ১৫।৬১।৩-৪ ॥"

ইহাতেই বুঝা যায়, যাঁহাদের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে বশীভূত এবং যাঁহাদের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম কোথাও আর কেহ নাই বলিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে আত্মসুখ-বাসনার লেশমাত্রও নাই।

ব্রজগোপীদের প্রেমসম্বন্ধে সাধারণভাবে এস্থলে আলোচনা করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অপর কোনও গোপীতে তাহা নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১।৪।১০৫-৮ ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥
রাধাপ্রেম বিভু—তার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র ব্যবহার ॥ ১।৪।১১০-১৩ ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে নব-নব-রূপে ভাসে ॥
মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥
১।৪।১২০-২৪ ॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকাতেই কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। এই বিকাশময় প্রেমস্তরের নাম মাদন; মাদন স্বয়ংপ্রেম। এই মাদন আর কোনও গোপীতেই নাই।

## ১৫৫। গোপীদের প্রেমলীলা কামক্রীড়া নহে

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৭৪ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত কামক্রীড়াতেও নায়ক-

নায়িকার মধ্যে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাহ্যিক ক্রিয়াসাম্যে কেহ কেহ গোপীদের ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিকে কামক্রীড়ামাত্র মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহা কামক্রীড়া নহে; যেহেতু, কামক্রীড়ার উদ্দেশ্য হইতেছে— আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি। গোপীদিগের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও যে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়া নহে।

নিজেন্দ্রিয়-সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥

শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৭৫-৭৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে গোপীদের যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা নাই, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই।

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহংস্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

শ্রীভা. ১০।৩১।১৯ ॥

—( শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহার্ত্তা ব্রজসুন্দরীগণ বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াও কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনা-পুলিনে বসিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। বনের প্রায় সর্ব্বত্রই অতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি বিস্তৃত রহিয়াছে। এতাদৃশ বনমধ্যে ভ্রমণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতিসুকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদনা আশঙ্কা করিয়া প্রেমার্ত্তিভরে রোদন করিতে করিতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন— ) হে প্রিয় ! তোমার চরণ সুজাত-কমল-দল অপেক্ষাও সুকোমল। তাই তুমি যখন তোমার চরণ-কমল আমাদের স্তনোপরি স্থাপন করিতে অভিলাষী হও, তখন—আমাদের স্তন অত্যন্ত কঠিন এবং কর্কশ বলিয়া তৎ-সংস্পর্শে তোমার সুকোমল চরণ ব্যথিত হইবে আশঙ্কা করিয়া কেবল তোমার অভিলাষ পূরণের নিমিত্তই অতি ভয়ে ভয়ে এবং অতি ধীরে ধীরে তাহা আমাদের স্তনোপরি ধারণ করিয়া থাকি। এতাদৃশ সুকোমল-চরণ-কমলদ্বারা তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম-শিলাকণাদি পরিপূর্ণ বনে এই রজনীকালে যে তুমি ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে কি তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্ম শিলাকণাদি দ্বারা তোমার সেই চরণ-কমল ব্যথিত হইতেছে না ? ( অবশ্যই ব্যথিত হইতেছে—ইহা ভাবিয়া ) তোমাগত-জীবন আমাদের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে।"

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা লাগিবে মনে করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজেদের কঠিন স্তনমণ্ডলে তাঁহার চরণ-ধারণ করিতেও ভীত হইতেন। ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্রজসুন্দরীগণ তরুণী; শ্রীকৃষ্ণও তরুণ নাগর। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও অত্যধিক। এই অবস্থায়, যদি ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্তনমণ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্তনমণ্ডলে চরণ-ধারণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত হইতেন না। নিজেদের স্তনমণ্ডলে প্রেষ্ঠ নাগরের চরণ-স্পর্শজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যাইতেন; কারণ, কান্তর্ত্তৃক বক্ষোরুহ-স্পর্শ কামুকা তরুণীদের

একান্ত অভীপ্সিত, কান্ত-সঙ্গসুখ-ভোগের ইহাও একতম প্রকৃষ্ট উপায়। কোনও কামুকা তরুণীই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেনা এবং এই কার্য্যে কান্তের দুঃখ আশঙ্কা করিয়া ব্যথিতও হয় না। ব্রজসুন্দরীগণ কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ভীত হয়েন। তথাপি যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু—তাঁহাদের স্ব-সুখ-বাসনা নহে, পরন্তু কৃষ্ণসুখ-বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ তাহা ইচ্ছা করেন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন। এজন্য বলা হইয়াছে—

অতএব গোপীপ্রেমে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥
আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪৮–৫০॥

শ্রীরাধাও বলিয়াছেন—

"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী',
মোর হয় 'দাসী' অভিমান॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।৫০॥"

শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ব্রত—ভক্তচিত্ত-বিনোদন।

"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥"

ব্রজসুন্দরীদের সুখ হইবে মনে করিয়াই তিনি তাঁহাদের সহিত বিহারাদি করেন, নিজের সুখের জন্য নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( ১।১।১৫৩-অনুচ্ছেদে ) স্বসুখ-বাসনা জন্মায় বহিরঙ্গা মায়া। শ্রীকৃষ্ণও মায়াতীত এবং ব্রজসুন্দরীগণও মায়াতীত। মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা জন্মিতেই পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অবশ্য ইহার ধারণা করা সহজ নয়।

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলা হইতেছে হ্লাদিনী-শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী-বিশেষ। ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।" আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"যূনোর্নায়ক-নায়িকয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়োর্দর্শনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্যায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্ররীত্যা আচরণং তয়েতি। পশু-বচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ। * * প্রাকৃতঃ কামময়োঽপি সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।"

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির আস্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত কামক্রীড়ার ন্যায় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি হইতেছে তাঁহাদের প্রীতি-প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদিদ্বারা পিতামাতাও ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতি প্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদিদ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয় প্রীতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্ব্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্ত্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা ছোট নাতি-নাতনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তাৎপর্য্য পশুবৎ কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতিমিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুম্বনালিঙ্গনাদি আস্বাদ্য; প্রীতিহীন চুম্বনাদি ন্যক্কারজনক।

পুত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা চুম্বনাদিদ্বারা স্নেহ প্রকাশ করেন না; তখন সম্বন্ধের অপেক্ষা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্রূপ প্রীতি-প্রকাশে বাধা দান করে। সুতরাং বাৎসল্য-প্রীতিরও নির্ব্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরস্পরের প্রতি আসক্ত নায়ক-নায়িকার প্রীতি-প্রকাশে সম্বন্ধের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদিও কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বারমাত্র হয় না, উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত হয়; নিজেদের সুখের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্ব্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে যে চুম্বনা-লিঙ্গনাদি, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি-প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বারস্বরূপ, ইহা উদ্দেশ্যে পর্য্যবসিত হয় না; চুম্বনালিঙ্গনের জন্যই চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ সুখের নিমিত্তও নহে। ভূগর্ভস্থ বাষ্পরাশির চাপ উত্তাপা-ধিক্যাদিবশতঃ যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধর্ম্মবশতঃই বাষ্পরাশি ভূগর্ভ হইতে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনওস্থলে ভূ-পৃষ্ঠ-বিদারণ, কোনওস্থলে পর্ব্বতাদির উদ্ভব, আবার কোনও স্থলে বা হ্রদাদির সৃষ্টি হয়। এ-স্থলে ভূকম্পন-ভূগর্ভবিদারণাদি যেমন বর্দ্ধিতচাপ বাষ্প-রাশির উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাহার বহির্গমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশমাত্র—তদ্রূপ, চুম্বনালিঙ্গনাদিও শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীত্যাধিক্যের অভিব্যক্তি-চেষ্টার ফল বা বিকাশমাত্র; চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহাদের প্রীতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহারা কোনওরূপ সম্বন্ধের বা দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের একমাত্র অপেক্ষা পরস্পরের প্রীতি-সম্পাদন। যে উপায়েই হউক, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতিমুহূর্ত্তে-বর্দ্ধনশীলা প্রীতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যেমন খাদ্যবস্তুর গুণাদি বিচার করেন না, যাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীলা এই প্রীতি, যেন হৃদয়মধ্যে স্থানাভাববশতঃই, প্রতিমুহূর্ত্তে বর্দ্ধনশীলা গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায়-সম্বন্ধে তাহার কোনও বিচার নাই। যখন যে উপায় উপস্থিত হয়, তখন সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। পর্ব্বতগাত্রে সঞ্চিত বারিরাশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিবেই—তদ্রূপ ইঁহাদের প্রীতি-রাশিও যে কোন দ্বারে যে কোনও বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। এই প্রীতির মহিমা বিচার করিতে হইবে—অভিব্যক্তির দ্বার দিয়া নহে, অভিব্যক্তি-প্রকাশের উদ্দামতা দ্বারা।

সুখ-বাসনাই যদি গোপীদের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারজনিত দুঃখকে তাঁহারা বরণ করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের দুঃখ যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু হয়, তাহা হইলে সেই দুঃখকে তাঁহারা পরম সুখ বলিয়াই মনে করেন। শ্রীরাধার উক্তিতেই তাহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।৪৩ ॥"

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আত্মসুখ-স্পৃহামূলক কামক্রীড়াই যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাদিতে তাঁহাদের মধ্যে সাপত্ন্যজনিত ঈর্ষ্যা-দ্বেষাদির উদ্ভব হইত; প্রত্যেকে কেবল নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্তই অভিলাষবতী হইতেন, অন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে তিনি পরম দুঃখ অনুভব করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সঙ্গমাদি কোনও গোপীই ইচ্ছা করেন না। কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণ কোনও গোপীর সহিত সঙ্গমাদি ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের সুখ। অন্য গোপীর সহিত মিলনে শ্রীকৃষ্ণ যদি সুখ অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেহ দুঃখ অনুভব তো করেনই না, বরং তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের সুযোগ করিয়া দিতে পারিলেই পরমানন্দ অনুভব করেন। শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

"যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ্ হাথে ধরি, ক্রীড়া করাঞা করোঁ তাঁরে সুখী ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।৪৫ ॥"

প্রশ্ন হইতে পারে তবে আবার মান-অভিমান কেন? তাহাও কৃষ্ণ-সুখ-পুষ্টির জন্য।

"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।৪৫ ॥"

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতেই ব্রজগোপীদের প্রেমের কামগন্ধহীনতা পরিস্ফুট হইয়াছে।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ পদ্যাবলী ॥ ৩৪১ ॥

—শ্রীরাধা বলিয়াছেন—হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে-সেখানে (যে কোনও অন্য রমণীর সহিত) বিহার করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, প্রাণনাথব্যতীত অপর কেহ নহেন।"

যাঁহার চিত্তে স্বসুখ-বাসনা (কাম) আছে, তিনি কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারেন না।

ব্রজসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বাস্তবিক আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কাম না হইলেও সাধারণতঃ কাম-নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কাম নয়; এজন্যই উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ১।২।১৪৩-ধৃত প্রমাণ॥"

কাম বলার হেতু এই। ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র কামনাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি; অন্য কোনও কামনাই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। সুতরাং তাঁহাদের কামনামাত্রই প্রেম—কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা।

**উদ্ধবের বিবরণ।** উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণীবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যদুরাজের প্রধান মন্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, অত্যন্ত সুবুদ্ধি, কুশাগ্র-সূক্ষ্মবুদ্ধি।

"বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।১॥"

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সান্ত্বনা বিধানের জন্য এতাদৃশ উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজকে এবং যশোদামাতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। পরে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের গাঢ়তা, অসমোর্দ্ধতা এবং অপূর্ব্বতা দেখিয়া উদ্ধব বিস্মিত হইলেন। তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্য-ভাবের ভক্ত; এইরূপ কেবলা-প্রীতির কোনও ধারণাই তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। তাই তাঁহার বিস্ময়। উদ্ধব কয়েক মাস ব্রজে থাকিয়া গোপীদিগের অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহাদের প্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"এই ব্রজসুন্দরীদিগের জন্মই সফল। যেহেতু, ইঁহারা অখিলাত্মা ভগবান্ গোবিন্দে এইপ্রকার অদ্ভুত পরম প্রেম লাভ করিয়াছেন। সংসার-ভীত মুনিগণ মুক্ত হইয়াও এই প্রেম লাভ করিতে অভিলাষী হয়েন। আমরা ভগবানের সঙ্গী হইয়াও ইহা প্রার্থনা করি। ভগবানের কথায় যাঁহাদের অনুরাগ নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মজন্মেরই বা সার্থকতা কি?

এতাঃ পরং তনুভৃতে ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।৫৮॥"

গোপীদিগের প্রেমের ন্যায় প্রেমের কণিকা লাভের জন্য লুব্ধ হইয়া উদ্ধব মনে করিলেন—ইঁহাদের চরণ-রেণুদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বহুকাল অবস্থান করিতে পারিলেই চরণ-রেণুর প্রভাবে এই প্রেম-লাভের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে। তাই, গোপীদিগের চরণ-রেণুদ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার বাসনায় তিনি বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে লতাগুল্মরূপে জন্মলাভের প্রার্থনাও জানাইলেন।

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥
—শ্রীভা. ১০।৪৭।৬১॥

—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিগণ কর্ত্তৃকও অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজন

করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবতী গোপাদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনস্থ লতাগুল্মৌষধিদিগের মধ্যে কোনও একটী যেন আমি হইতে পারি।”

উদ্ধব আরও বলিলেন—

“যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।

কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥

শ্রীভা. ১০।৪৭।৬২॥

—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও মুকুন্দের যে পদবী অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আপ্তকাম যোগেশ্বরগণও স্ব-স্ব-চিত্তে যাহার অর্চ্চনা করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পদারবিন্দ এই সকল গোপী রাসগোষ্ঠীতে স্ব-স্ব-স্তনোপরি বিন্যস্ত করিয়া এবং আলিঙ্গন করিয়া স্ব-স্ব-কৃষ্ণবিরহ-তাপ দূর করিয়াছিলেন।”

পরে হয়তো ভাবিলেন—এতাদৃশী মহাপ্রেমবতী পরমভাগ্যবতী ব্রজসুন্দরীদের চরণ-রেণুদ্বারা অধ্যুষিত বৃন্দাবনে লতা-গুল্মরূপে জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্যই বা তাঁহার কিরূপে হইতে পারে? তাই তিনি দূর হইতেই তাঁহাদের চরণ-রেণুর বন্দনা করিলেন।

“বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ।

যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা. ১০।৪৭।৬৩॥

—নন্দব্রজের এই ব্রজরমণীগণের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। আমি সর্ব্বদা ইঁহাদের চরণ-রেণুর বন্দনা করি।”

ব্রজসুন্দরীদের প্রেম যদি কামময় হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের চরণ-রেণু লাভের জন্য উদ্ধবের এইরূপ ব্যাকুলতা কখনও সম্ভব হইত না।

**ব্রহ্মার উক্তি।** ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও যে ব্রজসুন্দরীদিগের পাদরেণু কামনা করেন, তাহারও প্রমাণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়।

বৃহদ্বামনপুরাণে দেখা যায়, ভৃগু-প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

“ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।

নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।

তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ॥

—লঘুভাগবতামৃত। ভক্তামৃত। ৩১-ধৃত বৃহদ্বামন-বচন॥

—ব্রহ্মা বলিলেন—পুরাকালে আমি নন্দব্রজস্থ গোপীগণের পাদরেণু প্রাপ্তির নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলাম; তথাপি আমি তাঁহাদের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই।”

ইহা শুনিয়া ভৃগু-আদি মুনিগণ বলিয়াছিলেন—“ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও যদি বৈষ্ণবদিগের পাদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীনারদাদি বহু বৈষ্ণবই তো আছেন; তাঁহাদের পাদরেণু গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া আপনি যে গোপীদের পাদরেণু গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহার হেতু কি? ইহাতে আমাদের সংশয় জন্মিতেছে। প্রভো! ইহার হেতু কি বলুন।”

"বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে তদ্বিধৈরপি। সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ। গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কোহেতুস্তদ্বদ প্রভো ॥
—লঘুভাগবতামৃত। ভক্তামৃত। ৩২-ধৃত বৃহদ্বামনপুরাণ-বচন ॥"

উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

"ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োঽপি তাঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ ॥
লঘুভাগবতামৃত। কৃষ্ণামৃত। ৩৩-ধৃত বৃহদ্বামন-বচন ॥

—ব্রহ্মা ভৃগুকে বলিলেন—হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃত স্ত্রীলোক নহেন। তাঁহারা (স্বরূপ-শক্তিভূতা) লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। আমি (ব্রহ্মা), শিব, শেষ-নামক অনন্তদেব এবং লক্ষ্মী—এই আমাদের কেহই কোনও কালেও ব্রজসুন্দরীদের সমান নহি।"

ব্রজসুন্দরীগণ যদি কামাসক্তা রমণী হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা এই সকল কথা বলিতেন না এবং তাঁহারা যে লক্ষ্মীদেবী হইতেও শ্রেষ্ঠা—তাহাও বলিতেন না।

**পরীক্ষিতের কথা।** ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে স্বীয় মৃত্যু অবধারিত জানিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়াছেন। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি বর্গও যে স্থানে উপস্থিত। যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীশুকদেবও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিৎ পরকালের মঙ্গলকামী হইয়া, সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর—পরম-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতের সভায় শ্রীমদ্ভাগবত-কথা এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার কথাও বর্ণন করিলেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে রাসাদিলীলা-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনও সর্ব্বজীবের সর্ব্বাস্থায়—বিশেষতঃ মুমূর্ষুর—পরম কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীশুকদেব মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা তিনি বর্ণনা করিলেন।

জন্মাবধি—এমন কি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই—শ্রীশুকদেব সম্পূর্ণরূপে মায়ানির্ম্মুক্ত, ব্রহ্মানন্দে এবং পরে ভগবৎ-গুণ-মহিমা-রসে নিমগ্ন। স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্তও তাঁহার কখনও ছিল না। রাসাদি-লীলা যদি কামক্রীড়া হইত, তাহা হইলে এতাদৃশ শুকদেব তাহা বর্ণনা করিতেন না—বিশেষতঃ পরকালের মঙ্গলকামী আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিতের নিকটে এবং রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিদিগের সমক্ষে। সেই স্থলে শুকদেবের পিতা ব্যাসদেবও ছিলেন এবং ব্যাসদেবের গুরু দেবর্ষি নারদও ছিলেন।

**শ্রীশুকদেবের উক্তি।** রাসলীলা বর্ণন করিয়া উপসংহারে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ। শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৯॥

—যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূদের সহিত সর্ব্বব্যাপক-বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত রাসাদিলীলার কথা

নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি—সর্ব্বোত্তমা ভক্তি—লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগস্বরূপ কামাদি দুর্ব্বাসনাকে পরিত্যাগ করেন এবং ধীর ( অচঞ্চল ) হয়েন।”

“ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সে-ই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।৫।৪৩-৪৫॥”

রাসাদিলীলা যদি কামক্রীড়া হইত, তাহার শ্রবণে এবং কীর্ত্তনে কাম-বাসনা আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াই উঠিত, ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায়। কাম-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনে কেহ কাম-বাসনা হইতে মুক্তি লাভ করিতেও পারে না, মায়াজনিত চিত্তবিক্ষোভ হইতেও ত্রাণ পাইতে পারে না, অঞ্চল-চিত্তও হইতে পারে না এবং পরাভক্তিও লাভ হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা-কথার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভগবানে পরাভক্তি লাভও হয়, চিত্ত চাঞ্চল্য এবং মায়াজনিত চিত্ত-বিক্ষোভও দূরীভূত হয়, চিত্ত হইতে কাম বাসনাও অন্তর্হিত হয়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—রাসাদিলীলা কামক্রীড়া নহে।

মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যেই কাম-ক্রীড়া। শ্রীকৃষ্ণ জীব-তত্ত্ব নহেন। “বিষ্ণোঃ”-শব্দে শ্রীশুকদেব তাহাই জানাইয়াছেন। রাসলীলা-বর্ণনের সর্ব্বপ্রথম শব্দও হইতেছে—“ভগবান্।” “ভগবানপি তা রাত্রীঃ”-ইত্যাদি। রাসলীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—বিষ্ণু, ভগবান্—সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। আর ব্রজগোপীগণও জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। যে মায়া চিত্ত-বিক্ষোভ জন্মায়, কাম-বাসনা জাগ্রত করে, সেই বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে কামক্রীড়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

## ১৫৬। ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণকান্তাত্বের স্বরূপ

কান্তা দুই রকমের—স্বকীয়া ও পরকীয়া।

**স্বকীয়া**। নিজের বিবাহিতা পত্নীকে স্বকীয়া কান্তা বলে।

“করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥
—উজ্জ্বলনীলমণি। কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ।৩॥

—যাহারা পাণিগ্রহণ ( বিবাহ )-বিধি অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পাতিব্রত্য হইতে অবিচলা, ( রসশাস্ত্রে ) তাহাদিগকে স্বকীয়া বলা হয়।”

**পরকীয়া**। যে সকল স্ত্রীলোক ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া অনুরাগবশতঃ পুরুষের নিকটে আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অনুসারে পত্নীরূপে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারা পরকীয়া কান্তা।

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণাঃ।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥
—উজ্জ্বলনীলমণি॥ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ।৬॥"

**শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা।** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ হইতেছেন তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। শক্তির সহিত শক্তিমানেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি মূর্ত্তাই হউক, আর অমূর্ত্তাই হউক, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ; কখনও অপর কাহারও সহিত তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বাভাবিকী শক্তি—সুতরাং তাঁহারই স্বকীয়া শক্তি। এই স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ স্বরূপতঃ তাঁহার স্বকীয়া কান্তাই। অপ্রকট ধামে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা—যেমন, ব্রজের শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, দ্বারকার শ্রীরুক্মিণী-আদি মহিষীগণ, পরব্যোমের লক্ষ্মীগণ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াকান্তাত্ব অবশ্য বিবাহজাত নহে। বিবাহজাত সম্বন্ধের নিত্যত্ব সম্ভব নহে; কেননা, বিবাহের সময়েই তাহার উৎপত্তি হয়, বিবাহের পূর্ব্বে তাহা থাকে না। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ হইতেছে অভিমানজাত—দৃঢ়া প্রতীতি হইতে উদ্ভূত। নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃত্ব-মাতৃত্ব যেমন জন্মগত নহে, পরন্তু গাঢ় বাৎসল্যবশতঃ তাঁহাদের দৃঢ়-প্রতীতিজাত, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তাত্বও তাঁহাদের প্রগাঢ়-দাম্পত্যভাববশতঃ কেবল অভিমানজাত, বিবাহজাত নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিড়-কান্তাজনোচিত-প্রীতিবশতঃ তাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বকান্ত—পতি এবং তাঁহাদের প্রীতির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন—তাঁহারা তাঁহার স্বকান্তা, বিবাহিতা পত্নী। কখন কি ভাবে বিবাহ হইয়াছে—এইরূপ অনুসন্ধান তাঁহাদের কাহারও নাই। তাঁহাদের এইরূপ অভিমান এবং সম্বন্ধ হইতেছে অনাদিসিদ্ধ। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারাগণের নিত্য-স্বকান্তা; তাঁহাদের কোনওরূপ বিবাহের কথা শুনা যায় না; বিবাহ সম্ভবও নয়। তাঁহাদের সম্বন্ধ—অনাদিসিদ্ধ, কেবল অভিমানজাত।

প্রকটলীলাতেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষীগণ তাঁহার স্বকীয়া কান্তা। প্রকট-লীলাতে জন্মলীলার ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন। অথচ তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধও ব্যর্থ হইতে পারে না। তাই, লীলাশক্তির প্রভাবেই লৌকিকী রীতির অনুকরণে বিবাহের ব্যপদেশে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ প্রকটিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীসীতাদেবীর সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যাপার। অতি শৈশবে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ একটী বালক এবং একটী বালিকা বিবাহের অব্যবহিত পরেই যদি কোনও কারণে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত যদি তাহাদের পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ না হয়, এবং বালিকাটী যদি এরূপ কোনও লোককর্ত্তৃক লালিত-পালিত হইতে থাকে, যিনি বালিকার বিবাহের কথা জানেন না, বালিকাটীরও যদি বিবাহের স্মৃতি না থাকে এবং বালক-বালিকা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দৈবাৎ যদি তাহাদের পরস্পরের মধ্যেই বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যে ব্যাপার হয়,

প্রকটলীলাতে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীসীতাদেবীর এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহিষীদিগের বিবাহও অনেকটা তদ্রূপ। লৌকিক বিবাহদ্বারা যেন তাঁহাদের পূর্ব্ব অনাদিসিদ্ধ দাম্পত্যসম্বন্ধই প্রকটিত হইয়া থাকে।

## ১৫৭। বিভিন্ন স্বকীয়া কান্তায় বিভিন্ন ভাববৈচিত্রী

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং অপ্রকট-ব্রজের গোপীগণ—ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও সকলের ভাব সর্ব্বতোভাবে এক রকম নহে। প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যই ইহার হেতু। প্রেমের গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে প্রেমের মহিমার, প্রেমের মাধুর্য্যাদির, প্রেম-প্রকাশের ভঙ্গীর এবং শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি-আদিরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে কান্তাদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। এক জাতীয় প্রেম হইলেও গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে যে বিভিন্ন পাত্রে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, লৌকিক জগতেও তাহা দেখা যায়: পিতা ও মাতা—উভয়েরই সন্তানের প্রতি একই জাতীয় বাৎসল্য; কিন্তু তাহা এক জাতীয় হইলেও পিতা অপেক্ষা মাতার বাৎসল্য যে উৎকর্ষময়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ অপেক্ষা দ্বারকা-মহিষীদিগের প্রেম এবং দ্বারকা-মহিষী অপেক্ষা ব্রজের গোপীদের প্রেম উৎকর্ষময়। এই প্রেমোৎকর্ষের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবহারের এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। লক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময় মহিষী-দিগের প্রেমের এবং গোপীদিগের প্রেমের বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

গোপীদিগের প্রেম অতি উচ্চ স্তরে অবস্থিত; এই স্তরের নাম মহাভাব। এই মহাভাব দ্বারকা-মহিষীদিগের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। গোপীদের প্রেমের এই পরমোৎকর্ষবশতঃ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতাও মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগ্যতা অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময়ী। কয়েকটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইহা পরিস্ফুট করার চেষ্টা হইতেছে।

(ক) মহাভাব স্বরূপতঃই পরমতম আস্বাদ্য—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ"। মহিষীদিগের প্রেমে এইরূপ আস্বাদ্যত্বের একান্ত অভাব; যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে মহাভাব নাই।

(খ) মহাভাবের স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগের মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মহাভাবের স্বরূপতা—পরমতম আস্বাদ্যত্ব—ধারণ করে। মহিষীদিগের পক্ষে ইহা অসম্ভব।

(গ) মহাভাবের প্রভাবে ব্রজসুন্দরীদিগের ইন্দ্রিয়াদি মহাভাবের স্বরূপত্ব ধারণ করে বলিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহও মহাভাব-স্বরূপত্ব লাভ করে—সুতরাং পরমতম আস্বাদ্য হইয়া উঠে। মানবতী ব্রজসুন্দরীদিগের তিরস্কারও সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরম আস্বাদ্য হয়; যেহেতু, এই তিরস্কারও মহাভাবময়। এজন্য ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।২৩॥" ইহার কারণ, বেদস্তুতিতে পরমতম আস্বাদ্য মহাভাব স্ফুরিত হয় না। সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট চিনির পুতুল শিশুর নিকটে দেখিতে ভয়াবহ হইলেও আস্বাদনে মধুর। ব্রজসুন্দরীদিগের তিরস্কার শুনিতে তিরস্কারাত্মক বলিয়া মনে হইলেও যখন কর্ণে প্রবেশ করে, তখন পরম আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, ইহাও মহাভাবাত্মক চিত্ত হইতে উদ্ভূত এবং মহাভাবাত্মক রসনেন্দ্রিয় হইতে

নিঃসারিত বলিয়া স্বরূপতঃ মহাভাবাত্মক। মহিষীদিগের মধ্যে মহাভাবের একান্ত অভাব বলিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিও মহাভাবাত্মিকা হইতে পারে না। আর, মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তমতা নাই বলিয়া মহিষীগণ মানবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করার কথাও তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে না।

(ঘ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সময় সময়, কৃষ্ণপ্রীতির আনুগত্যেই স্বসুখ-বাসনার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন এইরূপ হয়, তখন তাঁহাদের হাব-ভাব-কটাক্ষাদি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কোনওরূপ প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, তাঁহাকে প্রেমবশে রাখা তো দূরে।

কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যত্ব থাকে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ।

(ঙ) মহিষীদিগের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। যখন ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিও শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা আর শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভ, নিজেদের প্রেমবশ্য, বলিয়া মনে করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেম কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-লেশহীন বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না বলিয়া তাঁহাদের প্রেম কখনও শৈথিল্য ধারণ করে না, সুতরাং তাঁহাদের সেবা-বাসনাও কখনও সঙ্কুচিত হয় না।

(চ) ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাব অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া কোনও কিছুর অপেক্ষা বা কোনওরূপ বাধাবিঘ্নই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। কিন্তু মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মহাভাবের ন্যায় সান্দ্র নহে বলিয়া ইহা সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষাহীন নহে। প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায়, ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাবের প্রবল বেগের মুখে সর্ব্ববিধ অপেক্ষা, সর্ব্ববিধ বাধা বিঘ্ন কিরূপে বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায় এবং মহিষীদিগের প্রেম যে অপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাতেই তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। তাহার হেতু এই যে, বিশেষ বিশেষ কারণে প্রকট-লীলাতেই নিত্যপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণসেবার পথেও প্রবল বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; অপ্রকট-লীলায় এই জাতীয় বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা দেখা যাইবে।

যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে, অপ্রকট-লীলার গোপীগণ এবং মহিষীগণ উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া কান্তা হইলেও প্রেমের গাঢ়তার পার্থক্যবশতঃই তাঁহাদের স্বকীয়াভাবের সেবা এক রকম নহে। এজন্যই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহিষীদিগকে বলিয়াছেন—"স্বীয়া ( স্বকীয়া )" এবং ব্রজসুন্দরীদিগকে বলিয়াছেন—"পরম স্বীয়া ( পরম স্বকীয়া )।" এই ভাবে তিনি তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

## ১৫৮। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াকান্তা

### ক। ব্রজগোপীগণ স্বরূপতঃ স্বকীয়া, প্রকটে তাঁহাদের পরকীয়াভাব

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বস্তুতঃ পরকীয় বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সমস্তই যিনি, আবার যিনিই সমস্ত, তাঁহার আবার "পর" কে বা কি ?

তিনি অনন্ত-শক্তি। সমস্ত শক্তিরই একমাত্র শক্তিমান্ তিনি। সমস্ত শক্তিই তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা শক্তিব্যতীত অপর কেহ বা অপর কিছুই তাঁহার অন্তরঙ্গা কান্তা হইতে পারেন না। তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপাই তাঁহার প্রেয়সী কান্তাগণ। তাঁহারা যে আবরণে যে ভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া কান্তাই ; যেহেতু তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়াশক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন—যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে—যদি কোনও জীবতত্ত্ব রমণী নিজাঙ্গদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে অভিলাষিণী হয় এবং যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেবা যদি অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলেও সেই রমণী—অপর কোনও পুরুষকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেও, সেই রমণী—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া হইতে পারে না। তাহার দুইটী হেতু। প্রথমতঃ, সেই রমণী জীবতত্ত্ব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই জীবশক্তির অংশ ; এই জীবশক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি, অপর কাহারও শক্তি নহে এবং এই জীবশক্তির শক্তিমান্‌ও শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহে, সেই রমণীর পতিও নহে। সুতরাং তত্ত্বের বিচারে সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া নহে। দ্বিতীয়তঃ, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রেরই—সুতরাং সেই রমণীরও—চিত্তে অবস্থিত। তাঁহার সঙ্গেই সেই রমণীর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ ; এরূপ ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ তাহার পতির সঙ্গেও সেই রমণীর নাই, থাকিতেও পারে না। পতি যতই প্রিয় হউক, পতির চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া যায়, পতিকে হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। অথচ পরমাত্মারূপে, পরম আত্মীয়রূপে—শ্রীকৃষ্ণের স্থান হৃদয়ের অন্তস্তলে। পরমাত্মা কাহারও "পর" নহেন। এই হিসাবেও সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া হইতে পারে না।

যাহা হউক, কোনও জীবতত্ত্ব রমণী এ-স্থলে আলোচনার বিষয় নহে ; যেহেতু, কোনও জীবতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বা প্রেয়সী হইতে পারে না। এ-স্থলে আলোচ্য বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপা কৃষ্ণকান্তা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাত্ত্বিক-বিচারে স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহা কোনও কৃষ্ণকান্তাই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা হইতে পারেন না। তথাপি শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়—প্রকটলীলাতে যে সকল গোপসুন্দরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসাদিলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বিবাহিতা স্বকীয়া কান্তা ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া।

তবে কি রাসবিহারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী গোপী ছিলেন না ?

রাসবিহারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণই ; অপর কেহ নহেন। পূর্ব্বেই (১।১।১১৫ ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপরিকরগণের সহিতই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহিতই তাঁহার রসাস্বাদিনী লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—একমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাবই রাসরস উৎসারিত করিতে পারে ; সেজন্যই মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধাব্যতীত রাসলীলা সম্পাদিত হইতে পারে না—শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী, রাসাধিষ্ঠাত্রী। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও নিত্যসিদ্ধ গোপীর মধ্যেও এই মাদন নাই, থাকিতেও পারে না। অন্য

রমণীর কথা তো দূরে। সুতরাং রাসবিলাসিনী গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যকান্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রকটলীলাতে যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিহারাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে তাঁহার নিত্যকান্তা, **গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতি** হইতেও তাহা জানা যায়। এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রজস্ত্রীগণ যমুনা পার হইয়া দুর্ব্বাসা-ঋষির আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টদ্রব্য ভোজন করাইয়াছিলেন। ইহা কেবল প্রকটলীলাতেই সম্ভব, অন্যত্র দুর্ব্বাসার দর্শন ব্রজস্ত্রীগণের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই শ্রুতিতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে—একদা ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া সর্ব্বেশ্বর গোপাল শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দান করা উচিত? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—দুর্ব্বসাকে ভক্ষ্য দান করা উচিত। "একদা হি ব্রজস্ত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা সর্ব্বেশ্বরং গোপালমুচিরে উবাচ তাঃ কৃষ্ণঃ। ননু কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি দুর্ব্বাসস ইতি।"

ব্রজগোপীগণ দুর্ব্বাসার নিকটে উপনীত হইয়া ভক্ষ্য প্রদান করিলেন। আহারের পরে অন্য প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ—এই কৃষ্ণ যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম ইত্যাদি" এবং আরও বলিয়াছিলেন—"স বো হি স্বামী ভবতি—সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।"

এই সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রকটলীলা-বিহারিণী ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে—যদিও ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা জানিতেন না—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী। দুর্ব্বাসাই তাঁহাদিগকে জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী—পতি, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ইহা দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা; যেহেতু, তখনও যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, তখন নিত্য-স্বকীয়া কান্তা না হইলে দুর্ব্বাসার উক্তির—স বো হি স্বামী ভবতি—এই উক্তির—সার্থকতা থাকে না। তখনও যখন তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় নাই, অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে—নিত্য-স্বকীয়া কান্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পর-পুরুষ এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা।

এইরূপে গোপালতাপনী শ্রুতি হইতে বুঝা গেল—ব্রজসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও প্রকটলীলাতে তাঁহাদের পরকীয়া-ভাব।

### খ। স্বকীয়া ও পরকীয়া কান্তারসের আস্বাদনেই মধুর-রসাস্বাদনের পূর্ণতা

প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? যাঁহারা নিত্য-স্বকীয়া কান্তা, তাঁহারা কিরূপেই বা এবং কেনই বা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা বলিয়া মনে করিতে পারেন? এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইতেছে।

কান্তাভাবময় রসকে সাধারণতঃ মধুর রস বলা হয়। যদিও শান্তদাস্যাদি সকল রসই মধুর—আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়, তথাপি কান্তাভাবময় রসে অন্য সমস্ত রসের গুণ আছে বলিয়া এবং তদতিরিক্ত আরও এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব আছে বলিয়া এই কান্তাভাবময় রসকেই মধুর-রস বলা হয়।

এই মধুর-রস উৎসারিত এবং আস্বাদিত হয়—কান্তাদের সহিত লীলাতে। কান্তা যখন দুই রকমের হইতে পারে—স্বকীয়া ও পরকীয়া, তখন এই দুই রকমের কান্তার সহিত লীলাতেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসের আস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব হইতে পারে। পরকীয়া কান্তার সহিত লীলাতে যে মধুর-রসের বৈচিত্রী উৎসারিত হইতে পারে, তাহার আস্বাদন না হইলে মধুর-রসের আস্বাদন থাকে অপূর্ণ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্ব বা রসস্বরূপত্বও থাকিয়া যায় অপূর্ণ। তাই পরকীয়া কান্তার সহিতও রসিক-শেখর-শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের আস্বাদনের বাসনা।

### গ। ব্রজপরকীয়ার স্বরূপ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রেয়সীই তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া স্বরূপতঃ তাঁহার স্বকীয়া। তিনি স্বতন্ত্র—স্বরাট্, স্ব-স্বরূপশক্ত্যেক-সহায়—বলিয়া, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিতই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাও সম্ভব নয়। অথচ মধুর-রসের আস্বাদন-পূর্ণতার নিমিত্ত পরকীয়া কান্তারও প্রয়োজন। তাঁহার কোনও কোনও স্বকীয়া কান্তাকেই যদি পরকীয়াভাবাপন্ন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু নিত্য-স্বকীয়া কান্তাকে কিরূপে পরকীয়াভাবাপন্ন করা যায়? ইহা তো এক অভাবনীয় এবং অঘটন ব্যাপার। স্বরূপের যেমন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়, স্বরূপগত ভাবেরও তেমনি পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার সহায়তাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাহাও অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নয়। যেহেতু, অপ্রকট-লীলায় নিত্যস্বকীয়া-ভাব। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া সেখানেও এই পরিবর্ত্তন অবশ্য ঘটাইতে পারেন; কিন্তু তাহা করিলে অপ্রকটের নিত্য-স্বকীয়াভাবময়ী লীলার নিত্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং আরও অনেক বিপর্য্যয়ের আবির্ভাব হয়। তাই অপ্রকট-লীলাতে স্বকীয়াভাবময়ী কান্তাদিগকে পরকীয়াভাবাপন্ন করার সুযোগ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্য পরিকরবৃন্দ যখন যেন নূতন ভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তখন যোগমায়া তাঁহাদের স্বরূপগত ভাবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অন্যরূপ ভাব আরোপিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। প্রকট-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া ব্রজসুন্দরীদিগের স্বরূপগত স্বকীয়া-ভাবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে পরকীয়া-ভাবাপন্ন করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের হেতুবিচার-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর বলিয়া ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন, এবং তিনি পরমকরুণ বলিয়া রসনির্য্যাস আস্বাদনের ব্যপদেশে আনুষঙ্গিক ভাবে রাগমার্গের ধর্ম্ম প্রচারই, তাঁহার অবতরণের মুখ্য হেতু। তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কিরূপ রস আস্বাদন করিবেন, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরই কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥১।৪।২৫॥"

বৈকুণ্ঠাদি ধামেও যে সকল লীলা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্ত লীলার অনুষ্ঠান করিবেন এবং সে সমস্ত লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবেন। কি রকম সে-সমস্ত লীলা, তাহার দিগ্‌দর্শনরূপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ১।৪।২৬ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের পতি-ভাবই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তাঁহার প্রতি গোপীদিগের পতি-ভাব স্বাভাবিক হইলেও প্রকটলীলাতে যোগমায়া তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে উপপতি-ভাব সঞ্চারিত করিবেন।

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যেই প্রকটলীলাতে পরকীয়া-ভাব। কিরূপে এই পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত হয়, উপরে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে তাহা জানা যায়। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার পক্ষে অসাধ্য কিছু নাই; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলারসপুষ্টির নিমিত্ত যোগমায়াই ইহা করিয়াছেন।

যোগমায়াকর্ত্তৃক প্রভাব বিস্তারের ফল হইয়াছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের নিত্য স্বকান্ত, গোপীগণও তাহা জানিতে পারেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিতে পারেন নাই। পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ-বিষয়ে উভয় পক্ষের জ্ঞানই যোগমায়ার প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনাদিসিদ্ধ প্রেম বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, যাইতে পারেও না; যেহেতু, তাঁহাদের এই পারস্পরিক প্রেম হইতেছে স্বরূপগত। এই স্বরূপগত প্রেম তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই, পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবেই। প্রেমটী যখন কান্তাভাবময়, তখন আকর্ষণটীও হইবে তদনুকূল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন ॥
এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্ব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ১।৪।২৭-২৯ ॥"

পরকীয়া-ভাবকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে যোগমায়া এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। গোপালচম্পূ-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—দুষ্টমতি কংস অবিবাহিতা সুন্দরী গোপকন্যাদিগকে লুণ্ঠন করিয়া নেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে গোপকন্যাদের বিবাহের বয়স না হওয়া সত্ত্বেও গোপগণ তাঁহাদিগকে পাত্রস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা—নন্দ-নন্দনের সঙ্গে বিবাহ সংঘটিত হউক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তখনও উপনয়ন হয় নাই বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করা যায় না। বাধ্য হইয়া তাঁহারা অন্য পাত্র স্থির করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপসুন্দরীদের সহিত অন্য কাহারও বিবাহও সম্ভব নয়। অথচ অন্যের সঙ্গে

বিবাহ না হইলে পরকীয়াত্বও সাধিত হইতে পারে না। তখন যোগমায়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক মায়াময় স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন। এক রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় গোপকন্যাগণব্যতীত অপর সকলেই স্বপ্ন দেখিলেন—প্রস্তাবিত পাত্রদের সঙ্গে গোপকন্যাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহা স্বপ্ন হইলেও কেহ স্বপ্ন বলিয়া মনে করিলেন না, সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। গোপকন্যাগণের স্বপ্ন না দেখার হেতু এই যে—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, স্বপ্নেও তাঁহারা অপরকে পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

যাহা হউক, এই মায়াময় স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত হওয়ায় গোপকন্যাগণকে তথাকথিত শ্বশুরালয়ে আসিতে হইল, শ্বাশুড়ী-ননদী-আদিও তাঁহারা পাইলেন। কিন্তু শ্বাশুড়ীর পুত্রকে তাঁহারা পতিরূপে অঙ্গীকারও করেন নাই, পতি বলিয়া মনেও করেন নাই। যোগমায়াই নানা কৌশলে পতিস্মন্যদিগের সান্নিধ্য হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি লোকদৃষ্টিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেও তাঁহারা পরবধূ। ইহাই হইল পরকীয়া-ভাবের ভিত্তি।

লৌকিক-দৃষ্টিতে গোপসুন্দরীগণ পরবধূ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল এবং স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমবশতঃ তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল। এই পারস্পরিকী প্রীতিই পরস্পরের সহিত তাঁহাদের মিলনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তুলিল।

কিন্তু মিলন তো সহজ নয়। লোকদৃষ্টিতে গোপীগণ যখন পরবধূ, তখন কুলধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া পড়িল শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলনের প্রবল অন্তরায়। কিন্তু তাঁহাদের মহাশক্তিসম্পন্ন প্রেম এই অন্তরায়কে তৃণবৎ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান করাইল। তথাপি তাঁহাদের মিলন হইতে লাগিল—অতিগোপনে। গোপনতা কোনও পক্ষেরই নিজের জন্য নহে—লোকের নিকটে পরস্পরের নিন্দার ভয়ে। লোকের নিকটে নিন্দিত হইলে গোপীদিগের মনে দুঃখ হইতে পারে, লোকের দৃষ্টিতে তাঁহারা হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন—ইহা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ খোঁজেন গোপনতা; আর শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও অনুরূপ আশঙ্কায় গোপীগণ খোঁজেন গোপনতা। তাই ইচ্ছা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদের সকল সময়ে অভীষ্ট মিলন সম্ভব হয় না। "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।"

যে বিঘ্নবশতঃ ইচ্ছানুরূপ ভাবে সকল সময়ে মিলন সম্ভব হয় না, সেই বিঘ্ন কিন্তু মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাকে ঘনীভূত করিয়া রসের পুষ্টি সাধনই করিয়া থাকে। বহুবার ব্যর্থ প্রয়াসের পরে যখন মিলন হয়, তখন মিলনের আস্বাদন-চমৎকারিত্বও অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে। ইহা হইতেছে পরকীয়া-ভাবে মধুর-রসের আস্বাদনের একটী অপূর্ব্ব বৈচিত্রী। স্বকীয়া-ভাবাপন্ন কান্তার সহিত মিলনে এইরূপ কোনও বাধা-বিঘ্নের অবকাশ নাই বলিয়া এ-জাতীয় রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা সে-স্থলে অতি বিরল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগের উৎকণ্ঠা যখন অত্যন্ত বলবতী হয়, তখন কোনওরূপ বিঘ্নই তাঁহাদের মিলনে বাধা জন্মাইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থবর্ণিত শারদীয়-রাসলীলাতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে দৃষ্ট হয়।

শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ আত্মাহারা হইয়া পড়িলেন। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বংশীবাদককে লক্ষ্য করিয়া উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইলেন। যিনি পরিবেশন করিতেছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে পরিবেশন-ভাণ্ড তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইয়া পড়িল, তিনি সে-স্থান হইতেই ধাবিত হইলেন। এইরূপে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ছুটিলেন। পতিম্মন্য-আদির কথা, কুলধর্ম্মাদির কথা, লোকনিন্দাদির কথা—তাঁহাদের স্মৃতিপথেও উদিত হয় নাই। তাঁহাদের মন—সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি—কেন্দ্রীভূত হইয়া গিয়াছে বংশীবাদক প্রাণবল্লভে। উন্মত্তার মত শত শত গোপী একই পথে ছুটিয়াছেন; কিন্তু কাহারও প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, কাহারও সম্বন্ধে কাহারও অনুসন্ধান নাই। অনুসন্ধান করিবে কে? মন তো যেন তাঁহাদের মধ্যে নাই; মন আগেই ছুটিয়া গিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে; মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাময়ী বাসনাই যেন দেহকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সাময়িক উত্তেজনাবশতঃই যে কুলধর্ম্মাদির কথা তাঁহাদের মনে জাগে নাই, তাহাও নহে। তাঁহারা যখন নির্জ্জন অরণ্যে গভীর নিশিথে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া—তাঁহাদের কুলধর্ম্মের ও নারীধর্ম্মের কথা জানাইয়া, তৎসমস্তের লঙ্ঘনে ইহকালে নিন্দা-গ্লানি এবং পরকালে অনন্ত দুর্দ্দশার কথা বলিয়া—তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের প্রেমের—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণসেবা-বাসনার—প্রবল-বন্যার স্রোতে সমস্ত উপদেশ কোন্ দূরদেশে ভাসিয়া গেল। তাঁহারাও অতি নিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথার উত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহার সেবাতেই সকলের সেবা হইয়া যায়। শেষকালে উভয় পক্ষের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বরূপগত প্রেমেরই জয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসলীলা করিলেন। আত্মারাম হইয়াও তিনি কেবলমাত্র ব্রজসুন্দরীদিগের দুর্দ্দমনীয় প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য রাসলীলাতে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিলেন।

মহাভাবের যে কি অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, উল্লিখিত বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার, কুলধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্নকে প্রবল-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র-তৃণখণ্ডবৎ ভাসাইয়া দেওয়ার অসাধারণ সামর্থ্য একমাত্র মহাভাবেরই আছে।

পরকীয়াভাবের প্রভাবেই যে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের এইরূপ অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয় সামর্থ্য জন্মিয়াছে, তাহা নয়। ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের এইরূপ প্রভাব নিত্যই বর্ত্তমান—অপ্রকটেও বর্ত্তমান, প্রকটেও বর্ত্তমান। বাধাবিঘ্নের অতিক্রম-প্রসঙ্গে তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। মদমত্ত হস্তীর দেহে শক্তি আছে কিনা, থাকিলে তাহার পরিমাণ কত, তাহা জানা যায় একমাত্র তখন, যখন সে কোনও বিরাট মহীরুহকে উৎপাটিত করে। মহীরুহ তাহার শক্তি জন্মায় না, মহীরুহের উৎপাটনের জন্য হস্তীর পূর্ব্বশক্তি অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র।

প্রকটলীলায় পরকীয়াভাবের আবেশবশতঃ ব্রজসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পক্ষে যে সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হয়, অপ্রকট-লীলায় নিত্য-স্বকীয়াভাব বলিয়া সে-সমস্ত অন্তরায়ের অবকাশ নাই।

তাই অপ্রকট-লীলায় তাঁহাদের প্রেম স্বীয় শক্তি প্রকাশের তেমন সুযোগ পায় না। প্রকটে পরকীয়াভাববশতঃ সেই সুযোগ উপস্থিত হয় বলিয়াই তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

### খ। সাধনসিদ্ধা গোপী

এ-স্থলে কেবল নিত্যসিদ্ধ-গোপসুন্দরীদের কথাই বলা হইল। তাঁহাদের সকলেই লোকধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—কয়েকজন গোপী তাঁহাদের স্বজনকর্ত্তৃক গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধা হইয়াছিলেন; বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠাবতী হওয়া সত্বেও তাঁহারা যাইতে পারেন নাই। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপী নহেন। ইঁহারা সাধন-সিদ্ধা। সাধনসিদ্ধাদের মধ্যেও আবার ইঁহারা হইতেছেন বিশেষ এক শ্রেণীর গোপী।

সাধারণতঃ সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন; প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর যথাবস্থিত দেহে বিকশিত হয় না। দেহত্যাগের পরে জাতপ্রেম ভক্তের জন্ম হয়—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থানে—চিন্ময় দেহে। তাহার পরে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-কথাদি-শ্রবণের প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর অতিক্রম করিয়া মহাভাবে উন্নীত হয়। তখনই বাস্তবিক তাঁহার গোপীত্ব এবং গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগিত্ব সিদ্ধ হয়। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের ন্যায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারও বিবাহ-সম্বন্ধে লৌকিক-প্রতীতি জন্মিলেও যোগমায়া তাঁহাকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। এতাদৃশী সাধনসিদ্ধা গোপীগণও সমস্ত বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া নিত্যসিদ্ধা গোপীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ, সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাপ্রভাবেই, জাতপ্রেম হওয়ায় পূর্ব্বে, জাতরতি-অবস্থাতেই, যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটলীলা-স্থানে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ সম্যক্রূপে চিন্ময় ছিল না। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হয় নাই। তাঁহাদেরও বিবাহাদি হইয়াছিল; কিন্তু জাতপ্রেম নহেন বলিয়া এবং চিন্ময়-দেহা নহেন বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের দেহ পতিস্পর্শে কৃষ্ণসেবার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহের পরে অবশ্য নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের কৃষ্ণরতি প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদি স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাই বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য তাঁহারাও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণসেবার উপযোগী ছিল না বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদের সহায়তা করেন নাই। তাই তাঁহারা গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিলেন।

## ১৫৯। পরকীয়াভাবে রসের উল্লাস

বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতিপথে কোনও প্রবল বাধা উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরকীয়া কান্তার পক্ষে গাঢ় অনুরাগ বশতঃ স্বীয় অভীষ্ট নায়কের সহিত মিলন-চেষ্টায় যদি বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা মিলিত হইবার সুযোগ পায়েন, তখন সম্বর্দ্ধিত উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের

মিলনানন্দও অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব ধারণ করে। পরকীয়াভাবে মিলনের পক্ষে বহু বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মিলনজনিত আনন্দেরও অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব ধারণের সম্ভাবনা আছে। এজন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়াছেন—

"পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস ॥ ১।৪।৪২॥"

স্বকীয়া-ভাবে যে মধুর-রস, পরকীয়া-ভাবেও সেই মধুর-রসই। বৈশিষ্ট্য এই যে—পরকীয়া-ভাব-সুলভ বাধাবিঘ্ন এই মধুর-রসকে উচ্ছ্বাসময় করিয়া তোলে। ইহাই স্বকীয়া হইতে পরকীয়ার এক বৈশিষ্ট্য। পরকীয়া-ভাব মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য দান করে না, মধুর-রসের স্বরূপগত মাধুর্য্য-রাশিকে একসঙ্গে পুঞ্জীভূত করিয়া অভিব্যক্ত করায়মাত্র—বাধাপ্রাপ্ত নদীস্রোতের জল যেমন পুঞ্জীভূত হয়, তদ্রূপ। জল নদীরই; বাধা জলের সৃষ্টি করে না, জলকে পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগ দেয় মাত্র।

## ১৬০। রাসলীলার পক্ষে পরকীয়া-ভাব অপরিহার্য্য নহে

লোকধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোপসুন্দরীগণ শারদীয়া রাসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়াই রাসলীলারস পরম উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরকীয়াভাব না হইলে যে রাসলীলা হইতে পারে না এবং স্বকীয়াভাবেও যে রাসলীলা-হইতে পারে না—ইহা মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীরাধাই হইতেছেন রাসেশ্বরী, রাসাধিষ্ঠাত্রী এবং সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনাখ্য-মহাভাবই হইতেছে পরম-রসকদম্বময় রাসরসের পরমতম এবং একমাত্র উৎস। রাসলীলার পক্ষে শ্রীরাধা এবং তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাবই অপরিহার্য্য। "কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং রাধামাধায় হৃদয়ে"-ইত্যাদি বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। কিন্তু রাসলীলার পক্ষে গোপীদিগের পরকীয়াভাব যে অপরিহার্য্য—এইরূপ উক্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ব্রজের অপ্রকট-প্রকাশে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ সকলেই স্বকীয়া-ভাববতী। পরম-রসকদম্বময় রাসরসের পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদন এবং এই মাদনভাববতী রাসেশ্বরী এবং রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা গোপীগণও যখন অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যবিরাজিত, তখন অপ্রকটে—সুতরাং স্বকীয়াভাবে—রাসলীলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে কি বাধা থাকিতে পারে?

অবশ্য অপ্রকটে স্বকীয়াভাবে রাসলীলার কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। তাহাতেই অপ্রকটে রাসলীলার অনস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। যেহেতু, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে, অপ্রকট-লীলাব বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ, কোনও ব্যাপারের অনুল্লেখই সেই ব্যাপারের অনস্তিত্ব সপ্রমাণ করে না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবনের অনেক ঘটনাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয়; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও স্নানাহারাদির কথা, কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা যদি উল্লিখিত না হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তিনি কখনও স্নানাহারাদি করিতেন না, কিম্বা কখনও স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতেন না।

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে অপ্রকট গোকুলের বর্ণনায় দেখা যায়, এই গোকুল হইতেছে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি। এই পদ্মের পত্রস্থানীয় হইতেছে গোপসুন্দরীদিগের উপবন। এই উপবনসমূহকে বলে কেলিবৃন্দাবন। "যস্য চ সমীপগানাং আলয়রূপস্য কমলস্য সর্ব্বতশ্চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ব্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি। * * * পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি ॥ শ্রীগোপালচম্পূ ॥ পূর্ব্বচম্পূ ।১।৫৬॥" এই কেলিবৃন্দাবনে গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কেলি-বিলাসাদি করিয়া থাকেন। রাস-কেলি ব্যতীত অন্য কেলি করেন, ইহা অনুমান করার কোনও হেতু নাই।

পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়—শ্রীসদাশিব নারদকে বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ—সকলেই নিত্য, সকলেই তাঁহার তুল্য গুণশালী। পুরাণে বর্ণিত প্রকট-লীলার ন্যায়, বৃন্দাবনের অপ্রকট-নিত্যলীলাতেও তাঁহারা বিদ্যমান। অপ্রকট-লীলাতেও বনে এবং গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গমনাগমন আছে, বয়স্যদের সহিত গোচারণ আছে—কেবল অসুর-সংহার নাই।

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥
যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ:বিনাসুরবিঘাতনম্ ॥ ৫২।৩-৫॥"

এই পদ্মপুরাণবাক্য হইতে বুঝা যায়—প্রকটের ন্যায় অপ্রকটেও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই আছে ; কেবল অসুর-সংহার-লীলা নাই। সুতরাং অপ্রকটে যে রাসলীলাও আছে—এইরূপও মনে করা যায়। মথুরাগমনাদি লীলাও অবশ্য অপ্রকটে নাই। ইহা অসুর-সংহারাদিরই অন্তর্ভুক্ত।

উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকটী হইতেছে এই :—

"হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ। বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ ॥
বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ ॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা-বিশেষ অনুসারে ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল (পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণে)। শ্রীহরি সর্ব্বদাই ব্রজদেবীদিগের সহিত রাসাদিলীলায় বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কখনই বিরহ হয় না।"

এই শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র বিশেষ-প্রকট-শব্দয়োরুপাদানাদ্ 'বৃন্দারণ্যে বিহরতা' ইত্যত্রাপ্রকটলীলাবিশেষতয়া বিহরতা ইতি গমিতম্। ততশ্চ বৃন্দারণ্য ইতি তস্য অপ্রকটপ্রকাশ-বিশেষ ইতি লব্ধিতম্। সদেত্যনেন বিরহসময়েঽপি বিহারাবকাশতয়াঃ স্থাপনীয়ত্বাৎ। তথা হরিণা ব্রজদেবীনামিত্যনেন তস্য তাসামপি অপ্রকটপ্রকাশান্তরং মতম্। প্রকাশভেদেন অভিমানভেদশ্চ বিরহ-সংযোগয়োর্যুগপদসম্ভবাৎ ॥"

টীকার মর্ম্ম। এই শ্লোকে "বিশেষ" এবং "প্রকট" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হওয়ায়—"বৃন্দারণ্যে বিহরতা—বৃন্দাবনে বিহারকারী"—এই বাক্যে অপ্রকট-লীলাবিশেষে বিহারই সূচিত হইয়াছে। আবার, "বৃন্দারণ্য"-শব্দে বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশবিশেষের কথাই বলা হইয়াছে। "সদা"-শব্দের দ্বারা (প্রকটের) বিরহ-সময়েও

বিহারের অবকাশ স্থাপিত হইয়াছে। আবার, "হরিণা ব্রজদেবীনাম্"—এই বাক্যে শ্রীহরির এবং ব্রজদেবীদেরও অপ্রকট-প্রকাশান্তরের কথা সূচিত হইয়াছে। বিরহ ও সংযোগের যুগপৎ অনুভব অসম্ভব বলিয়া প্রকাশভেদে অভিমানভেদের কথাও জানা যাইতেছে।

এই টীকা হইতে জানা গেল—প্রকট-লীলাতে যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের বিরহ, তখনও অপ্রকট-ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসাদিলীলায় সর্ব্বদা বিলসিত। শ্রীকৃষ্ণ এক প্রকাশে প্রকট-লীলায় এবং এক প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় বিরাজমান। ব্রজসুন্দরীগণও তদ্রূপ প্রকাশভেদে উভয় লীলায় বিরাজিত। বিরহ এবং সংযোগ—একই সময়ে অনুভূত হইতে পারে না বলিয়া বুঝিতে হইবে—প্রকট-প্রকাশে তাঁহাদের এক রকম ভাব এবং অপ্রকট-প্রকাশে অন্য রকম ভাব। এই অপ্রকট-প্রকাশ যে প্রকট-ব্রজেরই এক অপ্রকট-( লোকনয়নের অগোচর এক- ) প্রকাশমাত্র, তাহা মনে করারও কোনও হেতু নাই।

এইরূপে উজ্জ্বলনীলমণি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল যে—বৃন্দাবনের অপ্রকট-প্রকাশেও রাসাদি-লীলা নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভাবভেদ হইতেছে—স্বকীয়া এবং পরকীয়া—এই দুই রকম ভাবভেদ। প্রকটে পরকীয়া-ভাব বলিয়াই বিরহ-দুঃখ। অপ্রকটে স্বকীয়া-ভাব বলিয়া বিরহ নাই, রাসাদি-লীলায় নিত্যসংযোগ আছে।

সুতরাং স্বকীয়াভাবেও যে রাসলীলা সম্ভব, উজ্জ্বলনীলমণি হইতে পরিষ্কারভাবেই তাহা জানা গেল। প্রকটের পরকীয়া-ভাবে বাধাবিঘ্নাদি আছে বলিয়া অবশ্য রাসরস বিশেষভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—ইহাই বিশেষত্ব।

## ১৬১। ব্রজব্যতীত অন্যত্র পরকীয়াভাব নাই।

কান্তারসের এক অপূর্ব্ব-বৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য প্রয়োজন—রসের উচ্ছ্বাস-সাধন। উচ্ছ্বাস-সাধনের জন্য প্রয়োজন—দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্নের অবতারণা। বাধাবিঘ্ন কেবল অবতারিত করিলেই চলিবে না, সেই বাধাবিঘ্নকে অপসারিত করিতেও হইবে ; নচেৎ রস-আস্বাদনই সম্ভব হইবে না। পরকীয়া-ভাবে উৎকট বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। যে প্রেম স্বীয় স্বরূপগত সামর্থ্যে এই উৎকট-বাধাবিঘ্নকে অপসারিত করিতে পারে, সেই প্রেমে প্রেমবতী কান্তাগণের মধ্যে পরকীয়াভাব সঞ্চারিত করিলেই উচ্ছ্বাসময় মধুর-রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। উৎকট-বাধাবিঘ্নকে অপসারিত বা উপেক্ষিত করার সামর্থ্য আছে একমাত্র মহাভাবের। তাই, মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তাতেই পরকীয়া-ভাবের সঞ্চার প্রয়োজন। মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা হইতেছেন একমাত্র গোপসুন্দরীগণ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকর। এজন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ১।৪।৪২ ॥"

পরব্রহ্ম ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপতি হইলেও এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে অপর সকলের উপরে প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হইলেও তিনি নিজে কিন্তু শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমের বশীভূত ; তিনি শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমের উপরে কোনও-রূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন না ; বরং প্রেমই তাঁহার উপরে এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে। যে ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে অচিন্তনীয় বাধাবিঘ্নও নিমেষে অন্তর্হিত হইতে পারে, সেই ঐশ্বর্য্য যেই

বিশুদ্ধ প্রেমের অধীন, সেই বিশুদ্ধপ্রেমবতী গোপসুন্দরীদিগের স্বরূপগত প্রেম মহাভাব যে লোকধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-আদির বাধাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু থাকিতে পারে না। এইরূপ বিশুদ্ধপ্রেম অন্য কোনও ধামের কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে—এমন কি দ্বারকা-মহিষীগণের মধ্যেও—নাই বলিয়া রসাস্বাদন-সাধক পরকীয়া-ভাবও ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে থাকিতে পারে না।

দ্বারকা-মহিষীদিগের প্রেমেও যে কুলধর্ম্মাদির অপেক্ষা আছে, সুতরাং তাহাদের প্রেমও যে কুলধর্ম্মাদিজনিত বিঘ্নের অপসারণে অসমর্থ, শ্রীশ্রীরুক্মিণীদেবীর কথা আলোচনা করিলেই তাহা জানা যায়।

শ্রীশ্রীরুক্মিণীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, দ্বারকা-লীলার নিত্যমহিষী। প্রকটলীলাতে তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্য-বীর্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, অথচ প্রকটলীলায় সে-পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন, প্রেম উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী ; তিনি কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রুক্মিণীকে অর্পণ করিবেন না ; শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীকে বিবাহ দেওয়ার জন্যই তিনি চেষ্টিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী কুলপুরোহিতের যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র পাঠাইলেন এবং তাহাতে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং লইয়া যাওয়ার কৌশলের কথাও জানাইলেন। ইহাও জানাইলেন—যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তাহা হইলে তিনি উৎকট তপস্যা করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পত্নীরূপে চরণে স্থান না দেন, সেই পর্য্যন্ত—যত জন্মই হউক না কেন, সেই পর্য্যন্ত—তিনি তপশ্চরণ করিবেন। অন্যকে তিনি কিছুতেই বরণ করিবেন না।

ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীরুক্মিণীদেবীর স্বভাবসিদ্ধ কান্তাপ্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পতিরূপে বরণ না করিতে দৃঢ়সঙ্কল্পা। কিন্তু একটী বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়াছে—যে কোনও ভাবে সেবার বাসনা জাগ্রত হয় নাই। এই বিশেষ ভাবে সেবার বাসনা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নীরূপে। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়াও তিনি কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিতেও প্রস্তুত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সেবাভিলাষিণীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার না করিলেও যে কোনও ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বাসনা, তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয় নাই। নারীধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, আর্য্যপথাদি রক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্যই তিনি উৎকণ্ঠিতা। ইহা তাঁহার অনাদিসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপগত স্বভাব। তাঁহার প্রেম স্বরূপতঃই নারী-ধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম-আর্য্যপথাদির অপেক্ষাহীন নহে ; সেই অপেক্ষাকে অপসারিত করিবার শক্তিও তাঁহার প্রেমের নাই। অথচ ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি যে কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র লোকধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া উন্মত্তার মত শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে তাঁহাদের ধাবিত হওয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক

কুলধর্ম্মাদি-রক্ষার নিমিত্ত উপদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত তাঁহাদের অবিচলা নিষ্ঠা এবং দুর্দ্দমনীয় আগ্রহই তাহার প্রমাণ।

এ-স্থলে এই বিষয়ে একটী প্রবাদের কথাও উল্লিখিত হইতেছে। কথিত আছে—গত দ্বাপরে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, তখন একদিন নারদ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জানাইলেন—তাঁহার নিজের শরীর অসুস্থ। তাহাতে নারদ অত্যন্ত বিচলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—চিন্তার কোনও কারণ নাই। তাঁহার কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহাকে তাঁহার চরণধূলি দেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সর্ব্বাঙ্গে তাহা লেপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাধি দূর হইতে পারে। শুনিয়া নারদ একে একে সকল মহিষীর নিকটে গেলেন; কিন্তু কোনও মহিষীই স্বীয় চরণ-ধূলা দিলেন না। পত্নী হইয়া পতিকে কিরূপে চরণ-ধূলা দিতে পারেন? ইহা যে পত্নীধর্ম্ম-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ কেন যে অসুখের ভাণ করিতেছেন, নারদ তখন বুঝিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন ব্রজে। ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অসুখের কথা জানাইলেন। তাঁহারা সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলেন। নারদ বলিলেন—চিন্তার কোনও কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার অসুখের একটা ঔষধের কথা বলিয়া দিয়াছেন। সেই ঔষধ সংগ্রহের জন্যই নারদ চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাঁহার কোনও প্রেয়সী যদি নিজের চরণ-ধূলি দেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ধূলা স্বীয় অঙ্গে লেপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অসুখ সারিয়া যাইবে।

নারদের কথা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই স্বীয় পদধূলি আনিয়া দেবর্ষি নারদের হাতে দিলেন। অন্যের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরকীয় হইলেও তাঁহারা কিন্তু তাঁহাকে নিজেদের প্রাণপতি বলিয়াই এবং নিজেদিগকে তাঁহার "অশুল্ক-দাসীকা" বলিয়াই মনে করেন। তথাপি তাঁহাকে নিজেদের পদধূলি দিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কোচই অনুভব করিলেন না, একটু ইতস্ততঃও করিলেন না। নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তা তাঁহাদের নাই; তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ-দূরী-করণ। আর, পদধূলি দিতেছেন—দেবর্ষি নারদের হাতে। দেবর্ষির হাতে গোপবালিকা-নিজেদের পদধূলি দেওয়া যে অন্যায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠায় তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে সর্ব্বতো-ভাবে অপেক্ষাহীন, ইহাই তাহার প্রমাণ। আর, মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যে অপেক্ষাহীন নহে—পদধূলিদানে অসম্মতিই তাহার প্রমাণ।

মহিষীদিগের প্রেম অপেক্ষাহীন নহে বলিয়াই তাঁহাদের চিত্তে পরকীয়া-ভাবের সঞ্চার সম্ভব নয়। তাই বলা হইয়াছে—পরকীয়াভাব ব্রজবিনা অন্যত্র অসম্ভব।

## ১৬২। ব্রজ-পরকীয়া ভাব নিরবদ্য।

ব্রজসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা বলিয়া এবং প্রকটলীলায় পরকীয়া-ভাব স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়াভাব রসশাস্ত্রবিদ্গণের মতেও দূষণীয় নহে।

উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"উজ্জ্বলশুচিপর্য্যায়ে রসেঽস্মিন্নধর্ম্মময়ৌপপত্যম্ অঙ্গত্বায় নোচিতম্। জারঃ পাপপতিঃ সমাবিতি ত্রিকাণ্ডশেষাদি-

দর্শনেন নামাপি তস্য নিন্দাগর্ভমেব লভ্যতে। নাট্যালঙ্কারশাস্ত্রয়োস্তু তস্য ন্যক্কারশ্চ শ্রূয়তে। যদুক্তং তত্তন্মতং সংগৃহ্য সাহিত্যদর্পণে। উপনায়ক-সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ। বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ চ তথাঽনুভব-নিষ্ঠায়াম্। প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্র-তির্য্যগাদিগতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যম্ ইতি।”

ইহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই ঃ—উজ্জ্বল-শুচিপর্য্যায় মধুর-রসে অধর্ম্মময় ঔপপত্যকে রসের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। ত্রিকাণ্ডশেষাদি অভিধান হইতে জানা যায়—জার এবং পাপপতি এতদুভয় সমান। সুতরাং ‘উপপতি’ এই নামটীই নিন্দাগর্ভ। নাট্যশাস্ত্রে এবং অলঙ্কারশাস্ত্রেও ঔপপত্য ন্যক্কারজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণে বিভিন্ন মত সংগ্রহ করিয়া বলা হইয়াছে—উপনায়ক-বিষয়া রতি, মুনিপত্নী-গুরুপত্নী-বিষয়া রতি, বহুনায়কবিষয়া-রতি, তির্য্যগাদিগতা রতি—এসমস্ত রতি, শৃঙ্গার ( মধুর )-রসসিদ্ধির অনুপযোগিনী।”

প্রাচীন-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে ঔপপত্য যে দূষণীয় এবং নিন্দনীয়, তাহাই উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল। কিন্তু ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ নিন্দনীয়ত্ব যে প্রযুক্ত নহে, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণির মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে।

“লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥ নায়কভেদ-প্রকরণ।১৬॥

—ঔপপত্য-বিষয়ে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক সম্বন্ধেই ; পরন্তু রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে ( অর্থাৎ, রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য দূষণীয় নহে )।”

এইরূপে প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য যে রসবিরোধী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য যে রসবিরোধী নহে, তাহা জানাইয়া উজ্জ্বলনীলমণি অন্যত্র রসনিষ্পত্তি-বিষয়ে পরোঢ়া প্রাকৃত-নায়িকার অনৌচিত্যের কথা বলিয়াছেন।

“নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ ॥ নায়িকাভেদ-প্রকরণ।২॥

—নাট্যে এবং মুখ্যরসে যে পরোঢ়া রমণী নিষিদ্ধা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকা-সম্বন্ধে।”

ইহার পরেই পূর্ব্বাচার্য্যদের নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

“নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥

—প্রাচীন রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে অঙ্গী-কান্তারসে পরোঢ়া নায়িকাকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে—কমলনয়না ব্রজদেবীগণ ব্যতীত কেবল অন্য পরোঢ়া নায়িকা সম্বন্ধে। ব্রজদেবীগণ পরোঢ়া হইলেও রসশাস্ত্রে অনভিপ্রেত নহেন ; যেহেতু, রসবিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-মণ্ডল-শেখর কংসারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন।”

যাহারা বস্তুতঃই অন্যের পত্নী, তাহাদের লইয়াই প্রাকৃত বা লৌকিক ঔপপত্য। ইহা নীতি-বহির্ভূত, সমাজের শৃঙ্খলা-নাশক, অধর্ম্ম-জনক এবং নিরয়-প্রাপক। তাই রসশাস্ত্রে ইহা ঘৃণিত, বর্জ্জিত। কিন্তু প্রকটলীলায়

ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে ঔপপত্য, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের যে পরকীয়া-ভাব, রস-শাস্ত্রে তাহা ঘৃণিত বা বর্জ্জিত নয় ; যেহেতু, রস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজসুন্দরীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন—ইহাই হইল উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

ব্রজ-পরকীয়ারস নিন্দিত নহে কেন, তাহার হেতুরূপে উভয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে—রসনির্য্যাস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণও অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজদেবীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, পরকীয়া-রস আস্বাদনের জন্যই অবতার এবং ইহাও বুঝা যায়—প্রকট-লীলায় অবতীর্ণ না হইলে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে নিত্য অবস্থিতিসত্ত্বেও অপ্রকটে এই পরকীয়ারস আস্বাদিত হইতে পারিত না। "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥" ইত্যাদি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১।৪।২৫-২৬)-প্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যেও তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের স্বকীয়াভাব ; প্রকট-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা পরকীয়া-ভাবাপন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরকীয়া-রসনির্য্যাস আস্বাদন করাইয়া থাকেন ; সুতরাং প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের পরকীয়া-ভাব হইল প্রাতীতিক—অবাস্তব, আগন্তুক। ইহা স্বকীয়া-ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব পরকীয়া দূষণীয় ; কারণ ইহা অধর্ম্মজনক, নিরয়-প্রাপক, সামাজিকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে ; কিন্তু যে পরকীয়াভাব অবাস্তব, প্রাতীতিক, স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধর্ম্মজনকও নয়, নিরয়-প্রাপকও নয় এবং তাহা সামাজিকের মনেও ঘৃণার উদ্রেক করে না, বরং কৌতুকাবহ ব্যাপাররূপে রসাস্বাদনের পুষ্টিবিধানই করে। এজন্যই রসশাস্ত্রে ইহা দূষণীয় নহে। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করিবার একটী বিশেষ বিষয় এই যে, ঔপপত্যের বা পরকীয়াত্বের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দোষের বা দোষাভাবের বিচার করা হইয়াছে। যে কারণবশতঃ প্রাকৃত ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষযুক্ত, সেই কারণের অভাববশতঃই ব্রজের ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষমুক্ত। প্রাকৃত ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব বাস্তব বলিয়া নিন্দিত। ব্রজের ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব অবাস্তব বলিয়া অনিন্দিত। উভয় শ্লোকের শেষার্দ্ধের হেতুগর্ভ বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

ব্রজ-পরকীয়া-ভাবের স্বরূপের কথা বিবেচনা করিয়াই যে তাহাকে নিরবদ্য বলা হইয়াছে, উক্ত আলোচনা হইতে তাহাই জানা গেল। অন্য দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও তাহার নিরবদ্যতার কথা জানা যায়।

মুখ্যতঃ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কোনও কার্য্যের দোষ-গুণের বিচার করা হয়। উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তাহা হইলে আপাত-দৃষ্টিতে কার্য্যটী অসাধু হইলেও তাহাকে বাস্তবিক অসাধু বলা যায় না। বলবতী স্বসুখবাসনার তাড়নায় যাহারা অপকর্ম্ম করে, তাহাদের কার্য্য যেমন অসাধু, উদ্দেশ্যও তেমনি অসাধু। সুতরাং সেই কার্য্য উভয় দিক হইতেই অসাধু, নিন্দনীয়।

প্রাকৃত পরকীয়া-ভাবের মূলই হইতেছে স্বসুখবাসনার প্রাবল্য ; এজন্য ইহা নিন্দনীয়। কিন্তু ব্রজসুন্দরী-দিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও নাই, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তাহা নাই। তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত

হয়েন কেবলমাত্র পরস্পরের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে; ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। এজন্যই তাঁহাদের মিলন নিরবদ্য।

একথা শ্রীকৃষ্ণও নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীদের নিকটে স্বীয় অপরিশোধ্য চিরঋণিত্বের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

> ন পারয়েঽহং **নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং** বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা **মাভজন্** দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
>
> —শ্রীভা. ১০।৩২।২২॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদের সংযোগকে "নিরবদ্য" বলা হইয়াছে। তাঁহারা "দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলসমূহকে—স্বজন-আর্য্যপথ-বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্নকে" সম্যক্‌রূপে চ্ছেদন করিয়া লৌকিক-দৃষ্টিতে "পরপুরুষ" শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; তথাপি তাঁহাদের এই মিলনকে "নিরবদ্য" এবং "সাধুকৃত্য" বলা হইয়াছে। কেন? "যা মাভজন্"-বাক্যেই তাহার উত্তর পাওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন—স্বসুখ-বাসনার তাড়নায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের "ভজনের—প্রীতিবিধানের" উদ্দেশ্যে। এজন্যই তাঁহাদের আর্য্যপথ-ত্যাগাদি হইতেছে "নিরবদ্য" এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাও অসাধুকৃত্য না হইয়া হইয়াছে "সাধুকৃত্য"।

ইহা "নিরবদ্য" এবং "সাধুকৃত্য" বলিয়াই উদ্ধবাদি পরম-ভাগবতগণও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের প্রভাবে ব্রজসুন্দরীগণ দুর্জ্জর-গেহশৃঙ্খলকে সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, সেই প্রেম-লাভের উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীদিগের চরণরেণুদ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার বাসনায় ব্রজের কোনও একস্থানে তৃণগুল্ম হইয়া জন্মগ্রহণ করার জন্য উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করিয়াছেন। আবার শ্রীশুকদেব গোস্বামীও শ্রদ্ধার সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে পরাভক্তি লাভের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

## ১৬৩। ব্রজ-পরকীয়াভাব সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে, দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের সমক্ষে, শ্রীশুকদেবগোস্বামী যখন ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করিলেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, তাঁহার ঔপপত্যও অবাস্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যময়ী লীলাকাহিনীর বক্তা হইতেছেন বিষয়-মলিনতার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত দেবর্ষি-মহর্ষিগণ-সেবিত বিরক্ত-শিরোমণি পরম-ভাগবতোত্তম শ্রীশুকদেবগোস্বামী। তথাপি, সাধারণ-সামাজিকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ঃ ছিন্ধি সুব্রত ॥
শ্রীভা. ১০।৩৩।২৬-২৮ ॥

—হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মসেতুর (ধর্ম্মমর্য্যাদার) বক্তা, কর্ত্তা এবং অভিরক্ষিতা। তিনি কেন তাহার বিপরীত (অধর্ম্ম) আচরণ করিলেন? তিনি কেন পরদারাভিমর্ষণ করিলেন? যদুপতি আপ্তকাম হইয়াও কোন্ অভিপ্রায়ে এইরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? ইহাতে আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুব্রত! কৃপা করিয়া এই সংশয়ের ছেদন করুন।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নচেদমধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জ-ভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্ষণম্ ইতি।—ইহা কেবল অধর্ম্মমাত্র নহে; পরন্তু কলঞ্জ-ভক্ষণের ন্যায় মহাসাহস—পরদারাভিমর্ষণ-শব্দে তাহাই সূচিত হইতেছে।" বিষাক্ত বাণের দ্বারা নিহত মৃগ-পক্ষীর মাংসকে কলঞ্জ বলে। তাহা ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। স্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য্য এই যে—পরদারাভিমর্ষণ প্রায়শ্চিত্তার্হ অনাচার, পাপ।

মাহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—

**(ক)** ধর্ম্মসংস্থাপনের এবং অধর্ম্ম বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। অধর্ম্মের বিনাশও ধর্ম্ম-সংস্থাপনেরই অঙ্গীভূত। সুতরাং তিনিই যদি অধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে—তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। পরদারাভিমর্ষণ যে অধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ, তাহা তিনি জানেন। তিনি জানিয়া-শুনিয়া এই পাপকর্ম্ম কেন করিলেন? কলঞ্জ একটী বিষাক্ত দ্রব্য; ইহা জানিয়াও যে ব্যক্তি কলঞ্জ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি যে মহাসাহসের পরিচয় দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসংস্থাপক হইয়া পাপজনক পরদারাভির্ষণ কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মহাসাহসের পরিচায়ক নয়? ইহা কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পাপজনক নহে?

**(খ)** শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-সংস্থাপক এবং অধর্ম্ম-বিনাশকের আচরণ যে লোকে অনুসরণ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা বা অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণরূপ আচরণের অনুসরণ যদি লোকে করে, তাহা কি লোকের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে?

**(গ)** শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা-তাড়িত লোকের ন্যায় পরদারাভিমর্ষণরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করিলেন কেন?

**(ঘ)** এই পরদারাভিমর্ষণরূপ লীলা-প্রকটনে শ্রীকৃষ্ণের কি অভিপ্রায়?

শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

## ১৬৪। পরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি

উল্লিখিত প্রথম প্রশ্নের উত্তররূপে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
**তেজীয়সাং ন দোষায়** বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।২৯॥

—( ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি ) ঈশ্বরদিগেরও ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং এই ধর্ম্মব্যতিক্রমে তাঁহাদের সাহসও ( নির্ভয়তাও ) দৃষ্ট হয়। সর্ব্বভুক্ অগ্নি পবিত্র-অপবিত্র সমস্ত ভক্ষণ করিলেও যেমন অগ্নিকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ এ-সমস্ত তেজস্বী ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রম তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ হয় না।"

এই শ্লোকের "ঈশ্বরাণাং"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাম্। —প্রজাপতি ( ব্রহ্মা ), ইন্দ্র, সোম, ( চন্দ্র ), বিশ্বামিত্র-প্রভৃতির।" অন্যান্য সকল টীকাকারই এইরূপই অর্থ লিখিয়াছেন। ঈশ্বর-শব্দে এ-স্থলে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করা হয় নাই; পরবর্ত্তী এক শ্লোক হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন; ইন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিয়াছিলেন; চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীতে উপগত হইয়াছিলেন; বৃহস্পতি উতথ্য-পত্নী-গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্তই ধর্ম্মমর্য্যাদার বিরোধী—সুতরাং পাপ-কার্য্য। কিন্তু ব্রহ্মাদির এতাদৃশ আচরণকে তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নয় বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। তাহার হেতু প্রকাশ করা হইয়াছে—দুইটী শব্দে—"ঈশ্বরাণাম্" এবং "তেজীয়সাম্।" তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া এবং তেজস্বী বলিয়া এ-সমস্ত ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যও তাঁহাদের পক্ষে দোষাবহ নয়—ইহাই শ্রীশুকদেবের উক্তির তাৎপর্য্য। এই দুইটী শব্দের অর্থে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই শ্রীশুকদেবের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—ঈশ্বরাণাং কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিতানাম্—ঈশ্বর-শব্দের তাৎপর্য্য এস্থলে কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিত। যাঁহারা কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, কর্ম্মের ফল যাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, এ-স্থলে তাঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মের ঈশ্বর, কর্ম্ম তাঁহাদের ঈশ্বর নয়। মায়াবদ্ধ প্রাকৃত লোক যেমন কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ হয়েন না। কেন? তাঁহারা তেজীয়ান্ বলিয়া। তেজীয়ান্-শব্দের তাৎপর্য্য কি? শ্রীমদ্‌বীররাঘবাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তেজীয়স্ত্বমত্র শাস্ত্রবশ্যতানাপাদকসমর্থত্বরূপং বিবক্ষিতম্।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তেজীয়সাং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সামর্থ্যং তেজঃ তজ্জুষাম্।" শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অতিতেজস্বিনাং সর্ব্বকর্ম্মদহনসমর্থানাম্।" শ্রীপাদ শুকদেব তাঁহার সিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকায় লিখিয়াছেন—"তেজীয়সাং তপ-আদিতেজো-যুক্তানাম্।" শ্রীমদ্‌বিজয়ধ্বজতীর্থ "ঈশ্বরাণাং"-শব্দের অর্থমধ্যেই তেজঃ-শব্দের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরাণাং যোগৈশ্বর্য্যপারঙ্গতানাম্।"

এই সমস্ত টীকা হইতে জানা গেল—"তপস্যাদি হইতে ভগবৎ-কৃপায় যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, সেই

যোগৈশ্বর্য্য হইতে উদ্ভূত যে প্রভাব, যে প্রভাবের ফলে কিছু-করার-না-করার বা অন্যথা-করার সামর্থ্য জন্মে, যে প্রভাবের ফলে সর্ব্বকর্ম্ম-দহন-সামর্থ্য জন্মে, যে প্রভাবের ফলে শাস্ত্রবশ্যতার অতীত হওয়ার সামর্থ্য জন্মে, সেই প্রভাবই হইতেছে তেজঃ-শব্দের তাৎপর্য্য। এইরূপ তেজ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই এই শ্লোকে "তেজীয়ান্" বলা হইয়াছে।

এইরূপ তেজীয়ান্ যাঁহারা, তাঁহাদের ধর্ম্মব্যতিক্রম দোষাবহ নহে কেন? শ্রীমদ্‌বীররাঘবাচার্য্য লিখিয়াছেন "পদার্থানাং বিলক্ষণ-শক্তিকত্বাদিতি তাৎপর্য্যম্। তত্র দৃষ্টান্তমাহ-যথা বহ্নেরিতি। —বস্তুসমূহের বিলক্ষণ শক্তি আছে বলিয়া; বহ্নির দৃষ্টান্তে শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।" অগ্নি সমস্ত বস্তুকে দাহ করিয়াও যেমন দাহ্যবস্তুর মালিন্যাদিদ্বারা মলিন হয় না, ইহা যেমন অগ্নির শক্তির একটা বিশেষত্ব, তদ্রূপ তেজীয়ান্ লোকদিগেরও এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে ধর্ম্মব্যতিক্রম-জনিত পাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা। ভগবদ্ভজনাদির প্রভাবে তাঁহারা আর কর্ম্মের বা কর্ম্মফলের অধীন থাকেন না। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী হইতে ইহাই বুঝা যায়। "ঈশ্বরাণাং জ্ঞানে ভক্তৌ চ সামর্থ্যবতাং ভগবদ্ভজনাদিনা কর্ম্মাদিপারতন্ত্র্যরহিতানাম্।"

এইরূপে দেখা গেল—"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ভগবৎ-কৃপায় সাধন-ভজনের ফলে ব্রহ্মাদি যে অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই লোকের দৃষ্টিতে যাহা ধর্ম্মবিগর্হিত পাপজনক কার্য্য, সেই কার্য্য করিয়াও তাঁহারা পাপলিপ্ত হয়েন না।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যকে আরও পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে শ্রীলশুকদেব গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—

"কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েন বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ শ্রীভা ১০।৩৩।৩২॥

এই ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ নিরহঙ্কারী; তাই পুণ্যাচরণদ্বারাও ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহাদের কোনও ফল নাই, পাপাচরণেও তাঁহাদের কোনও অনর্থ হয় না।" অর্থাৎ কোনও রূপ কর্ম্মফলই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ধর্ম্মব্যতিক্রমরূপ কর্ম্মের ফল সাধন-প্রভাবসম্পন্ন তেজীয়ান্ ব্যক্তিদিগকে কেন স্পর্শ করিতে পারে না, এই শ্লোকের "নিরহঙ্কারিণাম্"-শব্দে তাহা বলা হইয়াছে।

দেহেতে যে অহং-বুদ্ধি, তাহারই নাম অহঙ্কার। এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই নিরহঙ্কারী। "অনাত্মনি দেহে আত্মাভিমানরহিতানামিত্যর্থঃ। বীররাঘবাচার্য্য।" আত্মা (জীবাত্মা) হইতেছে চিদ্‌বস্তু, জড় নহে। জীবের দেহ হইতেছে অচিৎ বা জড় বস্তু, চিৎ নহে। জড়দেহকেই যাহারা আত্মা বা আমি (অহং-দেহী) বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকেই অহঙ্কারী বলা হয়। যাঁহারা এইরূপ অহঙ্কারী নহেন, জড়দেহে যাঁহাদের আত্মবুদ্ধি নাই, তাঁহারা নিরহঙ্কার। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলে এইরূপ দেহাভিমান জন্মে; এই দেহাভি-মানই আবার পর-পর-কর্ম্মের হেতু হয়। সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎ-কৃপায় যাঁহাদের দেহাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, কর্ম্মের মূলও তাঁহাদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তখন আর কর্ম্মবশ্য থাকেন না, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মের বশীভূত হইয়া কোনও কর্ম্ম করেন না, যেহেতু, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে আবার পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্মের প্রশ্ন কিরূপে উঠিতে পারে ? তবে কেন বলা হইল—নিরহঙ্কার বলিয়া পুণ্যকর্ম্মই হউক, কি পাপকর্ম্মই হউক—কোনও কর্ম্মের ফলে তাঁহারা স্পৃষ্ট হয়েন না। পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করার প্রবৃত্তি কেন তাঁহাদের হয় ?

উত্তর এই। পূর্ব্ব-কর্ম্ম নষ্ট হয় বটে ; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম—অর্থাৎ যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সেই কর্ম্ম—নষ্ট হয় না। প্রারব্ধকর্ম্মই পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম করায়। "কুশলেতি-প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণমাত্রমেব। শ্রীধরস্বামী।" কিন্তু নিরহঙ্কার বা দেহাভিমানশূন্য বলিয়া সেই প্রারব্ধকর্ম্মে তাঁহাদের আবেশ থাকে না, বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। মায়ার গুণ-প্রভাবে দেহেন্দ্রিয়াদিই কর্ম্ম করে। যতক্ষণ দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জীব দেহের কর্ম্মকে নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ॥৩।২৭॥"

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাতে যাঁহাদের দেহাভিমান দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—দেহ বা ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে—তাঁহারা নহেন।

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ গীতা॥ ৩।২৮॥"

এজন্য প্রারব্ধ কর্ম্মে তাঁহাদের বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। বুদ্ধি লিপ্ত হয় না বলিয়া কর্ম্মের ফল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ গীতা॥ ১৮।১৭॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কৃত ভাব যাঁহার নাই, যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হয় না, এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াও তিনি বিনাশ করেন না এবং বিনাশ-নিমিত্ত ফলের দ্বারাও তিনি আবদ্ধ হয়েন না।" গীতায় আরও বলা হইয়াছে—এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না, কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার কোনও প্রত্যবায় হয় না।

"নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন॥ গীতা ॥৩।১৮॥"

শ্রীশুকদেবোক্ত পূর্ব্বশ্লোকে "তেজীয়সাং ন দোষায়"—এই বাক্যে যে তেজের কথা বলা হইয়াছে, সেই তেজ হইতেছে—সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎকৃপা হইতে জাত অহঙ্কারহীনত্ব হইতে উদ্ভূত প্রভাব। এইরূপ প্রভাব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত ; প্রারব্ধবশতঃ যে কর্ম্ম তাঁহারা করেন, তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি লিপ্ত হয় না বলিয়া সেই কর্ম্ম ধর্ম্মবিগর্হিত হইলেও তাহার ফল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; সুতরাং তাঁহাদিগকে পাপলিপ্ত হইতে হয় না।

### খ। কৈমুত্যন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকার্য্যের দোষহীনতা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পরীক্ষিতের প্রশ্ন ছিল শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণ সম্বন্ধে। কিন্তু শুকদেব শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মাদির কথা বলিলেন কেন ?

শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—“পরমেশ্বরে কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তিমাহ—ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি।—কৈমুতিক-ন্যায় অনুসারে পরমেশ্বরে দোষ-পরিহার করিবার নিমিত্ত সামান্যরূপে মহদ্‌গণের বৃত্তান্ত বলিতেছেন—ধর্ম্মব্যতিক্রম ইত্যাদি বাক্যে।”

কৈমুতিক-ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরমেশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত মহদ্‌ব্যক্তিদিগকেও যখন ধর্ম্মব্যতিক্রম-দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, তখন পরমেশ্বরকে যে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ? পরবর্ত্তী শ্লোকে শুকদেব নিজেই তাহা বলিয়াছেন।

“কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৩-৩৪ ॥”

—( ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত নিরহঙ্কার মহদ্‌ব্যক্তিগণকেও যখন ধর্ম্মব্যতিক্রম-জনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, তখন ) তির্য্যক্ ( পশু-পক্ষী-আদি ), মনুষ্য এবং দেবতা-আদি সমস্ত জীব যাঁহাকর্ত্তৃক নিয়ম্য এবং যিনি তির্য্যগাদি সমস্ত জীবের নিয়ন্তা এবং সকলের যথাযথ কর্ম্মফলদাতা, কুশল ও অকুশলের ( পাপ-পুণ্যের ) সহিত তাঁহার যে কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? যাঁহার পাদপদ্মের পরাগের ( কান্তি-পরমাণুর ) নিষেবন ( ধ্যানানুশীলন )-দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং ভক্তিযোগ-সহকারে যাঁহার ভজন করিয়া মুনিগণও নিখিল-কর্ম্মাত্মক-বন্ধনের নিরাকরণপূর্ব্বক বন্ধনদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন ( অর্থাৎ বিহিত বা অবিহিত কর্ম্ম করিয়াও তদ্দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না ) এবং যিনি স্বীয় ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মাণ্ডে স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করেন, যাঁহার নিয়ন্তাও কেহ নাই, যিনি কাহাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিতও হয়েন না, তাঁহার ( সেই শ্রীকৃষ্ণের ) আবার বন্ধন কোথায় ?”

যাঁহার নিয়ন্তা থাকে, তিনিই নিয়মের অধীন। নিয়ম-পালনজনিত পুণ্য এবং নিয়ম-লঙ্ঘনজনিত পাপ তাঁহাকেই স্পর্শ করে। কিন্তু যিনি সর্ব্ববিধ নিয়মের এবং নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে, তাঁহাকে তাঁহার কোনও কর্ম্মের ফলই স্পর্শ করিতে পারে না।

মায়াবদ্ধজীব কর্ম্মফলভোগের জন্য ভোগায়তন দেহ পাইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার দেহ কর্ম্মাধীন ; সেই দেহ পাঞ্চভৌতিক, জড়—সুতরাং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। সেই ভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের কর্ম্মকে জীব নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করে ; তাহাতে তাহার কর্ম্মবন্ধন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; তাঁহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই। সেই দেহ কর্ম্মাধীনও নহে। তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় সচ্চিদানন্দ দেহ প্রকটিত করেন। তাঁহার এই সচ্চিদানন্দ দেহের কর্ম্ম তাঁহারই কর্ম্ম। তাঁহার এই কর্ম্ম—দিব্যকর্ম্ম। জীবের ন্যায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মফলজনিত বাসনার প্রেরণায় কৃত কর্ম্ম নহে ; তাঁহার এই দিব্য কর্ম্ম হইতেছে—আনন্দের উচ্ছ্বাসে কৃত কর্ম্ম এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য কৃত কর্ম্ম। তাঁহার এতাদৃশ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হইতে পারে না।

মায়াবদ্ধ জীবও যাঁহার কৃপায় সাধন-ভজনের ফলে কর্ম্মফলের অতীত হইয়া যাইতে পারে, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায় ?

যাঁহার দর্শনে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার আবার কর্ম্মবন্ধন কিরূপে হইতে পারে ?

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ শ্রুতিঃ ॥"

শ্রীশুকদেব এইরূপে দেখাইলেন যে, কোনওরূপ কর্ম্মের ফলই শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে সকল মহদ্‌ব্যক্তির দৃষ্টান্তের অবতারণা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাঁহারা যে সকল রমণীতে উপগত হইয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাঁহারা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মাদির পক্ষে পরকীয়া রমণী। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপনারীর সঙ্গে রাসলীলায় বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাস্তবিক পরকীয়া নারী ছিলেন, তাহা হইলেও এতাদৃশ পরদারাভিমর্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ বা পাপজনক নয়, কৈমুত্যন্যায়ে শ্রীশুকদেব তাহাই দেখাইলেন। ইহাই পরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

## ১৬৫। পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন। পরদারাভিমর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নিজের পক্ষে পাপজনক না হইলেও, যাহারা ইহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার অনুকরণ করিবে, তাঁহাদের তো প্রত্যবায় হইবে ? নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

### (ক) ঈশ্বরের বাক্যই অনুসরণীয়, সকল কার্য্য অনুকরণীয় নহে

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥
—শ্রীভা. ১০।৩৩।৩০-৩১ ॥

—অনীশ্বর ( দেহাদিপরতন্ত্র ॥ স্বামী ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ॥ শ্রীজীব ) জীব কখনও ইহা (ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিরূপ কার্য্য ) মনের দ্বারাও সমাচরণ ( একাংশেও আচরণ ) করিবেনা ( দেহের এবং বাক্যের আচরণ তো দূরে )। রুদ্রভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রোদ্ভব কালকূট ভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাবশতঃ ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিরূপ কার্য্যের আচরণ করিলেও বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। ঈশ্বরদিগের বাক্যই ( আজ্ঞাই ) সত্য ( প্রমাণরূপে গ্রহণীয় ); কিন্তু তাঁহাদিগের আচরণ ক্বচিৎ সত্য। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরদিগের নিজ বাক্যের অবিরোধী যে আচরণ, তদ্রূপ আচরণই করিবেন।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী এ-স্থলে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিরূপ আচরণ জীবের অনুকরণীয় নহে। তাঁহার আদেশই অনুসরণীয়।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্ন তু কৃষ্ণবৎ।

ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ। ১২॥

—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণতুল্য আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না। এইরূপই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের নির্ণীত তাৎপর্য্য।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মধুর রসের কথা তো দূরে, অন্যরসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নহে। আস্তাং তাবদস্য রসস্য বার্ত্তা রসান্তরেঽপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ॥" কৃষ্ণবৎ আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবৎ আচরণের বিধি দেওয়া হইল। ভক্তের আচরণের অনুকরন-সম্বন্ধেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। সিদ্ধভক্তের সমস্ত আচরণও অনুকরণীয় নহে; যেহেতু, "যৎপাদপঙ্কজ-পরাগনিষেবতৃপ্তা"—ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৪-শ্লোক হইতে জানা যায়—সিদ্ধভক্তদের মধ্যেও কখনও কখনও স্বৈরাচার দেখা যায়। আবার সাধক-ভক্তদের আচরণও সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে; কারণ, "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"—এই গীতা (৯।৩০)-শ্লোকের মর্ম্মে জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও সুদুরাচার—পরস্বাপহারী পরস্ত্রীগামী আদি—আছেন; তাঁহাদের এ-সমস্ত গর্হিত আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্ব্বক আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যে সমস্ত ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ পালন করেন, তাঁহাদের ভক্তি-শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে। "নন্বু ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোঽনুসরণীয়ঃ। নাদ্যঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ যথাহি যৎপাদপঙ্কজপরাগেত্যত্র স্বৈরং চরন্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেষু মধ্যে সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদিভিঃ। মৈবম্। বর্ত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশাস্ত্রোক্তা যে বিধয় স্তদ্বন্ত এবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ ন তু কৃষ্ণবৎ॥ উজ্জ্বলনীলমণি। কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ। ১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥"

ভক্তিশাস্ত্রের যাহা বিধি, তাহাই হইতেছে ভগবানের বাক্য, তাহাই অনুকরণীয়। শ্রীশুকদেবও তাহাই বলিয়াছেন— "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যম্।" ভগবানের আচরণ সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয় নহে। কোনও কোনও আচরণ অবশ্য অনুকরণীয় হইতে পারে। "তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ॥" কোন্ কোন্ আচরণ অনুসরণীয়? "তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥" ঈশ্বরদিগের যেই আচরণ তাঁহাদের বাক্যের সহিত—শাস্ত্রে উপদিষ্ট বাক্যের সহিত— সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণই অনুসরণীয়, অন্য আচরণ অনুসরণীয় নয়। ইহাতেও তাঁহাদের বাক্যের বা উপদেশের অনুসরণীয়তার কথাই বলা হইল।

শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের আচরণ জীবের অনুসরণীয় আদর্শ নহে।

ভগবানের আচরণ হইতেছে তাঁহার লীলা। তিনি লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে এবং স্বরূপ-শক্তির বা আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেরণায়। স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের সংস্রবই সম্ভব নয়। সুতরাং

ভগবানের লীলার অনুকরণ করিতে যাইয়া জীব প্রাকৃত জীবের সঙ্গে প্রাকৃত ব্যবহারই করিবে এবং তাহাও করিবে স্বীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনার প্রেরণায়। সুতরাং তাহা হইবে তাহার নিরয়-প্রাপক, বন্ধনের হেতু। এজন্যই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— দেহে বা বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করা তো দূরে, মনে মনেও তাহা করিবেনা, করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। মহাদেব কালকূট ভক্ষণ করিতে পারেন; যেহেতু, কালকূট তাঁহার উপরে কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নয়; কিন্তু কোনও জীব তাহা ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎই বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আচরণ—বিশেষতঃ রাস-লীলায় ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত আচরণ—জীবের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। অজ্ঞতাবশতঃ কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

## ১৬৬। পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি

### রাসলীলা পরদারাভিমর্ষণ নহে

এক্ষণে পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আলোচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও পরদারাভিমর্ষণ-রূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করিলেন কেন?

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৫॥

—যিনি গোপরমণীগণের ও তৎপতিদিগের এবং সকল দেহীরই অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিচরণ করেন এবং যিনি অধ্যক্ষ (বুদ্ধি-প্রভৃতির সাক্ষী), সেই-এই-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার জন্যই দেহ প্রকটিত করিয়াছেন। ('ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্'-স্থলে 'এষ ক্রীড়নদেহভাক্'-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। এস্থলে অর্থ হইবে—তাঁহার ক্রীড়নরূপগোপীদের দেহকে ভজনা করিয়াছেন)।

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন— "পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃত-মিদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ—গোপীনামেতি। —এপর্য্যন্ত গোপীদের পরদারত্ব (যুক্তির অনুরোধে) স্বীকার করিয়া, তাহা যে দোষাবহ নহে, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে 'গোপীনা-মিত্যাদিবাক্যে'—দেখান হইতেছে যে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে পরদার-সেবা বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।"

বৈষ্ণবতোষণী-টীকার প্রারম্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ। তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্যতীতি তদসহমানস্তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি গোপীনামিতি।—এইরূপে গোপীদিগের পরদারত্ব স্বীকার করিয়াই দেখান হইয়াছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু পরদারসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও তাহাতে গোপীদিগের

কুলটাত্ব, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জারত্ব, অপনীত হয় না। কুলটাত্ব এবং জারত্ব পরম ধিক্কারেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীশুকদেবের পক্ষে তাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই তিনি—'গোপীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকে-গোপীদিগের পরদারত্বই খণ্ডন করিতেছেন।"

উল্লিখিত শ্লোকটীর আলোচনা করিলেই স্বামিপাদের এবং শ্রীজীবপাদের উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার এবং বৈষ্ণবতোষণীর আনুগত্যে শ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে।

শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ সকলের অন্তরে বিচরণ করেন—গোপীদিগের অন্তরে, তাঁহাদের পতিদিগের (পতিম্মন্যদিগের) অন্তরে এবং সকলেরই ( গো-গোপ-পক্ষি-মৃগাদি সকলেরই ) অন্তরে বিচরণ করেন বলিয়া তিনি সকলের অধ্যক্ষ —বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী। সুতরাং তিনি পরমাত্মা। পরমাত্মার পক্ষে "পর" বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। যাঁহার "পর" বলিয়া কেহ নাই, তাঁহার পক্ষে আবার "পরদার" কিরূপে থাকিতে পারে ? "বুদ্ধ্যাদি-সাক্ষী পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। অতো ন তস্য পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা পরদারা ইতিভাবঃ॥ তোষণী॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—পরমাত্মা তো নিরাকার বলিয়াই শুনা যায়। নিরাকার পরমাত্মার পক্ষে "পর" বলিয়া কেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আকার-বিশিষ্ট। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তো "পর" বলিয়া কেহ থাকিতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। প্রথমতঃ, পরমাত্মার নিরাকারত্ব-সম্বন্ধে। অন্তর্য্যামিত্ব অবস্থায় আকারের অপেক্ষার অভাববশতঃই পরমাত্মাকে নিরাকার বলিয়া মনে করা হয়। বস্তুতঃ পরমাত্মা নিরাকার নহেন।

কঠোপনিষদে পরমাত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র" বলা হইয়াছে। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥ ২।৩।১৭॥" এ-স্থলে পরমাত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ" বলাতে তাঁহার সাকারত্বই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমাত্মাকে "প্রাদেশমাত্র পুরুষ" এবং "শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ" বলা হইয়াছে; তিনি সকলের হৃদয়ে "বাস করেন—বসন্তম্।"

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ —শ্রীভা. ২।২।৮॥"

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের দেহবিশিষ্টতা-সম্বন্ধে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের ন্যায় দেহবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার দেহ জীবের দেহের ন্যায় নহে। জীব কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ভোগায়তন দেহ ধারণ করে; শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ কর্ম্ম কিছু নাই; সুতরাং তাঁহার দেহও জীবের ন্যায় ভোগায়তন দেহ নহে। জীবের দেহ প্রাকৃত, পাঞ্চভৌতিক—সুতরাং অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণের দেহ অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ, নিত্য। স্বরূপতঃই তিনি নরাকৃতি। "নরাকৃতিং পরং ব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণ॥ দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। গোপালতাপনী শ্রুতিঃ॥" জীবের দেহ ও দেহী ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহী-ভেদ নাই। বিগ্রহই তিনি, তিনিই বিগ্রহ। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। জীব কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্ম গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিমিত্ত স্বীয় অনাদিসিদ্ধ নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন। "ক্রীড়নেনেহ দেহ-ভাক্।" জীব পরস্পরের আত্মা নহে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সকলের আত্মা।

তিনি এক বিগ্রহেই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।", "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি।", "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"-ইত্যাদি শ্রুতি॥ তিনিই পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। পরমাত্মারূপে তাঁহার "পর" বলিয়া কেহ যখন নাই, শ্রীকৃষ্ণরূপেও তাঁহার "পর" বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে "পরদার" বলিয়াও কেহ থাকিতে পারে না।

"অধ্যক্ষ"-শব্দের আরও একটী তাৎপর্য্য আছে। যিনি যাহাদের অধ্যক্ষ, তিনি তাহাদের অধিষ্ঠাতা। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যের যোগ্যতা দান করেন এবং যোগ্যতানুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করেন। আলোচ্য-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে গোপী-প্রভৃতি সকলেরই অধ্যক্ষ বলা হইয়াছে। সুতরাং গোপী-প্রভৃতির বুদ্ধি-আদির, চিত্তের ভাবাদির, প্রেরকও তিনি। "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপম্" ইত্যাদি ( শ্রীভা. ১০।৪৪।১৪ )-বাক্যে মথুরানাগরীগণ গোপীদিগের যে ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, "কাত্যায়নি মহামায়ে"–ইত্যাদি ( শ্রীভা. ১০।২২।৪ )-বাক্যে কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব ( পতিভাব ) প্রকাশ পাইয়াছে, "অপি বত মধুপুর্য্যাম্"-ইত্যাদি ( শ্রীভা. ১০।৪৭।২১ )-বাক্যে উদ্ধবের নিকটে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যে অত্যন্ত মমতাময়-ভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভাবের প্রেরকও তাঁহাদের চিত্তের অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণই। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণপতিরূপে মনে করিতেন, বিশেষরূপে কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের "নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥ শ্রীভা. ১০।২১।৪॥" —এই বাক্য হইতে, অতি স্পষ্ট ভাবেই তাহা জানা যায়। ইহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদিগের পতিরূপ অধ্যক্ষ।

অন্তর্য্যামী অধ্যক্ষরূপে, তাঁহার কান্তারূপে তাঁহার সেবার জন্য গোপীদিগের চিত্তে বাসনা জাগাইয়া বহিঃ-প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। অন্তর্য্যামিরূপে তিনি গোপীদিগের চিত্তে যে ভাব জাগাইয়াছেন—তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পতিভাব এবং নিজেদের সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীত্বের ভাব। বাহিরেও সেই ভাবানুকূল ব্যবহারই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে নিত্যই যখন গোপীদিগের চিত্তে বিচরণ করেন, নিত্যই যখন তাঁহাদের বুদ্ধি-আদিকে পরিচালিত করেন এবং বহিঃপ্রকটিত বিগ্রহেও যখন তাঁহাদের বুদ্ধিপ্রেরিত বাসনার অনুরূপ ভাবে তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা যে তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী, তাহাই সূচিত হইতেছে।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির উক্তিও গোপীদিগের নিত্য-শ্রীকৃষ্ণপত্নীত্বের পরিপোষক। "যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈ-র্বেদৈ-র্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষু আবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি।—দুর্ব্বাসা-ঋষি ব্রজসুন্দরীগণকে

বলিয়াছেন—যিনি গো-সকলে বিদ্যমান্, যিনি গো-সকলকে পালন করেন, যিনি গোপসকলে অধিষ্ঠিত, যিনি সকলবেদে অধিষ্ঠিত, সকলবেদ যাঁহার গুণ-মহিমাদি কীর্ত্তন করেন, যিনি ভূতসকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত-সকলের বিধান করেন ( অর্থাৎ যিনি ভূতসকলের অন্তর্য্যামী ), সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।"

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণরূপত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৩৭॥"

এই শ্লোকে ব্রহ্মা গোপসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের "কলা—শক্তি" এবং "নিজরূপ—আত্মস্বরূপ" বলিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপা। সুতরাং তাঁহারা স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাই।

ব্রহ্মসংহিতায় গোপাঙ্গনাদের লক্ষ্মীত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপুরুষত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
—ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫।২৯ ॥"

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। ইত্যাদি।
—ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।৫৬॥"

গোপীগণ লক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ পরম-লক্ষ্মীপতি পরম-পুরুষ বলিয়া এবং এই পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীস্বরূপা গোপীগণকর্ত্তৃক নিত্য-সেবিত বলিয়া তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ হইতে জানা গেল—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ, তাঁহার স্বকীয়শক্তি; তাঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। তিনিও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাবোচিত ক্রীড়া করেন। সুতরাং তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়নকতুল্যা—ক্রীড়া-পুত্তলিকা-তুল্যা। আলোচ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের "ক্রীড়নদেহভাক্ ( পাঠান্তর )"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইতেছে। গোপীগণ তাঁহার স্বকীয়-ক্রীড়নকতুল্যা বলিয়া তিনি তাঁহাদের দেহের ভজনা ( দেহ লইয়া ক্রীড়া ) করেন। তাঁহারা তাঁহার "পর" নহেন।

শ্লোকস্থ "ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্"-বাক্যের তাৎপর্য্যও তদ্রূপ। ক্রীড়ার ( লীলার ) জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে স্বীয় অনাদিসিদ্ধ দেহ প্রকটিত করিয়াছেন—অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিত্যপরিকরদের লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গোপসুন্দরীগণও তাঁহাকর্ত্তৃক লীলার্থ অবতারিত বলিয়া তাঁহারই স্বকীয় নিত্যপরিকর; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার "পর—পরকীয়াকান্তা" নহেন।

আলোচ্য "গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকসমন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭১-

অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"অন্তরন্তঃস্থিতমপ্রকটং যথা স্যাত্তথা গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ তৎপতিম্মন্যানাং ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষামেব গোকুলযুবরাজতয়া অধ্যক্ষশ্চ সন্ যশ্চরতি ক্রীড়তি স এব প্রকটলীলাগতোঽপি ভূত্বা সর্বেষাং বিশ্ববর্ত্তিনাং দেহিনাম্ অপি ক্রীড়নদেহভাক্ সন্ তেষাং পালনত্বেনাধ্যক্ষোঽপি সন্ চরতি তস্মাদ্ অনাদিত এব তাভিঃ ক্রীড়াশালিত্বেন স্বীকৃতত্বাৎ তচ্ছক্তিরূপাণাং তাসাং সঙ্গমে বস্তুত এব পরদারতাদোষোঽপি নাস্তি। –অন্তঃ—অন্তঃস্থিত অপ্রকটরূপে গোপীগণের এবং তাঁহাদের পতি—পতিম্মন্য—গণের ক্রীড়ার জন্য দেহধারী ( নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশমান ) এবং গোকুল-যুবরাজরূপে তাঁহাদের অধ্যক্ষ হইয়া যিনি বিচরণ করেন ( ক্রীড়া করেন ), তিনি এই প্রকটলীলাগত হইয়াও বিশ্ববর্ত্তী নিখিল-দেহিগণের ক্রীড়ার জন্য দেহধারী এবং তাহাদের পালকরূপে অধ্যক্ষ হইয়াও বিচরণ করেন। সুতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণের সহিত ক্রীড়াশীল—ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার শক্তিরূপা গোপীদের সহিত তাঁহার সঙ্গমে পরদারতা-দোষও নাই।"

এইরূপে, আলোচ্য-শ্লোকে শ্রীশুকদেব দেখাইলেন—গোপীগণ যখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারা নহেন, তখন তাঁহাদের সহিত রাসলীলায় বিলসিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মব্যতিক্রম করা হয় নাই ; সুতরাং তাঁহার এই আচরণ বস্তুতঃ জুগুপ্সিতও নয়। আপ্তকাম হইয়াও তিনি যে গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গোপীপ্রেমবশ্যতা এবং ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতাই সূচিত হইতেছে।

ইহাই পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—গোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা না হইলেও পরকীয়া কান্তা মনে করিয়াই তো তিনি তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতিসেবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীশুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়ার শক্তিতে মোহিত হইয়া ব্রজবাসী গোপগণ স্ব-স্ব-পত্নীগণকে স্ব-স্ব-পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।"

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭১-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"তেষাং তৎপতিত্বং চ 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যাদি-বক্ষ্যমাণদিশা', তেষাং তাসাঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রং ন তু দৈহিকম্। তাদৃশ-প্রতীতি-সম্পাদনঞ্চ তাসামুৎকণ্ঠাপোষার্থমিতি তৎপ্রকরণসিদ্ধান্তস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা।—গোপগণে তাঁহাদের ( গোপীগণের ) পতিত্ব—নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়-ইত্যাদি শ্লোকোক্তি-অনুসারে প্রাতীতিকমাত্র, দৈহিক নহে। ব্রজসুন্দরীগণের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির জন্যই এই প্রতীতি সম্পাদন করা হইয়াছে॥ ইহা ( পরবধূত্ব )-প্রকরণ ঘটিত সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গোপসুন্দরীদের সহিত অন্যগোপদের যে বিবাহ, তাহা মায়াময়, সত্য নহে।

সেই বিবাহ সত্য নহে বলিয়া গোপীগণের পর-পত্নীত্বও সত্য নহে। ইহা প্রাতীতিকমাত্র। গোপগণ মনে করিতেন মাত্র—গোপীগণ তাঁহাদের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে গোপীগণ যখন গৃহে থাকিতেন না, তখন যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে গোপীদিগের অনুরূপ দেহ প্রকটিত করিতেন; তাঁহারাই গোপদের গৃহে থাকিতেন। গোপগণও মনে করিতেন—তাঁহাদের পত্নীগণ গৃহেই আছেন। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহাদের সহিতও গোপদের সঙ্গমাদি হইত না, তদ্রূপ ইচ্ছাও গোপদের চিত্তে জাগ্রত হইত না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীদের অনুরূপ মূর্ত্তির সহিতও অন্য কাহারও কোনওরূপ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব নহে। গোপীদিগের প্রতিমূর্ত্তিকেও যখন যোগমায়া অন্য স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতেন, তখন গোপীদিগকেও যে রক্ষা করিতেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে।

এইরূপে দেখা গেল—গোপীদের পরকীয়াত্ব প্রাতীতিকমাত্র, বাস্তব নহে। বাস্তব নহে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহাদের সহিত বিহারও বস্তুতঃ পরদারাভিমর্ষণ নহে।

ইহাও পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের অন্তর্ভুক্ত।

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিতে গোপীদিগের পরকীয়া-পত্নীত্ব প্রাতীতিকমাত্র—ইহাই জানা গেল। এই প্রতীতি শ্রীকৃষ্ণেরও বিদিত ছিল। তথাপি যে তিনি তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছেন, তাহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণই হইয়াছেন—পরকীয়া-কান্তারস আস্বাদনের নিমিত্ত। তাঁহার পক্ষে বাস্তব পরকীয়া কান্তা যখন সম্ভব নয়, তখন স্বকীয়া কান্তাতেই যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়াভাব সঞ্চারিত করিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ১।১।১৬৯ ক (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

## ১৬৭। পরীক্ষিতের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি

এক্ষণে মহারাজ পরীক্ষিতের চতুর্থ বা শেষ প্রশ্নের আলোচনা করা হইতেছে।

প্রশ্নটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ ঃ—ভগবান্ আপ্তকাম হইয়াও ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হয়েন কেন? বহির্দৃষ্টিতে যাহা লোকবিগর্হিত, এইরূপ পরদারাভিমর্ষণরূপা রাসলীলা তিনি কি অভিপ্রায়ে করিলেন?

### ক। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ শ্রীভা. ১০।৩৩।৩৬ ॥
( "ভূতানাং"-স্থলে "ভক্তানাং"—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।)

—জীবদিগের প্রতি ( পাঠান্তর অনুসারে ভক্তদিগের প্রতি ) অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নরাকার দেহ প্রকটিত করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সেই সকল লীলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যে-সকল লীলার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ( তৎপর ) ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে।"

"ভক্তানাম্"-পাঠস্থলে "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-অংশের তাৎপর্য্য এইরূপ। ভক্ত সাধারণতঃ দুই

প্রকার—সিদ্ধভক্ত ও সাধকভক্ত। সিদ্ধভক্ত হইতেছেন—নিত্যসিদ্ধ এবং সাধকসিদ্ধ—এই দুই রকমের। দুই রকমের সিদ্ধভক্তই শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-ভক্ত, তাঁহার লীলার সহচর। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে—তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যাহা কিছু করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই হইতেছে—ভক্তচিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" তিনি আপ্তকাম বলিয়া অভাব-পরিপূরণের জন্য তাঁহার কোনও বাসনার উদ্রেক হয় না; কিন্তু তিনি রসস্বরূপ বলিয়া লীলারস-আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা জন্মে ( ১।১।১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। পরিকর-ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদনও করেন এবং রসাস্বাদনও করিয়া থাকেন ( ১।১।১৩১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। তিনি রসিকশেখর বলিয়া পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ম্ম। প্রকট-লীলাতে এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাই এইরূপ রসাস্বাদিকা লীলা চলিতে থাকে। মধুর-রসের আস্বাদন-বিষয়ে পরকীয়া-ভাববতী কান্তাদিগের প্রেমরসের আস্বাদন তাঁহার প্রকট-লীলার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি তাঁহাদের সহিত রাসাদিলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং তাহার ব্যপদেশে তাঁহাদের চিত্তবিনোদনও করিয়াছেন। এই লীলায় তিনি তাঁহাদের প্রেমসেবা গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লীলারস নিজে আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকেও আস্বাদন করাইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিয়াও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-প্রকটনের ইহাও একটী অভিপ্রায়।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়া কেবল যে গোপীদিগেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত লীলাতেই কেবল যে অপূর্ব্ব বৈচিত্রীময় মধুর-রসের আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই নহে। দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের চিত্ত-বিনোদনও করিয়াছেন এবং তত্তদ্‌ভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে তত্তদ্‌ভাবময় রসও আস্বাদন করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন।

আর, সাধক-ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত লীলার কথা শুনিয়া সাধক-ভক্তগণও ভজনে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইতে পারিবেন, লীলাকথা-শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহাদের ভাবের পুষ্টিও সাধিত হইতে পারিবে। ইহাই সাধক-ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ।

"অনুগ্রহায় ভূতানাম্‌"-পাঠস্থলে তাৎপর্য্য এইরূপ। "ভূতানাম্‌—ভূত সমূহের, জীবমাত্রেরই।" বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত-আদি সকল অবস্থায় অবস্থিত সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তিনি এই সকল লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী লীলার এমনই চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে যে—ভক্ত ( শুদ্ধাভক্তিমার্গের )-সাধকের কথা তো দূরে, যাঁহারা মুক্তিকামী—মুমুক্ষু—মুক্তিবাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর, যাঁহারা জীবন্মুক্তত্ব লাভ করিয়া "আত্মারাম" হইয়াছেন, তাঁহারাও অহৈতুকী-ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণোহরিঃ॥ শ্রীভা. ১।৭।১০॥"

আর, যাঁহারা বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়াছেন, পূর্ব্বভক্তি-বাসনা থাকিলে তাঁহারাও ভক্তির কৃপায় ভজনের

উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি॥ নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি।" শ্রুতিও বলেন—"মুক্তা অপি এনম্ উপাসত ইতি॥" আর, যাঁহারা বিষয়ী লোক, ভক্তসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তও ভজনের জন্য আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা. ৩।২৫।২৪॥"

এইরূপে মনুষ্যমাত্রের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশই শ্রীকৃষ্ণের এই সকল লীলা-প্রকটনের অভিপ্রায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যভাবময়ী লীলা প্রকটিত করিলেও তো উল্লিখিতরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইত; ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত রাস-লীলা প্রকটনের অভিপ্রায় কি?

উত্তর এই। রস-মাধুর্য্যাদিতে রাসলীলাই হইতেছে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি। এই লীলারই চিত্তাকর্ষকত্ব সর্ব্বাতিশায়ী। এজন্য এই লীলার প্রকটন। বিশেষতঃ, প্রেমের যত রকম বৈচিত্রী আছে, মহাভাব হইতেছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাভাববতী গোপীগণই এই মহাভাবের আশ্রয়। তাঁহাদের সহিত লীলাতেই পরমতম লোভনীয় এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণসেবাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ মহাভাবের বিকাশ হয় এবং মহাভাব-রসও উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীদিগের আস্বাদনীয় হইয়া থাকে। এতাদৃশ সর্ব্বোৎকর্ষময় মহাভাবের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার প্রকটন করিয়াছেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্বকীয়াভাবেও তো ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে মহাভাব বিদ্যমান এবং স্বকীয়াভাবেও যখন রাসলীলা হইতে পারে (১।১।১৬০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তখন স্বকীয়াভাববতী গোপীদিগের সঙ্গে রাসলীলা প্রকটিত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে পরকীয়া-ভাব সঞ্চারিত করাইয়া রাসলীলা প্রকটিত করিলেন কেন? স্বকীয়া-ভাবে রাসলীলা করিলে লৌকিকী দৃষ্টিতে তাহা জুগুপ্সিত বলিয়াও বিবেচিত হইত না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। স্বকীয়া এবং পরকীয়া—এই উভয় ভাবে রাসলীলা সংঘটিত হইতে পারিলেও এবং এই উভয় ভাবের রাসলীলাতেই মহাভাবের পরমোৎকর্ষ খ্যাপনের সম্ভাবনা থাকিলেও মহাভাবের অপূর্ব্ব প্রভাব স্বকীয়াভাবের রাসলীলাতে প্রকটিত হইতে পারে না। স্বকীয়াভাবের মিলনে উৎকট-বাধাবিঘ্নের অভাব; সুতরাং মহাভাব যে সর্ববিধ বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার সামর্থ্য ধারণ করে, স্বকীয়াভাবের লীলাতে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে না। পরকীয়া-ভাবের মিলনে বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদির দুরতিক্রমণীয়-বাধাবিঘ্ন আছে এবং সে-সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়াও যে মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের মহাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করাই তাঁহাদের সহিত লীলার একটী উদ্দেশ্য। ইহা অবশ্য আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য যে পরকীয়া-কান্তারসের অপূর্ব্ব মাধুরীর আস্বাদন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের দিক্ হইতে ইহা আনুষঙ্গিক হইলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে ইহার মুখ্যত্ব আছে; যেহেতু, লীলার ব্যপদেশে যে লোভনীয় মহাভাবের কথা জানাইয়া তৎপ্রতি তিনি

জীবের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই মহাভাবের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের কথাও যাহাতে জানা যাইতে পারে, সেই ভাবে লীলা প্রকটিত হইলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা অত্যধিক। ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলার কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে এবং আনুষঙ্গিকভাবে হৃদ্‌রোগ কামও দূরীভূত হইতে পারে, রাসলীলার সর্ব্বশেষে "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি"-শ্লোকে স্বয়ং শুকদেবই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

পরকীয়া-ভাববতী ব্রজগোপীদের সহিত রাসাদি-লীলা না করিলে মহাভাবের অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা জীবের নিকটে প্রকাশিত হইতে পারিত না। সুতরাং এই লীলার প্রকটন যে জগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ-করুণা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ইহা জুগুপ্সিত তো নহেই, বরং অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করা সঙ্গত।

এইরূপে শ্রীশুকদেব জানাইলেন—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্য হইতেছে জীবের প্রতি তাঁহার অসাধারণ কৃপার প্রকাশ। ইহাই পরীক্ষিতের শেষ প্রশ্নের উত্তর।

## ১৬৮। শ্রীশুকদেবের উক্তির সারমর্ম্ম—ব্রজপরকীয়া-ভাব নিরবদ্য

ব্রজসুন্দরীগণ যে বাস্তবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা, রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের পূর্ব্বেও শ্রীশুকদেবগোস্বামী "পদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩৩।৭-শ্লোকের অন্তর্গত "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে, "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৩৩।২১-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋষভস্য—পত্ন্যঃ"-শব্দে পরিষ্কার-ভাবেই তাহা বলিয়াছেন (পরবর্ত্তী ১।১।১৬৯ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকেও প্রকারান্তরে তাহাই বলিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, পরীক্ষিতের শেষ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

"মহারাজ পরীক্ষিৎ, তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—ব্রজগোপীগণ হইতেছেন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ-স্বকান্তা। প্রকটলীলায় তাঁহাদের পরকীয়াত্ব প্রাতীতিকমাত্র, বাস্তব নহে। যোগমায়াকৃত মুগ্ধত্ববশতঃ ব্রজসুন্দরীগণ বা শ্রীকৃষ্ণ এই তথ্য না জানিলেও, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা জানেন। এজন্যই রাসলীলা দর্শন করিয়া দেবতা-গন্ধর্ব্বাদিও আনন্দের আতিশয্যে নৃত্যগীতাদি করিয়াছেন, পুষ্পবর্ষণ করিয়াছেন, তাহাও তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা যদি মনে করিতেন যে, গোপীগণ বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা, তাহা হইলে তাঁহারা এইভাবে রাসলীলাকে এবং রাসলীলা-বিলাসীদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিতেন না, বরং ধিক্কারই দিতেন। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা রাসলীলার আলোচনা করিবেন, তাঁহারাও ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব সম্বন্ধের কথা জানিয়াই আলোচনা করিবেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাকে পরদারাভিমর্ষণ বলিয়াও মনে করিবেন না, ধর্ম্মব্যতিক্রম বলিয়াও মনে করিবেন না। তাঁহারা বরং ইহাকে এক কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়া—বস্তুতঃ স্বকীয়া-পত্নী ব্রজসুন্দরীগণকে মুগ্ধত্ববশতঃ পরকীয়া পত্নী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন বলিয়া কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিয়াই—মনে করিবেন এবং এই লীলার

ব্যপদেশে জগতের জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিয়াও তাঁহারা বিস্ময়গর্ভ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন।”

ইহাই পরীক্ষিতের শেষ প্রশ্নের উত্তর। এই উত্তর হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা পরদারাভিমর্ষণও নহে, ধর্ম্মব্যতিক্রমও নহে, সুতরাং ইহা জুগুপ্সিতও নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ( ১।১।১৫৫-অনুচ্ছেদে ), ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবও পরকীয়াভাববতী গোপসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মারুদ্রাদিও তাঁহাদের পদরেণু-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত। ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়া-ভাব যদি জুগুপ্সিত হইত, তাহা হইলে উদ্ধবাদি বা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইত না। পরদারাভিমর্ষণকারী এবং ধর্ম্মব্যতিক্রমকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও তাঁহাদের পূজ্যত্ববুদ্ধি এবং ভজনীয়ত্ব-বুদ্ধি থাকিত না।

যাঁহারা তত্ত্ব জানেন না, তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুকও নহেন, তাঁহাদের অভিমতের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। তত্ত্ব না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও যে কেহ কেহ মানুষ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা অব্যক্ত নিরাকার ব্রহ্মের ব্যক্তীভূত প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে মূঢ় এবং অবুদ্ধিও বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতের কোনও মূল্য নাই।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা গেল—ব্রজের পরকীয়াভাব নিরবদ্য।

## ১৬৯। প্রকটলীলার পরকীয়াভাবের পর্য্যবসান স্বকীয়াতে

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এবং প্রীতিসন্দর্ভে শাস্ত্রবাক্যের বিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন—দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধিকাদি-গোপকন্যাদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সেই সময়ে যোগমায়া গোপসুন্দরীদিগের মায়াময় বিবাহের রহস্য প্রকাশ করেন এবং সকলে তাহাতে জানিতে পারেন যে, তাঁহারা বাস্তবিকই তখন পর্য্যন্ত অনূঢ়া ছিলেন।

শ্রীজীব আরও দেখাইয়াছেন—প্রকটলীলার রসোৎকর্ষ-সিদ্ধির নিমিত্ত মায়াময় বিবাহের প্রতীতির যেমন প্রয়োজন ছিল, সেই প্রতীতির অবসান ঘটাইয়া ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহেরও তেমনই প্রয়োজন ছিল।

শ্রীজীব বলেন, প্রকট-লীলার রস-পরিপাটী নির্ব্বাহার্থই স্বকীয়া-ভাব-প্রকটনের প্রয়োজন। কিরূপে? তাহা জানিতে হইলে সম্ভোগ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ জানা প্রয়োজন। বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের সপ্তম পর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

### সম্ভোগ-চতুর্ব্বিধ।

পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শনালিঙ্গনাদিরূপ সেবা যখন পরম উল্লাস প্রাপ্ত

হয়, তখন তাহাকে সম্ভোগ বলে। ইহা অবশ্য কামময় সম্ভোগ নহে। সম্ভোগ চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ( মিশ্রিত ), সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্।

যে সম্ভোগে লজ্জা ও ভয় বশতঃ সম্ভোগাঙ্গ বিশেষরূপে প্রকটিত হয় না, তাহার নাম **সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।** সাধারণতঃ পূর্ব্বরাগের পরেই ইহার বিকাশ।

নায়ক-কৃত বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বা স্ব-বঞ্চনাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা যে সম্ভোগে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে **সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।**

কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত মিলনে যে সম্ভোগ, তাহার নাম **সম্পন্ন সম্ভোগ।**

আর, পারতন্ত্র্যবশতঃ যে নায়ক-নায়িকার পক্ষে পরস্পরের দর্শনাদি দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে, পারতন্ত্র্য দূর হইয়া গেলে তাহাদের পরস্পরের দর্শনাদিজনিত উপভোগের আধিক্য জন্মে যে সম্ভোগে, তাহাকে বলে **সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।**

"দুর্ল্লভালোকয়োর্য্নোঃ পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥ উজ্জ্বল-নীলমণি। সম্ভোগপ্রকরণ ॥১৬॥"

নায়ক-নায়িকার ভাব-বিকাশের তারতম্য অনুসারেই সম্ভোগের নাম-ভেদ।

এই চারি রকমের সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের সিদ্ধির নিমিত্ত দুইটী বস্তুর প্রয়োজন—প্রথমতঃ, নায়ক ও নায়িকা, উভয়েরই পরাধীনত্ব, যাহা মিলন-বিষয়ে উভয়কেই বাধা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের পক্ষেই পরে সেই পরাধীনত্বের বিনাশ, যাহাতে মিলন-বিষয়ে কাহারওই কোনও রূপ বাধা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। নায়ক-নায়িকা যদি পরকীয়া-ভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে উভয়েই বাধা প্রাপ্ত হয়—নায়িকা প্রাপ্ত হয় শাশুড়ী-আদির নিকট হইতে এবং নায়ক প্রাপ্ত হয় পিতা-মাতা-আদির নিকট হইতে। এই বাধাকে অতিক্রম করিয়া যদি কোনও প্রকারে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাধাজনিত উৎকণ্ঠার ফলে মিলন-সুখও পরমাস্বাদ্য হয়। ব্রজের অন্তর্গত কোনও স্থানের নিকট-প্রবাস হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত, পরকীয়াত্বের বাধাকে অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীরাধার মিলনে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ অপেক্ষা অধিকতর চমৎ-কারিত্বময় সুখ জন্মে বলিয়া তাহাকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলা হয়। ব্রজের বাহিরে কোনও স্থানের সুদূর প্রবাস হইতে দীর্ঘকাল পরে সমাগত নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও অপূর্ব্বচমৎকৃতিময় সুখের অনুভব হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়। এইরূপ মিলনে আনন্দাধিক্যের হেতু এই যে, পরকীয়াত্ব এবং সুদীর্ঘ সুদূর প্রবাস—উভয়ে মিলিয়া মিলন-বিষয়ে বিপুল বাধা জন্মাইয়া মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকে অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করে ; তাহার ফলেই মিলন-সুখের পরম আধিক্য। ইহাতে বুঝা যায়—মথুরাদি-স্থানে সুদীর্ঘ সুদূর প্রবাসের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্না ব্রজদেবীদের মিলনেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সুখের আস্বাদন সম্ভব।

কিন্তু তাহাতে পরকীয়া-ভাবজনিত তীব্র পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসান হয় না। শ্রীজীব বলেন—এই পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসান হইতে পারে—যদি স্বকীয়াভাবেতে পরকীয়া-ভাবের পর্য্যবসান হয়।

তখনই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের চরম-পরাকাষ্ঠা এবং তাহাতেই প্রকট-লীলারও রস-পরিপাটীর পর্য্যবসান। ইহাতে মনে হয়—সুদূর-প্রবাসাগত নায়কের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্ন নায়িকার মিলনে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আবির্ভাব হয়, উক্তরূপ স্বকীয়া-ভাবানুগত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের তদপেক্ষাও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের অন্ততঃ দুইটী হেতু দেখা যায়—পরকীয়াভাবগত তীব্র পারতন্ত্র্যের অবসান এবং পারতন্ত্র্যাবস্থায় যাঁহারা মিলন-বিষয়ে বাধাবিঘ্নের হেতু হয়েন, তাঁহাদের সম্মতিতে এবং উদ্যোগেই নায়ক-নায়িকার মিলন। সুদূর প্রবাসান্তে পরকীয়া-ভাবের মিলনে এই দুইটী বস্তুর অভাব এবং তজ্জনিত আনন্দ-বৈচিত্রীরও অভাব।

ইহাতে বুঝা যায়—প্রারম্ভিক পরকীয়াত্ব হইতেছে অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পরম-বৈশিষ্ট্যের পুষ্টিসাধক। এজন্যই প্রকট-লীলার পরকীয়াত্ব স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হইলেই লীলারসের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইতে পারে। প্রকট-লীলার পরকীয়াত্ব যে স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হয় শাস্ত্র-প্রমাণের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহাও দেখাইয়াছেন।

কিন্তু স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হইলেই ব্রজসুন্দরীদিগের স্বরূপগত মহাভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় না, সুতরাং তাঁহারা স্বকীয়া হইলেও দ্বারকা-মহিষীদিগের ন্যায় স্বকীয়া নহেন। এজন্য শ্রীজীব তাঁহাদিগকে পরমস্বীয়া (বা পরম-স্বকীয়া) বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকট-লীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ।২৭৮॥"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের প্রমাণবলে বলিয়াছেন—প্রকট-লীলার পরকীয়াভাবের স্বকীয়াতে পর্য্যবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকট-লীলাকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করান। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন প্রকট-লীলা তদ্রূপ অপ্রকট-লীলার সহিত মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকট-লীলার পর্য্যবসান-কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে নিবিষ্টচিত্তা গোপীগণ অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে দুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই দুই প্রকাশের অভিমান এবং লীলা যে পৃথক্, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। উভয়ের পার্থক্যের জ্ঞান তাঁহাদের না থাকাতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবা-বিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৭॥"

ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার শেষভাগে স্বকীয়াভাবানুগত পরম-বৈশিষ্ট্যময় যে সমৃদ্ধিমান্-সম্ভোগরসে ব্রজসুন্দরীগণ তন্ময়তা লাভ করেন, সেই তন্ময়তার আবেশ এবং সেই স্বকীয়াভাবের আবেশ লইয়াই তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাঁহাদের সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে।

যখনই যখনই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তখনই এইরূপ স্বকীয়া-ভাবের আবেশ লইয়াই ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। এজন্যই গৌতমীয়তন্ত্র বলিয়াছেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ।—অনেক জন্ম—বহু প্রকটলীলা—সিদ্ধ (স্বকীয়াভাবময়ী) গোপীদিগের পতিই তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( ১।১।১১৭-অনুচ্ছেদে ), প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানে প্রকট-লীলাস্থিত পরিকরগণ অপ্রকট-লীলার তত্তৎ-পরিকরদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়েন। প্রকট-প্রকাশগত গোপসুন্দরীগণ এইভাবে অপ্রকট-প্রকাশগত তাঁহাদের স্বরূপান্তরের সহিত মিশিয়া গেলেও যখন ভাবের কোনও বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় না, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলাতে তাঁহাদের স্বকীয়াভাব, কেবল প্রকট-লীলাতেই আগন্তুক পরকীয়া ভাবের আবেশ।

অবশ্য আগন্তুক বলিয়া প্রকটের পরকীয়াত্ব যে অনিত্য, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( ১।১।১১৪-অনুচ্ছেদে ), প্রকটলীলা এবং প্রকটের প্রত্যেক খণ্ড লীলাও নিত্য। সুতরাং প্রকটের পরকীয়াভাবও নিত্য—অবশ্য প্রকট-লীলাতে নিত্য।

## ক। ব্রজ-পরকীয়া-ভাবের নিরবদ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার

ব্রজসুন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক স্বকীয়া পত্নী, প্রকটের পরকীয়া-ভাবাত্মিকা-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ"-ইত্যাদি ( ১০।৩৩।৭ )-শ্লোকে গোপীদিগকে স্পষ্ট কথায় "কৃষ্ণবধ্বঃ—শ্রীকৃষ্ণের বধূ" বলা হইয়াছে। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ"-ইত্যাদি প্রমাণে বধূ-শব্দে জায়া, স্ত্রী এবং পুত্রবধূকে বুঝায়; উপপত্নীকে বুঝায় না। সুতরাং "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের জায়া, স্ত্রী বা পত্নীই বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"ননু মধ্যে মণীনামিত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ন ঘটতে অদাম্পত্যেন তস্তদাগন্তুকসম্বন্ধাৎ ন স্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি—কৃষ্ণবধ্ব ইতি।—মধ্যে মণীনামিত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ( ১০।৩৩।৬ )-শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, দাম্পত্য না থাকিলে তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু অদাম্পত্য হইল আগন্তুক সম্বন্ধ, স্বাভাবিক নয়। এই ( ১০।৩৩।৭ ) শ্লোকে ( মেঘচক্রের ) যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবে তাহাও সঙ্গত হয় না। তাই আনন্দবৈচিত্রীবশতঃ শ্রীশুকদেব 'কৃষ্ণবধ্বঃ'-শব্দে ( দাম্পত্যরূপ ) রহস্য কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্লোকের বৃহৎক্রম-সন্দর্ভটীকাতেও লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণবধ্ব ইতি। গোপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি—গোপবধূ বলিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসিদ্ধি আছে, কৃষ্ণবধ্বঃ-শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।" এইরূপে দেখা গেল, শ্লোকের "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে ব্রজসুন্দরীদিগের বাস্তব স্বকীয়াত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(২) "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি ( ১০।৩৩।২১ )-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋভস্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য—গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণের।" শ্রীজীব গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।" যাহা হউক, এস্থলে জানা গেল—গোপীদিগের বাস্তব স্বকীয়াত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) "ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ"-ইত্যাদি ( ১০।৪৬।৬ )-শ্লোকের অন্তর্গত "বল্লব্যঃ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মে বল্লব্য ইতি বস্তুতস্তস্যৈব পত্নীত্বাৎ—ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার বল্লবী বলিয়াছেন।"

(৪) "অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্ত্রোঽধুনাস্তে"-ইত্যাদি ( ১০।৪৭।২১ )-শ্লোকের অন্তর্গত "আর্য্যপুত্ত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্ত্রঃ অস্মৎস্বামীতি বা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্বামী বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা আর্য্যপুত্ত্র বলিয়াছেন।" প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, রমণীগণ স্বামীকে আর্য্যপুত্ত্র বলেন।

আর "আর্য্যপুত্ত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স এব অস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অন্যস্তু লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ—গোপীগণ বলিতেছেন, তিনিই ( শ্রীকৃষ্ণই ) আমাদের বাস্তবপতি ; অন্য (যাহাকে আমাদের পতি বলা হয়, সে ব্যক্তি ) লোকপ্রতীতি-মাত্র পতি, কিন্তু বাস্তব পতি নহে।"

(৫) "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৪ )-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"পরমাত্মানমপি মাং দয়িতং নিজপতিমিতি ন তু পাণিগ্রহীতারং গোপমিত্যাদি।—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের স্বপতি মনে করেন।" শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তত্রেদং ত্রিভির্যৌগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থ। ন তু কিম্বদন্তী-প্রাপ্তমন্যদিত্যর্থঃ।—মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা—এই তিনটী পদের দ্বারা জানা যাইতেছে, আমিই যে গোপীদের পতি, এসম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিতবতী ; যাহারা তাঁহাদের পতি বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারা তাঁহাদের পতি নহেন।"

এ-সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্তি হইতে জানা যায়—গোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী। তাঁহাদের পরকীয়াত্ব প্রতীতিমূলকমাত্র, কিম্বদন্তী-মূলকমাত্র, বাস্তব নহে।

গোপীদিগের স্বকীয়াত্বই যখন নিত্যসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক, প্রকটের পরকীয়াত্ব যখন প্রাতীতিকমাত্র—স্বাভাবিক নহে, বিশেষ উদ্দেশ্যে আরোপিত হইয়াছে মাত্র, তখন তাঁহাদের প্রাতীতিক পরকীয়াত্বের গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রকটলীলায় লৌকিক-রীতিতে বিবাহের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বকীয়াত্বের প্রকটন অস্বাভাবিক নহে এবং শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—তাহা অশাস্ত্রীয়ও নহে।*

ব্রজের পরকীয়াভাব যে অনিন্দনীয়, উল্লিখিত বিবরণ হইতেও তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

(৬) পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটী আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে, ব্রজ-সুন্দরীদিগকে পরকীয়া কান্তা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত বিহার করিলেন কেন ? এক্ষণে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে। উত্তর হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে পরকান্তা বলিয়া মনে করিতেন না। একথা বলার হেতু এই।

পূর্ব্ববর্ত্তী (১)-উপ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—শ্রীভা. ১০।৩৩।৬-শ্লোকে "মধ্যে মণীনাম্" ইত্যাদি বাক্যে, এবং শ্রীভা. ১০।৩৩।৭-শ্লোকে "তড়িত ইব মেঘচক্রে বিরেজুঃ"-ইত্যাদি বাক্যেও

*লেখক-সম্পাদিত গৌরকৃপাতরঙ্গিনী টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "অপ্রকটব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে ভাবে নৃত্যের কথা বলা হইয়াছে, দাম্পত্য না হইলে সেই ভাবের নৃত্য সম্ভব নয়। ইহাতে বুঝা যায়, গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা, শ্রীকৃষ্ণ তাহা মনে করেন নাই।

আবার, পূর্ব্ববর্ত্তী (৩)-উপ-অনুচ্ছেদেও দেখান হইয়াছে, শ্রীভা. ১০।৪৬।৬-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরী-দিগকে তাঁহার "বল্লবী—পত্নী" বলিয়াছেন। আবার শ্রীভা. ১০।৪৬।৪-শ্লোকে "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতম্ প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি বাক্যে গোপীদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন—"তদেবং ত্রিভির্যোগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিম্বদন্তী-প্রাপ্তমন্যদিত্যর্থঃ॥—মন্মস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা—এই তিনটী পদে, অথবা দয়িত, প্রেষ্ঠ, আত্মা—এই তিনটী পদে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, 'গোপীগণ আমাকেই ( শ্রীকৃষ্ণকেই ) তাঁহাদের পতি বলিয়া নিশ্চিতবতী হইয়াছেন, কিম্বদন্তীপ্রাপ্ত তাঁহাদের পতিম্মন্যদের তাঁহারা পতি মনে করেন না'।" এ-স্থলে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের কথাগুলি মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখনও—গোপীদের সহিত বিয়োগের অবস্থাতেও—তিনি গোপীদিগকে পরকীয়াকান্তা মনে করিতেন না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই—রাসলীলা-কালেও—গোপীদিগকে পরকীয়া কান্তা মনে করিতেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে শারদীয়-রাসরজনীতে গোপীগণ যখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ঔপপত্যের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পতিসেবার উপদেশ দিলেন কিরূপে ? সে-স্থলে তো তিনি তাঁহাদিগকে পররমণীই মনে করিয়াছিলেন ?

উত্তর এই। লোক-প্রতীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল বাক্যে গোপীদিগের সহিত তিনি পরিহাসই করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাস্তবিক পরনারী মনে করিয়াই যে তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবতোষণীকারও লিখিয়াছেন—"প্রথমমবহিত্থয়া ঔদাস্যম্ অবলম্বমানঃ—অবহিত্থার (আত্মভাব-গোপন) সহিতই প্রথমে তিনি ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছেন"। তিনি আরও বলিয়াছেন—"স্বয়মপি কৈতবেন সভয়-সম্ভ্রমমিব পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি—শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি যেন ব্রজের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই ভয়ের এবং সম্ভ্রমের ( ত্বরার ) সহিত যেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ভয়-সম্ভ্রমের ভাব তাঁহার কৈতবমাত্র—কপটতা।" তিনি আরও বলিয়াছেন—উপদেশাত্মক শ্লোকগুলির প্রত্যেকটীরই দুই রকম অর্থ আছে—উপেক্ষাময় এবং সম্প্রার্থনাময়। উপেক্ষাময় অর্থগুলি হইতেছে—কৈতব, অবহিত্থা ; বাস্তব নহে। বাস্তব অর্থ—সম্প্রার্থনাময় ; তাঁহাদের সহিত বিহারের জন্য ঔৎসুক্য-বাচক।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপীদিগকে পরকান্তাই মনে না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? উত্তরে বক্তব্য এই। লোকপ্রতীতিদ্বারা যে

অবাস্তব পরকীয়া-ভাবের স্বষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের মিলনের পক্ষে উৎকট বাধাবিঘ্নের স্বষ্টি হইয়াছে। তাহার ফলে রসের যে অনির্ব্বচনীয় এবং অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব সাধিত হইয়াছে, তাহাতেই পরকীয়া-ভাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরকীয়াত্ব অবাস্তব হইলেও তদুত্থিত বাধাবিঘ্নের প্রভাব অবাস্তব নহে।

একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। মনে করা যাউক যেন, বাল্যকালেই একটী বালকের সঙ্গে একটী বালিকার বিবাহ হইয়াছে। কোনও ঘটনাচক্রে কিছু কাল পরে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পরে বালকটী দূরবর্ত্তী কোনও এক অপরিচিত স্থানের কোনও লোকের আশ্রয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। বালিকাটীও ঘটনাচক্রে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোনও একস্থানে একজন সৎলোকের আশ্রয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইল; উভয়ই উভয়কে চিনিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে পতি-পত্নীসম্বন্ধ, তাহা কেবল তাহারাই জানে, অপর কেহ জানেনা; অপরের নিকটে, এমন কি তাহাদের আশ্রয়দাতাদের নিকটেও, তাহারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, বলিলে প্রমাণাভাবে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের আশ্রয়দাতারা এবং সে-স্থানের অন্য লোকেরাও মনে করে, এই দুইজনের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই নাই। অথচ, তখন তাহাদের পূর্ণ যৌবন। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য তাহাদের বলবতী আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখন তাহারা গোপন মিলনের জন্য সুযোগের অনুসন্ধান করে এবং সুযোগ পাইলে মিলিত হয়। এ-স্থলেও বাস্তব স্বকীয়া-ভাবেরই মিলন, কিন্তু পরকীয়া-ভাবের আবরণে। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীদের প্রকট-লীলাতেও ঠিক এইরূপ অবস্থা।

“নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়”-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে,—গোপীদের পতিম্মন্যগণ গোপীদিগকে নিজেদের নিকটেই দেখিতেন; সুতরাং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে পরদার-লম্পট মনে করিতেন না; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াও প্রকাশ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগকে পরপত্নী মনে করিতেন না, গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পক্ষে পরপুরুষ মনে করিতেন না। সুতরাং রাসলীলা-বিলাসীদের মধ্যে, কিম্বা তাঁহাদের সহিত প্রতীতিমূলক-সম্বন্ধান্বিত ব্রজবাসীদের মধ্যেও, কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরদারাভিমর্ষক বলিয়া মনে করিতেন না। বস্তুতঃ, রাসলীলা পরদারাভিমর্ষণ নহে; কেননা, গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য-স্বকীয়া কান্তা।

## ১৭০। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এতই গাঢ় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না, তখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের ভাবই তাঁহারা চিত্তে পোষণ করেন। “ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭২॥” শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইলেও নরলীলার আবেশে এবং তাঁহাদের গাঢ় প্রেমের প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারেন না; তাঁহারা যেমন গোপ, তেমনি কৃষ্ণকেও তাঁহারা গোপ-সন্তান বলিয়া এবং কেহ বা তাঁহাকে সন্তান, কেহ বা সখা, কেহ বা প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শারদীয়-মহারাসে কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদিগের কয়েকটী উক্তির যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, তাঁহাদের চিত্তে যেন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। ইহার সমাধান কি ?

রাসলীলা-প্রসঙ্গে ব্রজসুন্দরীদিগের দু'য়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, সে-সম্বন্ধে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই সমাধান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে দুইটী শ্লোক আলোচিত হইতেছে। এই দুইটী শ্লোকের উপলক্ষ্যে টীকাকারগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই অন্যান্য স্থলেও সমাধান করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা হইলেও প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের পরকীয়াভাব ; সুতরাং প্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে "পরপুরুষ।" শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকটের রাসলীলাই বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পক্ষে পরপুরুষ এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁহারা "পরনারী"—অবশ্য ইহা কেবল লোক-প্রতীতি অনুসারে।

শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ—যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থা হইতেই—আত্মহারা হইয়া, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্তের কথা ভুলিয়া গিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবিত হইয়া নির্জ্জন গভীর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষার বাণী বলিয়াই মনে করিলেন। গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতিসেবাদি করার জন্যই তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন এবং ঔপপত্য যে নিতান্ত ঘৃণিত, তাহাও তিনি বলিলেন। হতাশাজনিত বিষাদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্রজসুন্দরীগণ সাশ্রুলোচনে তাঁহার উপদেশ শুনিলেন এবং পরে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহার কয়েকটী কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৩২ ॥

—(গোপ-কিশোরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরম ধর্ম্মজ্ঞ; সেজন্যই 'পতি, পুত্র ও সুহৃদ্গণের যথাযোগ্য সেবাই স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম'—বলিয়া তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। কিন্তু আমরা মনে করি, তোমার উপদেশের তুমিই একমাত্র যোগ্য পাত্র (অর্থাৎ তোমার সেবা করিলেই আমাদের পক্ষে তোমার উপদেশ পালন করা হইবে); কেননা, তুমিই ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের প্রিয়তম, বন্ধু এবং আত্মা।"

এ-স্থলে দেখা যায়—পূর্ণপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে "ঈশ—ঈশ্বর" এবং "সর্ব্বজীবের আত্মা" বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান, তাঁহার পরমাত্মত্বের জ্ঞান, তখন তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের গাঢ়তম প্রেমের মধ্যে কিরূপে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে ?

বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের জ্ঞান ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল না। তবে, এ-সকল কথা বলিলেন কেন ? শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—উপহাসের সহিতই তাঁহারা এ-সমস্ত কথা বলিয়াছেন। "অপি

চ যদুক্তং পত্যপত্যেত্যাদি ত্বয়া ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসম্ এবমেতদুপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যবাস্ত। উপদেশদত্ত্বে হেতুঃ ঈশ ইতি॥ শ্রীধরস্বামিপাদ॥" বৈষ্ণব-তোষণী-টীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন—"ধর্ম্মবিদেতি সোপহাসমেব"-ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণ গোপসুন্দরীগণকে বলিয়াছিলেন—"পতি-পুত্র-সুহৃদাদির সেবাই হইতেছে স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম।" ইহা হইতেছে একটী ধর্ম্মোপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্ত্রীলোকের এই স্বধর্ম্মের উপদেষ্টা। ধর্ম্মবিৎ না হইলে এবং স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ না করিলে কেহ বাস্তবিক ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন, তখন তিনি নিজেকে ধর্ম্মবিদের আসনেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী বলেন—তিনি 'ঈশ' বলিয়াই উপদেশদাতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির প্রত্যুত্তরে গোপসুন্দরীগণ উপহাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"তুমি ধর্ম্মবিৎ হইয়াছ! বংশীধ্বনিদ্বারা যিনি পরনারীদিগকে নিশিথকালে নির্জ্জন গভীর অরণ্যে নিজের নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনি নিজে ধর্ম্মপরায়ণ বই কি! এবং অতি সুযোগ্য ধর্ম্মবেত্তা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা বই কি!! হাঁ, হাঁ, মনে পড়িয়াছে। ভাগুরী, গার্গী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির নিকটে আমরা শুনিয়াছিলাম, তুমি নাকি ঈশ্বর (শ্রীভা. ১০।৩১।৪-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী)! তা তুমি যখন ঈশ্বর, তখন নিশ্চয়ই তুমি ধর্ম্মবিৎ, ধর্ম্মবিৎ বলিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টাও হইতে পার! আচ্ছা, তুমি যখন ঈশ্বর, তখন তুমিই তো সর্ব্বজীবের প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা (প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা)। আমরাও তো জীব। সুতরাং তুমি আমাদেরও তো প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা। সকলেই যখন প্রেষ্ঠের, বন্ধুর সেবা করিয়া থাকে, তখন তোমার সেবা করাও তো আমাদের কর্ত্তব্য। পতি-আদির সেবার জন্য তুমি যে উপদেশ করিয়াছ, পরমাত্মারূপে তুমি যতক্ষণ পতি-আদির মধ্যে থাক, ততক্ষণই লোকে পতি-আদির সেবা করে। পতি-আদির দেহ হইতে তুমি যখন চলিয়া যাও, তখন কেহই সেই দেহের সেবা করে না, বরং সেই দেহকে ভস্মীভূত করিয়াই দেয়। সুতরাং পতি-আদির সেবাও তোমারই সেবা। পতি-আদির দেহে বস্তুতঃ তোমার সেবা করিলেও সে-স্থলে তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না; এ-স্থলে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে মূর্ত্তরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। আবার, তুমি যখন ঈশ্বর, সকলেরই একমাত্র আত্মা, তখন তোমার সেবা করিলেই তো সকলের সেবাই হইয়া যায়। সুতরাং তোমাতেই আমরা তোমার উপদেশ পালন করিব (বৈষ্ণব-তোষণীকার বলেন—অসূয়ার সহিতই এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। "সাসূয়মাহুর্যৎ পতীতি")।

গোপসুন্দরীদিগের উক্তিকে উপহাসময় এবং অসূয়াময় বাক্যরূপে ধরিয়া টীকাকারগণ এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিয়াছেন। এ-স্থলে সে সমস্ত অর্থের আলোচনা অনাবশ্যক।

গোপসুন্দরীদিগের চিত্তে যে বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি জন্মে নাই, শ্লোকটীর মর্ম্ম হইতেও তাহা জানা যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "অঙ্গ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। "অঙ্গ"-শব্দে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-প্রিয়ত্ব সূচিত হয়। ঈশ্বরত্বের জ্ঞানে অন্তরঙ্গ-প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হয় না, বরং ত্রাস ও সঙ্কোচেরই উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভ মনে করিয়াই তদুচিত-সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে উন্মাদিনীর ন্যায় বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদির কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছেন! যে প্রেমের উচ্ছ্বাসে

তাঁহাদের এতাদৃশী সেবার জন্য উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা, শ্লোকাক্ত কথাগুলি বলার সময়েও তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম এবং তাদৃশী সেবার বাসনা যে বিরাজিত ছিল "অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ি"-বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। তখনও তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবার জন্য ঔৎসুক্যবতী। তাঁহাদের-সেই প্রেম এবং সেই সেবাবাসনা যে সম্যক্রূপেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সত্ত্বেও যে বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদির প্রতি তাঁহাদের মন কিঞ্চিন্মাত্রও চালিত হয় নাই, পরবর্ত্তী বাক্যগুলি হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। পরবর্ত্তী ১০।২৯।৩৩-শ্লোকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"তুমিই নিত্যপ্রিয়", "আর্ত্তিদ-পতিসুতাদিদ্বারা কি হইবে ?" "আমাদের আশা ভঙ্গ করিও না"-ইত্যাদি। ১০।২৯।৩৪-শ্লোকে তাঁহারা বলিয়াছেন—"তুমি আমাদের চিত্তকে সুখের দ্বারা অপহরণ করিয়াছ, তোমার নিকট হইতে আমরা অন্যত্র যাইতে পারিতেছি না, যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই।" ১০।২৯।৩৫-শ্লোকে তাঁহারা অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত তাঁহাদের অভিলষিতরূপে তাঁহার সেবার কথাই জানাইয়াছেন ; তাহা যদি তাঁহাদের ভাগ্যে না জুটে, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন।

"সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥

—হে অঙ্গ ! তোমার সহাস্য-দৃষ্টি এবং মধুর মুরলীরবে আমাদের হৃদয়ে (প্রাণবল্লভরূপে তোমার সেবার জন্য উৎকণ্ঠাময়ী বাসনারূপ যে) অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমার অধরামৃত-প্রবাহের দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত কর। হে সখে ! যদি তুমি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমার ধ্যান করিতে করিতে তোমার চরণ-সান্নিধ্যে গিয়া উপনীত হইব।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে তাঁহাদের ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এবং সেই প্রেমানুরূপ সেবার বাসনা পূর্ণতমরূপেই তখনও বিরাজিত। যদি তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি বাস্তবিকই স্ফুরিত হইত, তাহা হইলে ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাস্তব-ঈশ্বরত্ববুদ্ধি এবং প্রেম বা প্রেমানুরূপ সেবা-বাসনা—এই দু'য়ের যুগপৎ উপস্থিতি যে অসম্ভব, অর্জ্জুনের, দেবকী-বসুদেবের এবং রুক্মিণীর দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উপহাসের বা অসূয়ার সহিতই যে ব্রজ-সুন্দরীগণ "যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ"— ইত্যাদি কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়—শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি—ভক্তিই (প্রেমভক্তি বা প্রেমই) ভগবান্কে দেখায়।" সুতরাং প্রেমের পূর্ণতম-বিকাশে ভগবানেরও পূর্ণতম দর্শন, তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের এবং সমগ্র মাধুর্য্যেরও দর্শন, অবশ্যই হইতে পারে। মিলনের অবস্থায় মিলনানন্দের পরিপোষণের নিমিত্ত এই প্রেম পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় স্নিগ্ধজ্যোতিঃ প্রসারিত করিয়া কেবল মাধুর্য্যকেই দেখায়, ঐশ্বর্য্যকেও জ্যোতির স্নিগ্ধতাবশতঃ মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াই দেখায়। বিরহ-সময়ে বিরহাগ্নি উত্তাপময় বলিয়া সেই প্রেম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের সর্ব্বান্তর্ভেদী কিরণজাল বিস্তার করিয়া মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য উভয়কেই দেখাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রেম এবং ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি যুগপৎ বিদ্যমান্ থাকিতে পারিবে না কেন ? "যৎ পত্যপত্যসুহৃদাম্"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিকালে

শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপসুন্দরীদিগের বিরহ না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাবাণী শুনিয়া তাঁহাদের চিত্তে ভাবী বিরহের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। বিরহের আশঙ্কাও কম উত্তাপময়ী নহে। এই উত্তাপময় প্রেম নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তো শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত করিতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। উল্লিখিতরূপ দৃষ্টান্তের অভাব। অর্জ্জুন-দেবকীবসুদেব-রুক্মিণী-আদির দৃষ্টান্তে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যখনই তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের প্রেম অন্তর্হিত। দ্বারকার কিঞ্চিত্তরলত্বময় প্রেমেরই যখন এতাদৃশী অবস্থা, তখন ব্রজসুন্দরীদিগের সান্দ্রতম-কেবল-প্রেমে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির প্রবেশ একান্তই অসম্ভব। ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই যদি প্রেমের এবং ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধির যুগপৎ অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে ব্রজসুন্দরীদিগের যে বাস্তব তীব্রতম বিরহ, সেই বিরহরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তো তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম অনুভব জাগাইতে পারিত। কিন্তু মাথুরবিরহ-কালেও তাঁহাদের চিত্তে যে কখনও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। আপনা-আপনি স্ফুরণ তো দূরে, দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা বলিয়াছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান জন্মে নাই। ব্রজসুন্দরীদিগের কথা দূরে, বাৎসল্যঘন-বিগ্রহ নন্দ-যশোদাও উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন নাই, নিজেদের পুত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

সুতরাং আলোচ্য-শ্লোকে, প্রেমের প্রভাবেই যে ব্রজসুন্দরীগণ ভাবী বিরহের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। উপহাসের ভাবেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, স্বামিপাদাদির এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে, আর একটী শ্লোক আলোচিত হইতেছে। শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনা-পুলিনে আসিয়া মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তির সহিত বিলাপ করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

“ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ শ্রীভা. ১০।৩১।৪ ॥

—( আর্ত্তির সহিত ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ) হে সখে ! তুমি গোপী-যশোদার পুত্র নহ। তুমি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী ; ব্রহ্মার প্রার্থনাতেই বিশ্বের পালনের নিমিত্ত সাত্বতকুলে ( যদুকুলে ) অবতীর্ণ হইয়াছ।”

এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, গোপীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ব-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেননা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী বলিয়াছেন ; একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন

সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী। তিনি যদি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরই হইবেন, তাহা হইলে যদুকুলে (১) কেন তাঁহাকে দেখা যায় ? জগতের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মা যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, সেই প্রার্থনার ফলেই তিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল ? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা আবার "সখা" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলেন কিরূপে ? এ-সম্বন্ধে টীকাকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক।

বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—"সের্ষ্যমাহুর্গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুতয়া অস্মৎপালিকায়াঃ শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা নন্দনো ভবান্ ন ভবতি, কিন্তু পরমাত্মৈব, স্বতঃ সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাৎ। এবং নুনমপি ব্রহ্মভক্তিবশীকৃতত্বাদেব ভবান্ এতন্নন্দনন্দতাব্যাজেন বিশ্বগুপ্তয়ে প্রকটোঽস্তি-ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্য এই। ব্রজসুন্দরীগণ ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি নিশ্চয়ই ব্রজেশ্বরী যশোদার সন্তান নহ ; কেননা, ব্রজেশ্বরী পরম-দয়াবতী, এজন্য তিনি আমাদেরও পালিকা ; নিষ্ঠুরতা, পরদুঃখে উদাসীনতা, কখনও তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সন্তানই যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে তাঁহার পরমদয়ালুতাদি গুণেরও তুমি অধিকারী হইতে, তুমি আমাদিগকে দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারিতে না। দেখা যাইতেছে, অপরের সুখ-দুঃখে তুমি পরমাত্মার মতনই উদাসীন। মুনিগণ বলেন—তুমি নাকি পরমেশ্বর, পরমাত্মা ; ব্রহ্মার প্রার্থনায় নাকি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। সর্ব্বত্র তোমার ঔদাসীন্য দেখিয়া আমদেরও যেন তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি যদি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই হও এবং বিশ্বের পালনের নিমিত্তই যদি তুমি অবতীর্ণ হইয়া থাক, তাহা হইলে দর্শন দিয়া আমাদিগের পালন করাও তো তোমার কর্ত্তব্য, আমরাও তো বিশ্বেরই মধ্যে।

শ্লোকস্থ সকল শব্দের সহিত সর্ব্বপ্রথম "ন"-শব্দের অন্বয় করিয়া বৈষ্ণবতোষণীকার অন্য এক রকম অর্থও করিয়াছেন। তাহা এইরূপ।

তুমি গোপিকা যশোদার নন্দন নহ ; কেননা, যশোদানন্দন হইলে তুমি আমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতে না ; যশোদামাতা আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ( মুনিরা যে বলেন ) তুমি নাকি সর্ব্ব-জীবের অন্তরাত্মার দ্রষ্টা ; কিন্তু তাহাও নহ ; কেননা, তাহা হইলে তুমি আমাদেরও অন্তর্দ্রষ্টা হইতে, আমাদের অন্তরের দুঃখও দেখিতে পারিতে, অদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিতে না। (মুনিরা আরও নাকি বলেন যে )—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই নাকি তুমি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহাও সত্য নহে ; তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদিগকেও তুমি পালন করিতে, অদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে দুঃখ দিতে না। ( মুনিরা আরও নাকি বলেন )—তুমি সাত্বত-কুলে, ভক্তকুলে, আবির্ভূত হইয়াছ ; কিন্তু তাহাও

(১) মথুরার যাদবগণ এবং ব্রজের শ্রীনন্দাদি গোপগণ সকলেই বস্তুতঃ যদুবংশের অন্তর্ভুক্ত। সকলেরই আদি পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন যদু।

তো সত্য বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, ভক্তকুলে তোমার আবির্ভাব হইলে ভক্তসংসর্গে তোমার মধ্যে নিরুপাধি-কৃপালুতা থাকিত ; কিন্তু তাহাতো আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অর্থের তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই।

এই সমস্ত অর্থ হইতে জানা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীদিগের চিত্তে বাস্তবিক ঈশ্বর-বুদ্ধি স্ফুরিত হয় নাই। তাঁহারা উপহাস করিয়াই এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এতই গাঢ় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা লোকপরম্পরা শুনিলেও তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না, নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়াই মনে করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের কোনও আচরণে তাঁহাদের চিত্তে দুঃখের উদয় হইলে, তাঁহাদের শ্রুত ঈশ্বরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করিতেন।

# সপ্তদশ অধ্যায়

## ( শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-বিচার )

### ১৭১। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্

পূর্ব্বেই ( ১।১।৬৭-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া স্বরূপ-শক্তির বিলাস ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তারও পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনিই স্বয়ংভগবান্। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা. ১৷৩৷২৮॥" অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। স্বরূপে তাঁহারাও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ বলিয়াই তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ বলিয়া তাঁহারা কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও স্বয়ংভগবান্ রূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অংশরূপে নহে। যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরূপে অবশ্য তিনি অংশরূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; কিন্তু তখন তিনি যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদির নামেই অভিহিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়েন না।

### ১৭২। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, অবতরণ-কালেও অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই মধ্যে অবস্থান করেন। এ-বিষয়ে কয়েকটী শাস্ত্র-প্রমাণ এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব বলিয়াছেন—

"ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ॥ শ্রীভা. ১১।১১।২৮॥

—তুমি ব্রহ্ম, পরম ব্যোম, প্রকৃতির অতীত ভগবান্। নিজের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ বপুসকলকে আত্মসাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ ভগবানেব ত্বমবতীর্ণোঽসি। ভগবত এব বৈভবমাহ। ব্রহ্ম ত্বং পরব্যোমাখ্যো বৈকুণ্ঠস্ত্বং, প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষোঽপি ত্বমিতি। ভগবানপি কথম্ভূতঃ সন্নবতীর্ণঃ স্বেচ্ছয়োপাত্তানি ততস্ততঃ আকৃষ্টানি পৃথগ্ বপুংষি নিজতত্তদাবির্ভাবাঃ যেন তথাভূতঃ সন্নিতি।—সাক্ষাৎ ভগবানই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই ভগবানের বৈভব বলিতেছেন—ব্রহ্ম তুমি, পরমব্যোম-নামক বৈকুণ্ঠ তুমি, প্রকৃতির অতীত পুরুষও তুমি। সাক্ষাৎ ভগবান্ কি প্রকার হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন? স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ ধাম হইতে পৃথক্ পৃথক্ বপুকে—তত্তদ্

ধামের স্বীয় আবির্ভাবসমূহকে—আকর্ষণ করিয়া, তথাভূত হইয়া—সেই সকল আবির্ভাবসমূহকে ( ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকে ) স্বীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুমি আবির্ভূত হইয়াছ।”

অন্যত্রও দেখা যায়, বিদুরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উদ্ধব বলিয়াছেন—

“স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥—শ্রীভা. ৩।২।১৫॥

—অশান্ত মূঢ়ব্যক্তিসকলকর্ত্তৃক শান্তরূপ স্বীয় ভক্তসকল উপদ্রুত হইলে, ভক্তানুগ্রাহক পরাবরেশ ভগবান্ অজ হইয়াও মহদংশযুক্ত হইয়া কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন।”

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯১-অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“তস্য জন্ম নিজতত্তদংশান্যাদায়েবেত্যাহ—মহদংশযুক্তঃ মহতঃ স্বস্যৈবাংশৈর্যুক্তঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদি শ্রুতেঃ। মহদ্বচ্চেতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ। মহান্তো যে পুরুষাদয়োহংশাঃ তৈর্যুক্ত ইতি বা। লোকনাথং মহদ্ভূতমিতিবদাত্মত্বাব্যভিচারঃ। মহদ্ভিরংশিভিরংশৈশ্চ যুক্ত ইতি বা।—নিজ অংশ সকল গ্রহণ করিয়া জন্মলীলা প্রকট করেন, এজন্য বলা হইয়াছে—মহদংশযুক্ত। মহৎ—নিজের অংশ ভগবৎস্বরূপসমূহ, তাঁহাদের সহিত যুক্ত—মহদংশযুক্ত। ( মহৎ-শব্দে যে ভগবৎ-স্বরূপকে বুঝায়, তাহার প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে ) শ্রুতি বলেন—‘মহান্ বিভু আপনাকে।’ এ-স্থলে শ্রীহরিকে ‘মহান্’ বলা হইয়াছে। বেদান্তের ‘মহদ্বচ্চ ॥১।৪।৭ ॥”-সূত্রেও পরমাত্মাকেই ‘মহৎ’-বলা হইয়াছে। অথবা, “মহৎ” যে পুরুষাদি অংশ, তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তিনি মহদংশযুক্ত। বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রের ‘লোকনাথং মহদ্ভূতম’—এস্থলে যেমন আপনার মহৎস্বরূপের অব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ “মহদংশযুক্ত”-শব্দদ্বারা, শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশসমূহ সম্মিলিত হইলে নিজ স্বরূপের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহা দেখান হইল। অথবা, অংশিসকলের সহিত এবং অংশসকলের সহিত মিলিত—এইরূপও ‘মহদংশযুক্ত’-শব্দের অর্থ হইতে পারে।”

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের আলোচনায় জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার অংশস্বরূপ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহকে স্বীয় বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য শ্রীনন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন—

“আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৮।১৩ ॥

—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটী প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন; ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—“বাস্তবার্থশ্চায়ম্। অনুযুগং যুগে যুগে তনূর্গৃহ্নতঃ প্রকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ, তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোহপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতাম্ এতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ

সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—“বস্তুতস্তু অস্য অবতারিণঃ তত্তদ্বর্ণবন্তঃ অবতারাঃ অংশাঃ এব। ইদানীম্ অয়ম্ অবতারী পূর্ণঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্তঃ। যদ্বা, যঃ শুক্লঃ, যো রক্তঃ, যঃ পীতশ্চ। উপলক্ষণমেতৎ যো যোঽন্যো মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিশ্চ স সর্ব্বোঽপি ইদানী-মংশিনোঽস্য অবতারসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতাম্ অস্মিন্ অন্তর্ভূততাম্ গতঃ সর্ব্বাংশম্ আদায় এব অবতীর্ণত্বাৎ।”

টীকার তাৎপর্য্য। ইনি যুগে যুগে স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করেন। ইঁহার তিনটী বর্ণ প্রকটিত হইয়া গিয়াছে—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এ-স্থলে শুক্ল, রক্ত ও পীত হইতেছে উপলক্ষণ; শুক্ল-রক্তাদির উপলক্ষণে মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার, পুরুষাবতারাদি সমস্তকে বুঝাইতেছে। এই সমস্ত অবতারাদি হইতেছেন ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ, আর ইনি তাঁহাদের অংশী। এক্ষণে ইঁহার আবির্ভাব-সময়ে তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণতা—কৃষ্ণরূপতা—প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভূততা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সমস্ত অংশকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, স্বয়ংও কৃষ্ণ বলিয়া, নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণীভূত করিয়াছেন বলিয়া এবং ইনি সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া ইঁহার মুখ্য নাম হইতেছে ‘কৃষ্ণ।’

মন্বন্তরাবতারাদি সকলে কৃষ্ণবর্ণ নহেন, কেহ কৃষ্ণও নহেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ নন্দ-নন্দনের অন্তর্ভূত হওয়াতে, তাঁহাদের স্ব-স্ব রূপ বা বর্ণ আর দৃষ্ট হয় না; কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাঁহারাও যেন কৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। টীকার “কৃষ্ণীকৃত”-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে—অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময়ে তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভূত থাকেন।

অন্য ভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। যিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, ইদানীং তিনি স্বীয় কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং “কৃষ্ণ” তাঁহার একটী নাম—ইহাই গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায়। কিন্তু এক্ষণে “কৃষ্ণ” বা “কৃষ্ণবর্ণ” হইয়াছেন—ইহা না বলিয়া, “কৃষ্ণতা” প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহা বলিলেন কেন? ইহার অবশ্যই গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেই গূঢ় অভিপ্রায়টী এই।

কৃষ্-ধাতু আকর্ষণে। কৃষ্ণ=আকর্ষক। কৃষ্ণতা=আকর্ষকতা। নন্দ-তনয় এবার “আকর্ষকতা” প্রাপ্ত হইয়াছেন। “কৃষ্ণতাং গতঃ”—এই বাক্যে “গতঃ”-শব্দ অতীতকাল-বাচক। ইহাতে বুঝা যায়—নামকরণ-সময়ের পূর্ব্বেই, জন্ম-সময়েই, ইনি “আকর্ষকতা” প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাহাকে আকর্ষণ করিয়া ইনি আকর্ষকতা প্রাপ্ত হইলেন? ইনি অবশ্য “পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১১০॥” কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব অভিব্যক্ত হয় নাই। তবে কাহাকে বা কি বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া ইনি “আকর্ষকত্ব” প্রাপ্ত হইলেন? পরবর্ত্তী একটী শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উল্লিখিত “আসন্ বর্ণাঃ”-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের একটী নামের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—কৃষ্ণ। ইহার পরবর্ত্তী শ্রীভা. ১০।৮।১৪-শ্লোকে গর্গাচার্য্য স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—এই সন্তানের আর একটী নাম—বাসুদেব। এই দুইটী নাম ব্যক্ত করার পরেই গর্গাচার্য্য বলিলেন—

“বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮।১৫॥

—হে নন্দমহারাজ ! তোমার এই পুত্রের গুণ-কর্ম্মানুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে ; সে-সমস্ত নাম ও রূপের কথা আমিও জানিনা, লোকেও জানে না ( অনন্ত বলিয়া )।”

ইহা হইতে জানা যায়—এই নন্দ-তনয়ের অনন্ত নাম ও রূপ আছে। “সন্তি”—এই বর্ত্তমানকাল-বাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে গর্গাচার্য্য মাত্র দুইটী নাম রাখিয়াছেন। এক্ষণে বলিলেন—ইঁহার অনন্ত নাম ও অনন্ত রূপ বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহার অনন্ত নাম এবং অনন্ত রূপ নিত্য বর্ত্তমান। এ-স্থলে যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের নাম এবং রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের রূপও নিত্য, নামও নিত্য এবং তাঁহাদের নাম-রূপকে শ্রীকৃষ্ণেরই নামরূপ বলাতে ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই তত্তৎ-রূপে এবং তত্তৎ-নামে নিত্য বিরাজিত। স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে এই সমস্ত নিত্য-নামরূপযুক্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকে স্বীয় বিগ্রহে আকর্ষণ করিয়াই ইনি “আকর্ষকত্ব” বা “কৃষ্ণতা” প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—“ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ”-বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভূত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।

বিবিধ শাস্ত্রোক্তির আলোচনা পূর্ব্বক লঘুভাগবতামৃতও বলিয়াছেন—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েন। তাই প্রকট-বৃন্দাবনেও এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা প্রকট দেখা যায়।

“স্যুর্মহান্তোঽতিপরমমহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্। স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়বামনাঃ॥
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥ এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥
অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃত। কৃষ্ণামৃত॥ ৬৪৬-৪৯॥”

লঘুভাগবতামৃত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও উক্তরূপ তথ্যই স্থাপন করিয়াছেন।

“যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ॥
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥ এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ॥
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ। তত্রৈব লীলা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ইতি
—লঘুভাগবতামৃত। ৬৫৭-৫৮ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন॥

—যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ ভগবান্ পুরুষোত্তম ( পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ), যিনি শ্বেতাদ্বীপাধিপতি, এবং যিনি নর ও নারায়ণ, তিনিই বৃন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দন হরি। শতসহস্র উল্কা ( স্ফুলিঙ্গ ) যেমন মহাগ্নিতে লীন থাকিয়া মহাগ্নির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার মহাগ্নি হইতে নির্গত হয়, তদ্রূপ

ইঁহারই ( এই নন্দনন্দনেরই—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, শ্বেতাদ্বীপাধিপতি এবং নর-নারায়ণব্যতীতও ) আরও অনন্ত মনোহর অবতার আছেন। তাঁহারা সকলে শ্রীহরিতেই লীন হইয়া শ্রীহরির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন।”

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ যে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত, এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-প্রমাণ হইতেও তাহা জানা গেল। এজন্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

“পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥”

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যাঁহার প্রকাশ বা আবির্ভাব—সুতরাং অংশ, এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি স্বয়ংভগবান্‌ই হইবেন, কোনও অংশরূপ-ভগবৎ-স্বরূপের অবতার হইতে পারেন না। তিনি নিজেই অবতারী॥

## ১৭৩। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অংশী

পূর্ব্বোদ্ধৃত “আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ”-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮।১৩-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকট করেন। আবার পূর্ব্বোদ্ধৃত “বহূনি সন্তি নামানি”-ইত্যাদি শ্রীভা. ১০।৮।১৫-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণই নিত্য—অনাদি—নামরূপযুক্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রূপে অনাদি কাল হইতে বিরাজিত; সুতরাং অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা অংশ। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যাঁহার প্রকাশ বা অংশ এবং যিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে—ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে—আত্মপ্রকট করেন, তিনি নিজেই অংশী, অবতারী; তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল বলিয়া তিনি স্বয়ংভগবান্‌ই।

শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বে ( ১।১।৬৭-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম।

যিনি পরব্রহ্ম, তিনি হইতেছেন সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব; তিনি নিজে অনাদি তত্ত্ব, অথচ সকলের আদি। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ।

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা।৫।১॥”

তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না। তাঁহার ভগবত্তাও স্বয়ংসিদ্ধ, অপর কোনও স্বরূপ হইতে প্রাপ্ত নহে। সুতরাং তিনি যে স্বয়ংভগবান, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

## ১৭৪। শ্রুতি-বাক্যের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিষয়ক বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত

শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি। শ্রুতি যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম—সুতরাং স্বয়ংভগবান্—বলিয়াছেন, তখন ইহাই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য; যেহেতু, বেদান্ত-দর্শন বলিয়াছেন—“শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।”

কোনও কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অন্য কোনওরূপ উক্তি থাকিলেও শ্রুতিবাক্যের আনুগত্যে তাহার অর্থ করিতে হইবে ; নচেৎ, শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—এই বেদান্ত-সূত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে দুইটী বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমতঃ—পুরাণাদির কতকগুলি উক্তি, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয় যেন, শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার বা যুগাবতারাদি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—বিরুদ্ধমত, যাহাতে বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভগবৎ-স্বরূপাদির অবতার।

## ১৭৫। অংশাবতারত্ব-সূচক পুরাণাদিবাক্যের আলোচনা

দেবকী-গর্ভে আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবান্ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ শ্রীভা. ১০।২।৯॥

—আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব। তুমি নন্দপত্নী যশোদাতে উৎপন্ন হইবে।"

এ-স্থলে "অংশভাগেন"-শব্দে মনে হইতে পারে, ভগবান্ অংশে—পূর্ণরূপে নহে—দেবকী-পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ "অংশভাগেন"-শব্দের একাধিক অর্থ করিয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তত্বাদিতি।—সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।"

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৯২-অনুচ্ছেদে "অংশভাগেন"-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পরিপূর্ণরূপেণ। অংশানাং ভজনেন লক্ষিতো বা।—অংশসমূহের ভাগ–ভজন—প্রবেশ যাহাতে, তাদৃশ পরিপূর্ণরূপে। কিংবা, অংশসমূহের ভজনদ্বারা যিনি লক্ষিত হয়েন, তিনি অংশভাগ।" এই টীকাতেও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া যোগমায়ার নিকটে বলা হইয়াছে। আরও বুঝা গেল—তাঁহার সমস্ত অংশ-স্বরূপগণও তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

কংস-কারাগারে দেবকীদেবীর প্রতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ ভবায় নঃ।—শ্রীভা. ১০।২।৪১॥

—হে মাতঃ, আমাদের পালনের জন্য পরম-পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ অংশে তোমার গর্ভে আসিয়াছেন (যথাশ্রুত অর্থ)।"

এ-স্থলেও "অংশেন"-শব্দের অর্থ—অংশের সহিত। সহার্থে তৃতীয়া। পরিপূর্ণরূপে। অথবা, যিনি অংশদ্বারা-মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে পালন করেন, তিনি স্বয়ং তোমার গর্ভে আসিয়াছেন। এইরূপ অর্থ না করিলে শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে না।

এইরূপে সর্ব্বত্রই শ্রুতিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদাদি টীকাকারগণও তাহাই করিয়াছেন।

## ১৭৬। অন্য-ভগবৎ-স্বরূপের অবতারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু অংশাবতার বলিয়াই মনে হয়, দিগ্দর্শনরূপে পূর্ববর্ত্তী ১।১।১৭৫-অনুচ্ছেদে সেই সকল শাস্ত্রবাক্যেরই কয়েকটী আলোচিত হইয়াছে। যথাশ্রুত অর্থে এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণভাবে অংশাবতার বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু অংশরূপ কোন্ ভগবৎ-স্বরূপের অবতার, তাহা জানা যায় না।

আবার, এমন কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যও আছে, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ভগবৎস্বরূপের অবতার, তাহা যেন স্পষ্টভাবে বা তাৎপর্য্যার্থে সে-সমস্ত হইতে জানা যায়। শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের আনুগত্যে এক্ষণে এতাদৃশ কয়েকটী শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতিপূর্ণ মীমাংসার দিগ্দর্শন করা হইতেছে।

### ক। বিকুণ্ঠাসুতের অবতারত্ব

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জয়বিজয়-শাপ-প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে মনে হয়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিকুণ্ঠা-সুতের অবতার। এই দুইটী শ্লোকের প্রথম শ্লোকটী হইতেছে এইরূপ :—

"ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ ॥ শ্রীভা. ১১।৬।৩১ ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠং যাস্যন্ তব ভবনং যাস্যামি—বৈকুণ্ঠ-গমন-সময়ে তোমার ভবনে যাইব।" এই টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের অনুবাদ হইবে এইরূপ :—

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে অনঘ! হে ব্রহ্মন্! এইক্ষণে ব্রহ্মশাপের ফলে যদুকুলের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। ইহার (ধ্বংসের) পরে, বৈকুণ্ঠে যাওয়ার সময়ে আমি তোমার ভবনে (সত্যলোকে) যাইব।"

শ্রীমদ্ভাগবতের অপর শ্লোকটী হইতেছে এই :—

"ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥ ১১।৬।২৭ ॥

—(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি এখন তোমার স্বীয় পরম-ধামে (শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বোশ্লোক-ব্যাখ্যানুসারে)—বৈকুণ্ঠে—গমন কর এবং লোকসমূহসহ লোকপাল-আমাদিগকে ও বৈকুণ্ঠ-কিঙ্করগণকে প্রতিপালন কর।"

প্রথম শ্লোকের স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায়—মুষল-লীলায় যদুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে যাইবেন বলিয়াই ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন এবং শ্রীধরস্বামীর সেই অর্থ অনুসারে, দ্বিতীয় শ্লোক হইতেও বুঝা যায়—ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠ-গমনের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মা এই বৈকুণ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণের "পরমধামও" বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—এই বৈকুণ্ঠের অধিপতি যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু ইহা কোন্ বৈকুণ্ঠ ? এক বৈকুণ্ঠ হইতেছে—পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের ধাম। ব্যষ্টিসৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বৈকুণ্ঠই দর্শন করিয়াছেন। এই বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বিরজার বা কারণার্ণবের পরপারে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আর এক বৈকুণ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ। তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ। রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া॥
শ্রীভা. ৮।৫।৪-৫॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যথা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি মন্যতে তথৈব বৈকুণ্ঠস্য কল্পনম্ আবির্ভাবনম্ এব। ন তু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বম্। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ জজ্ঞ ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠাসুতস্য এব ইদং বৈকুণ্ঠম্। মূলবৈকুণ্ঠস্তু সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টম্ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রসিদ্ধমেব। 'স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ (শ্রীভা. ৮।১৯।১১)' চেতি নির্দ্দিষ্টং তৎস্থানং সর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ম্।" লঘুভাগবতামৃতধৃত উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ।"

টীকানুসারে শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই :—"ভগবান্ স্বয়ং শুভ্র ও তৎপত্নী বিকুণ্ঠার যোগে স্বীয় অংশে বৈকুণ্ঠ-নামে আবির্ভূত হয়েন। বিকুণ্ঠাদেবীর যোগে বৈকুণ্ঠদেবের আরও কয়েকজন ভ্রাতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা সুর-সত্তম। রমাদেবীর প্রার্থনা অনুসারে রমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য বৈকুণ্ঠদেব লোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠ-নামক লোক প্রকটিত করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন -

"মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপকস্যাব্যয়াত্মনঃ।
প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমুচ্যতে॥ কৃষ্ণামৃত। ২০২॥

—অব্যয়াত্মক ব্যাপক মহাবৈকুণ্ঠলোকের (পরব্যোমের), সত্যলোকের উপরিভাগে, প্রকটনকেই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে কল্পন বলা হইয়াছে।"

ইহা হইতে জানা যায়—বিকুণ্ঠাসুত বৈকুণ্ঠদেবের বৈকুণ্ঠ-লোক মূল বৈকুণ্ঠেরই প্রকাশ বিশেষ—সুতরাং ব্যাপক, অব্যয়াত্মক এবং নিত্য ; ইহা প্রাকৃত নহে। এই বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডস্থ সত্যলোকের উপরিভাগে অবস্থিত ; সুতরাং বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত।

এই বৈকুণ্ঠ যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে জানা যায়—বিষ্ণুকর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য শূলহস্তে ভগবানের (বৈকুণ্ঠদেবের) পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠদেব স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তখন হিরণ্যকশিপু বৈকুণ্ঠদেবকে তাঁহার পুরীতে (বৈকুণ্ঠে) দেখিতে না পাইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

"স তন্নিকেতং পরিমৃশ্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদঃ ॥
—শ্রীভা. ৯।১৯।১১ ॥"

তখন পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ, বিবর, সাগর—সর্ব্বত্র ভ্রাতৃহন্তাকে অন্বেষণ করিয়াও কোথাও না পাইয়া হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিলেন—"ময়ান্বিষ্টমিদং জগৎ—আমি সমস্ত জগৎ অনুসন্ধান করিয়াও (আমার ভ্রাতৃহন্তাকে পাইলাম না)।" ইহাতেই জানা যায়—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই হিরণ্যকশিপু স্বীয় ভ্রাতৃহন্তাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রথমে তিনি যে বৈকুণ্ঠপুরীতে গিয়াছিলেন, তাহাও ব্রহ্মাণ্ডেরই মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতেও জানা যায় একসময় ব্রহ্মার পুত্র সনন্দনাদি ভুবনত্রয়মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুর লোকে (বৈকুণ্ঠে) গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বিষ্ণোর্লোকং যদৃচ্ছয়া।
সনন্দনাদয়ো জগ্মুশ্চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥ শ্রীভা. ৭।১।৩৫ ॥"

ভুবনত্রয়-ভ্রমণ-কালে তাঁহারা বিষ্ণুর লোকে উপনীত হইলেন—ইহাদ্বারাই বুঝা যায়,—এই বিষ্ণুর লোক হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহা বিকুণ্ঠাসুতের লোক বৈকুণ্ঠই।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে দুই বৈকুণ্ঠের কথা জানা গেল—এক বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম; আর এক বৈকুণ্ঠ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সত্যলোকের উপরিভাগে। সত্যলোকের উপরিভাগে অবস্থিত বৈকুণ্ঠ হইতেছে বিকুণ্ঠাসুত বৈকুণ্ঠের ধাম। লঘুভাগবতামৃত বলেন, স্বর্গেও এই বৈকুণ্ঠদেবের একটী লোক আছে; তিনি স্বর্গস্থিত বৈকুণ্ঠেও লীলা করেন এবং স্বীয় প্রকটিত সত্যলোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠেও লীলা করেন—দুই প্রকাশে।

"স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিষ্কৃতো হি যঃ ॥
—লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণামৃত-২৫৭ ধৃত-পুরাণবচন ॥"

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, যদুকুল-ধ্বংসের পরে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার সময়ে তিনি ব্রহ্মার ভবনে যাইবেন, ইহা কোন্ বৈকুণ্ঠ ?

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে বুঝা যায়—তিনি যে বৈকুণ্ঠের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যাইতে হইলে সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মার ভবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়; সুতরাং ইহা স্বর্গস্থিত বৈকুণ্ঠ নহে। ইহা সত্যলোকের উপরিস্থিত বিকুণ্ঠা-সুতের বৈকুণ্ঠই হইবে। স্বর্গ—সুতরাং স্বর্গস্থিত বৈকুণ্ঠও—সত্যলোকের নিম্নদেশে অবস্থিত।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এই বৈকুণ্ঠ যে সত্যলোকের উপরিস্থিত বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠই, মূল বৈকুণ্ঠ পরব্যোম নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক্ষের পূর্ব্ববিবরণ আলোচনা করিতে হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৭।১।৩৫-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সনন্দনাদি বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠে যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিকুণ্ঠাসুতের দুই জন দ্বারপাল ( জয় ও বিজয় ) তাঁহাদিগকে পুরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তাঁহারা দ্বারপালদ্বয়কে অভিসম্পাত দেন—দ্বারপালদ্বয় যেন অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিন জন্মের পরে দ্বারপালদ্বয় স্বীয় লোকে—বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠে—প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এই দুই দ্বারপাল—প্রথম জন্মে হিরণ্য-কশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ জন্মে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন এবং পরে আবার শ্রীহরির পার্শ্বে গিয়া বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভ করেন।

"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত-সাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ শ্রীভা. ৭।১।৪৬॥

—সেই দুই জন ( অর্থাৎ শিশুপাল ও দন্তবক্র ) তীব্র বৈরানুবন্ধ-( শত্রুতা )-হেতু ধ্যানদ্বারা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণুপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

এই শ্লোকে দুইটী কথা পাওয়া গেল—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত শিশুপাল ও দন্তবক্র (১) শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইলেন এবং (২) পুনরায় বিষ্ণুপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই শ্রীহরি এবং বিষ্ণু কে ? ব্যাপক বলিয়া ভগবৎ-স্বরূপ-মাত্রকেই বিষ্ণু বলা হয় এবং মঙ্গলদায়ক বলিয়া হরিও বলা হয়। এ-স্থলে শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুপার্ষত্ব লাভ করার উক্তিতে একই ভগবৎ-স্বরূপকেই যে শ্রীহরি এবং বিষ্ণু বলা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই ভগবৎ-স্বরূপ যে বিকুণ্ঠাসুত, তাহাতে সন্দেহ নাই ; যেহেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সনন্দনাদি বিকুণ্ঠাসুতের দ্বারপালদ্বয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিন জন্ম পরে তাঁহারা পুনরায় বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা বিকুণ্ঠাসুত শ্রীহরির পার্শ্বে আনীত হইয়া পুনরায় বিকুণ্ঠাসুতের পার্ষদত্ব—দ্বারপালত্ব—লাভ করিলেন।

কিরূপে এবং কাহাকর্ত্তৃক তাঁহারা বিকুণ্ঠাসুতের পার্শ্বে নীত হইলেন ? তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠে না আসিলে তাঁহাদের এ-স্থানে আসা সম্ভব নয় ; যেহেতু, সাযুজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক্ সত্ত্বা ছিল না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। মৌষল-লীলায় যদুকুল-ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ এ-স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় বিগ্রহ হইতে বাহির করিয়া দেন। উপরে উদ্ধৃত "বৈরানুবন্ধতীব্রেণ"-ইত্যাদি শ্রীভা. ৭।১।৪৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই বলিয়াছেন। "নীতৌ মৌষললীলান্তে হরের্নারায়ণস্য পার্শ্বং জগ্মতুরিতি মৌষললীলাতঃ পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণশরীব এব নারায়ণস্যাপি প্রবিষ্টত্বাৎ তৎপার্ষদৌ জয়বিজয়াবপি তত্রৈব প্রবিশ্য স্থিতাবিতি তত্ত্বম্। শিশুপালদন্তবক্রৌ কৃষ্ণে সাযুজ্যং প্রাপতুরিতি তু লোকপ্রতীতিঃ। —মৌষললীলার পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিকুণ্ঠাসুত নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই প্রবিষ্ট ছিলেন ; তাঁহার পার্ষদ জয়-বিজয়ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবিষ্ট হইয়াই ছিলেন। শিশুপাল-দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা লোকপ্রতীতিমাত্র।"

যাহাহউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যদুকুল-ধ্বংসের পরে সত্যলোকস্থিত ব্রহ্মার ভবন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠে যাইবেন বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বিকুণ্ঠাসুতের ব্রহ্মাণ্ডস্থ বৈকুণ্ঠ ; তাহা পরব্যোম-নামক মূল বৈকুণ্ঠ নহে।

ইহাতে মনে হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ বিকুণ্ঠাসুতের অবতার। তাই তিনি যদুকুল-ধ্বংসের পরে বিকুণ্ঠাসুতের বৈকুণ্ঠে আসিয়াছিলেন।

ইহাও শাস্ত্রোক্তি ; সুতরাং মিথ্যা বা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। আবার এই শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিয়াছেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। ইহাও মিথ্যা হইতে পারে না ; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা শ্রুতিসম্মত।

শ্রীমদ্‌ভাগবত একবার বলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ; আবার বলেন—তিনি বিকুণ্ঠাসুতের অবতার, সুতরাং স্বয়ংভগবান্ নহেন। এই দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কিরূপে হইতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা শ্রুতিসম্মত বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই তাঁহার বিকুণ্ঠাসুতের অবতারত্বের সমাধান করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় এই সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ৯০-অনুচ্ছেদে ) শ্রীজীবগোস্বামীও তদ্রূপ সমাধানই করিয়াছেন। সেই সমাধান এই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সময়ে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই—সুতরাং বিকুণ্ঠাসুতও—তাঁহারই বিগ্রহের মধ্যে অবস্থান করেন। শিশুপাল-দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বরূপ জয়-বিজয়রূপে বিকুণ্ঠাসুতের পার্ষদত্ব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করেন এবং বিকুণ্ঠাসুতের পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই অবস্থান করেন। সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই বলিয়া মনে করিয়াছে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। যদুকুল-ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রকট-ধামে যাওয়ার সময়ে বিকুণ্ঠাসুত এবং তাঁহার দ্বারপালরূপী পার্ষদদ্বয়—জয়-বিজয়ও—সত্যলোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখে অভিব্যক্ত বিকুণ্ঠসুতেরই উক্তি। ইহাই সমাধান। এইরূপ সমাধান না করিলে শ্রুতিবাক্যের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা সম্ভব হয় না।

## খ। বদরীশ-নারায়ণের অবতারত্ব

লঘুভাগবতামৃতে স্কন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।
চন্দ্রবংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ ॥ কৃষ্ণামৃত। ২৬৫ ॥

— (যথাশ্রুত অর্থ ) শ্রীহরির যে অংশদ্বয়, নর ও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

ইহা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ( বদরিকাশ্রমের অধিপতি ) নারায়ণের অবতার এবং অর্জ্জুন হইতেছেন ( বদরিকাশ্রমস্থ ) নরের অবতার।

এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্তি দৃষ্ট হয়।

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ ॥ শ্রীভা, ৪।১।৫৮ ॥"

এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ—"ভগবান্ শ্রীহরির অংশভূত সেই দুইজন ( নর ও নারায়ণ ) পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক, ভূভার-হরণার্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"তাবিমৌ নরনারায়ণৌ হরেঃ কৃষ্ণস্য অংশৌ কর্ত্তারৌ ইহ দ্বাপরান্তে যদূদ্বহ-কুরূদ্বহৌ কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ম্মভূতৌ আগতৌ প্রাপ্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ স্বাংশিনো স্তাবংশৌ প্রবিষ্টাবিতর্থঃ।" শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"আগতাবিতি কর্ত্তরি নিষ্ঠা। কৃষ্ণাবিতি কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি তাবিমৌ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ।"

এই টীকানুসারে, শ্লোকস্থ "অংশৌ" শব্দ হইতেছে "আগতৌ"-ক্রিয়ার কর্ত্তা, কর্ত্তৃকারকে দ্বিবচন। আর "কৃষ্ণৌ—কৃষ্ণার্জ্জুনৌ" হইতেছে "আগতৌ—প্রাপ্তৌ"-ক্রিয়ার কর্ম্ম, কর্ম্মকারকে দ্বিবচন। "হরেঃ অংশৌ—হরি শ্রীকৃষ্ণের অংশ।"

এই টীকানুসারে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ :—"দ্বাপরান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত নর ও নারায়ণ, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিলেন।" অংশ অংশীতে প্রবেশ করিলেন।

এই ভাবে পূর্ব্বোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণ-শ্লোকেও "কৃষ্ণার্জ্জুনৌ"-শব্দকে "প্রাপ্য"-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে মনে করিয়া এবং "ধর্ম্মপুত্রৌ"-কে "প্রাপ্য" ও "জাতৌ"—ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ত্তা ধরিয়া অর্থ করিলে অর্থ হইবে এইরূপ :—"হরি শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত নর-নারায়ণ-নামক ধর্ম্মপুত্রদ্বয় কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া ( কৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়া ) চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ( কৃষ্ণার্জ্জুনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন )।"

এইরূপ অর্থ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্বাসূচক শ্রুতির ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকে না।

এইরূপে প্রকৃত অর্থ হইল এই যে—দ্বাপরে নর ও নারায়ণ যথাক্রমে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নর-নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, তাহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে বদরীশ নারয়ণের অবতার নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বদরীশ-নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই প্রমাণিত হইল।

## গ। উপেন্দ্রের অবতারত্ব

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"শ্রীহরিবংশমতে উপেন্দ্র এব অবততার ইতি—শ্রীহরিবংশের মতে শ্রীউপেন্দ্রই ( শ্রীকৃষ্ণরূপ ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

শ্রীউপেন্দ্র হইতেছেন বৈবস্বত-মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার; তাঁহার অপর নাম বামন। এই বামন বা উপেন্দ্রসম্বন্ধে শ্রীহরিবংশে ইন্দ্রের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

"ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্যৈব মুনে ভাগমহং দদৌ।

যবীয়াংসমহং প্রেম্ণা কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ ॥ লঘুভাগবতামৃত ॥ ২৬৮॥—হরিবংশ। ১২৭।৩৪॥

—(পারিজাত-প্রসঙ্গে ইন্দ্র নারদের নিকটে বলিয়াছেন) হে মুনে! যে যজ্ঞভাগ পূর্ব্বে বিষ্ণুকে দিতাম, এক্ষণে সেই যজ্ঞভাগ আমি শ্রীকৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। হে নারদ! প্রেমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আমার কনিষ্ঠভ্রাতা (বামন) বলিয়া মনে করি।" (শ্রীবামনদেব ইন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতারূপে স্বর্গে বিরাজমান)।

ইন্দ্রের এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে—বামনদেবই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু উপেন্দ্র বা বামন যে শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, তাহা শ্রীহরিবংশেই কথিত হইয়াছে।

"অদিত্যা তপসা বিষ্ণুর্মহাত্মারাধিতঃ পুরা। বরেণ চ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ ॥

তয়োক্তস্ত্বাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম। তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোঽপরঃ ॥

অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥—লঘুভাগবতামৃত ২৭১-৭২ ধৃত হরিবংশ ১২৮।২১-২৩॥ বচন ॥

—(নারদ বলিতেছেন) পুরাকালে অদিতিদেবী তপস্যাদ্বারা মহাত্মা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে বরদানের জন্য ইচ্ছা করিলে অদিতি বলিয়াছিলেন—হে সুরোত্তম! আমি তোমার সদৃশ পুত্র-প্রাপ্তির ইচ্ছা করি। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—ত্রিভুবনে আমার সমান অপর কোনও পুরুষ নাই। আমিই অংশে তোমার পুত্র হইব।"

এই পুত্রই উপেন্দ্র বা বামন। ইনি যে বিষ্ণুর—শ্রীকৃষ্ণের—অংশ, তাহা হরিবংশ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

এইরূপে হরিবংশ হইতে দুই রকম উক্তি পাওয়া গেল—উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রের অবতার বা অংশ। এই পরস্পর-বিরোধী বাক্যদ্বয়ের সমন্বয় এই—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া তিনিই সকলের অংশী, উপেন্দ্রাদি তাঁহার অংশ। কনিষ্ঠভ্রাতারূপে বিরাজিত উপেন্দ্রে ইন্দ্রের সমধিক প্রীতি স্বাভাবিক। সেই প্রীতিবশতঃই তিনি অংশী শ্রীকৃষ্ণকেই উপেন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণেই উপেন্দ্রের উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া উপেন্দ্র এক স্বরূপে তাঁহার মধ্যেও অবস্থিত আছেন; সুতরাং ইন্দ্রের পক্ষে উল্লিখিতরূপ অনুভব ভ্রান্তিমাত্র নহে ॥

"একই ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুরূপ।
একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১৪১॥"
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্র ॥

### ঘ। ক্ষীরোদশায়ীর অবতারত্ব

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণের অবতার। ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা তৃতীয় পুরুষ।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা জানাইবার উদ্দেশ্যে রুদ্রাদি দেবগণের

সহিত, ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে গিয়া, ব্রহ্মা যখন পুরুষসূক্তদ্বারা জগতের পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ীর স্তবস্তুতি করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনিয়া দেবতাদের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥ শ্রীভা. ১০।১।২১॥

—সমাধি-অবস্থায় আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন—হে অমরগণ! আমি যে পৌরুষী বাণী (ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের বাক্য) শুনিলাম, তাহা তোমরা শুন এবং অবিলম্বে সেই বাণীর অনুরূপ কার্য্য কর।"

আকাশবাণীটী এইরূপঃ—

"পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরদ্ভুবি॥
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥
বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥
বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥
শ্রীভা. ১০।১।২২-২৫॥

—পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা (পরম) পুরুষ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। স্বীয়-কালশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর ভারহরণ-ব্যপদেশে সেই ঈশ্বরেশ্বর যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন (প্রকট থাকিবেন), যদুবংশে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরাও তত দিন অবস্থান কর। সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন (অবতীর্ণ হইবেন)। তাঁহার প্রীতিসম্পাদনের জন্য সুরস্ত্রীগণও জন্মগ্রহণ করুন্। বাসুদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট্ অনন্তদেব তাঁহার প্রিয়কার্য্যসম্পাদনার্থ অগ্রেই অবতীর্ণ হইবেন। যাঁহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ সম্মোহিত হয়, বিষ্ণুর সেই ভগবতী মায়াও প্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া প্রভুর কার্য্যসম্পাদনার্থ অংশে অবতীর্ণ হইবেন।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—(১) ব্রহ্মা পুরুষসূক্তে কাহার স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন? (২) আকাশ-বাণীটী কাহার বাক্য? (৩) আকাশবাণীতে যাঁহার অবতরণের কথা জানান হইয়াছে, তিনি কে?

ক্রমশঃ এই তিনটী প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে।

(১) ক্ষীরোদশায়ী পুরুষই জগতের পালন-কর্ত্তা; সুতরাং পৃথিবীর ভারহরণ করা তাঁহারই কার্য্য। এজন্যই ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদশায়ীর নিকটে পৃথিবীর দুর্দ্দশার কথা জানাইবার জন্যই যখন তিনি সে-স্থানে গিয়াছিলেন. তখন তিনি যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষেরই স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন।

"তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥ শ্রীভা. ১০।১।২০॥

—( ব্রহ্মা ) সে-স্থানে গিয়া সমাহিত-চিত্তে পুরুষসূক্তদ্বারা জগন্নাথ দেবদেব এবং বৃষাকপি পুরুষের উপাসনা করিলেন ।”

ব্রহ্মা যাঁহার উপাসনা করিলেন, সেই পুরুষ কে ? তিনটী বিশেষণে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি “জগন্নাথ—জগতের নাথ বা পালনকর্ত্তা।” তিনি “দেবদেব—দেবতাদিগেরও দেবতা বা পূজ্য” ; জগতের পালনের জন্য দেবতাগণও তাঁহার স্তবাদি করিয়া থাকেন। তিনি “বৃষাকপি—অভীষ্ট বর্ষণ করেন এবং ক্লেশাদিকে আকম্পিত বা দূরীভূত করেন।” বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—“জগতাং নাথং বিশেষশ্চ দেবানাং দেবং পূজ্যং জগৎপালনার্থং দেবৈঃ স্তুতত্বাদিতি ভাবঃ। কিন্তু বর্ষতি কামান্, আকম্পয়তি: ক্লেশানিতি বৃষাকপিস্তম্ ইতি প্রয়োজনঞ্চোদ্দিষ্টম্।” যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মাদিদেবগণ সে-স্থানে গিয়াছিলেন, উল্লিখিত বিশেষণত্রয়ে তাঁহারা জানাইতেছেন—এই পুরুষের দ্বারাই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং এই পুরুষ যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মা পুরুষসূক্তে ক্ষীরাব্ধিশায়ী পুরুষেরই স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। এজন্যই “পুরুষ”-শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

( ২ ) আকাশবাণীটী কাহার বাক্য ?

ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—“গাং পৌরুষীম্—পুরুষের বাক্য।” ব্রহ্মা যে ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের স্তব করিয়াছিলেন, সেই পুরুষেরই বাক্য। শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—“পৌরুষীং পুরুষস্য ভগবত ইয়ং পৌরুষী তাং গাং বাচম্—ভগবান্ পুরুষের-বাক্য।” যাঁহার স্তব করা হইয়াছে, স্তবে তুষ্ট হইয়া তিনিই কিছু বলিবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

( ৩ ) কাহার অবতরণের কথা আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে ?

যিনি অবতীর্ণ হইবেন, আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে, তিনি—“ঈশ্বরেশ্বরঃ”, “সাক্ষাদ্ ভগবান্”, “পুরুষঃ পরঃ”।

ঈশ্বরেশ্বরঃ—ঈশ্বর-সমূহেরও ঈশ্বর, পরমেশ্বর। “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ( ৬।৭ )-বাক্যে পরব্রহ্মকেই “ঈশ্বরেশ্বর” বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই “পরমেশ্বর” বলিয়াছেন। “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৫।১ ॥” ক্ষীরাব্ধিশায়ী পুরুষ “অনাদি”—অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ – নহেন ; যেহেতু, গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ তিনি ; সুতরাং অব্যবহিতভাবে তাঁহার আদি হইতেছেন গর্ভোদশায়ী। তিনি সকলের “আদিও” নহেন ; এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অব্যবহিত “আদি” হইতেছেন প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। সুতরাং গর্ভোদশায়ী সর্ব্বকারণ-কারণও নহেন। যিনি “ঈশ্বরেশ্বর—মহেশ্বর”, তিনি গর্ভোদশায়ীরও ঈশ্বর, এমন কি গর্ভোদশায়ী এবং কারনার্ণবশায়ীরও ঈশ্বর এবং তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ—ব্রহ্মাণ্ডের অব্যবহিত কারণস্বরূপ পুরুষত্রয়েরও কারণ বা মূল।

সাক্ষাদ্ ভগবান্—স্বয়ংভগবান্। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বটেন ; কিন্তু স্বয়ংভগবান্ নহেন। ক্ষীরোদশায়ীর ভগবত্ত্বা স্বয়ংসিদ্ধ নহে ; পরন্তু স্বয়ংভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-ভগবান্।

পুরুষঃ পরঃ—পরম-পুরুষ। ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ বটেন, কিন্তু পরম-পুরুষ নহেন। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষে এবং গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষেও ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষ অপেক্ষা উৎকর্ষ বিদ্যমান্। যিনি পরম-ঈশ্বর, তিনিই পরম-পুরুষ।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বসুদেবের গৃহে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া আকাশবাণীতে বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছন পরম-পুরুষ, পরমেশ্বর, স্বয়ংভগবান্। তিনি ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ নহেন।

বিশেষতঃ আকাশবাণীটী যখন ক্ষীরোদশায়ীরই বাক্য, তখন তাঁহার নিজেরই যদি বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহাহইলে "ঈশ্বরেশ্বর, সাক্ষাদ্‌ভগবান্, পরমপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন"—এইরূপ না বলিয়া "আমি নিজেই অবতীর্ণ হইব"—এ-কথা বলাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই।

বসুদেব-গৃহে দেবকী-গর্ভে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্যান্য প্রমাণ হইতেও জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী প্রমাণ আলোচিত হইতেছে।

আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবান্ যোগমায়াদেবীর নিকটে বলিয়াছিলেন—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাং পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ শ্রীভা. ১০।২।৯॥

—হে শুভে! আমি "অংশভাগে" দেবকীতে পুত্রতা প্রাপ্ত হইব; তুমি নন্দপত্নী যশোদাতে আবির্ভূত হইবে।"

এই শ্লোকের "অংশভাগেন"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেন—পুরুষরূপ অংশদ্বারা যিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন।" এইরূপ অর্থে, প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ যে দেবকীসুতের অংশ, তাহা প্রতিপন্ন হইল। ক্ষীরাব্ধিশায়ী আবার কারণার্ণবশায়ীর অংশের অংশ—সুতরাং দেবকীসুতের অংশাংশাংশ।

স্বামিপাদ অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন—"যদ্বা অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন—মায়ার সাহচর্য্যে যিনি গুণাবতারাদি রূপে ভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি।" এই অর্থেও বুঝা গেল—গুণাবতারাদি হইতেছেন দেবকীনন্দনের অংশ; ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষও গুণাবতার; সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী যে দেবকীনন্দনের অংশ তাহাই বলা হইল।

স্বামিপাদ "অংশভাগেন"-শব্দের আরও কয়েক রকম অর্থ করিয়া শেষকালে বলিয়াছেন—"সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণ ইতি বিবক্ষিতম্—দেবকীগর্ভে ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণরূপেই অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে।"

সুতরাং দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া যোগমায়ার নিকটে যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ী নহেন, পরন্তু ক্ষীরাব্ধিশায়ীরও অংশী। ইহাই স্বামিপাদের ব্যাখ্যা হইতে জানা গেল।

দেবকীর গর্ভস্তুতি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি ন স্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনন্তে॥ শ্রীভা. ১০৷২৷৪০॥

—হে যদূত্তম! মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, রাজন্য (শ্রীরামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম), বিবুধ (উপেন্দ্র)-প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি যেমন ত্রিভুবনকে এবং আমাদিগকেও পালন করিতেছেন, এবারও তদ্রূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন। আপনাকে বন্দনা করি।"

যিনি দেবকীর গর্ভে আবিভূর্ত হইয়াছেন, তিনি যে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী, সুতরাং স্বয়ং ভগবান্—ব্রহ্মা এ-স্থলে তাহাই বলিলেন। ক্ষীরাব্ধিশায়ী কিন্তু মৎস্য-কূর্ম্মাদির অবতারী নহেন।

যিনি দেবকীর গর্ভে আবিভূর্ত হইয়াছেন, তিনি যে পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবান্—দেবকীকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা তাহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন;

"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ॥ শ্রীভা. ১০৷২৷৪১॥

—হে মাতঃ! ভাগ্যক্রমে পরম-পুরুষ সাক্ষাদ্ ভগবান্ স্বীয় অংশের (অংশসমূহের) সহিত অপানার কুক্ষিগত হইয়াছেন—আমাদের মঙ্গলের জন্য।"

ব্রহ্মা বলিলেন—যিনি দেবকীর গর্ভে আসিয়াছেন, তিনি "পরঃ পুমান্—পরম পুরুষ"—সুতরাং তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরাব্ধিশায়ী নহেন এবং তিনি "সাক্ষাদ্ ভগবান্"—স্বয়ংভগবান্, স্বয়ংভগবানের অংশাংশাংশ ক্ষীরোদশায়ী নহেন।

কংস-কারাগারে দেবকীগর্ভ হইতে যিনি আবিভূর্ত হইলেন, তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া দেবকীদেবী বলিয়াছিলেন—

"নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ॥ শ্রীভা. ১০৷৩৷২৪॥

—কালচক্রের পরিবর্ত্তনে দ্বিপরার্দ্ধকাল (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) শেষ হইলে যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত সূক্ষ্মভূতে, সূক্ষ্মভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন অশেষসংজ্ঞ একমাত্র আপনিই বিদ্যমান থাকেন।"

দেবকীদেবী এস্থলে মহাপ্রলয়ের কথাই বলিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে চরাচর সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া গেলে একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই থাকেন। তখন গুণাবতার ক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ক্ষীরোদসমুদ্রে থাকেন না। পরব্রহ্মকেই যে দেবকীদেবী স্তুতি করিয়াছেন এবং পরব্রহ্মই যে তাঁহার যোগে আবিভূর্ত হইয়াছেন—পরন্তু ক্ষীরোদশায়ী নহেন—এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

দেবকীদেবী অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মাংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ শ্রীভা. ১০৷৮৫৷৩১॥

—(দেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) যে তোমার অংশের অংশ ও তদংশদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, হে বিশ্বাত্মন্! অদ্য আমি সেই তোমার শরণ লইলাম।"

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। বিশ্বের স্থিতিকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ; তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীই যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহার কোনও প্রমাণই দৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪৮॥

—যাঁহার এক নিশ্বাসকালমাত্র তদ্‌রোমকূপজাত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথগণ স্ব-স্ব-অধিকারে অবস্থিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ ( অংশাংশ ), আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন করি।"

এ-স্থলে ব্রহ্মা বলিলেন—মহাবিষ্ণু ( কারণার্ণবশায়ী ) হইতেছেন গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ। ক্ষীরাব্ধি-শায়ী আবার মহাবিষ্ণুরই অংশাংশ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশেরও অংশাংশ। ক্ষীরাব্ধিশায়ী যে শ্রীকৃষ্ণ নহেন, ইহা হইতে তাহাই জানা গেল।

এইরূপ আরও বহু প্রমাণ আছে, যাহা হইতে জানা যায়—ক্ষীরাব্ধিশায়ী পুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষীরাব্ধিশায়ীর অবতার—এই উক্তি বিচারসহ হইতে পারে না।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহাতে অবস্থিত থাকেন, ক্ষীরাব্ধিশায়ীও থাকেন। কেহ যদি স্বীয় সাধনানুসারে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে ক্ষীরাব্ধিশায়ীর উপলব্ধি পাইয়া থাকেন, তাহাও মিথ্যা হইবে না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে ক্ষীরাব্ধিশায়ী তো আছেনই। একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥১।২।৮৯॥
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা॥১।২।৯২॥
সেহো ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মতে কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার॥১।২।৯৩-৯৬॥"

## ঙ। কেশাবতারত্ব

**কেশাবতার**—কেশ + অবতার = কেশাবতার ; কেশের অবতার।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, অসুর-প্রকৃতি রাজন্যবর্গ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবী যখন স্বীয় দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করিয়া পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইলে—

"এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে। অবতীর্য্য ভুবোভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥
বি. পু. ৫।১।৫৯-৬০॥"

এই শ্লোকদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ ঃ—পরাশর ঋষি মৈত্রেয়কে বলিলেন—"হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশদ্বয় উৎপাটিত করিলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—"আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবেন।" ইহার পরে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—কৃষ্ণকেশই দেবকীর অষ্টম গর্ভে এবং শ্বেতকেশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।

উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ক্ষীরোদশায়ীর কৃষ্ণবর্ণ কেশের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ কেশের অবতারই বলরাম। কেশ-শব্দের একটী অর্থ হইতেছে—চুল, সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে বলা হয়—বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর ইত্যাদি; যাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার বলেন, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ-বলরাম হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকস্থিত চুলেরই অবতার।

মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়ো রেকো বলভদ্রো বভুব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভুবঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ২৯-ধৃতবচন।"

এই শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থেরই অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি এইরূপ ঃ—

"ভূমেঃ সুরেতরবিরুথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬।"

—অসুর-সেনা-নিপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্বেতকৃষ্ণ-কেশ ভগবান্ স্বীয় অংশ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া লীলা করিবেন। তাঁহার বর্ত্ম বা লীলার রহস্য সকলেরই দুর্জ্ঞেয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের এইশ্লোকে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে "সিতকৃষ্ণকেশঃ—শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত" বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে মনে হয়—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ; যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণের এবং মহাভারতের শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থে ক্ষীরোদশায়ীই শ্বেত-কৃষ্ণ-কেশযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ বিচারসহ নহে। তাহার হেতু এই ঃ

"কেশ"-শব্দের সাধারণ অর্থ চুল। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক-সমূহে "চুল"-অর্থে ই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ইহাই মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের মস্তকে শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চুল ছিল বা আছে। তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, ক্ষীরোদশায়ীর মস্তকের চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁহার কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ ( বা পাকা ), কতকগুলি চুল স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ ( বা কাঁচা ); অথবা তাঁহার মস্তকের চুল প্রথমে সকলগুলিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে তাহার মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ( বা সাদা ) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষীরোদশায়ীর চুল স্বভাবতঃই যে শ্বেত-কৃষ্ণ ( কাঁচা-পাকা ), তাহার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। "ন চাস্য নৈসর্গিক-সিতকৃষ্ণতেতি প্রমাণমস্তি ॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬-শ্লোকের টীকায় ক্রমসন্দর্ভ" ॥ সুতরাং তাঁহার চুল স্বভাবতঃই শ্বেত-কৃষ্ণ—এই অনুমান বিচারসহ নয়। আর তাঁহার চুল প্রথমে সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কালবশে পরে কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ( সাদা ) হইয়া গিয়াছে—এইরূপ অনুমানও গ্রহণীয় হইতে পারে না ; এই অনুমান স্বীকার করিতে গেলে মনে করিতে হয়, সাধারণ মানুষের ন্যায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণও কালের প্রভাবের অধীন। দেবতামাত্রই যে নির্জ্জর, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভগবান্ কালের প্রভাবের অতীত ; জরা বা বার্দ্ধক্য হইতেই লোকের মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া যায় ; ভগবানের জরা বা বার্দ্ধক্য সম্ভব নয় ; তাঁহার রূপ নিত্য। "যৈর্যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে তু ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ। যতঃ সুরমাত্রস্যৈব নির্জ্জরত্বং প্রসিদ্ধম্। অকাল-কলিতে ভগবতি জরানুদয়েন কেশ-শৌক্ল্যানুপপত্তিঃ ॥ শ্রীভা. ২।৭।২৬-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা ॥" সুতরাং কালপ্রভাবে ক্ষীরোদশায়ীর কতকগুলি চুল পাকিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—এই অনুমানও বিচারসহ নহে। এইরূপে দেখা দেখ, শ্লোকস্থিত "কেশ"-শব্দের "চুল"-অর্থ বিচারসহ নয়। তাহা হইলে কোন্ অর্থে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণ বা মহাভারত বা শ্রীমদ্‌ভাগবত—সর্ব্বত্রই "কেশ"-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে ; বাল, কচ, কুন্তল, চিকুর প্রভৃতি যে সকল শব্দে "চুল" বুঝায়, এরূপ কোনও শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, একটী বিশেষ অর্থে এসকল স্থলে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানের অংশুকে ( তেজঃ, কিরণ, শক্তি প্রভৃতিকে ) যে বিশেষ অর্থে "কেশ" বলা হয়, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান্। সহস্রনাম-ভাষ্যে ধৃত মহাভারত-বচনে দৃষ্ট হয়, ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে বিদ্যমান্ অংশুসমূহের ( জ্যোতিঃ সমূহের ) নাম "কেশ" ; তাই সর্ব্বজ্ঞ মুনিসত্তমগণ আমাকে "কেশব" বলেন।

"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ।
সর্ববজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্ম্মুনিসত্তমাঃ॥"

কেশ+ব=কেশব; কেশ-শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ব-প্রত্যয়; অর্থ—কেশ আছে যাঁহার, তিনি কেশব। মোক্ষধর্ম্মে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের কিরণসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতারপ্রসঙ্গে সর্ববত্রই যখন "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কোথাও চুল-বাচক বাল, কচ, প্রভৃতির কোনও একটী শব্দও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ভগবান্ যখন নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিঃ বা কিরণকেই "কেশ" বলা হয়, স্বয়ং নারদও যখন স্বচক্ষে ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন, তখন উপরি উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে "জ্যোতিঃ"-অর্থেই যে "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। "তত্র চ সর্বত্র কেশেতর-শব্দাপ্রয়োগাৎ নানাবর্ণাংশূনাং শ্রীনারদদৃষ্টতয়া মোক্ষধর্ম্মপ্রসিদ্ধেশ্চ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥"

নৃসিংহপুরাণেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। "শ্রীনৃসিংহপুরাণে সিতাসিতে চ মচ্ছক্তী ইতি তচ্ছক্তিদ্বারৈব শ্রীকৃষ্ণেন তদ্ঘাতনাপেক্ষয়া॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ॥ ২৯"—নৃসিংহপুরাণে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়াছেন—"আমার শুক্ল ( সিত ) কৃষ্ণ ( অসিত ) শক্তি কংসাদিকে হত্যা করিবে।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনৃসিংহদেবের অসুর-ঘাতন-শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া কংসাদিকে হত্যা করিবে। "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৭॥ পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৯॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২॥" শ্রীনৃসিংহদেবের মধ্যে যে অসুর-সংহারিণী-শক্তি বিরাজিত, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণু হইতে বিকশিত হইয়া অসুর-সংহার করিয়া থাকে। ( অংশু, কিরণ, তেজঃ, শক্তি প্রভৃতি একই অর্থ-বাচক শব্দ )।

এইরূপে দেখা গেল, বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকে "তেজঃ বা শক্তি" অর্থেই "কেশ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—"কেশ"-শব্দের "তেজঃ বা জ্যোতিঃ"-অর্থ ধরিলে বিষ্ণুপুরাণাদির উক্তির তাৎপর্য্য কি হইবে ?

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তৎপূর্বে একটী কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরাণেই অক্রূর-স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে "পরম ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।

"ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥ ৫।১৮।৫৩॥"

এবং যে অক্ষর পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং পরব্রহ্মের বাচক, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ওঙ্কারও বলা হইয়াছে।

"বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপে বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ।
রূপং সদিতি বাচকমক্ষরং যৎ জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ৫।১৮।৫৭॥"

যিনি প্রণব এবং প্রণব যাঁহার বাচক, যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি কাহারও অংশ হইতে পারেন না ; অপর সকলেই তাঁহার অংশ বা বিভূতি। তিনি স্বয়ংভগবান্। বিষ্ণুপুরাণ স্পষ্ট কথাতেও তাহাই বলিয়াছেন।

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।১২ ॥"

যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম—সুতরাং স্বয়ংভগবান্, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের অন্তর্গত "বিশ্বং ভবান্ সৃজতি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ক্ষীরোদশায়ী হইলেন জগতের পালনকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ( ক্ষীরোদশায়ী ) ও শিবরূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ( ক্ষীরোদশায়ী ) এবং শিব যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ, অক্রূর-স্তবে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন।

"প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাখ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ॥ বি. পু. ৫।১৮।৫১ ॥"

এই সমস্ত প্রমাণ-বলে বিষ্ণুপুরাণ হইতেই জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পরম-ব্রহ্ম এবং ক্ষীরোদশায়ী তাঁহার প্রকাশ-বিশেষ বা অংশ।

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবতগীতা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, সমস্তের পরম ধাম বা আশ্রয়, সমস্তের আদি, অজ, শাশ্বত, বিভু।

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥
পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২ ॥ অর্জ্জুনোক্তিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অপর কেহ নাই, গীতা তাহাও বলিয়াছেন।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিংশ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥ ৭।৬॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ॥"

এইরূপে মহাভারত হইতেও জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ংভগবান্, সকলের ( সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীরও ) আদি এবং পরম আশ্রয়।

সর্ব্ব-বেদেতিহাসের সার প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ শ্রীভা. ১।৩।২৮॥ —শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ংভগবান্, অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ ( সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও ) তাঁহার অংশ-কলা মাত্র।" ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট কথাতেই তাহা বলিয়াছেন।

"নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ শ্রীভা. ১০।১৪।১৪ ॥"

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "ওঁ যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী। ৯৪ ॥—সেই গোপাল ( শ্রীকৃষ্ণ ) পরব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম ( শ্রীকৃষ্ণ )-সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ৬।৭॥"—এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে—ঈশ্বর-সমূহেরও পরম-মহেশ্বর, পতিসমূহের (জগতের পালনকর্ত্তাদিগেরও) পতি বলা হইয়াছে। সুতরাং জগতের পালনকর্ত্তা (পতি) ক্ষীরোদশায়ীরও যে তিনি পালনকর্ত্তা, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৫।১॥

—শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম-ঈশ্বর (শ্বেতাশ্বতরের ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্), অনাদি (যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই), আদি (যিনি সকলের আদি), সমস্ত কারণেরও মূল কারণ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।"

এইরূপে দেখা গেল—বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, সংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রই এক বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন। এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ীর কেশের (চুলের) অবতার বলিলে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণের সহিতও বিরোধ জন্মে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের স্ব-স্ব-উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মে।

বিষ্ণুপুরাণাদির শ্লোকের বিচারসহ তাৎপর্য্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকই বিবেচিত হইতেছে। "ভগবান্ আত্মনঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ উজ্জহার; সুরান্ উবাচ চ—এতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে অবতীর্য্য ভুবঃ ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ।"—ইহাই হইল শ্লোকের অন্বয়। এস্থলে "আত্মনঃ"-শব্দ হইতেছে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত, অর্থ—আত্ম (নিজ) হইতে, নিজের নিকট হইতে, "আত্মনঃ সকাশাৎ,—নিজের মস্তক হইতে।" "কেশৌ"-শব্দে জ্যোতির্দ্বয় বুঝায়। "উজ্জহার"-ক্রিয়াপদের অর্থ—উদ্ধৃত করিলেন, প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতির্দ্বয় প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন।

পূর্ব্ব আলোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির নামই কেশ; তাঁহার মধ্যেই নারদ নানাবর্ণের জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে—ক্ষীরোদশায়ী সেই জ্যোতিঃ পাইলেন কোথায়?

উত্তর—পূর্ব্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে—ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; অংশের মধ্যে অংশীর তেজঃ—শক্তি—বিদ্যমান্ থাকে, অবশ্য পূর্ণমাত্রায় নহে। সঙ্কর্ষণ-বলরামও হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, দ্বিতীয়-স্বরূপ। তেজের বর্ণ-সাদৃশ্যে কৃষ্ণবর্ণ তেজোদ্বারা শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্বেতবর্ণ তেজোদ্বারা শ্বেতবর্ণ বলরাম সূচিত হইতেছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বতকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলিদ্বারা যেমন তাহার এক অংশ দেখাইয়া বলা হয়—"এই সুমেরু", তদ্রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়া পরিপূর্ণ-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত করিয়া ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলেন—যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র তেজঃ দেখাইলাম, তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন। "মৎকেশৌ—আমার মধ্যে (ময়ি) অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঃ"। সমগ্র শ্লোকের

তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—'ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী নিজের নিকট হইতে তাঁহার অংশী শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন এবং সুরগণকে বলিলেন—আমার মধ্যে যে শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্বেত-কৃষ্ণ-তেজঃ কিঞ্চিৎ বিরাজিত, যাহা আমি তোমাদিগকে প্রকটিত করিয়া দেখাইলাম—তাঁহারা উভয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজনিত দুঃখ দূর করিবেন।"

এক্ষণে মহাভারতের শ্লোক বিবেচিত হইতেছে। "স চ অপি হরিঃ কেশৌ উদ্ববর্হে, একং শুক্লম্, অপরঞ্চ অপি কৃষ্ণম্।" এস্থলে "উদ্ববর্হে"-ক্রিয়াপদের অর্থ—"যোগবলে নিজের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন।" "উদ্ববর্হে যোগবলেন আত্মনঃ সকাশাৎ বিচ্ছিদ্য দর্শয়ামাস॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯।" আর শ্লোকস্থ "স চ অপি"-অংশের "চ"-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। মহাভারতের এই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে দেবগণ ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সমুচ্চয়ার্থক চ-শব্দে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে; তাৎপর্য্য এই ঃ—দেবগণ ভূ-ভার-হরণের প্রার্থনা জানাইলে ক্ষীরোদশায়ী-হরি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া উদাসীনের মত রহিলেন না; প্রার্থনার উত্তরে তিনি শ্বেত-কৃষ্ণ কেশ দেখাইলেন। আর "স চ অপি"-অংশের "অপি"-শব্দ প্রয়োগেরও একটা সার্থকতা আছে। অপি-শব্দের অর্থ "ও"; "স অপি"—তিনিও, ক্ষীরোদশায়ী হরিও (শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন)। ইহাতে বুঝা যায়—অপর কেহও শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইয়াছিলেন, ক্ষীরোদশায়ীও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অপর কেহ কে? এই অপর কেহ হইতেছেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণ; তাঁহারা হইতেছেন তেজঃ-প্রদর্শনের হেতু-কর্ত্তা; তাঁহাদের প্রেরণাতেই ক্ষীরোদশায়ী শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ দেখাইলেন। প্রেরণার প্রয়োজন এই যে—ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণের অংশ; অংশ-রূপে তিনি তাঁহাদের তেজের অংশ ধারণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রেরণা বা ইচ্ছাব্যতীত ক্ষীরোদশায়ী তাঁহাদের তেজঃ নিজের মধ্যে থাকিলেও দেখাইতে পারেন না। "অপিশব্দ-স্তদুদ্বর্হণে শ্রীভগবৎ-সঙ্কর্ষণয়োরপি হেতুকর্ত্তৃত্বং সূচয়তি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ২৯॥" তাহা হইলে, উপরে মহাভারতের যে বাক্যাংশের অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—ভূ-ভার-হরণার্থ দেবগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই ক্ষীরোদশায়ী হরি তাঁহার অংশী শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রেরণা পাইয়া নিজ সন্নিধান হইতে দুইটী তেজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন; তাহাদের একটী শুক্ল এবং অপরটী কৃষ্ণ।

মহাভারত-শ্লোকের অপরাংশ এই—"তৌ চাপি কেশৌ আবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ।" এই অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"তৌ চাপীতি চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন ভগবৎ-সঙ্কর্ষণৌ স্বয়মাবিবিশতুঃ পশ্চাত্তৌ চ তত্তাদাত্ম্যেন আবিবিশতুরিতি বোধয়তি। অপিশব্দো যত্র অনুস্যূতৌ অমূ সোঽপি তদংশা অপীতি গময়তি।" ইহার তাৎপর্য্য এই—"তৌ চাপি"-বাক্যাংশের "চ"-শব্দ অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, শ্রীরোহিণী-দেবকীতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; পরে ক্ষীরোদশায়ীতে প্রকাশিত শুক্ল-কৃষ্ণ জ্যোতিঃ সেই রাম-কৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবিষ্ট হইয়াছে। "অপি"-শব্দ ইহাই বুঝাইতেছে যে,—যে-ক্ষীরোদশায়ী হরিতে শ্বেত-কৃষ্ণ তেজঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই হরি এবং তাঁহার অংশ সকলও শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

"তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব"—ইত্যাদি শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বলেন—"তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব ইত্যাদিকং তু নরো নারায়ণো ভবেৎ হরিরেব ভবেন্নর ইত্যাদিবৎ তদৈক্যাবাপ্ত্যপেক্ষয়া—নর নারায়ণ হয়েন, হরিই নর হয়েন ; এস্থলে যেমন নর-নারায়ণের তাদাত্ম্য স্বীকার দ্বারাই অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্বেতজ্যোতিঃ শ্রীবলরামে এবং কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।"

অসুর-সংহারের দ্বারাই ভূ-ভার হরণ করা হয় ; অসুর-সংহার কিন্তু স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে ; ইহা হইতেছে জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ( ক্ষীরোদশায়ীর ) কার্য্য। পূর্ব্বেই ১।১।১৭২-অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহও ( সুতরাং ক্ষীরোদশায়ীও ) তাঁহার মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হয়েন। মহাভারতোক্ত শ্লোকের উল্লিখিত রূপ অর্থ এই সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। হরিবংশের উক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে। হরিবংশে কথিত আছে—"পুরুষ-নারায়ণ ( ক্ষীরোদশায়ী ) কোনও পর্ব্বত গুহায় স্বীয় মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে সে স্থানে রাখিয়া স্বয়ং শ্রীদেবকীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে ক্ষীরোদশায়ীর তেজঃ আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; একথা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরিবংশ ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত রূপই বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের উক্তির তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যে বিষ্ণুপুরাণাদির অন্যস্থলে কথিত স্ব-স্ব-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং অন্যান্য গ্রন্থোক্তির সহিতও সঙ্গতি থাকে।

এই আলোচনার প্রথমাংশে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ" ( ২।৭।২৬ ) ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকে আছে—পৃথিবীর দুঃখ দূর করার নিমিত্ত "কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" অবতীর্ণ হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি ? টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোহসৌ জাতঃ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ন বয়ঃপরিণামকৃতং অবিকারিত্বাৎ—নিজের অংশ শ্রীবলরামের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। কে অবতীর্ণ হইলেন ? সিত-কৃষ্ণ কেশ যে ভগবানের, সাক্ষাৎ তিনিই অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে সিত-কৃষ্ণ-কেশত্ব তাঁহার শোভাই সূচিত করিতেছে, বয়সের পরিণাম—বৃদ্ধত্ব—সূচিত করিতেছে না ; যেহেতু তিনি অবিকারী।"

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতং মৎকেশাবেবতৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্ব্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা অত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতিবিরোধাচ্চ—বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যে কেশ-প্রদর্শনের কথা দৃষ্ট হয়, ক্ষীরোদশায়ীর কেশই যে অবতীর্ণ হইবেন—একথা প্রকাশের অভিপ্রায়ে তাহা করা হয় নাই ; কিন্তু—পৃথিবীর ভার-হরণ কি এমন কার্য্য ? আমার কেশদ্বয়ই তাহা করিতে সমর্থ—এই তাৎপর্য্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এবং শ্রীরাম-কৃষ্ণের বর্ণ-সূচনার্থই সিত-কৃষ্ণ-কেশ দেখান হইয়াছে। অন্যরূপ অর্থ করিতে গেলে, বিষ্ণুপুরাণ-মহাভারতের পূর্ব্বাপর উক্তির সহিতই বিরোধ জন্মিবে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্—এই শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তির সহিতও বিরোধ জন্মিবে।"

পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, শ্রীধরস্বামীর এই উক্তি তাহারই সমর্থন করিতেছে।

যাহা হউক, শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে "কলয়া সিতকৃষ্ণ-কেশঃ" অংশের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন—"কোঽসৌ কলয়া অংশেন সিতকৃষ্ণকেশো যঃ। সিতকৃষ্ণকেশৌ দেবৈর্দৃষ্টৌ ইতি শাস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধেঃ। সোঽপি যস্য অংশেন স এব ভগবান্ স্বয়মিত্যর্থঃ। তদবিনাভাবিত্বাৎ।—যিনি অবতীর্ণ হইলেন, তিনি কে ? যিনি অংশে ( অংশস্বরূপ ক্ষীরোদশায়িরূপে ) সিতকৃষ্ণকেশ, তিনি। শাস্ত্রান্তরে ( বিষ্ণুপুরাণাদিতে ) প্রসিদ্ধি আছে যে—দেবতাগণ ( ক্ষীরোদশায়ীতে ) সিতকৃষ্ণ কেশদ্বয় ( জ্যোতিঃ ) দেখিয়াছিলেন। যিনি সিতকৃষ্ণ কেশ ( জ্যোতিঃ ) দেখাইয়াছিলেন, তিনি যাঁহার অংশ, সেই স্বয়ংভগবান্‌ই অবতীর্ণ হইয়াছেন।" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তিও পূর্ব্ব আলোচনার সমর্থক।

বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নয়, তাহা যে প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী, উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা গেল।

## চ। যুগাবতারত্ব

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কোনও কোনও শ্লোক দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতারমাত্র, স্বয়ংভগবান্ নহেন। তাঁহাদের কথিত দুইটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া এ-স্থলে দেখান হইতেছে যে, তাঁহাদের অনুমান বিচারসহ নহে।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-সময়ে গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮।১৩॥"

এই শ্লোক দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন—যিনি শুক্ল-রক্তাদি বর্ণে যুগাবতাররূপে বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনিই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণে যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে গর্গাচার্য্য যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়াছেন, শ্লোকের অর্থালোচনা করিয়া তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ( ১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যুগাবতারত্ব স্থাপিত হয় নাই; পরন্তু যুগাবতার-সমূহের অবতারিত্বই স্থাপিত হইয়াছে; যেহেতু, শ্লোকে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণে যুগাবতাররূপে নিজেকে প্রকটিত করেন। তিনি যুগাবতারের প্রকটন-কর্ত্তা, অবতারী, অংশী।

এই গেল বিরুদ্ধবাদীদের উল্লিখিত একটী শ্লোক। এক্ষণে দ্বিতীয় শ্লোকটী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—কবি-হবি-আদি নয়জন যোগীন্দ্র এক সময়ে নিমি-মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে নিমি-মহারাজ তাঁহাদের মুখে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শুনিবার পরে—কোন্ যুগের উপাস্য কে,

তাঁহার উপাসনার বিধিই বা কি,—তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। নবযোগীন্দ্রের একতম করভাজন-ঋষি সত্য ও ত্রেতাযুগের উপাস্য-স্বরূপের—অর্থাৎ সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লের এবং ত্রেতাযুগের যুগাবতার রক্তের—কথা বলিয়া এবং তাঁহাদের উপাসনার বিধির কথাও বলিয়া দ্বাপরের উপাস্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ।
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্। শ্রীভা. ১১।৫।২৭-৩১॥

—দ্বাপরের উপাস্য হইতেছেন শ্যামবর্ণ, পীতবাস, চক্রাদি আয়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি চিহ্নে এবং করচরণাদিতে পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত, কৌস্তুভাদি ভূষিত। হে নৃপ! তত্ত্বজিজ্ঞাসু লোকগণ বেদ-তন্ত্রাদির বিধানে ছত্র-চামরাদিযুক্ত মহারাজোপলক্ষিত সেই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। 'বাসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নকে নমস্কার, অনিরুদ্ধকে নমস্কার, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, নারায়ণকে নমস্কার, ঋষিকে নমস্কার, পুরুষকে নমস্কার, মহাত্মাকে নমস্কার, বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার, বিশ্ব-স্বরূপকে নমস্কার, সর্ব্বভূতাত্মাকে নমস্কার।'—এইরূপ বলিয়া, হে পৃথ্বিনাথ! দ্বাপরযুগে লোকগণ জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সত্যযুগের উপাস্যরূপে যেমন সত্যযুগের যুগাবতারের কথা এবং ত্রেতার উপাস্যরূপে যেমন ত্রেতাযুগের যুগাবতারের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এ-স্থলেও দ্বাপরের উপাস্যরূপে দ্বাপরের যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। দ্বাপরের উপাস্যের উপাসনাতে যখন বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদির উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার স্তবের কথা বলা হইয়াছে এবং বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি যখন শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ এবং দ্বাপরের উপাস্যের বর্ণ যখন শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণের বর্ণও যখন শ্যামবর্ণ, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দ্বাপরের উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে এবং সত্য-ত্রেতার উপাস্যস্বরূপের ন্যায় তিনিও যুগাবতার মাত্র।

কিন্তু এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের যুগাবতার নহেন। কেননা, দ্বাপরের যুগাবতার শ্যামবর্ণ নহেন, তাঁহার বর্ণ শুকপত্রাভ—শুকপাখীর পাখার বর্ণের মতন। "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ শ্রীভা. ১১।৫।২৭-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ।"

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রতিযুগে সাধারণতঃ লোকে সেই যুগের যুগাবতারেরই উপসনা করিয়া থাকে। করভাজন-ঋষিকর্ত্তৃক সত্যত্রেতার উপাস্যরূপে সত্যত্রেতার যুগাবতারের উল্লেখেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই অবস্থায়, দ্বাপরের উপাস্যরূপে শুকপত্রাভ-দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ না করিয়া ঋষি করভাজন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের উপাসনার কথা বলিলেন কেন? দ্বাপরে যদি শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য হয়েন, শুকপত্রাভ-যুগাবতার যদি উপাস্য না-ই হয়েন, তাহা হইলে শাস্ত্রে দ্বাপরে শুকপত্রাভ যুগাবতারের উল্লেখের সার্থকতাই বা কি?

উত্তর এই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে যুগে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারের অবতরণ-সময়েই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্বয়ংভগবানের অবতরণ-সময়ে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহমধ্যে অবস্থিত থাকেন ; সেই যুগের যুগাবতারও তখন স্বয়ংভগবানের বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অবতীর্ণ হয়েন, পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না। স্বয়ংভগবান্‌ই স্বীয় লীলার আনুষঙ্গিকভাবে যুগাবতারের কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই যুগে যুগাবতার পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না বলিয়া যুগাবতারের পরিবর্ত্তে স্বয়ংভগবানের উপাসনাই সেই যুগের লোকের কর্ত্তব্য।

গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বাপরের শুকপত্রাভ যুগাবতার তখন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-মধ্যেই অবস্থিত ছিলেন, পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন নাই। এজন্য করভাজন-ঋষি শ্রীকৃষ্ণকেই দ্বাপরের উপাস্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যেই দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরে শুকপত্রাভ যুগাবতারই উপাস্য। এজন্য শাস্ত্রে শুকপত্রাভ দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়েন না। "ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৪॥" বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে এক হাজার সত্যযুগ, এক হাজার ত্রেতা যুগ, একহাজার দ্বাপরযুগ এবং একহাজার কলিযুগ থাকে।

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে॥ বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১৪॥"

ব্রহ্মার দিবসের অন্তর্গত এক হাজার দ্বাপর যুগের মধ্যে মাত্র একটী দ্বাপরেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, অবশিষ্ট নয়শত নিরনব্বই দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। এই নয়শত নিরনব্বই দ্বাপরে শুকপ্রত্রাভ যুগাবতারই অবতীর্ণ এবং উপাসিত হইয়া থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রে শুকপত্রাভ দ্বাপর-যুগাবতারের উল্লেখ অসার্থক নহে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—করভাজন-ঋষি তো সাধারণ ভাবেই দ্বাপরের উপাস্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি যে কেবল গত দ্বাপরের—যেই গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দ্বাপরের—উপাস্যের কথাই বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি ?

তাহার প্রমাণ এই। "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—চারিবেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ হইতেছে অপৌরুষেয়, পরব্রহ্মের নিশ্বাস। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, এই অপৌরুষেয় পুরাণ ছিল মাত্র একখানি ; তাহা ছিল শতকোটি-শ্লোকে পরিপূর্ণ।

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপুরাণ ॥৫৩।৪॥"

প্রতি দ্বাপরে ভগবান্‌ই ব্যাসরূপে চারিলক্ষ-শ্লোক-সমন্বিত অষ্টাদশ পুরাণ ভূর্লোকে প্রকাশিত করেন। দেবলোকেতে অদ্যাপিও শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ বিদ্যমান।

"কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা। তথাষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে॥
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি-প্রবিস্তরম্॥ মৎস্যপু ॥৫৩৮-১০॥"

প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রকটিত হয়, তাহা হইতেছে—যে চতুর্যুগের অন্তর্গত সেই দ্বাপর, সেই চতুর্যুগের উপযোগী। বর্ত্তমানে যে-সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত হইতেছে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগের উপযোগী। ঋষি করভাজন যে চারিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সম্বন্ধেই। সুতরাং তিনি যে দ্বাপরের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপর—অর্থাৎ গত দ্বাপর। গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই সেই দ্বাপরের উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

এজন্যই "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বাপর-যুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্য চ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্তৎ-সর্ব্বময়মাহ দ্বাপর ইতি। সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ শ্যামত্বং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দর্শিতম্। দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতিদৃশেন।" দীপিকা-দীপন-টীকাকারও ঐরূপ লিখিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—কৃষ্ণাবতারবিরহিত-দ্বাপরে তু শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ তু শ্যামত্বং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দর্শিতং দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিত ইতি।"

ইহা হইতে জানা গেল—যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-কথিত শুকপত্রাভ যুগাবতারই উপাস্য; কিন্তু যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই দ্বাপরের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই।

উল্লিখিত "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ"—ইত্যাদি শ্লোকটী বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান্ চতুর্যুগেরই উপযোগী। সুতরাং এ-স্থলে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগের অন্তর্গত দ্বাপরের উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে; যেহেতু, এই দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, সেই দ্বাপরের উপাসনার কথা এ-স্থলে বলা হয় নাই।

গত দ্বাপরের উপাস্যরূপে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, করভাজন-ঋষির উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীজীবের এবং দীপিকাদীপন-কারের যে টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে করভাজন-কথিত দ্বাপরের উপাস্যকে "সর্ব্বময়" বলা হইয়াছে। যিনি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপেও আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তত্ত্বতঃ যিনি সর্ব্ব—সকল, তাঁহাকেই "সর্ব্বময়" বলা যায়। এইরূপ সর্ব্বময়ত্ব একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই থাকিতে পারে। করভাজন-কথিত দ্বাপরের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ যে এইরূপ সর্ব্বময়, তাঁহার উপাসনার অঙ্গীভূত যে স্তবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই তাহা জানা যায়।

স্তবে "বাসুদেবায় নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ"-বাক্যে উপসংহার করা হইয়াছে। "বাসুদেব" হইতে "সর্ব্বভূত"-পর্য্যন্ত যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তময়ই শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই করভাজনের

অভিপ্রেত। বাসুদেবও তিনি, সঙ্কর্ষণও তিনি, প্রদ্যুম্নও তিনি, অনিরুদ্ধও তিনি। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ চতুর্ব্যূহ। আবার নারায়ণও তিনি। এই নারায়ণ-শব্দ-সম্বন্ধে টীকাকারগণ লিখিয়াছেন—"নানাবতারময়ত্বেনাপ্যাহ নারায়ণায়েতি ( শ্রীজীব )। নানাবতারাবতারিত্বমপি তত্র লিঙ্গমিত্যাহ নারায়ণায়েতি ( দীপিকাদীপন )।—তিনি নানাবতারময় বলিয়া, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, নারায়ণ বলা হইয়াছে ( শ্রীজীব )। নানাবতারের অবতারী বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে ( দীপিকাদীপন )।" টীকাকারগন আরও লিখিয়াছেন—"তত্র নারায়ণায় ঋষয় ইতি দিগ্‌দর্শনং কৃত্বা তত্তদনন্তাবতারাকর-পুরুষাবতারময়ত্বেনাহ পুরুষায় মহাত্মন ইতি। অতএব বিশ্বেষামীশ্বরায়। বিশ্বায় তত্তদ্রূপায় চেত্যর্থঃ। কিং বহুনা সর্ব্বভূতরূপায় সর্ব্বাত্মরূপায় চেতি।—এস্থলে 'নারায়ণ, ঋষি' ইত্যাদিরূপে দিগ্‌দর্শন করিয়া তত্তৎ-অবতারের আকরতুল্য পুরুষাবতারময়ত্বের কথা বলিয়াছেন—'পুরুষায়, মহাত্মনে'-ইত্যাদি বাক্যে। অতএব তিনি বিশ্বসমূহের ঈশ্বর এবং বিশ্বস্বরূপও। অধিক আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি সর্ব্বভূতরূপ এবং সর্ব্বাত্মরূপ।"

এই সমস্ত লক্ষণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের থাকিতে পারে না। সুতরাং করভাজন-ঋষি গত দ্বাপরের উপাস্যরূপে যাঁহার কথা বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার নহেন। দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গত দ্বাপরযুগের অবতার বলা যায়; কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্, যুগাবতার নহেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীমদ্‌ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দেখিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতার, স্বয়ংভগবান্ নহেন, তাঁহাদের অনুমান বিচারসহ নহে।

## ছ। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অবতারত্ব।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের অবতার। এই উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত হয় না; কয়েকটী যুক্তিমাত্র অবতারিত হয়। যুক্তিগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

### কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

প্রথমতঃ, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"-এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যে শ্রীনারায়ণকেই স্বয়ংভগবান্ বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে "কৃষ্ণ"—অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই বলা হইয়াছে।

এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহাই দেখান হইতেছে।

শাস্ত্রে বাক্যরচনার একটা নিয়ম দেখা যায় এই যে—প্রথমে অনুবাদের উল্লেখ করিতে হয়, তাহার পরে বিধেয়ের উল্লেখ করিতে হয়।

"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ —একাদশীতত্ত্বধৃত-ন্যায়।

—অনুবাদ না বলিয়া কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।"

"অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥ শ্রীচৈ. চ. ১।২।৬১॥"

যে বস্তু জ্ঞাত, তাহাকে বলে অনুবাদ; আর যে বস্তু অজ্ঞাত, তাহাকে বলে বিধেয়।

"বিধেয় কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত॥ শ্রীচৈ. চ ১।২।৬২॥"

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন—একজন লোক। তিনি যে বিপ্র, ইহা সকলেই জানে; সুতরাং তাঁহার বিপ্রত্ব জ্ঞাত বলিয়া "অনুবাদ"। কিন্তু তিনি যে পরম-পণ্ডিত, ইহা অনেকেই জানে না; সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া "বিধেয়"। এই বিপ্র যে পরম-পণ্ডিত, একথা জানাইতে হইলে বলা হয়—"এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।" বাক্যের প্রথমে বসিয়াছে—অনুবাদ "বিপ্র"-শব্দ; তাহার পরে বসিয়াছে—বিধেয়, "পণ্ডিত"-শব্দ। ইহাই বাক্য রচনার রীতি।

বাক্যের প্রথমে "অনুবাদ" না বসাইয়া যদি "বিধেয়" বসান হয় এবং পরে যদি "অনুবাদ" বসান হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে একটী দোষ হয়। এই দোষকে বলে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ"-দোষ। "অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেন অনির্দ্দিষ্টঃ বিধেয়াংশো যত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশস্য উপাদেয়ত্বেন প্রাধান্যম্। তস্য চ প্রাধান্যেন নির্দ্দেশ এব উচিত স্তদ্‌বিপর্য্যয়শ্চ॥ —সাহিত্যদর্পণ॥ ৭॥ —তৎপদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দ্দেশ না করিলে, অনুবাদের পূর্ব্বে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করিলে—অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।"

এক্ষণে প্রস্তাবিত বাক্যের বিচার করা যাইতেছে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্" —এই বাক্যে "কৃষ্ণ"-শব্দ প্রথমে এবং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ পরে বসিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়— "কৃষ্ণ"-শব্দ হইতেছে "অনুবাদ" এবং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ হইতেছে "বিধেয়।" "কৃষ্ণ"—জ্ঞাত; তাঁহার "স্বয়ং-ভগবত্তা"—অজ্ঞাত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পরে ঐ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা. ১।৩।২৮॥

—যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পুরুষের অংশ-কলা; কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্।"

পূর্ব্বে কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া "কৃষ্ণ" হইতেছেন—জ্ঞাত বস্তু, অনুবাদ; কিন্তু তিনি যে "স্বয়ংভগবান্", তাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই বলিয়া তাঁহার "স্বয়ংভগবত্তা" হইতেছে—অজ্ঞাত বস্তু, বিধেয়। এজন্য উল্লিখিত বাক্যে "কৃষ্ণ"-শব্দ পূর্ব্বে এবং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ পরে বসিয়াছে।

এইরূপে, বাক্যরচনার রীতি হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। এই বাক্যে "স্বয়ংভগবান্" হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক শব্দ।

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"স্বয়ংভগবান্ কিন্তু কৃষ্ণ।" এইরূপ অর্থ করিতে হইলে উক্ত বাক্যটীর রূপ হইবে এই—"স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ।" বাক্যটীর রূপ এই প্রকার হইলে মনে করিতে হইবে "স্বয়ংভগবান্"-শব্দ হইতেছে "অনুবাদ—জ্ঞাত বস্তু", আর "কৃষ্ণ" হইতেছে "বিধেয়—অজ্ঞাত বস্তু।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বে "স্বয়ংভগবান্"-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই; সুতরাং "স্বয়ংভগবান্"-শব্দকে "অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু" বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে "কৃষ্ণ"-শব্দেরই উল্লেখ আছে বলিয়া "কৃষ্ণ"ই জ্ঞাতবস্তু—অনুবাদ; তাহাকে "বিধেয়—অজ্ঞাতবস্তু" বলা যায় না। সুতরাং "স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ"—এইরূপ অন্বয় করিতে হইলে "অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ" হইয়া পড়ে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন—"স্বয়ংভগবান্ তু কৃষ্ণঃ"—এরূপ বাক্যস্থলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বলা হইয়াছে। ইহা মনে করিতে গেলে—দুইটী কথা আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ, যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন, তিনি বাক্যরচনার রীতি জানেন না; তাই অনুবাদের স্থলে বিধেয়কে এবং বিধেয়ের স্থলে অনুবাদকে বসাইয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে করিতে গেলে মনে করিতে হয়, বক্তার ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ আছে। কিন্তু "ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ শ্রীচৈ. চ. ১।২।৭২॥" দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধবাদীদের কল্পিত অন্বয় অনুসারে "স্বয়ংভগবান্‌কে" "অনুবাদ—জ্ঞাত বস্তু" বলিয়া মনে করিতে হয় এবং "কৃষ্ণকে" "বিধেয়—অজ্ঞাতবস্তু" বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু তাহা যে নয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আরও একটী কথা। শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—পরব্রহ্ম—সুতরাং স্বয়ংভগবান্। বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াও আদরণীয় হইতে পারে না।

"কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্" এবং "স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ"—এই দুইটী বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। "কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্"—এই বাক্যে "স্বয়ংভগবান্" হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক। কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ই, অপর কেহ নহেন। ইহা শ্রুতিসম্মত।

আর, "স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ"-এই বাক্যে "স্বয়ংভগবান্" কৃষ্ণের স্বরূপের পরিচায়ক নহে। স্বয়ংভগবান্‌ই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন অবতারী এবং কৃষ্ণ তাঁহার অবতার বা অংশ—ইহাই বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির তাৎপর্য্য। কিন্তু ইহা যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধবাদীদের আর একটী যুক্তি হইতেছে এই। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ব্রহ্মা পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের—তাঁহার ধাম-পরিকরাদির—দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ এবং ধাম-পরিকরাদি যে নিত্য, সত্য, চিন্ময়, তাহাও ব্রহ্মা অনুভব করিয়াছেন। সেই নারায়ণ—চতুর্ভুজ। তিনিই দ্বিভুজ-কৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নারায়ণের অবতার।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে যে স্থলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীনারায়ণের এবং তাঁহার ধাম-পরিকরাদির দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে-স্থলে এমন কোনও কথা নাই, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, শ্রীনারায়ণই

শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বা হইবেন। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের এইরূপ উক্তির মূল্য কিছু থাকিতে পারে না।

বিশেষতঃ, যদি মনে করা যায়—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে—কেবল প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ, অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ নাই, তাঁহার কোনও পৃথক্ ধামও নাই। কিন্তু ইহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ। অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার গোলোক-বৃন্দাবনাদি ধামের কথা শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় ( ১।১।৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )।

এইরূপে দেখা গেল—বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির কোনওটীই বিচারসহ নহে।

## সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা নারায়ণকেই দেখিয়াছেন, কৃষ্ণকে দেখেন নাই

বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে এই দুইটী যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন—প্রথমতঃ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন শ্রীনারায়ণেরই দর্শন লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের যখন দর্শন পায়েন নাই, তখন বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের তখন পৃথক্ সত্ত্বা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দ্বাপরের শেষ-ভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার যখন পৃথক্ সত্ত্বা ছিল না, কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণই ছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে—শ্রীনারায়ণই দ্বাপরের শেষ-ভাগে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এইরূপ যুক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে কেবল নারায়ণকেই দর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের অভাব সূচিত হয় না। পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই শ্রীবিগ্রহে অবস্থিত। সাধক কেবল স্বীয় ধ্যেয়রূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন, অন্যরূপের দর্শন পায়েন না ( ১।১।৮১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া কেবল শ্রীনারায়ণেরই দর্শন পাইয়াছেন। ইহাতে অন্যভগবৎ-স্বরূপের অনস্তিত্ব সূচিত হয় না। কোনও ধনুর্দ্ধারী যদি কোনও পক্ষীর একটী মাত্র চক্ষুকে বাণবিদ্ধ করিতে আদিষ্ট হয়েন, এবং সেই আদেশ অনুসারে তিনি যদি তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেই পক্ষীটীর সেই চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ চক্ষুটী ব্যতীত পক্ষীটীর অন্য কোনও অঙ্গই দেখিতে পাইবেন না। তাহাতে ইহা সূচিত হইবেনা যে, ঐ চক্ষুটী ব্যতীত অপর কিছুই—পক্ষীটীও—সে স্থানে নাই।

দ্বিতীয় যুক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য। দ্বাপরের শেষভাগেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও সত্য। সত্য ও ত্রেতার পরে দ্বাপর। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্যষ্টিসৃষ্টির পরেই চতুর্যুগ-প্রবাহ। সুতরাং ব্যষ্টিসৃষ্টির অনেক পরেই দ্বাপরের আরম্ভ। দ্বাপরের শেষভাগের পূর্ব্বে যে শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না, এইরূপ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বেই গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥—গোপালপূর্ব্বতাপনীশ্রুতি ॥১৫॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অবতাররূপ অংশ— এইরূপ অনুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও উক্তির যথাশ্রুত অর্থ বিরুদ্ধবাদীদের মতের সমর্থক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে—যথাশ্রুত অর্থ প্রকৃত অর্থ নহে। এ-স্থলে এইরূপ একটী বাক্য আলোচিত হইতেছে।

## নন্দ-মহারাজের উক্তি

সপ্তমবর্ষ-বয়সে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন-ধারণের পরে ব্রজের গোপবৃদ্ধগণ বালক-শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ-শক্তিসম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন। পূতনা-শকটাসুর-তৃণাবর্ত্তাদি অসুরের সংহার, কালীয়দমনাদি, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনাদি এবং গোবর্দ্ধন-ধারণাদিতে বালক-কৃষ্ণের যে অসাধারণ শক্তি তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা নন্দ-মহারাজের নিকটে তাঁহাদের শঙ্কা ও বিস্ময়ের কথা জ্ঞাপন করিলে, নন্দমহারাজ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥ শ্রীভা. ১০।২৬।১৫ ॥

—হে গোপগণ! আমার কথা শুন। তোমাদের এই বালক সম্বন্ধে তোমাদের শঙ্কার কোনও কারণ নাই। এই কুমারটী সম্বন্ধে গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শুন।"

ইহার পরে নন্দমহারাজ—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন,—গোপগণের নিকটে তৎসমস্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—"এই শিশুটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু গ্রহণ করেন। ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বসুদেবের গৃহে একবার জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার একটী নাম বাসুদেব। গুণ-কর্ম্মানুসারে ইঁহার বহু নাম ও রূপ আছে; সে সমস্ত নামরূপের কথা আমিও (গর্গাচার্য্যও) জানি না, অপর কেহও জানেন না। এই শিশু গোপকুলের ও গোকুলের আনন্দজনক হইবেন এবং সকলের মঙ্গল বিধান করিবেন। পূর্ব্বে এই শিশু অসুর-পীড়িত সাধুলোকদের রক্ষা করিয়াছিলেন; এজন্য সাধুগণ ইঁহার প্রতি প্রীতি পোষণ করেন। হে নন্দ! গুণে, শ্রীতে, কীর্ত্তিতে এবং অনুভাবে তোমার এই কুমারটী নারায়ণ-সম।" এই সকল গর্গোক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনন্দ গোপবৃদ্ধগণকে বলিলেন—"এই সমস্ত কারণে এই বালকের কার্য্যে বিস্ময় অনুভব করার কিছু নাই।"

ইহার পরে শ্রীনন্দমহারাজ বলিলেন—

"মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ শ্রীভা. ১০।২৬।২৩ ॥

—( যথাশ্রুত অর্থ ) আমার মনে হয়, এই কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ ; যেহেতু, এই বালক অক্লিষ্টকারী।”

এ-স্থলে শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়াছেন বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন—স্বয়ং নন্দমহারাজই যখন শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়াছেন, তখন তিনি নারায়ণের অংশই, স্বয়ংভগবান্ নহেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে—শ্রীনন্দ এইরূপ কথা বলিলেন কেন ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। সান্দ্রতম-প্রেমের প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ববুদ্ধি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, নর বলিয়াই মনে করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করেন না ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের “ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭২॥” এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়াই নন্দমহারাজের উক্তির ও ধারণার বিচার করিতে হইবে।

গর্গাচার্য্য তাঁহার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ( ১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু শুদ্ধবাৎসল্য-বিগ্রহ নন্দমহারাজের চিত্তে তাঁহার আত্মজের ভগবত্তার জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পুত্রমাত্র মনে করিয়া তিনি মনে করিয়াছেন—“উপাসনার প্রভাবে লোক ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করিতে পারে। গর্গাচার্য্য যখন বলিতেছেন—আমার এই পুত্রটী যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন, তাঁহার শুক্ল-রক্তাদি তিনটী বর্ণাত্মক রূপ হইয়া গিয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, আমার এই পুত্রটী সত্যযুগে সত্যযুগের উপাস্য শুক্লের উপাসনা করিয়া শুক্লবর্ণ হইয়াছিলেন ; আবার ত্রেতাতেও ত্রেতার উপাস্য রক্তের উপাসনা করিয়া রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শিশুটী পরম ভক্ত। আমার প্রতি কৃপা করিয়াই ভগবান্ তাঁহার এই ভক্তটীকে আমার সন্তানরূপে পাঠাইয়াছেন।”

গর্গাচার্য্য যে “গুণৈঃ নারায়ণসমঃ” বলিয়াছেন, এই বাক্যের “নারায়ণসমঃ”-শব্দটীর দুই রকম অর্থ হইতে পারে। ষষ্ঠীতৎপুরুষে, “নারায়ণের সম—নারায়ণসমঃ।” এই অর্থে—নারায়ণসম-অর্থ—“নারায়ণের তুল্য।” নারায়ণ—উপমান ; কৃষ্ণ—উপমেয়। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে উপমানেরই উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্যে কাহাকেও চন্দ্রের সমান বলিলে বুঝা যায়—চন্দ্রের সৌন্দর্য্যেরই উৎকর্ষ, উপমেয়-লোকটীর সৌন্দর্য্য চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ন্যূন। ষষ্ঠীতৎপুরুষে “নারায়ণসমঃ”-শব্দেও গুণে নারায়ণেরই উৎকর্ষ বুঝায়। এই অর্থই নন্দমহারাজ গ্রহণ করিয়াছেন। উপাস্যের কোনও কোনও গুণ অংশ-পরিমাণে উপাসকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তাই নন্দমহারাজ মনে করিলেন—নারায়ণের পরমভক্ত এই শিশুটীর মধ্যে নারায়ণের কোনও কোনও গুণ সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—“গুণৈঃ নারায়ণসমঃ।”

আর একটী অর্থ বহুব্রীহি-সমাসলব্ধ। “নারায়ণ সম যাঁহার, তিনি নারায়ণসম।” এই অর্থে কৃষ্ণ হইতেছেন উপমান এবং নারায়ণ উপমেয়। গুণে কৃষ্ণেরই উৎকর্ষ, নারায়ণের গুণ কৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন। গর্গ-কথিত কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার সঙ্গে এই অর্থেরই সঙ্গতি। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-প্রেমাশ্রয় নন্দমহারাজ স্বভাবতঃই এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার নিজ ভাবেই নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে "নারায়ণস্য অংশঃ—নারায়ণের অংশ" মনে করিয়াছেন, কৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণের গুণ—শক্তি—কিছু আছে মনে করিয়া। এজন্যই বৈষ্ণবতোষণীটীকায় লিখিত হইয়াছে—"অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি—নারায়ণের শক্তিতে আবিষ্টই মনে করি।"

বিশুদ্ধ-প্রেমের আবেশে নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, স্বীয় আত্মজ বলিয়াই মনে করেন। সুতরাং শ্রীনন্দ তাঁহার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের কথা যে বলেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এজন্য তিনি তাঁহার সন্তান কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ বলিয়াছেন বলিয়াই—"শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ"—তাত্ত্বিক ভাবে এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না।

## ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-প্রমাণ

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়।

"যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥
এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিব যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ইতি॥

—লঘুভাগবতামৃত ( ৬৫৭-৫৮ ) ধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন॥

—যিনি বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন, তিনিই বৈকুণ্ঠে ( পরব্যোমে ) চতুর্ভুজ ভগবান্ পুরুষোত্তম ( নারায়ণ ) রূপে, তিনিই শ্বেতদ্বীপের ঈশ্বর ( তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী ) রূপে, তিনিই ( বদরিকাশ্রমে ) নর-নারায়ণরূপে বিহার করেন। প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি হইতে যেমন শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, তদ্রূপ এই নন্দনন্দন হইতে ( নারায়ণ, শ্বেতাদ্বীপেশ এবং নর-নারায়ণ ব্যতীত ) অপর অনন্ত মনোহর অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

( এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ—ইঁহার অপর অনন্ত মনোহর অবতার আছেন—এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—চতুর্ভুজ নারায়ণ, শ্বেতদ্বীপেশ এবং নর-নারায়ণও তাঁহারই অবতার )।

এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের অবতার—অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহার অবতারী, অংশী।

যিনি সকল ভগবৎ-স্বরূপের অবতারী বা অংশী, তিনি হইবেন অসাম্যাতিশয় ( তাঁহার সমানও কেহ থাকিতে পারেন না এবং তাঁহার অধিকও কেহ থাকিতে পারেন না ) এবং অনন্যসিদ্ধ ( তাঁহার মূল বা অংশীও কেহ থাকিতে পারেন না, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ )। শ্রীকৃষ্ণই যে অসাম্যাতিশয় এবং অনন্যসিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

## শ্রীকৃষ্ণের অসাম্যাতিশয়ত্ব

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছেন—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ —শ্রীভা. ৩।২।২১॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য, যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং বা ঈশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ। বলিং করম্ অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ চিরকালীনৈঃ লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"ন বিদ্যতে সাম্যং কিমুতাতিশয়ো যস্য সঃ। যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমেব নাস্তি কিমুতাতিশয় ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—ত্রয়াণাং মহৎস্রষ্ট্রাদিপুরুষাণাং তিসৃণাং চিচ্ছক্তিজীবশক্তিমায়াশক্তীনাঞ্চ ঈশঃ। স্বৈরংশৈঃ ভক্তৈঃ শক্তিভিঃ লীলাভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ মাধুর্য্যৈশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং তদেব লক্ষ্মীস্তয়া হেতুনা আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং সঃ। চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডেষু সৃজদ্ভির্ব্রহ্মভিঃ পালয়দ্ভির্বিষ্ণুভিঃ সংহরদ্ভিঃ রুদ্রৈঃ ধারয়দ্ভিঃ শেষৈঃ।"

টীকানুসারে উল্লিখিত শ্লোকটীর মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তিনের—ত্রিলোকের, তিনপুরুষের (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের), চিচ্ছক্তি-জীবশক্তি-মায়াশক্তি—এই ত্রিবিধা শক্তির—অধীশ্বর। তিনি পরমানন্দ-সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বীয় ভক্তবর্গ, শক্তিবর্গ, লীলাসমূহ, ঐশ্বর্য্যসমূহ এবং মাধুর্য্যসমূহের সহিত বিরাজিত বলিয়া তৎসমস্তরূপ-সম্পত্তিদ্বারা তিনি আপ্তকাম। অতএব তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক যে কেহ নাই—তাহা বলাই বাহুল্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাগণ, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুগণ, সংহারকর্ত্তা রুদ্রগণ এবং ধারণকর্ত্তা শেষগণও পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক কিরীটযুক্ত মস্তকে তাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করেন (কিরীটসংঘট্টদ্বারা পাদপীঠে যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাকেই স্তব বলা হইয়াছে)।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—কোনও বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের সমানও কেহ নাই, অধিক থাকা তো দূরের কথা। অপর সকলেই—সুতরাং নারায়ণও—সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অংশ নহেন, বরং ন্যূনতাবশতঃ নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। আবার, শ্রীকৃষ্ণ "অসাম্যাতিশয়" বলিয়া তিনি যে পরব্রহ্ম—সুতরাং নারায়ণাদি সকলের আদিমূল—তাহাও জানা গেল; যেহেতু "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।৬।৮॥"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—একমাত্র পরব্রহ্মই অসাম্যাতিশয়, অসমোর্দ্ধ।

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনা করিয়া লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—

আধিক্যং পরব্যোমনাথাদপ্যস্য দর্শিতম্।
স্বয়ং-পদেন চাস্যান্যনৈরপেক্ষ্যমুদীরিতম্॥ কৃষ্ণামৃত।৫৮০-৮১॥

—এই (উল্লিখিতশ্রীমদ্‌ভাগবত)-শ্লোকে পরব্যোমাধিপতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্লোকস্থ "স্বয়ম্"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে "অন্যনিরপেক্ষ"-তাহাই সূচিত হইয়াছে।"

"অন্যনিরপেক্ষতা" দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্বাই খ্যাপিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীশুকদেব গোস্বামী দশরথ-তনয় **শ্রীরামচন্দ্রকেও "অসাম্যাতিশয়"** বলিয়াছেন।

"নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্তলীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥—শ্রীভা. ৯।১১।২০॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) হে রাজন্! দেবগণের প্রার্থনায় যিনি লীলাবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন, সেই রঘুপতি রামচন্দ্রের পক্ষে সমুদ্রবন্ধন এবং অস্ত্রসমূহদ্বারা রাক্ষসবধাদি যশ স্তুতির বিষয় নহে। শত্রুহননে কপিদিগের সহায়তারই বা তাঁহার পক্ষে কি প্রয়োজন? যেহেতু, তিনি 'অধিকসাম্যবিমুক্ত'-ধাম।"

এ-স্থলে বলা হইল—শ্রীরামচন্দ্র "অধিকসাম্যবিমুক্ত"—তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই, অর্থাৎ তিনি "অসাম্যাতিশয়।" সুতরাং কেবল শ্রীকৃষ্ণই যে "অসাম্যাতিশয়", তাহা কিরূপে বলা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে লঘুভাগবতামৃত বলিয়াছেন—

"রামোঽপ্যধিকসাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ।
তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণেনৈক্যেন তস্য তৎ।
নরলীলাদিসাধর্ম্ম্যাৎ প্রেষ্ঠং রূপং তদস্য যৎ॥১।৫৮২॥

—(শ্রীমদ্‌ভাগবতে) শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধে যে "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম" বলা হইয়াছে, সে-স্থলে কিন্তু "স্বয়ম্"-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ঐক্যবশতঃই ঐরূপ বলা হইয়াছে। (ঐক্য কোন্ বিষয়ে? তাহা বলিতেছেন) নরলীলাদি-সমানধর্ম্মবশতঃ শ্রীরামের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।"

শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ যে শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়, তাহার প্রমাণরূপে লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্যকুর্ম্মাদয়স্ত্বমী।
সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ॥ ইতি॥১।৫৮৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) মৎস্য-কুর্ম্মাদি অবতারগণের সকলেই আমার অনন্তরঙ্গ-স্বরূপ বটেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বোতোভাবে আমার অন্তরঙ্গ।"

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রেরও নরবপু, নর-অভিমান, নর-লীলা। এই সমস্ত বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সমতা বা ঐক্য আছে বলিয়াই শ্রীরামচন্দ্রকেও "অসাম্যাতিশয়" বলা হইয়াছে—তিনি অন্যনিরপেক্ষ অসাম্যাতিশয়, তাহা বলা হয় নাই; যেহেতু, তাঁহার সম্বন্ধে "স্বয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই।

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কিন্তু "স্বয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণের "অসাম্যাতিশয়ত্ব" অন্যনিরপেক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে "স্বয়ম্"-শব্দের প্রয়োগ না করাতে বুঝা যাইতেছে যে—শ্রীরামচন্দ্রের "অসাম্যাতিশয়ত্ব" অন্যনিরপেক্ষ নহে, তিনি "অন্যনিরপেক্ষ অসাম্যাতিশয় শ্রীকৃষ্ণের" অপেক্ষা রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই---শ্রীনারয়ণ-নৃসিংহাদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপই—নরলীল নহেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীরামচন্দ্র "অসাম্যাতিশয়।" নরলীলত্বে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রও অসাম্যাতিশয়; নরলীলত্বে এই উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু অন্যনিরপেক্ষত্বে ঐক্য নাই। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, অন্যনিরপেক্ষ নহেন বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নরলীল হইয়াও স্বয়ংভগবান্ নহেন।

শ্রীরামচন্দ্র যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ---সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ নহেন, স্বয়ংভগবান্ও নহেন—ব্রহ্মসংহিতা হইতেও তাহা জানা যায়।

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫।৫০ ॥"

—যে পরমপুরুষ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বারা (স্বীয় অংশে) রামাদিমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি (ব্রহ্মার উক্তি)।"

উল্লিখিত ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের অনুরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়।

"মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ শ্রীভা. ১০।২।৪০ ॥

—কংস-কারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিয়াছেন—হে ঈশ! হে যদূত্তম! মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং বিবুধ (বামন) প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হইয়া যদ্রূপ আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকেও পালন করিয়াছ, তদ্রূপ অধুনাও পৃথিবীর ভার হরণ কর (পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর)।"

এ-স্থলেও বলা হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার—অংশ।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে ফিরিয়া যাওয়া হইতেছে।

**অথবা,** শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধীয় শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের অন্তর্গত "অধিকসাম্য-বিমুক্তধাম্নঃ"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াও উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। "ধাম"—শব্দের অর্থ—জ্যোতিঃ বা শক্তি, প্রভাব। শ্রীরামচন্দ্রের শক্তির বা প্রভাবের সমান শক্তি বা প্রভাবও কাহারও নাই, অধিক তো নাই-ই। তাঁহার পক্ষে রাক্ষস-বধাধি আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? "জলধিবন্ধনং অস্ত্রপুগৈঃ রক্ষসাং বধঃ ইতি ইদং কবিভিরাশ্চার্য্যমিব বর্ণিতমপি যশস্তুতির্ন ভবতি। শ্রীধরস্বামী ॥—সমুদ্রবন্ধন এবং অস্ত্রসমূহদ্বারা রাক্ষস-বধাদি কার্য্য যদিও কবিগণ

আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তাহা তাঁহার যশঃস্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।” এইরূপ বলিবার হেতুও স্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। “তত্র হেতুঃ। অধিক-সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য কিং কপয়ঃ সহায়াঃ অতঃ সুগ্রীবাদ্যাশ্রয়ণং যথা লীলামাত্রং তথৈবেদমপি।—তাঁহার প্রভাব অধিক-সাম্যবিমুক্ত—তাঁহার সমান প্রভাবও কাহারও নাই, অধিক তো নাই-ই ; সুতরাং কপিদিগের সহায়তায় তাঁহার কি প্রয়োজন ? অতএব সুগ্রীবাদির আশ্রয়গ্রহণ যেমন তাঁহার লীলামাত্র, উল্লিখিতভাবে রাক্ষসবধাদিও তদ্রূপ লীলামাত্র।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“যুক্তঞ্চৈতদিত্যাহ সুরাণাং যাচ্ঞয়া আত্তা স্বীকৃতা লীলার্থা তনুর্যেন তস্য। —দেবতাদিগের প্রার্থনাতেই তিনি লীলার নিমিত্ত তাঁহার বিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন।” রাবণাদি রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও প্রভাবই তাঁহার প্রভাবের সমানও নয়, অধিক তো নহেই ; যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন ভগবৎ-স্বরূপ, দেবতাদের প্রার্থনাতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার প্রভাব অসাধারণ। রাক্ষসগণ ভগবৎ-স্বরূপ নহেন, তাঁহাদের প্রভাব তাঁহার প্রভাবের সমান হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাক্ষস-বধ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে তিনি কপিদের সহায়তাই বা নিলেন কেন ? “কিন্তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ—শত্রুবিনাশে তাঁহার পক্ষে কপিদিগের সহায়তারই বা কি প্রয়োজন ?” যুদ্ধাদিতে সমান-শক্তিবিশিষ্ট বা অধিকশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই সহায়তা নেওয়া হয়। কপিগণ ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন বলিয়া ভগবৎ-স্বরূপ রামচন্দ্রের সমান বা অধিক শক্তি তাঁহাদের থাকিতে পারে না। তথাপি যে তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার লীলামাত্র ; নরলীল বলিয়াই নর-ব্যবহারের অনুকরণে তিনি কপিদের সহায়তাও গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদ্রবন্ধনও করিয়াছেন, যুদ্ধও করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রূ-ভঙ্গীতেই রাক্ষস-বধ হইতে পারিত। এইরূপ অর্থে তাঁহার “অসাম্যাধিকত্ব”—কেবল রাক্ষসগণের এবং কপিদের শক্তির তুলনাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহার “নিরপেক্ষ অসাম্যাতিশয়ত্ব”—খ্যাপনের জন্য নহে। তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে “স্বয়ম্”-শব্দই ব্যবহৃত হইত। তাঁহার অসাম্যাতিশয়ত্ব—আপেক্ষিক ; রাক্ষস এবং কপিকুলের অপেক্ষায় ; তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার সমান নহেন, অধিক তো নহেনই।

এইরূপ অর্থে জানা গেল—কেবল নরলীলত্বেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাম্য ; অসাম্যাতিশয়ত্বে সাম্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের অসাম্যাতিশয়ত্ব সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ ; শ্রীরামচন্দ্রের অসাম্যাতিশয়ত্ব সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ নহে, কেবলমাত্র রাক্ষসবর্গের এবং কপিবর্গের সম্বন্ধেই তিনি অসাম্যাতিশয়-প্রভাবসম্পন্ন।

### জ। শ্রীকৃষ্ণরূপের অনন্যসিদ্ধত্ব

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মথুরা-নাগরীগণ বলিয়াছেন—

“গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ শ্রীভা. ১০।৪৪।১৪ ॥

—গোপীগণ কি এক অপূর্ব্ব তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এই রূপসুধা সর্ব্বদা পান করিতেছেন—যেই রূপ হইতেছে দুর্ল্লভ, নিত্যনবনবায়মান, লাবণ্যের সারভূত, অসমোর্দ্ধ ( যাহার

সমানও নাই, অধিকও নাই ), অনন্যসিদ্ধ ( স্বতঃসিদ্ধ, অপর হইতে প্রাপ্ত নহে ), এবং যাহা ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও শ্রীর ( সম্পত্তির ) একান্ত ধাম ( মূল আশ্রয় ) ।”

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণরূপকে “অনন্যসিদ্ধ—স্বয়ংসিদ্ধ” বলাতে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংরূপ—নারায়ণাদি কাহারও অংশ বা অবতার নহেন—তাহাই সূচিত হইতেছে। “ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও শ্রীর একান্ত ধাম” বলাতেও সূচিত হইতেছে যে—ঐশ্বর্য্যাদির মূল উৎসই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি হইতেই নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ঐশ্বর্য্য ; পরন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ হইতে লব্ধ নহে ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—মূল অবতারী, মূল অংশী।

উদ্ধবও বিদুরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥
—শ্রীভা. ৩৷২৷১২ ॥

---স্বীয় যোগমায়ার (অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তির) প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণ, নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক এবং নিখিল সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠারূপ এবং ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ মর্ত্ত্যলীলার ( নরলীলার ) উপযোগী, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন।”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে “সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং---সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা” বলাতে সূচিত হইতেছে যে, সৌভাগ্যাতিশয়ের মূল উৎসই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ; সুতরাং নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের সৌভাগ্যও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত। তাই শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণাদিরও অংশী।

### ঝ। শ্রীকৃষ্ণের মহদংশযুক্তত্ব

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে উদ্ধব বিদুরের নিকটে বলিয়াছেন—

“স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥ শ্রীভা. ৩৷২৷১৫ ॥

—অশান্ত মূঢ়ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক স্বীয় শান্তরূপ ভক্তসকল উপদ্রুত হইলে ভক্তানুগ্রাহক পরাবরেশ ভগবান্ অজ হইয়াও মহদংশযুক্ত হইয়া অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন ( আবির্ভূত হয়েন ) ।”

এই শ্লোকের “মহদংশযুক্তঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন---“মহদংশযুক্তঃ মহতঃ স্বস্যৈবাংশৈর্যুক্তঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদিশ্রুতেঃ। মহদ্বচ্চেতি ন্যায়প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ৯১ ॥—মহতের অর্থাৎ নিজের অংশসমূহের সহিত যুক্ত। মহৎ-শব্দে যে ভগবান্‌কে বুঝায়, তাহার প্রমাণ এই যে—শ্রুতিও বলেন—‘মহান্ বিভু আপনাকে।’ এই শ্রুতিবাক্যে বিভু ভগবান্‌কে ‘মহান্’ বলা হইয়াছে। বেদান্তের ‘মহদ্বচ্চ ॥ ১৷৪৷৭ ॥’—সূত্রেও পরমাত্মাকে—ভগবান্‌কে—মহান্ বলা হইয়াছে।” এই অর্থ হইতে জানা গেল---শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অংশসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

উক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে “পরাবরেশঃ” বলা হইয়াছে। “পরাবরেশঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“প্রকৃতেঃ পরে যে নারায়ণাদিস্বরূপাঃ অবরে ব্রহ্মাদয়শ্চ তেষামীশঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। মহদংশযুক্তঃ মহান্ মহৎ-স্রষ্টা পুরুষঃ মহান্তং বিভুমাত্মানমিতি শ্রুতেঃ। অংশাঃ মৎস্যকূর্ম্ম-নৃহরি-নর-নারায়ণ-বামনাদয়স্তৈর্যুক্তঃ সন্।—প্রকৃতির অতীত যে নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপসমূহ এবং অবর ব্রহ্মাদিও—তাঁহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনিই পরাবরেশ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহৎস্রষ্টা পুরুষ এবং মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-নরনারায়ণ-বামনাদি স্বীয় অংশের সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।” এইরূপে—পরাবরেশ-শব্দের অর্থ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই ঈশ্বর—সুতরাং অংশী। তাঁহার অংশভূত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়াই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বা অংশ হইতে পারেন না।

### ঞ। রসত্বে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ

শ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম রস-স্বরূপ। “রসো বৈ সঃ।” সুতরাং রসত্বের বিকাশে যে ভগবৎ-স্বরূপ উৎকর্ষময়, স্বরূপেও তিনিই উৎকর্ষময়।

রসত্বের বিকাশে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

“সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥১।২।৩২॥-ধৃত প্রমাণ ॥

—যদিও লক্ষ্মীপতি নারায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণে সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তথাপি ( সর্ব্বোৎকৃষ্ট-প্রেমময় )-রসবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। প্রেমময়-রসের স্বভাবই এইরূপ যে—ইহা আলম্বনকে ( আশ্রয়কে ) উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।”

রসত্বে বা মাধুর্য্যে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই যে পরমোৎকর্ষ, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য বলবতী লালসাই তাহার প্রমাণ। শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেছেন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরমা প্রেয়সী, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের লোভে, বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর ব্রত-নিয়ম ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।

“কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥—শ্রীভা. ১০।১৬।৩৬॥

—( কালীয়দমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়-নাগের ফণায় ফণায় নৃত্য করিতেছিলেন, তখন কালীয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন ) হে দেব ! যাহা পাইবার আশায় লক্ষ্মীদেবী নিখিল-কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া বহুকাল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, এই কালীয় যে কি পুণ্যবলে তোমার সেই পদরেণুর স্পর্শলাভের অধিকার পাইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।”

ইহা হইতেই বুঝা যায়—শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই রসত্বের অনেক অধিক উৎকর্ষময় বিকাশ—সুতরাং রসস্বরূপ-ব্রহ্মত্বেরও অধিক বিকাশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশ হইতে পারেন না ; পরন্তু শ্রীনারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

## ট। ভূমাপুরুষের অংশত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত-দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায় হইতে জানা যায়—দ্বারকাবাসী কোনও ব্রাহ্মণের সন্তান জন্মিয়াই মরিয়া যাইত। তিনি প্রত্যেক বারেই তাঁহার মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষিপ্ত করিয়া আর্ত্তির সহিত বলিতেন—রাজার দোষেই এইরূপ অঘটন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নয়টী পুত্রের মৃত্যু হইল। রাজদ্বারে মৃত নবম পুত্রটীকে নিক্ষেপ করার সময়েও সেই ব্রাহ্মণ উল্লিখিত-রূপে রাজার দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ ! আপনার গৃহে ধনুর্দ্ধর কেহ নাই, রাজন্যবন্ধুও কেহ নাই, যিনি আপনার সন্তানকে রক্ষা করিতে পারেন। আমি আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিব ; না পারিলে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কিছুদিন পরে তাঁহার ব্রাহ্মণীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তিনি অর্জ্জুনকে তাহা জানাইলেন। অর্জ্জুন শরজালে সূতিকাগৃহকে আচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীর একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই কিছুকাল রোদন করিয়া আকাশমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত রুষ্ট এবং দুঃখিত হইয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তখন দ্বিজপুত্রদিগকে আনিবার জন্য প্রথমে যমপুরীতে, তারপরে স্বর্গে, তারপরে যথাক্রমে আগ্নেয়ী, নৈঋ্ঁতী, সৌম্যা, বায়ব্যা ও বারুণীপুরী, রসাতল এবং অন্যান্য স্থানেও গেলেন ; কিন্তু কোনও স্থানেই দ্বিজপুত্রদিগকে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়নের উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের সহিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্রাদি, প্রকৃতির আবরণাদি অতিক্রম করিয়া কারণার্ণবমধ্যে মহাকালপুরে গিয়া উপনীত হইলেন। এই মহাকালপুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অষ্টভুজ ভূমাপুরুষরূপে (মহাকালরূপে) বিরাজিত। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই ভূমাপুরুষ সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন—

> দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
> কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৮॥

এই শ্লোকটীর দুই রকম অন্বয়—সুতরাং দুই রকম অর্থও—হইতে পারে। যথা—

(১) ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মরক্ষণায়) ভুবি মে (মম) কলাবতীর্ণৌ ! (কলয়া অবতীর্ণৌ !) যুবয়োঃ (যুবাং) দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজাত্মজাঃ উপনীতাঃ (মদন্তিকং প্রাপিতাঃ, যুবাং) অবনেঃ ভরাসুরান্ হত্বা ভূয়ঃ ত্বরয়া (শীঘ্রং) ইহ মে (মম) অন্তি (সমীপং) ইতং (আগচ্ছতং)।

—পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত আমার অংশে অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ! তোমাদের দেখিবার জন্য ইচ্ছা হওয়ায় আমি এই দ্বিজপুত্রদিগকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে হনন করিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর।

(২) ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মস্য ব্রহ্মণ্যত্বাদেঃ গুপ্তয়ে রক্ষণায়) কলাবতীর্ণৌ (কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ

শক্তিভিঃ বা সর্বৈঃ অংশৈঃ যুক্তৌ অবতীর্ণৌ )! যুবয়োঃ ( যুবাং ) দিদৃক্ষুণা ময়া মে ( মম ) ভুবি ( ধাম্নি ) দ্বিজাত্মজাঃ উপনীতাঃ ( আনীতাঃ ), ভূয়ঃ ( পুনরপি, যুবাং ) অবনেঃ ভরাসুরান্ ( ভারভূতান্ অসুরান্ ) হত্বা মে ( মম ) অন্তি ( অন্তিকায়—অন্তিকমাগন্তুং ) ত্বরয়েতং ( প্রস্থাপয়েতং মোচয়তং ইত্যর্থঃ )।—ধর্ম্মরক্ষার জন্য সর্ববশক্তিযুক্ত বা সর্ববাংশযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ! তোমাদের উভয়ের দর্শন পাইবার আশায় আমি দ্বিজপুত্রদিগকে আমার পুরে আনয়ন করিয়াছি। পুনর্ববার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে হনন করিয়া আমার নিকটে প্রেরণ কর ( মুক্ত কর )।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—উল্লিখিত দুইটী অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থটী বিচারসহ—শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য উক্তির সহিত, অন্যান্য পুরাণবাক্যের সহিত এবং শ্রুতি-স্মৃতির সহিত কোন্ অর্থটীর সঙ্গতি আছে।

উল্লিখিত প্রথম অর্থটী দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন হইতেছেন ভূমাপুরুষের অংশ। ইহা সমীচীন কিনা, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ( ৪৮-৬১ পৃষ্ঠায়। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণ ) এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ"-ইহা স্বীকার করিতে গেলে অনেক বিরোধ উপস্থিত হয়। "ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশ"-এইরূপ অর্থই বিচার-সহ। এ-স্থলে শ্রীজীবপাদের আলোচনার সার মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দুইটী বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ—বাক্যের বলবত্ত্বা-প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ—ভূমাপুরুষোক্ত বাক্যসমূহের বাস্তবার্থ-প্রকাশ।

বাক্যের বলবত্ত্বা-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—পূর্ববমীমাংসাকথিত রীতি অনুসারে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ের ছয়টী উপায় আছে ; যথা, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা ( আখ্যায়িকা ) ; ইহাদের মধ্যে পূর্বব উপায় অপেক্ষা পরবর্ত্তী উপায়ের দৌর্ববল্য বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্ববল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্ববল—ইত্যাদি। উক্ত ছয়টী উপায়ের মধ্যে প্রথমটী হইতেছে "শ্রুতি" এবং ষষ্ঠটী হইতেছে "সমাখ্যা বা আখ্যায়িকা" ; সুতরাং শ্রুতি হইতে সমাখ্যা অনেক দুর্ববল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভূমাপুরুষের বিবরণটী হইতেছে "সমাখ্যা বা আখ্যায়িকা" ; সুতরাং শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই বলবতী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নারায়ণাথর্ববশির-উপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালতাপনী-আদি শ্রুতি এবং সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের—সুতরাং ভূমাপুরুষেরও অংশী, ভূমাপুরুষাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ তাঁহার অংশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্বা এবং সর্ববাংশিত্ব শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্বা এবং সর্ববাংশিত্বই গ্রহণীয়। ভূমাপুরুষের আখ্যানের যথাশ্রুত অর্থ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আবার, শ্রুতি-তত্ত্বজ্ঞ এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীসূতগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অসম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন শৌনকাদি

ঋষিগণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"-বাক্যে শ্রুতিপ্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণ হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলা। ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিভাষা-বাক্য—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অন্যান্য বাক্যের নিয়ামক। সর্ব্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের আনুগত্যেই অর্থ করিতে হইবে—ইহাই সর্ব্বজন-স্বীকৃত বিধি। ভূমাপুরুষের বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ এই পরিভাষাবাক্যের বিরোধী বলিয়াও তাহা গৃহীত হইতে পারে না।

কোনও তত্ত্বসম্বন্ধে সাক্ষাদুক্তি বা অপরোক্ষ উক্তিই হইতেছে শ্রুতি। শ্রীসূতগোস্বামীর "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—বাক্যটী সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা শ্রুতি-সম্মত। সুতরাং শ্রীসূতগোস্বামীর বাক্যটী শ্রুতিপ্রমাণের মতনই প্রমাণ। কিন্তু ভূমাপুরুষের উক্তিটী সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে নহে। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করা ভূমাপুরুষের অভিপ্রেত নহে, দ্বিজপুত্রদিগের অপহরণের হেতু কথনই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; এজন্য তিনি বলিয়াছেন—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতাঃ—তোমাদের দর্শনাভিলাষী হইয়াই আমি দ্বিজপুত্রদিগকে আনিয়াছি।" ভূমাপুরুষকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-প্রকাশের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা, তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ভূমাপুরুষের অংশ, তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণও যে এক ভগবৎ-স্বরূপ, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্ব হইবে নিত্য অব্যভিচারী; সুতরাং তিনি তাঁহার তত্ত্বও জানেন এবং ভূমাপুরুষের তত্ত্বও জানেন। ভূমাপুরুষও একথা জানেন। অজ্ঞ ব্যক্তিকেই উপদেশ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় ভূমাপুরুষকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়—সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ করা ভূমাপুরুষের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং তাঁহার যথাশ্রুতার্থলব্ধ উক্তিকে শ্রুতির মর্য্যাদা দেওয়া সঙ্গত হয় না। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—শ্রীসূতগোস্বামীর এই বাক্যই শ্রুতিমর্য্যাদা-প্রাপ্তির যোগ্য।

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমাপুরুষের অংশ—এইরূপ উক্তি কোনও শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্—ইহা শ্রুতিস্মৃতিসম্মত। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে "অপ্রসিদ্ধ-কল্পনা-প্রসক্তি" হয়।

তর্কের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে ভূমাপুরুষের অংশ স্বীকার করিলেও ভূমাপুরুষের উক্তির যথাশ্রুত অর্থে এমন সব বিরোধ দৃষ্ট হয়, যাহার কোনও সমাধান নাই। বিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে।

ভূমাপুরুষ একবার বলিয়াছেন—"অবনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে—অবনীর ভারভূত অসুরগণকে হনন করিয়া তোমরা পুনরায় সত্বর আমার নিকটে আগমন কর (যথাশ্রুত অর্থ)"; আবার বলিয়াছেন—"যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ধর্ম্মাচরতাম্॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৯॥—তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্মাচরণ কর (যথাশ্রুত অর্থ)।" এ-স্থলে বিরোধ এই।

দ্বারকাতে বাসুদেব কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন,

তখন তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, সেই ধামেই তিনি অবস্থান করেন। লীলানুরোধে প্রকট-কালে অন্যত্র যাতায়াতও দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহা কেবল সাময়িক ভাবে। ভূমাপুরুষের আদেশ অনুসারে তিনি যদি চিরকালের জন্য দ্বারকা ছাড়িয়া মহাকালপুরে গিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারকায় নিত্য-স্থিতির কথা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশ হয়েন, তাহা হইলে অপ্রকট-সময়ে তিনি ভূমাপুরুষেই প্রবেশ করিবেন; তাহা হইলেও দ্বারকায় তাঁহার নিত্য-অবস্থিতি-সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যসমূহ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর, নর-নারায়ণ-ঋষি সম্বন্ধে বক্তব্য এই। নরনারায়ণ-ঋষি চিরকাল বদরিকাশ্রমেই অবস্থান করেন—ইহা অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ-ঋষি হইলে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভূমাপুরুষের নিকটে যাইতে পারেন না, গেলে বদরিকাশ্রমে তাঁহাদের চিরাবস্থিতি আর থাকেনা। আবার, তাঁহারা ভূমাপুরুষের অংশ হইলে অপ্রকট-সময়ে তাঁহাতে প্রবেশ করেন বলিয়া নর-নারায়ণ-ঋষিরূপে প্রকট থাকিতেও পারেন না। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যদি ভূমাপুরুষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বদাই দূর হইতেও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন; কেননা, করতলস্থিত-মণিবৎ তিনি সর্ব্বদাই সকল বস্তু দর্শন করিতেছেন। কিন্তু "তোমাদের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজপুত্ত্রদিগকে আমার নিকটে আনিয়াছি"—ভূমাপুরুষের এই বাক্য হইতেই তাঁহার সর্ব্বদর্শনের ব্যভিচার বুঝা যাইতেছে। ভূমাপুরুষের এই বাক্য হইতে আরও বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিজে যদি দর্শন দেন, তাহা হইলেই ভূমাপুরুষের পক্ষে তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সম্ভাবনা বা সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্ত্রদিগকে অপহরণ করিয়াছেন - ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণপুত্ত্রদিগকে নেওয়ার জন্য মহাকালপুরে আসিবেন, ইহাই তাঁহার আশা। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ভূমাপুরুষের অংশ নহেন; কেননা, তাঁহারা তাঁহার অংশ হইলে যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারিতেন। ইহাদ্বারা আবার ভূমাপুরুষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অধিক শক্তিমত্ত্বাই প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূমাপুরুষের অংশিত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে; কেননা, শক্তিবিকাশের ন্যূনতায় এবং আধিক্যেই অংশত্ব এবং অংশিত্ব সিদ্ধ হয়।

কিন্তু ভূমাপুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যদি অধিক-শক্তিমত্ত্বা স্বীকার করিতে হয় এবং তজ্জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভূমাপুরুষের অংশী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহা এই।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়—মহাকালপুরে গমন-সময়ে দূর হইতে ভূমাপুরুষের অপূর্ব্ব জ্যোতির দর্শনে অর্জ্জুনের নেত্রদ্বয় উৎপীড়িত হইয়াছিল এবং তিনি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং পুরে প্রবেশ করিয়াও ভূমাপুরুষের দর্শনে তিনি সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন।

এ-স্থলে প্রশ্ন এই যে—শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশী হয়েন এবং ভূমাপুরুষ হইতে অধিকতর শক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও হইবে ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ অপেক্ষা অধিকতর মহিমা-বিশিষ্ট। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন নিত্যই অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নয়ন উৎপীড়িত হয় না। অথচ ভূমাপুরুষের জ্যোতিতে তাঁহার নয়ন উৎপীড়িত হইল কেন ? ইহাতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে—ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃ অপেক্ষাও অধিক, সুতরাং ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশী ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ লীলানুরোধে কখনও অধিক শক্তির প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা ন্যূন শক্তির প্রকাশ করেন। যেমন, কোনও কোনও যুদ্ধে প্রাকৃত জন হইতেও শ্রীকৃষ্ণের পরাভবাদি দৃষ্ট হয়; শাল্বযুদ্ধ এবং জরাসন্ধ-ভয়ে পলায়নাদি তাহার দৃষ্টান্ত। আবার, জরাসন্ধকর্ত্তৃক প্রথম বার মথুরা-অবরোধ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অশ্বসমূহ রথের সহিত বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছিল; তখন অবশ্যই তাহারা প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়াই আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তখন কোনও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কিন্তু সেই রথেই শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে লইয়া দ্বারকা হইতে মহাকালপুরে আসিতেছিলেন, তখন প্রকৃতির আবরণে প্রাকৃত তমঃ দেখিয়া অশ্বসমূহ ভ্রষ্ট হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া অন্ধকার দূর করিলেই অশ্বগণ চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ-স্থলে অপ্রাকৃত অশ্বগণের পক্ষে প্রাকৃত অন্ধকারের প্রভাবে গতিভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ন্যূনশক্তির অভিব্যক্তিহেতু তদ্রূপ ঘটিয়াছিল।

তদ্রূপ, অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করেন, সেই লীলারসের উপযোগী শক্তিবিকাশই সে-স্থলে বুঝিতে হইবে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ হইলেও অর্জ্জুনের নিকটে জ্যোতির পরম বিকাশ প্রকটিত হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে অর্জ্জুনের নয়ন উৎপীড়িত হয় না। ভূমাপুরুষের স্বাভাবিক শক্তিবিকাশ দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন সাধ্বসযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বিরোধের কিছু নাই এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ভূমাপুরুষে তেজোমহিমার আধিক্যও সূচিত হয় না।

আর একটী সংশয় হইতেছে এই। মহাকালপুরে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন ভূমাপুরুষকে বন্দনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি ভূমাপুরুষের অংশ না হইতেন, তাহা হইলে ভূমাপুরুষকে বন্দনা করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভূমাপুরুষের বন্দনা হইতেছে তাঁহার নরলীলার একটী ভঙ্গী। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি শ্রীনারদাদি ঋষিদের বন্দনা করেন, শ্রীরুদ্রাদির প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্রীরুদ্র-নারদাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের অপকর্ষ অনুমিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়; নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি লীলা করেন; তাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই।

এই পর্য্যন্ত মহাকালপুর-গমন-প্রসঙ্গে বাক্যের বলবত্তা-প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূমাপুরুষের উক্তির যথাশ্রুত অর্থের অযৌক্তিকতা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূমাপুরুষের অংশত্বও খণ্ডিত হইল।

এক্ষণে প্রস্তাবিত শ্লোকটীর বাস্তবার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। এই বাস্তবার্থ দুই প্রকার—তাৎপর্য্যোত্থ এবং শব্দোত্থ।

তাৎপর্য্যোত্থ অর্থ এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হইয়াও গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-লীলায় গোপগণের বিস্ময়োৎপাদনরূপ কৌতুকের জন্য গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে স্বীয় এক দিব্য রূপ প্রকটিত করিয়া ব্রজবাসিগণের সহিত নিজেও নিজের সেই রূপকে যেমন নমস্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বিস্ময়োৎপাদনরূপ কৌতুকের জন্য তিনি নিজেরই একস্বরূপ-ভূমাপুরুষের দ্বারা দ্বিজপুত্রদিগকে অপহৃত করাইয়াছেন, দ্বিজপুত্রদিগকে আনয়নের নিমিত্ত মহাকালপুরে গমন-সময়ে পথিমধ্যে নানাভাবে অর্জ্জুনের বিস্ময় উৎপাদিত করাইয়াছেন এবং মহাকালপুরে যাইয়াও অর্জ্জুনের সহিত দিব্যমূর্ত্তিরূপ (ভূমাপুরুষরূপ) আপনাকে আপনি নমস্কার

করিয়াছেন। আবার নিজের সেই দিব্যমূর্ত্তিরূপেই নিজেকে এবং অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া "দ্বিজাত্মজা মে"-ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। "ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৭ ॥—অচ্যুত (স্বীয় নরলীলা-চ্যুতিরহিত শ্রীকৃষ্ণ) অনন্ত (অপরিচ্ছিন্ন-প্রভাব) নিজেকে (আত্মানং—ভূমাপুরুষরূপ নিজেকে) বন্দনা করিলেন।" গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-লীলায়—যেমন গোবর্দ্ধনোপরিস্থিত নিজের রূপকেই তিনি নিজে ব্রজবাসীদের সহিত নমস্কার করিয়াছিলেন—"তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে ॥ শ্রীভা. ১০।২৪।৩৬ ॥", এ-স্থলেও তদ্রূপ।

শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, ভূমাপুরুষের জ্যোতিকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"মত্তেজস্তৎ সনাতনমিতি—হে অর্জ্জুন, (এই ভূমাপুরুষে তুমি যে তেজ দেখিতেছ, তাহা অন্য কিছু নহে) আমারই সনাতন তেজঃ।" ভূমাপুরুষে দৃষ্ট তেজঃ যদি শ্রীকৃষ্ণেরই সনাতন তেজঃ হয়, তাহা হইলে ভূমাপুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই বুঝা যায়; কেননা, অংশের মধ্যেই অংশীর সনাতন তেজঃ থাকিতে পারে, অংশীতে অংশের তেজঃ থাকিতে পারে না। আবার, অংশরূপে ভূমাপুরুষ যে অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই নিজের একটী রূপ, তাহাও উক্ত বাক্য হইতে জানা গেল।

এইরূপে তাৎপর্য্যোত্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া এক্ষণে শব্দোত্থ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে।

মহাকালপুরে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন দেখিলেন—অনন্তনাগের উপরে সুখাসনে উপবিষ্ট এক পুরুষোত্তমোত্তম; তিনি নিবিড়-মেঘবর্ণ, পীতবসন, প্রসন্নমুখ, বিভু, মনোহরায়ত-নেত্র এবং মহাপ্রভাব।

"দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্ ॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৪ ॥"

এ-স্থলে ভূমাপুরুষকেই "পুরুষোত্তমোত্তম" বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে (১৫।১৮-শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণকে "পুরুষোত্তম" বলা হইয়াছে। ভূমাপুরুষকে "পুরুষোত্তমোত্তম—পুরুষোত্তম হইতেও উত্তম" বলাতে মনে হইতে পারে, ভূমাপুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ হইতেও উত্তম—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশী। গীতার ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, বস্তুতঃ তাহা নহে।

গীতার পুরুষোত্তম হইতেছেন তিনি—যিনি ক্ষর (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সমস্ত) ও অক্ষর (কূটস্থ)—এই দুইরকম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (গীতা ॥১৫।১৮)। এই পুরুষোত্তম-সম্বন্ধেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥ গীতা ॥ ১৫।১৫ ॥—সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য হইতেছি আমি (পুরুষোত্তম)।" ইহাদ্বারা গীতার পুরুষোত্তমের পরব্রহ্মত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে ভূমাপুরুষকে যে "পুরুষোত্তমোত্তম" বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি, দেখা যাউক।

বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীটীকা বলেন—"পুরুষেষু ত্রিষু উত্তমঃ শ্রীবিষ্ণুঃ, তস্মাদপি উত্তমং অবতারিত্বাৎ—তিন পুরুষের মধ্যে উত্তম হইতেছেন শ্রীবিষ্ণু, তাঁহারও অবতারী বলিয়া তাঁহা হইতেও উত্তম।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ত্রিষু পুরুষেষু উত্তমো মহৎস্রষ্টা তস্মাদপি ইতি পুরুষোত্তমোত্তমম্—মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী

পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের মধ্যে উত্তম হইতেছেন মহৎ-স্রষ্টা (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ); সুতরাং মহৎস্রষ্টা হইতেছেন পুরুষোত্তম; তাঁহা হইতেও উত্তম।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"পুরুষো জীবস্তস্মাদুত্তমস্তদন্তর্য্যামী তস্মাদুত্তমং ভগবৎপ্রভাবরূপমহাকালশক্তিময়ং তমিতি—পুরুষ হইতেছে জীব, জীব হইতে উত্তম হইতেছেন জীবন্তর্য্যামী পরমাত্মা, জীবান্তর্য্যামী হইতে উত্তম হইতেছেন শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ মহাকালশক্তিময় ভূমাপুরুষ।" কোনও টীকাকারই ভূমাপুরুষকে সমস্তবেদের একমাত্র বেদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। অথচ গীতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্তবেদের একমাত্র বেদ্য পরব্রহ্ম, তাহা গীতাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ বলিয়া তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকপ্রোক্ত "পুরুষোত্তমোত্তম" ভূমাপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ হইতে পারেন না।

এক্ষণে "দ্বিজাত্মজা মে"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে।

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥

এই শ্লোকটীর দুইটী অংশ—( ১ ) যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়া মে ভুবি উপনীতাঃ এবং ( ২ ) ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ ভূয়ঃ অবনেঃ ভরাসুরান্ হত্বা ইহ মে অন্তি ত্বরয়েতম্।

প্রথমে দ্বিতীয় অংশের অর্থ করা হইতেছে। "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দটী হইতেছে সম্বোধনাত্মক পদ; হে কলাবতীর্ণৌ! "কলাঃ"-শব্দের অর্থ—অংশসমূহ। কলাসমূহ ( অংশসমূহ )-যুক্তরূপে অবতীর্ণ=কলাবতীর্ণ ( মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস ), দ্বিবচনে "কলাবতীর্ণৌ।" এ-স্থলে "কলাঃ—অংশসমূহ"-শব্দে "অন্যভগবৎ-স্বরূপগণ" বুঝাইতেছে। অথবা "কলায়াম্ অবতীর্ণৌ—কলাতে ( অংশে ) অবতীর্ণ"—এইরূপও হইতে পারে—সপ্তমী তৎপুরুষ-সমাস। এ-স্থলে কলা ( অংশ )-শব্দে মায়িক প্রপঞ্চকে বুঝায়। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি—এই মমস্ত ভূত ( নিখিল মায়িক প্রপঞ্চ ইঁহার অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবানের ) একপাদ বিভূতি ( এক অংশ )"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, মায়িক-প্রপঞ্চ ভগবানের এক অংশ।

এইরূপে "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দের অর্থ হইল—সমস্ত-অংশ-যুক্ত হইয়া যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা, স্বীয় অংশভূত মায়িকপ্রপঞ্চে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই দুইজন। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন? "ধর্ম্মগুপ্তয়ে—ধর্ম্মরক্ষার জন্য।" হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ!—ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বাংশের সহিত যুক্ত হইয়া, অথবা স্বীয় অংশভূত মায়িকপ্রপঞ্চে, অবতীর্ণ হে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন!"

স্বয়ংভগবান্‌ই সর্ব্বাংশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন; অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তদ্রূপ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে সম্বোধনের পরে ভূমাপুরুষ বলিয়াছেন—ভূয়ঃ অবনেঃ ভরাসুরান্ হত্বা মে অন্তি ত্বরয়েতম্—তোমরা উভয়ে পুনরায় পৃথিবীর অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া আমার নিকটে প্রেরণ করিতে ত্বরান্বিত হও।"

এ-স্থলে "ত্বরয়েতম্" লোটের রূপ নহে। প্রার্থনায় নিজন্ত "ত্বর"ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ "যাতম্"-প্রত্যয় হইয়াছে। ভূমাপুরুষ প্রার্থনা জানাইতেছেন—অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া তাড়াতাড়ি যেন তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

"অন্তি"-শব্দ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ; অব্যয়-শব্দ বলিয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এ-স্থলে "চতুম্"-অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে ; যেমন, "এধেভ্যো ব্রজতীতি—কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইতেছে।" "অন্তি ত্বরয়েতম্"-বাক্যের অর্থ—আমার নিকটে প্রেরণ করার জন্য ত্বরান্বিত হও।

"অসুরান্—অসুরগণকে"-ইহা কর্ম্মকারক ; বধ কর ও সমীপস্থ কর—এই উভয় ক্রিয়ার কর্ম্ম। যেমন—"কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়তি"—কট প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছে ; এ-স্থলে যেমন প্রস্তুত করা এবং প্রেরণ করা—এই উভয় ক্রিয়ার কর্ম্মই কট, তদ্রূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে—অবশিষ্ট অসুরগণকে বধ করিয়া ভূমাপুরুষের সমীপে পাঠাইবার জন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত অসুরদিগের মুক্তির জন্যই ভূমাপুরুষের এই প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "হতারিগতিদায়ক।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন।

অসুরদিগের মুক্তির জন্যই যদি প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে নিহত অসুরদিগকে ভূমাপুরুষের নিকটে পাঠাইবার জন্য প্রার্থনা কেন ?

মুক্ত জীবগণ মহাকাল-জ্যোতির মধ্যেই প্রবেশ করে, মহাকালের বা ভূমাপুরুষের সান্নিধ্যেই তাহাদের অবস্থিতি। শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, অর্জ্জুনের নিকটে ভূমাপুরুষের জ্যোতিঃসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্দৃষ্টবানসি-ইত্যাদি—হে অর্জ্জুন! তুমি যে ব্রহ্মতেজোময় অপ্রাকৃত মহদ্‌বস্তু দেখিতেছ, তাহা আমারই সনাতন তেজঃ।" এই তেজের মধ্যে ভূমাপুরুষের সান্নিধ্যেই মুক্তগণের অবস্থিতি।

এজন্যই নিহত অসুরদিগকে নিজের নিকটে, স্বীয় জ্যোতির মধ্যে, পাঠাইবার জন্য ভূমাপুরুষ প্রার্থনা করিয়াছেন ; এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য—নিহত অসুরদিগের মুক্তিদান।

যদি বলা যায়—শ্লোকস্থ "মে"-শব্দটীকে "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দের সঙ্গে অন্বিত করিয়া এবং "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দটীকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ মনে করিয়া অর্থ করিলে কি কোনও দোষ হয় ?

দোষ হয়। কি দোষ ? তাহা প্রদর্শিত হইতেছে॥ "মে"-শব্দটীকে "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দটীর সঙ্গে অন্বিত করিলে বাক্যটী হইবে—"মে কলাবতীর্ণৌ" এবং "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দটীকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ মনে করিলে তাহার ব্যাসবাক্য হইবে—"কলাভ্যাম্ অবতীর্ণৌ" সমগ্র বাক্যটী হইবে "মে কলাভ্যাম্ অবতীর্ণৌ—আমার (ভূমাপুরুষের) কলাদ্বয়দ্বারা (কলাদ্বয় বা অংশদ্বয় রূপে) অবতীর্ণ তোমরা দুইজন (শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন)।" এইরূপ অর্থে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন যে ভূমাপুরুষের অংশ, তাহা পাওয়া যায়। এইরূপ অর্থ করা যায় বটে ; কিন্তু তাহাতে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেননা, "কলাবতীর্ণৌ"-শব্দটীকে ব্যাসবাক্যে পরিণত করিলেই "মে"-শব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধের প্রতীতি পরিষ্কার-ভাবে জন্মিতে পারে, নচেৎ

তাহা জন্মে না। যেহেতু, ঐরূপ অর্থে, "কলা"-শব্দের সহিতই "মে"-শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ( মে কলা—আমার কলা ); এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইলে "মে"-শব্দটীকেও সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "মৎকলাবতীর্ণৌ"-পদ সিদ্ধ করা সঙ্গত হইত এবং এইরূপ অর্থই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "মৎকলাবতীর্ণৌ"-পদই শ্লোকে থাকিত। তাহা যখন নাই, তখন কেবল কষ্টকল্পনার বলেই ঐরূপ অর্থে উপনীত হইতে হয়। ইহা একটী দোষ। দ্বিতীয় দোষ এই যে, এইরূপ কষ্টকল্পনার সহায়তাতে, "কৃষ্ণার্জ্জুন ভূমাপুরুষের অংশ"-এতাদৃশ যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যে শাস্ত্র-সম্মত নয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহাহউক, "কলাবতীর্ণৌ"-পদটীকে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়-সমাসবদ্ধ বা সপ্তমীতৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ মনে করিয়া যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্‌ই হয়েন, তাহা হইলে ভূমাপুরুষের পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত ইহার কিরূপে সঙ্গতি থাকিতে পারে ?

অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যটী হইতেছে এই। ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৫৯॥

এই শ্লোকের যাথশ্রুত অর্থ—তোমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পূর্ণকাম, নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় ; সৃষ্টিরক্ষার্থ লোক-শিক্ষাপ্রদ ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ।"

এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে যে ভূমাপুরুষের বাক্যসমূহের মধ্যেই বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ইহার বাস্তবার্থ এইরূপ ঃ—ভূমাপুরুষ বলিতেছেন—

"তোমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনরূপেই লোকহিতকর কার্য্য করিতেছ, তাহাই নহে, বৈভবান্তরদ্বারাও তাহা করিতেছ। তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন ( শ্রীকৃষ্ণ ) স্বয়ংভগবান্‌রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ( ঋষভ ), অপরজন ( অর্জ্জুন ) স্বয়ংভগবানের সখারূপে ঋষভ—শ্রেষ্ঠ—হইয়াও, সর্ব্বাবতারাবতারিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও এবং পূর্ণ-কাম হইয়াও,—লোকসংগ্রহার্থ, লোকসমূহের মধ্যে ধর্ম্মাচরণের আদর্শ স্থাপনের জন্যই, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে—তোমরা হইতেছ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়।"

শ্লোকস্থ "আচরতাম্"-শব্দ হইতেই উল্লিখিতরূপ বাস্তবার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচরতাম্—আ-পূর্ব্বক চর+শতৃ-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির বহুবচনান্ত। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থ—যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে। "লোকসংগ্রহং ধর্ম্মম্ আচরতাং ঋষভৌ নর-নারায়ণাবৃষী—লোকসংগ্রহার্থ যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তোমরা ( কৃষ্ণার্জ্জুন ) তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়। অর্থাৎ নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয় তোমাদের বিভূতিতুল্য।" ধর্ম্মাচরণ-শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমরাই নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।

এ-স্থলে, নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অল্পাংশ বলিয়া তাঁহাদিগকে বিভূতি বলা হইয়াছে। অল্পাংশত্বের হেতু এই—নর-নারায়ণ হইতেছেন পুরুষের অংশ , আর পুরুষ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং নারায়ণ-ঋষি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অল্পাংশ, তেমনি নারায়ণ-সখা নর-ঋষিও স্বরূপে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের অল্পাংশ।

কিঞ্চিৎ ভগবচ্ছক্তিতে আবিষ্ট ভক্তোত্তম জীবকেই বিভূতি বলে। বিভূতি-স্বরূপ ঋষিগণ লোকসংগ্রহের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। নর-নারায়ণ জীবতত্ত্ব না হইলেও, স্বরূপতঃ ঈশ্বর-কোটি হইলেও, লোকসংগ্রহার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও বিভূতি (বিভূতির ন্যায়) বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দেও দেখা যায়, বিভূতি-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"নারায়ণো মুনীনাঞ্চ ॥ শ্রীভা. ১১।১৬।২৫॥—মুনিগণের মধ্যে আমি নারায়ণ।" নারায়ণ-ঋষি যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, তাহাই ইহা হইতে জানা গেল। ভূমাপুরুষও তাহাই বলিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—"পূর্ণকামাবপি যুবাং নর-নারায়ণাবৃষী"-ইত্যাদি বাক্যে ভূমাপুরুষ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—নর-নারায়ণ-ঋষিদ্বয় কৃষ্ণার্জ্জুনের বিভূতির ন্যায়; নর-নারায়ণ-ঋষিই কৃষ্ণার্জ্জুন—ইহা ভূমাপুরুষের অভিপ্রেত নহে।

এইক্ষণে ভূমাপুরুষের উক্তির "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতাঃ"—অংশের অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে।

ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিতেছেন—"তোমাদের উভয়ের দর্শনাভিলাষী হইয়া আমি দ্বিজপুত্রদিগকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছি।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্রদিগকে হরণ করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই।

দুই রকমে ভূমাপুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সম্ভব—এক, শ্রীকৃষ্ণ যদি আপনা-আপনি ভূমাপুরুষের নিকটে আসেন; আর, যদি ভূমাপুরুষ কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নিকটে নিতে পারেন।

কিন্তু সহজভাবে কোনটাই সম্ভবপর নহে। কেননা, ভূমাপুরুষের নিকটে আসার পক্ষে স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রয়োজন নাই। আর, শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষ হইতে অত্যধিকরূপে শক্তিশালী বলিয়া ভূমাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুরীতে নিতেও পারেন না। এমন কোনও উপায় যদি অবলম্বন করা যায়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভূমাপুরুষের নিকটে যাইতে ইচ্ছুক হইতে পারেন, তাহা হইলেই ভূমাপুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভব হইতে পারে। তিনি সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন।

ভূমাপুরুষ জানেন—শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক-শিরোমণি, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণের প্রীতিবিধানে তৎপর। সুতরাং ভূমাপুরুষ যদি কোনও দ্বিজের পুত্রগণকে হরণ করিয়া স্বীয় পুরে আনিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁহার নিকটে আসিবেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই সমস্ত ভাবিয়াই ভূমাপুরুষ দ্বিজপুত্রদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিবংশের উক্তি হইতেও ইহা জানা যায়। শ্রীহরিবংশে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথা ত্বিহ ॥

—আমার দর্শনের জন্য সেই মহাত্মা (ভূমাপুরুষ) কর্ত্তৃক সেই বালকগণ অপহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রার্থই আসিবেন, অন্য কোনও কারণেই তিনি এখানে আসিবেন না—(ইহা মনে করিয়া)।"

প্রশ্ন হইতে পারে—ভূমাপুরুষ দ্বারকায় গিয়াও তো শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিতেন; দ্বিজপুত্রদিগকে হরণ করিলেন কেন? আবার, দ্বারকাস্থিত দ্বিজের পুত্রদিগকে হরণের জন্য তিনি তো একাধিক বারই দ্বারকায় গিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিলেন না কেন?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। দ্বারকাতে তিনি ভূমাপুরুষকে দর্শন দান করিবেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয়। এজন্য ভূমাপুরুষ দ্বারকায় তাঁহার দর্শনের জন্য চেষ্টাও করেন নাই, তদনুরূপ প্রেরণাও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চিত্তে জাগান নাই। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যদেবত্ব-প্রকটন, এবং ভূমাপুরুষের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি। ভূমাপুরুষের দর্শনোৎকণ্ঠা-বৃদ্ধিরই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম-দ্বিতীয়াদি দ্বিজপুত্রদিগকে নেওয়ার জন্য মহাকালপুরে আসেন নাই, নবম পুত্রের অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের যে আরো একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও বুঝা যায়। তাহা হইতেছে অর্জ্জুনের মোহভঙ্গ, অর্জ্জুনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধ করান। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৯-অধ্যায়ের টীকার উপসংহারে শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতম্—মহাকালপুর গমন-ব্যাপার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল।" সুতরাং তখনও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখেন নাই, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি বিশেষরূপে জানিতেন না। অর্জ্জুনের নিজের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। অর্জ্জুন যখন দ্বারকাবাসী হৃতপুত্র ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমি তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব; না পারিলে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" তখন অর্জ্জুনের সামর্থ্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—"সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন এবং অপ্রতিরথ অনিরুদ্ধও যখন আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন জগদীশ্বরেরও দুষ্কর সেই কর্ম্ম তুমি কিরূপে করিবে? আমি তোমার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীভা. ১০।৮৯।৩০-৩১॥" তখন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণ! আমি সঙ্কর্ষণ নহি, কৃষ্ণও নহি, কিম্বা কৃষ্ণপুত্রও নহি। আমার নাম অর্জ্জুন, গাণ্ডীবই আমার ধনু। আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমার বীর্য্যের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমি কিরাতবেশধারী মহাদেবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি।

"নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ। অহঞ্চৈবার্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥
মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্য্যং ত্র্যম্বকতোষণম্। শ্রীভা. ১০।৮৯।৩২-৩৩॥"

ইহা হইতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসম্বন্ধে অর্জুন কিরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের ক্ষমতা-সম্বন্ধেই বা তাঁহার কিরূপ মোহ ছিল।

নিজের শক্তির মহিমাসম্বন্ধে মোহবশতঃ অর্জ্জুনের যে গর্ব্ব ছিল, তাহার অসারত্ব দ্বিজপুত্র-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সূতিকাগৃহকে শরজালে আবৃত করিয়াও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের নবম পুত্রটীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যমপুরী-আদি নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও দ্বিজপুত্রদিগকে তিনি পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ জানেন—দ্বিজ-পুত্রদের মৃত্যু হয় নাই; তিনি জানেন, তাহারা কোথায় আছে। কিন্তু জানিয়াও তিনি অর্জ্জুনকে তাহা বলেন নাই; বলিলে অর্জ্জুনের মোহভঙ্গ হইত না। শেষকালে তিনি অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া

মহাকালপুরে উপনীত হইলেন, ভূমাপুরুষের অসাধারণ মহিমা দেখাইলেন এবং শ্রীহরিবংশের উক্তি হইতে জানা যায়—ভূমাপুরুষের মহিমা, তাঁহার অপূর্ব্ব তেজ-আদি—শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা। এই সমস্ত অবগত হইয়া অর্জ্জুনের মনে কি ভাব উদিত হইয়াছিল, ভূমাপুরুষ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতই তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

"নিশম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।৬২ ॥

—অর্জ্জুন বৈষ্ণব ধাম দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন—পুরুষগণের যাহা কিছু পৌরুষ, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই সম্পাদিত।"

অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন—ভূমাপুরুষের মহিমাও শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত এবং অখিল-জীব-নিচয়ের পৌরুষ বা প্রভাবও শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত। তখনই স্বীয় বীর্যসম্বন্ধে অর্জ্জুনের মোহ দূরীভূত হইল।

উল্লিখিত শ্লোকে, "পুরুষগণের পৌরুষ বা প্রভাব ভূমাপুরুষের অনুগ্রহে সম্পাদিত"—ইহা না বলিয়া "শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সম্পাদিত" বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশ হইতেন, তাহা হইলে "যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্"-বাক্যের কোনওরূপ অর্থ-সঙ্গতিই হইত না।

শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্ণয়ে উপক্রম এবং উপসংহারের সঙ্গতিই প্রধান সহায়। ভূমাপুরুষের আখ্যানের "নিশম্য বৈষ্ণবং ধাম"-ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত উপসংহার-শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণেরই পরম-পুরুষত্ব এবং সর্ব্বাংশিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই আখ্যানের উপক্রম-শ্লোকটী হইতেছে—

"একদা দ্বারাবত্যান্তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥ শ্রীভা. ১০।৮৯।২১ ॥

—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে ভারত! এক দিন দ্বারকা-নগরীতে কোনও এক বিপ্র-পত্নীর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরিয়া গেল।"

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স চোক্তলক্ষণো ভগবান্ কৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ—একদেতি। —ঋষিগণ-কথিত লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে 'একদা'-ইত্যাদি শ্লোকসমূহে অন্য আখ্যান ( মহাকাল-পুরুষের আখ্যান ) বর্ণন করা হইতেছে।"

এক সময়ে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের মনে সংশয় জাগিয়াছিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাঁহারা কোনওরূপ মীমাংসা করিতে না পারিয়া পরীক্ষার জন্য ভৃগু-ঋষিকে পাঠাইলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে, তারপর শিবের নিকটে এবং সর্ব্বশেষে বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষা করিলেন। পরে তিনি ঋষিদিগের নিকটে আসিয়া তিন দেবতার আচরণাদির কথা জানাইয়া বলিলেন—ঐ তিন দেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। ভৃগুমুখে শ্রীবিষ্ণুর ক্ষমাশীলতাদি গুণের কথা শুনিয়া ঋষিগণ বিগত-সংশয় হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যাঁহার শরণাগত হইলে শান্তিলাভ করা যায় এবং ভয় থাকে না, যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তদন্বিত অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মলনাশক যশঃ যাঁহা হইতে পাওয়া যায়, যিনি-মননশীল, মহাদোষাত্মক-

ভূতদ্বেষ পরিত্যাগকারী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, তুল্যদর্শী ও একমাত্র শ্রীভগবানেই নিষ্ঠচিত্ত সাধুগণের পরমগতি, শুদ্ধসত্ত্বই যাঁহার কৃপাযোগ্য অধিষ্ঠান এবং ইষ্টদেবতার ন্যায় আরাধ্যমান, নিষ্কাম, সর্ব্বথা রাগদ্বেষাদিরহিত ও নিপুণবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকেই ভজনা করেন, তিনি পুরুষোত্তম। শ্রীভা. ১০।৮৯।১৪-১৮॥"

এ-স্থলে ঋষিদিগের বাক্যে পুরুষোত্তম ভগবানের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সে-সকল লক্ষণবিশিষ্ট ভগবান্ যে কৃষ্ণই, তাহা জানাইবার জন্যই ভূমাপুরুষের বিবরণ কথিত হইতেছে—ইহাই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর উক্তি। এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভূমাপুরুষের আখ্যানের উপক্রমেও শ্রীকৃষ্ণের পরমপুরুষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। টীকার উপসংহারেও স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতমপি শ্রৈষ্ঠ্যকথন-প্রস্তাবেনাত্রোক্তম্। —মহাকালপুর-গমন ভারত-যুদ্ধের পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও শ্রেষ্ঠত্ব-কথন-প্রস্তাবে এস্থলে কথিত হইয়াছে।"

উপক্রম এবং উপসংহার—উভয় স্থলেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপনই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়—ইহাই স্বামিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য। ভূমাপুরুষের অংশিত্ব প্রতিপাদন এই আখ্যানের অভিপ্রেত নহে।

এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ নহেন, ভূমাপুরুষই শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

## ১৭৭। শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীনারায়ণের তত্ত্ব

পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্তের জ্ঞান লাভ হয়—একাধিক শ্রুতিতেই ইহা বলা হইয়াছে এবং সমস্ত শ্রুতিরও ইহাই অভিপ্রায়। **গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি** হইতে জানা যায়, মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং ভাতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি॥ ১।১॥—কে পরম দেব? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়? কাহার বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়? কাহাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব উৎপাদিত হইয়াছে?"

উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি। স্বাহেদং সংসরতীতি॥ ১।১॥—শ্রীকৃষ্ণই পরম-দেবতা (শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও পরব্রহ্মসম্বন্ধে বলিয়াছেন—তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ ৬।৭॥)। গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে মৃত্যু ভয় পায়। গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। স্বাহা কর্ত্তৃক এই জগৎ উৎপাদিত হইতেছে।"

রসত্বের পূর্ণতম বিকাশেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণতম বিকাশ। গোপীজন-বল্লভ-শ্রীকৃষ্ণেই রসত্বের—আস্বাদ্য-রসত্বের এবং আস্বাদক-রসত্বের—সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাহার হেতু এই।

প্রথমতঃ, আস্বাদ্য-রসত্বের বা মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপে। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন, শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমের প্রভাবে, তখনই তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যময় মদনমোহনরূপ প্রকাশ পায়। গোপীজনবল্লভেরই শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব। সুতরাং গোপীজনবল্লভেই মাধুর্য্যের বা আস্বাদ্য-রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ।

দ্বিতীয়তঃ, আস্বাদক-রসত্ব। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন—তাঁহার পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস—লীলার ব্যপদেশে যাহা উৎসারিত হয়। তাঁহার রাসলীলাই হইতেছে সর্ববলীলা-মুকুটমণি ( ১।১।১৩৯ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণই হইতেছেন—এই রাসলীলার পরিকর। সুতরাং গোপীজন-বল্লভই এই রাসলীলারস-আস্বাদক। রাসলীলা-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব সর্ববাতিশায়ী বলিয়া রাস-রসাস্বাদক গোপীজন-বল্লভেই আস্বাদক-রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ।

এইরূপে দেখা গেল—গোপীজনবল্লভেই রসস্বরূপত্বের—সুতরাং পরব্রহ্মত্বের—পূর্ণতম বিকাশ। তাঁহার জ্ঞানেই সমস্তের জ্ঞানলাভ সম্ভব। পরব্রহ্মের কেবল ঐশ্বর্য্যাত্মকরূপের জ্ঞানে মাধুর্য্যের পূর্ণজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, মাধুর্য্যব্যতীত অন্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ প্রায় পূর্ণরূপেই হয়তো হইতে পারে। কিন্তু ভগবত্তার বা পরব্রহ্মত্বের সার—মাধুর্য্যের সম্যক্ জ্ঞান লাভ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যাদিরও সম্যক্ জ্ঞান লাভ কেবল মাত্র গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানেই সম্ভব। এজন্যই বলা হইয়াছে—গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানেই সমস্তের জ্ঞান হইয়া যায়। ইহা দ্বারা গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বই সূচিত হইয়াছে। গোপালোত্তর-তাপনীতে শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টভাবেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে—"যোঽসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ॥ ১৫ ॥" শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সূচক শ্রুতি-স্মৃতির অন্যান্য প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ( ১।১।৬৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

**নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে** লিখিত আছে—

"অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজা স্বজেয়েতি ॥ নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ॥ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে ॥ নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে ॥ নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে ॥ নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে ॥ নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্ব্বাণি চ্ছন্দাংসি ॥ নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে ॥ নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে ॥ নারায়ণে প্রলীয়ন্তে ॥ এতদ্ ঋগ্বেদশিরোঽধীতে ॥ ১ ॥—পুরুষ নারায়ণ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবী, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রজাপতি, দ্বাদশাদিত্য, একাদশরুদ্র, অষ্ট বসু এবং বেদসমূহ উৎপন্ন ও প্রবর্ত্তিত হয়, আবার নারায়ণে লীন হয়। ঋগ্বেদশির এইরূপ বলেন।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—নারায়ণই সর্ববকারণ-পরব্রহ্ম। ইহার পরে উক্ত শ্রুতিই বলিয়াছেন—"অথ নিত্যো নারায়ণঃ ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ ॥ দিশশ্চ নারায়ণঃ ॥ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ ॥ উৰ্দ্ধ চ নারায়ণঃ ॥ অধশ্চ নারায়ণঃ ॥ অন্তর্ব্বহিশ্চ নারায়ণঃ ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥ নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ ॥ য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ এতদ্ যজুর্বেদশিরোঽধীতে ॥ ২ ॥" এই বাক্যেও নারায়ণের সর্ব্বাত্মকত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব খ্যাপন করিয়া তাঁহারই পরব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরে নারায়ণোপাসনার অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের কথা বলিয়া নারায়ণোপাসকের সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে—"ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভুবনং গমিষ্যতি ॥—নারায়ণের অষ্টাক্ষর-মন্ত্রোপাসক বৈকুণ্ঠভুবনে গমন করিবেন।" ইহার পরে এই

বৈকুণ্ঠ-ভুবন-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্॥ তস্মাত্তড়িদাভমাত্রম্॥—এই বৈকুণ্ঠ-ভুবন পদ্মাকার, বিজ্ঞানঘন ( চিদ্‌ঘন ), তজ্জন্য তড়িদাভ ( বিদ্যুতের ন্যায় আভাযুক্ত, জ্যোতির্ম্ময় )।”

ইহার পরেই বলা হইয়াছে—“ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি॥ সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওম্॥—ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র, ব্রহ্মণ্য মধুসূদন, ব্রহ্মণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্রহ্মণ্য অচ্যুত-বিষ্ণু। সর্ব্বভূতস্থ এক নারায়ণ ; তিনি কারণ-পুরুষ, অথচ স্বয়ং অকারণ ; তিনিই পরব্রহ্ম।” ( মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু, অচ্যুত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণেরও নাম )

এই শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে—দেবকীপুত্রই সর্ব্বকারণ-কারণ এবং স্বয়ং কারণরহিত পরব্রহ্ম নারায়ণ। দেবকীপুত্র-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। বসুদেব-পত্নীর নামও দেবকী, নন্দপত্নী যশোদারও একটী নাম দেবকী। দেবকীপুত্রই যে “বৈকুণ্ঠ-ভুবনের” অধিষ্ঠাতা, তাহাও উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১০৮-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—“বৈকুণ্ঠবনলোকং গমিষ্যতি তদিদং পুরমিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং তস্মাত্তড়িদাবভাসমিতি বনলোকাকারস্য বৈকুণ্ঠস্য আনন্দাত্মকত্বং প্রতিপাদ্য স চ তদধিষ্ঠাতা নারায়ণঃ কৃষ্ণ এব ইত্যুপসংহরতি ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্র ইতি॥—বৈকুণ্ঠ-বনলোক প্রাপ্ত হইবে। এই পুর পদ্মাকৃতি, বিজ্ঞানঘন, তড়িদাভ। এইরূপে বৈকুণ্ঠবনলোকের আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহার অধিষ্ঠাতা নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহা জানাইবার জন্যই উপসংহারে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র।”

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে “বৈকুণ্ঠভুবন”-স্থলে “বৈকুণ্ঠবনলোক”-পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা বোধহয় পাঠান্তর। উভয় পাঠের তাৎপর্য্য একই। “বৈকুণ্ঠভুবন”-পাঠ গ্রহণ করিলেও, দেবকীপুত্র-শ্রীকৃষ্ণকেই যখন এই “বৈকুণ্ঠভুবনের” অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে, তখন ইহা “বনবৈকুণ্ঠই” হইবে। যেহেতু, কৃষ্ণোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুলকে “বনবৈকুণ্ঠ” বলা হইয়াছে। “গোকুলং বনবৈকুণ্ঠম্॥ কৃষ্ণোপনিষৎ॥ ৯॥”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ নহেন। নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষৎ স্পষ্ট কথাতেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষৎসার-**শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। গীতাতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কোনও উল্লেখই কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না।**

পরব্রহ্মের একটী সর্ব্বসম্মত লক্ষণ হইতেছে এই যে—তাঁহার জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞানই লব্ধ হয়। পূর্ব্বে গোপাল-পূর্ব্বতাপনী শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—গোপীজন-বল্লভ-জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং গোপীজন-বল্লভ-কৃষ্ণেই এই লক্ষণটী বিরাজিত। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের জ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বজ্ঞানের কিছু ঊণতা থাকে ; যেহেতু, গোপীজনবল্লভে বিকশিত মাধুর্য্যের জ্ঞান নারায়ণের জ্ঞানে জন্মিতে পারে না। যেহেতু, পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে—রসত্বে শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে পরব্রহ্মত্বের এই লক্ষণটীর অভাব বলিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা যায় না। এই জন্যই নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ বলিয়াছেন—পরব্রহ্মরূপে যে নারায়ণের কথা বলা হইয়াছে, তিনি দেবকীপুত্র

শ্রীকৃষ্ণ। বস্তুতঃ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও অংশী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অংশী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু—অর্থাৎ নারায়ণ—যে পরব্রহ্মের আবির্ভাব—সুতরাং পরব্রহ্মের অংশ, কিন্তু পরব্রহ্ম নহেন—**কৈবল্যোপনিষৎ** হইতেও তাহা জানা যায়। কৈবল্যোপনিষৎ বলেন—

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ১৮-৯॥

—সেই স্বরাট্ অক্ষর (অবিনাশী) পরম পুরুষই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, তিনিই কালাগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয়বর্ত্তী যাহা কিছু, তৎসমস্তই তিনি, তিনি সনাতন। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতদ্ব্যতীত মুক্তির আর অন্য পন্থা নাই।"

টীকায় শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।" সুতরাং এ-স্থলে বিষ্ণু-শব্দে শঙ্খচক্রগদাধর চতুর্ভুজ নারায়ণকেই বুঝাইতেছে। পরব্রহ্মই যে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বিরাজিত, সুতরাং চতুর্ভুজ নারায়ণ যে পরব্রহ্মেরই আবির্ভাব-বিশেষ বা অংশ, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

উপরে উদ্ধৃত নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদ্‌বাক্যে একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে। এই বাক্যে যে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তিনি যে চতুর্ভুজ, তাহার উল্লেখ নাই। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ কিন্তু চতুর্ভুজ। পরন্তু এই শ্রুতিবাক্যে দেবকীপুত্রই যে পরব্রহ্ম নারায়ণ—এইরূপ উল্লেখ থাকায় নারায়ণরূপ পরব্রহ্ম যে দ্বিভুজ দেবকীপুত্র—সুতরাং গোপালতাপনীপ্রোক্ত গোপীজনবল্লভ (গোপালতাপনীতে গোপীজনবল্লভকে দেবকীপুত্রও বলা হইয়াছে)—তাহা পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের পরব্রহ্মত্ব যে শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, পরন্তু গোপীজনবল্লভ দেবকীপুত্রের পরব্রহ্মত্বই যে শ্রুতির অভিপ্রেত—ইহা দ্বারা তাহাই পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় * * * ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়"—ইত্যাদি বাক্যে, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণই যে দেবকীপুত্র, তাহাও গোপালোত্তরতাপনীশ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রুতিতে **পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হইল কেন?**

নারায়ণ-শব্দের অর্থ-বিচার করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে নারায়ণের একটী লক্ষণ বলা হইয়াছে—"যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ—যাঁহাতে সমস্ত লোক ওত-প্রোতভাবে—বস্ত্রে সূত্রের ন্যায় ওত-প্রোতভাবে—অবস্থিত, তিনি নারায়ণ।" ইহা হইতে জানা গেল—সর্ব্বাশ্রয়ত্বই নারায়ণের লক্ষণ।

বস্ত্রের মধ্যে সূত্রের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণে যে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, শ্রীশুকদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুম্বঙ্গ যথা পটঃ॥ শ্রীভা. ১০।১৫।৩৫॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতির নিম্নলিখিত শ্লোকে নারায়ণ-শব্দের অর্থ পরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥
শ্রীভা. ১০।১৪।১৪॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদায়তি। কুতোঽয়ং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি। এবমপি ত্বং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোঽয়নং আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মত্বাৎ নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকুঃ অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ ইতি স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ ত্বমখিললোকসাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতো নারম্ অয়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ। ভবেদেবং অন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ নারায়ণোহঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্বিংশতি-তত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। তথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি।"

কি কি কারণে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। টীকা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের হেতু কয়টী এই ঃ—

(১) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদেহীর আত্মা বলিয়া নারায়ণ।

(২) জীবসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অয়ন ( আশ্রয় ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ। এ-স্থলে অয়ন-অর্থ—আশ্রয়। পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের মধ্যে আছেন বলিয়া জীবসমূহ হইতেছে তাঁহার আশ্রয়। ইহা প্রথম অর্থেরই বিবৃতি।

(৩) নারসমূহের ( চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ) প্রবর্ত্তক ( অধীশ ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নারায়ণ। মহৎ-স্রষ্টা পুরুষরূপে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ। মহৎ-স্রষ্টা প্রথম পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাও ইহাতে সূচিত হইয়াছে। এ-স্থলে অয়ন-অর্থ—প্রবর্ত্তন।

(৪) অখিল-লোকসাক্ষী বলিয়া, অর্থাৎ অখিল-লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করেন বা জানেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ। ইহা নারায়ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এ-স্থলে অয়ন-শব্দের অর্থ—দর্শন বা জানা।

প্রশ্ন হইতে পারে—উপরে নারায়ণের যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত নারায়ণ তো অন্য প্রসিদ্ধ নারায়ণ ? যেমন—যিনি সর্ব্বজীবের আত্মা বলিয়া সমস্ত জীব যাঁহার আশ্রয়, তিনি ক্ষীরাব্ধি-শায়ী নারায়ণ—তৃতীয় পুরুষ। অখিল-লোকের—প্রতিলোকের (ব্রহ্মাণ্ডের)—দ্রষ্টা রূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যিনি

অবস্থিত, তিনি গর্ভোদশায়ী নারায়ণ—দ্বিতীয় পুরুষ। আর, চতুর্বিবংশতি-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক যিনি, তিনি কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, মহৎস্রষ্টা—প্রথম পুরুষ। ইঁহারাই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ। যেহেতু, ইঁহারাই "নরভূজলায়ন"—ইঁহাদেরই আশ্রয় নরভূজল। স্বামিপাদের উদ্ধৃত স্মৃতিপ্রমাণ অনুসারে "নরভূজল"-শব্দের অর্থ হইতেছে—চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব এবং জল ( কারণার্ণবের জল, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জল এবং ক্ষীরোদক বা ক্ষীরোদসমুদ্রস্থ জল )। উল্লিখিত তিন পুরুষ এই জলে অবস্থিত বলিয়া জল বা নারা ( আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ ) হইল তাঁহাদের অয়ন বা আশ্রয় ; তাই তাঁহারাই নারায়ণ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর ব্রহ্মাই দিয়াছেন—"নারায়ণোঽঙ্গম্"-বাক্যে। সেই-সেই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ। এই পুরুষত্রয় যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ,—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥"—এই সাত্বত-তন্ত্র-বচন হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই নারায়ণত্রয়ের অংশী বলিয়া তিনিই মূল নারায়ণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা গেল—যিনি সর্ববান্তর্য্যামী, সকলের মধ্যে যিনি অবস্থিত, যিনি মহদাদি চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের প্রবর্ত্তক, তিনি নারায়ণ।

গোপালতাপনী এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে নারায়ণত্বের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণেও বিদ্যমান, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। গীতার কয়েকটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখান হইতেছে।

গীতার "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ ॥ ১০।২০ ॥", "সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৫।১৫ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সর্ববান্তর্য্যামিত্বের, "মৎস্থানি সর্ববভূতানি ॥ ৯।৪ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববাশ্রয়ত্বের ( সকলের আশ্রয়ত্বের ), "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬ ॥", "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥ ৯।১০ ॥", "অহং সর্ববস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ত্ততে ॥ ১০।৮ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্বব-প্রবর্ত্তকত্ব, "ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭ ॥", "বাসুদেবঃ সর্ববমিতি ॥ ৭।১৯ ॥", "ময়া ততমিদং সর্ববম্ ॥ ৯।৪ ॥", "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্। ইত্যাদি ॥ ৯।১৬-১৯ ॥", "অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০ ॥", "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববাত্মকত্ব এবং "সর্ববভূতস্থিতং যো মাম্ ॥ ৬।৩১ ॥", "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত ॥১৩।৩॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার সর্ববমধ্যাবস্থিতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার "বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥ ৭।১০ ॥", "যচ্চাপি সর্ববভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ॥ ১০।৩৯ ॥, "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৮ ॥" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জগদ্-বীজত্বের কথা এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ॥ ১০।১২ ॥", "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥ বেদ্যং পবিত্র-মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ৯।১৭ ॥", "বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥"-ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার পরব্রহ্মত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের কথা এবং পরব্রহ্মত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্যতীত পরব্রহ্মত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥"—এই ব্রহ্ম-পরিচায়ক সূত্রে পরব্রহ্মের নারায়ণত্বের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, তিনিই সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আশ্রয়, সকলও তাঁহার আশ্রয় এবং তিনিই সর্ব্বাত্মক। এজন্যই নারায়ণাথর্ব্ব-শির-উপনিষৎ নারায়ণ-শব্দে পরব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—একাধিক ভগবৎ-স্বরূপেরই নারায়ণ নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; যেমন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। আবার শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের লক্ষণ বিদ্যমান্ বলিয়া তিনিও নারায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে **কোন্ নারায়ণ পরব্রহ্ম ?**

নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। এই শ্রুতি প্রথমে নারায়ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"এতদ্ ঋগ্বেদশিরোঽধীতে—ঋগ্বেদশিরঃ বা ঋগ্বেদ—একথা বলেন।" তাহার পরে আবার নারায়ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"এতদ্ যজুর্বেদশিরোঽধীতে—যজুর্বেদশিরঃ বা যজুর্ব্বেদ—একথা বলেন।" ইহাতে বুঝা যায়—ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ—এতদুভয়ই নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ নারায়ণ ? এই প্রশ্নের উত্তর-রূপেই সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ"—ব্রহ্মণ্যদেব দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সেই নারায়ণ। ইহাই অথর্ব্ববেদান্তর্গত এই শ্রুতির মীমাংসা।

এই মীমাংসাদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে—দেবকীপুত্ররূপ নারায়ণেই নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ; তাই তিনি পরব্রহ্ম। ইহা দ্বারা ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে—নারায়ণাখ্য অপর স্বরূপসমূহ নারায়ণ হইলেও তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের মধ্যেও—নারায়ণত্বের পূর্ণতম বিকাশ নাই।

এই শ্রুতিবাক্যে দেবকীনন্দনরূপ নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলায়, ইহাও সূচিত হইতেছে যে—পরব্রহ্ম দ্বিভুজ, নর-অভিমানী এবং নরলীল।

গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে জানা যায়—যে নারায়ণ ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-ভগবৎ-স্বরূপ-শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং পরব্রহ্মত্বের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। বিবরণটী এইরূপ।

গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতি হইতে জানা যায়—এক সময়ে ব্রজস্ত্রীগণ দুর্ব্বাসা-ঋষির নিকটে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্ঠঃ—এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম।" ইনিই জীবরূপে ভোক্তা, জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে সাক্ষী—দ্রষ্টা। ইনি "জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গাঃ পালয়তি, যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে, যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি, স বো হি স্বামী ভবতি ॥—যিনি জন্মজরারহিত, স্থাণু, অচ্ছেদ্য, যিনি সৌর্য্যে (সূর্য্যমণ্ডলে, অথবা সূর্য্যকন্যা যমুনার অদূরবর্ত্তী দেশে) অবস্থিত, যিনি ধেনুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত, যিনি গো-পালন করেন, যিনি গোপগণের মধ্যে অবস্থিত, যিনি সকল বেদে অবস্থিত, সমস্ত বেদ যাঁহার (গুণ-মহিমাদি)

কীর্ত্তন করেন, যিনি ভূত সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিধান করেন, সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।”

ইহার পরে ব্রজস্ত্রীগণের মধ্যে মুখ্যা গান্ধর্ব্বী ( শ্রীরাধিকা ) দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ? তাঁহার সম্বন্ধে আপনার কথিত বিবরণ আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন ? তাঁহার উপাসনার মন্ত্রই বা কি ? তাঁহার ধ্যানই বা কি ? কেনই বা তিনি দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিলেন ? তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামই বা কে ? এই গোপালের পূজাই বা কিরূপ ? তিনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডেই বা অবতীর্ণ হইলেন কেন ?”

দুর্ব্বাসা-ঋষি গান্ধর্ব্বীর সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ তিনি কিরূপে জানিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুর্ব্বাসা বলিয়াছেন—ব্রহ্মা নারায়ণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, তৎসমস্ত তিনি স্বীয়পুত্রদিগের নিকটে এবং নারদের নিকটে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটেই দুর্ব্বাসা এই সকল বিবরণ শুনিয়াছেন।

ব্রহ্মা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বা অস্য অবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি॥ —যাঁহা হইতে লোকসকল এবং দেবসকল তুষ্ট হয়েন, যাঁহার স্মরণে লোকসকল সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন, অবতার-সমূহের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ অবতার কে ? সেই শ্রেষ্ঠ অবতারের ব্রহ্মতাই ( স্বয়ং-ভগবত্ত্বাই বা ) কিরূপে সিদ্ধ হয় ?”

ইহার উত্তরে গোপাল-শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বয়ংভগবত্তা বা পরব্রহ্মত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তাঁহার ধামের শ্রেষ্ঠত্বের এবং ধামের ব্রহ্মত্বের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—তাঁহার সাতটী পুরী আছে, তন্মধ্যে গোপালপুরী ( গোকুল ) হইতেছে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। “ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি, তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি॥” এইরূপে ধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সাক্ষাৎ-ব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া ধামাধিপতি গোপালেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠাবতারত্ব এবং পরব্রহ্মত্ব খ্যাপন করা হইল।

ইহার পরে গোপালপুরীর বিশেষ বিবরণও দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের মধ্যে বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ—যে দ্বারকাতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ( বলরাম ), প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহরূপে স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত বিহার করেন, তাহাও শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন।

তাহার পরে শ্রীনারায়ণ বলিয়াছেন—“ওঁ তদ্‌যৎ তৎ সৎ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপমিত্যাদি—ওঁ তৎ-এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য হইতেছেন পরব্রহ্ম কৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দৈকরূপ, ইত্যাদি।”

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূজামন্ত্রসম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত কয়টী বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

“ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ॥”

"ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি ॥"
"ওঁ যোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি।"
"ওঁ যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ-ইত্যাদি ॥"
"ওঁ যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
"ওঁ যোঽসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
"ওঁ যোঽসৌ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ-ইত্যাদি।"
"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥"

এই সমস্ত উক্তি হইতে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের এবং পরব্রহ্মত্বের কথা জানা যায়। এই সমস্তই হইতেছে ব্রহ্মার নিকটে শ্রীনারায়ণের উক্তি। সুতরাং স্বয়ং নারায়ণই যে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্ম এবং পরম-নারায়ণ বলিয়া গিয়াছেন, গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে তাহাই জানা গেল।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। যাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে সমস্তেরই জ্ঞান লাভ হয়, তিনিই পরব্রহ্ম—ইহাই সমস্ত শ্রুতি একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিভুজ গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণের—যাঁহাকে শ্রুতিই "নারায়ণ" বলিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের—গোপীজন-বল্লভের, জ্ঞানেই যে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয়, ইহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের জ্ঞানে যে সর্ব্বজ্ঞান হয়, ইহা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। সুতরাং নারায়ণ্যাখ্য শ্রীকৃষ্ণ, বা শ্রীকৃষ্ণাখ্য নারায়ণই যে পরব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-নারায়ণ-সংবাদে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—

বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥
নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ শ্রীভা. ২।৫।১৪-১৬॥"

এই সকল শ্লোকে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকেই "নারায়ণ"-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে. "বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্"-ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে শ্রেষ্ঠ যে অপর কোনও বস্তু তত্ত্বতঃ নাই, তাহাও উক্ত শ্লোকার্দ্ধে বলা হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে অপর ভগবৎ-স্বরূপকেও পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যেমন, শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ১৬॥"

ইহার সমাধান এই। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক মায়াতীত প্রকাশই, হইতেছেন সচ্চিদানন্দ এবং সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু এবং নিত্য। "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ।" ব্যাপকত্বে, অনন্তত্বে এবং সচ্চিদানন্দত্বে প্রত্যেক স্বরূপই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তুল্য; কিন্তু পরব্রহ্মত্বের সারবস্তু রসত্বে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের তুল্য নহেন। কেবল ব্যাপকত্বাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীরামচন্দ্রাদিকে পরব্রহ্ম বলা হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিবাক্যের "অনন্তে", "নিত্যানন্দে" এবং "চিদাত্মনি" শব্দসমূহ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণের মধ্যেও বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ সম্বন্ধে "পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১৯।১৭৭॥"—তাঁহারাও শ্রীনারায়ণকে "পরংব্রহ্ম পরমাত্মা" বলিয়া মনে করেন। এ-স্থলেও পূর্ব্বোক্তভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শ্রীনারায়ণে "পরব্রহ্ম পরমাত্মা"-শব্দের প্রয়োগ। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই "ভগবান্"-শব্দবাচ্য হইলেও—পূর্ণতম ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠান বলিয়া এবং সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া পরব্রহ্মভূত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ—একথা বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। সর্ব্বভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪-৭৬ ॥"

শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই "ভগবান্"-শব্দের মুখ্য বাচ্য; অন্য ভগবৎ-স্বরূপে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ বলিয়া অন্য ভগবৎ-স্বরূপে "ভগবান্"-শব্দের গৌণ প্রয়োগ। তদ্রূপ, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে রসস্বরূপত্বাদি-পরব্রহ্ম-লক্ষণের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া তিনিই হইতেছেন "পরব্রহ্ম"-শব্দের মুখ্য বাচ্য; অন্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহে পরব্রহ্ম-লক্ষণের আংশিক বিকাশ বলিয়া অন্য ভগবৎ-স্বরূপে "পরব্রহ্ম"-শব্দের গৌণ প্রয়োগ। ইহাই নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদের সহিত সামঞ্জস্যময় সিদ্ধান্ত।

অথর্ব্ববেদান্তর্গত নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে-যে স্থলে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে-সে স্থলে নারায়ণ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

**মহানারায়ণোপনিষদেও** বলা হইয়াছে—

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৬।৪ ॥"

আবার, **মহোপনিষদেও** বলা হইয়াছে—

"একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো
নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ ॥ ১।১ ॥"

এই দুইটী উপনিষদ্‌ও অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে এই দুই উপনিষদুক্ত নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণই। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥"

**গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি** স্পষ্ট কথাতেই শ্রীকৃষ্ণের স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়াছেন।

"কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ২।১২ ॥"

এই সমস্ত কারণে শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখা যায়, উদ্ধব নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে "নারায়ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা শ্লাঘ্যতম; যেহেতু, অখিল-গুরু নারায়ণে তোমাদের এতাদৃশী মতি।

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতির্‌দৃশী ॥ শ্রীভা. ১০।৪৬।৩০ ॥

আবার, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণকে **"স্বয়ং-নারায়ণ"** বলিয়াছেন। লোমহর্ষণ-নন্দন সূতের নিকটে ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণকথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে সূতমহাশয় অম্বরীষ-নারদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—এক সময়ে দেবর্ষি নারদ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার উদ্দেশ্যে মহারাজ অম্বরীষও তখন মথুরায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেবর্ষির যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যন্মুনে পরমং ব্রহ্ম বেদবাদিভিরুচ্যতে।
স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্বয়ং নারায়ণঃ পরঃ ॥ পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড ॥ ৫৩।১০ ॥

—হে মুনে! বেদবাদী মহর্ষিগণ যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনিই পরদেবতা পুণ্ডরীকাক্ষ স্বয়ং নারায়ণ।"

ইহার পরে অম্বরীষ বলিয়াছিলেন—"তিনিই সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য, ধ্যাতব্য। তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তিনিই ব্রহ্মাকে রচনা করিয়া তাঁহাকে বেদাদি-শাস্ত্র জানাইয়াছিলেন। যোগীদিগেরও দুর্জ্ঞেয় সমস্ত-পুরুষার্থ-প্রদ সেই গোবিন্দের আরাধনা কিরূপে করিতে হয়, দয়া করিয়া তাহা বলুন। কেন না, গোবিন্দের আরাধনা না করিলে অভয়পদ পাওয়া যায় না এবং তপস্যা-যজ্ঞ-দানাদির উত্তম ফলও পাওয়া যায় না। সেই গোবিন্দের পাদপদ্ম-রসাস্বাদন না করিয়া লোক কিরূপেই বা অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে ?

অনারাধিতগোবিন্দো ন বিন্দতে যতোঽভয়ম্।
ন তপোযজ্ঞদানানাং লভতে ফলমুত্তমম্ ॥
অনাস্বাদিত-গোবিন্দ-পাদাম্বুজ-রসো নরঃ।
মনোরথকথানীতং কথমাকলয়েৎ ফলম্ ॥ পদ্মপুরাণ-পাতাল খণ্ড ॥ ৫৩।১৫-১৬ ॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—অম্বরীষ মহারাজ শ্রীগোবিন্দকেই "স্বয়ং-নারায়ণ" এবং "পরব্রহ্ম" বলিয়াছেন। তাঁহাকে "স্বয়ং-নারায়ণ" এবং "পরব্রহ্ম" বলার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও অংশী, পরব্যোমাধিপতি-আদি নায়ায়ণ-সমূহের নারায়ণত্বের মূল হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ; এজন্য তিনি "স্বয়ং-নারায়ণ।"

এইরূপে, শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ; সুতরাং তিনি কাহারও অংশ বা অবতার হইতে পারেন না। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণাদি অপর ভগবৎ-স্বরূপগণই তাঁহার অংশ, তিনি সকলের অংশী। তিনিই স্বয়ং-ভগবান্, তিনিই স্বয়ং-নারায়ণ, তিনিই পরম-ঈশ্বর, সর্ব্বকারণ-কারণ, অনাদি, অথচ সকলের আদি বা মূল। ব্রহ্মাও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।১॥"

## ১৭৮। সমস্ত ভগবন্নাম শ্রীকৃষ্ণ-নামের অন্তর্ভূত

শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি ১০।৮।৯-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে—"মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহা-নাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি যুক্তঞ্চ বিশেষ্যরূপস্য তস্য অন্য-নামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলমঙ্গলানামিত্যাদৌ সকলনিগমবল্লীসৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্।"

মর্ম্মার্থ। কৃষ্ণ-নামই মুখ্য-নাম। "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দ"-ইত্যাদি বচনোক্ত-নিরুক্তি হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববৃহত্তম আনন্দ, অন্য সমস্তই তাঁহার অন্তর্ভূত। সুতরাং তাঁহার কৃষ্ণ-নাম যে মহানাম, তাহা স্বাভাবিকই। প্রণবের মধ্যে যেমন বেদ অবস্থিত, তদ্রূপ কৃষ্ণ-নামের মধ্যেই অন্যান্য (ভগবৎ-স্বরূপের) নাম এবং কৃষ্ণরূপেতেই অন্যান্য ( ভগবৎ-স্বরূপের ) রূপ অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণনাম বিশেষ্যস্থানীয়, অন্যান্য নাম তাহার বিশেষণস্থানীয়। প্রভাস-পুরাণে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণনাম মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল-সমূহেরও মঙ্গল, সমস্ত নিগমরূপ-লতিকার সৎফলস্বরূপ এবং চিৎ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"হে পরন্তপ! সমস্ত নামের মধ্যে আমার 'কৃষ্ণনাম'ই মুখ্যতর।" এই নাম এবং এই নামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।

বিশেষতঃ, "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব এবং গোপালতাপনীশ্রুতিঃ॥"—এই প্রমাণ অনুসারে "কৃষ্ণ" হইতেছে পরব্রহ্ম-বাচক নাম। পরব্রহ্মে যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অন্তর্ভূত, তেমনি পরব্রহ্ম-বাচক কৃষ্ণনামের মধ্যেও সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নাম অন্তর্ভুক্ত।

ইহা হইতে জানা গেল—অন্য সমস্ত ভগবন্নাম—সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নামও—শ্রীকৃষ্ণ-নামেরই অন্তর্ভুক্ত। নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া, নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশ—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ হইতে পারেন না।

## ১৭৯। পরব্রহ্মে সকল ভগবন্নামের প্রয়োগ

পরব্রহ্মই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন এবং বিভিন্ন রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন; সুতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলা যেমন বস্তুতঃ পরব্রহ্মেরই লীলাবিশেষ, তেমনি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের নামও পরব্রহ্মেরই নাম-বিশেষ।

নামাপরাধ-কথন-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।৮৩-ধৃত পাদ্মপ্রমাণ॥—যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর এবং শ্রীশিবের (উপলক্ষণে অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের) গুণ-নামাদিকে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকটে অপরাধ করিয়া থাকে।" শ্রীবিষ্ণুর নাম এবং শ্রীশিবাদি অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের নাম যে অভিন্ন, তাহাই এই প্রমাণে পাওয়া গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য প্রথমে বলিয়াছেন—"নন্দ মহারাজের এই সন্তানটী বিভিন্ন যুগে শুক্ল-রক্তাদি বিভিন্ন রূপে এবং নামে অবতীর্ণ হয়েন।" ইহার পরে "কৃষ্ণ ও বাসুদেব" এই দুইটী নামের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণ-কর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা. ১০।৮।১৫॥

—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণ-কর্ম্মানুসারে বহু নাম এবং বহু রূপও আছে। সে-সমস্ত (অনন্ত বলিয়া) আমিও জানি না, লোকেও জানে না।"

এই শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন—গুণানুরূপাণি শ্রীনরনারায়ণ-নৃসিংহাদীনি, কর্ম্মানুরূপাণি মৎস্যাদীনি।" ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীনরনারায়ণ-নৃসিংহাদি এবং মৎস্যকূর্ম্মাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-বিশেষ। ইহার হেতু এই যে, নারায়ণ-নৃসিংহাদি এবং মৎস্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণই লীলা করিতেছেন।

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"অথ যথেয়ং কৌৎসায়নী স্তুতিঃ—ত্বং ব্রহ্মা ত্বং চ বৈ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বমগ্নির্বরুণো বায়ুস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ॥ ত্বমন্নস্ত্বং যমস্ত্বং পৃথিবী ত্বং বিশ্বং ত্বমথাচ্যুতঃ। স্বার্থে স্বাভাবিকেঽর্থে চ বহুধা সংস্থিতিস্ত্বয়ি॥ বিশ্বেশ্বর নমস্তুভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ম্মকৃৎ। বিশ্বভুগ্‌বিশ্বমায়ুস্ত্বং বিশ্বক্রীড়ারতিপ্রভুঃ॥ নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহ্যতমায় চ। অচিন্ত্যায়াপ্রমেয়ায় অনাদিনিধনায়চেতি॥ মৈত্রায়ণী-শ্রুতিঃ॥ ৫।১॥"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, বরুণাদি যেমন পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ, তেমনি তাঁহার বিভিন্ন নামও।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অংশীতে অংশের নামের প্রবৃত্তি আছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনা করা যাউক। নারায়ণ, অচ্যুত, বিষ্ণু, কেশব, মাধব প্রভৃতি নাম পরব্যোমাধিপতিতেও প্রযুক্ত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণেও প্রযুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন—"তোমরা শ্লাঘ্যতম; যেহেতু, অখিলগুরু নারায়ণে তোমাদের এতাদৃশী মতি বিদ্যমান।

"যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥ শ্রীভা. ১০।৪৬।৩০ ॥"

ইহাতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে যে মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, এইরূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরং এইরূপ প্রমাণই দৃষ্ট হয় যে, যশোদা-নন্দনেই কৃষ্ণনামের রূঢ়ি প্রয়োগ। "তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে। কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ নামকৌমুদী ॥—যিনি তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং যিনি শ্রীযশোদার স্তন্যপায়ী, তাঁহাতেই কৃষ্ণনামের রূঢ়ি—প্রসিদ্ধ—অর্থ, ইহাই সমস্ত শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।"

যদি কেহ বলেন যে, "অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ।—অজামিল যমদূত ও কৃষ্ণদূতগণের কথোপকথন শুনিয়া"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।২৪-শ্লোকে বিষ্ণুদূতগণকে "কৃষ্ণদূত" বলা হইয়াছে। তাহাতেই বুঝা যায়—এস্থলে বিষ্ণুকে ( অর্থাৎ নারায়ণকে ) "কৃষ্ণ" বলা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনারায়ণরূপে লীলা করেন বলিয়া শ্রীনারায়ণের লীলাও যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা, তেমনি শ্রীনারায়ণের পরিকর দূতগণও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পরিকর—দূত। ইহাই এ-স্থলে "কৃষ্ণদূত"-শব্দের তাৎপর্য্য। নারায়ণকে কৃষ্ণ বলাই এ-স্থলে মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যশোদা-নন্দনেই কৃষ্ণনামের রূঢ়ি-প্রয়োগ।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণ আছেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হয়; কিন্তু নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হয় না; কোনও স্থলে প্রকারান্তরে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলা হইলেও কৃষ্ণনামের রূঢ়িবৃত্তি নারায়ণে নহে, রূঢ়িবৃত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা আবির্ভাব-বিশেষই হইতেছেন শ্রীনারায়ন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশ বা আবির্ভাব নহেন।

ব্রহ্মসংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫।৪৩ ॥

—গোলোক-নামক নিজধামে এবং তাহার তলে অধোধঃস্থিত হরিধামে ( নারায়ণের ধামে ), মহেশধামে এবং দেবীধামে সেই সেই প্রভাব-নিচয় যৎকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেই গোবিন্দকে আমি ( ব্রহ্মা ) ভজন করি।"

ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীনারায়ণের ধাম পরব্যোম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম গোলোকের নিম্নে অবস্থিত এবং পরব্যোমের প্রভাবাদিও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই বিহিত। এই ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তস্যাপি কৃষ্ণাবির্ভাবত্বাভিধানাৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥ ২।১৭ ॥—তিনিও ( পরব্যোমাধিপতি নারায়ণও ) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া।" এই অনুচ্ছেদের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণ এব নারায়ণঃ সন্ পরমে ব্যোম্নি সর্ব্বদা দীব্যতীতি স তস্যাবির্ভাব ইতি স্ফুটমেবোক্তম্।—শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণরূপে পরব্যোমে সর্ব্বদা বিরাজিত; সুতরাং নারায়ণ যে কৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।"

সিদ্ধান্তরত্নের ২।১৮ অনুচ্ছেদেও লিখিত হইয়াছে—"ইদন্তু বোধ্যম্। গোলোকে নিবসন্ কৃষ্ণস্তদাবির্ভাবে পরব্যোম্নি তদধিপতিঃ শ্রীনিবাসঃ পুরুষাভিধানো রামাদিশ্চ অনাদিত এবাবির্ভূতো দীব্যতি।—এ-স্থলে এই তত্ত্ব বোধিত হইতেছে—গোলোকবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের আবির্ভাবভূত পরব্যোমে তদধিপতি পুরুষাভিধান শ্রীনিবাস ( লক্ষ্মীপতি নারায়ণ )-রূপে ও শ্রীরামাদিরূপে অনাদিকাল হইতে আবির্ভূত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।"

ব্রহ্মসংহিতার বাক্যও এই উক্তির সমর্থন করিতেছে।

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

## ১৮০। বৈকুণ্ঠেশ্বরাদির লীলা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্ভুক্ত

বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং স্বাংশ-স্বরূপ অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্গত-লীলারূপে প্রকটিত হইয়াছে, লঘুভাগবতামৃতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে লঘুভাগবতামৃতের বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

"অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে ॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে। সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা ॥
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা। বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরাদ্বারকাদিষু ॥
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তস্তু বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ। যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ ॥
আদিত্যেষ্বথ লব্ধেষু বভৌ দ্বাদশভির্ভুজৈঃ। তথা সাঙ্কর্ষণী লীলা দৈত্যসংহারিকাপি চ ॥
মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ। যাঃ শ্রীগোপালতাপন্যাং বারাহাদিষু চ শ্রুতাঃ ॥
এবং পুরুষলীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে। অনন্তশায়িরূপাভিঃ ক্রিয়তে সুষ্ঠু মূর্ত্তিভিঃ ॥
যদা যদা চ সা লীলা কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতা। ভবেৎ তত্তদুপাখ্যানং পুরাণেষ্বিতি বিশ্রুতম্ ॥
যানি রামাদিরূপাণি প্রাদুশ্চক্রে স্বকেলিষু। তান্যধিষ্ঠানরূপেণ রাজন্তেঽদ্যাপি মাথুরে ॥
গোপরার্দ্ধপয়ঃপূরৈর্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ। মমন্থাজিতরূপস্তং গোপৈর্দেবাসুরীকৃতৈঃ ॥

—কৃষ্ণামৃত। ॥৬৪৯-৫৬॥

—তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপগণের লীলা বৃন্দাবন-লীলাতে প্রকটিত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মমোহন-লীলাতে বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনে ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণের সহিত যে অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এই লীলাই সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা, তিনি স্বীয় স্বাংশবর্গের দ্বারা ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। দ্বারকা-মথুরাদিতে বাসুদেবাদির যে লীলা, তাহা ব্রজমধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যলীলায় প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন, শ্রীদাম-নামক গোপবালক গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণও চতুর্ভুজত্ব প্রকট করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দ্বাদশাদিত্য আসিয়া একই সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও দ্বাদশভুজ প্রকটিত করিয়া যুগপৎ তাঁহাদের মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন। দৈত্যসংহার-কারিণী সাঙ্কর্ষণী লীলাও তিনি ব্রজমধ্যে প্রকটিত করিয়াছিলেন। মথুরাধামে যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধ নিত্য বিদ্যমান, শ্রীগোপাল-তাপনীশ্রুতি হইতে এবং বরাহপুরাণাদি হইতে তাহাও জানা যায়। অনন্তশয্যাশায়ি-রূপসমূহদ্বারা মথুরাধামে পুরুষাবতারসমূহের লীলাও তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন যখন যে যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করিয়াছেন,পুরাণাদি-শাস্ত্রে সেই সেই লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় লীলায় রাম-নৃসিংহাদি যে সমস্ত রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, অধিষ্ঠান ( বিগ্রহ )-রূপে সে সমস্ত রূপ এখনও মথুরাধামে বিরাজিত আছেন। অসংখ্য গাভীসমূহের দুগ্ধরাশিদ্বারা বৃন্দাবনে ক্ষীরসমুদ্র আবির্ভূত করাইয়া গোপবালকদিগকে দেবতা ও অসুর-রূপে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে অজিতরূপে সমুদ্রমন্থন-লীলাও প্রকটিত করিয়াছিলেন।”

ইহার পরে লঘুভাগবতামৃত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—“যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্বাহু-রূপে, যিনি শ্বেতদ্বীপে শ্বেতদ্বীপেশ তৃতীয়পুরুষরূপে, যিনি ( বদরিকাশ্রমে ) নর-নারায়ণরূপে বিরাজিত, সেই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন। এই নন্দ-নন্দনেরই আরও অনন্ত মনোহর অবতার ( স্বরূপ ) আছেন। মহদগ্নিরাশি হইতে যেমন শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, তেমনি ( সর্ব্বাবতারী ) এই নন্দ-নন্দন হইতে অসংখ্য অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়েন।”

> “যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ।
> স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দ-নন্দনঃ॥ এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ।
> মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ। তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ইতি॥
> —লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃত ( ৬৫৭-৫৮ ) ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রমাণ॥”

এইরূপে দেখা গেল—পরব্যোমাধিপতির লীলাও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তঃপাতিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—পরব্যোমাধিপতিও শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভূত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

কিন্তু নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের লীলার অন্তর্ভুক্ত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের অংশরূপে নারায়ণের মধ্যে বর্ত্তমান, তৎসম্বন্ধে প্রমাণাভাব।

## ১৮১। বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতা কৃষ্ণাদি

পাদ্মোত্তর-খণ্ডে বৈকুণ্ঠের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাদের মধ্যে গোবিন্দ, দামোদর, কৃষ্ণ ইত্যাদিও আছেন। ব্রজবিহারী নন্দ-নন্দনেরও এই কয়টী নাম আছে। তাহা হইলে কি বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাই ব্রজের কৃষ্ণ ?

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। "গোবিন্দ"-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৬৫॥"; "দামোদর"-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"রাধাদামোদর—অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৭০॥" আবরণ-দেবতা "কৃষ্ণ"ও অন্য এক ভগবৎ-স্বরূপ, তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নহেন।

আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন নহেন, তাহার কয়েকটী হেতুও আছে। হেতুগুলি এই ঃ—

(ক) আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ হইতেছেন চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। "শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রধর॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২০৪ (সিদ্ধান্ত-সংহিতার প্রমাণ)।" কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ দ্বিভুজ; তাঁহার শঙ্খ-চক্রাদি কোনও অস্ত্র নাই।

(খ) সিদ্ধান্ত-সংহিতার মতে আবরণ-দেবতা "গোবিন্দও" চতুর্ভুজ এবং "দামোদরও" চতুর্ভুজ। (শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১৯৭, ২০১)। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন "গোবিন্দ" এবং ব্রজেন্দ্র-নন্দন "দামোদর" হইতেছেন দ্বিভুজ, চক্রাদিহীন।

(গ) বৈকুণ্ঠের আবরণে—অগ্নিকোণে আছেন "গোবিন্দ", নৈঋতকোণে আছেন "দামোদর" এবং ঈশান-কোণে আছেন "কৃষ্ণ।" (পদ্মপুরাণ)। সেই-সেই স্থানে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ধামও আছে। এই সমস্ত ধাম পরব্যোমেরই অন্তর্ভুক্ত। পরব্যোমের অধিপতি হইতেছেন শ্রীনারায়ণ। "নারায়ণ"-নামেও এক আবরণ-দেবতা আছেন—পূর্ব্বদিকে তাঁহার ধাম। সহজেই বুঝা যায়—এই আবরণ-দেবতা নারায়ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ নহেন; কেননা, কোনও ভগবৎ-স্বরূপই নিজরূপে নিজের আবরণ-দেবতা হইতে পারেন না। আবরণ-দেবতাগণ—যাঁহার আবরণ, তাঁহারই অংশ-প্রকাশ। কেশব, অচ্যুত, হৃষীকেশ, জনার্দ্দন প্রভৃতির নামও আবরণ-দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাঁহারাও পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরই অংশ-স্বরূপ। তদ্রূপ, আবরণ-দেবতা গোবিন্দ, দামোদর এবং কৃষ্ণও অব্যবহিত-ভাবে শ্রীনারায়ণেরই অংশ-স্বরূপ। তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ যদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে পরব্যোমের বহির্ভাগে কোনও ধামে লীলা করেন, তাহা হইলে সেই ধামেও তাঁহারা স্বরূপতঃ শ্রীনারায়ণের অংশ-স্বরূপই থাকিবেন। সুতরাং সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ধাম পরব্যোমের উপরে অবস্থিত হইতে পারে না; যেহেতু, এতাদৃশ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ধাম যদি পরব্যোমের উপরিভাগেই অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পরব্যোম অপেক্ষা সেই ধামের এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ অপেক্ষা সেই ধামাধিপতি তাদৃশ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মাহাত্ম্যাধিক্য সূচিত হইবে; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; যেহেতু, তাদৃশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতেছেন স্বরূপতঃ নারায়ণের অংশ, তাঁহার মাহাত্ম্যও হইবে নারায়ণের

মাহাত্ম্যের অংশ—নারায়ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যূন এবং সেই ধামের মাহাত্ম্যও হইবে পরব্যোমের মাহাত্ম্যের অংশ—পরব্যোমের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ন্যূন।

কিন্তু হরিবংশের প্রমাণে জানা যায়—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম হইতেছে পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত—বৈকুণ্ঠের মধ্যেও নয়, বৈকুণ্ঠের নিম্নেও নয় ( গোলোক যে বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত, ১।১।১০৩ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী ১।১।১৮২ অনুচ্ছেদেও প্রদর্শিত হইবে )। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে—গোলোক-বিহারী ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ—বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেবতা কৃষ্ণ, দামোদর বা গোবিন্দের অবতার নহেন ; সুতরাং বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অংশাবতারও নহেন।

## ১৮২। গোলোকের স্থিতি-বিচার

হরিবংশ-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার পরে ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন ; ঐ স্তুতিতে গোলোকের স্থিতি ( বা অবস্থান ) বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রকৃত স্তুতিবাক্যের যথাশ্রুত অর্থে, গোলোকের অবস্থান-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বিচারসহ নহে ; তাহা কেন এবং কিরূপে বিচার-সহ নহে এবং ইন্দ্র-কৃত স্তুতির প্রকৃত অর্থ ই বা কি,—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা শ্রীপাদ-সনাতনকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। শ্রীপাদ-সনাতন স্বরচিত শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতগ্রন্থে ইন্দ্রকৃত স্তবের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া নিজেই তাহাদের—মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুরূপ—ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হরিবংশ হইতে শ্রীপাদ সনাতন ইন্দ্রকৃত স্তবের যে শ্লোকগুলি বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল ঃ—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।　তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ (ক)
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।　স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্॥ (খ)
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।　যাং ন বিদ্মো বয়ং পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহান্॥ (গ)
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্।　ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ॥ (ঘ)
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।　স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানং কৃতাত্মনা॥ (ঙ)
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্॥ (চ)—শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত। ২।৭।৮০-৮৫॥

শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ মোটামুটি এইরূপ ঃ—“স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত ব্রহ্মলোক ( সত্যলোক ) ; সেই ব্রহ্মলোকে চন্দ্র ( সোম ) ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি আছে। তাহার ( সেই ব্রহ্মলোকের ) উপরে গোলোক ( গবাং লোকঃ ) ; সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন ; গোলোক সর্ব্বগত, মহাকাশগত এবং মহান্ ; সেই গোলোকেও তোমার ( কৃষ্ণের ) তপোময়ী গতি—যাহার ( যে গতির ) তথ্য পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই। শম-দমাঢ্য সুকৃতকর্ম্মাদের গতি স্বর্গ ; তপোযুক্ত ব্যক্তিদের গতি ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক পরাগতি। গো-গণের গতি গোলোক—এই গতি দুরারোহা। এই গোলোক—যখন মৎকৃত ( ইন্দ্রকৃত ) উপদ্রবের দ্বারা পীড়িত হইতেছিল, হে কৃষ্ণ ! তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিয়াছ।”

উক্ত শ্লোক-সমূহ হইতে গোলোকের অবস্থান এইরূপ জানা গেল ঃ—স্বর্গের উপরে ব্রহ্মলোক ( বা সত্যলোক ), তাহার উপরেই গোলোক।

শ্রীপাদ সনাতনের টীকানুসারে বুঝা যায়,—এই যথাশ্রুত অর্থ এবং তদনুরূপ গোলোকের অবস্থান বিচারসহ নহে এবং এই যথাশ্রুত অর্থে শ্লোকসমূহেরও অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—এই সাতটী লোক আছে। ভূঃ হইল পৃথিবী ; স্বঃ হইল স্বর্গ ; সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক ( শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীপুরাণ-প্রমাণ )। এই সাতটী লোকের বাহিরে আছে প্রকৃতির আবরণ মাত্র—এই সকল আবরণ কোনও লোক বলিয়া অভিহিত হয় না।

সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক বলিতে সত্যলোক বুঝায় ; উদ্ধৃত শ্লোকগুলির যথাশ্রুত অর্থ ধরিলে (ক)-শ্লোক হইতে জানা যায়—সত্যলোকে চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি আছে ; কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে ; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৯১-৯২ এবং ২।৭।১০ শ্লোক হইতে জানা যায়—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির উপরে ধ্রুবলোক এবং ধ্রুবলোকের উপরে হইল মহর্লোক এবং তাহার উপরে হইল জনলোক ( বি, পু, ২।৭।১২-১৩ ) ; জনলোকের উপরে তপঃ-লোক ( বি, পু, ২।৭।১৪ ) ; তাহার উপরে হইল সত্যলোক ( বি, পু, ২।৭।১৫ )।

"সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ। সিতার্কতনয়াদীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্॥
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ। সর্ব্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব॥
বি, পু, ১।১২।৯১-৯২॥

ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ। মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ॥ বি, পু. ২।৭।১০॥
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ। একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ॥
দ্বে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামল-চেতসঃ॥
চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাৎ তপঃ স্মৃতম্। বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ॥
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে। অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥
বি, পু, ২।৭।১২-১৫।"

এই সমস্ত প্রমাণ-বলে জানা যায়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থান হইল সত্যলোকের অনেক নীচে সত্যলোকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি অসম্ভব। সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দে সত্যলোক বুঝাইতে পারে না। যথাশ্রুত অর্থে এইরূপ আরও অসঙ্গতি আছে।

শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী শ্লোকগুলির যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—(ক)-শ্লোকে স্বর্গ-শব্দে স্বর্লোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে ( অর্থাৎ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই পাঁচটী লোককে ) বুঝাইতেছে। ইহার হেতু এই ঃ—ভগবানের বিরাট-রূপের কল্পনায় শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৫।৩৮-৩৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভূর্লোক তাঁহার চরণ, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক ( স্বর্গ ) তাঁহার হৃদয়, মহর্লোক তাঁহার বক্ষঃ, জনলোক তাঁহার গ্রীবা, তপোলোক তাঁহার স্তনদ্বয় এবং সত্যলোক তাঁহার

মস্তক ; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রহ্মলোক সনাতন—সৃষ্টবস্তু নহে। শ্রীভা. ২।৫।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, সৃষ্ট-ভুবনসমূহদ্বারাই বিরাটের রূপ কল্পিত হইয়াছে ; সৃষ্ট ভুবনাদি সনাতন—অসৃজ্য —নহে ; সুতরাং ২।৫।৩৯-শ্লোকে "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-বলিয়া যে লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সৃষ্ট লোক নহে (অর্থাৎ এস্থলে ব্রহ্মলোক বলিতে প্রাকৃত সত্যলোককে বুঝায় না)—সুতরাং এই ব্রহ্মলোক বিরাট-রূপের অবয়বও নহে—ইহা সপ্তলোকের অতিরিক্ত একটী লোক এবং ইহা সপ্তলোকের ন্যায় প্রাকৃত একটি লোকও নহে। ইহা যদি সপ্তলোকের অতীত একটী অপ্রাকৃত লোকই হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত সপ্তলোকের উপরেই ইহার অবস্থান হইবে ; প্রাকৃত সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই হইল উচ্চতম লোক ; তাহা হইলে এই সনাতন-ব্রহ্মলোক হইবে সত্য লোকেরও উপরে। অথচ হরিবংশের (ক)-শ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মলোক-শব্দের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোক-শব্দে যথাশ্রুত-অর্থানুসারে সত্যলোক বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করিলে শ্লোকের অর্থসঙ্গতি থাকে না ; অথচ সত্যলোক ব্যতীত সপ্তলোক-মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনও লোককেও ব্রহ্মলোক বলা হয় না ; সুতরাং (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সপ্তলোকের বহির্ভূত কোনও লোকই হইবে ; এবং সপ্তলোকের বহিরাবরণাদিকে যখন কোনও লোক নামে অভিহিত করা হয় না, তখন বহিরাবরণকেও ব্রহ্মলোক বলা যায় না ; তাহা হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত—সুতরাং অপ্রাকৃত—অসৃজ্য কোনও লোককেই বুঝাইবে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়—শ্রীভা. ২।৫।৩৯-শ্লোকে যে "সনাতন-ব্রহ্মলোকের" উল্লেখ করা হইয়াছে, হরিবংশের (ক)-শ্লোকোক্ত ব্রহ্মলোকও সেই ব্রহ্মলোকই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীভা. ২।৫।৩৯-শ্লোকোক্ত "সনাতন ব্রহ্মলোক" সত্যলোকের উপরে ; কিন্তু হরিবংশের শ্লোকে ব্রহ্মলোককে স্বর্গের (বা স্বর্লোকের) উপরে বলা হইয়াছে ; এই দুইটী উক্তির সঙ্গতি স্থাপন করিতে হইলে মনে করিতে হইবে—হরিবংশের শ্লোকে স্বর্গ-শব্দের উপলক্ষণে —স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই পাঁচটী লোককেই বুঝাইতেছে।

যাহাহউক, হরিবংশের শ্লোকে, স্বর্গ-শব্দে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত পাঁচটী লোককে বুঝাইলে ব্রহ্মলোক-শব্দে কি বুঝাইতেছে, তাহা দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—হরিবংশের "ব্রহ্মলোক" এবং শ্রীভা, ২।৫।৩৯-শ্লোকোক্ত "ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"-একই লোক। এক্ষণে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থঃ।—ব্রহ্মলোক বলিতে বৈকুণ্ঠকে বুঝায় ; ইহা নিত্য—সৃজ্যপ্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে।" তাহা হইলে হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দেও বৈকুণ্ঠই সূচিত হইতেছে। আরও দেখা যায়—"ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। শ্রীচৈ. চ. ২।২৫।৩০ ॥" ; সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিলে ভগবল্লোক বা বৈকুণ্ঠই সূচিত হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠ সূচিত হইলে (ক)-শ্লোকোক্ত অন্যান্য বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি থাকে কি না। বলা হইয়াছে, এই ব্রহ্মলোক "ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত" ; ব্রহ্মর্ষি শব্দে ব্রহ্মময়—ভগবদ্ভাবময়—ঋষি—পরম-ভাগবত নারদাদিকে বুঝায় ; ইঁহারা বৈকুণ্ঠেরই পার্ষদ-ভক্ত। সুতরাং ব্রহ্মর্ষি-শব্দের অর্থ-সঙ্গতিই হয়।

(ক)-শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—সেই ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) সোমগতি আছে, মহাত্মা জ্যোতিঃ-দিগেরও গতি আছে; পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সোমের সাধারণ অর্থ চন্দ্র এবং জ্যোতির সাধারণ অর্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল। এই অর্থ এস্থলে সঙ্গত হয় না—সত্যলোক সম্বন্ধেই যখন হয় না, তখন বৈকুণ্ঠ-সম্বন্ধেতো হইতেই পারে না; কারণ, প্রাকৃত চন্দ্র ও প্রাকৃত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি বৈকুণ্ঠে অসম্ভব। এসকল শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে—যাহাতে অর্থ-সঙ্গতি নষ্ট না হয়। সোম—উমার সহিত বর্ত্তমান যিনি, তিনি সোম ( স + উম ); পার্ব্বতীর সহিত শিব; বৈকুণ্ঠে পার্ব্বতীর ও শিবের গতি আছে; সুতরাং সোম-শব্দের এই অর্থ বিচার-সঙ্গত। জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়; জ্যোতিঃ-স্বরূপ যাঁহারা—ব্রহ্মেরই ন্যায় মায়াতীত —মুক্ত—যাঁহারা, জ্যোতিঃ-শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝায়। মুক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা—মহাভাগবত —পরমভক্তিপরায়ণ, সনকাদি—তাঁহাদেরও বৈকুণ্ঠে গতি হয়। সুতরাং "মহাত্মনাং জ্যোতিষাং"-পদের উক্তরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে।

তারপর ( খ, গ )-শ্লোক। "গবাং লোকঃ" বলিতে গোলোককে বুঝায়। "গবাং"-পদের গো-শব্দে গো-গোপ-প্রভৃতিকে বুঝায়, উপলক্ষণে। গো-গোপাদির—গো-গোপাদিরূপ ভগবৎ-পরিকরাদির—গো-গোপাদি-পরিকরবৃত ভগবানের, লোকই—গোলোক। এই গোলোক হইল—তস্যোপরি—বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত; সাধ্যগণ এই গোলোককে পালন করেন; সাধ্যশব্দের সাধারণ অর্থে দেবতা-বিশেষকে বুঝায়; স্বর্গ ই সাধ্যগণের লোক; অপ্রাকৃত গোলোকে তাঁহাদের গতি থাকিতে পারে না; সুতরাং এস্থলে সাধ্য-শব্দের সাধারণ দেবতা-বিশেষ—অর্থ গ্রহণীয় নহে। সাধ্য—সাধনার বস্তু; গো-গোপাদি-পরিবৃত ভগবানের উপাসকগণের সাধনার বস্তু যাঁহারা, সেই শ্রীনন্দ-যশোদাদি ভগবৎ-পরিকরগণই এস্থলে সাধ্য-শব্দের বাচ্য; তাঁহারা তাঁহাদের প্রেমসম্পত্তি দ্বারা লীলারস-পুষ্টির সাধন করিয়া গোলোকের মাহাত্ম্যকে পালন করেন (রক্ষা করেন), তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিই গোলোক-মাহাত্ম্যের হেতু। সেই গোলোক—সর্ব্বগত, মহাকাশগত—অর্থাৎ "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু।"—প্রপঞ্চাতীত বলিয়া, সচ্ছিদানন্দঘন বলিয়া পরম অপরিচ্ছিন্ন। অবশ্য সচ্ছিদানন্দঘন বলিয়া বৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন—বিভু। শ্রীভগবানের ও তদীয় ধামাদির কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই একাধিক অপরিচ্ছিন্ন—বিভু—ধামের যুগপৎ অস্তিত্ব ও উপর্য্যধোরূপে অবস্থানাদি সম্ভব। ( গ )-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ "তত্রাপি গতিস্তব"—সেই গোলোকেও তোমার গতি। এস্থলে "অপি" শব্দদ্বারা বৈকুণ্ঠে গতির কথাই সূচিত হইতেছে—হে কৃষ্ণ! বৈকুণ্ঠে যেমন তোমার গতি আছে, তদ্রূপ গোলোকেও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥—আমি এই প্রকার বহুবিধরূপে বসুন্ধরায় বিচরণ করি এবং ব্রহ্মলোকে ( বৈকুণ্ঠে ) ও গোলোকেও বিচরণ করি!" যাহা হউক, বৈকুণ্ঠে গতি যেরূপ, গোলোকে গতি সেইরূপ নহে; গোলোকে গতি—বৈকুণ্ঠে গতি অপেক্ষাও পরম-দুর্জ্ঞেয়া; ইহা তপোময়ী—ইহা একমাত্র কেবল-সমাধিদ্বারাই অবগত হওয়া যায়; তাই এই গতিসম্বন্ধে পিতামহ ব্রহ্মাও কিছু বলিতে পারেন না।

( ঘ )-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—সুকৃতকর্ম্মা জনসমূহের মধ্যে যাঁহারা শম-দমাঢ্য, স্বর্গলোক হইতে

সত্যলোক পর্য্যন্ত তাঁহাদের গতি হইতে পারে ( শমদমাঢ্য না হইলে ভৌমস্বর্গাদিতে গতি হইবে ); আর "ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং"—ভগবদ্‌বিষয়ক তপস্যায়, ভক্তিমার্গের সাধনে নিযুক্ত ভক্তদের গতি হয় ব্রহ্মলোকে ( অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে ); তাঁহাদের এই গতি পরাগতি, তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ হইতে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

( ঙ, চ )-শ্লোকে ইন্দ্র বলিতেছেন—কিন্তু, হে কৃষ্ণ! তোমার গো-সমূহের ( অর্থাৎ গো-গোপ-গোপী-সমূহের ) বাসস্থল যে গোলোক, সেই গোলোকে গতি দুরারোহা—তোমার গো-গোপ-গোপীগণব্যতীত অন্যের পক্ষে সেই গোলোকে যাওয়া দুষ্কর। হে কৃষ্ণ! এতাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ি-মহিমা-সমন্বিত যে গোলোক, আমারই উপদ্রবে তাহা ব্যথিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছ। ( ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজবাসিগণ গোপূজা ও গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র ব্রজমণ্ডলের উপরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতাদি উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনওরূপ উপদ্রবেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রজধাম উৎপীড়িত হইতে পারে না; ব্রজধামের কথা তো দূরে—ব্রজধামে গমনের অধিকার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরও কোনওরূপ বিঘ্ন সম্ভব নহে। ইন্দ্র স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিয়াছেন—তাঁহার উপদ্রবে ব্রজধাম উৎপীড়িত হইয়াছিল )।

এইরূপে দেখা গেল—হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোক-শব্দে বৈকুণ্ঠকেই বুঝায়। গোলোক যে ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত এবং গোলোকের মাহাত্ম্যও যে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও হরিবংশ হইতে জানা গেল। সুতরাং বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ অপেক্ষা যে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক, তাহাও হরিবংশের বাক্যে প্রমাণিত হইল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের অংশ হইতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেননা, অংশীর মাহাত্ম্য অপেক্ষা অংশের মাহাত্ম্য কখনও অধিক হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্।

## ১৮৩। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অধ্যয়ন

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মই হইবেন, তাহা হইলে স্বরূপতঃই তিনি হইবেন সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়—তিনি সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটী বাক্য দেখাইয়া কেহ কেহ বলেন, তিনি নাকি ঘোর-নামা আঙ্গিরস-গোত্রীয় কোনও ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সর্ব্বজ্ঞ—সুতরাং স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম—ছিলেন না।

এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃই সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। ব্রজের পরিকর-ভক্তদের গাঢ়প্রেমে তাঁহার মুগ্ধত্ববশতঃ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন থাকে। তথাপি অনেক শৈশব-লীলায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব যে আত্মপ্রকট করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ( ১।১।১৩৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। আবার, ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্ত্তনের সময়ে তিনি যে সমস্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ তখন তিনি মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে অবস্থিত; কোনওরূপ অধ্যয়নই তখন তাঁহার ছিল না। ইহাতেই বুঝা যায়—স্বরূপতঃই তিনি সর্ববজ্ঞ ছিলেন।

তথাপি তিনি যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল এবং নর-অভিমানী বলিয়াই নর-বালকগণ যেমন গুরুসন্নিধানে অধ্যয়ন করেন, তিনিও তদ্রূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার দুইটী উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, রস-আস্বাদন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ অধ্যয়নের ব্যপদেশে শ্রীগুরুদেবের এবং গুরুপত্নীর বাৎসল্যরস আস্বাদন করিয়াছেন এবং সহপাঠীদিগের সখ্যরসও আস্বাদন করিয়াছেন। আবার এই রস-আস্বাদনের ব্যপদেশে তিনি ভক্তচিত্ত-বিনোদনও করিয়াছেন—নানাবিধ পরিচর্য্যাদ্বারা গুরুর ও গুরুপত্নীর এবং একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে অধ্যয়ন ও একসঙ্গে শ্রীগুরুর পরিচর্য্যাদির প্রসঙ্গে সখাস্থানীয় সহপাঠীদেরও চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, লোক-সংগ্রহ। তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই; তথাপি লোকের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, একথা অর্জ্জুনের নিকটে তিনি নিজেই বলিয়াছেন ( শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ॥ ৩।২২-২৪ ॥)।

## ক। শ্রীকৃষ্ণ কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার সহপাঠী দরিদ্র শ্রীদামা বিপ্রের নিকট তাহা বলিয়াছেন। শ্রীদামা বিপ্র এক সময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত হইলে তাঁহাদের উভয়ের গুরুকুলে বাসের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাকে বলিয়াছিলেন - "তোমার মনে পড়ে কি, একদিন গুরু-পত্নীর আদেশে তুমি এবং আমি রন্ধনের কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন তীব্র বাতবর্ষায় বিপন্ন হইয়া সারারাত্রি আমাদিগকে বনমধ্যে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পরের দিন সূর্য্য উদিত হইলে আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি আমাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে গিয়া বিপন্ন অবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইলেন।

এতদ্বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্য্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥ শ্রীভা. ১০।৮০।৩৯ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। সান্দীপনির পুত্র মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখারূপে ব্রজলীলার পরিকরও ছিলেন। সান্দীপনি মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবীও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সহায়কারিণী ছিলেন। সান্দীপনি মুনির পরিজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও তাঁহার সান্দীপনি-গৃহে অধ্যয়নের অনুকূল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে যে, উপনয়ন-সংস্কারের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অধ্যয়নার্থ অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকটেই গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাকল্পাদি সমুদায় বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সহিত সমস্ত বেদ, মন্ত্রদেবতা-জ্ঞানসহিত ধনুর্বেবদ, মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি-দর্শনশাস্ত্র, তর্ক-বিদ্যা ( আন্বিক্ষিকী ) ও রাজনীতি ( সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় ) শিক্ষা করিয়াছিলেন। চতুঃষষ্টি দিবসেই তাঁহারা চতুঃষষ্টিকলা শিক্ষা করিয়াছিলেন ( শ্রীভা. ১০।৪৫।৩১-৩৫ )।

সান্দীপনিমুনি প্রভাসতীর্থে সাগরগর্ভে তাঁহার দুইটী পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে গুরুদক্ষিণারূপে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে মৃতপুত্রদ্বয়ের প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যমপুরী হইতে গুরুপুত্রদ্বয়কে আনিয়া গুরুদক্ষিণারূপে গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিলেন।

বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, অবন্তীখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের উক্তির সহিত তৎসমস্ত প্রমাণের কোনও বিরোধ নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে সান্দীপনি মুনির নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সান্দীপনিমুনির নিকটে সমস্ত বিদ্যার অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরেই গুরুদক্ষিণা দিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং অপর কাহারও নিকটে পুনরায় অধ্যয়নের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

## খ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যের অর্থের আলোচনা

ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটী বাক্যের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোর-নামক কোনও এক ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্যের বাক্যটী এই ঃ—

"তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ অপিপাস এব স বভুব, সঃ অন্তবেলায়াম্ এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত—অক্ষিতম্ অসি, অচ্যুতম্ অসি, প্রাণসংশিতম্ অসি ইতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৭।৬ ॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। "তৎ হ এতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামত আঙ্গিরসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্ত্বা উবাচ—'তদেতত্ত্রয়ম্' ইত্যাদিব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। স চ এতদ্ দর্শনং শ্রুত্বা অপিপাস এব অন্যাভ্যো বিদ্যাভ্যো বভূব। ইত্থঞ্চ বিশিষ্টেয়ং বিদ্যা যৎ কৃষ্ণস্য দেবকীপুত্রস্য অন্যাং বিদ্যাং প্রতি তৃড়্‌বিচ্ছেদকরীতি পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যাং স্তৌতি। ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় উক্ত্বা ইমাং বিদ্যাং কিমুবাচ ইতি, তদাহ—স এবং যথোক্তযজ্ঞবিৎ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতৎ মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। কিং তৎ ? অক্ষিতম্ অক্ষীণম্ অক্ষতং বা অসি ইত্যেকং যজুঃ। ইত্যাদি। —আঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক ঋষি স্বীয় শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিদ্যা বলিয়া বলিলেন—দূরবর্ত্তী 'তৎ এতৎ ত্রয়ম্'—এই কথার সহিত 'বলিলেন'—ক্রিয়ার সম্বন্ধ। তিনিও (কৃষ্ণও) উক্ত যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিদ্যা শ্রবণ করিয়া অন্যবিদ্যায় নিস্পৃহ হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা এমনই বৈশিষ্ট্যযুক্তা যে, ইহা দেবকীপুত্র-কৃষ্ণেরও অন্যবিদ্যায় তৃষ্ণা দূর করিয়া দিয়াছিল। ইহা বলিয়া পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যার স্তুতি করিতেছেন। অঙ্গিরা-গোত্রীয় ঘোর-ঋষি কৃষ্ণের প্রতি এই বিদ্যার উপদেশ করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—উক্ত প্রকার বিদ্যাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মরণ-সময়ে এই তিনটী মন্ত্র জপ করিবেন। কি সেই তিনটী মন্ত্র ? তুমি হইতেছ অক্ষীণ ; ইত্যাদি।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—দেবকীপুত্র-কৃষ্ণ ঘোর-ঋষির শিষ্য ছিলেন। কিন্তু মূল শ্রুতিবাক্যে একথা নাই, অন্য কোনও শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ কোনও কথা নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহার অন্য একটী প্রমাণ তাঁহার ভাষ্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—যজ্ঞদর্শনের কথা শুনিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া দেবকীপুত্র-কৃষ্ণ অন্য কোনও বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আর ইচ্ছুক হয়েন নাই। ইহা হইতে মনে হয়—তিনি যজ্ঞবিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ-বলে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-ধর্ম্ম-মীমাংসা-তর্কশাস্ত্র-রাজনীতি আদি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ঘোর-ঋষির শিষ্য মনে করাতেই শ্রীপাদ শঙ্করকে এমন কথা বলিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তিও অপ্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

দেবকীপুত্র-কৃষ্ণকে ঘোর-ঋষির শিষ্য মনে করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, ঋষি তাঁহাকে যজ্ঞবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন—"অপিপাস এব স বভুব"-এই শ্রুতিবাক্যাংশেই উপদেশের ফলের কথা বলা হইয়াছে। এই যজ্ঞবিদ্যার কথা শুনিয়া দেবকীপুত্র-কৃষ্ণ "অপিপাস এব স বভুব—অন্যবিদ্যা লাভের জন্য তাঁহার পিপাসা দূরীভূত হইল।" এইরূপ অর্থ করিতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্করকে "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম্মকে উল্লিখিত "অপিপাস এব স বভুব"-বাক্যদ্বারা ব্যবহিত করিতে হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"ঘোরঃ * * * উবাচ—অপিপাস এব স বভুব, সোহন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত"-এই বাক্যে "উবাচ—বলিয়াছিলেন"-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতেছে "তদেতত্ত্রয়ম্ ইত্যাদি", ইহা "অপিপাস এব স বভুব"-বাক্যদ্বারা ব্যবহিত। তাঁহার এই উক্তি অনুসারে, সকর্ম্মক-ক্রিয়া এবং তাহার কর্ম্মের মধ্যস্থলে, ইহাদের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধশূন্য অপর একটী বাক্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা। তাঁহার মতে "অপিপাস এব স বভুব"-বাক্যের সম্বন্ধ হইতেছে "দেবকীপুত্র-কৃষ্ণের" সঙ্গে, "উবাচ"-ক্রিয়ার সঙ্গে নহে। "উক্ত্বা"-ক্রিয়ার কর্ত্তাও "ঘোর আঙ্গিরসঃ" এবং "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ত্তাও হইতেছে "ঘোর আঙ্গিরসঃ।" সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুরূপ অর্থ পাইতে হইলে শ্রুতিবাক্যটিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এই ভাবে বসাইতে হয় ঃ—

"তদ্ হ এতদ্ ঘোর-আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, অপিপাস এব স বভুব। ( ঘোর আঙ্গিরস ) উবাচ—সোহন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত-ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্যঃ—"আঙ্গিরস-ঘোর-ঋষি সেই যজ্ঞদর্শন ( বা যজ্ঞবিদ্যা ) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলিয়া ( উপদেশ করিয়া ) সেই দেবকীপুত্র অপিপাসই হইলেন। আঙ্গিরস ঘোর বলিলেন—সেই ( যথোক্ত-যজ্ঞবিদ্ ) ব্যক্তি মরণকালে এই মন্ত্রত্রয় জপ করিবেন, ইত্যাদি।"

শ্রুতিবাক্যে "উক্ত্বা"-স্থলে যদি "উক্তত্বাৎ"-পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি হইতে পারিত ; কিন্তু তাহা না থাকায় কষ্টকল্পনার সাহায্যেই তাঁহাকে উক্তরূপ অর্থ করিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম্মকে "ব্যবহিত" বলিয়া মনে করিতে হইয়াছে।

দেবকীপুত্র-কৃষ্ণকে ঘোর-ঋষির শিষ্য বলিয়া মনে করার ফলেই শ্রীপাদ শঙ্করকে এইরূপ কষ্টকল্পনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ঘোর-ঋষি দেবকীপুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া বলিতে হইয়াছে।

যদি বলা যায়—দেবকীপুত্র কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনি এবং ঘোর-ঋষি এই উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিলেই তো কোনও সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। যদি স্বীকার করা যায় যে, দেবকীপুত্র উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও সমস্যা দেখা দেয়। তিনি আগে কাহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? যদি বলা যায়—আগে তিনি সান্দীপনি মুনির নিকটে এবং পরে ঘোর-ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সান্দীপনির নিকটে অধ্যয়নের পরে আবার ঘোর-ঋষির নিকটে ছান্দোগ্য উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা, তিনি সান্দীপনির নিকটেই উপনিষৎ সহিত সমস্ত বেদ—সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষৎ এবং তদন্তর্গত যজ্ঞবিদ্যাও—অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আবার কিজন্য ঘোর-ঋষির নিকটে যাইবেন ? আর যদি বলা হয়,—প্রথমে ঘোর-ঋষির নিকটে এবং পরে সান্দীপনির নিকটে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না। কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—ঘোর-ঋষির নিকটে যজ্ঞবিদ্যার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া দেবকীপুত্র "অপিপাস এব অন্যাভ্যো বিদ্যাভ্যো বভূব—অন্যবিদ্যায় নিস্পৃহ হইয়াছিলেন।" অন্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য নিস্পৃহ হইলে দেবকীপুত্র আবার সান্দীপনি মুনির নিকটেই বা অধ্যয়নের জন্য যাইবেন কেন এবং যাইয়া উপনিষৎসহ বেদাদিই বা অধ্যয়ন করিবেন কেন ? সুতরাং দেবকীপুত্র সান্দীপনি এবং ঘোর-ঋষি এই উভয়ের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে। ঘোর-ঋষির নিকটে তাঁহার অধ্যয়নের কোনও প্রমাণই কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না।

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ পরব্রহ্ম হইলেও তিনি যখন নরলীল এবং নর-অভিমানী, তখন ঘোর-ঋষির নিকটে তাঁহার অধ্যয়নের কথায় আপত্তির কারণ কিছু থাকিতে পারে না। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে আপত্তির হেতু এই যে, ঘোর-ঋষির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন-সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব। যদি তাহার প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে "উবাচ"-ক্রিয়ার কর্ম্মকে ব্যবহিত না করিয়াও অর্থ করা সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। সেই অর্থ এইরূপ হইত ঃ—

"আঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোর-ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে যজ্ঞদর্শন উপদেশ করিয়া বলিলেন—( যিনি যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন ) তিনি ( সঃ ) অপিপাসই হইয়াছেন। যজ্ঞবিদ্যাবিদ্‌ব্যক্তি মরণ-সময়ে এই মন্ত্রত্রয় জপ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। ইত্যাদি।"

যাহা হউক, দেবকীপুত্র-কৃষ্ণের ঘোর-ঋষির শিষ্যত্ব-সম্বন্ধে যখন কোনও প্রমাণই নাই এবং সেই কারণেই শিষ্যত্ব-সূচক উল্লিখিতরূপ অর্থ যখন সমীচীন বলিয়া মনে হইতে পারে না, তখন উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যটীর প্রকৃত অর্থ কি হইতে পারে ? তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৫৭-অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদী-কারাশ্চ কৃষ্ণশব্দস্য তমাল-শ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাৎ তত্রৈব প্রথমতরপ্রতীতেরুদয় ইতি চোক্তবন্তঃ। সামোপনিষদি চ—কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েতি ॥—শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীকারও বলিয়াছেন—তমাল-শ্যামল-কান্তি যশোদাস্তন্যপায়ী পরব্রহ্মে

কৃষ্ণশব্দের রূঢ়িবৃত্তি। যেহেতু, যশোদানন্দনেই শ্রীকৃষ্ণ-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ শ্রবণমাত্রে প্রথমেই যশোদানন্দনের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। সামোপনিষদেও ( সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদেও ) শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলা হইয়াছে ( দেবকীনন্দন-শব্দে এস্থলে যশোদা-নন্দনই বুঝায় ; যেহেতু, যশোদার একটী নামও দেবকী )।”

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, ছান্দোগ্য-শ্রুতি-প্রোক্ত বাক্যে ঘোর-ঋষি পরব্রহ্ম-জ্ঞানেই “কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়” বলিয়াছেন—ইহাই শ্রীজীবের অভিপ্রায়।

কোনও কার্য্য আরম্ভ করার পূর্ব্বে ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকগণ যেমন ইষ্টদেবের স্মরণ করেন, কিম্বা ভগবান্‌কে নমস্কার জানাইয়া থাকেন, ঘোর-ঋষিও তদ্রূপ “কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়—(তাৎপর্য্য, কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায় নমঃ)—বলিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই বুঝিতে হইবে। নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ দেবকীপুত্ত্রকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন ; ঘোর-ঋষি তাহা অবশ্যই জানিতেন। তাই তাঁহার পক্ষে পরব্রহ্ম দেবকীপুত্ত্র কৃষ্ণকে নমস্কার জ্ঞাপন অসম্ভবও নহে, অস্বাভাবিকও নহে, বরং সমীচীনই।

“উবাচ”-ক্রিয়ার কর্ম্ম—এতৎ, ইহা। ইহা কি ? “অপিপাস এব স বভূব। ইত্যাদি।”

অথবা, “উবাচ”-ক্রিয়ার কর্ম্ম—এতৎ, ইহা ( যজ্ঞদর্শন বা যজ্ঞবিদ্যা বা পুরুষ-যজ্ঞ ) এবং “অপিপাস এব স বভূব। ইত্যাদি।”

এই ভাবে, উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটীর অর্থ হইবে এইরূপ ঃ—

“আঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোর-নামক-ঋষি ‘কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়—দেবকীপুত্ত্র কৃষ্ণকে নমস্কার’—বলিয়া ( উক্ত্বা ) ইহা বলিলেন—( যিনি যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন ) তিনি ( সঃ ) অপিপাসই ( অন্যবিষয়ে অভিলাষশূন্যই ) হইয়াছেন ; মরণ-সময়ে এই মন্ত্রত্রয় জপ করা উচিত। ( কি সেই মন্ত্রত্রয় )—অক্ষিতম্ অসি ( তুমি অক্ষয়, ) অচ্যুতম্ অসি ( তুমি অচ্যুত ) এবং প্রাণসংশিতম্ অসি ( তুমি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম )।”

অথবা, “অঙ্গিরস-গোত্রীয় ঘোরনামক ঋষি ‘কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়—কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায় নমঃ’—বলিয়া যজ্ঞদর্শনের কথা ( এতৎ ) বলিলেন এবং আরও বলিলেন—( যিনি এই যজ্ঞদর্শন অবগত হইয়াছেন ) তিনি—ইত্যাদি।”

শ্রীরঙ্গরামানুজ তাঁহার ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকায় উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“ঘোরনামা অঙ্গিরোগোত্রঃ তদেতৎ পুরুষযজ্ঞদর্শনং দেবকীপুত্ত্রায় কৃষ্ণায় ইতি-শব্দঃ অধ্যাহর্ত্তব্যঃ ; তচ্ছেষভূতং তৎপ্রীত্যর্থম্ ইত্যুক্ত্বা ইত্যনুসন্ধায় উবাচ অনুষ্ঠিতবান্ ইত্যর্থঃ। বচের্লক্ষণয়াঽনুষ্ঠানার্থত্বম্। স ঘোরনামা ভগবচ্ছেষত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক-পুরুষযজ্ঞানুষ্ঠানেন ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাপ্য অপিপাসো মুক্তো বভূব ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি।”

এই টীকায় শ্রীরঙ্গরামানুজপাদ বলিয়াছেন—“কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়”-ইহার পরে “ইতি”-শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। দেবকীপুত্ত্র-কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে ঘোর-ঋষি “কৃষ্ণায় দেবকীপুত্ত্রায়”-ইহা বলিয়া—অনুসন্ধান করিয়া—পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। টীকাকার বলেন—এই শ্রুতিবাক্যে “উবাচ”-শব্দের অর্থ—“অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।” বচ্-ধাতু যে অনুষ্ঠান-অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রমাণও তিনি দিয়াছেন।

বচ্-ধাতুর লক্ষণার্থে তিনি অনুষ্ঠান অর্থ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য প্রসিদ্ধ অর্থ নহে। যাহা হউক, তিনি বলেন—দেবকীপুত্র-কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই ঘোর-ঋষি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান করিয়া ঘোর-ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি অপিপাস হইয়াছিলেন। ইত্যাদি।

উল্লিখিত অর্থসমূহে কোনও কষ্টকল্পনা নাই, শাস্ত্রপ্রমাণ–বিরুদ্ধ কোনও কথাও নাই, বাক্য-বিশেষের স্থান-বিপর্য্যয়ও করিতে হয় না ; অথচ অর্থগুলি শ্রুতিবাক্যের মূলানুযায়ী।

# অষ্টাদশ অধ্যায়

## ( শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব )

### ১৮৪। শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব সম্বন্ধে যুক্তি

শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্বকেই বুঝায়। ব্রহ্মবিগ্রহের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ( ১।১।৭১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। এ-স্থলে কয়েকটী যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে।

(ক) উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়া জড় বস্তুই অনিত্য। জড়-বিরোধী চিদ্‌বস্তুর উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই ; সুতরাং চিদ্‌বস্তুমাত্রই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ জড় বা প্রাকৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য।

(খ) যাহা দেশে এবং কালে সীমাবদ্ধ, তাহা কালের অধীন। তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে ; সেজন্য তাহা অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিভু এবং দেশ-কালের অতীত। তাই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য।

(গ) প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা শুনা যায়, দেহত্যাগের কথাও শুনা যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত জীবের জন্মের ন্যায় নহে, তাহা ১।১।১৪৩-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার জন্ম কেবল জন্মের অনুকরণমাত্র—ইহা দিব্য জন্ম। এই দিব্যজন্মের পূর্ব্বেও তাঁহার যে দেহ ছিল, জন্মদ্বারা সেই দেহই তিনি আবির্ভাবিত করেন, লোক-নয়নের গোচরীভূত করেন। জন্মকালে তিনি, জীবের ন্যায়, কোনও নূতন দেহ লইয়া আসেন না। তাঁহার দিব্যজন্ম হইতেছে তাঁহার নিত্য-দেহের আবির্ভাবমাত্র।

আর, তাঁহার দেহত্যাগও যে প্রাকৃত জীবের মৃত্যু নহে, তাহাও পূর্ব্বে ১।১।১৪৪-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। জন্মলীলার ব্যপদেশে যে বিগ্রহ তিনি প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই বিগ্রহকেই তিনি তিরোহিত—লোকনয়নের অগোচরীভূত—করেন মাত্র। ইহা তাঁহার তিরোভাবমাত্র।

এইরূপ আবির্ভাব-তিরোভাবের দ্বারা বিগ্রহের অনিত্যত্ব সূচিত হয় না, বরং নিত্যত্বই সূচিত হয়।

### (ঘ) অংশের নিত্যত্বদ্বারা অংশীরও নিত্যত্ব সূচিত হয়

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে মধ্বভাষ্যধৃত একটি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

“বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহমমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্।

—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি—আমি শত প্রকারে, সহস্র প্রকারে আবির্ভূত হই। আমি অমিত, অনন্ত। এই সকল রূপের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অজ্ঞান-বন্ধন নাই, মুক্তি নাই। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরম, পরমানন্দ-স্বরূপ। ইতি চতুর্ব্বেদশিখা।"

নৃসিংহপুরাণও বলেন—"যুগে যুগে বিষ্ণুরনাদিমূর্ত্তিমাস্থায় বিশ্বং পরিপাতি দুষ্টহেতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচ্ছেদ-ধৃত প্রমাণ ॥—দুষ্টবিনাশী বিষ্ণু যুগে যুগে অনাদি-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া বিশ্বের পরিপালন করিয়া থাকেন।"

শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ-সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরি-বিগ্রহমিতি—এই নৃসিংহবিগ্রহ ঋত ( সত্য ), সত্য ( সমদর্শী ) পর ( শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম ), ব্রহ্ম ( সর্ব্বব্যাপক ), পুরুষ।" এই শ্রুতির ভাষ্যে ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন—"এতন্নৃসিংহবিগ্রহং নিত্যমিতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভধৃত-প্রমাণ।—এই নৃসিংহবিগ্রহ নিত্য।"

ভগবৎ-স্বরূপগণের নিত্যত্বসম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবৎ-স্বরূপমাত্রেরই নিত্যত্বদ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরই নিত্যত্ব খ্যাপিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মের বিগ্রহে এবং পরব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদ নাই (১।১।৮৩-অনুচ্ছেদ)।

( ঙ ) পরব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণও নিত্য বস্তু।

ব্রজে আবির্ভূত, ব্রজস্ত্রীগণের প্রেষ্ঠ এবং পতি, গোপীজন-বল্লভ, নরলীল এবং নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকেই গোপাল-তাপনী-শ্রুতি পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই দ্বিভুজ, বনমালী, গোপবেশ, অভ্রাভ, গোপ-গোপাঙ্গনাবীত, গোপীজন-বল্লভ-সম্বন্ধেই গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। * * নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥" ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের বিভুত্ব, পরব্রহ্মত্ব এবং নিত্যত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

### ( চ ) শাস্ত্রকথিত উপাস্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু

শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যদি নিত্য না হইত, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হইত না। কেননা, অনিত্য বস্তুর উপাসনার সার্থকতা কিছু নাই। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ ॥ কঠশ্রুতি ॥ ১।২।১০ ॥—অধ্রুব দ্বারা সেই ধ্রুবকে পাওয়া যায় না।" নিত্য বস্তুরই উপাসনার বিধি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। শ্রুতি কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম নিত্য বস্তু বলিয়া।

**গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে** পঞ্চ-পদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে গোপীজন-বল্লভের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপাসনার ফলের কথাও বলা হইয়াছে। "যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি ॥ গোপাল-পূর্ব্বতাপনী ॥ ১।১ ॥—যিনি গোপীজনবল্লভের ধ্যান করেন, রসন ( প্রীতি-বিধান ) করেন, ভজন করেন, তিনি অমৃত হয়েন, তিনি অমৃত হয়েন, তিনি অমৃত হয়েন।"

**ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রে** অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রজপ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচ্ছেদ-ধৃত-প্রমাণ॥—(অষ্টাদশাক্ষর)-মন্ত্রে দীক্ষিত যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া অহর্নিশি এই মন্ত্র জপ করিবেন, তিনি গোপবেশধর হরির দর্শন পাইবেন ; তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

**গৌতমীয়-তন্ত্রেও** সদাচার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচ্ছেদ-ধৃত-প্রমাণ।"

**শ্রীমদ্ভাগবতে** শ্রীশুকদেবের একটী উক্তি এইরূপ ঃ—

"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।৩১।৬॥

—যোগিগণ আগ্নেয়ী-যোগধারণায় নিজ নিজ দেহ দগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, লোকাভিরাম এবং ধারণা-ধ্যানের মঙ্গল-স্বরূপ স্বীয় তনু, দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে ধ্যান-ধারণার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাই এ-স্থলে শ্রীশুকদেব বলিলেন।

ব্রহ্মা শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

—শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪॥

—মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যে আবার অরণ্যে, তন্মধ্যেও এই গোকুলে যে কোনও যোনিতে জন্মলাভ করাকেও মহৎ ভাগ্য বলিয়া মনে করি ; কেননা, তাহাতে গোকুলবাসী যে কোনও ব্যক্তির পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গোকুলবাসীরাই ধন্য ; যেহেতু, তাঁহারা মুকুন্দগতজীবন—যে মুকুন্দের পদধূলি অদ্যাপিও শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিতেছেন।"

এই শ্লোকে "যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব—যাঁহার পদরজ শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয়"—এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে—**নন্দ-নন্দন** শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই শ্রুতিগণ উপদেশ করিয়া থাকেন।

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** হইতেও জানা যায়, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ ৭।১৪॥", "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪॥", "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯।১৩॥", "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪॥", "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২॥", "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।৯-১০॥", "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬॥",

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥ ১৮।৬৫ ॥", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ ১৮।৬৬ ॥" এবং আরও বহুস্থলে নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করা যায়। তাঁহার উপাস্যত্বের উক্তিতেই তাঁহার নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

## ছ। উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—কেবল উপাস্যত্বদ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিত্যত্ব সূচিত হয় না। যেহেতু, নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া নন্দ-নন্দন ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রাপ্তিও হইতে পারে। নন্দ-নন্দনের উপাসনায় নন্দ-নন্দনকেই পাওয়া যায় কিনা ?

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিত্যাদি"-গীতা-বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় সাধক শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য অভীষ্ট বস্তুও পাইতে পারেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই চাহেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকেই পাইতে পারেন, শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ আছে।

**গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি** বলেন—"এতদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তি ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েৎ আত্মপদং তদৈব ॥ ১।৫ ॥—নিত্যযুক্ত (যত্নশীল) হইয়া যাঁহারা যন্ত্রাত্মক বিষ্ণুপদের (অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের) সম্যক্‌রূপে আরাধনা করেন, অথচ অন্য কাম্যবস্তু কিছু চাহেন না, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকটে স্বীয় স্বরূপ—গোপরূপ—প্রকাশ করেন।"

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে গোপবেশ—নন্দ-নন্দন—কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, এই শ্রুতি বাক্য হইতে তাহা জানা গেল।

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী হইতে আরও জানা যায়—"তদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়তি তে পপ্রচ্ছুস্তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ—অনবরতং ময়া ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্ব্বভূব ইত্যাদি ॥ ১।৫ ॥—সনকাদি মুনিগণ পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—পূর্ব্বে আমি পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অনবরত ধ্যান ও স্তব করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ আমার বিষয় অবধান করিয়াছিলেন এবং পরার্দ্ধান্তে তিনি আমার সাক্ষাতে তাঁহার গোপবেশরূপ আবির্ভূত করিয়াছিলেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফলে গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সাক্ষাতে স্বীয় গোপ-নন্দন রূপই প্রকটিত করিয়াছিলেন।

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি হইতে আরও জানা যায়—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্‌গণোহহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ ১।৮ ॥—ব্রহ্মা বলিতেছেন—মরুদ্‌গণের সহিত আমি পরম-স্তুতিদ্বারা বৃন্দাবনস্থিত-কল্পবৃক্ষতলে বিরাজমান্, পঞ্চপদাত্মক অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি।"

এইরূপ উপাসনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়াছিলেন, গোপাল-তাপনী বাক্যে তাহা পূর্ব্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন হইতেও তাহা জানা যায়।

**বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর** বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত হইলাম। পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা ইতি ॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৯৩-অনুচ্ছেদ-ধৃত-প্রমাণ।"

উপাসনার ফলে ব্রহ্মা যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এবং **পদ্মপুরাণ নির্ম্মাণ-খণ্ডের** প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও তাহা দেখাইয়াছেন ঃ—

"তথা শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্যাপি গীতং শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম-প্রারম্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—তস্য হৃষ্টাশয়ঃ স্তুত্যা বিষ্ণুর্গোপাঙ্গনাবৃতঃ। তাপিঞ্ছশ্যামলং রূপং পিঞ্ছোত্তং সমদর্শয়দিতি। অগ্রে চ তদ্বাক্যম্—মামবেহি মহাভাগ কৃষ্ণং কৃত্যবিদাম্বর। পুরস্কৃতোঽস্মি ত্বদ্ভক্ত্যা পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথা ইতি।—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনাম-প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'তাঁহার (ব্রহ্মার) স্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া গোপাঙ্গনাবৃত বিষ্ণু শিখিপুচ্ছ-চূড়ালঙ্কৃত তমাল-শ্যামল রূপ সম্যক্‌রূপে দর্শন করাইয়াছিলেন।' এই শ্লোকের অগ্রেও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণোক্তি দৃষ্ট হয়—'হে মহাভাগ! হে কর্ত্তব্যাভিজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ! আমি কৃষ্ণ, আমাকে অবগত হও। তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার মনোরথ-সকল পূর্ণ হউক।"

"তথা পাদ্মে নির্ম্মাণ-খণ্ডে—পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতমিতি শ্রীভগবদ্বাক্যানন্তরং ব্রহ্মবাক্যম্—ততোঽপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ। কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমদ্ভুতম্। বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লব-মণ্ডিতমিত্যাদি।—পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণ-খণ্ডে দেখা যায়—'তোমাকে বেদগোপ্য-স্বরূপ দেখাইতেছি'-এইরূপ ভগবদ্বাক্যের পরে ব্রহ্মার বাক্য—'হে ভূপ! তদনন্তর কাল-মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অদ্ভুত বালককে দেখিলাম। তিনি পীতবসন-পরিহিত, গোপবেশ, কদম্বমূলে উপবিষ্ট, গোপকন্যাবৃত, গোপ-বালকগণের সহিত হাস্য-পরায়ণ। আর, নবপল্লব-মণ্ডিত বৃন্দাবন-নামক বনও দেখিলাম। ইত্যাদি।'"

শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণও যে গোপীজন-বল্লভের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, **শ্রীমদ্ভাগবত** হইতে তাহা জানা যায়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ-দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ॥
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধাঃ ॥

শ্রীভা. ১০।৮৭।২৩ ॥

—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মাখ্য-) তত্ত্বের (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বরূপে তোমার) উপাসনা করেন (এবং উপাসনা করিয়া তোমাকে নির্ব্বিশেষরূপে প্রাপ্ত হয়েন)। তোমাতে শত্রুভাবাপন্ন লোকগণও (সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায়, অথবা তোমার প্রতি ভয়বশতঃ সর্ব্বদা) তোমার স্মরণ করিয়াও তাহাই পাইয়া থাকে। আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি (তোমার নিত্যকান্তা ব্রজ-) স্ত্রীগণ তোমার যে চরণ-পদ্মের সুধা সাক্ষাদ্ভাবে বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়া আমরাও তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণও গোপীজন-বল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া কায়ব্যূহরূপে গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি-গ্রন্থ-প্রোক্ত শ্রুতিচরী গোপী।

পুরাণাদি হইতে জানা যায়—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ গোপীজন-বল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে ইঁহাদিগকেই ঋষিচরী গোপী বলা হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনাতে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায়, তাহার আরও বহু প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

## ১৮৫। সিদ্ধ নির্দ্দেশ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যসিদ্ধত্ব

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতে পারে। উপাসনার ফলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বা গোপীজন-বল্লভের দর্শন এবং সেবাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেই প্রমাণিত হইতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্যসিদ্ধ, অনাদিসিদ্ধ। কেননা, অনাদিসিদ্ধ অপর কোনও স্বরূপও উপাসকের উপাসনায় তুষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দর্শন দিয়া উপাসককে কৃতার্থ করিতে পারেন। ইহা হইবে সাময়িক আবির্ভাব—সুতরাং অনিত্য।

এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণরূপ নিত্যসিদ্ধ। তাহারই কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

(ক) "সিদ্ধনির্দ্দেশোঽপি শ্রূয়তে যথা—বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দ-মন্দিরমিতি বৃহন্নারদীয়ারম্ভে মঙ্গলাচরণম্।—সিদ্ধনির্দ্দেশের (শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতিত্বের) কথাও শুনা যায়। যথা—বৃহন্নারদীয়ারম্ভে মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে—বৃন্দাবনে স্থিত ইন্দিরার আনন্দ-মন্দির শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি।"

(খ) "দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভূতং সান্নিধ্যং কেশবস্য চ। রুক্মিণীসহিতঃ কৃষ্ণো নিত্যং নিবসতে গৃহে॥ ইতি স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে বলিং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যম্।—স্কন্দপুরাণের দ্বারকামাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়, বলির প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—দ্বারকায় কেশবের সান্নিধ্য সমুদ্ভূত হয়। সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা রুক্মিণীর সহিত গৃহে অবস্থান করেন।"

(গ) "ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥ ইতি পাদ্ম-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে তৎ-প্রাতঃস্নানার্ঘ্যমন্ত্রঃ।—পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কার্ত্তিকীয় প্রাতঃস্নানার্ঘ্য-মন্ত্রে আছে—'হে হরে! আমি নিয়মপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিতেছি। শ্রীরাধার সহিত তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর'।"

(ঘ) "এবঞ্চ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদয়ো মন্ত্রাস্তত্তৎ-পরিকরাদিবিশিষ্টতয়ৈবারাধ্যত্বেন সিদ্ধনির্দ্দেশমেব কুর্ব্বন্তি। তদাবরণাদিপূজামন্ত্রাশ্চ।—(গোপালতাপনী-শ্রুতি-আদিতে) শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিধি দৃষ্ট হয়। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদীয় আবরণ-দেবতাগণের পূজামন্ত্রও তদ্রূপ সিদ্ধনির্দ্দেশই করিতেছে।"

শ্রুতি-আদিতে যে ধ্যান বিহিত হইয়াছে, তাহাতে গোপ, গোপী, গো, গবী, বৎসাদির সহিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পরিকরগণেরও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পূজাবিধি দৃষ্ট হয়। যদি পরিকরগণের সহিত তিনি নিত্য বিদ্যমান না থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ পূজাবিধির সার্থকতা কিছু থাকেনা। এজন্যই পূজাবিধি হইতে শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতি প্রতিপাদিত হইতেছে।

(ঙ) "কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেঽপি তথা শ্রূয়তে। যদাহ বৌধায়নঃ—হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দপ্রীতয়ে ততঃ। ইত্যাদ্যনন্তরম্, গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ কংসাসুরঘ্ন ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোদানতৃপ্তঃ কুরু মে দয়ালো অর্শোবিনাশং ক্ষপিতারিবর্গ ইতি। অন্যত্র চ যথা--গোবিন্দ গোপীজনবল্লভেশ বিধ্বস্তকংস ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য। গোবর্দ্ধনাদ্রিপ্রবরৈকহস্ত-সংরক্ষিতাশেষ-গবপ্রবীণ। গোনেত্রবেণুক্ষপণ প্রভূতমান্ধ্যং তথোগ্রং তিমিরং ক্ষিপাশ্বিতি।--কর্ম্মবিপাক-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির বিবরণ দৃষ্ট হয়। যেহেতু, বৌধায়নের উক্তিতে দেখা যায়—'তদনন্তর গোবিন্দের প্রীতির নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ হোমানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।'— ইত্যাদি বাক্যের পরে—'হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে কংসাসুরঘ্ন! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে দয়ালো! তুমি গোদানদ্বারা তৃপ্ত হও এবং অরিবর্গ-বিনাশকারী তুমি অর্শরোগ বিনাশ কর।' বৌধায়ন-স্মৃতিতে অন্যত্রও এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা—'হে গোবিন্দ! হে গোপীজনবল্লভ! হে ঈশ! হে বিধ্বস্ত-কংস! হে ত্রিদশেন্দ্রবন্দ্য! হে গোবর্দ্ধনাদ্রিপ্রবরৈকহস্ত! হে সংরক্ষিতাশেষ-গব-প্রবীণ! হে গোনেত্র-বেণুক্ষপণ! প্রচুর অন্ধতা ও উগ্র-তিমির-রোগ সত্বর বিনাশ কর'।"

(চ) "স্পষ্টঞ্চ তথাত্বং শ্রীগোপালতাপন্যাম্—গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সমরুদ্গণোঽহং তোষয়ামীতি।—শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যস্থিতির কথা শ্রীগোপাল-তাপনীতে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, ব্রহ্মা বলিতেছেন—মরুদ্গণের সহিত আমি বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে সমাসীন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সন্তোষ উৎপাদন করি।"

শ্রীজীবগোস্বামী পরিশেষে লিখিয়াছেন—"অলমেবম্বিধ-প্রমাণ-সংগ্রহ-প্রপঞ্চেন। যতশ্চিচ্ছক্ত্যেকব্যঞ্জিতানাং তৎপরিচ্ছদাদীনামপি তথা নিত্যস্থিতিত্বেন আবির্ভাবতিরোভাবাবেব দ্বিতীয়সন্দর্ভে সাধিতৌ স্তঃ, সর্ব্বথোৎপত্তিবিনাশৌ তু নিষিদ্ধৌ, ততস্তদবতারাণাং কিমুত স্বয়ংভগবতো বা তস্য কিমুততরামিতি।—এই রূপ প্রমাণ-সংগ্রহের আর প্রয়োজন কি? যেহেতু, একমাত্র চিচ্ছক্তিদ্বারা অভিব্যক্ত ভগবৎ-পরিচ্ছদাদিরও ভগবৎ-স্বরূপের ন্যায় নিত্যস্থিতি এবং তজ্জন্য যে তৎসমূহের আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র ঘটিয়া থাকে, তৎসমূহ যে সর্ব্বথা উৎপত্তি-বিনাশহীন, দ্বিতীয় (ভগবৎ-)সন্দর্ভে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎ-পরিচ্ছদাদির এবং ভগবৎ-স্বরূপগণেরও যখন নিত্যস্থিতি শাস্ত্রসিদ্ধ, যখন স্বয়ংভগবান্-শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি-সম্বন্ধে কি সংশয় থাকিতে পারে?"

## ১৮৬। শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ

সকল প্রমাণের উপরে শ্রুতি-প্রমাণের স্থান। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"

নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষৎ দেবকীপুত্রকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কৃষ্ণোপনিষৎ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্॥ ১২॥—কৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্মই।" গোপাল-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম

বলিয়াছেন, গোপীজন-বল্লভের জ্ঞানে যে সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছেন। এই তাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্লভের পরিচয়ও দিয়াছেন—তিনি গোপবেশ, অভ্রাভ, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত, সৎপুণ্ডরীক-নয়ন, বৈদ্যুতাম্বর (পীতাম্বর), দ্বিভুজ, বনমালাধারী, গোপ-গোপাঙ্গনাবীত, দিব্যালঙ্করণোপেত, রত্নপঙ্কজ-মধ্যগ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বিশ্বরূপ, বিশ্ব-স্থিত্যন্ত-হেতু, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব, বিজ্ঞানরূপ, পরমানন্দ-স্বরূপ, গোপীনাথ, কমলমালী, কমল-নাভ, কমলাপতি, একরূপেই বহুরূপ, নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, বিপ্রগণকর্তৃক বহুরূপে আরাধিত, বর্হাপীড়াভিরাম, কংস-বংশ-বিনাশী, কেশি-চাণূরঘাতী, বৃষভধ্বজ-বন্দ্য, পার্থসারথি, বেণুবাদনশীল, গোপাল, অহিমর্দ্দী, লোল-কুণ্ডলধারী, নৃত্যপরায়ণ, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা-তৃণাবর্ত্ত-সংহারী, নিষ্কল, অদ্বিতীয়, মহান্, পরমেশ্বর, কেশব, ক্লেশ-হরণ, নারায়ণ, জনার্দ্দন, গোবিন্দ, পরমানন্দ, মাধব, পরম-দেব, ইত্যাদি। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে এবং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকেই যে ব্রহ্মা নিজে স্তবাদিদ্বারা আরাধনা করেন, তাহা ব্রহ্মা নিজেই বলিয়াছেন—"অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি॥ গোপাল-পূর্ব্বতাপনী॥ ২।১৩॥" পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের জপ করিয়া এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার জন্য ব্রহ্মা সনকাদি-ঋষিগণকে উপদেশও করিয়াছেন এবং ইহার ফলে যে তাঁহারা সংসার-মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাও বলিয়াছেন। "যূয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি স হোবাচ হৈরণ্যঃ॥ গোপাল-পূর্ব্বতাপনী॥ ২।১৩॥" ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের এবং তাঁহার বেশভূষাদিরও অনাদিসিদ্ধত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

এতাদৃশ গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণসম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ॥ গোপাল-পূর্ব্বতাপনী॥ ১।৫॥ —যে কৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বেও পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বিদ্যমান্ ছিলেন। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অনাদি-সিদ্ধত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন (১০।১২) এবং শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা—মূল—তাহাও বলিয়াছেন (১৪।২৭)। ইহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অনাদি-সিদ্ধত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে; যেহেতু, যিনি অনিত্য, তিনি কখনও পরব্রহ্ম হইতে পারেন না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাও হইতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অনাদি-সিদ্ধত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতির এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা তাঁহাকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা যে তাঁহার তত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এবং তাঁহারা যে মূঢ় এবং অবুদ্ধি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা॥ ৯।১১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি ভূতগণের মহেশ্বর। আমার পরম-তত্ত্ব না জানিয়া, আমি নরদেহধারী বলিয়া, মূঢ় (বিবেকহীন) লোকগণ আমার অনাদর করিয়া থাকে।"

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ গীতা ৭।২৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার নিত্য, অত্যুত্তম, পরম-স্বরূপের কথা না জানিয়া অবুদ্ধি (হীনবুদ্ধি) লোকগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত ছিলাম, এক্ষণে অভিব্যক্ত হইয়াছি।"

"আমি অব্যক্ত ছিলাম, এক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছি"—এই বাক্যের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেব-গৃহে জন্মপ্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ।—মায়িক-আকারই দৃশ্যমান্ হয় বলিয়া নির্ব্বুদ্ধি লোকগণ মনে করে—আমি প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই ছিলাম, বসুদেবগৃহে জন্মলাভ করিয়া মায়িক আকারে ব্যক্ত হইয়াছি।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহ বলিয়া আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর; এক্ষণে (স্বীয় ইচ্ছাতেই) ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছি বলিয়া অবুদ্ধি লোকগণ মনে করে—সত্ত্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফলে বসুদেব হইতে দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অন্য রাজপুত্রগণ যেমন জন্মগ্রহণ করেন, তদ্রূপ।" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"বিবেকশূন্য লোকগণ মনে করে—দেহ গ্রহণের পূর্ব্বে আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ কার্য্য-করণে অক্ষম) ছিলাম; এক্ষণে বসুদেব-গৃহে ভৌতিক-দেহে ব্যক্তি-প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-করণে সমর্থ হইয়াছি; আমি জীববিশেষ বলিয়াই তাহারা মনে করে।" শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"বুদ্ধিহীন লোকগণ মনে করে—আমি অব্যক্ত (অর্থাৎ সর্ব্বোপাধিশূন্য বলিয়া অস্পষ্ট) ছিলাম; এক্ষণে বাসুদেব-দেহে অভিব্যক্ত হইয়া সেই বুদ্ধিহীন লোকগণের মতনই শরীরাভিমানী হইয়াছি।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"জগতের রক্ষার নিমিত্ত লীলাবশতঃ আমি যে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহে আত্মপ্রকট করিয়া থাকি, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহকে মন্দমতি লোকগণ কর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিক-দেহ বলিয়া মনে করে।" শ্রীপাদ রামানুজের অর্থও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের অর্থের অনুরূপ। সমস্ত ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যই এক—তাহা হইতেছে এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মায়াময়, সুতরাং অনিত্য—ইহা বুদ্ধিহীন লোকগণেরই অভিমত।

## ১৮৭। রূপবিরোধী মতসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিতে নিম্নলিখিতরূপ একটী উক্তি আছে:—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ ১।৭॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল এবং অশরীরী। উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়।"

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন—ব্রহ্মের কোনও রূপ নাই; উপাসকদিগের উপাসনার সুবিধার জন্যই তাঁহার রূপের কল্পনা করা হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন—রূপ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মের ধ্যানে রূপের কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার স্তুতিতে

তাঁহার অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া এবং তীর্থযাত্রাদির মাহাত্ম্য-বর্ণনে তাঁহার ব্যাপকত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া ব্যাসদেব যে তিনটী অপরাধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

এই শ্লোকটীর বহুল প্রচার আছে। ইহা ব্যাসদেবেই আরোপিত হয়; কিন্তু ব্যাসদেব কোথায় এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। ব্যাসদেবের লিখিত কোনও পুরাণাদিতে ইহা দৃষ্ট হয় বলিয়াও জানা যায় না।

এই শ্লোকে উল্লিখিত "জগদ্‌গুরো", "ভগবতো" এবং "জগদীশ"—এই তিনটী শব্দে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু রূপবর্জ্জিত কোনও সবিশেষ ব্রহ্মের কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই বলিয়া তাঁহাকে "অশরীরী" বলা হয় বটে; কিন্তু শ্রুতিস্মৃতিতে তাঁহার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের প্রচুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্ববিধ রূপবিবর্জ্জিতও বলা যায় না; ব্যাসদেবও কোনওস্থলে তাহা লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—এই শ্লোকটী ব্যাসদেবের রচিত নহে। ব্রহ্মের রূপ-বিরোধী কোনও লোকই ইহা লিখিয়াছেন এবং শ্লোকটীতে গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যাসদেবের নামে তাহা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্ম যদি রূপবিবর্জ্জিত না-ই হয়েন, তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী-বাক্যটীর তাৎপর্য্য কি?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৮২-৮৩ পৃষ্ঠায়) ভগবৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীরাম-পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"এবং ব্যাখ্যায়তে। 'রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপং গদারিশঙ্খাব্জধরম্' ইতি তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ। পৃথক্-শরীরধারিতারহিতস্য রূপকল্পনা অষ্টবিধ-প্রতিমা-রচনং বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।"

মর্ম্মার্থ। উল্লিখিত বাক্যের পরে শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীতেই লিখিত হইয়াছে—"এবম্ভূতং জগদাধারভূতং রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপম্। গদারিশঙ্খাব্জধরং ভবারিং স যো ধ্যায়েন্মোক্ষমাপ্নোতি সর্ব্বঃ॥ ১০।৮॥—জগদাধার-ভূত সচ্চিদানন্দরূপ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর, ভবারি রামের বন্দনা করি। যিনি এইভাবে তাঁহার ধ্যান করিবেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন।" এই বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে "সচ্চিদানন্দরূপ" বলা হইয়াছে। "সচ্চিদানন্দরূপ" বলায় জানা যাইতেছে—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই শ্রীরামচন্দ্র—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। তাঁহাতে দেহ ও দেহী—এই দুইটী বস্তু একই, পৃথক্ নহে। জীবের ন্যায় তাঁহার পৃথক্ শরীর নাই। তিনিও যাহা, তাঁহার শরীরও তাহাই। সুতরাং "রূপকল্পনা"-শব্দে অষ্টবিধ-প্রতিমা-রচনার বিধানই দেওয়া হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ যখন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহারা যখন রূপবর্জ্জিত নহেন, তখন তাঁহাদের রূপকল্পনার সার্থকতা কিছু নাই। শ্রীরামপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি উপাসকদের সুবিধার জন্য অর্চ্চাবিগ্রহ নির্ম্মাণেরই উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও—শৈলী ( শিলাময়ী ), দারুময়ী, লৌহী ( সুবর্ণাদিময়ী ), লেপ্যা ( মৃচ্চন্দনাদিময়ী ), লেখ্যা ( আলেখ্যময়ী ), সৈকতী ( মৃন্ময়ী ), মণিময়ী এবং মনোময়ী—এই আট রকম অর্চ্চা-বিগ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ শ্রীভা. ১১।২৭।১২ ॥"

গোপালোত্তর-তাপনী-শ্রুতিতেও উপাসকদের উপাস্য অর্চ্চাবিগ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"তত্র হি রামস্য রামমূর্ত্তিঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নমূর্ত্তিঃ অনিরুদ্ধস্য অনিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ। বনেষু এবং মথুরাসু এবং দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥"

ইহার পরেই "একাং হি রুদ্রা যজন্তি দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি"-ইত্যাদি বাক্যে এই সকল মূর্ত্তির উপাসকদের কথাও উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

# উনবিংশ অধ্যায়

## ( গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ )

### ১৮৮। প্রেমের আশ্রয়-প্রধানরূপই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্

পূর্ব্বে ( ১।১।১৩২ক-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—রসিক-শেখর পরব্রহ্ম রসের আস্বাদন করেন দুই রূপে—প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে। বাস্তবিক দুই রূপের রসাস্বাদনেই রসাস্বাদনেরও পূর্ণতা এবং রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণ বিকাশ। ব্রজলীলায় তিনি রস-আস্বাদন করেন—প্রেমের বিষয়-প্রধান রূপে। এই বিষয়-প্রধানরূপেই তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ। প্রেমের আশ্রয়-প্রধানরূপেও যে তিনি রস আস্বাদন করেন, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু সে-স্থলে আশ্রয়-প্রধানরূপের কোনও বিবরণ দেওয়া হয় নাই। এই আশ্রয়-প্রধান-স্বরূপই পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্। এক্ষণে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ আলোচিত হইতেছে।

### ১৮৯। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—গত ত্রেতাযুগে কবি-হবি-প্রভৃতি নয়জন যোগীন্দ্র-ঋষি নিমি-মহারাজের নিকটে উপনীত হইলে নিমি-মহারাজ তাঁহাদের নিকটে সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগের উপাস্যস্বরূপের কথা এবং তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি নিমি-মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাস্যের এবং উপাসনার কথা বলিয়া অবশেষে কলির উপাস্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

> "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
> যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ শ্রীভা. ১১।৫।৩২ ॥

—( কলিযুগে ) সুবুদ্ধি লোকগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাকৃষ্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ ভগবৎস্বরূপের উপাসনা করেন।"

এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে কলির উপাস্যের স্বরূপের কথা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে তাঁহার উপাসনার প্রধান উপচার।

এই উপাস্যের স্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে হইলে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের আলোচনা আবশ্যক। তাহাই আলোচিত হইতেছে।

এই শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে দুইটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, করভাজন-ঋষি বর্ত্তমান চতুর্যুগের উপাস্য এবং উপাসনার কথাই বলিয়াছেন; পূর্ব্বে ( ১।১।১৭৬চ-অনুচ্ছেদে ) শাস্ত্রপ্রমাণ-যোগে তাহা দেখান হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে যে কলিযুগের উপাস্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বর্ত্তমান চতুর্যুগান্তর্গত কলিযুগ—অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগ।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ . শ্রীভা. ৭।৯।৩৮॥"

এই প্রহ্লাদোক্তি হইতে জানা গেল—কলিযুগে ভগবানের "ছন্ন" অবতার। ছদ্-ধাতু হইতে ছন্ন-শব্দ নিষ্পন্ন। ছদ্-ধাতু আচ্ছাদনে। তাহা হইলে "ছন্ন"-শব্দের অর্থ হইল "আচ্ছাদিত"। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলিযুগের অবতার বা উপাস্য যিনি, তিনি হইবেন "আচ্ছাদিত"; অর্থাৎ তাঁহার নিজের স্বাভাবিক রূপ বা বর্ণটী অন্য কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে; সুতরাং এই আচ্ছাদক বর্ণটীই তাঁহার পরিদৃষ্ট হইবে; তাহাই হইবে তাঁহার কান্তি; তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক বর্ণটী দেখা যাইবে না। এইরূপ ছন্নত্বই কলিযুগের উপাস্যের বা অবতারের একটী বিশেষ লক্ষণ। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, সামান্য লক্ষণে বস্তুর পরিচয় হয় না। কেবল চতুষ্পাদ জন্তু বলিলেই গরুকে চিনা যায় না; সাস্না (গলদেশে দোলায়মান কম্বলের ন্যায় বস্তুবিশেষ)-বিশিষ্ট চতুষ্পাদ জন্তু বলিলেই গরুর পরিচয় হয়।

বর্ত্তমান কলিযুগের উপাস্যের পরিচায়ক উল্লিখিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকটীর শব্দগুলির একাধিক অর্থ হইতে পারে; কিন্তু যেই অর্থে, বা যে সকল অর্থে উক্ত বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব ব্যঞ্জিত হইবে, কেবল সেই অর্থই, বা সেই সকল অর্থই গ্রহণীয় হইবে। এই কথা স্মরণ রাখিয়াই অর্থালোচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণম্" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণম্"—এই শব্দদুইটীর অর্থালোচনা করা হইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণম্—এই শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণং বর্ণয়তি যঃ সঃ কৃষ্ণবর্ণঃ; কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিকে) বর্ণনা করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয়, না কি দুইটীই গ্রহণীয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে—"ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শব্দের অর্থের সহিত মিলাইয়া।

ত্বিষাকৃষ্ণম্—ইহা দুইটী শব্দও হইতে পারে, একটী শব্দও হইতে পারে। "ত্বিষা" এবং "কৃষ্ণ" এই দুইটী শব্দ পৃথক্ ভাবে শ্লোকে লিখিত হইয়াছে মনে করিলে "ত্বিষা কৃষ্ণঃ" হইবে দুইটী শব্দ; ত্বিট্-শব্দের অর্থ তেজঃ বা কান্তি; তাহার তৃতীয়া বিভক্তিতে—ত্বিষা;—অর্থ, কান্তিদ্বারা, কান্তিতে। "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যাংশের অর্থ হইবে—কান্তিতে কৃষ্ণ, যাঁহার কান্তি বা বাহিরের দৃশ্যমান্ বর্ণটী কৃষ্ণ।

আর, ত্বিষা + অকৃষ্ণঃ = (সন্ধিতে) ত্বিষাকৃষ্ণঃ। "ত্বিষা" এবং "অকৃষ্ণঃ"—এই দুইটী শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে পাওয়া যাইবে একটী শব্দ—ত্বিষাকৃষ্ণঃ; অর্থ হইবে—কান্তিতে অকৃষ্ণ; প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্বের সহিত এবং "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে—"ত্বিষাকৃষ্ণঃ"-শব্দের এই পরস্পর-বিরোধী অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয়।

প্রথমে দেখা যাউক—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যাংশকে দুইটী শব্দ মনে করিয়া তাহার অর্থ—"কান্তিতে কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থদ্বয়ের বা তাহাদের কোনও একটীর সঙ্গতি হইতে পারে কিনা।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের এক অর্থ—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ। যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"—কান্তিতে কৃষ্ণ হয়েন, তাহা হইলে "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় না। কারণ, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, আচ্ছাদিত না হইলে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে। "ছন্নত্ব" পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ—"কৃষ্ণকে বর্ণন করেন যিনি—এই অর্থের সঙ্গে "ত্বিষা কৃষ্ণ"-শব্দদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা। যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁহার বর্ণ যদি কৃষ্ণ না হয়, তাহা হইলে "কান্তি কৃষ্ণ" হইলে "ছন্নত্ব" বুঝাইতেও পারে।

কিন্তু তিনি কে হইতে পারেন ? হয়তো স্বয়ংভগবান্, না হয় লীলাবতার, আর না হয় যুগাবতার—এই তিনের কেহই হইবেন ; যেহেতু, এই তিন রূপেই ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই তিন রূপের মধ্যে লীলাবতার বাদ দিতে হইবে ; কেন না, কলিতে ভগবানের লীলাবতার হয় না। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৬।৯৭ ॥" লীলাবতার বাদ গেলে আর বাকী থাকে—স্বয়ংভগবান্, অথবা যুগাবতার। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ ; আর পূর্ব্বেই ( ১৷১৷১৭৬ চ-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—কলির সাধারণ যুগাবতারের বর্ণও কৃষ্ণ। ইঁহাদের কেহ যদি কলিতে অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণকে বর্ণন করেন," আর যদি তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণ—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"–হয়, তাহা হইলেও ছন্নত্ব পাওয়া যায় না ; যেহেতু, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইলে তাঁহার কান্তি "কৃষ্ণ" হইতে পারে না।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-স্থলে দুইটি শব্দ আছে মনে করিলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্বের" সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং "ত্বিষা কৃষ্ণ" দুইটী শব্দ, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক—"ত্বিষাকৃষ্ণকে" একটিমাত্র শব্দ ধরিয়া তাহার অর্থ—"কান্তিতে অকৃষ্ণ"—ধরিয়া কোনও বিচারসহ অর্থ পাওয়া যায় কিনা।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "যাহার বর্ণ কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের "কান্তিতে অকৃষ্ণ"-অর্থের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা যাউক।

যাঁহার বর্ণ "কৃষ্ণ", কিন্তু কান্তি "অকৃষ্ণ", তিনি যে "অকৃষ্ণ" কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং এ-স্থলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায়। এই অর্থ গ্রহণীয়।

তারপর "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অপর অর্থ—"যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন"-এই অর্থ ধরিয়া বিচার করা যাউক। যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ কি, তাহা জানা যায় না ; কিন্তু তাঁহার কান্তি-"অকৃষ্ণ।" তিনি কে হইতে পারেন ? পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা অনুসারে, কলিতে যখন লীলাবতার নাই, তখন তিনি হয়তো স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর না হয় কলির সাধারণ যুগাবতারই হইবেন। উভয়ের বর্ণ ই কৃষ্ণ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অথবা সাধারণ যুগাবতার কৃষ্ণ, কলির উপাস্যরূপে যদি "অকৃষ্ণ কান্তিতে" অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় ; সুতরাং এইরূপ অর্থও গ্রহণীয় হইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই "অকৃষ্ণ বর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, না কি যুগাবতার কৃষ্ণই "অকৃষ্ণ বর্ণে" অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া করভাজন-ঋষি বলিয়াছেন ?

যুগাবতার যে অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া কখনও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এইরূপ কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কলিতে "অকৃষ্ণ বর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া যুগাবতার-কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন—একথা ঋষি-করভাজনের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও বিশেষ কলিতে "পীত"-বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০।৮।১৩॥"-এই শ্লোক হইতে জানা যায় ( ১।১।১৭৬ চ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগীয় কলিতে "অকৃষ্ণ বর্ণে" অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই করভাজন-ঋষির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই "অকৃষ্ণ বর্ণ" কি ? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে "স্বয়ংভগবান্‌রূপে" কৃষ্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ ব্যতীত অপর কোনও বর্ণে কখনও অবতীর্ণ হয়েন, এইরূপ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং "অকৃষ্ণ বর্ণ" বলিতে "পীত"বর্ণকেই বুঝায়। এজন্যই এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ ॥ ১।৩।৪৫॥"

এইরূপে, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল—বর্ত্তমান্ কলির উপাস্যরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বহুকাল পূর্ব্বেই করভাজন-ঋষি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু তাঁহার স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত থাকিবে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ দ্বারা এবং তাঁহার অঙ্গ ও উপাঙ্গ তাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিবে—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।

পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন **গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্**।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য"-শ্লোক হইতে জানা যায়—পীতবর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্—সকল কলিতে আবির্ভূত হয়েন না, কোনও বিশেষ কলিতেই আবির্ভূত হয়েন ( ১।১।১৭৬-চ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সকল কলিতেই যদি আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে কলির সাধারণ যুগাবতারের কথা বলা হইত না। কিন্তু কোন্ কলিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েন ? গত দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণে আবির্ভূত হইয়াছেন। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে করভাজন-ঋষি বলিলেন—তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ত্তমান্ কলিতে তিনি আবার পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—**যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ আবির্ভূত হয়েন এবং এতাদৃশ কলিযুগের নামই বিশেষ কলিযুগ।**

এক্ষণে দেখিতে হইবে—**স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৌরত্বের হেতু কি ?**

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ স্বরূপে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা একই তত্ত্ব ; যেহেতু, একই স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। তাঁহাদের পার্থক্য কেবল

ভাব-বর্ণাদিতে। সুতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য হইল—তাঁহাদের ভাব-বর্ণাদির বৈশিষ্ট্য। আবার "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ"—এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায়—সকল ভগবৎ-স্বরূপই নিত্য; সুতরাং তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাববর্ণাদিও নিত্য। তাহা হইলে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভাব-বর্ণাদিও নিত্য। ইহা কেবল প্রকট-সময়ের জন্য আগন্তুক নহে; আগন্তুক হইলে ইহার নিত্যত্ব থাকে না।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণের স্বরূপগত বর্ণ হইতেছে—নবজলধর শ্যাম। "মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্"—ইত্যাদি গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলেন। তাহা হইলে এই গৌরবর্ণটী কোথা হইতে আসিল?

এই পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণটী যখন নিত্য এবং এই বর্ণটী যখন গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপেই নিত্য অবস্থিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহা স্বয়ংভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে—স্বরূপভূত ভাবে—নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট, এমন কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণটীর হেতু হইবে। একমাত্র স্বরূপ-শক্তিই অন্তরঙ্গ ভাবে এবং স্বরূপগত ভাবে তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট; স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অপর কিছুই তাঁহার স্বরূপে—বিগ্রহ মধ্যে বা বিগ্রহে—থাকে না। সুতরাং এই পীতবর্ণটীর হেতুও স্বরূপ-শক্তিই হইবে, অপর কিছু হইতে পারে না।

স্বরূপ-শক্তি দুইরূপে অবস্থিত—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত (১।১।৩০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অমূর্ত্তা শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই ইহা আছে। কিন্তু অমূর্ত্ত-শক্তির কোনও বর্ণ নাই; সুতরাং অমূর্ত্ত-শক্তিদ্বারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপের "ছন্নত্ব" জন্মিতে পারে না।

শক্তির মূর্ত্তরূপ হইল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মূর্ত্তরূপে হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে তত্তৎ--ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনীরূপেই অবস্থান করেন। যেমন, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধা, ইত্যাদি। মূর্ত্ত-শক্তির রূপ আছে, বর্ণ আছে। সুতরাং মূর্ত্ত-শক্তিই বর্ণ দিতে পারেন।

যে মূর্ত্ত-শক্তি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে সেই ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনী, সেই মূর্ত্ত-শক্তি কেবলমাত্র সেই-ভগবৎ-স্বরূপকেই স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে তিনি তাহা দিতে পারেন না; যেহেতু, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সহিত তাঁহার নিত্য-সঙ্গিত্ব নাই। এইরূপে দেখা যায়—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসঙ্গিনী শ্রীরাধাই তাঁহাকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, লক্ষ্মী-আদি তাহা দিতে পারেন না।

কিন্তু একজন অপর এক জনকে কিরূপে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন? বর্ণ থাকে দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংলগ্ন। শ্রীরাধা কিরূপে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন?

শ্রীরাধা হইতেছেন গৌরাঙ্গী। মূর্ত্ত-শক্তি বলিয়াই শ্রীরাধার এই গৌরবর্ণ। অমূর্ত্ত হইয়া গেলে তাঁহার কোনও বর্ণ থাকিবে না। সুতরাং শ্রীরাধার স্বীয় মূর্ত্তত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বহিরাবরণরূপে তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণে আচ্ছাদিত করিতে পারেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—একজন আর একজনের সহিত কি এইভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন ?

যদি দুইজন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, তাহা হইলে উল্লিখিত ভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নহেন; তাঁহারা একাত্মা, একই স্বরূপ ( ১।১।১৪৬-ঝ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। একই স্বরূপ বলিয়া উক্তরূপ ভাবে তাঁহাদের একত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

শ্রীরাধা কেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইবেন ? শ্রীরাধার একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূরণ। শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পূরাণে বাখানে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪৫॥" শ্রীকৃষ্ণের কোনও অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রয়োজন হইলে শ্রীরাধা তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অভীষ্ট-পূরণের জন্য শ্রীরাধা তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলেন ?

পূর্ব্বে ( ১।১।১৩২-অনুচ্ছেদে, বিষয়রূপে ও আশ্রয়রূপে রসাস্বাদন-প্রবন্ধে ) বলা হইয়াছে—স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবব্যতীত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাদন নাই; তাহা আছে—একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের এই বলবতী বাসনা পূরণের নিমিত্তই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মাদন দিতে ঔৎসুক্যবতী এবং মাদনাখ্য-মহাভাব দেওয়ার জন্যই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

মাদনাখ্য-মহাভাব দিতে হইলে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে কেন ?

একত্ব প্রাপ্ত না হইলে মাদন দেওয়া যায় না। তাহার হেতু এই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমঘনবিগ্রহা, মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ। বস্তুতঃ প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের এবং প্রত্যেক নিত্যসিদ্ধ পরিকরের বিগ্রহই হইতেছে ভাববিশেষের বিগ্রহ বা মূর্ত্তরূপ। কোনও স্বরূপেরই ভাবকে বাদ দিয়া তাঁহার বিগ্রহের কল্পনা করা যায় না, আবার বিগ্রহকে বাদ দিয়াও তাঁহার ভাবের কল্পনা করা যায় না। যেমন, আলোককে বাদ দিয়া দীপশিখার, বা দীপশিখাকে বাদ দিয়া আলোকের কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ। দীপশিখাকে না নিলে যেমন আলোক নেওয়া যায় না, তদ্রূপ শ্রীরাধার মাদন-ঘন-বিগ্রহকে না নিলেও তাঁহার মাদন-ভাবকে নেওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে মাদন দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

এইরূপ একত্ব-প্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবে আরও একটী ব্যাপারের সমাধান হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতেছে এই। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সঙ্গিনী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া তিনি স্বীয় প্রেমের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন এবং সেই প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ স্বীয় দেহদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, দেহদান ব্যতীতও প্রেমদান সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মাদনাখ্য-প্রেম দান করিয়া শ্রীরাধা পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারেন; তাহা হইলে এই পৃথক্ দেহদ্বারা তাঁহার পক্ষে মাদনভাব-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্ভব হইত না। কারণ, শ্রীরাধা সেবা করেন তাঁহার মাদনের বিষয়ভূত শ্রীকৃষ্ণকে। মাদন-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পক্ষে মাদনের বিষয় হইবেন না, তিনি

হইবেন তখন মাদনের আশ্রয়। শ্রীরাধাও মাদনের আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণকে মাদন দেওয়ার পরেও তিনি মাদনের আশ্রয় থাকিবেন; যেহেতু, মাদন বিভু বলিয়া পূর্ণ, অফুরন্ত। আশ্রয়ের দ্বারা আশ্রয়ের সেবা হয় না। সুতরাং মাদনের আশ্রয় শ্রীরাধার পক্ষে স্বীয় দেহদ্বারা মাদনের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সেবার অবকাশ থাকিত না।

কিন্তু উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়াতে শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সঙ্গিনীত্বও রক্ষিত হয় এবং স্বীয় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাও রক্ষিত হয়। সেবা রক্ষিত হয় কিরূপে? শ্রীরাধার অঙ্গ-স্পর্শের জন্য শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত। শ্রীরাধার উক্তিতেই তাহা জানা যায়। "মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেঙ্ দান॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।২০।৫০॥" শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সর্ব্ব অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া আছেন। তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তত্বও রক্ষিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট স্পর্শদানরূপ সেবাও রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু একজন কিরূপে স্বীয় মূর্ত্তত্ব রক্ষা করিয়া সর্ব্ব অঙ্গদ্বারা আর একজনের সর্ব্ব অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারেন? দুই কারণে ইহা সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন; তাঁহারা একই অভিন্ন স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এমনই প্রভাব যে, এই প্রেম যে কোনও ভাবে প্রয়োজন, সেই ভাবেই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার আনুকূল্য দান করিয়া থাকে। এ-স্থলে এই প্রেম স্বীয় অচিন্ত্য-প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেমঘন দেহকে যেন এমন ভাবে গলাইয়া দিয়াছে, যাহাতে তিনি স্বীয় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারেন।

এইরূপে শ্রীরাধা স্বীয় নবগোরচনা-গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া—আচ্ছাদিত করিয়া—শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিয়াছেন, স্বীয় মাদনাখ্য-মহাভাবাত্মক চিত্তদ্বারা শ্যামসুন্দরের চিত্তকেও আচ্ছাদিত করিয়া এবং শ্যামসুন্দরের চিত্তকে মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় করিয়াছেন এবং মাদনাখ্য-মহাভাব-রসে শ্যামসুন্দরের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বতোভাবে পরিনিষিক্ত এবং পরিসিঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের এবং রাধাপ্রেমেরও মাধুর্য্য ও প্রভাব আস্বাদনের যোগ্যতা দান করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—"কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ" গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—অশেষ-রসামৃতবারিধি, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই দুইয়ের একত্বপ্রাপ্ত স্বরূপ। এই স্বরূপও অনাদি, নিত্যসিদ্ধ—সুতরাং নিত্য।

মাদন হইতেছে "স্বয়ংপ্রেম", "অখণ্ডপ্রেম।" শ্রীরাধাই এই অখণ্ড প্রেমের ভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাদন নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অখণ্ড-প্রেমের ভাণ্ডার বলা যায় না। কিন্তু তিনিই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমের আশ্রয় হওয়াতে অখণ্ড-প্রেমের ভাণ্ডার হইয়াছেন। অখণ্ড-প্রেমের ভাণ্ডার হওয়াতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ নির্ব্বিচারেও যাহাকে-তাহাকে প্রেম দান করিতে পারেন।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ব্বিচারে প্রেম দান করিয়া থাকেন, গত দ্বাপরে তিনি তাহা ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াও গিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত উপপুরাণ-বচনটীই তাহার প্রমাণ।

"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥
— শ্রীচৈ. চ. ১।৩।১৫ শ্লোক ধৃত-বচন॥

—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্ বেদব্যাস! কোনও কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি (প্রেম) গ্রহণ করাইয়া থাকি (দান করিয়া থাকি)।"

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ংভগবান্ কোনও কোনও দ্বাপরেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; কলিযুগে তাঁহার অবতরণের কথা জানা যায় না। ঋষি-করভাজনের উক্তি হইতে জানা যায়—যে দ্বাপরে তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি আবার পাপহত লোকদিগকেও অর্থাৎ নির্ব্বিচারে সকলকে, প্রেমদানের জন্য অবতীর্ণ হয়েন। "ক্বচিৎ কলৌ—কোনও কলিতে, বিশেষ কলিযুগে" অবতীর্ণ হইয়া তিনি "পাপহত লোকদিগকে" হরিভক্তি—প্রেম—বিতরণ করেন—ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপেই তিনি এই ভাবে প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

"পাপহত লোকদিগকে" পর্য্যন্ত প্রেম-বিতরণের কথা হইতে বুঝা যায়—সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নির্ব্বিচারে, যাহাকে-তাহাকেই তিনি গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্‌রূপে প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

তিনি যখন স্বয়ংভগবান্ এবং স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যখন প্রেম দান করিতে পারেন না, একমাত্র স্বয়ংভগবান্‌ই যখন প্রেম দান করিতে পারেন (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তখন ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণরূপেও অবশ্য তিনি প্রেম দান করিতে পারেন এবং গত দ্বাপরে তাহা তিনি করিয়াছেনও; কিন্তু তাঁহা-কর্ত্তৃক নির্ব্বিচারে প্রেমদানের কথা জানা যায় না। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপেই তিনি নির্ব্বিচারে প্রেমদানের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী নহেন বলিয়া প্রেমের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীর বিতরণের সামর্থ্যও তাঁহার মধ্যে অপ্রকট। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে তিনি অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া সর্ব্ববিধ-প্রেমবৈচিত্রী বিতরণের সামর্থ্য এবং তদুপযোগী কারুণ্যও তাঁহার এই স্বরূপে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। ইহাই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের একটী অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্য।

উপরে উদ্ধৃত উপপুরাণের শ্লোক হইতে ইহাও জানা গেল যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণে যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন। সাধনের জন্য সাধকই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীরাধা হইতেছেন ভক্তকুল-মুকুটমণি; যেহেতু, তিনি "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।" তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানেও যে ভক্তভাব আছে, তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "কৃষ্ণকে বর্ণন করেন যিনি"—এই অর্থ হইতেও তাঁহার ভক্তভাব সূচিত হয়।

এক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা দেখা যাউক। এই শব্দে বলা হইল— কলির উপাস্য গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্ অঙ্গ এবং উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত বর্ত্তমান; অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও অস্ত্র ও পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে।

ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি তাঁহার নিত্যপরিকরদের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন (১।১।১১৫খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নিত্যপরিকর ব্যতীত তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী রসাস্বাদন হইতে পারে না। প্রকট-লীলাতে জগতের জন্য তিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাঁহার পরিকরগণও তাহার আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। কোনও কোনও অবতারে ভগবান্ অস্ত্রাদির সহিতও অবতীর্ণ হয়েন—অসুর-সংহারের নিমিত্ত।

গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের অঙ্গ এবং উপাঙ্গও তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদের কাজ করিয়া থাকেন—এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—তাঁহার পরিকরগণ তো তাঁহার প্রকট-লীলার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করেনই, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু কিরূপে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, নির্ব্বিচারে পাপহত লোকদিগকেও প্রেম-ভক্তি বিতরণের জন্য। তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী রসাস্বাদনের আনুষঙ্গিকভাবেই তিনি ইহা করিয়া থাকেন। পাপহত লোকদিগকে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি প্রদান করাই যখন তাঁহার সঙ্কল্প, তখন অসুর-সংহারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাই এই লীলাতে তাঁহার কোনওরূপ অস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। অঙ্গ এবং উপাঙ্গই অস্ত্রের কাজ করেন—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের—তাঁহার শ্রীবিগ্রহের—দর্শনেই অসুরের অসুরত্ব দূরীভূত হইয়া যায়।

আর, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের—তাঁহার শ্রীবিগ্রহের—দর্শনেই লোক—অসুর-স্বভাব লোক পর্য্যন্ত—প্রেমলাভ করিয়া থাকে। এইরূপে, তাঁহার সঙ্কল্পিত নির্ব্বিচার-প্রেমবিতরণের কার্য্যে, আনুকূল্য বিধান করে বলিয়া তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ পার্ষদের কাজই করিয়া থাকে।

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দ হইতে ইহাও জানা গেল—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন না, পরন্তু অসুরের অসুরত্ব বিনাশ করেন এবং তারপরে অসুরকেও প্রেমভক্তি দান করেন। তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গের দর্শন মাত্রেই এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন এবং তিনি হতারিগতিদায়ক বলিয়া নিহত অসুরকে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু প্রেমভক্তি দেন নাই। কিন্তু গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে তিনি কোনও অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন না; পরন্তু তাহার অসুরত্বের বিনাশ করিয়া তাহাকে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা গৌরবর্ণ স্বরূপের ইহাও একটী বৈশিষ্ট্য।

## ১৯০। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে মহাভারত-প্রমাণ।

মহাভরতের অনুশাসন-পর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে নিম্নলিখিত উক্তি দৃষ্ট হয়।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২ ॥
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥

—"কৃষ্ণ"-এই উত্তমবর্ণদ্বয় বর্ণন ( শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির কীর্ত্তন ) করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "সুবর্ণবর্ণ"। তাঁহার অঙ্গ হেমের ( স্বর্ণের ) ন্যায় গৌর এবং উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটী নাম "হেমাঙ্গ।" সাধারণ লোক হইতে তাঁহার অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম "বরাঙ্গ"। চন্দনের অঙ্গদ ( অঙ্গদের আকারে ঘৃষ্ট চন্দন ) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "চন্দনাঙ্গদী"। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "সন্ন্যাসকৃৎ—সন্ন্যাসী"। ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শম"। অচঞ্চল চিত্ত বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শান্ত"। কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি-পরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম "নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ"।

হেম—অর্থ—স্বর্ণ এবং সুবর্ণ—অর্থও স্বর্ণ হয়। সুবর্ণবর্ণ এবং হেমাঙ্গ—এই উভয় নামে সুবর্ণ এবং হেম—এই দুইটী শব্দের একই স্বর্ণ-অর্থ করিলে দুইটী নামই একার্থক হইয়া পড়ে। একার্থক দুইটী নামের কোনও সার্থকতা নাই। এজন্য "সুবর্ণ"-শব্দের সু ( উত্তম ) বর্ণ ( অক্ষর ) ধরা হইয়াছে—"কৃষ্ণ"-নামের উত্তম অক্ষরদ্বয়। সুবর্ণবর্ণ—"কৃষ্ণ"-এই উত্তম অক্ষরদ্বয় যিনি বর্ণন করেন, তিনি "সুবর্ণবর্ণ"; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃষ্ণবর্ণ-শব্দেরই অনুরূপ।

"হেমাঙ্গঃ"-শব্দও শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের অনুরূপ।

উপপুরাণের প্রমাণ হইতে জানা গিয়াছে—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাভারতের "সন্ন্যাসকৃৎ"-শব্দেও তাহাই বলা হইয়াছে।

সুবর্ণবর্ণ, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত প্রভৃতি মহাভারতোক্ত শব্দগুলিও "হেমাঙ্গ"—গৌরবর্ণ" ভগবানের ভক্তভাবত্ব সূচিত করিতেছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীমদ্ভাগবত এবং উপপুরাণের উক্তি হইতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, মহাভারত হইতেও তদ্রূপই জানা যায়।

### ১৯১। শ্রুতিতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের উল্লেখ

মুণ্ডকোপনিষদে "রুক্মবর্ণ"-পুরুষসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটী দৃষ্ট হয়।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।১।৩ ॥ *

—যখন কেহ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভক্তিমান্ ( বিদ্বান্ ) হয়েন, তাঁহার পুণ্য ও পাপ ( সমস্ত কর্ম্মফল ) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন ( মায়ার লেপশূন্য ) হয়েন এবং সেই রুক্ম ( স্বর্ণ )-বর্ণ পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।"

এই শ্রুতিবাক্যে, পশ্যঃ-শব্দের অর্থ—দ্রষ্টা; পশ্যতি ইতি পশ্যঃ—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য। রুক্ম-অর্থ—স্বর্ণ; রুক্মবর্ণঃ—স্বর্ণবর্ণঃ, গৌরবর্ণঃ। ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্মেরও যোনি বা মূল; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যিনি

---

* মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্যে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো"-ইত্যাদি নামের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও (নির্বিবশেষ ব্রহ্মেরও) প্রতিষ্ঠা, নিদান, মূল, তিনি—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নিরঞ্জনঃ—মায়ার অঞ্জনশূন্য, সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত। বিদ্বান্—বিদ্যাবান্, ব্রহ্মজ্ঞ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল পরা বিদ্যা। "পরা যয়া তদক্ষরম্ অভিগম্যতে—পরাবিদ্যা, যদ্দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ মুণ্ডক-শ্রুতি॥১।১।৫॥" এই পরাবিদ্যাই ভক্তি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি॥ গীতা॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—শ্রীমদ্‌ভাগবত॥ ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব-ভূয়সী॥ সৌপর্ণ-শ্রুতি।" তাহা হইলে বিদ্বান্-শব্দের অর্থ হইল—ভক্তিমান্, প্রেমভক্তিমান্।

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে এক স্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া গেল। তিনি হইতেছেন ব্রহ্মযোনি—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু তাঁহার বর্ণটী—বাহিরের কান্তিটী—হইতেছে স্বর্ণবর্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে তাহারই উদ্দেশ পাওয়া গেল।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে আরও জানা গেল—এই স্বর্ণবর্ণ পুরুষের দর্শন মাত্রেই দ্রষ্টালোক প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্ম—সুতরাং অসুরত্ব পর্য্যন্ত—বিদূরিত হয়, তিনি সম্যক্‌রূপে মায়ার প্রভাব-মুক্ত হয়েন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-শব্দে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা গেল। এই শ্রুতিবাক্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্তির মূল বলিয়া মনে হইতেছে।

এই শ্রুতিবাক্যে আরও বলা হইয়াছে—এই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনকর্ত্তা তাঁহার সহিত "পরম-সাম্য লাভ করেন।" ইহার তাৎপর্য্য কি? এক অর্থ হইতে পারে—দ্রষ্টাও রুক্মবর্ণ পুরুষ—পরব্রহ্ম—হইয়া যায়েন; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না; যেহেতু, অণুচিৎ জীব কখনও বিভুচিৎ পরব্রহ্ম হইতে পারে না। আর এক অর্থ হইতে পারে—প্রভাবে পরম-সাম্য। স্বর্ণবর্ণ পুরুষের যে-প্রভাবে তাঁহার দর্শনমাত্রেই জীব—পাপী জীবও—তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন, সেই প্রভাবের সহিত দ্রষ্টাও পরম-সাম্য লাভ করেন; অর্থাৎ—তাঁহার দর্শনেও অপর লোক প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত হইতে পারেন এবং বিধৌতকর্ম্মা হইতে পারেন। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের প্রভাবে তাঁহার মধ্যে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সহিত কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

এইরূপে এই শ্রুতিবাক্য হইতে একটী বিশেষ তথ্য জানা গেল এই যে—এই গৌরবর্ণ পুরুষের দর্শনে যিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে তদ্রূপ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রুতিপ্রোক্ত এই রুক্মবর্ণ পুরুষই হইতেছেন গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্।

## ১৯২। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঋষি-করভাজন বলিয়াছেন—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কলিতে অবতীর্ণ হইবেন। কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত নবদ্বীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

তিনিই যে শাস্ত্রবর্ণিত গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্, এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমে তাঁহার জন্মাদির কথা বলা হইতেছে।

বর্ত্তমান পাকিস্থানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জিলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রামের এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জাত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বিদ্যার্থী হইয়া তৎকালীন বাঙ্গালাদেশের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে আসেন। তাঁহার বিদ্যালব্ধ উপাধি হয় "পুরন্দর"। অধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীশচী দেবী।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন তারিখে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে* শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথের যোগে একটী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুগঠন শিশুর আবির্ভাব হয়। জন্মকালে তাঁহার নাম রাখা হয়—**নিমাই**। নামকরণ-দিনে নাম রাখা হয়—**বিশ্বম্ভর**। সকল শিশু যেমন কাঁদে, ইনিও কাঁদিতেন; কিন্তু যে ভাবে অন্য শিশুর কান্না বন্ধ হয়, সেইভাবে ইঁহার কান্না বন্ধ হইত না। একমাত্র হরিনাম শুনাইলেই ইনি কান্না বন্ধ করিয়া আনন্দে হাস্য করিতেন। এজন্য, তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়াও, প্রতিবেশিনী রমণীগণ তাঁহাকে **গৌরহরি** বলিয়া ডাকিতেন।

অল্পবয়সেই অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ইনি মহা পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং দেশবিশ্রুত অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত হয়েন। নবদ্বীপে শত শত প্রবীণ অধ্যাপকের বাস। নানাস্থান হইতে খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণও নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করার জন্য নবদ্বীপে আসিতেন। এমন পণ্ডিতও আসিতেন, যাঁহাদের ভয়ে নবদ্বীপের প্রবীণ পণ্ডিতগণও সন্ত্রস্ত হইতেন। কিশোর অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের নিকটে তাঁহারাও পরাজয় স্বীকার করিয়া যাইতেন। তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপকদের ন্যায় নিমাই পণ্ডিতও নবদ্বীপের বাহিরে যাইয়া বিদ্যা বিতরণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার পূর্ব্ববঙ্গেও গিয়াছিলেন। সে-স্থানে অধ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম বিতরণও করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। পরে তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন।

পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতার প্রীতিকামনায় তিনি গয়াধামে গমন করিয়া পিতৃকৃত্য করেন। সে-স্থানেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে তিনি গোপীজনবল্লভোপাসনার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়েন। গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সেই আবেশ আরও গাঢ় হইয়া উঠে। অধ্যাপন করিতে গেলেও কেবল কৃষ্ণকথাই বলিতেন। অধ্যাপন বন্ধ হইল। দিবারাত্রি কৃষ্ণকথাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। পরম-ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিতেন। সময় সময় নগরকীর্ত্তনেও বাহির হইতেন। এই সময়ে নগরকীর্ত্তন উপলক্ষ্যে, নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তার—যিনি পূর্ব্বে কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন, তাঁহার—অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

---

* লেখকসম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর-আবির্ভাব সময়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জগাই ও মাধাই নামক দুইজন ব্রাহ্মণ-সন্তান নবদ্বীপে অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদের ভয়ে একাকী কেহ পথে বাহির হইত না। এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই। সর্ব্বদা মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি তাঁহাদেরও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেন। তাঁহারাও সর্ব্বজন-মান্য পরম-ভাগবত হইয়া পড়েন।

চব্বিশ বৎসর গৃহবাস করার পরে বৃদ্ধা পতিহীনা জননী এবং কিশোরী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে গৃহে রাখিয়া, ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে* (১৫১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) কাটোয়া নগরে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।

সন্ন্যাসের পরেই ফাল্গুন মাসে তিনি নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে বা পুরীতে) গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত এবং জগদানন্দ পণ্ডিত। নীলাচলে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য নামে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মায়াবাদী। চৈত্রমাসে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার সঙ্গে বিচারে বেদান্তসূত্রের শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদ-ভাষ্য খণ্ডন করেন। সার্ব্বভৌম ঐকান্তিক ভাবে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

১৪৩২-শকের বৈশাখ মাসে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে মাত্র সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বাহির হয়েন। এই সময়েই গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে শ্রীপাদ রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। রায় রামানন্দ ছিলেন স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী-প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা। বিদ্যানগর ছিল তাঁহার প্রধান-কার্য্যস্থল। তাঁহার যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি অসাধারণ ভক্তিও ছিল। তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। তাহার পরে তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বাহির হয়েন এবং সর্ব্বত্র নাম-প্রেম প্রচার করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পরে ১৪৩৪-শকের প্রথমে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশবাসী ভক্তগণও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। শ্রীনিত্যানন্দাদি পূর্ব্ব হইতেই সেখানে ছিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ তদবধি প্রতি বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে গিয়া চারি-পাঁচ মাস বাস করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহাপ্রভু রথযাত্রাদি দর্শন করিতেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন।

নীলাচল হইতে একবার তিনি গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গলার রাজধানী গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। শ্রীপাদ সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন-সাহের প্রধান মন্ত্রী; তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীপাদ রূপ ছিলেন হুসেন-সাহের "দবীরখাস"। দুইজনই ছিলেন

---

* লেখকসম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখ"প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মহাপণ্ডিত এবং মহাভাগবত। মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করার পরে দুই জনেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন।

গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার কিছুকাল পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড-পথে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়—বৃন্দাবনে প্রভুর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। দশদিন পর্য্যন্ত সে-স্থানে তিনি শ্রীপাদ রূপকে ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের জন্য আদেশ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

তারপরে তিনি প্রয়াগ হইতে কাশীতে আসেন। এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। সনাতনও বৃন্দাবনে প্রভুর সহিত মিলনের আশায় যাত্রা করিয়াছিলেন। দুইমাস পর্য্যন্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে জীবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্বাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারের উপদেশ দিয়া তাঁহাকেও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

কাশীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে একজন মহাপ্রভাবশালী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার দশ হাজার দণ্ডী সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভু বেদান্তের বিচার করিয়া মায়াবাদ-ভাষ্যের খণ্ডন করেন। সশিষ্য প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

কাশী হইতে তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। আর কখনও নীলাচলের বাহিরে যায়েন নাই। নানাস্থানে ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহার পরে আঠার বৎসর তিনি কেবল নীলাচলেই ছিলেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দ নানাভাবে তাঁহার ভাবানুরূপ সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিতেন।

তাঁহার আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন।

সন্ন্যাস-অবস্থায় প্রায় চব্বিশ বৎসর অবস্থান করিয়া ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রহের সহিত লীন হইয়া তিনি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দেহাবশেষ কিছুই ছিল না। *

---

* **মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কাল।** শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-নামক গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে প্রভুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে গুঞ্জাবাড়ীস্থিত শ্রীমন্দিরে (গুণ্ডিচামন্দিরে) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং জগন্নাথের বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন। সে-স্থলে জগন্নাথের সেবক যে পাণ্ডা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া "কি হইল, কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বাহিরে অবস্থিত শ্রীরামপণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি গৌড়দেশবাসী ভক্তদের নিকটে এবং কাশীমিশ্র, হরিদাস প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্তদের নিকটে তাহা জানাইলেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী

রায় রামানন্দ রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলেই প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার নিকটে এবং নীলাচলবাসী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির নিকটে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রভু সমস্তই বর্ণন করিয়াছেন। আর, প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাস তো প্রত্যক্ষ-দর্শীই ছিলেন।

স্বরূপদামোদর নবদ্বীপেও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য্য। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে দুঃখিতমনে কাশীতে গিয়া তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি নীলাচলে আসেন। প্রভুর সঙ্গে তিনিও গৌড়দেশে গিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া আসেন। তিনি আর কখনও নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান। তিনি প্রভুর নীলাচল-লীলার সঙ্গী এবং প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, কড়চাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর নীলাচল-বাসের শেষ ষোল বৎসর স্বরূপদামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। যাহা তিনি দেখিয়াছেন, স্তোত্রাদিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং শেষ সময়ে তিনি এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক সঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছেন।

শ্রীল মুরারি গুপ্ত ছিলেন প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী এবং প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, কড়চাকারে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

---

সপ্তমী তিথিতেই প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। রথযাত্রার সময়েই জগন্নাথ কয়েকদিন গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন্ শকের রথযাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে প্রভু অন্তর্হিত হয়েন, শ্রীল লোচনদাস তাহা বলেন নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥ চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। **চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান**॥ চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। * * চব্বিশ বৎসর শেষে করিল সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১৩।৭-১০॥" এই বিবরণ হইতে জানা গেল—১৪০৭ শকে আবির্ভূত হইয়া ৪৮তম বৎসরে ১৪৫৫ শকে তিনি অন্তর্হিত হয়েন। সন্ন্যাসের পরে চব্বিশ বৎসর প্রভু প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে ১৪৫৫ শকেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, অন্যভাবেও, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে মোট কয়টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলেও, নির্ণীত হইতে পারে। প্রভু যখন নীলাচলে থাকিতেন, তখন প্রতিবর্ষেই তাঁহার দর্শনের জন্য গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেন; তাঁহারা রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই যাইতেন, অন্য সময়ে যাইতেন না। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, বিশ বৎসরের রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন। "বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি॥ শ্রীচৈ. চ. ২।১।৪৫॥" এতদ্ব্যতীত চারিটী রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুইটী পূর্ণ বৎসর প্রভু দক্ষিণ ভারতে ছিলেন, সেই দুই বৎসরের রথযাত্রায় গৌড়বাসী ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই। যেবার প্রভু বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছিলেন, প্রভুর আদেশে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রায়ও তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই (শ্রীচৈ. চ. ২।১৬।২৪৫)। আর একবার, শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনের যোগে প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; সেইবারের রথযাত্রায়ও তাঁহারা যায়েন নাই (শ্রীচৈ. চ. ৩।২।৩৮-৪৪)।

[ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য ]

এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের কড়চা, শ্রীশ্রীরূপসনাতনের উক্তি এবং দাসগোস্বামীর মৌখিক উক্তিও ছিল শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপকরণ।

শ্রীল মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় আদিগ্রন্থ।

## ১৯৩। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি, দ্বিভুজ। গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপেও তিনি নরাকৃতি, দ্বিভুজ। পার্থক্য কেবল বর্ণে ও ভাবে। উভয় স্বরূপেই তিনি নরলীল। অপ্রকটেও নরবপু এবং নরলীল, প্রকটেও নরবপু এবং নরলীল। জন্মলীলার অনুকরণ করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

নরলীল এবং নরবপু ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকগণ তাঁহাকেও মানুষ বলিয়াই মনে করে। একথা শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়া গিয়াছেন (গীতা॥ ৯।১১॥)। কেবল অলৌকিকী শক্তিদ্বারাও ভগবৎ-স্বরূপকে নির্ণয় করা

---

এক্ষণে জানা গেল—প্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দুই বৎসরের দুই রথযাত্রায় এবং তাহার পরে প্রভুরই আদেশে আরও দুইটী রথযাত্রায়, মোট চারিটী রথযাত্রায়, গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই; আর বিশটী রথযাত্রায় তাঁহারা গিয়াছিলেন। এইরূপে, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চব্বিশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া গেল।

রথযাত্রা হয় বৎসরে একবার, চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায়। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মহাপ্রভু দুইবার মাত্র কয়েক মাসের জন্য নীলাচলের বাহিরে ছিলেন—একবার বৃন্দাবনে এবং আর একবার গৌড়ে যাতায়াতের জন্য। নীলাচলে তাঁহার এই অনুপস্থিতিকালে কোনও রথযাত্রা হয় নাই; যেহেতু, প্রত্যেকবারেই তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন শরৎকালে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বে। সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাসের এবং অন্তর্দ্ধানের মধ্যবর্ত্তীকালে মোট রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী; তাহার বেশীও নহে, কমও নহে।

তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে; সুতরাং ১৪৩২ শকের রথযাত্রাই হইবে উল্লিখিত চব্বিশটী রথযাত্রার সর্ব্বপ্রথম রথযাত্রা এবং ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাই হইবে সর্ব্বশেষ বা চতুর্বিংশতিতম রথযাত্রা। প্রভুর প্রকটকালের সর্ব্বশেষ রথযাত্রায় যে গৌড়ের ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—**১৪৫৫ শকের আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল।**

শ্রীযুত ফণিভূষণ দত্ত বিরচিত "চৈতন্যজাতক" হইতে জানা যায়, তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, **১৪৫৫ শকের ৩১শে আষাঢ়েই** রবিবার এবং শুক্লা সপ্তমী ছিল। অধুনা কেহ বলেন, "ঐদিন তিথি সপ্তমী ছিল না—ছিল অষ্টমী (১৩৬০ বাং সনের ২রা শ্রাবণের "দেশ"-নামক পত্রিকা)। কিন্তু তাহাতেও "চৈতন্যজাতকের" গণনাকে ভুল বলা সঙ্গত হয় না। সংস্কারযুক্ত এবং সংস্কারবর্জ্জিত গণনায় এই জাতীয় পার্থক্য পঞ্জিকাতেও দৃষ্ট হয়। ১৩৬৩ সনের চান্দ্র আশ্বিনী কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথি বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে ১৪ই কার্ত্তিকে, অন্য পঞ্জিকার মতে ১৩ই কার্ত্তিকে। "দেশ"-পত্রিকায় প্রকাশিত আনুষঙ্গিক যুক্তিগুলিও বিচারসহ নহে।

যায় না ; কেননা, কোনও কোনও জীবতত্ত্ব সাধক-মহাপুরুষের মধ্যেও ভগবৎ-কৃপায় কিছু কিছু অলৌকিকী শক্তি সঞ্চারিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাবাপন্ন নরলীল ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে বলেন না যে, তিনি ভগবান্। যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, শাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখ থাকে। কোন্ যুগে কি উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত থাকে। বিজ্ঞব্যক্তিগণ শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে লক্ষণাদি মিলাইয়াই ভগবদবতার নির্ণয় করেন।

"—অন্য অবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি। কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ। আমাসভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার।' মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।২৯২-৯৬ ॥"

কেবল শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ জানা থাকিলেও ভগবৎ-স্বরূপকে জানা যায় না। ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানিবার শক্তি দেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন ; অপর কেহ পারেন না।

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন ॥"

তাঁহারই কৃপায় এবং তাঁহারই শক্তিতে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি র্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

এই শ্লোকেরই মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫ ॥
রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥
শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৪৯-৫০ ॥"

রসিক-শেখর পরব্রহ্ম বিষয়জাতীয় রসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইরূপে বিরাজিত এবং আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইয়ের মিলিতরূপেও বিরাজিত। এই মিলিত রূপেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীল স্বরূপদামোদরের এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কলির উপাস্য গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান্ আছে কিনা। এক্ষণে সেই বিচারই করা হইতেছে।

## ১৯৪। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের বিচার

### ক। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহিক বৈশিষ্ট্য

নরবপু ভগবান্ জন্মলীলার ভিতর দিয়া মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও কতকগুলি **শারীরিক লক্ষণে** সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহার **বৈশিষ্ট্য** থাকে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

মানুষের দেহ দৈর্ঘ্যে হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত; বিস্তারেও—দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তও—হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত। বর্ত্তমান কল্পের ব্রহ্মাও ছিলেন নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত—সাত বিঘত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন—"সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ॥ ॥ ১০।১৪।১১॥" জগতে কোনও কোনও লোককে চারি হাত (ছয় ফিট্) লম্বাও দেখা যায়; কিন্তু প্রমাণ-মাপে চারিহাত হইলেও তাহার নিজের হাতে তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতই হইয়া থাকে।

ভগবান্ কিন্তু এরূপ নহেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় বলা হইয়াছে—ভগবানের বিগ্রহ হয় সাড়ে চারি হাত। কোনও কোনও স্থলে চারিহাতের কথাও পাওয়া যায়। তাহা হইলে, যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন, মানুষের মত দ্বিভুজ হইলেও তাঁহার দেহ মানুষের দেহের ন্যায় সাড়ে তিন হাত হইবে না—হইবে চারি হাত, কি সাড়ে চারি হাত।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহও দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের হাতের চারি হাত ছিল।

"দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥

'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৩৩-৩৪॥"

এ-স্থলে "মহাপুরুষ"-শব্দে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।৪০।৪-শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্ ॥" আবার, "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদি"-শ্রীভা. ১১।৫।৩৩-শ্লোকেও এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবান্‌কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে।

### খ। কর-চরণ-চিহ্নাদিতে বৈশিষ্ট্য

কর-চরণ-চিহ্নাদিতেও মানুষ অপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের **বৈশিষ্ট্য** আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই

বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার চরণে "শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১৪।৫॥" শ্রীভা. ৫।৪।১-হইতে জানা যায়, ঋষভদেবের পাদতলাদিতেও বজ্রাঙ্কুশাদি ভগবল্লক্ষণ বিরাজিত ছিল। এই সকল চিহ্ন কোনও মানুষের চরণে থাকে না। শিশু শ্রীচৈতন্যদেবের কর-চরণ-চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন—

"নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১৪।১৩॥"

এ-সমস্ত অসাধারণ শারীরিক লক্ষণের দ্বারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে মহাভারতোক্ত "বরাঙ্গত্ব" পাওয়া যায়।

মহাভারতোক্ত অন্যান্য লক্ষণও মহাপ্রভুতে ছিল। তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন করিতেন ( সুবর্ণবর্ণত্ব ), তাঁহার অঙ্গও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল ( হেমাঙ্গত্ব ), কীর্ত্তন-সময়ে ঘৃষ্টচন্দনের দ্বারা তিনি নিজের বাহু-আদিতে অঙ্গদাদি রচনা করিতেন ( চন্দনাঙ্গদিত্ব ), তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়াছিলেন ( সন্ন্যাসকৃৎ ), এবং "শমঃ নিষ্ঠাশন্তিপরায়ণঃ"ও তিনি ছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত লক্ষণের দ্বারাই তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না ; কেন না, কোনও জীবতত্ত্ব সাধকের মধ্যেও এ-সমস্ত লক্ষণ থাকিতে পারে, সাধারণভাবে "বরাঙ্গত্ব"ও থাকিতে পারে। অবশ্য উল্লিখিত কর-চরণাদি-চিহ্ন এবং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলত্ব কোনও জীবতত্ত্ব সাধকের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

গ। **দেহের ধর্ম্ম**। পূর্ব্বোল্লিখিত শারীরিক লক্ষণব্যতীত ভগবদ্‌বিগ্রহের আরও কতকগুলি লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সাধারণ মানুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নরলীল ভগবানের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। এইরূপ কয়েকটী লক্ষণের কথা বলা হইতেছে।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়— পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন অপহতপাপ্মা, বিজর এবং বিমৃত্যু। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্বীয় অনাদিসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহেই অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তখনও তাঁহাতে এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান্ থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে এই সকল লক্ষণ ছিল কিনা, তাহা দেখা যাউক।

**অপহতপাপ্মত্ব**। স্বয়ংভগবান্ অপহতপাপ্মা, অর্থাৎ তাঁহাতে কোনও পাপ নাই, কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং পাপজাত কোনও ব্যাধিও তাঁহার থাকিতে পারে না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে কোনও সময়ে কোনও ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ কোনও উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধেও এইরূপ কোনও উক্তি কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

অবশ্য শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন— গয়াগমনের পথে একস্থানে মহাপ্রভুর দেহে জ্বর প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতিকারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুই হইল না। তখন মহাপ্রভুই বলিয়া দিলেন—"সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে।" তদনুসারে তাঁহার নিকটে বিপ্র-পাদোদক উপস্থাপিত হইলে "বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।

সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ॥” বিপ্র-পাদোদক পান করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যে সাধারণ লোকের জ্বরের ন্যায় জ্বর নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিপ্র-পাদোদকের মহিমা এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপনের জন্য এইরূপ জ্বরের অনুকরণ হইতেছে মহাপ্রভুর একটী ভঙ্গীমাত্র। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

**বিজরত্ব।** স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন জরাবর্জ্জিত, বার্দ্ধক্যবর্জ্জিত। গোপাল-পূর্ব্ব-তাপনীশ্রুতি হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নিত্য-তরুণ। “গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ ॥ ১।২॥” জন্মলীলার অনুকরণে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের উদ্দেশ্যে বাল্য ও পৌগণ্ডকে বিগ্রহের ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন বটে; কিন্তু বাল্য-পৌগণ্ডের অবসানে কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি। গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সোয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন; কিন্তু বৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, কখনও তাঁহাতে গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় নাই। সোয়াশত বৎসর বয়সেও তিনি ছিলেন কৈশোরোচিত তারুণ্য-লাবণ্যমণ্ডিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুরও গুম্ফ-শ্মশ্রুর উল্লেখ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। নানাস্থানে তাঁহার যে সকল শ্রীবিগ্রহ বহুকাল ধরিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনওটীতেই গুম্ফ-শ্মশ্রু নাই। “গৌর-কিশোর প্রেমে গর গর”, “নবকিশোর গা-খানি তাঁর, কাঁচা নবনী হেন”—ইত্যাদি বাক্যে প্রাচীন পদকর্ত্তারাও প্রভুর “কৈশোরের”ই উল্লেখ করিয়াছেন। “শ্রীমন্নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র হা শ্রীবিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র। হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥”—ইত্যাদি স্তবেও তাঁহাকে “কিশোর” বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বদাই তাঁহার গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন দেহে কৈশোরোচিত তারুণ্য-লাবণ্য বিরাজিত ছিল।

**বিমৃত্যুতা।** স্বয়ংভগবানের মৃত্যু নাই। জীবের মৃত্যু হইলে তাহার প্রাণহীন দেহটী পড়িয়া থাকে। মৌষল-লীলার ব্যপদেশে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন, মহাভারত-শ্রীমদ্‌ভাগবত-বিষ্ণু-পুরাণাদির উক্তির সমন্বয়-মূলক আলোচনা হইতে জানা যায়, তখন তাঁহার কোনও দেহ পড়িয়া ছিল না (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৪৪খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর ব্যতীত অন্য কোনও চরিতকারই কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। শ্রীল লোচনদাস তাঁহার “শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল”-গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে লিখিয়াছেন —আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি গৌড়বাসী ভক্তগণও তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুকে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাঁহারা দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রেই মন্দিরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রভু বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন গুঞ্জাবাড়ীর ব্রাহ্মণ-পাণ্ডা সে স্থানে উপস্থিত হইলে কপাট খুলিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আর্ত্তির সহিত অনুরোধ করিলেন। তখন সেই পাণ্ডা তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন ॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।"

উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দ হাহাকার করিতে লাগিলেন। আর,

"শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।"

গুণ্ডিচামন্দিরকেই এ-স্থলে গুঞ্জাবাড়ী বলা হইয়াছে। রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথ কয়েকদিন গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন এবং গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব। ইহাতে মনে হয়, ১৪৫৫-শকের রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতেই মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আষাঢ়ী দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা।

যাহা হউক, শ্রীল লোচনদাস-ঠাকুরের বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার কোনও দেহ অবশিষ্ট ছিল না। প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ইহাই শ্রুতিপ্রোক্ত বিমৃত্যুত্ব।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যখন একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ, তখন অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্মগুলি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই বিরাজিত।

উল্লিখিত শারীরিক লক্ষণাদি হইতে জানা যায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীবতত্ত্ব ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব, ভগবৎ-স্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেই যে তিনি স্বয়ংভগবান্ হইবেন, তাহা নহে। স্বয়ং-ভগবানের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে না। এই সকল বিশেষ লক্ষণের কোনও একটী লক্ষণ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে—তিনি স্বয়ংভগবান্। শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবানের কোনও বিশেষ লক্ষণ ছিল কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সকল সময়ে হয়তো প্রকটিত হয় না, লক্ষ্য করাও যায় না। দুই একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও স্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে; যেহেতু, এই দুই একটী বিশেষ লক্ষণও স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকে না। মনে রাখিতে হইবে—বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, সামান্য লক্ষণের দ্বারা নহে।

## ঘ। শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবত্তার লক্ষণ

স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, **তাঁহার মধ্যে অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত** (১।১।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে, এমন কি বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণে বা দ্বারকাধিপতি বাসুদেবেও, এই লক্ষণটী থাকে না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবে যে এই বিশেষ লক্ষণটী বিদ্যমান্ ছিল, তাহা বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

তিনি যখন দিগম্বর শিশু, তখন একজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রান্নার পরে তিনি যখন স্বীয় ইষ্টদেবে ভোগ নিবেদন করিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিতেছিলেন, তখন দেখেন, দিগম্বর বিশ্বম্ভর তাঁহার নিবেদিত অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নষ্ট হইল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি পুনরায় রান্না করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন ; তখনও ঐরূপ ব্যাপার ঘটিল। তৃতীয়বার রান্না করিয়া ভোগ লাগাইলেন। শিশুকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এইবারও সেই অবস্থা। এইবারও ব্রাহ্মণ "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। তখন শিশু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

"—অয়ে বিপ্র ! তুমি ত উদার। তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার ॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান। রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান ॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি। অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি ॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অষ্টভুজরূপ ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়। আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার। সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥
নবগুঞ্জা বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে। চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়নকমল। বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল ॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন নূপুর। নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥
অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেই স্থানে। বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষীগণে ॥
গোপগোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিগে দেখে। যত ধ্যান করে তাই দেখে পরতেকে ॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ। আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন ॥
—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি ৩য় অধ্যায় ॥"

প্রভুর হস্তস্পর্শে বিপ্র চেতনা পাইলেন ; কিন্তু মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিপ্র, তুমি অনেক জন্ম ধরিয়া আমার সেবা করিতেছ। আমি যখন দ্বাপরে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখনও তুমি তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া আমাকে ভোগ নিবেদন করিয়াছিলে ; আমি তখনও তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়া ই রূপ দেখাইয়াছিলাম।"

এইরূপে শ্রীশচীনন্দন তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা ব্যতীতও অনেককে তিনি নিজদেহে অনেক ভগবৎ-স্বরূপ দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ

( চৈ. ভা. মধ্য ১০ ), মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ ( চৈ. ভা. মধ্য ২৫ এবং ৮ ), নারায়ণ ( চৈ. ভা. মধ্য ২ ), বরাহ ( চৈ. ভা. মধ্য ৩ ), বিশ্বরূপ ( চৈ. ভা. মধ্য ৬ ), শিব ( চৈ. ভা. মধ্য ৮ ), বলরাম ( চৈ. চ. ১।১৭।১০৯-১৩ ), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী ( চৈ. ভা. মধ্য ৮ ) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দকে এবং সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য এবং রাজা প্রতাপরুদ্রকেও ষড়্ভুজ রূপ দেখাইয়াছেন। গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাস-রূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ লেখকের "শ্রীশ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংভগবত্তার আর একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—**প্রেমদাতৃত্ব**। পূর্ব্বেই ( ১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদে ) বলা হইয়াছে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না।

স্বয়ংভগবত্তার এই বিশেষ লক্ষণটীও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। প্রেমদাতা বলিয়াই তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমদাতৃত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার বন্দনায় বলিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—কৃষ্ণচৈতন্য নামক গৌরকান্তি কৃষ্ণকে নমস্কার—যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়া মহাবদান্য।"

সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তিনি আপামর-সাধারণকে, এমন কি মহাপাপীকে পর্য্যন্ত, প্রেম দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ গুণটীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে ভক্তিকল্পতরুরূপে এবং ভক্তিকল্পতরুর রক্ষক এবং পোষকরূপেও বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাবারি-সিঞ্চনে এই কল্পতরুর সর্ব্বাঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল জন্মিত, তিনি সেই ফল নির্ব্বিচারে বিতরণ করিতেন।

"শ্রীচৈতন্যমালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥

*　　*　　*

উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে। এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥

*　　*　　*

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥

—শ্রীচৈ. চ. ১।৯।৭, ২৩, ২৫-২৮॥"

যে কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্ল্লভ, যে প্রেমের জন্য লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ গোকুলবাসীদিগের চরণ-রেণুর দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাও সত্যলোক ত্যাগ করিয়া গোকুলের

অরণ্যে তৃণ-গুল্মাদি কোনও এক যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"তদ্‌ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্ ॥ ইত্যাদি। শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪ ॥", সেই সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব,—"মাগে বা না মাগে, পাত্র বা অপাত্র"—সকলকেই দিয়াছেন।

গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন—"অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মান্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥"—উল্লিখিত বাক্যে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জগাই-মাধাই, শ্রীবাস-পণ্ডিতের বস্ত্র সেলাই করিতেন—এইরূপ এক যবন দরজী, শ্রীবাস-পণ্ডিতের চারিবৎসর-বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী প্রভৃতি বহু লোককে কৃষ্ণপ্রেম দিয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে বৃন্দাবন-গমনের পথে ঝারিখণ্ডের ভিল্লপ্রায় লোকদিগকেও কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছেন ; ঝারিখণ্ডের বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই তিনি নাম-প্রেম দিয়া ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র-মৃগ-হস্তী-আদিও কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে "লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি", ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন।

দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া অসংখ্য লোককে প্রভু প্রেমাপ্লুত করিয়াছেন ; এমন কি, দর্শনমাত্রেই লোক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, নাচিয়াছে, গাহিয়াছে। আবার অদ্ভুত ব্যাপার এই—প্রভুর দর্শনে যাঁহাদের উল্লিখিতরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের দর্শনেও আবার অন্য লোকের সেইরূপ অবস্থা এবং তাঁহাদের দর্শনেও অপরের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। এইরূপে প্রভু মুণ্ডক-শ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"—এই পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সত্যতা জাজ্জ্বল্যমান্ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

( প্রভুর প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা লেখকের "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থের "প্রেমবিতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য )।

স্বয়ংভগবত্ত্বার উল্লিখিত বিশেষ লক্ষণ দুইটীই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংভগবান্।

## ১৯৫। শ্রীচৈতন্য—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে তাঁহার স্বয়ংভগবত্ত্বার লক্ষণই প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, গোদাবরী-তীরে রায়রামানন্দের নিকটে তাহাও প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ ছিলেন তৎকালীন উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ; কিন্তু বিষয়ী হইলেও তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত, মহা-প্রেমিক, মহা পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ। মহাপ্রভু সেই স্থানে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেন, সন্ধ্যাকালে

রামানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। কয়েক রাত্রি প্রভু তাঁহার সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় প্রভু ছিলেন শ্রোতা, আর রামানন্দ ছিলেন বক্তা।

প্রভুর একটী স্বভাব ছিল এই যে, সম্ভবতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, তিনি প্রায় সকল সময়েই আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন। "ছন্নঃ কলৌ" কিনা! কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্ম-গোপন-প্রয়াস প্রায়শঃই সফল হয় না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম-বলে আত্ম-গোপন-চেষ্টিত ভগবান্‌কে চিনিয়া ফেলেন। "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৭১॥" রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময়েও প্রভু আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। তথাপি স্বীয় অসাধারণ প্রেমের প্রভাবে রামানন্দ যেন সময়ে সময়ে প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইতেন। প্রভুর স্বরূপ যেন সময় সময় রামানন্দের প্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত নয়নের সাক্ষাতে স্ফুরিত হইত; কিন্তু তাহা অতি অল্পসময়ের জন্য—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াই যেন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইত—রামানন্দ যেন আলেয়ার মতই প্রভুর স্বরূপের দর্শন পাইতেন। তাহার কারণ এই যে, প্রভুর ইচ্ছা নয়—আলোচনার মধ্যেই রামানন্দ তাঁহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব পায়েন; তাহা হইলে আর আলোচনা চলিবে না।

যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।১০২-৩॥

যাহা হউক, আলোচনা শেষ হইলে প্রভুর ইচ্ছা হইল, রামানন্দকে তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন। একদিন রামানন্দ গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিলেন—সন্ন্যাসীকে; কিন্তু উঠিয়া দেখেন প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের স্থলে আর একটী অপূর্ব্ব রূপ—কমল-নয়ন শ্যামসুন্দর বংশীবদন, তাঁহার সাক্ষাতে কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশী শ্রীরাধা; শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তিতে শ্যামসুন্দরের সর্ব্ব-অঙ্গ আচ্ছাদিত। দেখিয়া রামানন্দের মনে সংশয় জাগিল। তিনি প্রভুর নিকটে স্বীয় সংশয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২২০-২৪॥

আবার প্রভু আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন; এই বারের চেষ্টা যেন রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে। নগ্ন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যেরই মাধুর্য্য অধিক। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়। প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥—শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২২৫-২৮॥

—রামানন্দ, তোমার প্রেমের প্রভাবেই তুমি এইরূপ দেখিতেছ। আমি সন্ন্যাসীই, অপর কিছু নহি। তুমি যদি স্থাবর-জঙ্গমের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে, প্রেমের প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গমের স্বরূপ তুমি দেখিতে না, দেখিতে তোমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকেই।

এইবার রামানন্দ প্রভুর চাতুরীতে ভুলিলেন না। প্রভুর কৃপায় রায়ের চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব জন্মিয়াছে। তিনি বলিলেন—

—তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার॥
—শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২২৯-৩২॥

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন; হাসিয়া রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন।

তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২৩৩॥

প্রভু রামানন্দ রায়কে নিজের স্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তাহা হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাব, এই দুইয়ের মিলিত একটী রূপ। রসরাজ হইতেছেন—অখিল-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর, মহাভাব হইতেছেন—মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকা। সুতরাং, "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ। ইহাই প্রভুর স্বরূপ।

রায়রামানন্দ প্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২৩৪॥

প্রভুর হস্তস্পর্শে রামানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; তখন তিনি দেখিলেন—যেই সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী! "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" আর নাই। রামানন্দ ইহাতে বিস্মিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং যে-স্বরূপটী তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, নিজমুখে তাঁহার পরিচয়ও দিলেন।

গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২৩৮॥

—রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌরবর্ণ নহে; তবে যে আমাকে গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, তাহার কারণ—রাধাঙ্গ-স্পর্শন। শ্রীরাধাও গোপেন্দ্রসুত ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

ভঙ্গীতে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং তাঁহার নিজস্ব বর্ণ হইতেছে—নবজলধর-শ্যাম, গৌর নহে। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি (শ্যামসুন্দর) গৌরসুন্দর হইয়াছেন।

প্রভু আরও বলিলেন—

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২৩৯॥

—শ্রীরাধার ভাবদ্বারা (মাদনাখ্য মহাভাবদ্বারা) স্বীয় আত্মাকে (দেহকে) এবং মনকে (মনের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে) ভাবিত (পরিষিঞ্চিত) করিয়া আমি (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।"

কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া—একত্বপ্রাপ্ত হইয়া—গৌর হইয়াছেন, প্রভু তাহাও বলিলেন—স্বীয় (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহা সম্ভব হয়না এবং শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলেও শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার শ্যাম অঙ্গ শ্রীরাধার গৌর অঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ (ত্বিষাকৃষ্ণ) হইয়াছেন, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন। আর ভিতরেও, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইয়াছে, আর এই প্রেমরসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ—সমস্তই সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহাতেই তিনি শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপের আরও একটী বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল—তাহা হইতেছে গৌরের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য।

"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" দেখিবার পূর্ব্বেই রায়রামানন্দ শ্যামসুন্দর বংশীবদনের সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তখন শ্যামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপই প্রকটিত হইয়াছিল; যেহেতু, "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" এই মদনমোহন-রূপের দর্শনেও রামানন্দ নিশ্চয়ই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই। ইহাতে বুঝা যায়—মদনমোহন-রূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল। কিন্তু তিনি যখন প্রভুর স্বরূপ—"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"—দেখিলেন, তখন আনন্দের আধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—এই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল না। সুতরাং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" যে মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও অধিকতর এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত—তরঙ্গায়িত—করিতে পারে

একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে মাধুর্য্যেরও ততটুকু বিকাশ সম্ভব। শ্রীরাধিকাতে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—মদনমোহন-রূপের বিকাশ—সম্ভব। আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত ঘনিষ্ট হইবে, মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশীই হইবে। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ট হউক না কেন, তাঁহাদের দুই ভিন্ন দেহই থাকে। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ট, এত নিবিড় যে, তাঁহাদের ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই রূপে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতম রূপে—মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকরূপে—বিকশিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হয়, এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি বর্দ্ধিত—উচ্ছ্বসিত—হইতে থাকে, আবার শ্রীরাধার এই উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত আনন্দ-লহরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধিত মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার প্রেম এবং আনন্দ-লহরী পরস্পর যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একথা শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১২৪॥

সুতরাং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"-শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে আছে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আর আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর "হুড়াহুড়ি" করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ। তাই এই অপূর্ব্ব রূপের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, বুঝিবা স্বয়ং মদনমোহনেরও মনোমোহন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যুগলিত রাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ"। এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই" তাঁহাদের যুগলিতত্বের চরমতম বিকাশ। এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই স্বরূপ। যে স্বরূপে শক্তির বিকাশ যত বেশী, সেই স্বরূপের মহিমাও তত বেশী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপে কেবল মাত্র অমূর্ত্ত শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শক্তির অবস্থিতি দুই রকম— মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত্তশক্তি নাই, মূর্ত্ত শক্তি আছেন শ্রীরাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের বাহিরে। আর "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্ত শক্তির এবং অমূর্ত্ত-শক্তির একই রূপে সম্মিলন। তাই এই রূপে স্বরূপ-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, এই রূপেই পরম-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। স্বরূপদামোদর তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিতে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য অন্যভাবেও বিবেচিত হইতে পারে। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "আনন্দস্বরূপ—আনন্দং ব্রহ্ম" এবং "রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ,

সর্ব্বরসঃ” বলিয়াছেন। আনন্দ-শব্দে এবং রস-শব্দেও মাধুর্য্যই সূচিত হইয়া থাকে ; সুতরাং মাধুর্য্যই যে পর-ব্রহ্মত্বের সার বা প্রাণবস্তু, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম যে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্, তাহাতেও সন্দেহ নাই। “ওঁ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং “যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্” ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে এবং “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম” ইত্যাদি গীতাবাক্যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—“কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।” সুতরাং মাধুর্য্য যে ভগবত্তার এবং পরব্রহ্মত্বের এবং পরতত্ত্বত্বেরও সার, তাহাও জানা যায়। সুতরাং যে স্থলে মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, সে স্থলে যে স্বয়ংভগবত্তার এবং পরতত্ত্বত্বেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণে —“রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে”—মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়াই বলা হইয়াছে —“ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।”

যাহাহউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত স্বরূপ, রায়রামানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর একটী বাক্য হইতে মনে হয়, তিনিও এই স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

“অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী　রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্　স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

—যিনি কৌতূহল-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রণয়িজনবৃন্দের (ব্রজবনিতাগণের) মধ্যে কোনও এক জনের (শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার (শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া তদ্দারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে অপর কেহ কেহ যে এই “রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপের” অনুভব পায়েন নাই, তাহাও বলা যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর এই রূপের অনুভব পাইয়াই “তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্”—বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রায়রামানন্দ প্রভুর যে স্বরূপের দর্শন পাইয়াছেন, তাহা যে “রাধাদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ,” পরিষ্কার ভাবেই তাহা বুঝা যায়। আর, তাহা যে “রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপও”, প্রভুর নিজের উক্তিতেই তাহা জানা যায়।

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ শ্রীচৈ. চ. ২।৮।২৩৯॥

## ১৯৬। শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার ভাব

শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করাতে সেই ভাবের আবেশে গৌরকৃষ্ণ নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিতেন এবং শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণকান্ত মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট গৌর-কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তদ্রূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় "রাধা"-জ্ঞান ॥ শ্রীচৈ. চ. ৩।১৪।১৩ ॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।১৭।২৭০ ॥

শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড়ভাবে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরাধার ভাবই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরাধার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে যে ভাব উদিত হয়, প্রভুর অন্তঃকরণেও সেই-সেই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার যে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের স্ফুর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেইরূপ সুখের উদয় হইয়া থাকে; আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহে শ্রীরাধার চিত্তে যে তীব্র দুঃখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের ভাবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও তদ্রূপ অসহ্য দুঃখ উদিত হইয়া থাকে।

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ দিব্যোন্মাদ প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ভাবের আবেশে প্রভুও তদ্রূপ দিব্যোন্মাদ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।৯৪-৯৫ ॥

শ্রীরাধার বিশেষ ভাবগুলিও—মোহন এবং মোহনজনিত দিব্যোন্মাদ, মাদন—শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিশেষ উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ভাবের লক্ষণ তাঁহার শ্রীরাধাস্বরূপত্বই প্রতিপাদিত করে। গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে তৎসমস্তের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল না। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখকের "শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ। স্বয়ংভগবত্তার বিশেষ লক্ষণও তাঁহাতে বিদ্যমান, শ্রীরাধার বিশেষ লক্ষণও তাঁহাতে বিরাজমান। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যে সকল লক্ষণের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত লক্ষণও শ্রীমন্মহাপ্রভুতে বিরাজমান।

## ১৯৭। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অবতারের হেতু

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—দ্বাপর-লীলার অন্তর্দ্ধানের পরে অপ্রকট গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন—

"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥
আপনি করিয়া ভক্তিভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ॥ এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥
—শ্রীচৈ. চ. ১।৩।১২-২২ ॥"

পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন ঃ—পূর্ব্বকল্পের কোনও এক কলিযুগে জগতের জীবকে তিনি প্রেমভক্তি দিয়াছিলেন; তাহার পরে বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই বহুকালের মধ্যে আর প্রেমভক্তি দেওয়া হয় নাই। "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান" ( চিরকাল—বহুকাল। শব্দকল্পদ্রুম )। অথচ প্রেম "ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।" একথা বলার হেতু এই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা···আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥১।৪।৮॥"-এই বাক্য হইতে জানা যায়—রসস্বরূপ পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩৩-অনু ); প্রিয়রূপেই তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্যই হইতেছে তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য সেবা ; যেহেতু, প্রিয়ব্যক্তির প্রীতিবিধানই সকলের অভীষ্ট। সুখস্বরূপ রসস্বরূপ প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্মের এই প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবাই বা সেবার বাসনাই হইতেছে—প্রেমভক্তি। ইহাই পরাবিদ্যা,—যদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ১।১।৫॥" এইরূপ প্রীতির ভাবব্যতীত, মমত্ববুদ্ধিব্যতীত, অন্যভাবে-অন্যবুদ্ধিতে, তাঁহার উপাসনায় সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রিয়রূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, নিতান্ত আপন-ভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহার প্রেমসেবাও পাওয়া যায় না। যে পর্য্যন্ত সেই রসস্বরূপকে এইভাবে পাওয়া না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত— জীবমাত্রের মধ্যেই যে একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে, প্রেমসেবাদ্বারা রসস্বরূপ-সুখস্বরূপ-প্রিয়তম-পরব্রহ্মের প্রীতিবিধানের বাসনা-পূর্ত্তিরূপা যে একটা সুখবাসনা আছে—সেই বাসনার চরমা-তৃপ্তি পাওয়া যাইবে না। তাঁহাকে নিতান্ত আপন করিয়া পাইলেই তাঁহার প্রেমসেবা দ্বারা জীব আনন্দী হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এইরূপ "আনন্দী" হইতে পারিলে, প্রিয়ের অনুসন্ধানে, আনন্দের অনুসন্ধানে সর্ব্ববিধ ছুটাছুটীর চিরতরে অবসান হইয়া যায়। প্রেমভক্তিই হইতেছে—এইভাবে "আনন্দী" হওয়ার একমাত্র উপায়। তাই বলা হইয়াছে—"ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মা নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ গীতা। ১৮।৬৫॥"-ইত্যাদি বাক্যে তিনি অর্জ্জুনের নিকটে প্রেমভক্তি-লাভের উপায়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন সত্য, এবং প্রেমভক্তিদ্বারা যে তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ের অনুসরণে যে প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে, সেই প্রেমভক্তি দেন নাই। কয়জন লোকই বা এই উপদেশের অনুসরণ করিবে ? বিশেষতঃ দ্বাপরে তিনি ভজনের আদর্শও স্থাপন করেন নাই। উপদেষ্টা স্বয়ং যদি উপদেশ অনুসরণের আদর্শ স্থাপন করেন, তাহা হইলেই লোকের পক্ষে সুবিধা হয়। কিন্তু দ্বাপরে তিনি তাহা করেন নাই। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন—আবার তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, অবতীর্ণ হইয়া দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুর—এই চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া জগতের জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন। "চারি ভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।" এইবার তিনি প্রেমভক্তিই দিবেন—কেবল প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের উপদেশমাত্র দিবেন না। দ্বাপরে ব্যাসদেবের নিকটে তিনি তাঁহার এই প্রেমদানের সঙ্কল্পের কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥" আরও সঙ্কল্প করিলেন—তিনি ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভজনের আদর্শও স্থাপন করিবেন।

প্রেমভক্তি দানেরই যখন সঙ্কল্প, তখন তাঁহার নিজেকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে ; কেননা স্বয়ং ভগবান্ তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ ব্রজ-প্রেম দিতে পারিবেন না। যুগাবতারকে অবতারিত করাইলে কলির যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু যুগবতার তো ব্রজ-প্রেম দিতে পারিবেন না। তাই তিনি নিজেই অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তনেরও প্রবর্ত্তন করিবেন এবং ব্রজ-প্রেমও বিতরণ করিবেন।

ভক্তভাব ব্যতীত ভজনের আদর্শ স্থাপন করা যায় না। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তভাব নাই, তাঁহার মধ্যে কেবল ভজনীয়ত্বের ভাব। তাই তিনি তাঁহার ভক্তভাবময়-স্বরূপেই-অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার ভক্ত-ভাবময় স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর-রূপেই কলির প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন "তথিলাগি পীতবর্ণে চৈতন্যাবতার ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৩।৩১ ॥"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দররূপে তিনি প্রেমের অখণ্ড-ভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া যথেচ্ছ ভাবে প্রেম-বিতরণের সুযোগও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অপেক্ষা অনেক বেশী।

এইরূপে দেখা গেল—জগতের দিক হইতে বিবেচনা করিলে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের হেতু হইতেছে—প্রেমভক্তি-বিতরণ, যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন এবং ভজনের আদর্শ স্থাপন।

কিন্তু এসমস্ত হইতেছে তাঁহার অবতারের আনুষঙ্গিক হেতু। রসিক-শেখরের মুখ্য কাজ হইতেছে রস-আস্বাদন, শ্রীশ্রীগৌররূপে এই রস-আস্বাদন হইতেছে স্বীয় মাধুর্য্যের—ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্য্যের আস্বাদন।

ভগবান্ যখনই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার পরিকরবর্গকে সঙ্গে লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া

থাকেন। এই পরিকরবর্গ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী রসাস্বাদনের আনুকূল্যও করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধীয় কার্য্যের আনুকূল্যও করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পরিকরবর্গও তাহা করিয়াছেন। নাম-প্রেম-বিতরণে এবং ভজনের আদর্শ-স্থাপনেও তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদন-ব্যাপারেও তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাধাভাবের আবেশে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির আস্বাদন করিয়াছেন। নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। তিনি নিজেও নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন, পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও করাইয়াছেন।

আবার, দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো"-ইত্যাদি বাক্যে মাত্র ষোলটী অক্ষরে সূত্রাকারে যে প্রেমভক্তি-সাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের নিকটে যেন তাহারই বিস্তৃত ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই গোস্বামিদ্বয় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে সেই ভাষ্যকেই প্রতি-ফলিত করিয়াছেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

# বিংশ অধ্যায়

## [ সম্বন্ধ-তত্ত্ব ]

**১৯৮। সম্বন্ধ-শব্দের** একটী অর্থ হইতেছে—প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু হইতেছেন পরব্রহ্ম।

কঠোপনিষদে দেখা যায়, যম নচিকেতার নিকটে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ২।১৫॥

—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সমস্ত সাধনাত্মক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় স্বয়ং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও বলিয়া গিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ ১৫।১৫॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য বা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব আমিই।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥ শ্রীভা. ১১।২১।৪২, ৪৩॥

—(বৃহতী নামক বেদের ছন্দবিশেষ কর্ম্মকাণ্ডে) বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা) কাহাকে প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) কাহাকে অবলম্বন করিয়া বিকল্পনা (বা তর্কবিতর্ক) করেন—এ-সমস্ত বিষয়ে বৃহতীর তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। (সেই বৃহতী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে) আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) বিধান করেন, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্ররূপে) আমাকেই প্রকাশ করেন এবং (জ্ঞানকাণ্ডে) তর্কবিতর্ক দ্বারা আমাকেই নিশ্চয় করেন।"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যে বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, ইহা হইতেও তাহা জানা গেল।

"বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।

বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।

বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ শ্রীভা. ১।২।২৮-২৯ ॥

—সমস্ত বেদ বাসুদেবপর ( বাসুদেবেই বেদের তাৎপর্য্য, ) সমস্ত যজ্ঞের তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, যোগের ( যোগশাস্ত্রের ) তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, সমস্ত বেদবিহিত ক্রিয়ার তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, জ্ঞানশাস্ত্রের তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, তপস্যার তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, ধর্ম্মের তাৎপর্য্যও বাসুদেবে, সমস্ত গতির তাৎপর্য্যও বাসুদেবে।”

সমস্তের তাৎপর্য্যই যে পরব্রহ্ম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে, এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্য হইতেও তাহাই জানা গেল।

এজন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

“বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ। তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াগন্ধ ॥
গৌণমুখ্যবৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে। বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥
শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১২৭-২৮ ॥”

এইরূপে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের এবং বেদানুগত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু, শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

**সম্বন্ধ-শব্দের আর একটী অর্থ** হইতে পারে—**অন্বয়, যোগ, সংলগ্নতা**। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সমগ্র বিশ্বের এবং বিশ্ববাসী সমস্ত জীবের নিত্য অন্বয়, সংযোগ। যেহেতু, পরব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি। “জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র।১।২॥—যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি-আদি হয়, তিনিই ব্রহ্ম।” শ্রুতিও বলেন—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয়।৩।১॥—যাঁহা হইতে এই বিশ্বস্থিত সমস্ত ভূতের জন্ম হয়, যাঁহা দ্বারা সমস্ত ভূত জীবিত থাকে, পুনরায় যাঁহাতে সমস্ত প্রবেশ করে, তাঁহার তত্ত্বই জানিবে, তিনিই ব্রহ্ম।” শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ—ব্রহ্মেতে জীবয়। সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ’য়ে যায় লয় ॥ ২।৬।১৩৫॥”

এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরব্রহ্মেরই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণতি। শক্তি ও শক্তিমানের সঙ্গে যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, শক্তিমান্ পরব্রহ্মের সঙ্গেও তাঁহার শক্তি-পরিণতি এই বিশ্বের সেই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অন্বয়।

আবার, ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবমণ্ডলীও তাঁহারই তটস্থা-শক্তির অংশ ; সুতরাং জীবমণ্ডলীর সহিতও পরব্রহ্মের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সংযোগ বা সম্বন্ধ।

আবার, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভগবদ্ধাম-সমূহও পরব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং ভগবদ্ধাম-সমূহও তাঁহার সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বন্ধান্বিত।

ভগবদ্ধামস্থিত ভগবৎ-পরিকরাদিও তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ বা তাঁহারই অংশ। সুতরাং তাঁহাদের সহিতও পরব্রহ্মের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

এই সমস্ত কারণেও জানা যায়—পরব্রহ্মই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

**সম্বন্ধ-শব্দের আর একটী অর্থও** হইতে পারে—সম্‌+বন্ধ ( বন্ধন )—**সম্যক্ বন্ধন** যাঁহার সঙ্গে, তিনি। যেই বন্ধন অনাদি, অনন্ত, নিত্য, যে বন্ধন কখনও ছিন্ন হইতে পারে না, তাহাকেই সম্যক্ বন্ধন বলা যায়। এই জাতীয় সম্যক্ বন্ধন আছে যাঁহার সঙ্গে, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে পরব্রহ্মের সহিতই জীবের এবং সমস্তের এই জাতীয় নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান্। সুতরাং পরব্রহ্মাই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে আমাদের একটা প্রিয়ত্বের বন্ধন আছে। সেই জন্য আমরা বলিয়া থাকি, তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ নহে; কেননা, ইহা অনিত্য; অবিচ্ছেদ্যও নয়। নিত্য অবিচ্ছেদ্য প্রিয়ত্বের সম্বন্ধও একমাত্র পরব্রহ্মের সঙ্গেই; যেহেতু, তিনিই একমাত্র প্রিয় বস্তু ( ১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

এই জগতে যাহাদের সহিত আমাদের প্রিয়ত্বের বন্ধন আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহারা আমাদের সুখ দিতে পারে বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা প্রিয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহাদের কেহই আমাদের বাস্তব অভীষ্ট সুখ বা আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দ দিতে পারেন—একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম। "এষ হি এব আনন্দয়াতি ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতি ॥ আনন্দবল্লী। ৭ ॥" সুতরাং সুখদাতৃত্বের দিক্ হইতেও একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব হইতেছেন—পরব্রহ্ম।

যাহাদিগকে আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়, বলিয়া মনে করি, জীবনাবসানের পরে তাহারা সকলেই আমাদিগকে শশ্মানাদিতে বিসর্জ্জন দিয়া আসে। তখনই তাহাদের সহিত আমাদের প্রিয়ত্ব-মূলক সম্বন্ধের বা ব্যবহারের অবসান ঘটে। কিন্তু পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই তখনও আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত করিয়া বা করাইয়া থাকেন; তিনিই আমাদের কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া কর্ম্মফলের বোঝা কমাইয়া দেন; তিনিই ভোগের উপযোগী দেহ দিয়া থাকেন; তিনিই ভজনের উপযোগী দেহ দিয়াও তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে নেওয়ার সুযোগ আমাদিগকে দিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না, হইতেও পারে না।

পরব্রহ্মের সহিতই যে জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান্।

প্রথমতঃ, অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; তিনি কিন্তু বহির্ম্মুখ জীবকেও ভুলেন নাই। দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের সুখ-সাধন বস্তুর অনুসন্ধানে জীব বিব্রত; সুখ-সাধন বস্তু দিয়া থাকেন কিন্তু তিনিই; অপর কাহারও দেওয়ার সামর্থ্য নাই; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বাধিপতি। তিনি সকলের—বহির্ম্মুখ জীবেরও—স্বরূপতঃ প্রিয় বলিয়া, সুতরাং সকলও স্বরূপতঃ তাঁহার প্রিয় বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ কাহাকেও ভুলিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া, তাহার অন্তর্ম্মুখতা জন্মাইবার জন্য পরব্রহ্ম ভগবানের বিশেষ প্রয়াস। এজন্য তিনি অনাদিকালেই বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন—যেন বেদ-পুরাণাদির কথা শুনিয়া জীব তাঁহার দিকে মনকে ফিরাইবার চেষ্টা করে। যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, তিনি

যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াও জীবকে তাঁহার উদ্দেশ জানাইয়া থাকেন ; আবার ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ের কথা জানাইয়া থাকেন।

অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া জীব জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিরূপে এই যন্ত্রণার চির-অবসান ঘটিতে পারে, বেদ-পুরাণাদিতে তিনিই তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥—তাঁহাকেই জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় ; ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

আবার, যদি কোনও ভাগ্যবান্ তাঁহার প্রকটিত শাস্ত্রাদির অনুসরণে তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনিও তদুপযোগিনী বুদ্ধি আদি দিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। একথা তিনি নিজেই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা॥ ১০।১০॥"

এমন প্রিয়ত্বের বন্ধন যাঁহার সঙ্গে, তিনিই একমাত্র সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই।

## পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব

এইরূপে, যে দিক্ হইতেই বিবেচনা করা যাউক না কেন, দেখা যাইবে, জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই, অপর কাহারও সঙ্গেই নহে। তিনিই একমাত্র প্রিয়, তিনিই একমাত্র সুখ। তিনিই সুখও দিতে পারেন, অপর কেহ পারে না। বাস্তবিক প্রিয়োচিত ব্যবহারও একমাত্র তিনিই করিতে পারেন, অপর কেহ পারে না। এতাদৃশ সম্বন্ধতত্ত্ব-বস্তুকে আমরা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছি, অনাদিকাল হইতেই তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া আছি। অথচ, রসস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ তাঁহার সহিতই অনাদি অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধবশতঃ সুখের জন্য, প্রিয়ের জন্য একটা চিরন্তনী বাসনাও আমাদের মধ্যে বিরাজিত। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আমাদের নাই বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিনা যে, এই চিরন্তনী বাসনা তাঁহারই জন্য। তাই তাঁহার অনুসন্ধান করিনা ; অন্যত্র সুখ এবং প্রিয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছি ; কিন্তু পাইতেছি না ; যাহা পাইতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা দ্বারা আমাদের সেই চিরন্তনী বাসনার পরিতৃপ্তি হইতেছেনা। আত্মবঞ্চনামাত্রই সার হয়। তাহার ফলে বরং জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্যাদির প্রবাহেই আমরা ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

যাঁহাকে ভুলিয়া আছি এবং যাঁহাকে ভুলিয়া থাকার ফলে আমাদিগকে জন্ম-মৃত্যু-আদির প্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যু-আদির অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও পন্থাই নাই। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" সেই রসস্বরূপকে পাইলেই, সেই প্রিয়স্বরূপকে পাইলেই, জীব বস্তুতঃ আনন্দী হইতে পারে, প্রিয়ের জন্য—সুখের জন্য—তাহার সমস্ত ছুটাছুটির সম্যক্‌রূপে অবসান ঘটিতে পারে ; অন্য কিছুর বা অন্য কাহারও প্রাপ্তিতে তাহা হইতে পারেনা। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, আনন্দস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে পাইলেই

আনুষঙ্গিকভাবেই জন্ম-মৃত্যু-আদি সমস্ত ভয়ের মূল কারণ দূরীভূত হইয়া যায় ; তখন আর ভয়ের কোনও হেতুই থাকে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। তৈত্তিরীয়-শ্রুতি ॥ আনন্দবল্লী। ৯।১॥"

## ১৯৯। কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ

জীবের সহিত যখন একমাত্র তাঁহারই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন জীবের পক্ষে তিনি অপ্রাপ্য নহেন, অনধিগম্য নহেন। "কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০৯।" তিনি যদি একেবারে অপ্রাপ্যই হইবেন, তাহা হইলে—নিজেকে জানাইবার জন্য, তাঁহাকে পাওয়ার উপায় জানাইবার জন্য—তিনি বেদাদি-শাস্ত্রই বা প্রকটিত করিলেন কেন এবং নানা ভাবে জগতে অবতীর্ণই বা হয়েন কেন ? তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" তাঁহাতে অসত্য বা মিথ্যা কিছু নাই ; তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহাতে বা তাঁহা হইতে অমঙ্গলও কিছু নাই ; তিনি সুন্দর, তাঁহাতে অ-সুন্দর কিছু নাই। জীবকে বঞ্চনা করার জন্য তিনি জগতে আসেন না, জীবকে বঞ্চনা করার জন্য তিনি বেদাদি-শাস্ত্র প্রকটিত করেন নাই।

### পাওয়ার উপায়

তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ও তিনি জানাইয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে তিনি জানাইয়া গিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ॥ গীতা ১৮।৬৫॥" তাঁহার এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ভজন করিলে যে তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রিয় অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন্। "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ গীতা ॥ ১৮।৬৫॥"

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আর পুনর্জ্জন্ম হয়না, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥ ৮।১৬॥—

—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তন (পুনর্জ্জন্মগ্রহণ) করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি হইল তাঁহার প্রাপ্তির অবান্তর ফল। মুখ্য ফল যে "আনন্দী" হওয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

## ২০০। তাঁহার ভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে

জীবমাত্রেই যখন তাঁহার শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবমাত্রেরই তাঁহার ভজনে স্বরূপগত অধিকার আছে। দাহিকা-শক্তি হইতে যেমন অগ্নিকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারেনা, শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার হইতেও তদ্রূপ কেহ জীবকে বঞ্চিত করিতে পারেনা। একথা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ গীতা ॥ ৯।৩২ ॥

—হে পার্থ! যাহারা পাপযোনি ( হীনকুলজাত ), যাহারা স্ত্রীলোক, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র, আমার সেবা করিয়া তাহারাও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়া থাকে।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥

শ্রীচৈ. চ. ৩।৪।৬২-৬৩॥"

## ২০১। দেবতান্তরের ভজনে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না

তাঁহাকে পাইয়া "আনন্দী" হইতে হইলে, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে হইলে, তাঁহারই ভজন করিতে হইবে। দেবতান্তরের ভজনে দেবতান্তরকে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যাইবেনা। তিনিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ গীতা॥ ৯।২৫॥

—দেবভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়েন, ( শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ ) পিতৃপুরুষের ভজনকারীরা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়েন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন এবং আমার যজনকারিগণ ( অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ ) আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন—"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্‌ভক্তা যান্তি মামপি॥ গীতা॥ ৭।২৩॥"

অন্য দেবতার উপাসনার ফল অস্থায়ী—তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্‌ভবত্যল্পমেধসাম্॥ গীতা॥ ৭।২৩॥"

সুতরাং সম্বন্ধ-তত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয়-তত্ত্ব।

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই প্রকাশ বলিয়া যে কোনও মায়াতীত ভগবৎ-স্বরূপের যথাবিহিত উপাসনায় মুক্তি লাভ করা যায় বটে; কিন্তু ব্রহ্মের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে, সম্যক্‌রূপে "আনন্দী" হইতে হইলে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন অপরিহার্য্য। পঞ্চম পর্ব্বে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগো৹বিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে প্রথম-পর্ব্বে প্রথমাংশে
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণসম্মত
ব্রহ্মতত্ত্ব সমাপ্ত।